নবপর্য্যায়।

(তৃতীয় খণ্ড)

১৩২০

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবত রত্ন বি-এ
সম্পাদিত।

বীরভূম সাহিত্য পরিষৎ।
কলিকাতা কার্য্যালয়
১৭ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।

বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

বীরভূমি।

[নব-পর্য্যায়]

তৃতীয় খণ্ড।

১৩২০ বঙ্গাব্দ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
অদ্বৈত সিদ্ধি	শ্রীরমেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী	২২৪
অন্ধ বিলাপ (কবিতা)	শ্রী প্রভাসকুমার সেন	৬৩০
অসীমে (কবিতা)	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এম্,এ,বি, এল,	৪৯
অন্তঃসলিলা (গল্প)	শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১
অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী	শ্রীশিবরতন মিত্র	৬৯২
অভয়া (কবিতা)	শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী	১৬
অভিমানে (গল্প)	শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৬২
আগমনী	সম্পাদক	৩২৯
আগমনী (কবিতা)	শ্রী প্রভাসকুমার সেন	৩৯১
আজ কেন ভুলিলে আমায় (কবিতা)	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এম্,এ,বি,এল,	১১১
আদর্শ নাশ	... ..	১২৯
আলোচনা	শ্রীমতী প্রিয়বালা সেন গুপ্ত	৮২
নায়ৎ খাঁ ও হিন্দু সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক	শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ	২৭৫
শ্বর দর্শন বিষয়ে শশিপদ বাবুর অভিমত	শ্রীপঞ্চানন শিরোরত্ন	৫১১
পাসনা	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার,এম্,এ,বি,এল,	৩৭
ঊষা (কবিতা	শ্রীপ্রভাসকুমার সেন	১৫৯
কালিয়	শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৪১৮,৪৬৬,৫২২,৬০৮
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী	শ্রীশিবরতন মিত্র	০৫
খেলা (কবিতা)	শ্রী—	৭৯
ঘড়িওয়ালা (গল্প)	শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়	১২০
চণ্ডিদাস	শ্রীশিবরতন মিত্র	৩৪৬
চার্ব্বাকের দেহাত্মবাদ খণ্ডন	শ্রীরমেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী	২৮৯
চিত্ত নদী (কবিতা)	শ্রীঅনিলোর্ম্মি সান্যাল	৬৬০
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একদিক	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু এম্, এ	৬১
ছলনা (কবিতা)	শ্রী—	১৯২
ছেলে (গল্প)	শ্রীমতী রাধারাণী দেবী	৭২

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
ডাকাতি (কবিতা)	শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী	১২৭
তুমি (কবিতা)	শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী	৬৪৮
দর্পহরণ (কবিতা)	শ্রীপ্রভাসকুমার সেন	৫৬০
দাস-ব্যবসায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৬১
দাও বল (কবিতা)	...	৭৩৯
দীক্ষা দান (কবিতা)	শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৬০২
দীনবন্ধু	শ্রী—	৫৮৯
দেশ ও কাল	শ্রীভারতচন্দ্র চৌধুরী, বি, এ,	৪০৪
নবদ্বীপে অষ্ট প্রহর	শ্রীপান্নালাল দে	৩৭৭
নিকলসনের ন্যায়-বিচার (গল্প)	শ্রীআদ্যানাথ রায় বি, এ, বি, টি,	২৮৮
পারিজাত (গল্প)	শ্রীমতী রাধারাণী দেবী	১০
প্রকৃত বন্ধু (কবিতা)	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১২৮
প্রাচীন মঙ্গল ডিহি	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১৫০
প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম্, এ, পি আর এস	২৯৭
প্রথমবৌদ্ধ মহাসঙ্গিতী	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম্,এ,পি-আর-এস	১
প্রভাত-স্বপ্ন (গল্প)	শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৫
প্রেম (গল্প)	শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী	২৮
প্রেম প্রীতি বা পিরীতি	শ্রীআনন্দগোপাল সেন, বি, এ,	৫৯
বধূ উর্ম্মিলা (কবিতা)	শ্রীপ্রভাসকুমার সেন	২৯৯
বর্ষ বৃদ্ধি	শ্রীউপেন্দ্রমোহন কবিভূষণ, বি,এ,	৫০
বর্ষগীতি	শ্রীননীবালা দেবী	৭৪৩
বাবর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী	শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ	২২৩
বংশের ধন (গল্প)	শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৬০
বিজয়া	সম্পাদক	৪০১
বিদায়ের পর (কবিতা)	শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়	২২২
বিশ্বাসের কথা	সম্পাদক	১৯৮
বীরভূমের গ্রাম্য ক্রীড়া	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৫৪৬
বৈষ্ণব তত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা	শ্রীআনন্দগোপাল সেন, বি, এ,	৪৭৬
বুদ্ধের করুনা (কবিতা)	শ্রীপ্রভাসকুমার সেন	৪৫৫
ব্রজের দুলাল (কবিতা)	শ্রীপ্রভাসকুমার সেন	৫০০
ব্রত ভঙ্গ (গল্প)	শ্রীশিবরতন মিত্র	৪২৮
ভাই ফোঁটা	শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ	৪৮৫

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
ভাগবত ধর্ম্ম	সম্পাদক	১৭, ৮৫
	১৭১, ২২৯, ৩০১, ৩৮৬, ৪৪৩, ৫১৫, ৫৪৬, ৬২৪, ৬৬৮, ৭২৩	
ভাগ্যহীন (কবিতা)	শ্রীবিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী	৬৮০
ভারতে নারীর সন্মান	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার, এম্,এ,বি.এল	৬৭৪
মনীষা মন্দিরে	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মিত্র	২৭৭
মহালয়া	শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ, বি, এ,	৩৭৫
মা..ক সাহিত্য (আলোচনা ও সঙ্কলন)	সম্পাদক	১১২
শব্দব্রহ্ম	শ্রীদক্ষিনাচরণ কাব্যতীর্থ	৫৯৫, ৬৪৯, ৬৯৯,
শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাব	শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল	৪১৫
শিশু (কবিতা)	৺আজীজউস্ সোভন	৫১০
শ্রীমদ্ভাগবত গীতা	শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ	৫৩
শ্রীশ্রীকুন্তী দেবের স্তব	সম্পাদক	১৯৩, ২৬৫, ৩৬১, ৪০২, ৪৬৫. ৫২১, ৬৪১, ৬৮৯.
শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী (আলোচনা)		২০৯
শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব (প্রাচীন গ্রন্থ মহাত্মা শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর রচিত)		১৪১, ৩০৮, ৩৯৩, ৪৫৬, ৫৬১, ৬৩১ ৬৮১
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মঃ অ, প. রামানন্দ রায় মিলন		[illegible]
শ্রীদুর্গা	শ্রীরমেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী	৩৬২
শ্রী জন্মাষ্টমী	সম্পাদক	২৬৬
সুখ	শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত	৭৩০
সম্ভোগ (কবিতা)	শ্রীবিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী	৬২৩
স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	সম্পাদক	১৪১
স্মৃতি (গল্প)	শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী	২০৪
সাধক কবি চণ্ডীদাস	শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	৭১১
সাধু নিত্যানন্দ দাস		৫৮৫
সাধুর আত্মরক্ষা (গল্প)	শ্রীমতী রাধারাণী দেবী	১৩
স্বামী সচ্চিদানন্দ	সম্পাদক	৫০১
সানুনয় প্রার্থনা	স্বামী সচ্চিদানন্দ	৫০১
হিমালয় যাত্রা	পরিব্রাজক শুদ্ধানন্দ	৬৫
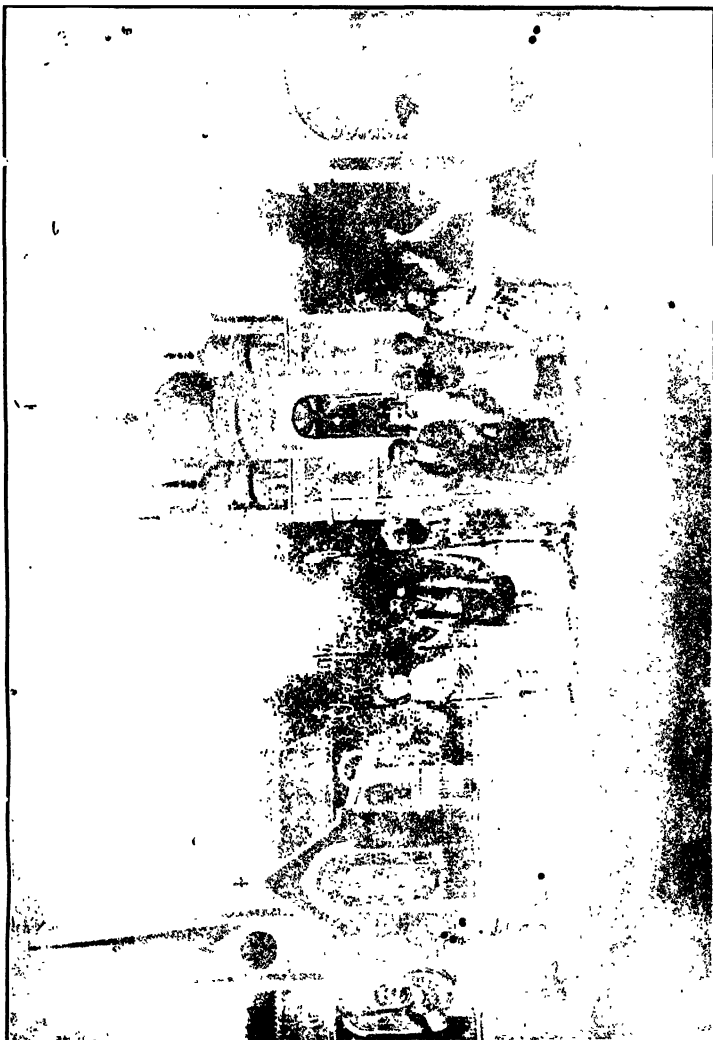
প্রথম বৌদ্ধ-মহা-সঙ্গীতি।

ভগবান বুদ্ধের মহানির্ব্বাণ লাভের পর সহস্রাধিক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্ম ভারতবর্ষে সজীবভাবে বিদ্যমান ছিল। এই সময়ের মধ্যে চারিটি বিভিন্ন উপলক্ষে বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ, সমবেত হইয়া ধর্ম্মের নিয়ম পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। এই অধিবেশনগুলি বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে মহাসঙ্গীতি নামে অভিহিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণ লাভের অনতিকাল পরে, রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। ইহার একশত বৎসর পরে বৈশালী নগরীতে দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তৃতীয় অধিবেশন রাজ চক্রবর্ত্তী অশোকের রাজ্যকালে পাটলিপুত্রে সংঘটিত হইয়াছিল। সর্ব্বশেষ অধিবেশনের সময়—মহারাজ কণিষ্কের রাজ্যকাল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রথম মহাসঙ্গীতির বিষয় আলোচনা করিব। বিনয়পিটকের অন্তর্গত চুল্লবগ্‌গে এই মহাসঙ্গীতির বিশদ বর্ণনা আছে। পালিভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকেরা 'Sacred Books of the East" বা ম্যাক্‌স্‌মুলার সম্পাদিত 'প্রাচ্য ধর্ম্ম গ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত রিস্ ডেভিডস্ ও ওলডেনবার্গ সম্পাদিত বিনয়পিটক পাঠ করিতে পারেন। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করিতে চাহেন তাঁহারা উক্ত ইংরাজী গ্রন্থের ভূমিকা, ওলডেনবর্গ সম্পাদিত মহাবগ্‌গের ভূমিকা, উইলহেলম্ গিগার কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাবংশের ভূমিকা রিস্ ডেভিডস্ কর্ত্তৃক অনুবাদিত "Buddhist Sutra" গ্রন্থের ভূমিকা, এবং ডাক্তার কার্ণ প্রণীত 'Manual of Indian Buddhism' পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

বর্ত্তমান বিষয়টি আমরা তিনভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিব।

প্রথম—প্রথম মহাসঙ্গীতির উদ্দেশ্য

দ্বিতীয়—অধিবেশনের কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

তৃতীয়—বৌদ্ধ গ্রন্থোক্ত এই ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ।

১। এই মহাসঙ্গীতির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি-মালা সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা। বুদ্ধদেব কোন গ্রন্থদ্বারা স্বীয় মত প্রচার করেন নাই তাঁহার সমস্ত উপদেশই মৌখিক। যখন যেরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া উপস্থিত শিষ্যবর্গের নিকট স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যেও অনেকেই তাঁহার অমূল্য ধর্ম্মনীতির সমুদয় অংশ জ্ঞাত ছিলেন না। ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কথিত ধর্ম্মমত ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাইতে পারে। তিনি কত সময়ে কত লোকের কাছে গল্পচ্ছলে কত অমূল্য কথা বলিয়া গিয়াছেন কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে। বর্ত্তমানকালে শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীযুক্ত সারদানন্দ স্বামী প্রণীত লীলা প্রসঙ্গ এবং উদ্বোধন পত্রিকায় বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত 'ভগবান প্রসঙ্গ' প্রভৃতি যে অভাব দূর করিতেছে, ঠিক সেই অভাব দূর করিবার জন্যই বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ সমবেত হইয়াছিলেন। মৌখিক উপদেশ বেশি দিন থাকে না, যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধদেবের নিকট হইতে তাঁহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইহার অধিকাংশ লুপ্ত বা বিকৃত হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়াই, বুদ্ধ শিষ্যগণ একত্রে সমবেত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেন।

এতদ্ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যও যে ছিল না তাহা নহে। ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর পর মহাকাশ্যপ প্রভৃতি স্থবিরবর্গ দেখিলেন যে নেতার অভাবে বৌদ্ধসংঘের শাসন প্রণালী শিথিল হইবার সম্ভাবনা। এ সময়ে বৌদ্ধসংঘকে দৃঢ় নিয়মবন্ধনে আবদ্ধ না করিলে শীঘ্রই তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিবে। এই আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক নহে মহাকাশ্যপ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইয়াছিলেন, মহাকাশ্যপ সশিষ্য কুশিনারায় আসিতেছিলেন এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন যে সপ্তাহ পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধের দেহত্যাগ হইয়াছে। বলা বাহুল্য সে সংবাদ শুনিয়া সকলেই শোকব্যথিত হইলেন, কিন্তু তন্মধ্যে সুভদ্রনামে একজন বলিয়া উঠিল "ভিক্ষুগণ তোমরা কেন শোক

করিতেছ ; তথাগতের মৃত্যুতে আমরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলাম। এতদিন তাহার শাসনানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিতে হইয়াছে, এখন হইতে আমরা যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারিব।"

২। বেহার প্রদেশের অন্তর্গত বর্ত্তমান রাজগির নামক স্থানে মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ বর্ত্তমান ছিল। বৌদ্ধ ইতিহাসে এই রাজগৃহ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ভগবান বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমে এইখানে আগমন করেন এবং অলারকালাম ও উদ্রকের নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করেন। পরে সিদ্ধিলাভ করিয়া পুনরাগমন করিলে রাজা বিম্বিসার সস্ত্রীক তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, এবং বেণুবন নামক সুরম্য উদ্যান তাঁহাকে প্রদান করেন। বিখ্যাত অনাথপিণ্ডিক রাজগৃহে বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষিত হন। শেষ জীবনে বুদ্ধদেব অনেক সময় রাজগৃহে বাস করিতেন।

এই রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। অজাতশত্রু তখন মগধের রাজা। প্রথম বয়সে বুদ্ধদেবের বিপক্ষাচরণ করিলেও অবশেষে তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই মহাসঙ্গীতির সমুদয় ব্যবস্থাভার গ্রহণ করিলেন। গুহাদ্বারে বিচিত্র মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল এবং পঞ্চশত বুদ্ধভক্ত তন্মধ্যে সম্মিলিত হইলেন। বৌদ্ধ-সংঘের নিয়মাবলী, বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র, ও বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিকতত্ত্ব, এই তিনটি বিভাগে সমুদয় বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচিত হইল। সভাপতি মহাকাশ্যপের আহ্বানে উপালি বৌদ্ধসংঘের নিয়মাবলী অর্থাৎ বৌদ্ধভিক্ষুগণকে যে যে নিয়ম পালন করিতে হইবে তাহা, তিনি যতদূর জানিতেন বিবৃত করিলেন। প্রথমে 'প্রাতিমোক্ষের' অন্তর্গত নিয়মাবলীর কথা উঠিল। তাহার প্রত্যেক নিয়ম বা অনুশাসনটি, বুদ্ধদেব, কোন্ স্থলে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রথমে প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন, এবং তৎসম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় যথাযথ বলিয়া গেলেন ; সমবেত ভিক্ষুগণ তাঁহার কথা অনুমোদন বা সংশোধন করিলেন, তদতিরিক্ত কিছু জানা থাকিলে তাহাও নিবেদন করিলেন। এইরূপে একটির পর একটি সমুদয় নিয়মাবলী স্থিরীকৃত ও লিপিবদ্ধ হইল।

সংঘ নিয়মাবলী এইরূপে স্থিরীকৃত হইলে, যথাক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র ও দার্শনিক তত্ত্ব, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে স্থিরীকৃত হইল। উপালির পরিবর্ত্তে আনন্দ ও কাশ্যপ এই দুই বিষয়ের প্রধান বক্তা হইলেন।

সভাশেষে আনন্দ উপস্থিত ভিক্ষুবর্গকে বলিলেন যে বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণ

সময়ে, ভিক্ষু ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড প্রদান করিতে বলিয়া গিয়াছেন। সভাতে স্থিরীকৃত হইল যে তথাগতের আদেশানুযায়ী কার্য্য করা হউক। তদনুসারে ভিক্ষুছন্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ডের ব্যবস্থা হইল।

মহাসঙ্গীতির যে বিশদ বিবরণ বৌদ্ধসাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে প্রাচীন ভারতবর্ষে সভাসমিতির অধিবেশন প্রণালী অতিশয় সুসংস্কৃত ও সুসভ্য ছিল। প্রত্যেকটি মন্তব্য (Resolution) সভাপতি যথারীতি সভার সম্মুখে নিবেদন করিতেন এবং উপস্থিত সদস্যগণের মত লইয়া কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতেন। প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশনকালে, সভাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার উপর বিনয় অর্থাৎ সংঘের নিয়মাবলী, বিবৃত করিবার ভার দেওয়া যায়—সভাস্থলে উপালির নাম উচ্চারিত হইল। সভাপতি আনন্দের নাম করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইল না—উপালিই 'বিনয়' বিবৃত করিলেন, আজকাল যেমন Select Committee, অর্থাৎ কয়েকটি মাত্র নির্ব্বাচিত সভ্য দ্বারা কোন বিষয়ের Draft Resolution বা খসরা মন্তব্য প্রস্তুত হইয়া পরে মূল সভাকর্ত্তৃক তাহা পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। উপালি Select Committeeর কার্য্য করিলেন।

নিজের মতের বিরুদ্ধ হইলেও সভাকর্ত্তৃক গৃহীত মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তখন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত ছিল। সভাতে মন্তব্য হইল যে স্ত্রীজাতিকে সংঘে প্রবেশ করিবার অধিকার দানের নিমিত্ত আনন্দ যে ভগবান বুদ্ধকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার পাপ হইয়াছে, আনন্দ তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আনন্দ উত্তর করিলেন যে মহাপ্রজাবতী গৌতমী ভগবানের মাতৃস্বরূপা, কারণ তিনিই স্তন্যদানে তাঁহাকে পালন করিয়াছেন। তাঁহার জন্য ভগবানের নিকট অনুরোধ করায় তিনি কোন পাপ করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন না। তথাপি উপস্থিত সদস্যগণের প্রতি সম্মানবশতঃ তিনি তাহা পাপকার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

৩। উপরে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ অনুযায়ী প্রথম মহাসঙ্গীতির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য কি অতঃপর তাহাই নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইব। ডাক্তার ওলডেনবার্গ বলেন যে এ সমুদয়ই অলীক উপাখ্যান মাত্র—পরবর্ত্তীকালের কল্পনার সৃষ্টি। তিনি বলেন যে 'চুল্লবগ্গে

বর্ণিত হইয়াছে যে বুদ্ধদেবের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সুভদ্র নামক জনৈক ভিক্ষু 'এখন হইতে আমরা যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারিব' ইত্যাদিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করে। তদুত্তরে কাশ্যপ প্রস্তাব করেন যে অবিলম্বে রাজগৃহে একটি ভিক্ষুসভার অধিবেশন হউক এবং তদনুসারেই প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এখন মহাপরিনিব্বানসুত্ত (ইহা চুল্লবগ্গের পূর্ব্বে লিখিত) নামক গ্রন্থেও সুভদ্রের কথা বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু তদুত্তরে কাশ্যপ যে ভিক্ষুসভার অধিবেশন প্রস্তাব করেন এরূপ কোন কথা তাহাতে নাই। যখন অন্যান্য ঘটনা উভয়গ্রন্থে একরূপ কেবল প্রাচীনতর গ্রন্থখানিতে মহাসঙ্গীতির অধিবেশনের কথা কিছুই নাই, তখন সহজেই অনুমিত হয়, যে মহাপরিনিব্বাণসুত্তের গ্রন্থকার উক্ত মহাসঙ্গীতির বিষয় কিছুই জানিতেন না, উহা পরবর্ত্তীকালের সৃষ্টি মাত্র। *

আমাদের বিবেচনায় ওলডেনবার্গ যে যুক্তির সাহায্যে স্বীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুমোদিত নহে। সমুদয় বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলেই তাহার ভ্রম বুঝিতে পারা যাইবে।

মহাপরিনিব্বাণসুত্ত বুদ্ধদেবের মৃত্যুবিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে তাঁহার মৃত্যু-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুবর্ণন ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও তৎপরবর্ত্তী আনুষঙ্গিক দুই একটি ঘটনাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেমন বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর কাশ্যপের আগমন, তৎপরে শবদাহ,

---

* What we have here before us is not history, but pure invention, and moreover, an invention of no very ancient date. We can prove it by comparing another text which is older than the story and the author of which cannot yet have known it.

This (Maha Parinibbana Sutta) gives the story of the irreverent conduct of Subhadda which Kassapa opposes by briefly pointing to the true consolation that should support the disciples in their separation from the master. . . . . .

There is not the slightest trace of any such allusion to the council. This silence is as valuable as the most direct testimony. It shows that the author of the Mahaparinibbana Sutta did not know anything of the first council.

ও সমাগত প্রার্থীদিগের মধ্যে ভস্মরাশি বিতরণ ইত্যাদি। কথিত আছে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের সময় কাশ্যপ অনুপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ভিক্ষুগণ পবিত্র দেহ চিতার উপর সজ্জিত করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন অনিরুদ্ধ তাঁহাদিগকে বলিলেন যে কাশ্যপ না আসা পর্য্যন্ত কিছুতেই অগ্নি সংযুক্ত হইবে না। পরে কাশ্যপ আগমন করিলে আপনা হইতেই চিতায় আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে কাশ্যপের আগমন বুদ্ধদেবের মৃত্যুর আনুসঙ্গিক ঘটনা এই জন্যই মহাপরিনিব্বাণসুত্তে বিশদভাবে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভস্মরাশি বিতরণ প্রভৃতি অন্য যে সমুদয় ঘটনা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাও বুদ্ধদেবের মৃত্যুকাহিনীর সহিত সংসৃষ্ট, তাহা বাদ দিলে বুদ্ধদেবের মৃত্যুকাহিনী সম্পূর্ণ হয় না সুতরাং তাহাও মহাপরিনিব্বাণসুত্তে স্থান পাইয়াছে। এইরূপ দেখা যায় যে বুদ্ধদেবের মৃত্যুসম্পর্কিত ব্যতীত অন্য কোন ঘটনাই মহাপরিনিব্বাণসুত্তে স্থান পায় নাই।

প্রথম মহাসঙ্গীতি, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অনতিকাল পরে সংঘটিত হইয়া থাকিলেও, তাহা উক্ত ঘটনার সহিত এরূপ সংসৃষ্ট নহে যে ইহার উল্লেখ ব্যতিরেকে বুদ্ধদেবের মৃত্যুকাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং মহাপরিনিব্বাণসুত্তের গ্রন্থকার যদি প্রথম মহাসঙ্গীতির উল্লেখ না করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে এমন বুঝা যায় না যে তিনি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

তর্ক উঠিতে পারে যে সুভদ্রের অসংযত আচরণই যখন প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশনের মুখ্য কারণ, এবং প্রথম মহাসঙ্গীতি বৌদ্ধ ইতিহাসে এতাদৃশ গুরুতর ঘটনা, তখন সুভদ্রের আচরণের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে মহাসঙ্গীতির বিষয়ও অন্ততঃ সামান্য একটু উল্লেখ আমরা আশা করিতে পারি! এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে সুভদ্রের আচরণই মহাসঙ্গীতির মুখ্য কারণ নহে। ওলডেনবার্গ অবশ্য বলেন যে 'সুভদ্র উল্লিখিত অসংযত বাক্য উচ্চারণ করিলে তদুত্তরে কাশ্যপ মহাসঙ্গীতির প্রস্তাব করেন।' * কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই খানেই ওলডেনবার্গ বিষম

* In opposition to Subhadda there came forward the great Kassapa who proposed that 500 of the most eminent members of the community should assemble at Rajagriha. Introduction to Mahavagga.

ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, এবং এই ভ্রম হইতেই প্রথম মহাসঙ্গীতি বিষয়ে তাঁহার ভ্রমাত্মক মতবাদের উৎপত্তি। তাঁহার মতটি সংক্ষেপে এই—'সুভদ্রের অসংযত উক্তির উত্তরস্বরূপ কাশ্যপ প্রস্তাব করেন যে রাজগৃহে ভিক্ষুগণের একটি অধিবেশন হউক তদনুসারে প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইল। সুভদ্রের আচরণের ফলে এইরূপ গুরুতর একটি কার্য্য সম্পন্ন হইল। মহাপরিনিব্বাণসুত্তে সুভদ্রের অসংযত আচরণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু তদুত্তরে কাশ্যপ যে মহাসঙ্গীতি অধিবেশনের প্রস্তাব করেন বলিয়া চুল্লবগ্গে প্রকাশ, তাহার কোন উল্লেখই নাই। সুতরাং মহাপরিনির্ব্বাণসূত্তের গ্রন্থকার কাশ্যপের উক্ত প্রস্তাব বা তদনুযায়ী কোন কার্য্যের কথা কিছুই জানিতেন না।

কিন্তু চুল্লবগ্গে এমন কোন কথা নাই যাহাতে বুঝা যায়, যে সুভদ্রের অসংযত বাক্যের প্রত্যুত্তর স্বরূপ কাশ্যপ মহাসঙ্গীতির প্রস্তাব করেন। চুল্লবগ্গে যে স্থলে প্রথম মহাসঙ্গীতির বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহার প্রথমে, তদুপলক্ষে কাশ্যপ যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা তাহার সারাংশ অনুবাদ করিলাম।

"একদা পাবা হইতে কুশীনারা আসিতে পথিমধ্যে বিশ্রাম করিতেছি এমন সময়ে সংবাদ পাইলাম যে, তথাগত পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া সকলেই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল, কিন্তু সুভদ্র নামে ভিক্ষু বলিতে লাগিল "ভিক্ষুগণ তোমরা কেন শোক করিতেছ; তথাগতের মৃত্যুতে আমরা প্রকৃত-পক্ষে স্বাধীন হইলাম! এতদিন তাঁহার শাসনানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিতে হইয়াছে, এখন হইতে আমরা যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারিব।" ভিক্ষুগণ যদি এখন হইতে আমরা সাবধান না হই তবে 'সুভদ্রের' সংখ্যা ক্রমশই বাড়িবে, সুতরাং আইস আমরা সকলে সমবেত হইয়া সংঘকে দৃঢ় নিয়মবন্ধনে বদ্ধ করি।"

ইহাতে এমন কিছু বুঝা যায় কি যে সুভদ্রের প্রত্যুত্তরস্বরূপ কাশ্যপ মহাসঙ্গীতির প্রস্তাব করেন? "একদা" এই কথাটী হইতেই বুঝা যায় যে সুভদ্রের উক্ত আচরণের বহুপরে কাশ্যপ মহাসঙ্গীতির প্রস্তাব করেন, এবং সুভদ্রের আচরণ দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এক্ষণে মহাপরিনিব্বাণসুত্ত হইতে উক্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। "সশিষ্য কাশ্যপ পাবা হইতে কুশীনারা আসিতে পথিমধ্যে বিশ্রাম করিয়া-

ছেন এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন যে তথাগত পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া সকলেই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল কিন্তু সুভদ্র নামে জনৈক ভিক্ষু বলিতে লাগিল "ভিক্ষুগণ তোমরা কেন শোক করিতেছ ইত্যাদি..." কাশ্যপ সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন যে ভিক্ষুগণ, তোমাদের শোক করা অনুচিত, কারণ ভগবান তো বলিয়াই গিয়াছেন যে প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী"

ওলডেনবার্গ ও রিস্ ডেভিড্‌সের মতে এই উভয় বর্ণনায় বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একটিতে সুভদ্রের কথার উত্তরে কাশ্যপ মহাসঙ্গীতির প্রস্তাব করেন বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু অপরটিতে লিখিত হইয়াছে যে সুভদ্রের কথার উত্তরে কাশ্যপ কেবলমাত্র তাহাকে প্রকৃত সান্ত্বনার উপায় নির্দ্দেশ করেন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে এই মতের প্রথমাংশ ভুল অর্থাৎ সুভদ্রের কথার উত্তরেই যে কাশ্যপ মহাসঙ্গীতির প্রস্তাব করেন চুল্লবগ্‌গে এরূপ লিখিত হয় নাই। উদ্ধৃত পদটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই সহজে প্রতীতি হইবে যে এই মতটির দ্বিতীয় অংশও ভুল। কাশ্যপ সে প্রকৃত সান্ত্বনার পথ নির্দ্দেশ করেন তাহা সুভদ্রের কথার উত্তরে নহে—বস্তুতঃ তাহা সুভদ্রের কথার উত্তর হইতেই পারে না—যাহারা শোকবিহ্বল হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়াই কাশ্যপ ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

প্রকৃত পক্ষে উভয় বর্ণনায় কোন বৈষম্য নাই। মহাপরিনিব্বাণসুত্ত বুদ্ধদেবের মৃত্যু-সম্বন্ধীয় পুস্তক সুতরাং তাহাতে বুদ্ধদেবের মৃত্যু ও তদানুসঙ্গিক ঘটনার সন্নিবেশ হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাশ্যপের কুশীনগরে আগমন বুদ্ধদেবের মৃত্যুকাহিনীর সহিত বিশেষভাবে বিজড়িত সুতরাং মহাপরিনিব্বাণসুত্তের গ্রন্থকার তদ্বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েকমাস পরে কাশ্যপ যখন প্রথম মহাসঙ্গীতির প্রস্তাব করেন তখন সুভদ্রের আচরণের কথা বলিয়াছিলেন এই জন্য সুভদ্রের আচরণ বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত ছিল—সুতরাং মহাপরিনিব্বাণসুত্তের গ্রন্থকার বর্ণনামধ্যে তাহাও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যদি সুভদ্রের কথার উত্তরেই কাশ্যপ তন্মুহূর্ত্তে মহাসঙ্গীতির প্রস্তাব করিতেন—ওলডেনবার্গ প্রভৃতি যেরূপ বলেন—তাহা হইলে সম্ভবতঃ মহাপরিনিব্বাণসুত্তে এই উপলক্ষে তাহার কোন উল্লেখ করা হইত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই এই ঘটনার অন্ততঃ ২।৩ মাস পরে যখন

কাশ্যপ মহাসঙ্গীতির প্রস্তাব করেন তখনই তিনি সুভদ্রের আচরণ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। সুতরাং মহাপরিনির্ব্বাণসূত্তে যে তাহার উল্লেখ নাই ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ডাক্তার ওলডেনবার্গ ও রিসডেভিড্স্ * উভয় বর্ণনায় বৈষম্য দেখিয়া প্রথম মহাসঙ্গীতির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, আমরা দেখাইয়াছি যে বাস্তবিক এরূপ কোন বৈষম্য নাই। সুতরাং প্রথম মহাসঙ্গীতি যে একটি বাস্তব ঘটনা তাহা স্বীকার করিতে অতঃপর আর কোন বাধা নাই।

প্রাচীন পালি সাহিত্যে অনেক গ্রন্থে প্রথম মহাসঙ্গীতির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চুল্লবগ্গ ব্যতীত, মহাবস্তু, দুল্‌বা বা তিব্বতদেশীয় বিনয়-পিটক্, সর্ব্বাস্তিবাদিন সম্প্রদায়ের বিনয়পিটক, সমস্ত পাসাদিকা, সুমঙ্গল বিলাসিনী, দীপবংশ, মহাবংশ, ফাহিয়ান ও হুয়েনসাংএর ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। ডাক্তার কার্ন বলেন যে আমরা এটুকু স্বীকার করিতে বাধ্য, যে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি সকলেই এক-বাক্যে রাজগৃহে প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশন কাহিনী সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। †

প্রথম মহাসঙ্গীতির বিষয়ে যেরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাদৃশ প্রাচীন ঘটনার সম্বন্ধে ইহাঅপেক্ষা অধিক প্রমাণের আশা করা যায় না—সুতরাং আমরা ইহাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

* The conclusion that Hermann Oldenberg draws is at least the easiest and readiest way of explaining the very real discrepancy that he has pointed out.—Rhys Davids.

† We are in good conscience bound to acknowledge that the only really historical fact is this that the Council of the Sthaviras at Rajagriha is recognised by all Buddhists. Kern Mannal of Indian Buddhism. P. 103.

পারিজাত।

(গল্প)

এক ছিলেন ব্রাহ্মণ। তিনি খুব ধনী ও ভাগ্যবান। তাঁর ছেলেদের সব বয়স হয়েচে, তাঁরা সব বিদেশে চাকরী করেন। কেউ কোনো রাজার সভা পণ্ডিত, কেউ মন্ত্রী, কেউ অধ্যাপক। ব্রাহ্মণ বাড়ীতেই থাকেন, বিষয় আশয় দেখেন।

একদিন সেই ব্রাহ্মণ বাজার কর্ত্তে গেছেন। তিনি অবশ্য বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বাজারে মাছ কিন্‌চেন। হঠাৎ দেখেন সেই মেছুনীর মাছের টোকার মধ্যে এক শালগ্রাম শিলা রয়েচেন। ব্রাহ্মন দেখ্‌লেন শিলাচক্রটি বেশ সুলক্ষণ-সম্পন্ন। ব্রাহ্মণের মনে বড় দুঃখ হলো। তিনি মেছুনিকে বল্লেন "মা তোমার এই পাথরটি আমায় দাও।"

মেছুনি বল্লে "বাঃ আমার ওটি পয়মন্ত বাটখারা, তোমায় ওটী দেব কেন?

ব্রাহ্মণ অনেক অনুনয় বিনয় কল্লেন, শেষে তাকে অনেক টাকা দিয়ে শালগ্রামটী নিলেন।

শালগ্রাম বাড়ী এনে ব্রাহ্মণ তাঁর যথারীতি অভিষেক কল্লেন, তাঁর জন্যে সোণার সিংহাসন এল, পূজার সব ভাল ভাল সাজ এল, ব্রাহ্মণ বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরের পূজা কর্ত্তে লাগ্‌লেন।

ব্রাহ্মণ দিনে ঠাকুরের পূজা করেন, আর রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে সেই ঠাকুর এসে তাঁকে বল্‌চেন "দেখ্ বামুন তুই আমাকে সেই মেছুনির কাছে রেখে আয়, তা নৈলে তোকে নির্ব্বংশ কর্ব্ব।"

একদিন যায়, দুদিন যায়, তিনদিন যায়, ব্রাহ্মণ রোজই এইরকম স্বপ্ন দেখেন। শেষে তিনি পাড়ার সব ভাল ভাল লোকদের এই স্বপ্নের কথা জানালেন, তাঁরা সকলেই বল্লেন "ও অলক্ষুণে ঠাকুর এক্ষুনি মেছুনির কাছে দিয়ে এস; ও ঠাকুর ঘরে রেখোনা, রাখ্‌লে তোমার মঙ্গল হবে না।"

ব্রাহ্মণের কিন্তু এ কথা ভাল লাগ্‌লো না। তাঁর কেমন এই কদিনের মধ্যে ঠাকুরের উপর একটা ভালবাসা জন্মে গেছে! পূজার সময় কেমন প্রাণে একটা বিমল আনন্দের উদয় হয়, বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তাঁর মনে হয় এ ঠাকুর ছাড়া হবে না। রোজ কিন্তু সেই একই রকমের স্বপ্ন দেখেন আর পাড়ার বৃদ্ধ লোকেরা রোজই বলে "এ ঠাকুর রেখোনা, মেছুনিকে দিয়ে এস।"

শেষে ব্রাহ্মণ কিছু বুঝ্‌তে না পেরে তাঁর বড় ছেলেকে এক পত্র লিখ্‌লেন। সব কথা লিখ্‌লেন, স্বপ্নের কথা, পাড়ার লোকের কথা সব লিখ্‌লেন, আর লিখ্‌লেন যে আমার কিন্তু ঠাকুর ফেরত দিতে ইচ্ছা নাই, আমার মনে দিন দিন খুব আনন্দ হচ্চে।

ব্রাহ্মণের বড় ছেলে খুব জ্ঞানী লোক। তিনি পত্র পেয়ে বাপকে লিখ্‌লেন যে আপনি যখন ঠাকুরকে আশ্রয় করেচেন, আর আশ্রয় করে' আনন্দ পাচ্চেন তখন আরও নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করুন, ঠাকুর ছাড়্‌বেন না।

ব্রাহ্মণও তাই চান। তিনি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা কর্ত্তে লাগ্‌লেন। প্রথমে একঘণ্টা পূজা কর্ত্তেন, শেষে দুই প্রহর কাল একমনে পূজা করেন, একেবারে তন্ময় হয়ে স্তব পাঠ কর্ত্তে কর্ত্তে চোখের জলে বুক ভেসে যায়। সেই স্বপ্ন কিন্তু রোজই দেখেন, সেজন্য আর ব্রাহ্মণের বড় একটা চিন্তা হয় না।

শেষে স্বপ্নই যেন সফল হ'তে লাগ্‌লো। ব্রাহ্মণের একটি নাতি, বড় ছেলের বড়ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল। কথাটি যদিও সত্য নয় তবু লোকে বলে "সবংশে বিনাশ যার, তার আগে মরে নাতি।"

পাড়ার লোক সব বলে "দেখ্‌লে আমাদের কথা শুন্‌লে না। এইবার দেখ, স্বপ্ন ফলে' গেল। আমি জানি অপয়া' ঠাকুর, ও ঠাকুর কি ঘরে আনে?"

ব্রাহ্মণ তাঁর বড় ছেলেকে পত্র দিলেন। তাঁর বড় ছেলে খুব জ্ঞানী লোক, তিনি লিখ্‌লেন—আপনি কেন ভাব্‌চেন? জীব সব কর্ম্মের বশ। আপন আপন কর্ম্মভোগ কর্ব্বার জন্যে সবাই দুদণ্ডের জন্য সংসারের পান্থশালায় আসে। তার পর যার যখন সময় হয় সে তখন যায়, এজন্য আপনি বিচলিত হন কেন? আপনি ধার্ম্মিক লোক, যে ঠাকুরকে ধরে'চেন, সেই ঠাকুরকেই আশ্রয় করে' থাকুন।"

ব্রাহ্মণ আরও নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা কর্ত্তে থাকেন। ক্রমে "একে একে, নিভিছে দেউটী।" ব্রাহ্মণের পরিবারে কালপুরুষের গতিবিধি বড় ঘন ঘন হ'তে লাগ্‌লো। আর একটি নাতি, আর একটি নাত্‌নি। তার পর ছেলে মেয়ে সব একে একে দপ্‌ দপ্‌ করে মারা যেতে লাগ্‌লো। শেষে ব্রাহ্মণের বৃদ্ধ কালের সঙ্গিনী, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীটি পর্য্যন্ত, হাতের নোয়া, মাথার সিঁদুর নিয়ে স্বামীর পায়ে মাথা রেখে চিরকালের মত চক্ষু মুদ্‌লেন। এখন সেই ঠাকুর ছাড়া ব্রাহ্মণের আর পৃথিবীতে কেউ নাই।

ব্রাহ্মণ ভাব্‌লেন ব্যাপার বড় মন্দ নয়। ঠাকুরকে বল্লেন, "ঠাকুর হ'লো

বড় মন্দ নয়। এখন তুমি আর আমি, আর কেউ নাই। তবে আর এ বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কি হ'বে ?"

এই বলে ব্রাহ্মণ পাড়ার সব গরীব দুঃখীদের ডাকলেন, বিষয় সম্পত্তি তাদের সব ভাগ করে' দিলেন। বাড়ী ঘর সব বিলিয়ে দিলেন। এক ঝুলি কল্লেন, ঝুলি না করে, ঠাকুরকে সেই ঝুলিতে নিয়ে ব্রাহ্মণ বাড়ী থেকে বেরুলেন, ইচ্ছা, যে কদিন থাকি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব।

ব্রাহ্মণ দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরছেন। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, কুরক্ষেত্র, হরিদ্বার, ঘুরে বেড়াচ্চেন। পথে কোন কষ্ট নাই। গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হলে, তারা নিমন্ত্রণ করে, আর ব্রাহ্মণ সেইখানে স্নান করে, ঠাকুরের পূজা করেন, তার পর ঠাকুরের ভোগ দিয়ে প্রসাদ পান। এমনি করে' দিন কেটে যায়, কেবল তিনি আর ঠাকুর, দুনিয়ায় আর কিছু নাই।

ক্রমে ব্রাহ্মণ এসে মানস সরোবরে উপস্থিত হলেন। মানস-সরোবরের তীরে বসে তিনি নারায়নের পূজা কচ্চেন। ব্রাহ্মণের এখন দিব্য চেহারা হয়েচে। শরীর হতে একটা শান্ত জ্যোতি যেন ফুটে বেরুচ্চে, মুখে চোখে একটা পবিত্র প্রসন্নতা, মাথায় বড় বড় চুল জটা বেঁধে গেছে—মুখে বিশাল শ্মশ্রু।

ব্রাহ্মণ মানস-সরোবরের তীরে পূজা কর্চ্চেন আর তিন জন অপ্সরা, যেমন এসে থাকে তেমনি মানস সরোবরে স্নান কর্ত্তে এসেচে। স্নান কর্ত্তে কর্ত্তে ভক্তি হলো, তারা বলাবলি করলে "দেখ এই ব্রাহ্মণ একজন খুব বড় সাধু, তা, আমাদের এখনও মন্ত্র নেওয়া হয়নি। মন্ত্র না নিলে সাধন ভজন হয় না—তা' এতদিন গুরু পাওয়া যায়নি, এইবার মনের মত গুরু পাওয়া গেছে, চল আমরা ব্রাহ্মণের নিকট মন্ত্র নিইগে।"

এই পরামর্শ করে তারা ব্রাহ্মণের কাছে এসে তাঁকে প্রণাম কল্লে ও মনের কথা সব বল্লে। ব্রাহ্মণ প্রথমে কিছুতে রাজী হবেন না, কত রকম আপত্তি কল্লেন বল্লেন দেখ আমি নিজে সাঁতার জানিনে, সংসার পাথারে হাবু ডুবু খাচ্চি, আবার তোমরা আমার পায়ে ধরো, সব্বাই মিলে ডুবে মরি। যে নিজে অন্ধ সে আবার অন্যেকে পথ দেখাবে কেমন করে ?"

অপ্সরারা কিন্তু কিছুতেই ছাড়বে না, তারা অনুনয় বিনয় করে, শেষে পায়ে ধরেই কাঁদতে লাগলো। কি করেন, নিরূপায় হয়ে ব্রাহ্মণ তাদের দীক্ষা দিলেন। অপ্সরারা মন্ত্র নিয়ে গুরুকে প্রণাম করে, বল্লে "কিছু গুরু দক্ষিণা

দিতে হয়, তা আপনি সন্ন্যাসী আপনাকে আর কি দেব ?" এই বলে তারা একটি পারিজাত ফুল ব্রাহ্মণকে গুরুদক্ষিণা দিলে। শেষে গুরুর পায়ে ধরে' বলে গেল "প্রভু যখন আপনার দরকার হবে, তখনি আপনি স্মরণ কর্ব্বেন স্মরণ করা মাত্র আমরা আসব। গুরুর সেবার থেকে মানবজীবনে আর বড় কার্য্য কিছু নাই—দয়া করে' ভুলবেন না। এই বলে' পায়ের ধুলো নিয়ে তারা চলে' গেল।

ব্রাহ্মণ পারিজাত ফুলটি দেখলেন। স্বর্গের ফুল, পৃথিবীর মানুষ এত সুন্দর জিনিস কখনও দেখেনি। ব্রাহ্মণ ফুলটি নিয়ে ভাবলেন, এই পারিজাত ফুল রাজার ভোগ্য। আমি একে ব্রাহ্মণ তাতে সন্ন্যাসী এতে আমার কোনো অধিকার নেই। এই ভেবে ব্রাহ্মণ সেখান থেকে ফুল হাতে করে' উঠলেন, একজন লোককে জিজ্ঞাসা কল্লেন এ দেশের রাজা কে, আর তাঁর রাজধানী কোথায়। সে লোকটি বলে' দিলে বেশী দূর নয়, কাছেই রাজার বাড়ী।

ব্রাহ্মণ ফুলটি নিয়ে রাজার বাড়ী গেলেন। রাজাকে অভিবাদন করে, আশীর্ব্বাদ কল্লেন, রাজা প্রণাম করে' পাদ্য অর্ঘ্য দিলেন, সিংহাসনে বসালেন নিজে জোর হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে পারিজাত ফুলটি দিয়ে চলে এলেন, সন্ন্যাসী মানুষ, রাজা রাজড়ার কাছে বেশীক্ষণ থাকতে নেই।

রাজা দেখলেন চমৎকার ফুল, এমন ফুল কেউ কখন দেখেনি। রাজা ফুল হাতে করে' অন্তঃপুরে গেলেন। রাজার দুই রাণী—দুই রাণী হলেযা হয়, রাজার সংসারেও তাই, একটি রাণী সুয়ো, আর একটি রাণী দুয়ো। রাজা সুয়ো রাণী বা ছোট রাণীকে ফুলটি দিলেন, তাঁর আর আহ্লাদের সীমা নেই, তিনি ফুলটি নিয়ে সকলকে দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

এ দিকে বড় রাণী রাগে গরগর কর্ত্তে লাগলেন। আর থাকতে পারলেন না, অভিমান করে' রাজাকে বলে' পাঠালেন, ঠিক ঐ রকম একটি ফুল চাই. যদি এনে দিতে পারেন ভাল নৈলে কেউ আটকাতে পার্ব্বে না, গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব্বো, মর্ব্বো, মর্ব্বো।"

রাজাতো ভেবে' আকুল। লোক পাঠিয়ে পায়ে ধরে' সেই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে সভায় ডাকিয়ে আনলেন। প্রণাম করে' তাঁকে সব কথা বল্লেন। ব্রাহ্মণ শুনে' বড় ভাবনায় পড়লেন। যাই হোক্ বড় রাণীকে ডেকে তিনি বুঝিয়ে বল্লেন "আমি ফুলের চেষ্টায় যাচ্চি। পেলেই আপনাকে এনে দেব, আপনি একটু ধৈর্য্য ধরুন।

ব্রাহ্মণ মানস-সরবরের তীরে এলেন তাঁর শিষ্যানীদের স্মরণ কল্‌লেন, তাঁরা এলেন। ব্রাহ্মণ বল্‌লেন, "দেখ আর একটি পারিজাত ফুল চাই, তা নৈলে আমাকে স্ত্রীহত্যার দায়ী হ'তে হবে।

অপ্সরারা গুরুদেবের কাছে সব কথা শুন্‌লেন, শুনে বল্‌লেন "প্রভু, বড্ড কঠিন কথা বল্লেন, আমাদের তো পারিজাত ফুলে কোন অধিকার নেই, ইন্দ্ররাজা আমাদের উপর খুসী হয়ে একদিন একটি ফুল দিয়েছিলেন সেইটি আপনাকে দিয়েচি। আর তো পারিজাত দেবার আমাদের অধিকার নেই।"

ব্রাহ্মণ দুর্ভাবনায় পড়্‌লেন, বলেন উপায়! আমাকে স্ত্রীহত্যার পাতকে পড়্‌তে হবে।

তখন অপ্সরারা একটু ভেবে বলে "দেখুন প্রভু, আপনি এক কাজ করুন আপনি স্বর্গে চলুন, আপনি একে ব্রাহ্মণ, তাতে সন্ন্যাসী, আপনি যদি গিয়ে ইন্দ্ররাজাকে বলেন, তা'হলে তিনি আপনাকে নিশ্চয় ফুল দেবেন।

ব্রাহ্মণ বলেন "আমি পৃথিবীর মানুষ, আমি কি করে স্বর্গে যাব ?"

অপ্সরারা বলে "সে জন্য আপনার ভাবনা নাই তার ব্যবস্থা আমরা কর্ব্ব।"

ব্রাহ্মণ স্বর্গে গেলেন, মন্দাকিনী নদী, নন্দন কানন, দেবতাদের সব রথ, দেবকন্যারা নেচে গেয়ে ফুল তুলে বেড়াচ্চে। ক্রমে ব্রাহ্মণ ইন্দ্ররাজের কাছে গেলেন। ইন্দ্ররাজ শচী সঙ্গে বসে আছেন—ব্রাহ্মণ তাঁদের বন্দনা কল্‌লেন। দেবরাজ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বল্‌লেন "আপনি কি অভিপ্রায়ে এসেচেন ?" ব্রাহ্মণ পারিজাত ফুল চাইলেন।

দেবরাজ দুঃখের সঙ্গে বল্‌লেন "দেখুন আপনি ব্রাহ্মণ, একটি পারিজাত ফুল চেয়েচেন, আমার দেওয়াতো উচিত। কিন্তু এখন পারিজাত ফুল দেবার আমার অধিকার নাই। আমি বৎসরে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ফুল পাই, তা এবার আমি আমার প্রাপ্য ফুলগুলি ব্যয় করে ফেলেচি, আমার আর ফুল দেবার অধিকার নাই আপনি আমাকে মাপ করুন।

ব্রাহ্মণ দেবরাজকে সব কথা বল্‌লেন, দেখুন পারিজাত না পেলে আমাকে স্ত্রী হত্যার পাতকে পড়্‌তে হবে, আপনি দেবরাজ, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরক্ষা করুন।

ইন্দ্র বল্লেন "দেখুন আপনি কৈলাস পর্ব্বতে যান, সেখানে দেবাদিদেব মহাদেব আছেন, তাঁর কাছে গেলে আপনার মনোরথ পূর্ণ হবে আপনি পারিজাত পাবেন।"

ব্রাহ্মণ বল্লেন "কৈলাস পর্ব্বতে আমি কি করে' যাব ?"

ইন্দ্র বল্লেন—"আপনি এখানে কি করে' এলেন ?"

ব্রাহ্মণ বল্লেন "আপনার তিনটি অপ্সরা আমার শিষ্যা, তারাই আমাকে এখানে এনেচে।"

ইন্দ্র বল্লেন "আচ্ছা আমি বলে' দিচ্চি, তারাই আপনাকে কৈলাসে নিয়ে যাবে।"

এই বলে ইন্দ্র অপ্সরাদের আদেশ দিলেন, "তোমাদের গুরুদেবকে কৈলাসে নিয়ে যাও, যদি কেউ আপত্তি করে, ব'লো ইন্দ্র রাজার হুকুম।

ব্রাহ্মণ কৈলাসে এলেন, হরপার্ব্বতীকে প্রণাম করে' সব কথা বল্লেন। মহাদেব বল্লেন "দেখ পারিজাত হয়ত আছে, নয়ত নাই, তুমি হয়ত পেতে পার, নয়ত পেতে পার না। আমার এত সব খেয়াল থাকে না। তুমি এক কাজ কর তুমি বৈকুণ্ঠে যাও, সেখানে নারায়ণ আছেন, তাঁর কাছে গেলে তোমার ইচ্ছা সফল হবে।"

ব্রাহ্মণ কাতরভাবে বল্লেন "বৈকুণ্ঠ তো কত তপস্যার ফলে মানুষ যায়, আমার কি সাধ্য আমি সেখানে যাই।"

মহাদেব অপ্সরাদের ডাক্‌লেন বল্লেন "দেখ তোমাদের গুরুদেবকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাও, যদি কেউ কিছু বলে' বলো মহাদেবের আজ্ঞা।"

বিরজা নদী পার হয়ে', নিঃশ্রেয়স কাননের মধ্য দিয়ে, সপ্তদ্বার অতিক্রম করে' ব্রাহ্মণ সশরীরে বৈকুণ্ঠে এলেন। নয়ন ভরে' লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন কল্লেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে' অনিমেষ নয়নে চেয়ে রইলেন, ব্রাহ্মণের মুখে কথা নাই।

নারায়ণ ব্রাহ্মণের পানে চেয়ে একটু হাস্‌লেন, বল্লেন "ওঃ তুমি এসেচ ? তোমার কথাই আমি ভাব্‌চি ? তুমি পারিজাত চাও।"

ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, মুখে কথা নাই।

নারায়ণ বল্লেন "তোমার জন্যে আমি পারিজাত, আগে হ'তে ঠিক করে' রেখেচি। এখান হতে' একটু উত্তরে যাও, গিয়ে একটি সোণার দ্বার দেখ্‌বে, সেই দ্বারে হাত দিলেই দ্বার খুলে যাবে। তা হলেই দেখ্‌বে তোমার জন্যে পারিজাত সাজানো আছে।

ব্রাহ্মণ যেই কথা শুনে উত্তর দিকে গেলেন। চিন্ময়পুরী, শোভার সীমা নাই। স্বর্ণদ্বারে হাত দিতেই দ্বার খুলে গেল, ব্রাহ্মণ এক অপূর্ব্ব পুরীর মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। যেমন পুরীর মধ্যে গেছেন আর অমনি

ব্রাহ্মণের সেই নাতিটি, যেটি সব প্রথম মারা গেছে—সে এসে ব্রাহ্মণের পায়ে প্রণাম কল্লে। তার দিব্য চিন্ময় উজ্জ্বল দেহ হয়েছে, সে প্রণাম করে'ই বল্লে, "দাদা ম'শায় এতদিন তুমি কোথা ছিলে, আমরা এখানে এসে তোমার জন্যে কত ভাব্‌চি, ঠাকুর রোজ আসেন, আর বলেন আর একটু বাকি তা'হলেই সে আস্‌বে।"

তারপর ব্রাহ্মণের পুত্রবধূরা সব ঘোমটা দিয়ে এসে প্রণাম কল্লেন, ছেলেরা এলেন, আর আর নাতি নাতনিরা এলেন, ব্রাহ্মণী এলেন, সবারই অক্ষয় অমর চিন্ময় উজ্জ্বল শরীর! ব্রাহ্মণ নিজের পানে চেয়ে দেখেন তাঁরও শরীর তাদের মত হয়ে' গেছে। ব্রাহ্মণ তো অবাক, কি বল্‌বেন বুঝতে পার্‌চেন না। ব্রাহ্মণী বল্লেন, জরা মৃত্যু রোগ শোক নাই, এইখানে আমাদের চিরকাল থাক্‌তে হবে।

বড়রাণী পারিজাত ফুল পেলেন কিনা সে খবর এখনও আসেনি, এলে পর জানান হবে।

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

অভয়া।

নয়নে তোমার ঝলিছে অনল আননে মুখর দীপ্তি;
বক্ষে দুলিছে অক্ষ-মালিকা, হৃদয়ে হরষ তৃপ্তি!
মঙ্গল করে দিতেছ অভয়, বাহুতে স্ফুরিছে শক্তি;
চরণে তোমার দলিয়া অশিব হৃদয়ে এনেছ ভক্তি!
রুদ্রাণী—তবু বিতরি কৃপা পাপীরে দিতেছ মুক্তি;
বিশ্ব-জননী বিশ্ব-পালিনী কি তব প্রেমের যুক্তি!
দেহ গো দীক্ষা জননি, আজি তোমারি অভয় মন্ত্রে;
বাজিয়া উঠিবে স্পন্দন নব লক্ষ হৃদয়-যন্ত্রে!

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

ভাগবত ধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে মুখ্যরূপে ভগবানের লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছাই সকল কার্য্যের মূল কারণ, বিশ্বের সমস্ত ব্যাপারের মধ্য দিয়া সেই মহীয়সী ইচ্ছা সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এই টুকু ধরিয়া লইয়া সেই ইচ্ছার স্বরূপ কি তাহা হৃদয়ের দ্বারা মানবকে উপলব্ধি করানই এই মহাগ্রন্থের উদ্দেশ্য।

আমরা কিন্তু বিশ্বে ভগবানের ইচ্ছার প্রকাশ দেখিতে পাই না, মুখে প্রায়ই বলিয়া থাকি ভগবানের ইচ্ছায় এই সমস্ত কার্য্য হইতেছে, কিন্তু বিশ্বব্যাপারে মানুষের কর্ত্তৃত্ব বা জড়শক্তির কার্য্য দর্শন করাই আমাদের সাধারণ অধিকার, এই অধিকারের ভূমি হইতে আমাদিগকে ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে এবং শ্রীভগবানের লীলাশক্তির দ্বারা বিশ্বব্যাপার কিরূপে নিয়মিত হইতেছে এবং সেই এক লীলাশক্তিই বিশ্বের সর্ব্বত্র নানামূর্ত্তিতে কিরূপে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা অবধারণ করিতে মানবকে সক্ষম করাই ভাগবত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

একটী বিশেষ অবস্থায় উপস্থিত না হইলে মানব ভাগবতশাস্ত্রের যাহা মর্ম্ম তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না, বা লীলাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছেন, "পিবত ভাগবতং রসম্" এই ভাগবত রস পান কর। এই বাক্যটি একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

বৈশাখ মাসে পথের ধারে জলসত্র বসিয়াছে, সেখানে দাঁড়াইয়া এক জন লোক জোরে জোরে ডাকিতেছে—"ওগো জল খাইয়া যাও গো, জল জল খাইয়া যাও।" এই ডাক সকলেরই কাণে যাইতেছে বটে, কিন্তু এই ডাক সকলের জন্য নহে। কেহ আরাম করিয়া জুরি চড়িয়া যাইতেছে, কেহ খস্‌খসের টাটিতে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া শুইয়া বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া খাইতেছে, কেহ পান চিবাইতে চিবাইতে ছাতা মাথায় দিয়া যাইতেছে; এই যে ডাক "জল খাইয়া যাও" ইহা সকলেরই কর্ণে প্রবেশ করিতেছে বটে, কিন্তু এই ডাক ইহাদের জন্য নহে।

তবে এ ডাক কাহার জন্য? গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে পথশ্রান্ত, ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও তৃষিত ব্যক্তির জন্য এই আহ্বান। এই আহ্বান শুনিয়া

তাহারা আনন্দে ও আশায় ব্যাকুল হইয়া জলপানের আশায় ছুটিয়া আসিবে এবং জলপান করিয়া তাহারাই তৃপ্তি ও শান্তি পাইবে, অন্যে নহে।

এই ভাগবতশাস্ত্রও পিপাসু ব্যক্তির জন্য। এক দিন ভারতবর্ষে এই পিপাসার উদয় হইয়াছিল, সেই পিপাসার দিনেই শ্রীভগবানের করুণামৃত-ধারা স্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র জগতে আগমন করিয়া সংসার মরুভূমিকে সুশীতল করিয়াছে। এই পিপাসা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে দুই স্থলে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি সুপ্রসিদ্ধ ঋষিগণ। এই ঋষিগণ যে পিপাসু হইয়াছেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবত অতীব স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়াছেন। ঋষিগণ বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে বসিয়া হরিলোক প্রাপ্তি কামনায় সহস্রবৎসর সাধ্য এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কলিকাল আগত প্রায়। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই সমস্ত যুগ চলিয়া গেল। ঋষিরা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা ভাবিতেছেন কলিকাল মানবের সর্বনাশক। কলহ বা বিরোধ অর্থাৎ স্বতন্ত্রতাই কলির স্বভাব, কলিতে মানব প্রায় অল্পায়ু যদি বা কেহ কিছু দীর্ঘায়ু হয় তাহা হইলে সে অসার ও অনিত্য বিষয় লইয়াই ব্যস্ত, পরমার্থ বিষয়ে আলস্য কলিকালের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। আবার যদি বা কাহারও পরমার্থ বিষয়ে অনুরাগ থাকে তাহা হইলে সে নির্বুদ্ধি, প্রকৃত পথ নিরূপণ করিতে পারে না, ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে গিয়াও প্রতারকগণ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হয়। কলিতে লোক অত্যন্ত মন্দভাগ্য কারণ তেমন সাধু সঙ্গ নাই, আবার যদি বা, কাহারও ভাগ্যে এ সমস্ত জুটিয়া উঠে তাহা হইলে তিনি উপদ্রুত, রোগে শোকে অভাবে সর্ব্বদাই কাতর। এই কলির অবস্থা।

ঋষিগণ দেখিলেন সেই কলিযুগ আসিতেছে তাহার লক্ষণগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহাদের মনে বড়ই দুশ্চিন্তার উদয় হইয়াছে, তাহারা ভাবিতেছেন এত দীর্ঘকাল ধরিয়া যে আমরা এত সাধনা করিলাম, কৈ সে সমস্তের দ্বারা তো কিছুই হইল না, শাস্ত্রপাঠ, ব্রত, দান, যজ্ঞ, তপস্যা, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সমস্তেরই অনুষ্ঠান করিয়াছি, কিন্তু কিছুই হইল না, জীবন যেন বিফল হইয়া গেল। ঋষিগণ যেমন নিজের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন তেমনি জগতের জন্যও ব্যাকুল হইয়াছেন, এই প্রকার যখন তাঁহাদের মনের অবস্থা, দীর্ঘকাল সাধ্য যজ্ঞসাধনে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন,

বার্দ্ধক্যকাল উপস্থিত অথচ মনে হইতেছে কিছুই হইল না. সেই সময়েই রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূত সেই নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঋষিগণ তাঁহাদের ব্যাকুলতা উগ্রশ্রবা সূতের নিকট নিম্নোক্ত দুইটি শ্লোকের দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন—

"কালিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ং।
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরেঃ॥
ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাং।
কলিং সত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবং॥" ১।১।২১-২২।

এই দুইটি শ্লোকের টীকানুসারী অর্থ এই—হে সূত তুমি হয়ত বলিবে যে তোমরা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, তোমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাযশঃ শ্রবণের জন্য উৎসুক হইয়াছ এ যে অতি আশ্চর্য্য কথা। কথাটা সত্য কিন্তু আমাদের মনে ভয় হইয়াছে—একটা নিরাশা জাগিয়াছে, তাই এই দীর্ঘ অনুষ্ঠান। এমন আমাদের অবসর আছে, আমরা হরিকথা শুনিতে চাই। আমরা পুরুষদিগের (মানব সকলের) সত্বনাশক দুস্তর কলিসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিতেছিলাম। এমন সময়ে কর্ণধারের মত তোমার দর্শন পাইলাম। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই তুমি এখানে আসিয়াছ। ঋষিদিগের ব্যাকুলতা আমরা দেখিলাম।

শ্রীমন্মহারাজ পরীক্ষিৎ যে অবস্থায় এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রীশ্রীশুকদেব প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা আলোচনা করিলেও এই ব্যাকুলতা আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। মহারাজ পরীক্ষিৎ যেমন ভাগ্যবান তেমনি সাধু-প্রকৃতির লোক। তিনি পাণ্ডুবংশাবতংস. যে সময়ে তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন সেই সময়ে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রচণ্ড ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ তাঁহাকে নষ্ট করিবার জন্য গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই অবস্থাতেই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে নারায়ণ ব্রহ্মতেজ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। সুতরাং 'ভগবান রক্ষাকর্ত্তা' এই কথায় বিশ্বাস যাহা ভক্তজীবনের ভিত্তি, তাহা গর্ভবাস সময়েই তিনি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ এই প্রকারের প্রকৃতির লোক অথচ কি এক অজ্ঞেয় শক্তির প্রভাবে তিনি ক্ষণকালের জন্য মোহাচ্ছন্ন হইয়া এক ভয়ানক অন্যায় কার্য্য করিয়া বসিলেন। শমীক ঋষি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, মহারাজ পরীক্ষিৎ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে জল চাহিয়াছিলেন। ঋষি সমাধিস্থ, একেবারে বাহ্যজ্ঞান-

শূন্য এই কারণে মহারাজকে অভ্যর্থনা করিতে পারেন নাই। মহারাজা এতবড় জ্ঞানী ও ভক্ত হইয়া এমন সহজ কথাটুকু বুঝিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা ও উত্তেজনায় একটি মৃতসর্প সমাধিস্থ ঋষির গলদেশে অর্পণ করিয়া যেন মনে মনে বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ! আমি তোমার অতিথি, তুমি যেমন আমার সেবা করিলে আমিও তেমনি তোমার সেই সেবার বিনিময়স্বরূপ তোমায় এই সুকুমার মাল্য অর্পণ করিয়া সম্মানিত করিয়া চলিলাম।

"ভো ব্রহ্মণ্‌ ত্বয়াহমতিথির্যথা সাধুসম্মানিতস্তথা ত্বামপ্যনয়া সুকুমারমালয়া সম্মানয়ামীতি বদন্নিতি ভাবঃ।" শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

মহারাজা পরীক্ষিতের এই মোহের অবস্থা অধিকক্ষণ থাকিল না, আশ্রম হইতে বাহির হওয়ার পর হইতেই তাঁহার মনে অন্যরূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয় বলিয়া আমাকে অপমান করিয়াছেন অথবা সত্যসত্যই তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। তাহার পর মহারাজ পরীক্ষিৎ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার সেই সাময়িক মোহ একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিতে আসিতে তিনি ভাবিতেছেন—

"মহীপতিস্ত্বথ তৎকর্ম্মগর্হ্যং বিচিন্তয়ন্নাত্মকৃতং সুদুর্ম্মনাঃ।
অহো ময়া নীচমনার্য্যবৎকৃতং নিরাগসি ব্রহ্মণি গূঢ়তেজসি॥
ধ্রুবং ততো মে কৃতদেবহেলনাদ্দুরত্যয়ং ব্যসনং নাতিদীর্ঘাৎ
তদস্তু কামং হ্যঘ নিষ্কৃতায় মে যথান কুর্য্যাং পুনরেবমদ্ধা।
অদ্যৈব রাজ্যং বলমৃদ্ধকোষং প্রকোপিত ব্রহ্মকুলানলো মে
দহত্বভদ্রস্য পুনর্ন মেঽভূৎ পাপীয়সী ধীর্দ্বিজ দেবগোভ্যঃ॥

মহারাজা পরীক্ষিৎ মুনির স্কন্ধে সর্পনিক্ষেপ করা বড়ই গর্হিত হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিলেন ও অত্যন্ত দুর্ম্মনাঃ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন আমি গূঢ় তেজসম্পন্ন নিরপরাধ ব্রাহ্মণের প্রতি নীচের মত অসাধু ব্যবহার করিয়াছি।

আমি এই কার্য্যের দ্বারা ঈশ্বরের অবজ্ঞারূপ মহাপাপ করিয়াছি। আমার শীঘ্রই ভয়ঙ্কর ব্যসন উপস্থিত হইবে। সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতির জন্য সেই ব্যসন অসঙ্কোচে আমাতেই হউক, তাহা হইলে পুত্রাদিকে আর সে পাপের ফলভোগ করিতে হইবে না, আর আমারও তাহা হইলে এরূপ গর্হিত কর্ম্ম করিতে আর প্রবৃত্ত হইবে না।

অদ্যই আমার রাজ্য, বল, সমৃদ্ধিশালী কোষাগার কুপিত ব্রাহ্মণের ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া যাউক আমি অভদ্র, তাহা হইলে আমার আর গো-ব্রাহ্মণ ও দেবতার প্রতি এরূপ পাপীয়সী বুদ্ধি হইবে না।

মহারাজা নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য এই প্রকারে অনুতাপ করিতেছেন, এদিকে শমীকঋষির পুত্র শৃঙ্গী অভিশাপ দিলেন যে যে ব্যক্তি তাঁহার পিতার গলদেশে মৃতসর্প প্রদান করিয়াছে এক সপ্তাহ মধ্যে তক্ষকের দংশনে তাহার মৃত্যু হইবে।

মহারাজ যখন এই অভিশাপের কথা শুনিলেন তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মহারাজের আর সাতদিন মাত্র সময় আছে। তিনি রাজ্য ঐশ্বর্য্য সিংহাসন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সুরতরঙ্গিনী পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। মুনিগণ আসিয়া মহারাজের চারিদিকে বসিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সকলকে যথাবিধি পূজা করিয়া এই অবস্থায় শ্রীশ্রীশুকদেবের নিকট এই লীলাগ্রন্থ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে শৌণকাদি ঋষিগণের ব্যাকুলতা যেমন, মহারাজ পরীক্ষিতেরও ব্যাকুলতা তেমনি। পিপাসুব্যক্তির জন্যই যে এই লীলাগ্রন্থ, ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। পিপাসু হইলেই মানব শ্রদ্ধান্বিত হইবে এবং শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করিলেই লীলার রহস্য অবগত হইতে পারিবে।

তৃতীয়শ্লোকে বলা হইয়াছে "রসিক" ও "ভাবুক" হইয়া ভাগবতরস পান করিবে এবং আমরাও রস ও ভাব বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি? রস ও ভাব এই দুইটি শব্দের উপর লীলার যাবতীয় রহস্য নির্ভর করিতেছে। শ্রীভক্তমালগ্রন্থের একটি উপাখ্যান হইতে এই দুইটি শব্দের তৎপর্য্য অতি সুন্দররূপেই বুঝিতে পারা যায়। উপাখ্যানটি এই।

গোকুলে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহাকে লোকে ভাবুক ব্রাহ্মণ বলিত। ইনি বাৎসল্যভাবে গোপালের উপাসনা করিতেন। ব্রাহ্মণের পুত্রাদি নাই তিনি শ্রীহরির পুত্রভাবে ভজনা করিতেন। একাগ্রচিত্তে ভজনা করিতে করিতে ব্রাহ্মণের ভাবসিদ্ধি হইয়া গেল এবং তিনি ভগবানের বাল্যরূপ প্রত্যক্ষ করিলেন।

ব্রাহ্মণের আর আনন্দের সীমা নাই, তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে

পাইলেন। প্রেমের স্বভাব এই যে তাহাতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান শিথিল হইয়া যায়, ব্রাহ্মণেরও তাহাই হইল। ব্রাহ্মণ শুদ্ধমাধুর্য্যভাব যাহা কেবলমাত্র ব্রজধামেই প্রকাশিত, তাহাই প্রাপ্ত হইলেন এবং পুত্রজ্ঞানে ভগবানকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। কোলে বসাইয়া অন্নভোজন করান, নানা অলঙ্কার ও বস্ত্র মাল্য প্রভৃতি ঠাকুরকে পরাইয়া দেন, নাসিকায় তিলক রচনা করিয়া দেন, কখন নাচান, কখন কোলে বা পিঠে করেন, চুম্বন করেন আলিঙ্গন করেন—এই প্রকারে ব্রাহ্মণ স্নেহানন্দ সিন্ধুর মধ্যে ভাসিয়া যাইতেছেন।

যেখানে যাহা কিছু ভাল দ্রব্য দেখেন গোপালের জন্য লইয়া আসেন। নাটিম, ঝুমঝুমি, গেণ্ডু, ভাঁটা, রাঙ্গাকড়ি, কন্যাবর, মাটির ভাঁড়, হাঁড়ি-কুঁড়ি প্রভৃতি যাহা কিছু খেলেনা পান, আনন্দের সহিত সংগ্রহ করিয়া গোপালকে আনিয়া দেন। গোপাল খেলেনা লইয়া খেলা করেন, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কোলে করিয়া নাচান আর তাঁহার নয়ন দিয়া আনন্দের অশ্রু অমৃতমন্দাকিনীর ধারার মত বহিয়া যায়। এই প্রকারে গোপালের সঙ্গে তাঁহার দিন রাত্রি কাটিয়া যায়। সে আনন্দ, কোটি ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও অধিক।

রাত্রিকালে ব্রাহ্মণ গোপালকে কোলে করিয়া শুইয়া থাকেন। হাত চাপড়াইয়া গোপালকে ঘুম পাড়ান। একদিন রাত্রিতে ব্রাহ্মণ গোপালকে লইয়া এই প্রকারে শুইয়া আছেন এমন সময়ে একটি বিড়াল ঘরের মধ্যে আসিয়া ডাকিতেছে। বিড়ালের ডাকে গোপাল চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এই প্রকারে বিড়ালটি মধ্যে মধ্যে ডাকে আর গোপাল ভয় পাইয়া ব্রাহ্মণের গলা জড়াইয়া ধরেন ও জিজ্ঞাসা করেন "বাবা ও কি ডাকৃচে ?"

ব্রাহ্মণ বলেন "কিছু না কিছু না, ও বিড়াল ডাকৃচে।"

এই প্রকারে মাঝে মাঝে রাত্রিকালে সেই বিড়ালটি আসিয়া ডাকে ও এই প্রকারের ঘটনা হয়। একদিন ভাবুক ও সাধু ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে এক দুর্দ্দৈব ঘটিল। ব্রাহ্মণের মনে ঐশ্বর্য্যভাব জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন "কি আশ্চর্য্য ! কৃষ্ণ, তিনি ঈশ্বর ও ত্রৈলোক্যের নাথ, তিনি দেবের দেব, কালের কাল, ভয়ের ভয়, যমের যম। এই বিভু এবং অচ্যুত, ইনি বিড়ালের ডাকে ভয় পাইয়া মুগ্ধ বালকের মত কাঁদেন কেন ?"

এই চিন্তা মনের মধ্যে উদয় হইবামাত্র ব্রাহ্মণের সেই শুদ্ধ বাৎসল্য-ভাব দূর হইয়া গেল, তিনি ঐশ্বর্য্যভাবে স্তুতি করিতে লাগিলেন। যেই ব্রাহ্মণের ভাবান্তর হইয়াছে অমনি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলেন। ব্রাহ্মণ হাহা-কার করিয়া ভূমিতে পড়িয়া কাতরে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সব গেল, মণিহারা ফণীর মত ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে ব্রাহ্মণ যখন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন দৈব বাণী হইল যে তোমার ভাবান্তর হইয়াছে সুতরাং এই দেহে তুমি আর আমার দেখা পাইবে না দেহ অন্তে পুনর্ব্বার আমাকে পাইবে।

ঐশ্বর্য্যভাবে উপাসনা করিলে অন্যধাম (বৈকুণ্ঠাদি) পাওয়া যায় মাধুর্য্যভাবে ভজনা করিলে ব্রজপুরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর চারি রস
ব্রজে উপাসনা রতি কৃষ্ণ যাহে বশ।"

'ভাব' একটী ঐন্দ্রজালিক বৃত্ত (Magic Circle) এই বৃত্তের মধ্যে না আসিলে লীলাগ্রন্থের, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের শেষতত্ত্ব বৃন্দাবন লীলা। যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি নানাভাবে নানারূপ উপাসনার বিষয়ীভূত হইয়া-ছেন, দার্শনিকের মনীষা যাঁহার তত্ত্ব নিরূপণে অক্ষম হইয়াছেন সেই তিনি "গোপবালক" বেশে আসিয়া আবির্ভূত। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে ব্যাপারখানা কি?

যাঁহারা বৈদেশিক, হিন্দুসাধনার বিশেষত্বটুকু যাঁহারা ঠিক হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে না পারেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মার অগোচর ও বেদগোপ্য লীলা এক কথায় উড়াইয়া দিতে পারেন। বলিতে পারেন এ কল্পনা মাত্র। হিন্দুজাতির ইতিহাসে একটি অধঃপতনের যুগ আসিয়াছিল তখন তাহারা উপনিষদের উন্নত ব্রহ্মতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল—সেই সময়ে এই সব লীলার উদ্ভব হইয়াছে। বৈদেশিকগণ একথা বলিতে পারেন, তাঁহাদের উপর আমাদের অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। কারণ হিন্দু চিত্তের যে বিশিষ্টতা, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না অথবা পূর্ব্বে যে ঐন্দ্রজালিকের বৃত্তের কথা বলা হইল; তাঁহারা তাহার বাহিরের লোক। জগতে এরূপ হইয়া থাকে, আমরাও তাঁহাদের অনেক বড় কথা বুঝিতে পারি না। আমাদিগকে এই ঐন্দ্রজালিকের বৃত্তটি কি তাহার পরিচয়

লইতে হইবে তাহা হইলেই লীলার রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। আর এক কথা, লীলার রহস্য অবগত না হইলে ধর্ম্মজীবন সফল হইবে না—এ কথাও আমরা ক্রমে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ ভাগবতশাস্ত্র আলোচনা করিলে এই তত্ত্বটি পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে শ্রীমদ্ভাগবতের মতে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণলীলাই সকল তত্ত্বের, সকল সাধনার শেষ কথা। হৃদয়ের দ্বারা এই লীলা উপলব্ধি করাই মানব-জীবনের পূর্ণ পরিণতি।

প্রথমতঃ সাধারণভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক এই লীলা কি? এবং কি প্রকারেই বা এই লীলা অনুভব করা যায়? মানুষ তত্ত্বালোচনা করে, সত্যের অন্বেষণ করে, ইহা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। অবশ্য কেন যে এই সত্যান্বেষণ—তাহার উত্তর মানবের বিজ্ঞান বা দর্শন দিতে পারুন বা না পারুন মানুষ যে সত্যের অন্বেষণ করিতেছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। দৃশ্যমান বিশ্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দ্রষ্টা মানবের জ্ঞানের বিষয়ীভূত, দার্শনিক এই বিশ্বতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন। জড়াতীত চৈতন্যের উপলব্ধি উন্নত মানবীয় জ্ঞানের প্রথম স্তর। যাহা দেখিতেছি তাহা পুর, কিন্তু এই পুরে একজন অধিবাসী আছেন, এই পুর তাঁহারই। এই প্রকারে বহুপুরুষ, এই পুর আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিতেছেন। ইহাই প্রথম তত্ত্ব। তাহার পর প্রশ্ন এই যে পুরুষ ও প্রকৃতি ইহাদের মধ্যে সংযোগ বিয়োগ হইতেছে, ইহা কি প্রকারে হইতেছে—এই খানেই একজন পুরুষবিশেষের আবশ্যক, এই পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর, এই ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ বিয়োগরূপ ক্রিয়া বা বিশ্বব্যাপার সাধিত হইতেছে। এই ঈশ্বরই প্রকৃতির নিয়ামক। যুক্তির দ্বারা ও বিচারের দ্বারা এ পর্য্যন্ত বুঝিলাম কিন্তু বুঝিয়া আমার কি হইল? সেই পরমার্থ বস্তু অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান ইহাও বুঝিলাম। কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, আপনার করিতে পারিলাম না। ইহাই সমস্যা শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী তাঁহার স্তবের প্রথম শ্লোকেই এই সমস্যাটি উত্থাপন করিয়াছেন

"নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্,
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানাং অন্তর্ব্বহিরবস্থিতং"

অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তিনি রহিয়াছেন অথচ তিনি অলক্ষ্য। এ সমস্যার মীমাংসা কি ?

পরের শ্লোকেই কুন্তীদেবী এই অলক্ষ্য থাকার কারণ কি তাহা বর্ণনা করিতেছেন

"মায়া যবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শ্লোকটির যে অর্থকরিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে লীলাতত্ত্বের রহস্য অতীব সুন্দরভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। বলা হইয়াছে তিনি অলক্ষ্য। ইহার কারণ মায়া যবনিকা। তবে কি মায়া-যবনিকা তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে ? উত্তর, না ; তাঁহাকে ঢাকে নাই। মেঘ যেমন আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে আর আমরা বলি যে সূর্য্য মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে এও ঠিক সেইরূপ। তিনি আচ্ছন্ন নহেন আমাদের দৃষ্টিই আচ্ছন্ন। তিনি অধোক্ষজ অর্থাৎ অক্ষজ বা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান তাঁহার অধঃস্থিত, অর্থাৎ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা ঐন্দ্রিয়িক বা ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব, আমরা জ্ঞানবান হইয়াও অজ্ঞান, এই জন্য তাঁহাকে দেখিতে পাই না, ইহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি নাই, তিনি অব্যয়। শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে এই শ্লোকে স্তব করিতেছেন, তিনি প্রত্যক্ষ কৃষ্ণকে দেখিতেছেন, স্তব করিতেছেন, তিনি যে প্রকৃতির পর একথা জানিতেছেন অথচ বলিতেছেন আমি তোমার সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং এজন্য নিজেকে নিন্দা করিতেছেন, ইহার তাৎপর্য্য কি ? এই জন্যই বলিতেছেন—একজন নাট্যধর নট আসিয়াছে, সে গান করিতেছে গানের অনুরূপ অভিনয় করিতেছে এবং রস ও তালের অনুরূপ নৃত্য করিতেছে। আর একজন লোক সেই চমৎকার নৃত্যাভিনয় দেখিতে গেল কিন্তু সে ব্যক্তি অজ্ঞ, সঙ্গীত শাস্ত্রের কিছুই জানেনা। সে চক্ষুদ্বারা নৃত্য দেখিতেছে, কর্ণের দ্বারা গান শুনিতেছে সত্য কিন্তু সে নৃত্য দেখিতেছেনা, গান ও শুনিতেছেনা। নর্ত্তকের অঙ্গভঙ্গী তাহার নিকট বিশৃঙ্খল ও অর্থশূন্য অঙ্গভঙ্গী বলিয়া প্রতীত হইতেছে আর তাহার সঙ্গীত সাধারণ চীৎকার বলিয়া তাহার মনে হইতেছে। সে জ্ঞাততত্ত্ব নহে। শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী বলিতেছেন আমার অবস্থাও সেইরূপ। পাণ্ডবেরা তোমায় ভক্ত, তুমি তাহাদের পালন করিতেছ, অথচ সকলের অন্তর্যামী হইয়াও আবার পাণ্ডবদিগের বধের জন্য অশ্বত্থামা প্রভৃতিকে অস্ত্রধারণ করাইতেছ। নিজে অস্ত্র-

গ্রহণ করিবেনা এরূপ সংকল্প করিয়াও পুনরায় অস্ত্রগ্রহণ করিতেছে। শিষ্ট পালনের প্রবৃত্ত হইয়াও ভীষ্মপ্রভৃতিকে বধ করাইতেছে। দ্রৌপদী ও সুভদ্রার প্রতি অতিশয় স্নেহযুক্ত হইয়াও তাহাদের পুত্রদিগকে বধ করাইতেছ। এই তোমার লীলা, লীলার যে তত্ত্ব কি, তাহা আমি জানি না।

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শ্লোকের টীকার যাহা অনুবাদ অবিকল তাহাই প্রদত্ত হইল। কারণ আমরা প্রাচীনেরা লীলাগ্রন্থ কি ভাবে বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন তাহাই দেখাইতেছি। তাহা হইলেই বুঝাগেল লীলাতত্ত্ব বড়ই কঠিন তত্ত্ব। আমাদের সাধারণ ধারণা কি ? আমরা মনে করি এই সব লীলা বর্ণনা, সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকের জন্য। তাহারা কবিতা বোঝে না, দর্শন বোঝে না কাজেই গল্পচ্ছলে তাহাদের শিক্ষা হইবে। লীলা নিম্নাধিকারীর জন্য আর উচ্চাধিকারীর জন্য সাংখ্য, বেদান্ত, উপনিষদ, ইহাই এ কালের শিক্ষিত লোকের ধারণা। কিন্তু প্রাচীনকালের যাঁহারা লীলাতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বলেন তত্ত্বের শেষ লীলাতত্ত্ব, সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান বা সমস্ত সাধনা আসিয়া লীলায় পরিণতি লাভ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী ও তাঁহার স্তবে পরবর্ত্তী শ্লোকে এই কথাই বলিতেছেন

"তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাং।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহিস্ত্রিয়ঃ।"

যাঁহারা পরমহংস অর্থাৎ আত্মানাত্মবিবেকী, দীর্ঘকাল ধরিয়া জ্ঞানযোগ সাধনের দ্বারা ইহাই আত্ম বা সৎ এবং ইহাই অনাত্ম বা অসৎ এইরূপ আলোচনা করিয়া বিবেকলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা মুনি—মননশীল দীর্ঘকাল যোগাদি সাধনদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা অর্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহারা অমলাত্মা অর্থাৎ বৈধ কর্ম্মাদি সাধনদ্বারা যাঁহাদের রাগ বা আসক্তি প্রভৃতি দূরীকৃত হইয়াছে তাঁহারাও এই সমস্ত দীর্ঘকালসাধ্য কঠোর সাধনা দ্বারা তোমায় দেখিতে পান না। তুমি ভক্তিযোগ-বিধাতা, আমি সামান্যা স্ত্রীলোক আমি তোমায় কিরূপে দেখিতে পাইব ? পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের শেষ অংশের আর একটি অর্থ করিয়াছেন। তুমি (লীলাময় ঈশ্বর) পরমহংস মুনি ও অমলাত্মাদিগের ভক্তিযোগ সাধনের জন্য অর্থাৎ স্বকীয় অচিন্ত্যগুণের দ্বারা তাঁহাদের আকর্ষণ করিয়া ভক্তিযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ। এত দুর্জ্ঞেয় তুমি, আমি স্ত্রীলোক হইয়া তোমায় কি প্রকারে

জানিব? তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে—লীলাতত্ত্ব বা ভগবানের অবতরণ সকল তত্ত্বের শেষতত্ত্ব এবং সাধনার শেষফল। মানবীয় সাধনা এই স্থানে আসিয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট চিন্তাপদ্ধতি আশ্রয় করিয়া লীলার এই রহস্য শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই চিন্তাপদ্ধতি গুলির মধ্যদিয়া স্তরে স্তরে অগ্রসর হইলেই বৃন্দাবন লীলার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা ক্রমশঃ এই চিন্তাপদ্ধতিগুলির অনুসরণ করিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে লীলাদর্শনের দ্বারাই মানবীয় সাধনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। পূর্ব্বে শ্রীশ্রীকুন্তীদেবীর স্তব হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইল তাহাতেও এই কথার উক্তি দেখিলাম। সেখানে বলা হইল যে তত্ত্বসাধনাতে পরমার্থ সত্যের অস্তিত্ব বুঝিলাম কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর আর ও বলা হইল যে চক্ষুর সম্মুখে লীলা হইয়া যাইতেছে অথচ বুঝিতে পারিতেছি না, আর বলা হইল যে এই লীলা বা ভগবানের এই অবতীর্ণ হওয়ার দ্বারায় পরমহংস মুনি ও অমলাত্মাগণ ভক্তিযোগলাভ করেন এবং ভক্তি-যোগের দ্বারাতেই তাঁহাদের সাধনা সফল হয়। এইবার সাধারণ ভাবে আমাদের জীবনের মধ্যে এই লীলাতত্ত্বের স্থান কোথায় তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে।

মানুষ সংসারে আসিয়া নানা ঘটনার মধ্যদিয়া বিকাশ লাভ করিতেছে। ধন, জন, মান, সম্ভ্রম, হাস্য ও হর্ষ কলরোল, আর শোক, তাপ ও বিষাদ নিরাশা, এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল আলোছায়ার মধ্য দিয়া আমাদের জীবন তরণী কালের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখনও কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝাঘাতে উন্মত্ত তরঙ্গকুলের মস্তকোপরি সভয়ে দোদুল্যমান, আবার কখনও ফুলগন্ধময় বসন্তের মৃদুল সমীরণে ও বিহগ কলকণ্ঠ কূজনে আপ্যায়িত। কখনও অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার, কখনও পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্না বন্যা। এমনি করিয়াই জীবন তরণী চলিয়াছে। কিন্তু কোন্ বন্দর হইতে যে এই তরণী বাহির হইয়াছে আর এই নিত্য সংঘটিত পরিবর্ত্তনপুঞ্জের মধ্য দিয়া কোন্ বন্দরের দিকে তাহা অগ্রসর হইতেছে, কেহ বা অলক্ষ্যে থাকিয়া এই শত শত তরণীর কর্ণধারের কার্য্য করিতেছেন, আর কেহ বা প্রতিনিয়ত আসিয়া আসিয়া ইহাদের শক্তিদান করিতেছেন এ কথা সাধারণ মানব বোঝে না। আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শন এই চরম কথাটুকু আমাদিগকে

বুঝাইয়া দিতে পারে না। কিন্তু এটুকু বুঝিতে হইবে। এটুকু বুঝিতে না পারিলে জীবনপথে এই ক্লান্তিকর পরিশ্রম, এত উদ্যোগ, আয়োজন সমস্তই বিফল হইল।

শাস্ত্রের মধ্যে এই লীলা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক জীবনের মধ্যেই এই লীলার অভিনয় হইতেছে, প্রত্যেককেই তাহা প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে হইবে। ইহাই জীবনের পূর্ণ পরিণতি। শাস্ত্রে যে সমস্ত লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে, একটু ধীরভাবে সেই সমস্ত লীলা প্রাচীনেরা যে ভাবে বুঝাইয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই লীলাগুলি যেন বীজগণিত শাস্ত্রের কষা অঙ্ক (Book-Articles) এগুলি আয়ত্ত করিলে পর অঙ্ক কষিবার নিয়ম পাওয়া যাইবে এবং সেই নিয়মের সাহায্যে আমাদের নিজেদের জীবনের যাহা সমস্যা তাহার মীমাংসা করিয়া আমরা ধন্য হইব।

প্রকৃতির শোভা অতি বিচিত্র ও অতি মনোহর; তাহার মধ্যে ভগবানের নিত্য প্রকাশ হইতেছে। বিশ্বের মর্ম্মস্থলে বসিয়া আনন্দময় পরমপুরুষ তাঁহার প্রেম বাঁশরী বাজাইতেছেন, সেই বাঁশরী রবে বিশ্ব নিত্য নূতনায়মান হইয়া উঠিতেছে। আমরা এখন প্রকৃতির শোভার মধ্যে ভগবানের মাধুর্য্য অনুভব করি—আমাদের বর্ত্তমানকালের কবিদের রচনার মধ্যে এই ভাবের অনুভূতি অনেক দেখিতে পাওয়া যাইবে। তিনি এই বিশ্ব পরিবর্ত্তনের মধ্যে রহিয়াছেন—নিদাঘের প্রচণ্ড সূর্য্যকরে, ধূলিময় প্রচণ্ড ঝঞ্চাবাতের মধ্যে তাঁহার ভীম ভৈরব মূর্ত্তি, আবার ফুল্লফুলময় মৃদুস্পর্শ মলয়ান্দোলিত বসন্ত প্রভাতে তাঁহার মধুর স্নিগ্ধভাব। প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে তিনি রহিয়াছেন এ কথা আমরা ঠিক বুঝিনা সত্য কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে অনুমান করিতে পারি। বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির পর যে ঈশ্বর তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলেও সাধনা দরকার। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, প্রাচীন সাধক ও দার্শনিক প্লেটোর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া একালে পাশ্চাত্য জগতে এই সাধনার ক্রমগুলি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রে এই সাধনার ক্রম বলা হইয়াছে উত্তর গীতার মধ্যে এই কথা বিশেষভাবেই বলা হইয়াছে।

প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে তাঁহার যে প্রকাশ আছে তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর প্রকাশ এই লীলার মধ্যে। লীলার মধ্যে তাঁহাকে যে আরও স্পষ্টতররূপে পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা স্পষ্টাক্ষরেই বলা হইয়াছে।

সকল লীলার সার লীলা শ্রীশ্রীরাসলীলা। এই রাসলীলার মধ্যে ব্রজদেবীগণের কৃষ্ণান্বেষণ অতীব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রজদেবীগণ সর্ব্বপ্রথমে বাহিরের প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিতেছিলেন। প্রথমে আকাশের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর বনস্পতিদিগের নিকট গেলেন। সর্ব্বপ্রথম বনস্পতিদিগের নিকট যাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক, বনের মধ্যে এই সমস্ত বৃক্ষ অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, ইহারা যখন সর্ব্বাপেক্ষা মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে, তখন প্রথমেই মনে হয় যে বনমধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত এবং ইহারা অধিক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায়; কৃষ্ণ যে কোথায় গিয়াছেন কি করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে ইহা ব্রজদেবীগণ জানেননা প্রথম তাঁহাদের মনে হইতেছে যে কৃষ্ণের সহিত যে ব্যবধান তাহা দেশগত ব্যবধান। এই প্রকারের ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা বনস্পতিগণকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরাও ঠিক তাহাই করিয়া থাকি, আমরাও প্রথম অবস্থায় সংসারের ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের নিকট আনন্দের আনন্দদাতা শ্রীনন্দনন্দন, যিনি প্রেমপূর্ণ হাস্য ও স্নিগ্ধ দৃষ্টির দ্বারা আমাদের মন চুরি করিয়াছেন তাঁহাকে অন্বেষণ করি, তীর্থে তীর্থে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। কিন্তু বনস্পতিগণ কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিলেন না। তখন ব্রজদেবীগণের মনে যে চিন্তার উদয় হইল তাহা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় নিম্নরূপ বর্ণনা করিতেছেন। ব্রজদেবীগণ বলিলেন এই সমস্ত বৃক্ষ ইহারা মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাদের যে গৌরব তাহা বাহ্য গৌরব, ইহারা কৃষ্ণের সন্ধান কিরূপে জানিবে। ইহারা দেখিতে বড় হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষুদ্র। ইহাদের ক্ষুদ্র ফল, ইহারা পরোপকার ধর্ম্ম জানে না, ইহারা অপ্রফুল্ল, সুতরাং অশুদ্ধান্তঃকরণ, ইহারা অহঙ্কারী, ইহারা কৃষ্ণের সন্ধান জানেনা।

তাহার পর ব্রজদেবীগণ ফুলোদ্যানে প্রবেশ করিলেন কুরুবক, অশোক, নাগকেশর, পুন্নাগ, চম্পক প্রভৃতি ফুলতরু দর্শন করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন, এই সমস্ত পুষ্পতরু, ইহারা শুদ্ধান্তঃকরণ, ইহারা বিকশিত ফুলশোভায় যেন অন্তরের আনন্দ জগতে ছড়াইয়া দিতেছে, ইহারা নিজের অন্তরের মধুদানে, মধুকর-অতিথির সেবা করে, ইহারা কৃষ্ণের সন্ধান জানে এবং বলিয়াও দিবে। পুষ্পতরুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন কৃষ্ণ কি এই স্থানে লুকাইয়া আছেন কিম্বা অন্যত্র গিয়াছেন। পুষ্পতরুসমূহ পবনে অগ্রশাখা সঞ্চালন

করিয়া বলিলেন আমরা জানিনা, ব্রজদেবীগণ বলিলেন, ওগো ইহারা কঠোর পুরুষ জাতি ইহারা আমাদের মনের কথা বুঝেনা, আমাদের প্রতি ইহাদের সহানুভূতি নাই, সেই জন্যই ইহারা বলিয়া দিল না। চল অন্যত্র যাই। এই বলিয়া তাঁহারা তুলসীর নিকট গেলেন, ভাবিলেন তুলসী স্ত্রীলোক, তিনি স্ত্রীলোকের হৃদয় পীড়া বুঝিবেন। ভগবান তুলসীকে সহস্র সহস্র ভ্রমরকৃত পীড়া উপেক্ষা করিয়াও চরণে ধারণ করেন—তুলসীর নিকট সংবাদ গ্রহণ করা যাউক। তুলসী সংবাদ দিলেন না বা দিতে পারিলেন না। ব্রজদেবীগণ বলিলেন ইনি সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা আর আমরা আজ সৌভাগ্যরহিতা, সেইজন্য আমাদের উপেক্ষা করিলেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা মালতী, মল্লিকা ও যুথির নিকট গমন করিলেন এবং মনে করিলেন ইহারা গুণাতিরেকে নম্রা। এখানেও সংবাদ পাইলেন না—ভাবিলেন ইহারা তুলসীর সপত্নী, তাহার পর কৃষ্ণ ভয়ে ভীত এই কারণে জানিয়াও বলিতেছেননা। (গোপীগণের এই যে চিন্তা ইহা আমাদের কথিত প্রাচীন টীকাকারগণ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঠিক সেই ভাবে আমরা বর্ণনা করিতেছি)

এইবার ব্রজদেবীগণ মনের দুঃখে যমুনার উপকূলে আসিলেন। দেখিলেন ফলতরুগণ ফলভারে অবনত, চূত, প্রিয়াল আদি বৃক্ষ। ব্রজদেবীগণ ভাবিলেন ইহারা তীর্থবাসী ও পরের জন্য জীবন ধারণ করিতেছেন ইহারা পরোপকারব্রতে নিত্য ব্রতী। ব্রজদেবীগণ তাঁহাদিগকে পথ জিজ্ঞাসা করিলেন—যে পথে যাইলে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইবে।

বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করার পর একজন গোপী বলিলেন ইঁহারা বিষ্ণু চিন্তায় সমাধিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন আমাদের প্রশ্ন বোধ হয় শুনিতে পাইলেন না। আর একজন বলিলেন ইহারা তীর্থবাসী কাজেই চিত্ত বড় কঠোর সে জন্য শুনিয়াও উত্তর দিলেন না। আর একজন বলিলেন না না, ইঁহারা তীর্থবাসী, বড় ভাললোক, ইঁহারা জানেন কি জানেন না তাহা না ভাবিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছ, এমন করিলে কি কখন সংবাদ পাওয়া যায়? তবে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব—একজন তর্জ্জনী দ্বারা পৃথিবী দেখাইয়া দিলেন। ঠিক বলিয়াছ, পৃথিবীর নিকটই সংবাদ পাওয়া যাইবে, কৃষ্ণ যেখানেই থাকুন পৃথিবী সেখানে আছেন, পৃথিবীর আর বিচ্ছেদ নাই। পৃথিবী এই যে নিত্য মিলন ভোগ করিতেছেন এ কি মহতী তপস্যার ফল, প্রথমে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর ক্ষিতি

যে কেশবের চরণস্পর্শ লাভ করিয়াছেন তাহার অতিশয় স্পষ্ট প্রমাণও পাইলেন। প্রমাণ এই যে পৃথিবীর ক্লেশের সীমা নাই, তিনি সর্ব্বংসহা, অথচ এই ক্লেশ তাঁহাকে কখনই কাতর ও অবসন্ন করিতে পারে না। নব নব তৃণাঙ্কুর পুলকের মত তাঁহার অঙ্গে সর্ব্বদাই উদ্গত হইতেছে, এত বিষাদ ও দুঃখের মধ্যেও তিনি নিত্য নূতন হইয়া উঠিতেছেন, কৃষ্ণ-চরণ স্পর্শ পাওয়ার ইহাই তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বাহ্য-প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাদের এইখানে কৃষ্ণান্বেষণ প্রায় শেষ হইয়া গেল। তাহার পর হরিণীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এইখানেই তাঁহারা বুঝিলেন কৃষ্ণ একাকী নহেন তিনি প্রিয়তমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রিয়তমা সঙ্গে আছেন, কৃষ্ণ একাকী নহেন এইটুকু বুঝিবার পর তাঁহাদের অন্বেষণ দ্বিতীয়স্তরে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা লীলা অনুকরণ করিতে লাগিলেন। লীলার মধ্যে অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিলেন, তাহার পর বিরহিনী শ্রীরাধার সহিত মিলন, তৎপরে গোপীগীত তদনন্তর কৃষ্ণপ্রাপ্তি। কৃষ্ণান্বেষণের এই স্তরগুলি আমরা পরে আলোচনা করিব। এখানে আমাদের আলোচ্য এই যে প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরদর্শনে ঠিক পথ পাওয়া যায় না এবং তাঁহার সঙ্গে আত্মীয়তা বুদ্ধিও জাগে না, লীলাতেই এই আত্মীয়তা টুকু হয়। লীলার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে সাধক কিরূপ অবস্থায় উপনীত হয়েন এইবার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের বর্ণনা হইতে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

এই তত্ত্ব আলোচনাতে ও আমরা সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীকুন্তীদেবীর স্তব হইতে সহায়তা পাইব। সুতরাং এই স্তবের আলোচনা আমরা যে স্থানে ছাড়িয়া আসিয়াছি পুনরায় সেই স্থানেই আরম্ভ করা যাইতেছে।

শ্রীশ্রীকুন্তীদেবীর স্তবের যে অংশ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাতে আমরা দেখিয়াছি যে তিনি বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন, পরমহংসগণ, মুনিগণ ও অমলাত্মাগণের যিনি ধারণার বিষয় আমি তাঁহাকে কি প্রকারে ধারণা করিব অর্থাৎ এই লীলাতত্ত্ব যখন সকল তত্ত্বের চরম তত্ত্ব তখন সাধারণ লোকেই বা এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে কিরূপে? এই প্রশ্নটি লীলাশাস্ত্র আলোচনায় অতি কঠিন প্রশ্ন। সত্যই খুব কঠিন সমস্যা! বিশ্ব ব্যবহারের মধ্যে মানুষ জড় বস্তুই দেখে, জড়জগতের বিষয়পুঞ্জকে ইন্দ্রিয়ের ভোগায়তন বলিয়া উপলব্ধি করে। এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই আসক্তি, তাহা হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে

মনুষ্যত্বের বিনাশ এইতো জগতে সচারাচর ঘটে। এখন এই বিশ্বব্যাপার আমার ভোগভূমি রূপে নহে, বিশ্বনাথের লীলারূপে উপলব্ধি করিতে হইবে— এ বড় কঠিন সমস্যা! ইহার মীমাংসা কি ?

সর্ব্বপ্রথমে দেখা যাউক শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী ইহার কি মীমাংসা করিতেছেন, তাঁহার পর দেখা যাইবে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এই মীমাংসার প্রয়োগ কোথায় ? শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী বলিতেছেন—

"কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে
নমঃ পঙ্কজ নেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥"

কুন্তীদেবী তাঁহাকে যেমন খুব দুরধিগম্য তত্ত্ব বলিয়া চিন্তার দ্বারা উপলব্ধি করিতেছেন, আবার তেমনি হৃদয়ের দ্বারা তিনি যে 'কৃষ্ণ'এটকুও বুঝিতেছেন। তিনি 'কৃষ্ণ' অর্থাৎ আকর্ষণ করিতেছেন। এখন কুন্তীর অবস্থা ঠিক এইরূপ। পথে যাইতে যাইতে একজন খুব বড়লোক দেখিলাম, লোকটি খুব বড়লোক, এত বড় যে আমার তাঁহার সহিত বন্ধুতা বা আত্মীয়তা হওয়া তো দূরের কথা আলাপ হইবারও বিশেষ সম্ভাবনা নাই! কিন্তু লোকটিকে দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছি না—সে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সহিত আলাপ না হইলেই নয়—এই অবস্থা, যে অবস্থা সাধনপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বর্ণনা করিয়াছেন—

"আপনা অযোগ্য ভাবি মনে জাগে ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ॥"

এই প্রকারে একজন বড়লোককে দেখিয়া মনের যখন এইরূপ অবস্থা হয় তখন আমরা ভাবি আচ্ছা আমার সহিত এমন কোন লোকের আলাপ নাই, যাহার সহিত এই বড়লোকের সহিত বন্ধুতা আছে। এই চিন্তা মনের মধ্যে জাগ্রত হওয়ায় শ্রীকুন্তীদেবী বলিলেন "বাসুদেবায়," বসুদেব তোমার বিশেষ কৃপাপাত্র, তুমি আপনার গুণে তাহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছ, সেই বসুদেব যখন আমার ভাই, তখন তুমি যতই বড় হওনা কেন, আমি তোমাকে ধরিবার পথ পাইয়াছি, তুমি আপনি আসিয়া মানবীয় ভাব ও স্নেহের মধ্যে ধরা দিয়াছ তাই, মানুষ তোমাকে আপনার করিতে পারে। 'বাসুদেব' বলিয়া তাঁহার সহিত সম্পর্ক পাতাইতে পাতাইতে আরও নৈকট্য

লাভ করিলেন, বলিলেন 'দেবকীনন্দনায়'। বসুদেব অপেক্ষা দেবকী অধিক প্রেমবতী, তুমি সেই দেবকীর আনন্দদাতা, তিনি তোমার মাতা। আরও নৈকট্য পাইলেন, বলিলেন 'নন্দগোপকুমারায়'—তোমার যে কৌমার লীলা-মাধুর্য্য তাহার আস্বাদন বসুদেব ও দেবকীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই নন্দগোপই তাহা আস্বাদন করিয়াছেন, অতএব নন্দগোপের মধ্য দিয়া তিনি আরও নৈকট্য উপলব্ধি করিলেন। আমরা পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরই পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক এই শ্লোকটির অর্থ করিতেছি। 'নন্দগোপকুমারায়' বলার পর সাধারণ হিসাবে 'যশোদানন্দনায়' ইহা বলা উচিত ছিল। কিন্তু সে কথা পরবর্ত্তী শ্লোকে ভাল করিয়া বলা হইবে বলিয়া এখানে আর বলা হইল না। তাহার পর বলিলেন 'গোবিন্দায়' এই গোবিন্দ-ভাবের মধ্য দিয়াই ভগবান ভক্তের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। "গাঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি বিন্দসি আকৃষ্য প্রাপ্নোষি" সকলের সকল ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করিয়া যিনি তাহার বিষয়ীভূত হন অথবা ভগবান যে ভাবে এইরূপে প্রকাশিত হন তাঁহার সেই ভাবের নাম গোবিন্দ।

এই প্রকারে শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী ভগবানের গুণের কথা ভাবিতেছেন, কিন্তু তখনও আপন অযোগ্যতা স্মরণ নিবন্ধন যে ক্ষোভ তাহাও মনে হইতেছে। এই কারণে পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন "অহন্তু তেষাং মধ্যে ন গণনীয়া তদপি মন্নেত্রসুখদোসি" আমি ইহাদের কাহারও সহিত তুলনায় নহি, তথাপি তুমি আমার নেত্র ও মনের সুখদ।

তাহা হইলে কুন্তীদেবী বলিতেছেন যে, সাধু ভক্তদিগের জীবনের মধ্য দিয়া ভগবানকে ধরিতে হইবে। পূর্ব্বে আমরা এই ভাগবত শাস্ত্রে গুরুবাদের যাহা ভিত্তি তাহা আলোচনা করিয়াছি—এই গুরুবাদের সহিত অভিন্ন ভাবে এই সাধুসঙ্গও ভক্তি সাধনার একটি প্রয়োজনীয় উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল। গুরুবাদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে (গত বর্ষের ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এস্থলেও ঠিক তাহাই প্রযোজ্য। গুরুবাদে যেমন দেখিয়াছি তদ্দ্বারা মানবের স্বাধীনতা যায় না, এখানেও ঠিক তাহাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে লীলা শাস্ত্রে যে সমস্ত লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে সেগুলি যেন বীজগণিত শাস্ত্রের কষা অঙ্ক (Book-Articles) সেগুলি আয়ত্ত করিলে মানুষ নিজ নিজ জীবনে সর্ব্বদা লীলাময়ের লীলা উপলব্ধি

করিতে পারিবে, এইটুকু উপলব্ধি করাই ভক্তিশাস্ত্র অনুসারে জীবনের পূর্ণ পরিণতি।

কুন্তীদেবী লীলাময়কে এই প্রকারে অন্যান্য ভক্তের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করার পর ধন্য হইলেন ও বলিলেন—

"যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী
কংসেন রুদ্ধাতি চিরং শুচার্পিতা।
বিমোচিতাহহঞ্চ সহাত্মজা বিভো
ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্গণাৎ॥"

এখন শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী দেখিতেছেন "মাতৃতোহপি মযাধিকা তবপ্রীতি (শ্রীধরঃ) তোমার মা যে দেবকী তাঁহার অপেক্ষাও আমার প্রতি তোমার প্রীতি বেশী, কারণ তিনি বহুকাল কারাগারে রুদ্ধা ছিলেন, তুমি একবারই তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছ আর আমাকে মুহুর্মুহু রক্ষা করিয়াছ। তাঁহার পুত্রগুলি কংসের দ্বারা নিহত হইয়াছিল, তাহারা রক্ষা পায় নাই আর আমি পুত্র সহ রক্ষা পাইয়াছি। অতএব শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী অনুভব করিতেছেন যে আমি সকলের অপেক্ষা দীনা, কিন্তু তুমি দীনবন্ধু তোমার কৃপা আমার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক "অহমেব সর্ব্বতোহপ্যতিদীনেতি ময়ি তব দীন-বন্ধুতাদেব দয়া.ন ত্বহং দেবকীব ত্বয়ি প্রেমবতী ভাগ্যবতী বা" শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

লীলার মধ্য দিয়া, ভক্ত সাধুর জীবনে ভগবানের যে লীলা হইয়া যাইতেছে তাহার আলোচনার মধ্য দিয়া আত্মানুশীলনে অগ্রসর হইলে মানবের যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়; যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি খুলিলে প্রত্যেক মানুষই স্পষ্টভাবে অনুভব করে যে ভগবানের কৃপা আমার উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমি যতটুকু পাওয়ার উপযুক্ত এই কৃপা তদপেক্ষা লক্ষকোটিগুণ অধিক সর্ব্বদা পাইতেছি। এটুকু যিনি না প্রত্যক্ষ করিবেন তাঁহার ভক্তি সাধনা মিথ্যা কথা। শ্রীকুন্তী দেবী ভক্তিসাধনার যে পথ বলিলেন এ পথছাড়া ভক্তি সাধনার অন্য পথ বা ক্রম হইতেই পারে না। এই ক্রম সার্ব্বজনীন, সকল ধর্ম্মেরই ভক্তি সাধনায় এই একই ক্রম, ইহা আমরা পরে দেখাইব।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আলোচনা করিলে আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাইব যে প্রত্যেক ভক্তই ভগবানের নিকট আত্মনিবেদনের সময় বলিতেছেন আমার প্রতি যে তোমার কৃপা, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নিজের জীবনে

ভগবানের করুণার এই প্রকাশ প্রত্যেককে বুঝিতে হইবে। আশ্চর্য্য এই যে সকলেই বুঝিবেন আমার উপর করুণা সকলের অপেক্ষা অধিক।

শ্রীশ্রীভীষ্মদেব তাঁহার স্তবের মধ্যে একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নাগপত্নীগণ প্রভৃতি সকলেরই স্তবে এই এককথাই বলা হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন লীলায় এই তত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর রূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রজবালকগণের মণ্ডলার মধ্যে বসিয়া যমুনাতীরে গোপালবেশী ভগবান ভোজন করিতেছেন—শ্রীমদ্ভাগবত তাহা এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন

"কৃষ্ণস্য বিশ্বং পুরুরাজি মণ্ডলৈ
রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু—
শ্ছদা যথাম্ভোরুহ কর্ণিকায়াঃ॥

ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে, কমলকর্ণিকার পত্রসকল যদ্রূপ শোভা পায় সেই প্রকারে অসংখ্য পঙ্‌ক্তি রচনা করিয়া সমীপবর্ত্তী হইয়া বসিল—শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যস্থলে বসিলেন! শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন "অভ্যাননা প্রেম্না সর্ব্বসাম্মুখ্য স্পৃহাবতো ভগবতঃ সত্যসঙ্কল্পতা শক্ত্যোবোদ্গারিতেনাচিন্ত্যবৈভবেন নিষ্পাদিতাং মুখাদ্যঙ্গানাং সর্ব্বদিক্ষু প্রকাশাৎ। কৃষ্ণস্যাভিমুখে ব্যবহিতপঙ্‌ক্তৌ বয়মেব বর্ত্তামহে অন্যেতু ব্যবহিত পঙ্‌ক্তিষু পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চোপবিষ্টা ইতি সর্ব্ব এবাভিমান বন্ত ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করিতেছেন, ভগবানও সত্যসঙ্কল্প তিনি তাঁহার অচিন্ত্যবৈভব প্রকাশ করিয়াছেন, ফলে তাঁহার মুখাদি অঙ্গ এককালে সকল দিকে প্রকাশ হইতেছে। প্রত্যেক বালক ভাবিতেছে যে আমরা এই কয়জনই কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে ও সম্মুখে আছি আর সকলে দূরে, কেহ পৃষ্ঠদেশে, কেহ পশ্চাতে।

এই কথা শ্রীরাসলীলায়ও গোপীমণ্ডলীমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এ সমস্ত কথা পরে আলোচ্য। মোট কথা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণলীলাই সকল রহস্যের সার ও সকল লীলার শিরোমণি, ভক্তসাধকের উচ্চতম অনুভূতি এই লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে এ বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতেই সমস্ত রহস্য ব্যক্ত হইয়াছে।

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন,
যে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন
বিশ্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, শুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি
তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে,
এই রূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণধাম
এইরূপ তাঁর নিত্য ধাম ॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ
তার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছে নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা গোপীগণ মন ॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ
তা সবার বলে হরে মন
পতিব্রতা শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥
চড়িগোপী মনোরথে, মন্মথের মন মথে
নাম ধরে মদন মোহন
জিনি পঞ্চ শরদর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ।
নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ চারণ রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার

যাঁর বেণু ধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার ॥
মুক্তাহার বক পাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি
পীতাম্বর বিজুরী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃত ধার ॥"

উপাসনা

হিন্দু বল, মুসলমান বল, কি খৃষ্টিয়ান বল সভ্য জগতের সকল জাতীয় লোককেই ঈশ্বরের উপাসনা করিতে দেখি! সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেখি "ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত মানবাত্মার মুক্তি নাই।" তবে আমার ন্যায় উপাসনাবিহীন ব্যক্তির গতি কি হবে? আমি যে উপাসনা জানি না। কেমন করিয়া জানিব? ঈশ্বর কিরূপ তাহাই ত জানি না। কৈ কেহ ত আমাকে বলে দেয় না "ঈশ্বর এইরূপ, এইরূপে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়?" কত শাস্ত্র খুঁজিলাম, ফল হইল না; আমার উপাস্যকে পাইলাম না। তাঁহাকে কেহ নির্গুণ কেহ সগুণ, কেহ নিরাকার ও কেহ সাকার বলিয়া থাকে। কিন্তু কৈ আমার অজ্ঞানতান্ধকার ত নষ্ট হইল না, যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই রহিল আলোক আসিল না—দেখিতে পাইলাম না। সৃষ্টির ভিতর খুঁজিতে গেলাম, পরিদৃশ্যমান বিশ্বরাজ্য তন্ন তন্ন করিলাম, কৈ তাঁহাকে ত দেখিতে পাইলাম না। সুধু মনে হইল সুশৃঙ্খল বিরাট বিশ্বরাজ্যের একটী কারণ আছে; বিশ্বের সৃষ্টিনিচয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সংযোগ দেখিয়া মনে হইল একমাত্র প্রস্রবণ হইতে এ সমস্ত আসিয়াছে। কিন্তু সেই একমাত্র কারণ বা প্রস্রবণ কি এবং কিরূপ তাহাতো জানিতে পারিলাম না—সে কারণের ভিতরে কি আছে তাহার পরে কিছু আছে কিনা তাহাতো বুদ্ধির অতীত হইল। অবশ্য বুঝিলাম বিশ্বের একটী কারণ আছে কিন্তু আর এক মহা-সমস্যার ভিতর পড়িলাম। বিশ্বের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম অবিরত সৃষ্টিও লয় হইতেছে। বীজ অঙ্কুরিত হইল; পরমাণুর পর পরমাণু, সেই অঙ্কুরের সহিত সংযুক্ত হইতেছে এইরূপে সংযোগ বিয়োগ হইতে হইতে অঙ্কুর মহাবৃক্ষে পরিণত হইল। পরে সংযোগ বিয়োগের নিকট পরাস্ত হইল—সংযোগ অপেক্ষা বিয়োগ বেশী হইতে লাগিল। এইরূপে আবার

সেই মহাপাদপ যে পরমাণু সেই পরমাণুতে পরিণত হইল, মধ্যে যে সমস্ত হইয়া গেল তাহার যেন কিছুই হয় নাই। সুধু বৃক্ষসম্বন্ধে নহে, তরুলতা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী এবং জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য সকলের সম্বন্ধেই এই এক নিয়ম—অহরহঃ কেবল জন্ম এবং লয়, সুধু মধ্যে কিছুকাল অবস্থিতি।

শিশু গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কাঁদিয়া উঠিল কেন? আমরা তো তাহাকে পাইয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিলাম! শিশু বড় হইতেছে আত্মীয় স্বজন কত সুখ পাইতেছে, কত হাসিতেছে, শিশুও হাসিতে শিখিল, শিশু মানুষ হইল, তাহার নিজের আবার সন্তান হইতে লাগিল, সে হাসিল, হাসিতে লাগিল। ক্রমে তাহার পিতামাতার মৃত্যু হইল সে আবার কাঁদিল, তাহার দুই একটী সন্তান মরিয়া গেল, সে কাঁদিতে লাগিল নিজে মরিবার সময় সে আবার কাঁদিয়া গেল। ক্রন্দনের সহিত যে জীবন আরম্ভ হইয়াছিল ক্রন্দনেই তাহার পরিসমাপ্তি হইল—সুধু মধ্যে ক্ষণকাল হাসির আলোক দেখা দিয়া গেল। সমগ্র বিশ্বে অহরহঃ এই মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দন ধ্বনি শুনা যাইতেছে, কেবল মাঝে মাঝে ক্ষণিক হাসির রোল উঠিয়া সে ক্রন্দন ধ্বনিকে আরও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তুলিতেছে।

যদি তাই হয়, যদি সুধু ক্রন্দনই শুনি, তবে জন্ম হয় কেন? কেনই বা মাঝে কিছু কাল হাসির আলোক দেখা যায়? আবার দেখি জন্মের জন্য, লয় এবং সংযোগের জন্য বিয়োগ হইতেছে। গাছ পালা বড় হইবার জন্য মাটী হইতে রস টানিতেছে এবং পশুপক্ষী লতাপাতাও শস্য ভক্ষণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আবার মানুষ সে সমস্তের দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে সচেতন জগতে নিরন্তর এইরূপ সংঘর্ষ, এই রূপ ভক্ষ্য ভক্ষক সম্বন্ধ চলিতেছে যে নিজের জন্য এত জীবনসংগ্রাম সেই নিজেকে শেষে পরের কাছে বলি দিতে হইতেছে। তবে কেন জন্ম, কেন স্থিতি, কেনই বা লয়?—সবই মহাসমস্যা। তবে কোথায় দয়া, কোথায়ই বা প্রেম? তবে কোথায়ই বা বিশ্বাসভক্তি কোথায়ই বা সুখশান্তি? সকলই মায়া, সকলই এক মহা প্রহেলিকা। তবে কেমন করিয়া আমি বলি হে ঈশ্বর তুমি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া পালন করিতেছে, কত করুণা ও মঙ্গল বিতরণ করিতেছ তোমাকে ধন্যবাদ, তোমাকে নমস্কার।" কেমন করিয়া এ সমস্ত কথা বলিয়া উপাসনা করি আমার মন ত ইহাকে উপাসনা বলিতে চাহে না। তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারিলাম না, তাহা হইলে

আমার উপাসনা করা হইল না। সুধু মনের ভিতর এক মহারহস্য অনুভব করিয়া অবাক হইয়া অচলের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। ঈশ্বরকে বুঝিলাম না, উপাসনা করিতে পারিলাম না, তবু ঈশ্বরের জন্য প্রাণের আবেগ গেল না, আবার হৃদয়ের ব্যাকুলতা কাটিয়া গেল। দেখিলাম উপনিষৎরচয়িতা মহর্ষিও ঈশ্বরকে সম্যক বুঝিতে পারেন নাই, তিনিও প্রথমে ঈশ্বরকে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম" বলিয়া শেষে উপসংহারে আসিয়াছেন "বাচো যত্র নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—অর্থাৎ ঈশ্বর তিনি, যেখান হইতে মন বাক্যের সহিত ফিরিয়া আইসে। ঈশ্বর বাক্য ও মন উভয়েরই অতীত। ঈশ্বরকে মনেও ধারণা করিতে পারা যায় না, বাক্যেও বর্ণনা করা যায় না। সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

এই জন্যই বোধ হয় বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মা বুদ্ধদেব তাঁহার সময় ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জটীল রহস্য সম্বন্ধে নীরব ছিলেন, তাই আজি বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর বলিয়া পরিচিত।

তবে সত্যই কি উপাসনা বলিয়া কিছু নাই? যদি তাহাই হয় তবে উপাসনা কথাটী কিরূপে লোক সমাজে এত প্রতিপত্তি লাভ করিল? আর কেনই বা জনকাদি ঋষিগণ হইতে খ্রীষ্ট মহম্মদ শঙ্কর চৈতন্য প্রভৃতি পূতনামা পুরুষগণ "ঈশ্বর ঈশ্বর" বলিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া যাইতেন? আছে, উপাসনা বলিয়া কিছু নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে উপাসনা সাধারণ কল্পিত উপাসনা নহে—সে উপাসনাও অন্যান্য জটীল রহস্যের ন্যায় এক মহারহস্য। উপাসনা মানুষের ইচ্ছাধীন নহে; সে আপনা হইতে আইসে; সে উপাসনার ভাব কখন আসিবে, উপাসক জানিতে পারে না এবং সকল সময়ে বা সকলের মধ্যেও আসে না। সেই দেবদুর্ল্লভ উপাসনাফুল একদিন অতীত যুগের ঋষিগণের মানসোদ্যানে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তখন তাঁহারা বিশ্বের মোহন ছবি দর্শন করিতে করিতে ভাবে বিভোর ও আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখ হইতে তাঁহাদের অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঋক সকল বহির্গত হইয়াছিল; তাঁহারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন সেগুলি তাঁহাদের অজ্ঞাতপূর্ব্ব, সুতরাং তাঁহারা সেগুলিকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। তাই আমরা বিশ্বাস করি বেদ আপ্তবাক্য, বেদ ব্রহ্ম, বাইবেল কোরাণ ঈশ্বরেরই আদেশাবলী।

তবে আমার উপাসনা করা হল না, বলিয়া শোক করি কেন? উপাসনার

জন্য ব্যাকুলতায় আমার কাজ কি? উপাসনার সময় আসিলে উপাসনা আপনিই আসিবে, যাঁহার উপাসনা তিনি নিজেই করাইবেন। উপাসনা উপদেশ বিদ্রূপ বা প্রশংসার জিনিস নহে। ঈশ্বরতত্ত্বের ন্যায় উপাসনাতত্ত্বও এক মহারহস্য। সেই মহাকবিত্বময়ী উপাসনার সময় আসিলে আমার ন্যায় শত শত মূর্খ রত্নাকরের জিহ্বা হইতে, "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ, যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতং"—রূপ ছন্দোময়ী উপাসনার বাণী অজ্ঞাতসারে আপনা হইতেই নির্গত হইবে।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার।

অন্তঃসলিলা।

প্রবল বাত্যায় ললিতদের নৌকা ডুবিয়া গেল। সে নৌকায় তাহার পিতামাতা এবং দুইটী ভগ্নী ছিল। মাঝিরা বহু কষ্টে ললিত এবং তাহার মাতাকে রক্ষা করিল, কিন্তু পিতা অথবা ভগ্নীদ্বয়ের কোন সন্ধান করিতে পারিল না।

যেখানে নৌকা ডুবিয়াছিল তাহার নিকটেই সুরপুর গ্রাম। সেখানে একজন প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন; তাঁহার নাম অমৃত বাবু। মাঝিরা ললিত এবং তাহার মাতাকে অমৃতবাবুর নিকট লইয়া গেল। অমায়িক, পরোপকারী অমৃতবাবু বহু যত্নে তাহাদিগকে স্থান দিলেন এবং যথোচিত শুশ্রূষার দ্বারা সে যাত্রা তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন।

ললিতদের সাংসারিক অবস্থা বেশই সচ্ছল ছিল কিন্তু তাহাদের এক জ্ঞাতির সহিত মোকর্দ্দমায় তাহার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হন। ললিত যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে তখন তাহাদের জমীদারী দেনার দায়ে নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। ভগ্নমন ব্রাহ্মণ তাই গ্রামের বাস উঠাইয়া গ্রামান্তরে বসবাসের অভিপ্রায়ে নৌকা করিয়া যাইতেছিলেন।

ললিত তাহাদের অবস্থা বিপর্য্যয়ের কথা বিশেষ কিছু জানিতে পারে নাই; ব্রাহ্মণ, পরিবারস্থ কাহাকেও এ দুঃসংবাদ প্রদান করিতে পারেন নাই; কেবলমাত্র স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন কিন্তু অপর কাহাকেও বলিতে দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ললিত কোঁচান কাপড় পরিয়া, গাড়ী করিয়া স্কুল যাইত; চাকরে

টিফিনের ভাল খাবার দিয়া আসিত; সে সমস্তের ব্যতিক্রম দেখিয়া ললিত তাহার স্নেহশীল পিতার নিকট ভৃত্য এবং কোচম্যানের নামে নালিশ করিল। গাড়ীঘোড়া তখন নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—ভৃত্য এবং কোচম্যানকে জবাব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মর্ম্মপীড়িত ব্রাহ্মণ সে সংবাদ একমাত্র পুত্রকে গোপন করিতে পারিলেন না—বলিলেন, দুই এক দিন মধ্যেই আমরা অন্যত্র যাইব; এ কয়দিন তোমার আর স্কুলে গিয়া কাজ নাই, ঘরে আমার নিকট পড়িও।' তাহার পর দিনই ব্রাহ্মণ জন্মের মত পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করিয়া কোন অনিশ্চিত বাসস্থানের আশায় সপরিবারে রওনা হইলেন। ইচ্ছা—এমন দেশে গিয়া বাস করিবেন যেখানে তাঁহার পরিচয় কেহ জানে না এবং যেখানে চাকরী স্বীকার করিতে কোন লজ্জাবোধ হইবে না। কিন্তু পথিমধ্যে ব্রাহ্মণের সকল লজ্জার অবসান হইয়া গেল।

(২)

সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াই ললিতের মাতা, স্বামী এবং কন্যাদ্বয়ের নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ২।১ দিন মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে আশ্রয়দাতার পরিজনবর্গের মধ্যে কেহ কেহ তাহা পছন্দ করিতেছে না। পিসীঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন "পরের বাড়ীতে মরাকান্না কেঁদে তাদের সুদ্ধ অমঙ্গল করা কেন? কাঁদ্‌তে হয়ত নিজের বাড়ী যান।" ললিতের মাতা সেইদিন হইতে নিস্তব্ধ হইলেন, আর কেহ তাঁহার উচ্চ রোদনধ্বনি শুনিতে পাইল না; গভীর নিশীথে সকলে সুপ্ত হইলে এই আশ্রয়হীনা বিধবা নীরবে কাঁদিয়া শয্যা ভিজাইতেন। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার উপায় নাই। বিবধা শেষে আত্মহত্যা করা স্থির করিলেন। কিন্তু পরক্ষণই ভাবিলেন "ললিতের কি হইবে?" আত্মহত্যার চিন্তা মন হইতে দূর হইল। তিনি সকল সহনাতীত ক্লেশ সহ্য করিবার নিমিত্ত মনকে প্রস্তুত করিলেন।

বালক ললিত ঠিক বুঝিত না তাহাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দিন কয়েক কাঁদিয়া কাটিয়া খেলায় উন্মত্ত হইয়া সকল ক্লেশ ভুলিয়া গেল এবং মাতার উপর পূর্ব্ববৎ দাবী করিতে লাগিল। মা! আজ আমায় একটা ঘোড়াওয়ালা ট্রাইসিকেল কিনিয়া দিতে হইবে। মা! আজ একটা খেল্‌না কিনিয়া দিতে হইবে, বলিয়া নিত্যনূতন আব্দারের সৃষ্টি করিতে লাগিল। মাতা চুপে চুপে তাহাকে বলিলেন কাল্ কিনে দেব'।

ললিত কষ্টকষ্টে সে দিনটা থামিয়া পরদিন আবার তাহার আবদার ধরিল। মাতা পুনরায় কালিকার ওজরে তাহাকে নিরস্ত করিলেন। শেষে এক দিন ললিত তাহার মাতাকে বিষম ধরিয়া বসিল—"রোজ রোজ কাল দিব বলিলে শুনিব না, আজ দিতেই হইবে।" ঐশ্বর্য্যপালিত পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া এবং নিজেকে তাহার প্রার্থনা-পূরণে অক্ষম জানিয়া মাতা কাঁদিয়া ফেলিলেন। মাতাকে রোদন করিতে দেখিয়া ললিত জিজ্ঞাসা করিল "মা! তুমি কাঁদিলে কেন?" মাতা তাহার উত্তর কিছু বলিতে না পারিয়া পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন—অশ্রুজল দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইয়া ললিতের মাথার উপর পড়িল। অজ্ঞান বালক কি জানি কোন্ জ্ঞানে বলিয়া উঠিল "না মা, আমার ট্রাইসিকেলে, খেলানায় কাজ নাই।" কিন্তু পুত্রের এই ত্যাগ স্বীকারে মাতার প্রবাহমান অশ্রু বাড়িল বই কমিল না। অমৃতবাবু অন্তঃপুরে প্রবেশকালীন অন্তরাল হইতে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন—দয়ার অবতার, তিনিও চক্ষু শুষ্ক রাখিতে পারিলেন না।

২।৩ দিন পরেই একজন ভৃত্য একটী ট্রাইসিকেল ও কয়েকটী ভাল ভাল খেলানা ললিতের হস্তে দিয়া আসিল। আনন্দে উন্মত্ত বালকের, কে সে সমস্ত দিল, তাহা জানিবার অবকাশ রহিল না। সে দোতালার প্রশস্ত বারাণ্ডার উপরেই ট্রাইসিকেলটীতে চড়িয়া বসিল। বার কতক এধার ওধার করিয়া শেষে খেলানাগুলির প্রতি মনোযোগ করিল। মোটরকারটীতে এমন কসিয়া দম দিল যে একবারও না চলিতে চলিতেই তাহার স্প্রিং কাটিয়া গেল। কাটিয়া যাইবার ভয়ে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াগুলির দম এত কম দিল যে তাহা আদৌ চলিল না। যখন সে এই সমস্ত করিতেছে এমন সময় তাহার মাতা অমৃতবাবুর এক কন্যা পঞ্চমবর্ষীয়া সুধার হাত ধরিয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পুত্রের প্রার্থিত এই সমস্ত আসবাব তাহার হস্তগত দেখিয়া পুত্রকে আলাদীনের প্রদীপটার অধিকারী জ্ঞানে বিস্মিত হইতেছিলেন। সুধা কিন্তু চট্ করিয়া ট্রাইসিকেলটীতে চড়িয়া বসিল, যেন তাহা বেওয়ারীশ। ওয়ারীশ, এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া দখল বজায় রাখিবার মানসে সশব্দে সুধার গণ্ডে এক বিশেষ চপটাঘাত করিল। চপেটাঘাতের উপক্রম দেখিয়া তাহার মাতা হাঁ হাঁ শব্দে তাহাকে ধরিতে আসিলেন কিন্তু ক্ষিপ্রকারী পুত্র ততক্ষণ কাজ সারিয়া ফেলিয়াছে। অভিমানিনী ঠোঁট ফুলাইয়া চীৎ-

কার শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। অপ্রত্যাশিত আঘাতে প্রথমে চীৎকার করিয়াই সে শব্দ ক্রমে বিলীন হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে পুনরায় শব্দ উঠিল এবং তখন ঘন ঘন চলিতে লাগিল। ক্রন্দন শব্দে বাটীর সকলে ত্রস্তে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পিসীমাতা ব্যাপার জানিতে চাহিলেন, অপরাধী পুত্রের অপরাধ বর্ণনা করিতে মাতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কথাটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দশটা ঢোক গিলিয়া, খুব নরমভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। পুত্র তখন বিজয় গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া খেলানায় মনোনিবেশ করিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে রোরুদ্যমানা সুধার প্রতি গর্ব্ব-ভরে কটাক্ষ করিতেছে; ভাব—"কেমন? আর কখন এমন করিবি?" কথাটা নরমভাবে বলিলেও মাতাকে সত্য কথা বলিতে হইল। পিসীমাতা তখন গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন "এমন ছেলে মরে না, যমের বাড়ী যায় না, যার খায় তার পাণ বেচে—সুধার গায়ে হাত! যে বাছা আমার জীবনে মার খায় নাই তার গায়ে হাত, ভাত দেবে না পিণ্ডি দেবে?" পুত্রের এরূপ স্থানে গমন, এরূপ আহার্য্যের ব্যবস্থা, মাতা দাঁড়াইয়া শুনিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে গোপনে রোদনের জন্য প্রস্থান করিলেন। তাহাতেও পিসীমাতার নিকট নিস্তার নাই। তিনি উদ্দেশেই বলিতে লাগি-লেন—"ভিখারীর ছেলের এত অহঙ্কার, হ'বা মাত্র নুন দিতে পারেন নাই; আজই ওঁরা আপনার পথ দেখুন; খাচ্ছিস্ দাচ্ছিস্ আছিস বাপু, তাই না হয় বেশ চুপ চাপ ক'রে থাক, ওমা তা নয়, যার খাবে তাকেই মার্‌বে। সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। কি জাত তার ঠিক নাই, কেমন চরিত্তির তা জানা নাই, দাদার যেমন কাজ, এসে বল্লে আর বাড়ীতে ঠাঁই দিলে!"

পিসীমাতা শেষে ললিতকে লইয়া পড়িলেন। "ওরে ও হতভাগা, হাড়হাবাতে ড্যাকরা ছোঁড়া, ওরে ও অলপ্পেয়ে! বলি ও খেলানা কি, তোর বাবা এনে দিয়েছে?"

ললিত কাপড় চিবাইতে চিবাইতে সংক্ষেপে উত্তর করিল "না, তিনুদাদা দিয়েছে"

পিসি। তিনুদাদা—তিনুদাদা তোর বাবার চাকর নাকি?

অকস্মাৎ পিসীঠাকরুনের মনে হইল তিনু এ সমস্ত পাইল কোথায়? বোধ হয় দাদা সুধার জন্য ঐ সমস্ত কিনিয়া দিয়াছেন তিনু ভ্রমবশতঃ ললিতের হাতে দিয়াছে; অথবা সুধার সাক্ষাৎ না পাইয়া ললিতের নিকট এই

সমস্ত গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছে; হ্যাংলা ছেলে তাহার দ্বারা নিজের সন্তোষ সাধন করিতেছে। অমনি তিনুকে ডাক পড়িল কিন্তু সে ভাগ্যক্রমে তখন বাটীতে ছিল না।

এমন সময় অমৃতবাবু গোলযোগ শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার জানিতে চাহিলেন। ভগ্নীর মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন "ললিত বেশ করেছে, ও যদি সুধার একটা হাত ভেঙ্গে দিত তবে আমি আরও একটু খুসী হতুম।" পিসিঠাকুরাণীকে মুখথাবড়া দিবার জন্যই তিনি একথা বলিলেন নতুবা তিনি বিলক্ষণই জানিতেন যে বালিকা সুধার পক্ষে অপরের ট্রাইসিকেল চড়িয়া বসাটা এমন কিছু গুরুতর অপরাধ নহে।

পিসিঠাকুরাণী ত অবাক্ হইয়া গালে হাত দিলেন; একমাত্র মেয়ে, শিবরাত্তির সল্‌তে, তাহাকে যে প্রহার করিয়াছে সে তিরস্কারের পাত্র তা সুধার যত দোষই থাক ইহাই পিসিঠাকুরাণীর ধারণা।

প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তাঁহার অন্যায় আদরে মাতৃহীনা সুধা নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। সুধার দাবীর অন্ত ছিল না, বেলা বারোটার সময় হয়ত বলিয়া বসিত "পাঁটার ঝোল নহিলে ভাত খাইব না" বৃক্ষশিরে হনুমান দেখিয়া ঝোঁক ধরিত—"উহা আমার নিকট এখুনি বাঁধিয়া আনিয়া দাও" ইত্যাদি। তাহার বরাতগুলি মানব ক্ষমতার আয়ত্তের মধ্যে কিনা তাহা তো বুঝিতই না, অপর কেহ বুঝাইতে গেলেও কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইত। একমাত্র অমৃতবাবু ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করিত না। যে পিসিমাতার আদরে বর্দ্ধিত সেই পিসিমাতাকেই অধিকাংশ সময়ে তাঁহার প্রদত্ত আদরের ফলভোগ করিতে হইত—তাহা শারীরিক মানসিক উভয়েই বিভক্ত। ঝোঁক সাম্‌লাইতে পিসিমাতার প্রাণান্ত হইত। তত্রাচ এই স্নেহশালিনী অভিভাবিকা মাতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রীটীকে আদর দিতে ক্ষান্ত হইতেন না। নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ বিধবার সংসারে সুধা ব্যতীত আর অবলম্বন ছিল না।

পিসিমাতা। . . . . তে পাই। সুধার খেল্‌না সুধা লইবে, তাহাতে ও ছোঁড়া সুধাকে মারিবে কেন?

অমৃতবাবু। খেলানা সুধার নহে, খেলানা ললিতেরই।

পিসি। ললিত খেলানা কোথায় পাইবে?

অমৃত। যেখানেই পা'ক খেলানা তাহারই। সে সুধাকে অন্যায় প্রহার করে নাই।

পিসি। অন্যায় প্রহার করে নাই! ললিতের উপর তোমার এত টান কেন? সে তোমার কে?

অমৃত। আমার পুত্র। শুনিয়া রাখ, ললিতকে আমি জামাতা করিব। এখন হইতে সেই অনুযায়ী তাহাকে যত্ন করিবে।

পিসি। আমার দায় পড়ে গেছে ও হাবাতে ছেলেকে যত্ন করতে। তুমি কর আমার দ্বারা ও সব হবে টবে না।

অমৃত। বেশ তাই করব। এস বাবা আমরা বাহিরে যাই।

অমৃতবাবু ললিতের হাত ধরিলেন। ললিত অমৃতবাবুর উপর মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিল "তুমি আমার এই ট্রাইসিকেলটা কাঁধে করিয়া লইয়া চল, খেলানাগুলো আমি আঁচলে লইতেছি"।

(৩)

কলিকাতায় একটী বাসা ভাড়া করিয়া, চাকর ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া অমৃতবাবু ললিতের পাঠের ব্যবস্থা করিলেন। বুদ্ধিমান বালক সম্ভবমত সত্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইল। শেষে ওকালতী পাস করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতে মনস্থ করিল। তখন অমৃত-বাবু বলিলেন "তোমাকে ওকালতী করিতে হইবে না। তুমি আমার বিষয়কর্ম্ম দেখ।" সুতরাং ললিত অমৃতবাবুর বিষয়কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণে মনো-নিবেশ করিল।

অমৃতবাবু সুধার একাদশবর্ষে ললিতের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। কিন্তু সেই চপেটাঘাতের ব্যাপারের পর হইতে সুধা ললিতকে মোটেই দেখিতে পারিত না। বিশেষতঃ পিসিমাতা ললিতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সর্ব্বদাই সুধাকে উত্তেজিত করিতেন। অমৃতবাবু যে পরিমাণে ললিতকে স্নেহ করিতে লাগিলেন, পিসিমাতাও ঠিক সেই পরিমাণে তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। শেষে যখন অমৃতবাবু তাঁহার স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ একমাত্র কন্যাকে ললিতের হস্তে সম্প্রদান করিলেন, তখন ক্রুদ্ধা পিসিমাতা তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া এক দূরসম্পর্কীয়া ননদের বাটীতে আশ্রয় লই-লেন। অমৃতবাবু অপযশের ভয়ে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন কিন্তু কোন ক্রমেই, তাঁহাকে, ফিরাইতে সক্ষম

হইলেন না। এ ঘটনা যদি বিবাহের পূর্ব্বে হইত তবে বিবাহ স্থগিত করিয়া তাঁহার ক্রোধ উপশম করা সম্ভবপর ছিল কিন্তু এখন আর উপায়ান্তর কি ?

স্নেহশালিনী পিসিমাতার প্রতি কর্ত্তব্যবোধে সুধা নিজের এবং পিসিমাতার হইয়া ললিতের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। ললিত একগ্লাস জল চাহিলে বলিত "আমার দায় পড়ে নাই, যার ইচ্ছা হ'বে গড়িয়ে খা'বে।" সকাল সকাল ভাত চাহিলে বলিত "কে তোমার রাধুনী আছে যে বাবুর জন্যে তিন সকাল রেঁধে দেবে ?" ইত্যাদি।

কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাব আসিয়া সুধাকে আশ্রয় করিয়াছে সে নিজেই তাহা বোঝে না। ললিত তাহার ঝগড়া করিবার পাত্র, তাহার সহিত ঝগড়া করিতেই হইবে। বয়স যত বাড়িতে লাগিল এই ঝগড়া করার প্রবৃত্তিটাও ততই বাড়িতে লাগিল, শেষ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে যে দিন সে ললিতের সহিত ঝগড়া করিবার বা তাহার অবাধ্যতাচরণের কোন সুবিধা না পায় সে দিনটা যেন তার বিফল হইয়া যায়।

সুধার এই অবাধ্যতাচরণের অন্তরতমস্থলে, যে একটা আনন্দ ছিল—এবং ললিতের অবাধ্যতাচরণ করা অপেক্ষা তাহার জীবনে অপর কোন প্রিয়তর কার্য্য ছিল না—একদিন তাহার অবাধ্যতাচরণ করিতে পারিলে প্রয়োজন হইলে তাহার বিনিময়ে সুধা যে তাহার সমস্ত জগৎ অনায়াসে দিতে পারিত, এ রহস্যটুকু কিন্তু ললিত বুঝিত না।

প্রথম প্রথম এ সমস্ত ললিতের বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিত কিন্তু অসহ্য হইলেও কখনও সুধাকে রূঢ় প্রত্যুত্তর প্রদান করে নাই।

বাল্যের কোপনস্বভাব বালক কেমন করিয়া যে এত শান্ত প্রকৃতি ধারণ করিল তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। ললিত তাহার মাতার সঙ্কোচপূর্ণ ব্যবহার, পিসীমাতার রূঢ় আচরণ দেখিয়া জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বুঝিয়াছিল যে তাহার আব্দার নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা হইতেছে। এই ভাব মনে প্রবেশ করিবামাত্র সে ক্রমে ক্রমে শান্ত হইয়া পড়িল।

উত্তরে, প্রত্যুত্তর না পাইয়া কলহে সুধার উৎসাহ থাকিত না, বিশেষতঃ ললিতের একান্ত নিরীহ ব্যবহার, সুধার সকল অত্যাচার মাথা পাতিয়া লওয়া প্রভৃতি, অনেক সময় সুধার নারীহৃদয়ে আঘাত দিত এবং ললিতের পায়ে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিত। কিন্তু কার্য্যে কোন দিন হইয়া

উঠিল না। বাপরে! সুধা কেমন করিয়া নিজমুখে বলিবে "ওগো! দোষ যে সবই আমার, তুমিত মূর্ত্তিমান সহ্য" ললিত যখন কাতর নয়নে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া তাহারই প্রদত্ত অপমান, তিরস্কার সহ্য করিত তখন সুধার নারীহৃদয় কাঁদিয়া উঠিত এবং তাহার কলহের মধ্যে আন্তরিক উত্তাপ অনেক কমিয়া যাইত। সে মনে মনে ভাবিত "ইহার অপরাধ কি? কি দোষে আমি ইহাকে এমন জ্বালাতন করি?" কিন্তু স্নেহশালিনী পিসিমাতা, ললিতের জন্যই দূরপ্রস্থিত বলিয়া, এবং ললিতের প্রতি তাঁহার বিরাগ স্মরণ করিয়া, সে একদিনের জন্যও কলহে বিশ্রাম দেয় নাই। শুধু তাই নয় ললিত যে কার্য্য করিতে নিষেধ করিবে তাহাকে সে কার্য্য সর্ব্বাগ্রে করিতেই হইবে। এমনি করিয়া সুধা অন্তরে বাহিরে বিভিন্ন হইয়া কার্য্যতঃ ললিতের জীবন তিক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। সুধা যখন একান্ত আগ্রহের সহিত অন্য চিন্তা বিরহিতা হইয়া ললিতের সহিত এই কলহে প্রবৃত্ত ছিল তখন তাহার চারিদিকে অলস প্রতিবেশীমণ্ডলী তাহাদের কাল কাটাইবার জন্য তাহার সম্বন্ধে যে সমস্ত কাল্পনিক ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া সাধারণের আলোচনা-ক্ষেত্রে বীজের মত তাহা বপন করিয়া যাইতেছিল—সেই সমস্ত বীজের ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিবার তাহার অবসর ছিল না। আর এককথা তাহার কৃত কার্য্যের জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই সুতরাং তাহাদের ক্ষুদ্র জগতের বাহিরে যে একটা বড় জগৎ আছে এবং সেই জগতে যে তাহার অনুরূপ ফল ফলিবে ইহা সুধা স্বপ্নেও মনে করে নাই।

ব্যাপারটা যখন ললিতের গোচর হইল তখন সে বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। এমন ভাবে তাহা ললিতের নিকট আসিল—যে তাহার অন্তরাত্মার বিশ্বাসে প্রবৃত্তি না থাকিলেও সে বিশ্বাস করিল।

ললিত অনেক সহিয়াছিল কিন্তু আর সহিতে পারিল না! স্ত্রীর প্রতিকূলাচরণজনিত অপমানের সহিত কলঙ্ক সংবাদ মিশিয়া কত কথাই মনে পড়িয়া গেল—তাঁহার জননী তখন স্বর্গগতা, তাঁহার কথা মনে পড়িল—শৈশবের ইতিহাস জননীর নিকট শুনিয়াছিল—ভাবিল সেই নৌকাডুবিতে মৃত্যু হওয়াই তাহার বিধিলিপি ছিল, যেন এক দুর্দ্দান্ত অশরীরি দানব তাহাকে উপহাস করিয়া যাতনা দিবার জন্য, সে দিন তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল।

যথাসময়ে আহারাদি করিয়া সুধা শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু আজ তাহার আহারে প্রবৃত্তি হয় নাই। স্বামীর আজ্ঞার প্রতিকূলতাচরণ করাই তাহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল—একবার সুধার মনে হইল স্বামীকে কিছু জিজ্ঞাসা করে কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিল না। অন্য লজ্জা নহে, কখনও সে সাধিয়া ললিতকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। আজ কি দায়ে পড়িয়া সাধিয়া জিজ্ঞাসা করিবে? সে নীরবে অন্যদিনের মত তাহার শয্যার নির্দ্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিল।

কক্ষকোণে একটী কেরোসিন আলোক জ্বলিতেছিল, নীল ফানুসে আলোকের উগ্রতা ছিল না। কেবলমাত্র একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিস্তৃত গৃহ আলোকিত করিতেছিল।

ঘুমঘোরে কি মৃত্যুঘোরে, ললিত পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে তাহার অলস হস্ত পাশবালিশ অতিক্রম করিয়া সুধার গায়ে আসিয়া পড়িল। অন্য দিনের মত আজ কিন্তু তাহা সরাইয়া দিবার উদ্যম সুধার ছিল না। ললিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "সুধা ঘুমাইয়াছ কি?' সুধার তখন চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতেছিল। কিন্তু আজ ললিতের সেই কাতরতা মাখান ধীর স্বর তাহার কর্ণে বীণার ঝঙ্কারের মত শুনাইল—অশ্রুপ্রবাহ আরও বর্দ্ধিত হইল। ললিত আবার জিজ্ঞাসা করিল "সুধা কি ঘুমাইলে?" সুধা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিল "কেন?" এই "কেন" আজ ললিতের কর্ণে বড় মধুর ঠেকিল। কারণ আজ তাহাতে ক্রোধের ঝঙ্কার নাই, কলহের আভাস নাই আজ তাহা অনুতাপদীর্ণ, প্রণয়পূর্ণ প্রেমসম্ভাষণের রূপান্তর মাত্র। ঐ "কেন"র মধ্যে ক্ষমাপ্রার্থীর একটা অস্পষ্ট ব্যাকুলতাও বুঝি বুঝা যায়। ধীরে ধীরে ললিত কহিল "একবার এদিকে ফিরিবে কি? আমার কয়েকটী কথা বলিবার আছে।" জীবনে এই প্রথম সুধা ললিতের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিল—সুধা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে আমাকে মর্ম্মপীড়িত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে? থাক্ সব কথা বলিতে আমার সময়ে কুলাইবে না। সুধা! আমি চলিয়া যাইতেছি—

ললিতের কথার জড়তার ভাবে, সুধার মনে সন্দেহ হইল বুঝিবা ললিত কোন বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করিয়াছে। ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তাহার সেই সমস্ত অনর্থক অভিমান, অনর্থক কটুক্তির ফলে আজ

কি তবে সে পতিপ্রাণহন্ত্রী হইতে চলিয়াছে? সে সুধার কি সময়? সুধা দাম্ভিকা, কর্কশভাষিণী, অভিমানিনী, মুখরা, সুধা আজ এমন সময়ে বলিবার কথা খুঁজিয়া পাইল না, সুধু বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। ললিত সে ভাব লক্ষ্য করিল। তাহার এই চাঞ্চল্যের মধ্যে তাহার মুখ ফুটিয়া ক্ষমা প্রার্থনার অক্ষমতা বুঝিতে পারিল। ললিত বহুকষ্টে তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল "সুধা", সুধা উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ললিত শেষ একটা চুম্বনের জন্য মুখ উঠাইল কিন্তু পারিল না পড়িয়া গেল। সুধা তাহা বুঝিতে পারিল, স্বামীর সেই মৃত্যুছায়া সমাকীর্ণ মুখে তাহার মুখটী মিলাইয়া দিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু হায়! তখনও সেই দারুণ, কি বলিব? লজ্জা না স্বভাব না অনুতাপ আসিয়া বাধা দিল। সেই অন্তিম শয্যাশায়ীর অন্তিম প্রার্থনা পূরণ করিতে গিয়াও পারিয়া উঠিল না। শুধু অশ্রুধারায় শয্যা ভাসিতে লাগিল। উপায় বিধান করিবার জন্য চীৎকার করিয়া তাহার পিতাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু তাহাও পারিয়া উঠিল না।

ললিতের গলায় ঘড় ঘড় শব্দ উঠিয়া শেষ শ্বাস বহির্গত হইয়া গেল। তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও সুধা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিল না।

পিসিমাতা আসিয়া সুধাকে সান্ত্বনা দিলেন, সুধা কেবলমাত্র তাহার মুখের দিকে একবার ঘৃণাভরে তাকাইয়া মুখ নামাইল। পাড়াপ্রতিবাসী আসিয়া চীৎকারে অট্টালিকা বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু সুধা ফল্গুর জলভারের ন্যায় অন্তরে অন্তঃসলিলা শোকভার বহন করিয়া অশ্রুশূন্যনেত্রে চাহিয়া রহিল। আজ তাহার শোক বুঝি রোদনেরও অতীত।

শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।
লাভপুর।

অন্তিমে।

ভুলেও ত কভু
তব কথা মনে ভাবিনি,
ছেলেবেলা হ'তে
তোমারে ডাকিতে শিখিনি।

এ জীবনে নাথ
মনে ভেবে কভু দেখিনি,
কখনত' প্রভু
তোমারে কখনও ডাকিনি।

তোমার অপার
করুণার কথা
আঁধার হৃদয়ে
আলোক দেখাতে

অজ্ঞান, অবোধ হৃদয় আমার
তোমারে ডাকিতে চাহেনি,
তুমিত' তথাপি আমারে ভুলিয়া
কখন' থাকিতে পারনি।
মোহের বশেতে তোমারে ভুলিয়ে
যখনি কুপথে গিয়েছি,
হৃদি থেকে তুমি করেছত' মানা
কভু না সে কথা শুনেছি।
এ অন্তিমে প্রভু অতীতের স্মৃতি
একে একে মনে জাগিছে;
লাজে, ভয়ে নাথ! হ'য়েছি কাতর
দুখে বুক মম ফাটিছে।
মরণের ছায়া ঘেরি এবে মোরে
দিতেছে দারুণ বেদনা,
তাইতে আজিকে অনুতাপ মোরে
দিতেছে অশেষ যাতনা।

এবে মনে হয় সময় থাকিতে
কেন বা তোমারে বুঝিনি;
সময় থাকিতে কেন বা না আমি
তোমারে ডাকিতে শিখিনি।
দারাসুত তরে কতই ভেবেছি
কতই কাতর হয়েছি,
অসার সংসারে নিত্য সুখ লাগি
কতই না আমি খেটেছি।
এত সাধনার একটুকু যদি
করিতাম তোমা লাগিয়া,
মরিতাম আজি তব নাম ল'য়ে
শ্রীপদে সকলি সঁপিয়া।
বুক ফেটে যায়, এসো দয়াময়,
ব'স এসে হৃদিপরে,
ক'রনাক' ঘৃণা অধম পাপীরে
লওকোলে ক্ষমি মোরে।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়।

বর্ষ বৃদ্ধি।

কালচক্রের আবর্ত্তনে আর একটি বৎসর অতীত সাগরে বিলীন হইয়া গেল। কালচক্রের কি মহিমা! ইহা সতত শকটচক্রের ন্যায় ঘূর্ণামান হইতেছে। কালের সেই অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান চক্রের বশবর্ত্তী হইয়া এবং বিশ্বনিয়ন্তার মানব-জ্ঞানাতীত দুজ্ঞেয় মহিমায় এই একটি বর্ষকাল দেখিতে দেখিতে অতীতের অনন্ত কবলে লীন হইয়া গেল। এই এক বৎসরে পৃথিবীর কত স্থানে কত ঘটনাই ঘটিয়া গেল এবং কত লোকের কত যে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? কাল অনন্তশক্তি—কালের নিকট কাহারও আধিপত্য নাই; কাল নিজ শক্তিতে অপ্রতিহত ভাবে অতীত হইতেছে ইহার গতি রোধ করে, কাহার সাধ্য! বড় সুখের বিষয় এক্ষণে সকল দেশের

অধিবাসীরাই যেন বুঝিতে পারিয়াছে যে এত দিন তাঁহারা যেরূপ আলস্যে ও ঘুমঘোরে কাল কাটাইতে ছিলেন, অতঃপর সেরূপ করিলে চলিবে না। পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র সমূহ—ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান মহোৎসাহে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এ সময় যিনি নিষ্ক্রিয় হইয়া সময় অতিবাহন করিবেন, তাঁহার অবনতির পথ খোলা থাকিবে তাই এসিয়ায়ও মহাজাগরণ আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের এই হিন্দুস্থানও এই নবজীবনের তরঙ্গে প্লাবিত হইয়াছে ভারতের সকল প্রদেশেই নবজীবন সঞ্চারের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সকল প্রদেশের অধিবাসীই যেন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অলস হইয়া থাকিলে আর চলিবে না; আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে জড়তা পরিহার পূর্ব্বক অন্যান্য দেশের ন্যায় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এজন্য দেশের শিল্প বাণিজ্যের পথ সুপ্রসর করিতে হইবে ইহা সকলে বুঝিয়াছেন। তাই আমরা ভারতের সকল প্রদেশেই সজীবতার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি।

গত বৎসরে যে সকল লক্ষণ আমরা সামান্য অঙ্কুরের আকারে দর্শন করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান নববর্ষে তাহা পরিণত ও সম্পূর্ণ ভাবে দর্শন করিব বলিয়া আমাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতেছে। আমাদের এই ভারতের উন্নতির চেষ্টা যাহাতে এই নববর্ষে আরও প্রবল হয়, তাহার জন্য আমাদিগকে সাধ্যানুসারে যত্ন ও উদ্যোগ করিতে হইবে।

আমরা কার্য্যক্ষম হইয়াছি বলিলেই আমাদের কর্ম্মের যোগ্যতা প্রকাশ হইবে না। কার্য্যতঃ আমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে হইবে। যাঁহারা জন্মভূমির সুসন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই শুভ সুযোগে অগ্রসর হউন। যাহাতে নষ্ট প্রায় পল্লীগ্রামগুলি রক্ষা পায়, দেশের কৃষক ও শিল্পীরা দুইবেলা দুই মুষ্টি অন্ন ভোজন করিতে পায়, দেশের লোকে তৃষ্ণার সময়ে এক গণ্ডূষ নির্ম্মল জল পান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন, লাট সভার 'মাননীয়" হইয়া বক্তৃতা করিলেই দেশের কল্যাণ হইবে না। ভারত উদ্ধারের জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন অথচ নিজ বাসগ্রামের প্রাচীন পুষ্করিণী গুলির পঙ্কোদ্ধার করিতে পারেন না এরূপ স্বদেশানুরাগী আমরা চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি। তাঁহাদের দ্বারা দেশের অতি সামান্য উপকারই হইয়া থাকে সেই সকল বাক্যবীরের অপেক্ষা আমরা প্রকৃত কর্ম্মবীরের সংখ্যা

বাহুল্য দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। নব বর্ষে আমরা অনেক দেখিবার আশা করি, আমাদের সে আশা কি ফলবতী হইবে না ?

বৎসর গুলি যেরূপ বার মাস, ষড় ঋতু লইয়া আগমন করে ও মানবের এক বৎসর পরামায়ু হরণ করিয়া চলিয়া যায়, বর্ত্তমান বৎসরও তাহাই করিবে। কিন্তু আমরা সেরূপ ভাবে যাইতে দিব না। যাহাতে এই বর্ষ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকে, আমাদের উন্নতি পথে এই নব বর্ষ যাহাতে চিরকাল আলোক স্তম্ভ বলিয়া পরিগণিত হয়, আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। দেশের মঙ্গল উদ্দেশ্যে যে সকল বৈধ কার্য্যে লোক প্রবৃত্ত হইতে পারে, আমাদিগকে সেই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমরা শিল্প, বাণিজ্য, লোকশিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি দেশহিতকর সকল প্রকার কার্য্যেই যাহাতে উন্নতি ও সফলতা লাভ করিতে পারি তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। কাল সাগরের তীরে বসিয়া উর্ম্মিমালা গণনা করিলে চলিবে না, পণ্যসম্ভারপূর্ণ অর্ণবপোত সাগর জলে ভাসাইয়া আমাদিগকে বাণিজ্যে যাইতে হইবে। আমাদের অনেক কর্ত্তব্য বাকি আছে, নববর্ষে যাহাতে সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি তাহার জন্য সকলকেই বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। দেশলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে আমরা কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হইব।

হে বিশ্বপতে ! আপনার আশ্রয়ে এই বিশ্বচক্র নিরন্তর ঘুর্ণিত ও উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া আপনার শুভাভিপ্রায় সকল সম্পাদন করিতেছে। আপনি সাক্ষী স্বরূপে নিয়ন্তারূপে আবহমানকাল স্বাভিপ্রেত শুভোৎপাদনে স্থিত নিশ্চিত রহিয়াছেন। আপনি আমাদিগের পরম পিতা, আমাদের হৃদয় মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করুন।

এক্ষণে বৃহস্পতি প্রভৃতি সুধীবর্গ সকল বিষয়ের প্রারম্ভে যাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদিগের প্রারব্ধ কার্য্যে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করিয়া থাকেন, আমরাও সেই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন সিদ্ধিদাতা গণপতি দেবকে নমস্কার করতঃ নববর্ষে নব-অনুরাগভরে নীরব উৎসাহের সহিত মঙ্গলময় শ্রীভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া পুনরায় এই নব কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম ! এখন তিনিই আমাদের মঙ্গল করুন, তিনিই আমাদিগকে কর্ত্তব্য পথে পরিচালিত করুন, তিনিই আমাদিগের সহায় হউন, তাঁহার শ্রীচরণে এই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। আমরা এই নববর্ষকে বহুসমাদরে আশাপূর্ণ-হৃদয়ে গ্রহণ করিতেছি।

যাহা হউক, দয়াময়ের এমনই বিচিত্রলীলা যে, বেদপ্রসবিনী বিদ্যা-দেবীর সাহিত্য কুসুম-কাননের একটী সৌগন্ধযুক্ত সুন্দর প্রসূন এই আমা-দিগকে দান করিয়াছেন তাই, আজ আমরা তাঁহার অজ্ঞেয়, অননুভূত শক্তি-প্রভাবে পরিচালিত হইয়া, সেই বেদমাতা ব্রহ্মাত্মজার অর্চ্চনা করিতে, তাহার সেই সাহিত্য আরামের সুপবিত্র প্রসূননিচয় আহরণ করিয়া পবিত্র মালিকা গ্রথিত করতঃ তাঁহারই চরণাম্বুজে অর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। ভরসা করি সারদার সুপ্রসাদে সাহিত্য সেবিগণের সম্যক সহায়তায় এবং সাধুমণ্ডলীর সদুপদেশে আমাদের আদরের "বীরভূমি" দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুধীবৃন্দের হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতে সম্যক সমর্থ হইবে।

অতএব আমরা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই নববর্ষারম্ভে মঙ্গলানুষ্ঠান কর্ত্তব্য বিষয়ে 'বীরভূমির' মঙ্গলোদ্দেশ্যে দেবতাদিগকে প্রণাম ও তাঁহাদের সুপবিত্র নাম স্মরণ করতঃ, আবার কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইলাম! দেবতা-গণ আমাদের কার্য্যে সহায়তা করুন। "যৎ ভদ্রং তন্ন আসুব"

যাহা হউক, এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট আমরা একান্ত প্রার্থনা করি যে, এই নববর্ষ আমাদিগের আর্য্যসন্তানগণের প্রভূত কল্যাণনিদান হউক। সকলে যেন সুখ-শান্তিতে এই নূতন বৎসর অতিবাহিত করিয়া, নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ করিতে পারেন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগ, শোক, অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি যেন পৃথিবী হইতে দূরীভূত হয়।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় পিঠাপুরের রাজার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত বক্তার পদ প্রাপ্ত হইয়া "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" সম্বন্ধে যে দ্বাদশটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন—তাহার সার মর্ম্ম 'Indian Messenger' পত্রে বাহির হইয়াছে—আমরা নিম্নে তাহা বঙ্গ-ভাষায় প্রদান করিলাম।

বারটি বক্তৃতার মধ্যে তিনটি কৃষ্ণ সম্বন্ধীয়, যে সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের প্রভাব অল্প বিস্তর পরিমাণে গীতায় লক্ষিত হয় তৎসম্বন্ধে তিনটি, জ্ঞান সম্বন্ধে একটি, ভক্তি সম্বন্ধে দুটি ও কর্ম্ম সম্বন্ধে তিনটি। প্রথম বিষয়টির নাম "কৃষ্ণ উপা-

খ্যানের মূল ও বিকাশ" এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নের আলোচনা হইয়াছে।

(১) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কখন হইয়াছিল ?

(২) কাহার দ্বারা এবং কখন মহাভারত রচিত হইয়াছিল

(৩) মহাভারতের যে ভিন্ন ভিন্ন 'পাঠ' পাওয়া যায় তাহার সমস্তগুলি-তেই কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের উল্লেখ আছে কি না ?

(৪) যদি না থাকে তাহা হইলে কোন্ সময়ের পাঠে, এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন্ যুগে তাঁহাদের কথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় ?

(৫) কৃষ্ণকে কি প্রথম হইতেই ভগবানের অবতার বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ?

(৬) অথবা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তাঁহার উপর ঈশ্বরত্ব আরোপিত হইয়াছে ? দেশীয় ও বিদেশীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিৎগণের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও গবেষণার অনুসরণ করিলে আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে চারিটি যুগ দেখিতে পাওয়া যায়--প্রত্যেক যুগ কয়েক শতাব্দীব্যাপী। মন্ত্রযুগ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ যুগ, সূত্র যুগ ও ধর্ম্মশাস্ত্র যুগ। এই মন্ত্রযুগ আবার মন্ত্রের রচনা ও সঙ্কলন এই দুই ভাগে বিভক্ত। এই সমস্ত যুগের সাহিত্য হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ মন্ত্রযুগের দ্বিতীয় অংশে সংঘটিত হয়—অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মিবার ১৩০০ কি ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে।

মহাভারতের গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব ও রচনাকাল।—মহাভারতীয় উক্তি ও অন্যান্য প্রমাণ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহাভারত চারিটি স্তরে বিভক্ত—এক এক স্তর এক এক যুগের এবং গ্রন্থকারেরই রচনা' এই গ্রন্থে আছে। ইহার মধ্যে প্রথম স্তরের অংশটুকু খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর রচনা আর শেষ স্তরের অংশটুকু প্রায় ৩০০ খৃষ্টাব্দের রচনা।

গীতার গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব ও রচনাকাল সম্বন্ধে অন্বয়ীমুখী ও ব্যতি-রেকমুখী প্রমাণের দ্বারা অসংশয়িতরূপে দেখান হইয়াছে, যে মন্ত্র সঙ্কলনের যুগ—যে সময় গীতার প্রথমে উল্লিখিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল এই গ্রন্থ সেই সময়ের কোন লোকের উপদেশ বা রচনা হইতে পারে না। প্রথমতঃ পর-বর্ত্তী কালের সাহিত্যে এই গীতা গ্রন্থের এত প্রভাব, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম তিন যুগে অর্থাৎ মন্ত্র, উপনিষৎব্রাহ্মণ ও সূত্রযুগে এই

গ্রন্থের কোনও উল্লেখ নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র যুগের প্রথম অংশে গীতা রচিত হয়—সুতরাং গীতার রচনাকাল খৃষ্ট জন্মিবার অল্পকাল পূর্ব্বে বা পরে।

এইবার তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন।

মহাভারতের পূর্ব্বকথিত চারিটি স্তরের মধ্যে কোন্ স্তরে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের কথা প্রবর্ত্তিত হয়? এ সম্বন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে প্রথমে স্তরে আদৌ ইহাদের কথা ছিল কি না, খুবই সন্দেহের বিষয়—আর যদিই বা উল্লেখ ছিল তাহা হইলে দ্বিতীয় স্তরে তাহাদের মূল চরিত্রের বর্ণনা অনেক পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। মিষ্টার হপ্‌কিন্‌স্ ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের ন্যায় পণ্ডিতদিগের মতে পাণ্ডবেরা কবিকল্পনা প্রসূত এবং এই মহাভারত গ্রন্থের ক্রমিক বৃদ্ধির কোনও স্তরে ভারতদিগের স্থান অধিকার করে।

পরিশেষে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কীয় আমার পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে আমি দেখাইয়াছি যে পূর্ণবৃদ্ধিপ্রাপ্ত মহাভারতের কৃষ্ণ, ঋগ্বেদের অনার্য্য বীর কৃষ্ণ ও ছান্দোগ্য উপনিষদের আঙ্গিরস ক্ষত্রিয় কৃষ্ণ এতদুভয়ের সমবায়। প্রথমে বীররূপে তাহার পর প্রায় দেবতারূপে কৃষ্ণের পূজা করা হইত পরে ক্রমশঃ বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে এক প্রতিযোগী স্থাপনার জন্য তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মান্দোলনের কেন্দ্র করা হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সাহিত্যে ঈশ্বরের অবতারের কথা নাই—বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বর আবির্ভূত হন এ প্রকারের চিন্তা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে যে যুগের কথা বলা হইল (বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী যুগ) সেই যুগে নূতন চিন্তায় বিবর্দ্ধিত করিয়া বিরোধী ধর্ম্মমতে বুদ্ধেরা যে নূতন নূতন উপায়ের মধ্য দিয়া বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুত্থান যখন আবশ্যক হইয়া পড়িল সেই সময়ে গীতা ও অথর্ব্বন বৈষ্ণব উপনিষদের ন্যায় গ্রন্থ রচিত হইল।

আমার দ্বিতীয় বক্তৃতা মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণ" এই প্রসঙ্গে আমি যে সমস্ত গ্রন্থ কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে অর্থাৎ মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত-পুরাণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিস্তৃত জীবনী প্রদান করিয়াছি। কৃষ্ণ চরিত্রের এই বিবরণী শ্রোতৃগণ বিচার করিতে পারিবেন যে আজকাল আমাদের দেশের যে অনেক প্রসিদ্ধ লেখক কৃষ্ণ চরিত্র অনুকরণীয় বলিয়া প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কতদূর যুক্তিযুক্ত—অবশ্য যদি মানিয়া লওয়া যায় যে কৃষ্ণ চরিত্র ঐতিহাসিক।

আমার তৃতীয় বক্তৃতার বিষয় ভগবদ্গীতার কৃষ্ণ এ বিষয়ে আমি দেখাইয়াছি যে গীতার যাহা কেন্দ্রগত ভাব— কৃষ্ণ ভগবান, তিনি তাঁহার শিষ্য অর্জ্জুনের রথ চালনা করিতেছেন ও তাঁহাকে উচ্চতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছেন—এই ভাবিয়াই কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর প্রথম অধ্যায় হইতেই গীতার গ্রন্থকারের মনে উদিত হইয়াছে। সেই স্থানে বুদ্ধিকে সারথি, দেহকে রথ, ইন্দ্রিগণকে অশ্ব, বিষয়কে পথ বলা হইয়াছে এবং বুদ্ধির অনুবর্ত্তনের আনন্দ ও ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তনের দুর্গতি বর্ণনা করা হইয়াছে।

গীতায় গ্রন্থকার বিশ্বকারণ পরমাত্মার সহিত আপনকে এক ভাবনা করিয়াছেন ও সমস্ত গ্রন্থে সেই পরমাত্মারই নামে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এই কার্য্যে তিনি উপনিষদের ঋষিগণেরই শিক্ষা ও উদাহরণের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন—যেমন কৌষিতকী উপনিষদের ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদ, এই খানেই অবতার বাদের বীজ রহিয়াছে। তাহার পর আমি বিস্তৃতভাবে হিন্দুশাস্ত্রের সগুণ ব্রহ্ম-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি—এবং দেখাইয়াছি যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির চৈতন্য যে সময়ে এই ঈশ্বরের চিন্তার দ্বারা পূর্ণ বা তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া যায়—অথচ সম্পূর্ণরূপে সেই বিশিষ্ট চৈতন্য সেই ঈশ্বর চেতনা হয়েন নাই এই প্রকারের যে প্রকাশ তাহাও বলিয়াছি। আমাদের পূজার জন্য গীতায় যে কৃষ্ণ রহিয়াছেন তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট দেশে বা কালে জাত ব্যক্তিবিশেষ নহেন, তিনি পরমাত্মা (Universal self) গভীর ধ্যানের সময় দেশ ও কালের সীমার বাহিরে আমরা নিজের আত্মার মধ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি। গীতার ষষ্ঠ, সপ্তম ও একাদশ অধ্যায়ের কতগুলি শ্লোক দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।

আমার চতুর্থ বক্তৃতার বিষয় "গীতার সহিত সাংখ্য দর্শনের সম্বন্ধ।" এই প্রসঙ্গের আমি যথাসম্ভব সরল ভাষায় মূল তত্ত্বগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি এবং তত্ত্বের সহিত ক্যাণ্টের Critical Philosophy-র যে আশ্চর্য্যরূপ সামঞ্জস্য আছে তাহা দেখাইয়াছি—আরও দেখাইয়াছি যে এই উভয় দর্শনের যাহা অসম্পূর্ণতা তাহা একই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত এবং একই বা একই প্রকারের যুক্তির দ্বারা ইহা দেখাইতে পারা যায় এবং ইহা দেখানও হইয়াছে। আমি আমার সাংখ্য দর্শনের বর্ণনা ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা হইতে বহু বচন উদ্ধার করিয়া স্থাপন করিয়াছি—সর্ব্বশেষে দেখাইয়াছি গীতার উপদেশসমূহ সাংখ্য দর্শনের দ্বারা কিরূপ

গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে এবং গীতা তাহার বেদান্ত মতের সহিত এই দর্শনের মতের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি দেখাইয়াছি যে কোন কোন স্থলে এই সমন্বয় চেষ্টা বেশ সুফল হয় নাই কিন্তু চিন্তা ও জীবনের বড় বড় সমস্যাগুলির যথার্থ মীমাংসা-বিষয়ে এই চেষ্টা বিশেষরূপে সহায়তা করে ও অনেক কথার আভাষ দান করে।

পঞ্চম বক্তৃতার বিষয় "গীতা ও যোগদর্শন।" এই প্রসঙ্গে পতঞ্জলির আবির্ভাবকাল বিচারিত হইয়াছে—দেখান হইয়াছে যে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পতঞ্জলির আবির্ভাবকাল। ঈশ্বরবাদ ও সাধনপদ্ধতি এই দুইটি বিষয়ে পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্যদর্শন হইতে পৃথক। পাতঞ্জল দর্শনের ঈশ্বর-বাদের প্রকৃতি ও প্রমাণ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করার পর পাতঞ্জলদর্শনের সাধনপদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সমস্ত যোগাঙ্গব্যাখ্যা করা হইয়াছে—যোগসূত্র হইতে ও স্থানে স্থানে ভোজভাষ্য হইতে প্রমাণবচন উদ্ধার করা হইয়াছে। তাহার পর উপনিষদ্ আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, যে সময়ে সাংখ্য ও যোগ, সাধনের পদ্ধতি-মাত্র ছিল, প্রণালীবদ্ধ দর্শনশাস্ত্রে পরিণত হয় নাই সেই সময়ে যোগ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল। তৎপরে ভগবদ্গীতা আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে গীতা পতঞ্জলির যোগাঙ্গগুলি কতদূর পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে পাতঞ্জলদর্শন অপেক্ষা বিশুদ্ধতর ও উন্নততর যে যোগ সাধন আছে বিস্তৃতভাবে তাহারও আলোচনা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ বক্তৃতার বিষয় "ভগবদ্গীতা ও বেদান্তদর্শন।" এই প্রসঙ্গের প্রথমেই পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনের সহিত অন্যান্য হিন্দুদর্শনের প্রভেদ কি তাহার বিস্তৃত আলোচনায় বলা হইয়াছে যে বেদের প্রমাণবচন পুনঃ পুনঃ উদ্ধার করাই এই দুইখানি দর্শনের বিশে-ষত্ব। আচার্য্যশঙ্করের কয়েকটি উক্তি হইতে আমরা দেখিয়াছি বৈদান্তিক দিগের পক্ষে এই শব্দ প্রমাণের অর্থ কি। শব্দ প্রমাণ বলিতে তাঁহারা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রমাণ বোঝেন—যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা প্রত্যেক পবিত্র-হৃদয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তি লাভ করিতে পারেন। তাহার পর অদ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রকৃতির সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ মানবতত্ত্ব, মুক্তি ও তাহার সাধন প্রভৃতি বিষয়ে মত ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং ব্রহ্মসূত্র হইতে প্রমাণ বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি যে এই উভয় মতের কোন্‌টি কতদূর সূত্রসম্মত। তৎপরে দেখাইয়াছি যে গীতা যদিও প্রধানতঃ দ্বিতীয় মত বা বিশিষ্টাদ্বৈতমতের পক্ষপাতী তথাপি গীতার বেদান্তমতকে এই উভয় মতের কোনটির সহিতই সম্পূর্ণরূপে এক বলিতে পারা যায় না। ভক্তিবিষয়ক উপদেশে গীতা ব্রহ্মসূত্র অপেক্ষা অনেক উন্নত—এবং উপনিষদ অপেক্ষাও অগ্রবর্ত্তী। উপনিষদে ভগবদ্ভক্তির প্রসঙ্গ থাকিলেও জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ যে সসীমের সহিত অসীমের সম্বন্ধ—

এবং জীব যে সর্ব্বদাই ভগবানের প্রেম ও অনুগ্রহ ভোগ করিতেছে এ তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে ও যথারূপে প্রতিষ্ঠা করেন নাই।

সপ্তম বক্তৃতার বিষয় "বা পাশ্চত্য আদর্শের সহিত গীতার জ্ঞানের আদর্শের তুলনা।" একটি মত প্রচলিত আছে যে ধর্ম্মবিষয়ক দার্শনিক জ্ঞান গভীর আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন নহে—এই প্রসঙ্গে সেই মতের ভ্রান্তি সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতার গ্রন্থকার এই প্রকারের জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন। গীতার ঈশ্বর তত্ত্ব, ঈশ্বরের সহিত জীবের ও বিশ্বের সম্বন্ধ বর্ণনা করা হইয়াছে—দেখান হইয়াছে যে এই মত, যিনি উচ্চতম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহারই পক্ষে সম্ভব। 'পদ্ধতি' (Method) সম্বন্ধে আলোচনায় বলা হইয়াছে যে পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত আধুনিক লোকদিগের হৃদয়ঙ্গম হয়, এরূপ পরিষ্কার পদ্ধতি আমাদের দর্শনশাস্ত্রে নাই। তৎপরে আমি ক্যাণ্ট ও হেগেলের Critical ও Dialectic পদ্ধতি আলোচনা করিয়া Absolute Idealism এর প্রাথমিক লক্ষণ গুলি নিরূপণ করিয়া প্রাচীনকালের ও আধুনিকালের অধিকাংশ প্রধান প্রধান দর্শনশাস্ত্র Objective, Subjective ও Absolute এই তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম দুইটি স্তরের অন্তর্ভূত—গীতার গ্রন্থকার অবশ্য Dialectic Method পরিষ্কাররূপ অবগত ছিলেন না কিন্তু আশ্চর্য্যরূপ সমন্বয়সাধক কল্পনাশক্তি প্রভাবে পূর্ব্বোক্তপদ্ধতির একদেশ দর্শিতায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই এবং আপনা হইতেই এমন এক বিজ্ঞানবাদে উপস্থিত হইয়াছেন যাহা, দৃশ্যতঃ বিরোধী কিন্তু বস্তুতঃ অবিরোধী চিন্তা ও জীবনের গতির সমন্বয় সাধন করিয়াছে। গীতার যে বিশ্বজনীন সম্মান তাহার দাবী এইখানে।

অষ্টম বক্তৃতার বিষয় "গীতার ভক্তির আদর্শ ও বৈষ্ণবীয় ভক্তির আদর্শের তুলনা" প্রথমে দেখান হইয়াছে যে সপ্তম বক্তৃতার প্রভেদে অভেদ (Unity in difference) যে মত ব্যাখ্যাকরা হইয়াছে সেই মত কেবল ভক্তি ও কর্ম্মের নহে, জ্ঞানের ও যথার্থ ভিত্তি। দ্বৈতবাদ (Dualism) অজ্ঞেয় ঈশ্বরের উপাসনা করে—ঈশ্বরও সসীম কারণ তিনি মানব ও প্রকৃতিদ্বারা সীমাবদ্ধ। এরূপ ঈশ্বর পূর্ণাঙ্গ ভক্তির বিষয় হইতে পারেন না। অতীন্দ্রিয় কোন কিছুর জন্য যে ভার তাহাও ঠিক ভক্তি নহে। অসীমের দ্বারা যে সম্ভ্রম, ভক্তি ও প্রেমের উদ্বোধন হয় তাহাই ভক্তিপদবাচ্য। পক্ষান্তরে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, যাহা সসীম তাহার সত্ত্বা অস্বীকার করেন—সুতরাং সাধক সত্য না হওয়ায় সাধ্য যে অসীম, তাহাও অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই মতে কেবল ভক্তি ও কর্ম্ম নহে, সাধন বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পদ্ধতিরূপে জ্ঞানেরও স্থান থাকে না—কারণ এখানেও সাধ্য সাধক ভেদ থাকা চাই। এই সমস্ত প্রাথমিক আলোচনার পর বিস্তৃতভাবে উপনিষদে ঈশ্বরভক্তি অনুশীলনের যে সমস্ত উপদেশ আছে তাহার

আলোচনা করিয়াছি—বিশেষ করিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য উপনিষদের নারদ সনৎকুমার সম্বাদ আলোচিত হইয়াছে। তাহারপর দেখান হইয়াছে যে গীতার ভক্তি উপনিষদ প্রদর্শিত পথাবলম্বনেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই উভয় শাস্ত্রেরই প্রাথমিক শিক্ষা অসীমের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি—এই উপলব্ধির বিচারের দিক (Intellectual aspect) জ্ঞান আর ভাবের দিক (Emotional aspect) ভক্তি। জ্ঞান ও ভক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট এবং যে সমস্ত শিক্ষা এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ আনয়ন করে এবং একটিকে উপেক্ষা করিয়া আর একটি গ্রহণ করে তাহা মূলতঃ ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর। তৎপরে দেখান হইয়াছে যে অসীমের উপলব্ধির যে দুইটি উপায়, অন্বয় ও ব্যতিরেক ইহার মধ্যে গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্বিতীয়টি ও একাদশ অধ্যায়ে প্রথম পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াছেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে একাদশ অধ্যায়ে উপদিষ্ট সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার প্রশংসা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে নির্গুণব্রহ্মে উপনীত হইবার ইহাই সুগম পথ, যাঁহারা একেবারে নির্গুণব্রহ্মে যাইতে চাহেন তাঁহাদের বিপদের কথা বলা হইয়াছে। এই সগুণব্রহ্মের উপাসনা অবশ্য মূর্ত্তিপূজা বা দেবপূজা নহে—গীতার মতে ইহা ঠিক ভগবানের উপাসনা নহে। এই প্রসঙ্গে দেবপূজা ও যজ্ঞাদি সম্বন্ধে গীতার মত আলোচিত হইয়াছে। ইহা হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের পরবর্ত্তী বিকাশ যাহার শ্রীমদ্ভাগবতে আভাস পাওয়া যায় এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, নারদ পঞ্চরাত্র, এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি ও চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবধর্ম্মের ভক্তির আদর্শ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং ইহার যাহা মৌলিকভ্রান্তি অর্থাৎ পৌরাণিক ঘটনার বিশ্বাস প্রত্যক্ষ অনুভূতিরূপে গ্রহণ, তাহাও আলোচিত হইয়াছে।

আমার নবম বক্তৃতার বিষয় "খৃষ্টীয় আদর্শের সহিত গীতার ভক্তির আদর্শের তুলনা।" এই প্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের কয়েকটি বিভাগের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ঐতিহাসিক সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে এবং আমাদের অর্থাৎ হিন্দুদের পক্ষে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত খৃষ্টধর্ম্ম আলোচনা করার আবশ্যকতাও বর্ণিত হইয়াছে। আরও দেখান হইয়াছে যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে খৃষ্টের জীবন যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে খৃষ্ট ঐতিহাসিক—এবং ঐ চরিত্র সত্যই দেবচরিত্র—যখন এই চরিত্রের প্রথম আবির্ভাব হয় তখনও উহা যেমন আদর্শ ছিল, এখনও সেইরূপ। ঈশ্বরের প্রতি ও মানবের প্রতি মহাত্মা খৃষ্ট যে প্রেম প্রচার করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে এই উপদেশ খুবই কার্য্যকারী। (practical) মানব জাতির ইতিহাসে এই উপদেশ কিরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাও বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার পর সেন্ট পলের শিক্ষা আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে আমাদের

ধর্মগ্রন্থ সমূহে অবলম্বিত রূপক ও ভাষা হইতে পৃথক রূপক ও ভাষা আশ্রয় করিয়া তিনি পাপ, প্রায়শ্চিত্ত, বিশ্বাস, কর্ম্ম, প্রেম, ক্রশে দেহত্যাগ ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা গীতার জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ব্রহ্মনির্ব্বাণ ও ব্রহ্মসংস্থার সহিত খুব গভীরভাবে একরূপ। তৎপরে সুসমাচার প্রচারক (Evangelist) জনের উপদেশাবলীর আলোচনায় তাঁহার চতুর্থ ধর্ম্ম পুস্তকের (gospel) ভূমিকার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছি। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে শব্দ ব্রহ্ম (Logos) সম্বন্ধীয় তাঁহার মত উপনিষদ্ ও গীতার মতের সহিত মূলতঃ অভিন্ন। খৃষ্টীয় ঈশ্বরের ত্রিত্ব (Triune-three in one) রহস্য নহে—হিন্দুদের "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" যিনি "একম্ রূপম্ বহুধা যঃকরোতি" তাঁহার সহিত অভিন্ন।

দশম বক্তৃতার বিষয় "গীতার কর্ম্মযোগ।" এই প্রসঙ্গে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এবং গীতার তিন ষটকের আলোচনা করিয়া প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের চরমপন্থী দিগের উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার পর প্রথম হইতেই এই দুই মার্গের সমন্বয়ের যে চেষ্টা হইয়াছে ঈশোপনিষৎ হইতে প্রমাণ বচন উদ্ধার করিয়া সেই সমুচ্চয়-বাদবর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিরোধ ক্রমে বাড়িতে লাগিল এবং রীতিমত বিরোধী দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল—কাজেই তাহাদের সমন্বয়েরও বৃহত্তর চেষ্টা দেখা গেল। এই সমস্ত চেষ্টার মধ্যে গীতার চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা সফল। গীতা সর্ব্বপ্রথম জৈমিনীর অনুবর্ত্তী কর্ম্মকাণ্ডী দিগের সহিত বিচার আরম্ভ করিয়াছেন—কর্ম্মকাণ্ডীগণের যজ্ঞ ও তৎ প্রসূত ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ নাই। গীতা দেখা-ইয়াছেন এই মতাবলম্বীগণ যাহা বলেন তদপেক্ষা উন্নততর তত্ত্ব আছে —এবং তাঁহারা কর্ম্মসাধনের যে উদ্দেশ্যের কথা বলেন তদপেক্ষা উন্নততর উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু এই উন্নততর অবস্থার কথা আলোচনা করিতে গিয়া গীতাকার সাংখ্যদর্শনের মতের যৌক্তিকতার দ্বারা চালিত হইয়া আত্মা স্বরূপতঃ নিস্ক্রিয় এইরূপ কথা বলেন—এই মত কর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করে। যাহা হউক তিনি বৈদান্তিক মতের আশ্রয়ে নিত্য ক্রিয়াশীল ঈশ্বরবাদ, নিস্কাম কর্ম্ম, ব্রহ্মার্পণ এই তিনটি সত্যের দ্বারা কর্ম্মবিরোধী সাংখ্যমতাবলম্বীগণ ও মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণের মত খণ্ডন করেন।

একাদশ বক্তৃতার বিষয় "ভগবদ্গীতার নৈতিক আদর্শ" এই প্রসঙ্গে জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্বন্ধ পুনরালোচিত হইয়াছে এবং জ্ঞানতত্ত্ববিশ্লেষণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে আত্মা, স্বরূপে নিস্ক্রিয় এরূপ মত অযৌক্তিক—সাংখ্য দর্শনের ইহাই মৌলিক ভ্রান্তি। 'জ্ঞান' অবিশ্রান্ত ক্রিয়াশীলতা দ্বারা আত্মরক্ষা করে—আত্মা, তাঁহার পারমার্থিক ভাবেই দেখা যাউক আর ব্যবহারিক ভাবেই দেখা যাউক মূলতঃ ক্রিয়াশীল ও উদ্দেশ্যযুক্ত। আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এক নিত্য ক্রিয়াশীল পুরুষের হস্তে রহিয়াছি—তিনি

নিত্য পূর্ণ, কাজেই নিজের বলিতে তাঁহার কোন কামনা নাই অথচ সৃষ্টির পূর্ণতা সাধনের জন্য অপূরিত কামনা লইয়া তিনি কার্য্য করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে নিষ্কাম কর্ম্মের আলোচনা করা গিয়াছে ও যোগী, যিনি ঈশ্বরের সহিত এক হইয়াছেন কি অর্থেই বা তাঁহার কামনা আছে আর কি অর্থেই বা তাঁহার কামনা নাই তাহাও দেখান হইয়াছে। গীতা স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ দিয়াছেন তাহাতে চরিত্রের এমন একটি আদর্শ বুঝায় যাহাতে আমাদের দৈহিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন গুলিকে সন্ন্যাসীদিগের মত নিগ্রহ না করিয়া তাহাদের শুদ্ধিসাধন পূর্ব্বক ঈশ্বরের সহিত এক হইবার যে মূল উদ্দেশ্য তাহার সহিত এক করিয়া ফেলিতে হইবে। ঈশ্বরই সমস্ত-সীমাবদ্ধ বস্তুর জন্য কামনা ত্যাগ বলিতে এই বুঝায় যে তাহারা ঈশ্বর হইতে পৃথক এরূপ জ্ঞানে তাহাদের অনুসরণ করা হইবে না। তাহারা ঈশ্বরের অংশ বা প্রকাশ এই ভাবে তাহাদের প্রতি অভিপ্রায়-যুক্ত এই কামনা ঈশ্বর প্রেমেরই অঙ্গ। এই মত হইতেই ব্রহ্মার্পণ—ও যজ্ঞার্থে কর্ম্ম এই মতের উদ্ভব হইয়াছে।

দ্বাদশ বক্তৃতার বিষয় গীতার কার্য্যকরী নীতি উপদেশ—এই প্রসঙ্গের শেষে সমস্ত বক্তৃতা গুলির সার মর্ম্মও প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একদিক।

ইহা অবশ্য সকলেই জানেন যে সমগ্র বঙ্গ ও বিহার প্রদেশে, মান্দ্রাজ প্রদেশের উত্তর পূর্ব্বভাগে এবং যুক্তপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে জমির খাজনা বিষয়ে সরকারের সহিত জমিদারের একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী বৎসরের ১৭৯৩ খৃঃ তৎকালীন ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস সেই সময়কার দশমবার্ষিক বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করিয়া এবং জমিদারদিগকে ভূম্যাধিকারী বলিয়া স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়া আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

জমিতে সম্পত্ত্যধিকার জমিদারের থাকিলেও গবর্ণমেণ্ট খাজনা বাবদ তৎকালীন জমিজাত দ্রব্যের মূল্য ধার্য্য করিয়া তাহার ১১ভাগের ১০ভাগ গ্রহণ করেন। তৎকালে রাজপুরুষেরা মনে করিয়া ছিলেন যে ভারতবর্ষে জমির মূল্য

তখনকার মূল্য অপেক্ষা আর অধিক বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই। সে সময়ে অর্থনীতি বিজ্ঞান শাস্ত্র এতাদৃশ সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই, যদ্দ্বারা লোকে বুঝিতে পারিত যে লোকবল, অর্থবল এবং অন্যান্য সামাজিক সাধারণ উন্নতির সঙ্গে জমির মূল্যও বাড়িয়া যাইতে থাকিবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রণেতৃগণ যে এই আইন প্রণয়ন করা কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাহার একটী প্রধান কারণ।

সুতরাং পরবর্ত্তীকালে যদিচ অনেকের মতে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতবাসীর পক্ষে অশেষ সুফলপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি একথা নিশ্চিত যে যখন ইহা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তখন ইহা তাদৃশ কোনও প্রকারের সুফল প্রদান করিবে কিনা সে বিষয়ে তৎকালীন মনীষিগণও কোনও সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

জমিতে সাধারণতঃ তিনশ্রেণীর লোকের সত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে,—গবর্ণমেণ্ট, জমিদার ও রাইয়ত। এই তিন শ্রেণীর মধ্যেই জমি প্রসূত দ্রব্যাদি বিভক্ত করা হয়। এই তিন বিভাগ পরস্পরের সহিত কি প্রকারে সম্বন্ধ-যুক্ত তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবল মাত্র গবর্ণমেণ্ট ও জমিদার এই দুইয়ের মধ্যে আয় কিভাবে বিভক্ত হইবে তাহা স্থির করিয়া দিয়াছে। কিন্তু জমিদারও রাইয়তের মধ্যে আবার কি নিয়মে আয় বিভক্ত হইবে সে বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কিছুই ধার্য্য করিয়া দেয় নাই।

১৮৬২ খৃঃ ভারতসচিব স্যর চার্লস্ উড্ মহোদয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়ম ভারতগবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভবিষ্যতে গ্রাহ্য হইবে বলিয়া যে সরকারী চিঠি প্রেরণ করেন তাহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ব্যাখ্যা করিয়া তিনি প্রায় সাত আটটী গুণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী এই যে মধ্যবিত্ত লোক যাহাদের উপরেই জাতীয় উন্নতি অবনতি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে তাহারা উক্ত বন্দোবস্তের অধীন প্রদেশেই বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে পারিবে।

এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিহার প্রদেশে জমিদারও রাইয়তের মধ্যে কি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহার ফলাফলই বা কি হইয়াছিল তাহাই একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। বিহার প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একশত কুড়ি বর্ষ যাবৎ কার্য্য করিয়া আসিতেছে কিন্তু সেখানে এখনও

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনও সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠে নাই। সেখানে এখনও কেবলমাত্র উচ্চ জমিদার ও দীন রাইয়তই বিরাজ করিতেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্য্যতঃ কিরূপ ফলপ্রদ হইয়াছিল তজ্জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ খাজনা আদায় না হওয়া হেতু গবর্ণমেণ্ট পুনঃপুনঃ আইন প্রণয়ন করিয়া জমিদারকে এতবেশী ক্ষমতা দিয়া ছিলেন যে জমিদার তাঁহার খুসীমত প্রজাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পর্য্যন্ত রাখিতে পারিতেন, জোর করিয়া বাড়ী ঘর দ্বার নিলাম তুলিয়া দেওয়া ত অতি সহজ ছিল। প্রজাকে রক্ষা করার জন্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে কোনও প্রকারের আইন প্রণয়ন করা হয় নাই। এবং বিশেষ করিয়া সেই রক্ষার ভার গবর্ণমেণ্ট ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই প্রকৃত পক্ষে গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

ইতি মধ্যে জমিদার যথেচ্ছাচারিতা দ্বারা রাইয়তের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে ছিলেন। রাইয়তকে রাইয়ত হইয়া প্রাণ ধারণ করাই দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল, পদবৃদ্ধি হইয়া অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হওয়া ত দূরের কথা।

জমিদারের এই যথেচ্ছাচারিতা বেহারে চরমে পৌঁছিয়াছিল। একটী উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। ১৮৪০ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ এই ৪৩ বৎসরের মধ্যে বিহারে কর্ষিত ভূমি বাড়িয়া যায় নাই, অন্য কোনও প্রকারে জমির উন্নতি করিয়াও তাহাকে অধিক ফলপ্রসূ করিয়া তোলা হয় নাই। জমিজাত দ্রব্যাদির মূল্য কেবলমাত্র শতকরা ৭৩৲ টাকা হারে বাড়িয়া গিয়াছিল। যদি এই হারে কর বাড়িতে থাকিত তাহা হইলে ১৮৮৫ সালের এবং তৎপরবর্ত্তী প্রজারক্ষণ আইন প্রণীত না হইলে যে প্রজাদের অবস্থা আজ কি হইত তাহা ভাবিতে হইলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

ভারতের এই সব প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা আমাদের দেশের মান্যগণ্য বহুব্যক্তি বহুকালাবধি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কিরূপ বিচার করিয়া ছিলেন জানি না কিন্তু ইহা ঠিক যে তাঁহারা সমস্ত ব্যাপারটাকে জমিদারদের দিক হইতেই দেখিয়া-ছিলেন এবং জমিদারি ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কি প্রকারে খাজনা বিভক্ত হইয়াছে তাহাই দেখিয়াছিলেন মাত্র। গবর্ণমেণ্টের হাতে অধিক অর্থ গেল না, অতএব আমরা লাভবান হইলাম। কিন্তু এ দিকে উক্ত অর্থের যে অংশ কর্ষিত ভূমি

বিস্তারের জন্য বাড়িয়া যাইতেছে অথবা যে অংশ ব্যবসায় বাণিজ্যাদি সামাজিক উন্নতি হইতে বাড়িয়া গিয়াছে সে অংশ যে ন্যায্য রকমে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য তাহা বিচার করিয়া দেখি না, সেই অংশ গবর্ণমেণ্ট না পাওয়ায় আমাদের যে অন্য প্রকারে ক্ষতি হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যে অন্য উপায়ে—ট্যাক্স ইত্যাদি ধার্য্য করিয়া—সেই পরিমাণ অর্থ লইতে বাধ্য হইতেছে। জমিজাত উক্ত অংশ গভর্ণমেণ্ট সহজে পাইলে সাধারণ ব্যক্তিকে স্বীয় শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ হইতে ট্যাক্স দিয়া কষ্ট পাইতে হইত না। অপর পক্ষে দেখিতে পাই সেই অর্থদ্বারা রাইয়তের'ও কোন মঙ্গল হইতে ছিল না। রাইয়ত দীন হইতে দীনতর হইতে চলিতেছিল। মাঝখান হইতে মুষ্টিমেয় জমিদারগণ ক্রমাগত স্ফীত হইয়া উঠিতেছিলেন। ইহারই চরম বেহারে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দেওয়া আর সম্ভব নয়। তবে রাইয়তকে রক্ষাকরা সম্ভব। সুখের বিষয় প্রজাসত্ব-রক্ষার্থে নানাপ্রকারের আইন নানাদিকে হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহাতে শুভ ভিন্ন অশুভ ফল হইতে পারে না। চতুর্দ্দিকে অজ্ঞতা ও স্বার্থের চীৎকার ইহার বিরুদ্ধে উঠিতেছে। অপরদিকে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ এই প্রজারক্ষণ বিষয়ক আইন সকলের বিশেষ করিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা যেন সেই শিক্ষা ভুলিয়া বৃথা মোহে না পড়ি।

হে বাঙ্গালি। বিংশশতাব্দীর অর্থনীতি বিজ্ঞানশাস্ত্রের বাণী, বিংশ শতাব্দীর প্রজাতন্ত্রতা, বিংশশতাব্দীর স্বায়ত্তশাসন প্রণালী যেন আর তোমাকে ঐ সকল ভ্রমপ্রমাদে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে না পারে। শুদ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য কিম্বা যাহারা আত্মরক্ষায় অতিমাত্র সক্ষম সেই জমিদারদের জন্য যেন আর তুমি নিরক্ষর সর্ব্বসহ বাঙ্গালী প্রজাকে উপেক্ষা করিও না। নিজের জাতি, নিজের আত্মীয়, নিজের সর্ব্বস্ব কোথায় তাহা যেন তুমি মার্জ্জিত ভাষার কোলাহলে কিম্বা ক্ষণিকের বাহ্য চাকচিক্যে না ভুলিয়া যাও। ভুলিয়া যাইও না যে বিশাল জনসমাজ,—নিরক্ষর, অজ্ঞ, বহুকালাবধি উৎপীড়িত ঐ রুগ্ন পল্লীবাসিরা তোমার আদর্শ-সমাজের অঙ্গীভূত. তাহারাই "তোমার জাতির অনন্তকালের ভিত্তি,—অতীতে ছিল বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে; তাহাদের শুভই তোমার শুভ," তাহাদের সাধনার সাফল্যই তোমার প্রয়াসকে সফলতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

বীরভূমি, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা।
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০।

হিমালয় যাত্রা।

কোন একটি কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহার আরম্ভের কারণ বা একটা কিছু ভূমিকা স্বরূপ দেওয়া দরকার, নতুবা কার্য্যটী কি কারণে হইল তাহা বুঝিয়া উঠিতে সাধারণ মানব মাত্রেরই একটু গোলযোগ ঘটিয়া যায়, তাই আমি সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া হিমালয় দর্শন করিবার প্রবৃত্তি কোথা হইতে হইল এবং তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তিই বা কেন, তাহা একটু আলোচনা করিয়া পরে ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিব:—বাল্যকালে যখন হিমালয় পর্ব্বতের বিষয় অবগত হই যে আমরা যে আর্য্যঋষিগণের বংশধর বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্র পরিচিত, হিমালয় তাঁহাদের সাধন ভজন ও উপাসনাদির স্থান এবং বর্ত্তমান সময়ে তথায় অনেককালের ত্রিকালজ্ঞ উন্নত সাধু মহাত্মা বিভিন্ন আশ্রমে এবং গুহা মধ্যে ধ্যানমগ্ন আছেন এবং কাহাকেও সাধন রত হইতে হইলে তাঁহাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় তখন হিমালয় দর্শন করিবার বিশেষ বাসনা হৃদয় মধ্যে উদিত হয়। তদনন্তর রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণ পাঠে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের বহুপ্রকার প্রমাণ পাইয়া কি করিয়া তথায় যাওয়া যায় তাহার খবর লইতে আরম্ভ করি, তারপর লোক পরম্পরায় জানা গেল যে সাধু সন্ন্যাসীরাই উক্ত স্থানের পথ প্রদর্শক এবং তাঁহাদের সঙ্গলাভে তথায় যাওয়া যায়। ফলে বালককাল হইতে সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ ঘটিলে অমনি মনে হইত ইঁহারা হিমালয় সম্বন্ধে যদি গল্প করেন তবে ভাল হয়, কিন্তু সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যে খবর লইব ততখানি ভরসা হইত না। এইরূপ অনুসন্ধিৎসু হইয়া কৈশোর জীবনে ভূতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া অনেক খবর সংগ্রহ করিতেছিলাম, তারপর বর্ত্তমান ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট লৌহ বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়া হিমালয়ের পদদেশ পর্য্যন্ত

উপনীত হইয়াছেন ইত্যাদি বিষয় জানিতে পারি। এই সময়ে শ্রীযুত জলধর সেন মহাশয় পরিব্রজ্যাবলম্বন পূর্ব্বক হিমালয় ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তাঁহার ভ্রমণকাহিনী পুস্তকাকারে সাধারণ্যে প্রচার করেন, তাহা পাঠ করিয়া উক্ত বাসনা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। যদিও তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকে উক্ত স্থানে পঁহুছিতে পারিবেন কিনা এই বিষয়ে সন্দিহান হন এবং চড়াই উৎরাই সম্বন্ধীয় মন্তব্য পাঠে একেবারে হতাশ্বাশ হইয়া পড়েন কিন্তু আমি তাঁহার কৃত বই খানিকে আমার পথ প্রদর্শক বলিয়া মনে করিয়া লই। সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি বর্ত্তমান প্রব্রজ্যা।

এই আশ্রম গ্রহণ করিবার সময় পরমারাধ্যতম পূজ্যপাদ মদীয় আচার্য্যদেব আশ্রমের পরিচয় প্রদান কালীন যখন বলিলেন যে আমরা যে মঠের সন্ন্যাসী সেই মঠের অবস্থান ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় কীর্ত্তি কলাপ সমস্তই হিমালয় প্রদেশে অবস্থিত, এবং এই আশ্রম গ্রহণকারী প্রত্যেকের অন্ততঃ একবার উক্তস্থান দর্শন করা বিধেয়। তখন হৃদয় মধ্যে এই বাসনা প্রবলভাবে জাগরিত হইয়া উঠিল যে একবার তাঁহারই সাহচর্য্য ও সেবা গ্রহণ করিয়া হিমালয় দর্শন করিব। কিন্তু পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমার সেই বাসনা উক্ত মতে পূর্ণ হইতে দিলেন না। ১৩১৬ সালের শেষের সহিত আমার সেই বাসনা অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন দিশাহারা পথিকের মত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলে আবার তাঁহারই প্রেরণাতে হিমালয় দর্শন বাসনা আরও প্রবলতর হইয়া উঠে। সেই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া ঐ সময়ে পথিমধ্যে নানা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান নগর নগরী ইত্যাদি পরিদর্শনান্তে ৫ই চৈত্র শনিবার বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার সময় হিমালয় প্রবেশদ্বার হরিদ্বার ধামে উপনীত হই।

দৈনিক কার্য্য বিবরণী সাধারণ মতে লিপিবদ্ধ করা ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা আমার চির অভ্যাস এবং শেষোক্ত বিষয়ে পূজ্যপাদ মদীয় আচার্য্যদেবের বিশেষ আদেশে ভ্রমণ কালীন সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে দেখিয়া আমার ভ্রমণের সহতীর্থ জনৈক বন্ধু আমাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং ইহা সর্ব্ব সাধারণে প্রচারিত হইলে তদ্বারা একটী বিশেষ অভাব দূরীভূত হইবে এই ভাব ব্যক্ত করিলে তিনি বলিলেন যে আপনি যে ভাবে বিশেষ বিশেষ স্থানাদির তত্ত্বাদি অনুসন্ধান করিতেছেন তাহা যদি প্রকাশিত হয় তাহা হইলে সর্ব্ব সাধারণের একটী বিশেষ অভাব মোচন হইবে এবং

যাঁহারা এই স্থানকে অতীব দুর্গম বলিয়া দর্শনাদির একটু ইচ্ছা থাকিলেও পশ্চাৎপদ হইয়া যান তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য হইবে, এই প্রকার খবরাদি পাইলে যাঁহাদের ইচ্ছা নাই তাঁহারাও অন্ততঃ একবার আসিতে প্রস্তুত হইবেন। অবতরণিকায় এই পর্য্যন্ত শেষ করিয়া এখন হরিদ্বার ধামে কি কি আছে ও প্রধান প্রধান স্থানের বিশেষত্ব কি এবং দ্রষ্টব্য বিষয়াদির আলোচনা করিব হরিদ্বার কানপুর জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা এবং আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ে দেরাদুন শাখার একটী প্রধান ষ্টেশন; এখানে গবর্ণমেণ্টের বিচারালয় পুলিশ চৌকী পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল ডাক বাঙ্গালা ইত্যাদি আছে। সাধারণ যাত্রীদের অবস্থান জন্য বহু ধর্ম্মশালা আছে, তন্মধ্যে মাড়োয়ারি পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালা রায় বদরিদাসের ধর্ম্মশালা, রায় বাহাদুর সুরজমলের ধর্ম্মশালা, গরীব দাসী সাধুদের ধর্ম্মশালা প্রভৃতি সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। এখানে সমাগত যাত্রীগণ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, শিবিপিড়ি প্রদক্ষিণ, * কুশাবর্ত্ত ঘাটে পিণ্ডদান, ভীমগোড়া, সপ্তস্রোতা জ্ঞান গোধরি, সর্ব্বনাথ শিব, সূর্য্যকুণ্ড, নীল্লোকেশ্বর শিব, বিলোকেশ্বর শিব, পিছোড়নাথ শিব, মায়াদেবী, ভৈরব নাথ গৌরীকুণ্ড, চণ্ডীদেবী চণ্ডীপাহাড় নীলধারী প্রভৃতিতে স্নান দর্শন পূজা পাঠাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। হরিদ্বারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়, সপ্তস্রোতা গঙ্গা ইহার উত্তর দেশে মিলিতা হইয়া আবার ব্রহ্মকুণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্ব দক্ষিণ হইতে ত্রিধারা বিশিষ্টা হইয়া কনখলের দক্ষিণ দেশে যাইয়া মিলিতা হইয়াছেন। মুসলমান রাজত্বর সময় এই স্থান হইতে খাল কাটাইয়া গঙ্গার একটী ধারা কনখলের পার্শ্ব দিয়া রুড়কী প্রভৃতি প্রসিদ্ধস্থান হইয়া আবার কানপুরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন, ইহাদ্বারা কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে হরিদ্বার প্রধানতঃ সাধু সন্ন্যাসীর সাধন ভজনের স্থান, এখানে গৃহস্থ বাসিন্দা মোটেই নাই। এমন কি হরিদ্বারের পাণ্ডাগণ তিন মাইল দূরবর্ত্তী জোয়ালাপুর গ্রামে বাস করেন এবং তথা হইতে প্রত্যহ যাতায়াত করিয়া যাত্রীদের সর্ব্ববিধ কার্য্যাদি সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। এখানে সাধু সন্ন্যাসীদের অনেক আশ্রম ও আখেরা ইত্যাদি আছে। তন্মধ্যে

---

* এই রকম কিম্বদন্তি আছে যে গঙ্গাদেবী যখন ধরণী তলে অবতীর্ণা হন দেবাদিদেব মহাদেব এই স্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেইজন্য যাত্রীগণ এই আসন বা পিড়ি প্রদক্ষিণ করেন।

জুনা আখেরা, নির্ব্বাণি আখেরা, নিরঞ্জনী আখেরা, অচল আখেরা, ভৈরবনাথের আখেরা, স্বামী ভোলানন্দ গিরিজিউর আশ্রম, কেশবানন্দজিউর আশ্রম, জ্ঞান গোধরি, রাধাগোবিন্দ জিউর মঠ সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ ও তথায় অনেক সাধু মহাত্মা স্ব স্ব সাধন ভজন কার্য্যে রত আছেন। সাধু মহাত্মাদের মধ্যে শ্রীমৎমোহন্ত মহারাজ বলবন্তগিরি স্বামী, ভোলানন্দ গিরি, শ্রীমৎ প্রেমানন্দ জিউ, জ্ঞান বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরমার্থ নাথ প্রভৃতি সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। প্রত্যহ জ্ঞান গোধরিতে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা, পাঠ ও নানাবিধ তত্ত্ব সম্বলিত গান ইত্যাদি হইয়া থাকে। এখানে সংস্কৃত অধ্যাপনার নিমিত্ত ২।৩টি চতুষ্পাঠী আছে, কিন্তু স্থানীয় ব্যবহারিক ভাষা উর্দ্দু। বিদ্যার্থীদের আহারের জন্য ৪।৫টী অন্নছত্র আছে তন্মধ্যে রায় বাহাদুর সুরজমলের ও কুশাবর্ত্ত ঘাটের অন্ন ছত্রে বহু বিদ্যার্থী পানাহারে যথাবিহিত আপ্যায়িত হইয়া থাকে, ব্রহ্মনাগে মাছের খেলা অতীব মনোরম, অনেক যাত্রী নানাবিধ খাদ্য দ্রব জলে ছড়াইয়া দিয়া মাছের ক্রীড়া দেখিয়া থাকেন। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে পুলিশ চৌকীর ধার পর্য্যন্ত গঙ্গা পার্শ্বে প্রায় ৭শত হস্ত চওড়া পাকা বান্ধান স্থান আছে সায়ংকালে যাত্রীগণ সাধু দর্শন মানসে তথায় সমবেত হইয়া থাকে। সাধু সন্ন্যাসীদের আহারের জন্য ২।৩টি সাধারণ অন্নছত্র আছে বটে কিন্তু আগন্তুক সাধুদের কনখল হইতে মাধুকুরি করিয়া আহার করিতে হয়।

এখানে তিনটী ঋতু সাধারণতঃ প্রবল দেখা যায়, শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। তিন ঋতুই ভয়ানক প্রখর, জল বায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ, আহার্য্য দ্রব্যাদির মধ্যে তরিতরকারির মূল্যাদি অনেক বেশী। দুগ্ধ ও ঘৃত সাধারণ মত পাওয়া যায়। বাসোপযোগী অনেক ভাড়াটীয়া বাড়ীও পাওয়া যায় এখানে পাণ্ডাদের স্ব স্ব বাড়ী আছে ও তাহাতেই যাত্রীদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া থাকেন, আর যাঁহারা ধর্ম্মশালাতে অবস্থান করেন পাণ্ডাগণ তথায় যাইয়া তাঁহাদের কার্য্যাদি সম্পন্ন করাইয়া দেন। সাধন ভজনের জন্য বিল্লোকেশ্বর শিবালয় ও চণ্ডী পাহাড় অতীব সুবিধাজনক ও বেশ নির্জ্জন, বানরের উৎপাত ধর্ম্মশালাদিতে সাধারণ মত দেখা যায় তজ্জন্য যাত্রীদের বিশেষ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। হরিদ্বারের ঋষিকুল ব্রহ্মচারি আশ্রম একটী দেখিবার স্থান। ইহা ষ্টেসনের কিছু দক্ষিণ দেশে উত্তর দক্ষিণ রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত। তথায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালকগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রাচীনকালের প্রথানুযায়ী বিদ্যাভ্যাস

তপস্যা হোমাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। তাহাদের কার্য্যাদি দর্শন করিয়া মন প্রাণ পুলকিত হয় ও আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। বর্ত্তমান যুগে এই আশ্রমটী একটী আদর্শ জিনিষ ও ইহার কার্য্যাদি বিশেষ প্রসংসনীয় ও উল্লেখ-যোগ্য। হরিদ্বারে বার বৎসর অন্তর কুম্ভ মেলা এবং ছয় বৎসর অন্তর অর্দ্ধ কুম্ভ মেলা হয় তাহাতে অনেক হিমালয়বাসী সাধু মহাত্মার দর্শন লাভ ঘটে। প্রতি বৈশাখ মাসেও বহুযাত্রী ও সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে এবং মাঙ্গআলী মেলা হয়।

কনখল

হরিদ্বার হইতে প্রায় ক্রোশাধিক দক্ষিণে কনখল। এইরূপ জনশ্রুতি আছে এই স্থানে পুরাকালে দক্ষপ্রজাপতির রাজধানী ছিল এবং তিনি এইখানেই মহাসমারোহে এক মহতী যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তদীয় কন্যা সতী পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান দক্ষযজ্ঞ কুণ্ড,দক্ষেশ্বর প্রজাপতি শিব,সতী কুণ্ড প্রভৃতি তাঁহাদের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের স্মৃতি মানস পটে জাগাইয়া দেয়। কনখলে সাধুমহাত্মাদের অবস্থানের জন্য অনেকগুলি বড় বড় ধর্ম্মশালা বাড়ী মঠ ও আশ্রমাদি আছে এবং তাঁহাদের আহারাদির জন্য অনেকগুলি অন্নসত্র আছে, এখানে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালনার্থে অনেক সাধু মহাত্মা হৃষীকেশ ও অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়া থাকেন। আশ্রমাদির মধ্যে পণ্ডিত কেশবানন্দ জিউর আশ্রম মঠ ও পাঞ্জাবী ছত্রাদির বাড়ী অত্যন্ত বৃহৎ ও সর্ব্বপ্রকারে সুবিধাজনক, বহু সাধু মহাত্মার স্থান সঙ্কুলান হয়। কনখলে পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মিশনের একটী সেবাশ্রম আছে, তথায় অনেক রোগীর বাসোপযোগী বাড়ী, ঔষধালয় ও সর্ব্বপ্রকার সংস্থান আছে। আশ্রমের স্বামীজি মহারাজগণ, ব্রহ্মচারী ও সেবায়েত মণ্ডলী অতি যত্নে আগত জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যথাবিধি সেবা শুশ্রূষাদি করিয়া থাকেন। এই আশ্রমের এক একটী বাড়ী একএক জন বিভিন্ন স্থানীয় বড়লোকের দানশৌণ্ডতার পরিচয় ঘোষণা করিতেছে। কনখল হইতে অনতিদূরে কাঙ্গারু নামক স্থানে ও জোয়ালাপুরে আর্য্যসমাজের নেতা শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত সরস্বতী মঠ ও গুরুকুল ব্রহ্মচারী আশ্রম আছে। তাঁহারা জাতিনির্ব্বিশেষে উপনয়নাদি সংস্কার করিয়া নানাবিধ সুশিক্ষা দিয়া থাকেন। আশ্রমস্থ সকলে সংস্কৃত ভাষায় আলাপাদি করেন ও বৈদিকমার্গ অবলম্বী। তাঁহাদের আচার ব্যবহার

প্রশংসনীয়। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে তাঁহাদের একটি বার্ষিক সম্মিলনী হইয়া থাকে ও আর্য্য সমাজের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে নেতাগণ ও সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া মহা আনন্দ করিয়া থাকেন।

হরিদ্বারে শ্রীযুত রায় বাহাদুর সুরজমলের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালায় আসন গ্রহণ করি। ধর্ম্মশালার কার্য্যাধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ বেশ সদাশয় লোক তাঁহারা সদা সর্ব্বদা যাত্রীগণের সুবিধার্থ সর্ব্বপ্রকরে কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এইস্থানে অবস্থিতি কালীন হরিদ্বার, কলখল, জোয়ালাপুর প্রভৃতি স্থানের সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন ভ্রমণ ও প্রসিদ্ধ উন্নতমনা সাধু মহাত্মাদের সঙ্গ লাভ ঘটে। শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রমে ও রাধাগোবিন্দজির মঠে সাধু মহাত্মাদের ভাণ্ডারা দর্শনে পরমানন্দ লাভ করি। ১০ই চৈত্র বৃহস্পতিবার জোয়ালাপুরে আর্য্যসমাজের বার্ষিক সম্মিলনাতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের প্রধান প্রধান বক্তাদের বক্তৃতা শ্রবণ করি ও তাঁহারা কি কি উপায়ে ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হই। তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের পদ্ধতি অনেকটা বর্ত্তমান খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকদের মত বোধ হইল। উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় একদল বাঙ্গালী সাধু হিমালয় দর্শনাভিলাষে এখানে আসিয়া উপনীত হন, পরিচয়ে জানিতে পারিলাম তাঁহারা সকলে বহুতীর্থ পর্য্যাটনান্তে এস্থানে উপনীত হইয়াছেন ও পুরী ধামস্থ কড়া-রাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামীজির শিষ্ট সম্প্রদায় ও যোগ মার্গাবলম্বী। বহুদিন একা পর্যটন করিতেছিলাম এবার তাঁহাদের মিলনে পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলাম। তাঁহারা আমাকে পরম যত্ন করিতে লাগিলেন ও সকলে এক সঙ্গে হিমালয়ে প্রবেশ করিব স্থির করা গেল। তাঁহারাও আমার সঙ্গে এই ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

হরিদ্বারে শ্রীশ্রীমতী নর্ম্মদা ভৈরবী মাতাজি ও রাধাগোবিন্দজিউর মঠের বৃদ্ধা দাসী বেণী দাসী অত্যন্ত পর দুঃখ কাতরা, সেবা শুশ্রূষপেরায়ণা। তাহারা উক্ত কার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিয়াছে, তাহাদের আচার ব্যবহার অতীব প্রশং-সনীয় হরিদ্বারের পাণ্ডাগণ বেশ চতুর ও ধূর্ত্ত। অধিকাংশই অর্দ্ধশিক্ষিত। কি করিয়া যাত্রীদের সর্ব্বস্বান্ত করিতে হয় তাহার পথ সর্ব্বদা পরিস্কার করিতে জানেন। কিন্তু কথাবর্ত্তায় চালচলনে শীঘ্র তাহা বুঝিয়া লওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ যাত্রী মহাশয়েরাও বিশেষতঃ ভারত-

খণ্ডের পূর্ব্ব ভাগের মহাত্মারা যেমন ফাঁকি দিয়া কাজ সারিতে শিখিয়াছেন একদিনে সমস্ত তীর্থগুলির অভিজ্ঞতা লাভ প্রয়াসী, পাণ্ডাগণ তদ্রূপ সেয়ানা। তাহাদের পরস্পরের ব্যবহারে ও কার্য্যাদিতে প্রকৃতরূপে তীর্থ দর্শনাভিলাষিদেরও অনেক অসুবিধা হইয়া পড়ে ও ঠকিতে হয়।

হিমালয়গামী যাত্রীদের এস্থানে যান বাহনের ও কুলির বন্দোবস্তাদি করিতে হয় ও তদুপযোগী সব এস্থানে সুবিধাজনক পাওয়া যায়। কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমের পাণ্ডা মহারাজগণ এস্থান পর্য্যন্ত আসিয়া যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এখান হইতে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত টমটম্ ও এক্কা গাড়ী, গোযান প্রভৃতি পাওয়া যায়। যাঁহারা দেরাদুন হইয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিতে চাহেন তাঁহাদের হৃষীকেশ দর্শন করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের যানাদির ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন আর যাঁহারা কেবলমাত্র হৃষীকেশ দর্শনান্তে দেশে ফিরিয়া যান তাহারাও তাহাই করিয়া থাকেন। ১৫ই চৈত্র পর্য্যন্ত এখানে বাস করা হয়। ইতিমধ্যে হিমালয় ফেরত অনেক সাধু মহাত্মার দর্শন লাভ ঘটে, কিন্তু তাঁহারা সকলে নিঃসম্বল পর্য্যটনের প্রতিবাদ করেন। এগার দিন এইখানে অতিবাহিত করিয়া ও স্থানীয় সাধু মহাত্মাদের সঙ্গলাভ করিয়া পরম পুলকিত হই। পূর্ব্বে হিমালয় যাত্রীদের এখানে একটী পরীক্ষা দিতে হইত, সেই পরীক্ষা এই। পূর্ব্বকালে হিমালয়ে প্রবেশের জন্য বর্ত্তমান সময়ের মত সুবিধাজনক রাস্তা ঘাট কিছুই ছিল না। যাঁহারা মুমুক্ষু ও হিমালয়বাসী সাধু মহাত্মার দর্শনাকাঙ্ক্ষী তাঁহারাই হিমালয়ে যাইতেন। এখান হইতে ক্রমশঃ বড় বড় জঙ্গল পথে যাইতে হইত। তখনকার হরিদ্বার বাসী সাধু মহাত্মাগণ হিমালয় গামী মহাত্মাদের নানাবিধ ফলমূল চিনাইয়া দিতেন। শরীর পরীক্ষা করিয়া হিমালয়ে পর্য্যটন উপযোগী কি না দেখিতেন ও নানাবিধ উপদেশাদি দিতেন। এখন অনেক সাধু মহাত্মার উপদেশে অনেক ধনী ব্যক্তি স্ব স্ব ব্যয়ে বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মশালা, নদীর উপর পুল ও রাস্তাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, বিশেষতঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নেপাল যুদ্ধের পর কুমাউন বিভাগ দখলের পর অনেক রাস্তা ঘাট তৈয়ার হওয়াতে যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তাই আর কোন রকমের পরীক্ষা দিতে হয় না।

হরিদ্বার স্বর্গদ্বার বলিয়া যে অভিহিত হয় তাহার একটী প্রমাণ দেখা যায়। আমরা প্রাচীন ইতিহাসাদিতে যেখানে স্বর্গের বর্ণনা আছে সেখানে

দেখিতে পাই যে স্বর্গে সর্ব্ব বিষয়ে একটী সমন্বয় ভাব ও সর্ব্ব বিষয়ে স্বর্গবাসী সকলের সমান অধিকার আছে। এই স্বর্গের প্রবেশ দ্বার হরিদ্বার ধামেও কেমনি হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয় না সকলেই যেন যন্ত্র চালিত ভাবে স্ব স্ব কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। তবে কাল প্রভাবে বর্ত্তমান সময়ে অনেক বিলাসিতার ভাব ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিতেছে। এরকম শোনা যায় যে পূর্ব্বে এস্থানে সাধুমহাত্মাদের তৃণকাষ্ঠ নির্ম্মিত কুটীর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, এখন রাস্তার দুই পার্শ্বে বড় বড় দ্বিতল ত্রিতল বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। এসব হওয়া সত্ত্বেও সর্ব্ব বিষয়ে যেন একটী সৌম্য ভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত যেন একটী সর্ব্ব বিষয়ে জীবন্ত ভাব পরিলক্ষিত হয়, কোথায়ও বা উচ্চৈঃ স্বরে বেদ ধ্বনি ও স্তোত্র পাঠ হইতেছে, আবার কোথাও সাধু মহাত্মাগণ পূজা বা ধ্যান মগ্ন, কোথাও বা অগ্নিহোত্রী ও ব্রহ্মচারীগণের যজ্ঞীয় ধূমে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছে। আবার কোথায়ও বা মুমুক্ষুগণ সাধুমহাত্মাদের পাশে নীরবে উপবেশন করিয়া জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতেছেন। এই সব দেখিলে প্রাণ মন পুলকিত হয় আর যেন একটা নূতন দেশে আসিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। ১৬ই চৈত্র বুধবার প্রাতে সাধু মহাত্মাগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণান্তে সত্যনারায়ণ অভিমুখে যাত্রা করি।

পরিব্রাজক শুদ্ধানন্দ।

ছেলে।

(গল্প)

এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পূর্ব্বজন্মের পুণ্যের ফলে এ জীবনে এক সিদ্ধ পুরুষের শিষ্য হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রী, সংসারে আর তাঁহাদের কেহই নাই। প্রসব বেদনা উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সন্তান হইবে, এমন সময় গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের আর আনন্দের সীমা নাই। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করিলেন। আজ গুরুদেবের মুখমণ্ডল বড়ই গম্ভীর, তিনি আসিয়াই ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন।

ব্রাহ্মণের একটি পুত্র সন্তান হইল, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আসিয়া শঙ্খ বাজাইয়া হুলুধ্বনি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পুত্রমুখ দর্শন

করিয়া ব্রাহ্মণী সকল কষ্ট ভুলিলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া গুরুদেবকে শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন। গুরুদেব মুখখানি গম্ভীর করিয়া শিষ্যকে বলিলেন "একখানি তাম্রকুণ্ড লইয়া আইস।" নগরের নিকটে ব্রাহ্মণের বাস, ব্রাহ্মণ একখানি অতি বৃহৎ তাম্রকুণ্ড অনতিবিলম্বে লইয়া আসিলেন। তাহার পর গুরুদেব শিষ্যকে বলিলেন, "ছেলেটিকে লইয়া আইস।" গুরুদেব এমন ভাবে কথাগুলি বলিতেছেন যে ব্রাহ্মণ আর কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না, কাষ্ঠপুত্তলিকার মত তাঁহার আদেশ পালন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ সদ্যজাত পুত্রটিকে সূতিকা গৃহ হইতে লইয়া আসিলেন, গুরুদেব বলিলেন "তাম্রকুণ্ডে ছেলেকে শোয়াইয়া নদীর তীরে লইয়া আইস।" নিকটেই অতি বৃহৎ নদী—বিশাল জলরাশি প্রখর স্রোতে সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

গুরু ও শিষ্য নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে গুরুদেব সেই শিশুটিকে তাম্রকুণ্ড সহ গ্রহণ করিলেন ও নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রখর স্রোতে তাম্রকুণ্ড শিশুকে লইয়া কোথায় ভাসিয়া গেল, ব্রাহ্মণ নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ, চিত্রপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গুরুদেব বলিলেন "বাড়ী ফিরিয়া যাও, শোক করিও না, তোমার স্ত্রীকেও আমার নাম করিয়া শোক করিতে বারণ করিও।" এই বলিয়া গুরুদেব অন্যত্র চলিয়া গেলেন, ব্রাহ্মণ মৌনভাবে বাড়ী আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে গুরুদেবের সমস্ত কার্য্য ও আদেশ জানাইলেন। তাঁহার স্ত্রীর হৃদয় শোকে একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু গুরুদেবের আদেশ, নীরবে অনেক চেষ্টা করিয়া সমস্ত সহ্য করিলেন।

তাহার পর দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে, যে আনন্দময় পরমপুরুষ বিশ্বের ভিত্তিমূলে বিদ্যমান থাকিয়া জগতের শোক, দুঃখ ও অন্ধকার দূর করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই জগৎকে নূতন ও অমৃতময় করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহার বিধানে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর শোকের দাগ মুছিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণী আবার গর্ভবতী হইয়াছেন, আজ আবার প্রসব বেদনা উঠিয়াছে, অকস্মাৎ গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তাঁহার প্রসন্ন মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। গুরুদেব ঠিক পূর্ব্বের মত গম্ভীর হইয়া বসিলেন। আবার ব্রাহ্মণের একটি পুত্র হইল, তেমনি পূর্ব্বের মত আনন্দধ্বনি হইল, ব্রাহ্মণ ভয়ে ভয়ে গুরুদেবকে সুসংবাদ

প্রদান করিলেন। গুরুদেব ঠিক পূর্ব্বের মত গম্ভীরভাবে আদেশ করিয়া তাম্রকুণ্ড আনাইলেন, সদ্যজাত শিশুটিকে তেমনি করিয়া নদীর তীরে লইয়া গেলেন, প্রখর স্রোতে তেমনি করিয়া তাম্রকুণ্ড সহ শিশুটিকে ভাসাইয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ অবাক, সংসারী মানুষ, শোকের বেগ সহ্য করিতে পারিতেছেন না, বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে—এই অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন—ব্রাহ্মণী তখন কাঁদিতেছেন—ব্রাহ্মণ আসিয়া গুরুদেবের মহিমার কথা বলিয়া ব্রাহ্মণীকে অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন গুরুদেব যখন আমাদের ইহকালের ও পরকালের ভার লইয়াছেন তখন তিনি যাহা করিতেছেন, আমাদের মঙ্গল করিবার জন্যই করিতেছেন। ব্রাহ্মণী কোনরূপে শোক সম্বরণ করিলেন। ক্রমে শোকের ঝড় আস্তে আস্তে মন্দীভূত হইয়া বৎসরান্তে একেবারে থামিয়া গেল।

পূর্ব্বের ঘটনার পর আবার ঠিক দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। গর্ভবতী ব্রাহ্মণীর আবার প্রসব বেদনা উঠিয়াছে, গুরুদেবও আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণীর পুত্র সন্তান হইল, গুরুদেবও তাম্রকুণ্ড আনাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী কিছুতেই ছেলে দিবেন না। ব্রাহ্মণ জোর করিয়া ব্রাহ্মণীকে কাঁদাইয়া ছেলে লইয়া নদীতীরে গেলেন। পূর্ব্বের মত তাম্রকুণ্ডে করিয়া নদীর স্রোতে ছেলেটিকে ভাসাইয়া দিয়া গুরুদেব প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণীর তো কথাই নাই, এবারে ব্রাহ্মণও বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। হাজার হউক মানুষ তো, রক্তমাংসের শরীরে আর কত সহ্য হয়?

এক বৎসর পরে ব্রাহ্মণী পুনরায় গর্ভবতী হইয়াছেন। এবারে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলিলেন "দেশ ছাড়িয়া চল আমরা অন্য দেশে চলিয়া যাই, এ দেশে থাকিলে গুরুদেব আসিয়া অন্যবারের মত করিবেন।"

ব্রাহ্মণ প্রথমে অনেক প্রকারে ব্রাহ্মণীকে বুঝাইলেন, বলিলেন এবার যদি গুরুদেব সেরূপ করেন তাহা হইলে দুই স্বামী স্ত্রীতে তাঁহার পায়ে জড়াইয়া ধরিব, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই দয়া করিবেন।

ব্রাহ্মণী কিন্তু কোন সান্ত্বনা মানিবেন না—অগত্যা ব্রাহ্মণ তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বহুকালের পৈতৃক বাস্ত পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জন্মের মত গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। অনেক গ্রাম, অনেক নগর অতিক্রম করিয়া

এক নূতন রাজার দেশে আসিয়া বড় বাড়ী জমি জমা কিনিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

(২)

এবারে ব্রাহ্মণীর একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র শুক্লপক্ষের শশিকলার মত দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর আর আনন্দের সীমা নাই। ছেলেটিকে লইয়া স্বপ্নের মত তাঁহাদের দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে।

ক্রমে পুত্রের উপনয়ন হইয়া বিদ্যারম্ভ হইল। এমন মেধাবী ও প্রতিভা-শালী বালক আর জন্মায় নাই, লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সেই রাজ্যের যিনি রাজা, তিনি যেমন বিদ্যোৎসাহী তেমনি গুণগ্রাহী। ব্রাহ্মণের পুত্রের প্রশংসা রাজারও কর্ণগোচর হইল। কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পুত্র সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন। রাজা আদর করিয়া তাহাকে সভাসদ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই যুবকের গুণে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাহাকে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী করিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর আর আনন্দের সীমা নাই—অত্যধিক আনন্দের মত্ততায় আর গুরুর কথা তাঁহাদের মনে নাই।

এইবার ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী শুভদিনে শুভলগ্নে পুত্রের বিবাহ দিয়া পরমাসুন্দরী পুত্রবধূ গৃহে আনিলেন। চারিদিকেই আনন্দ, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর আর সৌভাগ্যের সীমা নাই।

এমনি করিয়া বাইশ বৎসর কাটিয়া গেল, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর বয়সও হইয়াছে। কবে কি হইবে, কেহই জানে না। ব্রাহ্মণের ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল, রোগ নাই বালাই নাই, বুকের কাজ বন্ধ হইয়া হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ফুরাইয়া গেল, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর এত সাধের সাজান বাগান নিমেষের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া ব্রাহ্মণ কাঁদিতেছে; ব্রাহ্মণী মাটিতে মাথা খুঁড়িতেছে, ধারা বাহিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া রক্তের স্রোত মাটিতে গড়াইতেছে। নববধূর মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা হইতেছে। সহর শুদ্ধ লোক আসিয়া ব্রাহ্মণের অঙ্গনে মিলিত হইয়া সকলেই হায় হায় করিতেছে।

গুরুদেবের কথা এতদিন ব্রাহ্মণের বড় একটা মনে ছিল না। মধ্যে মধ্যে মনে পড়িলে, কেমন একটা ভয়ের উদয় হইত, তাই তাঁহার কথা ভুলিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন। আজ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়িয়া

গেল. গুরুদেবের সেই সৌম্যমূর্ত্তি, সেই বর্ণনাতীত স্নেহ ও প্রেমের কথা মনে হওয়ায় তাঁহার মনে ভয়ানক অনুশোচনার উদয় হইল, বেশ বুঝিতে পারিলেন যে গুরুদেবের পদাশ্রয় পরিত্যাগ করাতেই তাঁহাকে অদৃষ্টের হস্তে এইরূপে ক্রীড়নক হইতে হইয়াছে। প্রকৃতি তাঁহাদের লইয়া কি দারুণ উপহাসই না করিল? একবার সৌভাগ্যের সপ্তস্বর্গে তুলিয়া তাহার পর শোকের অন্ধতম গহ্বরের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণপদ্ম স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন রোদন ধ্বনিতে গৃহাঙ্গন পূর্ণ, মৃতদেহ এই মাত্র অপসারিত হইয়াছে, এমন সময়ে গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উভয়েই ক্ষণকালের জন্য শোকের জ্বালা ভুলিয়া গুরুদেবের চরণমূলে আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। গুরুদেব খুব গম্ভীরভাবে তাহাদের বলিলেন "যাহা নিয়তি ও অনিবার্য্য তাহা হইয়াছে। আমি সমস্তই জানি। তোমরা পুত্র-শোকে ভয়ঙ্কর কাতর হইয়াছ, এখন জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি পুত্র চাও?"

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। গুরুদেবের প্রসন্ন ও প্রশান্ত মুখমণ্ডলের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। গুরুদেব তাহাদের মৌন ভাব দেখিয়া বলিলেন "তোমরা যখন চুপ করিয়া রহিয়াছ তখন যেন মনে হইতেছে তোমরা পুত্র চাও। এতো অতি সহজ কথা, ইহার জন্য ব্যাকুল হইতেছ কেন? আর শোক করিও না। ভূমি শয্যা হইতে উত্থান কর। আমি তোমাদের পুত্র আনিয়া দিব, যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে কেবল একপুত্র নয়, সমস্ত পুত্রগুলিই ফিরিয়া পাইবে।"

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু গুরু-দেবের এমনি শক্তি যে তিনি যাহা করিতে বলিবেন তাহা না করার কাহারও সাধ্য নাই। ফলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন।

তাহার পর গুরুদেব আপন যোগশক্তির দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সূক্ষ্মদেহে শক্তিসঞ্চার করিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে নিজেদের স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া গুরুদেবের অনুবর্ত্তন করিতে করিতে যমালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে এক অপূর্ব্ব দেশ। উজ্জ্বল মূর্ত্তিধারী অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণ নিজেদের গোত্রোৎপন্ন ব্যক্তিদের মঙ্গলের জন্য সমাধিস্থ হইয়া

রহিয়াছেন, তাহার পর চারিদিকে নরককুণ্ড। অতি ভীষণ দৃশ্য, গুরুদেব একে একে সেই সমস্ত কুণ্ডের পরিচয় দিতে লাগিলেন।

তামিস্র নরক অতিভীষণ, সূচীভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন—যাহারা ইহ-জীবনে পরধন, পরস্ত্রী, পরপুত্র প্রভৃতি অপহরণ করিয়াছে তাহারা এই নরকে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত হইয়া বিকটাকার যমদূতগণের দুর্ব্বিষহ তাড়না সহ্য করিতেছে ও কাতরে চীৎকার করিতেছে। তাহার পর অন্ধ-তামিস্র, সে আরও ভয়ানক। তৎপার্শ্বে রৌরব নরক। যাহারা স্বার্থপর ও দেহসর্ব্বস্ববাদী ইহজীবনে পরদ্রোহ ও পরহিংসা আচরণ করিয়াছে তাহাদের সেই হিংসাগুলি এখানে 'রুরু' নামক এক প্রকার, সর্প হইতেও ক্রূর ভীষণ বিষধর প্রাণীতে পরিণত হইয়াছে, নিজকৃত হিংসা কর্ম্মের দ্বারা মানবসকল এই রৌরবনরকে অসহায় অবস্থায় ক্লিষ্ট হইতেছে। তাহার পর মহারৌরব, সে আরও ভয়ানক। তৎপার্শ্বে কুম্ভীপাক—উগ্রস্বভাব ব্যক্তিগণকে যমদূতেরা এই নরকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিতেছে। তৎপরে তাম্রময় অত্যুষ্ণ সমভূমি, মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য, শত শত পাপী ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া এই কালসূত্র নরকে পাগলের মত উধাও ছুটিয়া বেড়াইতেছে—তৎপরে অসিপত্রবন, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, কৃমিকুণ্ড প্রভৃতি নরক—তাঁহারা যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই ভয়ানক। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আর নরকদৃশ্য দেখিতে পারিলেন না। তখন গুরুদেব তাঁহাদের অন্যস্থানে লইয়া গেলেন। তাঁহারা দেখিলেন সূর্য্যদেবের পুত্র ভগবান যমরাজ স্বগণ-সহ সভায় উপবেশন করিয়া মৃতপ্রাণীদের কর্ম্মানুসারে দোষাদোষের বিচার করিয়া দণ্ড দান করিতেছেন। তাঁহারা তিনজনে অলক্ষ্যভাবে বিচারা-লয়ের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই বিচারকার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

যমরাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন "দেখ——গ্রামের——ব্রাহ্মণের শাস্তির জন্য যে দূতকে পাঠান হইয়াছিল, সে কি ফিরিয়া আসিয়াছে ?"

ব্রাহ্মণ দেখিলেন যমরাজ তাঁহারই নাম করিতেছেন, তিনি উৎকণ্ঠিত হইলেন, ব্রাহ্মণীও কাঁপিয়া উঠিলেন।

একজন দূত অতিশয় মলিনমুখে আসিয়া যমরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "প্রভো, আমি কিছুই করিতে পারি নাই, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

"কিছুই করিতে পার নাই কেন ?"

"প্রভো অনেক চিন্তা করিয়া আমি ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া তাহার স্ত্রীর গর্ভে বাস করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এই ব্রাহ্মণের যিনি গুরু তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ, তিনি আমার জন্মের পরেই এক তাম্রকুণ্ডে করিয়া আমাকে নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। সুতরাং আমি ব্রাহ্মণের বেশী কিছু করিতে পারি নাই।"

এই বলিয়া যমদূত যমরাজের অনুমতি পাইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলে, যমরাজ বলিলেন, "আর কোন্ দূত সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর শাস্তির জন্য গিয়াছিল ?"

আর একজন দূত ঠিক পূর্ব্বদূতের মত মলিনমুখে আসিয়া যমরাজকে প্রণাম করিয়া যুক্ত করে দাঁড়াইল ও বলিল "প্রভো, আমিও কিছু করিতে পারি নাই, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন ?" যমরাজের প্রশ্নে এ ব্যক্তিও ঠিক পূর্ব্ব ব্যক্তির বর্ণিত ঘটনা পুনরায় বর্ণনা করিল।

এইবার যমরাজ তৃতীয় দূতকে ডাকিলেন, সেও আসিয়া পূর্ব্বদুইজনের বর্ণিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিয়া গেল।

এইবার চতুর্থ দূতকে ডাক পড়িল। সে দম্ভভরে হেলিয়া দুলিয়া বুক ফুলাইয়া আসিয়া যমরাজকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। যমরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি করিয়াছ ?"

সে বলিল "মহারাজ। আমি একাই আমাদের চারিজনের কার্য্য করিয়া আসিয়াছি। আমিও আমার সঙ্গীগণের ন্যায় ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করি। আমি যখন গর্ভে তখনই ব্রাহ্মণ পিতৃপুরুষের বাস্তু ও সেই সিদ্ধপুরুষ গুরুর চরণাশ্রয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল; তখন সে বিদেশে আসিয়া বাস করে। আমি তাহার পুত্র হইয়া ২০ বৎসর ছিলাম। বিদ্যা, বুদ্ধি ও সম্ভ্রমে সমস্ত লোককে চমৎকৃত করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর একেবারে সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িলাম। আমা ছাড়া আর তাহারা কিছুই জানে না। এই যখন অবস্থা তখন ভাবিলাম, এইবার ইহাদের ছাড়িয়া যাই, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। পরে ভাবিলাম, যখন যাইব তখন একটি স্থায়ী রকমের শেল ইহাদের বুকের উপর পুঁতিয়া রাখিয়া যাওয়াই সঙ্গত। এই ভাবিয়া বিবাহ করিলাম ও স্ত্রী রাখিয়া একদিন হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছি।"

দূতের কথায় যমরাজ বিশেষ তুষ্ট হইয়া তাহার পদোন্নতি করিয়া দিলেন,

গুরুদেব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলিলেন এই তোমাদের, নয়নের মণি পুত্র ঐ দেখ সভায় বসিয়া আছে।" ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী এবার চাহিয়া দেখিলেন, ঠিক তাহাদের সেই মৃত পুত্রের ন্যায় চেহারা।

গুরুদেব বলিলেন "যদি তোমাদের পুত্রের প্রয়োজন হয় বল আমি ডাকিয়া লইয়া আসিতেছি।"

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী গুরুদেবের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, চোখের জলে চরণ ধৌত করিয়া দিতে লাগিলেন ও বলিলেন গুরুদেব আর মোহের শৃঙ্খলে বাঁধিবেন না। অতঃপর তাঁহারা তিনজনে ফিরিলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রবধুও গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিলেন। ব্রাহ্মণ আপনারি পৈতৃকগ্রামে ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহারা তিনজনে সংসার সাগরের তরণীরূপে গুরুদেবের চরণদুখানি দৃঢ়রূপে ধরিলেন—তাঁহারা তিনজনে সমস্বরে সর্ব্বদাই অশ্রুসজল-নেত্রে আবৃত্তি করেন—

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষীভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামঃ।"

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

খেলা।

তুমি বুঝি এমনি করিয়া,
মানুষের হৃদয় লইয়া,
খেলা করে' কাটাইছ অনন্ত যৌবন—
এমনি কি খেলার খেয়ালে,
মধুমাসে শান্ত সন্ধ্যাকালে
একদিন ডেকে মোরে দিলে দরশন।
সেদিনের সেই সন্ধ্যাকালে,
মধুময় চন্দ্র কর জালে
উজলিত দশদিশি, বহিল মলয়,

এসেছিল কত নরনারী
সকলেই গৃহে গেল ফিরি,
তুমি শুধু যেচে নিলে আমার হৃদয়!
প্রবাসের শূন্যতার দিন
আমি ছিনু বিষণ্ণ মলিন
হৃদয়ের গুরুভারে অবশ কাতর,
আঁখি কোণে স্নেহ বিকাশিলে
আলো ঢেলে মধুরে হাসিলে
স্বেচ্ছায় তোমার' পরে করিনু নির্ভর।
তার পর বহুদিন গত,
ভ্রমিলাম দেশ শত শত,
কত গিরি, কত নদী মানব মানবী,
কত প্রেম স্নেহ ভালবাসা,
কত মোহ সম্মান নিরাশা
হৃদয়ের মাঝে এসে এঁকে গেল ছবি।
কিন্তু তুমি কুহক দেবতা,
সকলের নোয়াইয়ে মাথা
উচ্চ ক'রে পাতিয়াছ নিজ স্বর্ণাসন,
যাহা আসে সকলি ফুরায়,
ব্যস্ততায় দিন কেটে যায়
ধ্রুব অচঞ্চল শুধু তোমারি শাসন।
বরষায় বিদেশে একেলা
নদীতীরে হেরি জল খেলা
আকাশে মেঘের দল ছুটাছুটি করে
উচ্ছৃঙ্খল আর্দ্র সমীরণ
নিয়ে এসে তব পরশন
ডুবাইয়া দিয়ে যায় স্বপন সাগরে।
পূর্ণিমার উজ্জ্বল রজনী,
চারিদিকে অসীম বনানী
অতিদূর জনহীন পার্ব্বতীয় দেশ,

একা ধাই রহস্য মাঝারে
চারি দিকে হেরি বারে বারে
বিশ্ব জুড়ি তব হাসি লাবণ্য অশেষ ।
সাগরের লহরীর মত
স্নেহ-সাধ নিত্য শত শত
অবিরাম ও চরণে পড়ে লুটাইয়া
কিন্তু তারা ভেঙ্গে কেঁদে আসে,
তবু ছুটে যায় কত আশে ;
এই খেলা খেলিতেছ লয়ে মোর হিয়া ।
তবে বুঝি এমনি করিয়া,
এ জীবন যাইবে কাটিয়া,
মোর মত আছে বুঝি কোটি কোটি জন !
আর তুমি এমনি করিয়া,
তাহাদের হৃদয় লইয়া
খেলা করে' কাটাইছ অনন্ত যৌবন :—
আমাদের ভগ্ন হৃদিতল—
অনুরাগ রক্ত শতদল,
এই বুঝি চিরদিন তোমার আসন—
কোন্ দূরে কত উচ্চে বসি,
ছড়াইয়া মোহময়ী হাসি
অঞ্চল উড়ায়ে বিশ্বে করি নিমন্ত্রণ
এই মত খেলা করে' কাটাও যৌবন ।
চূর্ণ হৃদয়ের রক্ত-অলক্ত-রঞ্জিত
নিরাশার দীর্ঘশ্বাসে নিত্য আপ্যায়িত !

শ্রী—

আলোচনা।

গত মাঘ মাসের "কুশদহ" পত্রিকায় "রামায়ণের সমাজ" নামক প্রবন্ধের লেখক মহাশয় স্ত্রীজাতির শিক্ষা আচার ইত্যাদি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি সামান্য কিছু আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজে এখনো অনেকে উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী আছেন। তাহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু এই উচ্চ শিক্ষা গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতির অর্জ্জিত উচ্চ শিক্ষা নহে। আমাদের বিশ্বাস, গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মপরায়ণা রমণীগণের অনুকরণে প্রকৃত সুশিক্ষা বা ব্রহ্মবিদ্যা অর্জ্জনের সম্ভাবনা থাকিলে, কোন হিন্দুই স্বীয় স্ত্রীকন্যা ভগিনীদিগকে সেই শিক্ষায় বঞ্চিত রাখিতে ইচ্ছা করিতেন না। কিন্তু আজ কালকার বিদ্যালয় সমূহে উচ্চ শিক্ষার নামে যাহা প্রচলিত, স্ত্রীজাতির চরিত্রোন্নতি বিধানে তাহা সম্পূর্ণ উপযোগী কিনা, সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান যুগে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষার নামে অধিকাংশ স্থলে বিলাস বিভ্রম শিক্ষাই হইয়া থাকে। এই বিষয়ে শুধু আমাদের নিজের কথা বলিতেছি না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুযোগ্য পৌত্র সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তাঁহার "আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"অধিকাংশ ভদ্রমহিলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বা না হইয়া কিছুতেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে না। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা তাহাতে দেখিতেছি অধিকাংশ নব্য মহিলা বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই ইংরাজী নভেলগুলি, বাঙ্গালার বঙ্কিম বাবুর ন্যায় খ্যাতনামা লেখকদিগের উপন্যাসগুলি এবং প্রেম বিষয়ক কবিতা পাঠ করিয়াই সময় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করেন।"

স্ত্রীশিক্ষার ফলাফল বিষয়ে ভুক্তভোগী একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যদি এরূপ বলিতেছেন, তবে আর হিন্দুগণ বর্ত্তমান উন্নত স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অনুরাগী হইবেন কোন্ সাহসে ?

রামায়ণের কালে আর্য্যরমণীদের মধ্যে অবরোধ প্রথা বর্ত্তমান ছিলনা, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রবন্ধ লেখক মহাশয় রামায়ণ হইতে রামচন্দ্রের উক্তি বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—রাবণবধের পরে সীতারামের মিলনকালে বৈদেহীদর্শনোৎসুক ঋক্ষবানর ও রাক্ষসগণ বিভীষণ কর্ত্তৃক

নিবারিত হইলে রামচন্দ্র সেই উৎসার্য্যমাণ সেনাগণকে সন্ত্রস্ত দর্শনে কৃপাপরবশ হইলেন এবং ক্রোধে বিভীষণকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "কি হেতু ইহাদিগকে কষ্ট দিয়া আমাদের অনাদর করিতেছ? গৃহ বস্ত্র প্রাকার অথবা ঈদৃশ লোকাপকরণ স্ত্রীলোকের আবরণ নহে। স্বামীকর্তৃক সংকৃত হওয়াই ইহাদের আবরণ, জানকীর তো তাহা হইয়াছে।" এই উক্তিদ্বারা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, তৎকালে সাধারণতঃ রমণীগণ গৃহাদিতেই অবরুদ্ধ থাকিতেন। নতুবা রামচন্দ্র ঐ বিষয় উল্লেখ করিবেন কেন? বিভীষণই বা জানকী দর্শনোৎসুক রাক্ষস বানর প্রভৃতিকে নিবারণ করিতে যাইবেন কেন? কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ রমণী-দিগকে শুধু অবরোধে রাখিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন না; তাঁহাদের রক্ষণার্থ স্বামীর আদর যত্ন লাভেরও বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করিতেন। রামচন্দ্র স্বামীসোহাগিণী সীতার চরিত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই সকলের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য নিজের সমক্ষে সীতাকে শিবিকা হইতে বাহির হইতে বলিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা রামচন্দ্র কোনরূপেই অবরোধ প্রথার অস্তিত্ব বা আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই। তিনি ত পরক্ষণেই বলিলেন,—"ব্যসন, পীড়ন, যুদ্ধ, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও বিবাহ সময়ে রমণীগণের লোক সমাজের সম্মুখীন হওয়া দোষাবহ নহে। জানকী বিপদ্ ও ভয়ানক কৃচ্ছ্রে পড়িয়াছেন; অতএব এমন সময়ে বিশেষতঃ আমার সম্মুখে তাঁহার দর্শন দোষাবহ হইবে না।" এই স্থলে ত স্পষ্টাক্ষরেই বলা হইল যে, ব্যসনাদি সময় ভিন্ন অন্য সময়ে রমণীগণের লোক সমাজের সম্মুখীন হওয়া দোষাবহ। অভিষেকাদি ধর্ম্মকার্য্যের সময়ে এবং বন গমন প্রভৃতি বিপদের সময়ে সীতা লোক সমাজের সম্মুখীন হইয়াছিলেন কেন, তাহার কৈফিয়ৎ ও ইহাতেই আছে। প্রবন্ধ লেখক বলিয়াছেন, "বন গমন কালে সীতাকে লোকে দেখিলে কুলকলঙ্ক বা ধর্ম্ম নষ্ট হইবে এরূপ কথা কেহ বলেন নাই।" পতিপ্রাণা সীতা বীরাগ্রগণ্য পতি এবং দেবরের দ্বারা সুরক্ষিতা হইয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রতি পালনের জন্য বনে গমন করিতেছেন। এই অবস্থায় অবরোধ প্রথা বর্ত্তমান থাকিলেই লোকে 'কুলকলঙ্ক' বা 'ধর্ম্ম নষ্টের' আশঙ্কা করিবে কেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বিশ্বস্ত আত্মীয় স্বজন বা স্বামীর সমভিব্যাহারে হিন্দুরমণীগণ আজকালও তীর্থাদি স্থানে গমন করিয়া থাকেন, তাহাতে ত কেহই দ্বিধা বোধ করেন না। সুতরাং

আমরা দেখিতেছি, রামায়ণের সমাজেও অবরোধ প্রথা বর্ত্তমান ছিল। রামায়ণে স্পষ্টই লিখিত আছে,—

"রুদ্ধাচান্তঃপুরে গুপ্তা তৎচ্চিত্তা তৎপরায়ণা।" অর্থাৎ—পতিগতচিত্তা সীতা অন্তঃপুরে রুদ্ধা ও রক্ষিতা হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

হিন্দু রমণীর অবরোধ প্রথা বা পুরুষাধীনতা মুসলমান জেনানা প্রথার ন্যায় কঠোর নহে এবং তাহা মুসলমানদের নিকট হইতে প্রাপ্তও নহে। যে হেতু, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য গ্রন্থ সমূহে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনু বলিয়াছেন,—"নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি।" অর্থাৎ স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের যোগ্য নহে। মহাভারতে দ্রৌপদী দুঃখের সহিত বলিতেছেন,—

"ন দৃষ্টপূর্ব্বা বান্যত্র সাহমদ্য সভাং গতা।
যাং ন বায়ু নচাদিত্যো দৃষ্টবন্তৌ পুরা গৃহে॥"

অর্থাৎ—আমাকে পুর্ব্বে অন্যত্র কেহ কখনো দেখে নাই, সূর্য্যও বায়ু পর্য্যন্ত আমাকে পূর্ব্বে দেখেন নাই। সেই আমাকে আজি সভায় আসিতে হইল. এই সকল কবিবাক্য এবং "অসূর্য্যম্পশ্যা, রাজদারা" এই সকল পদ সমূহ ও বোধ হয় ভারতে মুসলমান অধিকারের বহু পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল।

লেখক মহাশয় রামায়ণের সমাজ আলোচনা করিতে যাইয়া উত্তর রাম চরিত হইতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। উত্তররামচরিত রামায়ণ রচনার বহু সহস্র বৎসর পরে কবিবর ভবভূতি কর্ত্তৃক বিরচিত একখানি দৃশ্যকাব্য। তাহাতে রামায়ণে বর্ণিত বিষয়ের অনেকই পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। সুতরাং তাহার সাহায্যে রামায়ণের সমাজ নিরুপণ করা কিরূপে সম্ভবপর? উত্তর রাম-চরিতে নব বিবাহিতা সীতার যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই তাহাতে তাঁহাকে একটি কচি বালিকা বলিয়াই মনে হয়। সীতার যৌবন বিবাহের সমর্থনকারী লেখক মহাশয় তাহা কখনো অনুমোদন করিতে পারিবেন কি? উত্তররামচরিতে বর্ণিত জনক ও কৌশল্যার কথোপকথন শুনিয়াই তিনি স্থির করিলেন যে, দশরথের পরিবারে অবরোধ প্রথা বর্ত্তমান ছিল না। আমরা ত দেখিতে পাই, আজকাল কঠোর পর্দ্দানসিন পরিবারেও জনক ও কৌশল্যার মত বয়সের নিকট সম্পর্কিত বৈবাহিক বৈবাহিকাগণ সর্ব্বত্রই স্বচ্ছন্দে দেখা সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া থাকেন; স্থল বিশেষে সম্পর্কোচিত হাস্য কৌতুকও করেন। তাহাতে অবরোধ প্রথা ক্ষুণ্ণ

হইবার কারণ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ সাধুতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য রাজর্ষি জনক লোক সমাজে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কৌশল্যার মত বৃদ্ধা কেন নিঃসম্পর্কিতা কোন যুবতীরও তাঁহার সহিত কথোপকথন অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

এই সকল আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, রামায়ণে সমাজে অবরোধ প্রথার অস্তিত্ব খণ্ডণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার একটিও সুপ্রযুক্ত হয় নাই।

শ্রীপ্রিয়বালা সেন গুপ্ত।

ভাগবত ধর্ম্ম।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা সেই লীলাই শ্রীমদ্ভাগবতের সকল কথার সার কথা। এই যে শ্রীবৃন্দাবনলীলা ইহার তত্ত্ব অবগত হইলেই মানবের সাধন পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। স্তরে স্তরে অগ্রসর হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত এই লীলা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আমাদিগকেও শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে এই স্তরগুলি অতিক্রম করিতে হইবে, নতুবা শ্রীবৃন্দাবন লীলার রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভগবানের যে আনন্দময় ভাব, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে, এই ভাব উপলব্ধি করাই বৈদিক সাধনারও চরম আদর্শ। লীলার মধ্যে দুইটি পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে আমরা শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইতে পারিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থূলভাবে সেই পথ দুইটি দেখান হইতেছে, পরে এই দুইটি পথের তত্ত্ব বিশদরূপে আলোচনা করা যাইবে।

আনন্দময় ভাবের চরম উপলব্ধিতে এক ভগবানের কর্ত্তৃত্ব ছাড়া অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব থাকে না। "ভগবানের কর্ত্তৃত্ব ছাড়া অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই' এই কথাটি শুনিলে এ কালের লোকে বড়ই অসন্তুষ্ট হয়, কারণ তাহারা মনে করে যে ইহাতে মানবের স্বাধীনতা নষ্ট করা হইল। কিন্তু এই ধারণাটি একেবারে ভ্রান্ত। ভগবানের সত্তা যে কিরূপ সে সম্বন্ধে আমাদের প্রায়ই কাহারও একটা বেশ পরিস্কাররূপ জ্ঞান নাই, সেই জন্য

মনে করি যে ভগবানেরই কর্তৃত্ব আর কাহারও কিছু নাই. একথা বলিলে মানবইচ্ছার স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হয়। এই জন্য সর্ব্বপ্রথমে ভগবানের সত্ত্বা কিরূপ তাহারই আলোচনা দরকার।

ভগবানের সত্ত্বা

আমাদের জগতের দেশ কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ বস্তু বা ঘটনা সমূহের সত্ত্বার মত নহে। আমাদের সত্ত্বা কিরূপ? দোয়াতটি যে আছে, সে কিরূপে আছে, বা তাহার এই থাকাটা কিরূপে সিদ্ধ হইতেছে? ইহার উত্তর এই যে দোয়াতটি কলম নয়, পেন্সিল নয়, বালিশ নয়, বই নয়। আমাদের এই দেশকাল ও নিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ জগতে একটা কিছু হইতে হইলে, আর কতকগুলি কিছু 'না হইতে' হইবে। এই না হওয়ার মধ্য দিয়া প্রাকৃত প্রপঞ্চের যাবতীয় সত্ত্বা সিদ্ধ হইতেছে। যেমন স্থূল জগতে জড়বস্তুর একটি ধর্ম্ম আছে তাহার নাম "স্থানাবরোধকতা"। গাড়ুতে জল পূর্ণ করিতে হইলেই বাতাসকে চলিয়া যাইতে হইবে। জল থাকা মানেই বাতাসের না থাকা। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেক থাকা'র সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড 'না থাকা' নিত্যকাল অবিচ্ছেদ্য ভাবে লাগিয়া রহিয়াছে। 'আমি' যদি একমাত্র কর্ত্তা হই তাহা হইলে আর 'আপনি' বা 'তিনি' কর্ত্তা হইতে পারেন না। এই জন্য লোকে আসিয়া প্রায়ই প্রশ্ন করে, "আচ্ছা মহাশয় ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই যদি সমস্ত হইতেছে তবে আমি আমার কর্ম্মের জন্য দায়ী হইব কেন?" ইহার উত্তর এই যে "ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সমস্ত হইতেছে" এইটুকু বুঝিয়াছে এমন যে 'তুমি', তাহার তো কোনই দায়ীত্ব নাই, কিন্তু 'ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সমস্ত হইতেছে' এই বাক্যটি মুখে বলা আর তাহা জানা তো এক নয়।

আমাদের অবস্থা কেমন? ঠিক সেই মুটের মত। একবার এক মুটে খুব ভাড়ি মোট মাথায় করিয়া রাস্তায় যাইতেছে, গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড সূর্য্য চারিদিকে আগুণ ছড়াইতেছেন, মাটি গরম হইয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। মুটে বেচারার ভয়ানক কষ্ট হইতেছে। সে বলিতেছে, হে ঠাকুর, তুমি যদি আমায় রাজা করো, তাহা হইলে আমি এই রাস্তায় বনাত বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর দিয়া মোট লইয়া যাই। এই যে গল্পটি ইহার মধ্যে অনেক শিখিবার আছে। এই মুটে বেচারা ভালমানুষ লোক, সে রাজভাব কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেছে. কিন্তু সে মুটেভাবে এতই বদ্ধ যে কল্পনা করিয়াও

ষোল আনা রাজভাব কল্পনা করিতে পারিতেছে না। সে যদি রাজা হয় তাহা হইলে রাস্তায় বনাত বিছাইয়া দিতে পারিবে, কিন্তু তাহা হইলে তাহাকে যে আর মোট বহিতে হইবে না, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। "আমি ঈশ্বরের" ইহাই পরমার্থ সত্য, এবং ইহাই বিদ্যা। কিন্তু আমি তাহা জানিতেছি না, ইহাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যা হইতেই আমার পার্থক্য-বুদ্ধি, স্বাতন্ত্র্য ও কর্ত্তৃত্বাভিমান। এই পার্থক্যবুদ্ধি, স্বাতন্ত্র্য ও কর্তৃত্বাভিমান আমাদের মধ্যে এত প্রবল যে আমরা সহস্র চেষ্টা করিয়াও ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি না। যখন বলি ঈশ্বর আছেন তখন আমি তাঁহার হইয়া গিয়াছি, যদিই বা স্বাতন্ত্র্য থাকে (একদল পণ্ডিত বলেন স্বাতন্ত্র্যই থাকে না) তাহা হইলে সে স্বাতন্ত্র্যকে স্বাতন্ত্র্য বলা যায় না। আমার ইচ্ছা একেবারে সেই ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাই উত্তমা ভক্তি।

তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে এই জগতে আমরা দেখি যে একজনের সত্ত্বা ও কর্ত্তৃত্বের অর্থই এই যে তাহা অপরের সত্ত্বা বা কর্ত্তৃত্বকে অস্বীকার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ঈশ্বরের সত্ত্বা বা কর্ত্তৃত্ব কাহারও সত্ত্বা বা কর্ত্তৃত্ব ধ্বংস করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করে না, অপর সকলের সত্ত্বা বা কর্ত্তৃত্বের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রতিষ্ঠা করে! এইটুকু আমাদিগকে বেশ ধীরভাবে উপলব্ধি করিয়া দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণা করিতে হইবে— এটুকু ধারণা একটু কঠিন। কিন্তু এটুকু ধারণা করিলে আর কোনো গোল নাই। ভক্তিশাস্ত্রের রহস্য ও শ্রীবৃন্দাবন লীলার তত্ত্ব সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

একটা উদাহরণ দিই। পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কেন হইয়াছে ও কিরূপে হইয়াছে ভোজবৃত্তিতে বেশ ভাল করিয়াই বলা হইয়াছে। সেখানে এইরূপ বলা হইয়াছে যে সাংখ্যদর্শন আমাদিগকে প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়া গেলেন। বলিলেন প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই নিত্য, অনাদি ও অপরিচ্ছিন্ন, এবং নিষ্ক্রিয়; উভয়েই স্বতন্ত্র, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব। প্রকৃতি জড়, কিন্তু পুরুষ চেতন; প্রকৃতি পরিণামী, পুরুষ নির্ব্বিকার; প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নির্গুণ (গুণাতীত)। প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা; প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা; প্রকৃতি বিষয়, পুরুষ বিষয়ী। পুরুষ কূটস্থ, কেবল এবং অসঙ্গ।

কিন্তু সাংখ্যমতে পুরুষ বহু। "জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্।" সাংখ্য-সূত্র ১।১৪৯। ইহার কারণ দিলেন এই যে যদি বহুপুরুষ না হইত তাহা হইলে একজন মরিলে অমনি সবাই মরিয়া যাইত, একজন জন্মাইলে সকলকেই জন্মাইতে হইত, একজনের কোন ইন্দ্রিয় বিকল হইলে অন্যান্য সকলেরও সেই ইন্দ্রিয় বিকল হইত, একজনের একটি কার্য্যে প্রবৃত্তি হইলে সকলেরই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত; কিন্তু কার্য্যতঃ জগতে তাহা দেখা যায় না, একজনে একটি গুণ প্রবল দেখা যায়, আর একজনে আর একগুণ প্রবল দেখা যায়। এই জন্যই সাংখ্যদর্শন বহুপুরুষের কথা বলিলেন।

"জন্ম মরণ করণানাং প্রতিনিয়মাদ্ অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যয়াচ্চ।" কারিকা ১৮

তত্ত্বসমাসেও এই কথা আরও ভাল করিয়া লিখিয়াছেন

"যদ্যেকঃ পুরুষঃ স্যাদেকস্মিন্ সুখিনি সর্ব্বএব সুখিনঃ স্যুঃ। একস্মিন্, দুঃখিনি সর্ব্বএব দুঃখিনঃ স্যুঃ। একস্মিন্ মূঢ়ে সর্ব্বে মূঢ়াঃ স্যুঃ। একস্মিন্ সঙ্কীর্ণে সর্ব্বে সঙ্কীর্ণাঃ স্যুঃ! একস্মিন্ বিশুদ্ধে সর্ব্বে বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ। একস্য করণাপাটবে সর্ব্বেষাং করণাপাটবঃ স্যাৎ। একস্মিন্ জাতে সর্ব্বে জায়েরন্। একস্মিন্ মৃতে সর্ব্বে ম্রিয়েরন্। ইতি ন চৈক ইতশ্চ বহুবঃ পুরুষাঃ সিদ্ধাঃ।"

যাহা হউক এই প্রকৃতি পুরুষের একবার সংযোগ হয়, একবার বিয়োগ হয়। সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। তাহার পর প্রকৃতি, পুরুষের মোক্ষসাধন করিয়া নিবৃত্ত হয় এবং পুরুষ ও প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির পরিণামের দুইটি প্রয়োজন;—প্রথম ভোগ আর দ্বিতীয় প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান। এখন এই দুইটি প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গেল, কাজেই বিয়োগ হইয়া গেল—সাংখ্যের মতে ইহারই নাম কৈবল্য বা মুক্তি।

এই কৈবল্যের কারিকা বেশ সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥" ৫৯
"প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাহস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য।" ৬১

নর্ত্তকী যেমন দর্শকদের নাচ দেখাইয়া নিবৃত্ত হয় প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষকে আপনার রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হন। প্রকৃতির অপেক্ষা অধিক সুকুমার আর কিছুই নাই, কারণ পুরুষ তাঁহাকে একবার দেখিলে আর তিনি পুরুষের দর্শন পথবর্ত্তিনী হয়েন না। সাংখ্য কারিকায় যাহা বলিয়াছেন সূত্রেও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন, সূত্রে আছে

"নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ।
দোষবোধোঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ॥"

এখন প্রকৃতি পুরুষের এই যে সংযোগ বিয়োগ পাতঞ্জল দর্শনের মতে এবং গীতার মতে তাহা ভগবানের ইচ্ছায় সাধিত হয়। গীতা বলিতেছেন

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।"

অর্থাৎ ভগবানের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে।

ভোজ তাঁহার পাতঞ্জলদর্শনের রাজমার্ত্তণ্ড বৃত্তিতে বলেন—

"তস্য স্ব প্রয়োজনাভাবে কথং প্রকৃতি পুরুষয়োঃ সংযোগবিয়োগৌ আপাদয়তীতি নাশঙ্কনীয়ং তস্য কারুণিকত্বাৎ ভূতানুগ্রহ এব প্রয়োজনং কল্প-লয়-মহাপ্রলয়েষু নিঃশেষান্ সংসারিণ উদ্ধরিষ্যামীতি তদধ্যবসায়ঃ যদ্যস্যেষ্টঃ তত্তস্য প্রয়োজনমিতি॥"

অর্থাৎ ভগবান পরম করুণাময়, তিনি করুণাবশতঃ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ বিয়োগ ঘটাইতেছেন—তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল ভূতবর্গের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াই তিনি এই সৃষ্টিপ্রলয়ের খেলা করিতেছেন। কল্প, লয়ও মহাপ্রলয়ে ভূতবর্গকে উদ্ধার করিব এই তাঁহার অধ্যবসায়। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে এই জগদুদ্ধারের অধ্যবসায়ও ঈশ্বরত্বের একটি প্রমাণ—আসল কথা ইহাই একমাত্র প্রমাণ। পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে ভগবানের ইচ্ছাই সকল কার্য্যের মূল কারণ, বিশ্বের সমস্ত ব্যাপারের মধ্য দিয়া সেই মহীয়সী ইচ্ছা সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশ করিতেছে—এইটুকু ধরিয়া লইয়া সেই ইচ্ছার স্বরূপ কি এবং বিশ্বের কল্পব্যাপী ইতিহাসে তাহার প্রকাশই বা কিরূপে হইয়াছে, তাহা হৃদয়ের দ্বারা মানবকে উপলব্ধি করানই শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য। এইবার আমরা আভাস পাইলাম। হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে এই উদ্দেশ্যের যে উদ্ভব তাহাও একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে, তাহারও একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস রহিয়াছে। এবারে আমরা আভাস মাত্র পাইয়াই উপস্থিত

সন্তুষ্ট হইলাম. পরে এই ইতিহাস আরও বিস্তৃততর রূপে আলোচনা করিব।

এইবার একটু ভাবিতে হইবে যে পাতঞ্জল দর্শনে ভগবানের এই ইচ্ছা বা সর্ব্বকর্তৃত্ব, বা মূল কর্তৃত্ব ঠিক অনুসৃত হইয়াছে কি না, অথবা ভগবানের অনুগ্রহই সমস্তের একমাত্র হেতু ইহা ঠিক প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে কিনা ? ইহার উত্তর, পাতঞ্জলে তাহা সম্পূর্ণরূপে হয় নাই, অন্য কোথায়ও হয় নাই, কেবল মাত্র শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা হইয়াছে, শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বে ইহার শেষ সফলতা।

আগে পাতঞ্জল দর্শনে কেন হয় নাই তাহাই দেখান যাইতেছে। পাতঞ্জল দর্শনের গোড়ার কথা এই যে মানুষ তাহার স্বরূপে নাই, অর্থাৎ মানুষের যাহা প্রকৃত অবস্থা. এখন সে সে অবস্থায় নাই। রাজার ছেলে যেমন ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে যে সে ভয়ানক দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে এবং স্বপ্নযোগে তীব্র দারিদ্র্য ক্লেশও ভোগ করে, ঠিক সেই রকম আর কি। "মানুষ যে তাহার স্বরূপে নাই, এবং তাহাকে তাহার স্বরূপে যাইতে হইবে" এই কথাটি কেবল হিন্দুধর্ম্মের নহে, সকল ধর্ম্মেরই গোড়ার কথা। পাতঞ্জল দর্শন বলেন যে যোগের দ্বারা চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ হইলেই মানুষ তাহার স্বরূপে অবস্থিত হইবে। এইবার কথাটার ব্যাখ্যা চাই, চিত্তই বা কি আর তাহার বৃত্তিই বা কি। বলিলেন চিত্তের পাঁচটি বৃত্তি, প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি! ইহাদের নিরোধ করা যায় কিরূপে এখন তাহাই প্রশ্ন। প্রথম বলিলেন "অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের এই বৃত্তি পাঁচটি নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা তীব্র সংবেগ-সম্পন্ন, তাঁহাদের এই যোগ সাধন আসন্ন, এই পর্য্যন্ত বলিয়া পাতঞ্জল দর্শন বলিলেন "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যই আলোচনা করা যাউক, আর ভোজ-বৃত্তিই আলোচনা করা যাউক উভয়ত্রই দেখা যাইবে যে ঈশ্বর প্রণিধান ও আসন্নতম সমাধিলাভের অন্যতর উপায়, একমাত্র উপায় নহে। তবে ভোজবৃত্তি বলিয়াছেন যে এই উপায়টি অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধান, সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায় "ইদানীমেতদুপায়বিলক্ষণং সুগমমুপায়ান্তরং দর্শয়িতুমাহ।" প্রনিধান বলিতে কি বুঝায়? বৃত্তিকার বলিতেছেন" প্রণিধানং ভক্তিবিশেষঃ বিশিষ্টমুপাসনং সর্ব্বক্রিয়ানাং তত্রার্পণং বিষয়-সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পয়তি তৎ প্রণিধানং সমাধেস্তৎফললাভস্য চ প্রকৃষ্ট উপায়ঃ।" অর্থাৎ সবিশেষ ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া বিষয়ভোগাদি ফলাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক

ঈশ্বরারাধনা করিলেই সমাধির ফল লাভ হয়, ইহাই যোগসাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

এইবার শ্রীমদ্ভাগবতের ঈশ্বরবাদের ভিত্তি-নিরূপণ করা যাইতেছে। এই টুকু বুঝিতে পারিলে শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক কথা, এতদিন যাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতাম না, তাহা এই ভিত্তি হইতে দেখিলে অতিশয় সহজ হইয়া যাইবে। অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবতেরও ঈশ্বরবাদের যাহা বীজ তাহা পাতঞ্জল দর্শনেও আছে। আগে সেই বীজটুকু পরীক্ষা করা যাউক। পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে যে সর্ব্বজ্ঞত্বের যাহা মূল বীজ তাহা এই ঈশ্বরেই আছে—"তত্র নিরতিশয়ং সার্ব্বজ্ঞ্য-বীজম্" আবার শুধু তাহাই নহে, পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বরকে আদিগুরু বলা হইয়াছে—"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ" কালের দ্বারা ঈশ্বরের সীমা অবধারণ করা যায়না তিনি ব্রহ্মাদিরও গুরু। এই তাঁহার কালাতীত গুরুভাব টুকু স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের যে সমস্ত কথা বলা হইতেছে তাহা অতিশয় সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

দেখা গেল যে ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে—তাহা হইলেই পাতঞ্জল দর্শনে মানবীয় সাধনার যে আদর্শের কথা বলিয়াছেন, সেই স্বরূপে অবস্থান সর্ব্বাপেক্ষা সহজে সাধিত হইবে। বেশ কথা। আর অন্য উপায় লইয়া কথা কাটাকাটির বা বিচার বিতর্কের প্রয়োজন নাই, এখন এই ভক্তির অনুশীলন করা যাউক এবং ঈশ্বরতত্ত্বই ধ্যান ধারণা করা যাউক, এই খানেই ভাগবত আরম্ভ হইয়া গেল।

আগে আলোচনা করা যাউক—ভক্তি কি? শাণ্ডিল্য সূত্র, নারদ সূত্র, নারদপঞ্চরাত্র, প্রভৃতি বহু গ্রন্থে, এবং শ্রীরামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে নানা রূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত সিদ্ধান্তের সার গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎ-প্রণীত—"সিদ্ধান্ত-রত্ন" গ্রন্থে যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা অতীব সুন্দর। ভক্তি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তাহা চারিটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

১। প্রাকৃতসত্ত্বময়জ্ঞানানন্দরূপা।
২। ভগবজ্জ্ঞানানন্দ রূপা।
৩। জৈবজ্ঞানানন্দ রূপা।
৪। হ্লাদিনী সারসমবেতসম্বিৎসাররূপা।

ইহার মধ্যে তিনি মীমাংসা করিয়াছেন "নাদ্যঃ ভগবতো মায়াবশ্যত্বা-শ্রবণাৎ, স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্চ। নদ্বিতীয়ঃ অতিশয়াসিদ্ধেঃ। নাপিতৃতীয়ঃ জৈবীয়োস্তয়োঃ ক্ষোদিষ্ঠত্বাৎ কিন্তু চতুর্থ এবাসৌ ভবেৎ।"

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সিদ্ধান্তের অর্থ এই। এই যে প্রকৃতি—তাহাতে সত্ত্বগুণ আছে—যাহার স্বভাব প্রকাশ ও সুখ। সেই সত্ত্বগুণের ক্রিয়ার ফলে তত্ত্বের সহিত পরিচয় হয়—এবং সেই পরিচয় বা জ্ঞান হইতে মানব-চিত্তে এক বিমল জ্ঞানের উদয় হয়। ভক্তি সেই জ্ঞানানন্দ। কিন্তু ইহা হইতে পারে না। কারণ পুরুষ, তিনি প্রকৃতির পর, গীতার উপদেশ নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে হইবে। সুতরাং ভক্তির স্বরূপ ইহা হইতে পারেনা। আরও শ্রুতি আছে "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী।" সেই পরম পুরুষকে ভক্তি আনিয়া দেয়, তাঁহাকে বশীভূত করে, তিনি ভক্তি-বশ, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এখন সেই পরম পুরুষ যখন স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত, তখন প্রাকৃত কোন কিছুর বশ্যতা তাঁহার কি করিয়া থাকিতে পারে?

তবে ভক্তি শ্রীভগবানের জ্ঞানানন্দ-স্বরূপিণী—অর্থাৎ এই যে জ্ঞান ও আনন্দ, তাহার যিনি বিষয় তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান। (বিশেষজ্ঞগণ লক্ষ্য করিবেন, এই মত আশ্রয় করিলে অদ্বৈত মতে আসিতে হয়) কিন্তু ইহা হয় কিরূপে? লীলায় দেখা যাইতেছে ভক্তের ভক্তি, ভগবান ইহা গ্রহণ করিতেছেন, তাহার পর জীবের যে জ্ঞানানন্দ তাহাও ভক্তি-পদবাচ্য নহে। কারণ জীবের আনন্দ অনিত্য ও ক্ষয়শীল। এই তিনটি সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বকীয় মত প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির ও সম্বিৎ শক্তির সমবেত সাররূপা পরাবস্থাই ভক্তি।

প্রসঙ্গটি অত্যন্ত কঠিন। সম্যক আলোচনা করিতে হইলে হিন্দু মনো-বিজ্ঞানের অতি জটিল রহস্যগহনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। অন্য কোন প্রসঙ্গে তাহা করা যাইবে। উপস্থিত এই বিষয়টি সহজে বুঝাইতে পারা যায় কিনা তাহাই দেখা যাউক।

পাতঞ্জল দর্শন বলিলেন ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সহজে আমাদের স্বরূপে আরোহণ করিতে পারি। অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধান আমার একটি ক্রিয়া, আমি যে কর্ত্তা, সে, আমারই একটি ক্রিয়ার দ্বারা স্বরূপে যাই-তেছে। ভক্ত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা মহাশয়, আপনি বলিতেছেন

যে ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা আপনি আপনার স্বরূপে আরোহণ করিতেছেন। অতি উত্তম কথা, কিন্তু আপনি তো অতি সদ্বিবেচক, এই যে 'প্রণিধান' করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আপনার রহিয়াছে, ইহা আপনি কোথায় পাইলেন, আর আপনি কর্ত্তা বলিয়া যে অভিমান করিতেছেন, সেই কর্ত্তৃত্বাভিমান কি সত্য ? এ প্রশ্নের উত্তরেই ভাগবতধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

যাত্রার যিনি অধিকারী তিনি সাজঘরে (Green room) থাকেন সেখানে তিনি সকলকে সাজাইতেছেন। কেহ রাবণ, কেহ ইন্দ্রজিৎ, কেহ রাম, কেহ লক্ষ্মণ, কেহ বিভীষণ, কেহ হনুমান সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে গিয়া আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছে। যখন অভিনয় করিতেছে তখন অভিনেতা বা অভিনেত্রী অধিকারীর কথা, সাজঘরের কথা সব ভুলিয়া গিয়াছে, আজ সে হনুমান সাজিয়াছে কিন্তু পূর্ব্বদিন সে যুধিষ্ঠির সাজিয়াছিল তার পূর্ব্বদিন দূত সাজিয়াছিল, ছয়মাস আগে হয়ত তামাক সাজিতেছিল, আবার যাত্রা হইয়া গেলে তাহাকে হাতা বেড়ি লইয়া পাচক সাজিতে হইবে, এ সব কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে, এখন যাহার অংশ সে অভিনয় করিতেছে তাহাতেই তাহার 'অভিনিবেশ' জন্মিয়া গিয়াছে। সে হনুমান হইয়া ভাবিতেছে, আমি পবননন্দন, আমি মহাবীর, আমি লঙ্কা পোড়াইয়াছি আমি 'গন্ধমাদন আনিতে গিয়া কালনেমী বধ করিয়াছি। অভিনয়স্থলে প্রত্যেক অভিনেতা আপনাকে এক এক 'কর্ত্তা' বলিয়া অভিমান করিতেছে কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ রাণী, কেহ সেনাপতি। এই বহুকর্ত্তৃত্ব না থাকিলে অভিনয়ও হয় না, আর যাত্রার যিনি অধিকারী তাঁহার 'অধিকারী' হওয়াও হয় না। অর্থাৎ যাত্রাওয়ালাকে যাত্রাওয়ালা হইতে হইলে অভিনেতাগণের যেমন স্বকর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিবে, তেমনি যাত্রাওয়ালার বশ্যতাও থাকিবে। কিন্তু মূল কর্ত্তৃত্ব যাত্রাওয়ালার তাহা সাজঘরে না গেলে ঠিক বোঝা যায় না। এখন রঙ্গস্থলে বসিয়া দেখিলে যাত্রা একরূপ দেখায় আর সাজঘরে বসিয়া দেখিলে আর একরূপ দেখায়। লীলাদর্শন এই সাজঘরে বসিয়া দেখা। এই জন্যই নারদের উপদেশানুসারে বেদব্যাস সমাধি-দৃষ্টি আশ্রয় করিয়াই লীলা যেরূপ দেখিয়াছেন, সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদিগকেও সেই সাজঘরে বসিতে হইবে, তাহা হইলে আর ভাগবতের ঈশ্বরবাদ বুঝিতে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না।

ভক্তির তত্ত্ব বা স্বরূপ লইয়া পণ্ডিতদের ও তত্ত্বদর্শীদের মধ্যে এই যে

আলোচনা, ইহা বিশ্বজনীন অর্থাৎ সকল দেশেই এই একরূপ আলোচনা হইয়াছে। মধ্যযুগের খৃষ্টান দার্শনিকেরা প্রশ্ন করিয়াছেন ইহা Opus (merit, work) না Donum (দান)। ইহার মীমাংসা আমরা যাহা করিলাম তাহাতে এইটুকু বুঝা গেল, যে ইহা দানও বটে, আমাদের কৃতকর্ম্মও বটে। অর্থাৎ তুমি যেখান হইতে দেখিবে সেইরূপই দেখাইবে। যদি সাজঘর হইতে বা বুদ্ধির ভূমি হইতে দেখ তাহা হইলে Donum (দান) আর যদি মনের ভূমি হইতে দেখ তাহা হইতে Opus, সুতরাং এইখানে মহাসমন্বয় হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের দৃষ্টি বুদ্ধির ভূমি হইতে, সুতরাং এখানে সমস্তটাই দান। এইবার উদাহরণ দিয়া বুঝাই। এবারে কয়েকটি বিশেষ উদাহরণ দিতেছি, পরে সাধারণভাবে লীলাতত্ত্ব বুঝাইয়া বৃন্দাবনলীলার ভিত্তি নিরূপণ করা যাইবে।

সকল লীলার শিরোমণি শ্রীরাসলীলা হইতে প্রথম উদাহরণটি দেওয়া যাইতেছে। শ্রীরাসলীলার সমস্ত তত্ত্বই অতীব গভীর রহস্যজালে আচ্ছন্ন, হিন্দুসাধনার বিশেষত্বের সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে ইহার কোন কথাই বুঝিবার উপায় নাই। এই সকল তত্ত্বের মধ্যে একটি তত্ত্ব এই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিলেন— বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজদেবীগণ নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণাভিমুখে ধাবিতা হইলেন। এই সমস্ত গোপীর মধ্যে কয়েকটি গোপী "অন্তর্গৃহগতা" অর্থাৎ ঘরের মধ্যে ছিলেন, তাঁহারা আর বাহির হইতে পারিলেন না। বাহিরে হৃদয়সর্ব্বস্ব প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল আবেগে বংশীবাদন করিয়া আহ্বান করিতেছেন আর তাঁহারা যাইতে পারিতেছেন না— সে অনির্ব্বচনীয় বিরহের যন্ত্রণা, কেবল যে যন্ত্রণা তাহাও নহে কারণ কৃষ্ণ প্রেমের এমনি স্বভাব যে "বাহিরে বিষজ্বালা হয়, অন্তরে অমৃতময়" সুতরাং তাঁহাদের সুখেরও সীমা, দুঃখেরও সীমা একইকালে উপস্থিত হইল। ফলে শুভ ও অশুভ এই উভয়বিধ কর্ম্মনিবন্ধন গুণময় দেহের সহিত দেহীর যে বন্ধন, তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহারা গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময়দেহে কৃষ্ণলাভ করিলেন। (এই গোপীরা কেন দেহের দ্বারা কৃষ্ণসঙ্গে সঙ্গতা হইতে পারিলেন না, সে সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্য্যপাদেরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করিব। উপস্থিত, আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের ঈশ্বরবাদের বিশিষ্টতাটুকু

আলোচনা করিতেছি)। গোপীরা গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন, যেমন শ্রীশ্রীশুকদেব এই কথা বলিয়াছেন অমনি সভার মধ্যে অনেকেরই মনে একটী সন্দেহের উদয় হইল। মহারাজা পরীক্ষিতের নিজের হয়ত ইহাতে কোন সন্দেহ হয় নাই, তবে এই সকল লোকের ও ভবিষ্যতের মানবের সন্দেহ দূর করিবার জন্য শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং।"

হে মুনে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ অতএব এই সন্দেহটি নিরসন করুন। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরম কান্ত বলিয়াই জানিতেন, তিনি যে ব্রহ্ম ইহাতো জানিতেন না। তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত বিহার করিব এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, এই যে আকাঙ্ক্ষা ইহা গুণবিষয়িণী, সুতরাং তাঁহাদের গুণ প্রবাহের উপরম কি করিয়া হইল? শ্রুতিতে আছে "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" তাঁহাকে জানিলে পর ত্রৈগুণ্য বা অমৃতলাভ হয়। স্মৃতিতে আছে "আত্মনমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে" কিন্তু ব্রজদেবীগণ তো আত্মা বলিয়া তাঁহাকে জানেন নাই। সুতরাং এ অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা বলিলেন।

এই সন্দেহ। একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে পাতঞ্জলদর্শনের "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রে ভক্ত যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন সেই প্রশ্নই এখানে উঠিয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে লীলাতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞানের উর্দ্ধের অবস্থা, অন্ততঃ পক্ষে ভক্তগণ এইভাবেই তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মহারাজ পরীক্ষিত যেন বলিতে চাহেন যে গুণপ্রবাহের যে উপরম হইবে, তাহা আমাদের ব্রহ্মবুদ্ধির দ্বারা, ব্রহ্ম বা ভগবানের দ্বারা নহে। এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এখানে একটি সামান্য উদাহরণ দিতেছি। "ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান" এই বিষয় তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিলাম; বক্তৃতা করার তাঁহার কি শক্তি! এই যে বাক্যটি ইহার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড অসঙ্গতি (Fallacy) রহিয়াছে, তাহা আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই না। "ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান" ইহা যদি সত্যই বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে সেই এক নিশ্বাসেই "তাঁহার কি শক্তি" এ কথা বলিব কেন? আমাদের ঠিক তাহাই হয়। প্রকৃত কথা এই যে মহারাজ পরীক্ষিত বহির্মুখ ব্যক্তিগণের পক্ষ হইয়া যে প্রশ্নটি করিলেন, সেই প্রশ্নটি সত্য সত্য যাঁহাদের মনে জাগিয়াছে তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ভিত্তি যাহা ঋষি অতি

যত্নপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। অধিক কি এই পূর্ব্বক্ষণে শ্রীশুকদেব ব্রজদেবীগণের ব্যাকুল প্রাণে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিতির কথা যখন বলিলেন তখন বলিলেন "আজগ্মুঃ" ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট "আসিলেন"। "গেলেন" একথা বলিলেন না। ইহা হইতে কি প্রমাণ হইতেছে? ইহা হইতে এইটুকুই প্রমাণ হইতেছে যে শ্রীশুকদেব রাসমণ্ডপে বসিয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বে যে সাজঘরে বসিয়া অভিনয় দেখার কথা বলা হইল এ ঠিক তাই। এই ভূমিতে দাঁড়াইলে মানবীয় সাধনার নদীগুলি আর পৃথক নামরূপসম্পন্ন এরূপ দেখা যায় না, ভগবানের করুণা সাগরে তাহারা মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, এইরূপ দেখা যায়। এই ভূমিই শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমি এবং এই ভূমিতে আরোহণ করাই জীবের স্বরূপলাভ—জীব যে 'নিত্য কৃষ্ণদাস' ইহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

(এস্থলে একটি কথা বলা উচিত যে মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের অন্তর্মুখীদের পক্ষের একটি অর্থ আছে, শ্রীবৈষ্ণবতোষণীটীকায় সেই অর্থও ধরিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সেটুকু আমাদের আলোচনা করার প্রয়োজন নাই)

যাহা হউক শ্রীশুকদেব যে ভাবে উত্তর দিলেন তাহাতে যেন ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন "বেশ কথা বলিয়াছ—'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে' সীতা রামের মা!'

এই জন্য তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক আগের কথা আর একবার স্মরণ করিয়া তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে বলিলেন। শ্লোকটি এই

"উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ"

"বহুপূর্ব্বেই তোমাকে তো শিশুপালের কথা বলিয়াছি, সে হৃষীকেশের প্রতি বিদ্বেষ-সম্পন্ন ছিল, অথচ সিদ্ধিলাভ করিল। অথচ তুমি অধোক্ষজের প্রিয়াগণের সম্বন্ধে এই প্রশ্ন করিতেছ।"

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপঃ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ।"

জীবমাত্রেরই নিঃশ্রেয়সের জন্য ভগবানের প্রাকট্য, তিনি অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ ও গুণাত্মা।

"কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহং সৌখ্যং সৌহৃদমেবচ
নিতং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হিতে।"

যে কোন প্রকারেই হউক ভগবানে আসক্তি জন্মিলেই তাহা মঙ্গলের হেতু হয়। নিত্য কাম অথবা ক্রোধ, কিম্বা ভয় অথবা স্নেহ কিম্বা সম্বন্ধ অথবা ভক্তি, বিধান করিয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(কামং গোপী জনাদয়ঃ ক্রোধং দ্বেষং চৈদ্যাদয়ঃ ভয়ং কংসাদয়ঃ স্নেহং বাৎসল্যং নন্দাদয়ঃ। ঐক্যং আত্মারামাঃ সৌহৃদং বৃষ্ণিপাণ্ডবাদয়ঃ)

"ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে।"

যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর অজ ভগবান, যাহা দ্বারা স্থাবরাদিও মুক্ত হয় তাঁহাতে বিস্ময় করিও না।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণলীলার ভিত্তি কি তাহা এই কয়টি শ্লোকে অতি পরিষ্কার ভাষায় বলা হইল। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে আরও অনেক স্থানে অতীব স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে, পূতনা-বধ লীলায়—

"পূতনা লোক-বালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিং॥
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিং নু রক্তা স্তন্মাতরো যথা॥"

পূতনা কি ভয়ঙ্কর, সে জগতে যত নিরীহ ও নিরপরাধ শিশুদিগকে হত্যা করিয়া বেড়াইত, সে রাক্ষসী; রক্তপান তাহার স্বভাব। সে হত্যা করিবার অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণের মুখে স্তনদান করিয়াছিল তবু তাহার সদ্গতি হইল। সুতরাং স্নিগ্ধা জননীর ন্যায় যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা (আস্তিক্য) এবং ভক্তি (প্রেম) দ্বারা পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম বস্তু দান করেন, তাঁহার সদ্গতির কথা আর কি বলিব ?".

কৃষ্ণলীলার এই 'আর এক রহস্য' ইহাও অতি যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছে ইহার অর্থ কি ? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নিত্য ও প্রপঞ্চাতীত লীলা জীবকল্যাণের জন্য প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছিল—ইহাই কৃষ্ণলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য। একটি কথা আছে যে জগতে নিজ নিজ স্থানে সমস্তই সর্ব্বোত্তম। যাহার যেখানে স্থান সেখান হইতে তাহা বিচ্যুত হইলেই তাহা অন্যায় বা অশোভন হইয়া পড়ে। বিশ্বে কিছুই হেয় নহে, যদি তাহা বিশ্ব-

শৃঙ্খলায় যেটি তাহার নিয়মিত স্থান তথায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই একটি অতি সুন্দর তত্ত্ব। বিশ্বশৃঙ্খলায় আমার স্থান কোথায়? প্রত্যেকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। ইহার উত্তর, ভগবানই সকলের স্থান। In Him we live and move and have our being. এই তত্ত্বটুকু উপলব্ধি করিতে হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে লীলা প্রকট করার হেতু কি তাহাও একটু স্থিরচিত্তে, চিন্তা করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে এই আবির্ভাবের হেতু এক কথায় "নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায়" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার আবির্ভাবের কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে বহুবার বর্ণনা করা হইয়াছে। বহুবার, বর্ণনা করায় এইরূপ বুঝিতে হইবে, যে এ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্তমত ও ধারণা প্রচলিত আছে। তাহা দূর করিতে হইবে। আর এক কথা এই ভগবদাবির্ভাবের কারণটুকু ঠিক বুঝিতে না পারিলে লীলার অনেকস্থল আমরা বুঝিতে পারিব না।

শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী তাঁহার স্তবে সর্ব্বপ্রথম ইহা আলোচনা করিয়াছেন—

"কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্য কীর্ত্তয়ে।
যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনং ॥
অপরে বসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোঽভ্যাগাৎ।
অজস্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায় চ সুরদ্বিষাং ॥
ভারাবতরণায়ান্যে ভুবোনাব ইবোদধৌ।
সীদন্ত্যা ভূরিভারেণ জাতো হ্যাত্মভুবার্থিতঃ ॥
ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হানি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ।
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ ॥
ত এব পশ্যন্ত চিরেণ তাবকং।
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজং ॥"

১ স্ক ৮অ ৩১—৩৫

শ্রীশ্রীকুন্তীদেবী এই পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা তাঁহার আবির্ভাবের হেতু নির্ণয় করিয়াছেন। এই শ্লোককয়েকটি আলোচনা করিবার প্রথমে এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন ভূমি হইতে দেখিলে ইহার সমস্তগুলিই সত্য।

তুমি জগন্মোহন ও দুর্জ্ঞেয়, তোমার আবির্ভাবের কারণ মতভেদে

বহু প্রকারে কথিত হয়। "প্রাদুর্ভাব-কারণমেব মতভেদেন বহুপ্রকারমাহ।" যেমন মলয় পর্ব্বতের কীর্ত্তিবিস্তার নিমিত্ত তাহাতে চন্দনতরু জন্মগ্রহণ করে, তাহার ন্যায় তুমি অজ হইলেও যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তিপ্রচার অথবা প্রিয়তম যদুরাজের কীর্ত্তিবিস্তার নিমিত্ত যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কেহ কেহ বলেন বসুদেব ও দৈবকী পূর্ব্বজন্মে তপস্যা করিয়া তোমায় পুত্ররূপে পাইতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তুমি অজ হইলেও এই জগতের ক্ষেম এবং দেবদ্বেষী অসুরগণের বধ নিমিত্ত বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পুত্র হও। আবার কেহ কেহ বলেন মহাসমুদ্রে নৌকার মত পৃথিবী পাপভারে অবসন্না হইয়াছিলেন ভূভার হরণের জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। আর কতকগুলি লোক বলেন যে অবিদ্যা কাম ও কর্ম্মের দ্বারা জীবসকল ক্লেশ পাইতেছিল, তুমি আসিয়া এমন সব কর্ম্ম করিলে যাহা শ্রবণ স্মরণ অর্চ্চন করিয়া তাহারা এই ক্লেশের হস্তে পরিত্রাণ পাইবে।

হে শ্রীকৃষ্ণ! যে সমস্ত লোক তোমার চরিত্র শ্রবণ বা গান বা উচ্চারণ অথবা সর্ব্বদা স্মরণ করেন কিম্বা অন্যে কীর্ত্তন করিলে তাহাতে যাঁহাদের আনন্দ হয় তাঁহারা অচিরে তোমার চরণারবিন্দ দেখিতে পান এবং অচিরে জন্মপরম্পরা নিবারিত হয়।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার টীকায় প্রকাশ করিয়াছেন যে ভগবানের আবির্ভাবের যে সমস্ত কারণ বর্ণিত হইল তন্মধ্যে শেষ কারণটিই কুন্তীদেবীর মত। আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব যে ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেরও মত—শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের ইহাও একটি বিশেষ মত এবং ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই মত শ্রীরাসলীলার নিম্নোদ্ধৃত সুবিখ্যাত শ্লোকে স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥"

অর্থাৎ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করণার্থ মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া তাদৃশী ক্রীড়া করেন যাহা শুনিয়া লোকে তৎপর হয়, অর্থাৎ লীলামাধুরী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভগবচ্চিন্তনে নিয়োজিত হয়।

শ্রীমৎ পূজ্যপাদ রূপগোস্বামী বিরচিত শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে ভগবানের

এই আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের যাহা মত তাহা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নের শ্লোকগুলি আস্বাদনীয়,—

"অজো জন্মবিহীনোঽপি জাতো জন্মাবিরাচরৎ।
নন্বেকস্য কিলাজত্বং জন্মিত্বঞ্চ বিরুধ্যতে।
ইত্যাশঙ্কাহ ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবৈভবঃ॥
তত্র তত্র যথা বহ্নিস্তেজোরূপেণ সন্নপি।
জায়তে মণিকাষ্ঠাদেহেঁতুং কঞ্চিদবাপ্য সঃ॥
অনাদিমেব জন্মাদি লীলামেব তথাদ্ভুতাম্।
হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন॥
স্বলীলাকীর্ত্তিবিস্তারাৎ লোকেষ্বনুজিঘৃক্ষুতা।
অস্য জন্মাদিলীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তমঃ॥
তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ।
প্রিয়েষু করুণাপ্যত্র হেতুরিত্যুত্তমেব হি॥
ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশেশ্বরৈঃ
অভ্যর্থনন্তু যত্তস্য তদ্ভবেদানুষঙ্গিকম্॥
চেদদ্যাপি দিদৃক্ষেরন্ উৎকণ্ঠার্ত্তা নিজ প্রিয়াঃ
তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ॥
কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্ ভিভাগবতোত্তমৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে॥"

তিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত—অথচ জাত, জন্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, অজত্ব ও জন্মিত্ব একজনেরই পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য বলা হইল ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবৈভব অর্থাৎ তাঁহার ঐশ্বর্য্য বৈভব কাহারও বুদ্ধিগোচর নহে। অগ্নি তেজোরূপে অপ্রকাশ অবস্থায় রহিয়াছে, অথচ কোন কারণ যোগে অর্থাৎ মণিকাষ্ঠাদি হইতে প্রাদুর্ভূত হন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোন কারণ বশতঃ অদ্ভুত ও অনাদি জন্মাদি লীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। আপনার লীলাকীর্ত্তির বিস্তারের জন্য সাধক ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছাই তাঁহার জন্মাদিলীলা আবিষ্কারের মুখ্য হেতু। আর বসুদেবাদি তাঁহার প্রিয়তমগণ ভয়ঙ্কর দানবগণ কর্ত্তৃক পীড়্যমান হইলে সেই প্রিয়তমগণের প্রতি কৃপাও তাঁহার আবির্ভাবের হেতু। পৃথিবীর ভারহরণের জন্য ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের প্রার্থনা, তাঁহার

আবির্ভাবের মুখ্য কারণ নহে, ইহা একটি আনুষঙ্গিক কারণ। কোন প্রিয়জন উৎকণ্ঠিত ও আর্ত্ত হইয়া দেখিবার জন্য অভিলাষ করিলে কৃপানিধি হরি তাঁহাদের সমক্ষে সেই সেই লীলা তৎক্ষণাৎ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কোন কোন ভাগ্যবান ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রেমবিবশ হইয়া আজিও বৃন্দাবনমধ্যে ক্রীড়াশীল শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া থাকেন।

পুর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে দেখা যাইতেছে যে শ্রীমদ্ভাগবতে যে বলা হইল "অনুগ্রহায় ভক্তানাং" ভক্তগণকে অনুগ্রহ করা, ইহাই তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্য কারণ, অন্যান্য কারণ যাহা কিছু বলা হয় তাহা গৌণ। এই ভক্তানুগ্রহই ভূতানুগ্রহ। ভগবানের করুণা জগতে বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু ভক্তগণকে আশ্রয় করিয়াই তাহা হইয়া থাকে। আর এককথা বলা হইল যে "স্বকীয় লীলাকীর্ত্তি" বিস্তার তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্যতম হেতু। এইবার "লীলাকীর্ত্তির বিস্তার" জিনিসটি কি তাহা একটু চিন্তা করা দরকার। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইহা চিন্তা করিবার প্রণালী আমাদিগকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন

"কৃষ্ণ নবজলধর, জগৎশস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃত ধার।"

শস্যের বীজ যেমন অবজ্ঞাত অবস্থায় ও দুঃখে কষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়া ধূলারাশির মধ্যে পড়িয়া থাকে, তেমনি এই জগৎ, এই গতিশীল বিশ্বব্যাপার জন্মজরামৃত্যুর কবলে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে। আকাশে মেঘ হয়, মেঘে বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টি শস্যের উপর পতিত হইলে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়, তাহার পর দেখি আর সে নিরাশা ও অবসাদ নাই, ক্ষেত্রগুলি হরিতবর্ণ তৃণে পরিপূর্ণ হইয়াছে, মৃদুপবনে দুলিতেছে তাহাদের শীর্ষদেশে শিশিরবিন্দু মুক্তার মত দুলিতেছে, তেমনি ভগবানের লীলা অমৃতবিন্দুর ন্যায় এই জন্মজরামৃত্যুপূর্ণ কারাগারে পতিত হয়, মানবের হৃদয়ে প্রেমাঙ্কুর হয় এবং জীবশোভায় ও সৌন্দর্য্যে সুভূষিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে বৃষ্টিবিন্দু আকাশ হইতে জগতের উপর নিত্যকাল পতিত হইতেছে, বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বৃষ্টিবিন্দু পৃথিবীর উপর না পড়িয়া অন্যদিকে উড়িয়া যাইতেও পারে, আর মেঘ বৃষ্টিরূপে পরিণতই বা হয় কেন? বিজ্ঞান বলিলেন পৃথিবীর বুকের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ নামক একটি শক্তি আছে সে সর্ব্বদা উপরের জিনিসকে নিজের বুকের দিকে টানিতেছে। আর এই পৃথিবী, যদিও নিত্য

সন্তাপময় তথাপি মধ্যে মধ্যে এখান হইতে শীতল বায়ু উপরের দিকে যায়, সেই শীতল বায়ু স্পর্শ পাইলে মেঘ আর বাষ্পরূপে থাকিতে পারে না, জল হইয়া যায়, এবং মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর বুকের উপর পতিত হয়।

সেইরূপ জগতে পাপ, মোহ, অবিদ্যা, ও কামের প্রাবল্য দেখিয়া আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, পৃথিবীর বুকে একটি আকর্ষণ শক্তি আছে তাহারই নাম ভক্তি, পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা শ্রীভগবানেরই স্বরূপ শক্তি—আর এই পৃথিবী হইতেই অনন্যশরণ ভক্তবৃন্দের কাতর প্রাণের সরল ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ করুণ প্রার্থনা শীতলবায়ুর মত, নিত্য ও প্রপঞ্চাতীত ধামে গমন করিতেছে—এই দুইটি আশ্রয় করিয়া জগতে শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত বর্ষিত হয়, তাই জীব বিকাশলাভ করে ধূলামাটীর মধ্যে থাকিয়াও বীজ আপনস্বরূপে আরোহণ করিয়া ধন্য হইতে পারে।

যাহা প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যদি তাহাই লইয়া মানবকে থাকিতে হইতে, তাহার বাহিরে যদি মানুষ যাইতে না পারিত, তাহা হইলে মানব জীবনের কোন উচ্চমূল্য থাকিত না। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী বা জড়বাদীগণ যাহাই বলুন না কেন, মানুষের অন্তরতমস্থলে এমন একটি বৃত্তি আছে যাহা মানুষকে উড়াইয়া লইয়া যায়, সীমার বাহিরে যে অসীম তাঁহার জন্য ব্যাকুল করে! মানুষের কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য সমস্তই সেই প্রেরণার ফল। এই যে বিকাশটুকু মানুষ লাভ করিয়াছে, এই "মৃত্যু সংসার সাগরে" নিপতিত হইয়াও সে উন্মুক্ত বায়ুমণ্ডলে মাথা তুলিয়া নিশ্বাসগ্রহণ করিতেছে, এ রহস্যের উত্তর কি? * ইহার উত্তর এই লীলামৃতবর্ষণ। যুগযুগান্ত ধরিয়া ভক্তেরা ভগবানকে ডাকিয়াছেন তিনি জগতে আসিয়া লীলা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন তাই মানুষ আঁধারেও আলোক দেখে, মৃত্যুতে ও অমৃত দেখে।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের যে সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইল--শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার তাঁহার সমস্তগুলির সুন্দর সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক জগৎকে নিজ মত উপদেশ করিয়াছেন।

"পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রের প্রচারে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥

* Whence this Idealism?

কিন্তু কৃষ্ণের হয় যেই অবতার কাল।
ভার হরণ কালে তাতে হইল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার আসি তাতে মিলে ॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে ॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥
প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সব্ব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে মোর নাহি প্রীত ॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে
আমি সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি ॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম ॥

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥
এই শুদ্ধ'ভক্ত লৈয়া করিব অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে লীলা করিব যাহে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি নাহি জানে গোপীগণ।
দুহাঁর রূপগুণে দুহাঁর নিত্যহরে মন॥
ধর্ম্মছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রসসার করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥"

শ্রীভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের মত আগামীবারে আরও বিশদরূপে বর্ণনা করা যাইবে।

প্রেমিক।

মৃদু হাসি হাসে গো গোলাপ
আদরতো সবে তারে করে,
তাহাতে তো নাহি যায় বোঝা
বেশী ভালবাসে কে তাহারে।
পদ নিম্নে বিনত নয়নে
চেয়ে হের আছে তৃণ দাম

তব পানে দীন ভাবে সদা;
দিতে চায় বলি নিজ প্রাণ
কাতরেতে করজোড়ে সদা
পদে তব বিকাইতে চায়;
প্রেমিকের মহৎ পরাণ
এমনি করিয়া কেটে যায়!

শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া সবডিবিজন মধ্যে অজয়নদের উত্তর এবং ভাগীরথীর ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, ঝামটপুর নামক গ্রামে বৈদ্য-কুলে অনুমান ১৫৩০ খৃঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় জন্ম গ্রহণ করেন।

কৃষ্ণদাস যখন মাত্র ছয় বৎসরের এবং তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্যামদাস চারিবৎসরের শিশু তখন পিতা ভগীরথ কালগ্রাসে পতিত হন। ভগীরথ কবিরাজী করিয়া অতিকষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন—কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই নিমিত্ত মাতা সুনন্দাদেবী, শিশুপুত্র দুইটী লইয়া বিষম বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন পর, তিনিও পরলোক গমন করিয়া সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। অনাথ শিশু দুইটী, অগত্যা তাঁহাদের অপুত্রা পিতৃষ্বসার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইস্থানে রহিয়া কৃষ্ণদাস, প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুদিন অধ্যয়ন করিলেন। অনন্তর, সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া অচিরে তাহাও আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এতদ্ব্যতীত, তাৎকালিক প্রথানুযায়ী কৃষ্ণদাস যৎকিঞ্চিৎ পার্শীভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রথমাবস্থায় কৃষ্ণদাসের, সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া জাতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ রহিলেও কালে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। বাল্যকালা-বধি কৃষ্ণদাস, সাধুসঙ্গ ও ধৰ্ম্মালোচনায় কালযাপন করিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। কৃষ্ণদাসের ২৬ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতৃষ্বসা ঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়। ধৰ্ম্মপরায়ণ কৃষ্ণদাস, বিষয়াদি তত্ত্বাবধারণের ভার কনিষ্ঠ শ্যামদাসের উপর অর্পণ করিয়া একাগ্রমনে সাধন ভজন ও ধৰ্ম্মচিন্তায় আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণান্তর তৎপ্রবর্ত্তিত ধৰ্ম্মপথই শ্রেয়-জ্ঞান করিয়া তিনি অতিমাত্রায় চৈতন্যগত প্রাণ হইয়া পড়িলেন—সংসারের প্রতি তিনি একবারে বীতস্পৃহ হইলেন—তিনি আদৌ দারপরিগ্রহ করি-লেন না। এইরূপে তিনি প্রায় বিংশতিবর্ষ ধরিয়া নানাবিধ শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণদাসের বাটীতে গুণার্ণব মিশ্র নামক তাঁহাদের কুলদেবতার একজন

পূজারী ছিলেন। কৃষ্ণদাস স্বয়ং, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়কে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন। কিন্তু উক্ত পূজারীঠাকুর ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামদাস চৈতন্যমহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব কোন মতেই অঙ্গীকার করিতেন না। এইরূপ মতামত লইয়া কখন কখন তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা চলিত। একদিন, ঘটনাক্রমে নিত্যানন্দ প্রভুর মীনকেতন রামদাস নামক একজন শিষ্য ও অনুচর ইঁহাদের বাটীতে সমুপস্থিত হইলে এই বিষয় লইয়া গুণার্ণব ও শ্যামদাসের সহিত তর্ক উপস্থিত হয়; এই তর্ক ক্রমে বিবাদে পরিণত হইল, রামদাস ক্রোধবশতঃ অভিসম্পাত প্রদান করেন। তদনন্তর কৃষ্ণদাস তাঁহাদের নিকট বহু যত্নে নিত্যানন্দপ্রভুর গুণ বর্ণনা করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হন কথিত আছে, কৃষ্ণদাস সেই রজনীতে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হন এবং পরদিন প্রত্যুষেই চিরজীবনের মত সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে নানাদেশ পর্য্যটন ও তীর্থ দর্শন করিতে করিতে বৃন্দাবন ধামে উপনীত হইলেন। তথায় রূপ, সনাতন, রঘুনাথদাস, জীবগোস্বামী, কবিকর্ণপুর, গোপালভট্ট প্রভৃতি বৈষ্ণবগোস্বামী মণ্ডলীর পুণ্যাশ্রয়ে রহিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় তিনি, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বোক্ত গোস্বামী মহোদয়গণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তৎশাস্ত্রে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সংসার ত্যাগ ও বৃন্দাবন যাত্রা

রচিত গ্রন্থাদি—পূর্ব্বোল্লিখিত গোস্বামী মহোদয়গণের আদেশ এবং উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়, রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন সেবাবিষয়ক সংস্কৃতভাষায় "গোবিন্দলীলামৃত" নামক পাণ্ডিত্য ও কবিত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ *; "কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থের টীকা এবং "ভাগবতশাস্ত্রগূঢ়রহস্য" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি, 'অদ্বৈত সূত্রের কড়চা', 'স্বরূপ বর্ণন', 'বৃন্দাবন ধ্যান', 'ছয় গোস্বামীর সংস্কৃত সূচক', 'চৌষট্টী দণ্ড নির্ণয়', 'প্রেম-রত্নাবলী', বৈষ্ণবাষ্টক', 'রাগমালা', 'শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার, 'রাগময়করণ', 'পাষণ্ডদলন,' 'বৃন্দাবন পরিক্রম', 'রাগ-

* মালিহাটী নিবাসী বৈদ্যবংশীয় সুবিখ্যাত কবি যদুনন্দন দাস 'গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের পয়ারানুবাদ করিয়াছেন।

রত্নাবলী', 'শ্যামানন্দ প্রকাশ', 'সারসংগ্রহ', প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুসংখ্যক, গভীর জ্ঞান, ভক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এই সকল গ্রন্থ অপেক্ষা, চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ক "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" নামক গ্রন্থ লিখিয়াই সাহিত্য ও ধর্ম্মজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বৃন্দাবনবাসী চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্যপ্রভুর অন্ত্যলীলা সবিস্তাররূপ বর্ণিত না থাকায়, বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্য মঙ্গল' (চৈতন্য ভাগবত) নামক গ্রন্থপাঠে তাদৃশ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত তাঁহারা সকলেই * বয়োবৃদ্ধ পরমজ্ঞানী, সুপণ্ডিত ও ভক্তিতত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয়কে চৈতন্য মহাপ্রভুর শেষজীবনের লীলাকথা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়া একখানি চরিত গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের এই সময় শরীর ও মনের অবস্থা

"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির
হস্ত হালে মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানারোগগ্রস্ত, চলিতে বসিতে না পারি
পঞ্চরোগ পীড়ায় ব্যাকুল, রাত্রি দিনে মরি॥"

তথাচ তিনি তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না—আদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক নবোৎসাহে সঞ্জীবিত হইয়া এই গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। এদিকে, তিনি তাঁহার কুলাধিদেবতা মদনগোপাল (বা মদনমোহন) শ্রীবিগ্রহের প্রত্যাদেশসূচক মালা প্রাপ্ত হইয়া আরব্ধ কার্য্যে অগ্রসর হইবার অমিত বল সঞ্চয় করিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু, রঘুনাথ দাস গোস্বামী; নীলাচলে মহাপ্রভুর অবস্থান কালে স্বরূপ দামোদরের সহিত একত্র মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। স্বরূপ, মহাপ্রভুর মনোগত ভাব সমস্তই অবগত ছিলেন—তিনি রঘুনাথ গোস্বামীকে তৎসমুদয় বর্ণন করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী, স্বীয় দীক্ষাগুরু রঘুনাথের নিকট এই সকল বিস্তারিত ভাবে অবগত হইয়াছিলেন। চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা কালে, কবিরাজ গোস্বামীর ইহাই যে একটী প্রধান অবলম্বন তাহা বলা বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত, তিনি বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত' মুরারী গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের—'কড়চা', শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর

* আদিলীলা—গ্রন্থবিবরণ নামক অষ্টম পরিচ্ছেদ দেখুন।

রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট মৌখিক বিবরণ হইতে ঘটনাবলীর বিবরণ সঙ্কলনে প্রভূত সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।* বলিতে কি, কবিরাজ গোস্বামী, আপনার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ভক্তিময় কবিত্ব একত্র সমাবেশ করিয়া এই গ্রন্থখানিকে এক অপূর্ব্ব অমৃতাধার রূপে সৃজন করিয়া গিয়াছেন।

"চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনী কথা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (১) আদিলীলা—জন্মাবধি গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থিতিকাল —২৪ বৎসর, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। ১-১২ পরিচ্ছেদে মুখবন্ধ স্বরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিবিধ তত্ত্ব, চৈতন্যাবতারের আধ্যাত্মিক কারণ, মহাপ্রভুভক্তগণের নাম ও শ্রেণী বিভাগ বর্ণিত আছে। ১৩-১৭ পরিচ্ছেদে জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত জীবনের স্থুল ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে। (২) মধ্যলীলা— সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে দেশ পর্য্যটন করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত— ৬ বৎসর পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। লীলা বর্ণনায় এই অংশই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে নানাবিধ ঘটনার সমাবেশ, এবং গ্রন্থকারের অগাধ পাণ্ডিত্যের বিকাশ, ও জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৩) অন্ত্যলীলা—নীলাচলে অবস্থিতি— শেষ ১৮ বৎসর—বিংশ পরিচ্ছেদ। সমগ্র গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা ১২০৫১।

কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় নয় বৎসর কাল অমিত পরিশ্রমের পর ১৫৩৭ শক (১৬১৫খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসে এই গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করেন।† গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া তিনি তৎকালীয় বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব সমাজের নেতা জীবগোস্বামীর নিকট সাধারণ্যে তাঁহার গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। জীব গোস্বামী, গ্রন্থের পাণ্ডিত্য ও সহজভাষায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ়রহস্যনিচয় বিবৃত দেখিয়া, এইরূপ গ্রন্থ প্রচারিত হইলে কি জানি রূপ, সনাতন প্রভৃতি বিরচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর আদর কমিয়া যায়, এইরূপ

* "চৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থে ৬০টী সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ স্বরূপ শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

† "শাকে সিন্ধাগ্নি বাণেন্দৌ" (=১৫৩৭ শক) এর পরিবর্ত্তে কেহ কেহ, "শাকেঽগ্নি বিন্দুবাণেন্দৌ (=১৫০৩ শক) পাঠ ধৃত করিয়া ১৫৮১ খ্রীঃ "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ রচনা শেষের তারিখ বলিয়া উল্লেখ করেন। কৃষ্ণদাস যখন অশীতিপর বৃদ্ধ, তখন এই গ্রন্থ রচনা শেষ হয়; এই হিসাবে তিনি অনুমান ১৫০০ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মানিয়া লইতে হয়— এদিকে চৈতন্য মহাপ্রভু ১৫৩৩ খ্রীঃ তিরোধান হন। তবে কি কৃষ্ণদাস, চৈতন্যপ্রভুর লীলাকালে অনুমান ৩০ বৎসর কাল ধরিয়া বর্ত্তমান ছিলেন?—অসম্ভব।

আশঙ্কা করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। কৃষ্ণদাস এত পরিশ্রমের ফল ব্যর্থ হইল দেখিয়া একবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন—কিন্তু তাঁহার শিষ্য মুকুন্দ দত্ত, কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ এক এক পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইলে তাহার এক এক গ্রন্থ অনুলিপি রক্ষা করায় সে আশঙ্কা দূর হইল—তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এই সময় বঙ্গদেশ হইতে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর বৃন্দাবনে উপনীত হন এবং কবিরাজ গোস্বামীর প্রতি উল্লিখিত অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া জীব গোস্বামীর নিকট তাহার প্রতিকার করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। এই সঙ্গে তিনি এই গ্রন্থের একটি টীকা প্রণয়ন করিয়া তৎসহ প্রচার করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। অগত্যাই, জীবগোস্বামী অনুমোদন স্বাক্ষর করিয়া প্রতি পরিচ্ছেদের শেষভাগে 'চৈতন্যচরিতামৃত' শব্দের পর স্বহস্তে 'কহে কৃষ্ণদাস' এই বাক্যটি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থখানি এখনও বিপন্মুক্ত হইতে পারিল না। "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ, গৌড়ে প্রেরিত হইবার সময় পথিমধ্যে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। কথিত আছে কৃষ্ণদাস, এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া একান্ত শোকাকুলিত হৃদয়ে ১৬১৫ খ্রীঃ চান্দ্রাশ্বিন শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে রাধাকুণ্ডে পতিত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। * ভবিষ্যতে এই গ্রন্থখানি যে বৈষ্ণব মাত্রেরই সম্মান ও ভক্তির বস্তু হইবে, কৃষ্ণদাস বিন্দুমাত্রও তাহার আভাষ জানিতে পারিলে, তাঁহাকে শোকাবস্থায় কঠোর পরিশ্রমের ফললাভ করিয়া বিমল আনন্দের সহিত প্রাণত্যাগের পরিবর্ত্তে এরূপভাবে জীবনের অবসান করিতে হইত না।

কবিরাজ গোস্বামীর "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থখানি বৈষ্ণবগণের নিত্যসহচর। "আধ্যাত্মিক রূপে চৈতন্যের ধর্ম্মমত সমর্থন, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ও ঘটনার বিচিত্রতা প্রদর্শন ও রচনার ওজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ধরিলে, ইহা বৈষ্ণবীয় সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়। * * * ইহা

* কিন্তু গ্রন্থ চুরির বহুদিন পর খেতরীর মহোৎসব (১৫৮২ খ্রীঃ) হইয়া গেলে জাহ্নবা ঈশ্বরী যখন বৃন্দাবনে যান তখন তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া "নরোত্তম বিলাস" গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

তথা হৈতে গেলা জীব গোস্বামীর স্থানে।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি সেই খানে॥ (পৃঃ ২২৬)

বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে একটি অমূল্য রত্ন ও প্রেমভক্তির অমৃত প্রস্রবণ" (৺জগদীশ্বর গুপ্ত)। "চৈতন্য প্রভুর জীবন সম্বন্ধে গোবিন্দ দাসের কড়চার পর, "চৈতন্যচরিতামৃত" শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ; কিন্তু গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রবীণতা গুণে এই পুস্তক পূর্ব্ববর্ত্তী সকল পুস্তক হইতেই শ্রেষ্ঠ। চৈতন্য ভাগবতের ন্যায়, ইহাতে ঘটনার তত ঘনসন্নিবেশ নাই, বর্ণিত ঘটনা গুলির মধ্যে অবকাশ আছে, কিন্তু সেই অবকাশ, ছবির অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের ন্যায় মূল ঘটনার সৌন্দর্য্য গাঢ়ভাবে স্পষ্ট করে। বৈষ্ণবোচিত সুন্দর বিনয়, ভক্তির ব্যাখ্যা, স্বচ্ছন্দে সংযত লেখনীর দ্বারা বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোড়ন ও প্রেমকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসম্বদ্ধ করার নৈপুণ্য—এই বহুগুণ সমন্বিত হইয়া "চৈতন্যচরিতামৃত" এক উন্নত প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে ক্ষুদ্র লতা গুল্ম পুষ্প হইতে বৃহৎ বনস্পতির বিচিত্র সমাবেশ যুক্ত বৈভব প্রকটিত করিতেছে" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় স্বীয় গ্রন্থে কিরূপ বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন :—

"সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন
যাঁ সবার চরণ কৃপা শুভের কারণ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে
তাঁহার চরণ ধুঞা মুঞি করি পানে ॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ
তোমরা এ অমৃত পী'লে, সফল হৈল শ্রম ॥'

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের ভাষা সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ বাঙ্গালা নহে। বৃন্দাবনী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই তিন ভাষার শব্দেরই যথেষ্ট সমাবেশ আছে। কিন্তু, তাহা হইলেও ভাষার অংশ সাধারণ পাঠকের পক্ষে তত দুর্ব্বোধ্য নহে!

সুবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের, সংস্কৃত ভাষায় একটি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই টীকা এখনও বৈষ্ণব সমাজে আদৃত রহিয়াছে।

এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত কবিরাজ গোস্বামী বহুতর সুমধুর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান ঝামটপুর গ্রামে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি-সেবা, কবিরাজ গোস্বামীর কাষ্ঠ পাদুকা, এবং ভজনস্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সকলের নিত্য-পূজাদির বন্দোবস্ত আছে। ঝামটপুর, বৈষ্ণব ও সাহিত্য-

সেবিগণের তীর্থ-স্থান। এখানে কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য মুকুন্দ কবিরাজের হস্তলিখিত "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থ রক্ষিত আছে। কবিরাজ গোস্বামীর স্বহস্তলিখিত মূল গ্রন্থখানি শ্রীবৃন্দাবনে রাধাদামোদরের মন্দিরে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

"আজি কেন ভুলিলে আমায় ?"

আজি কেন ভুলিলে আমায় ?—
মনে পড়ে বাল্যস্মৃতি,
ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি,
যতন, আদর কত দুঁহু দুজনায়।
বালক সরল প্রাণ,
নাহি ছিল অভিমান,
স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা কভু না ছিল তাহায়।
সুখ-স্নিগ্ধ ছিল সব,
প্রাণে প্রাণে অনুভব,
দোঁহার ব্যথার ব্যথী ছিনু দুজনায়।
সে দয়া, সে মায়া তব
মুহূর্ত্তে ভুলিলে সব,
এ-ও কি গো, প্রিয়বর, সম্ভব তোমায় ?
আজি কেন ভুলিলে আমায় ?—
বুঝিতে নারিনু আমি,
স্নেহের মূরতি তুমি,
কেমনে সে স্নেহ-ডোর ছিঁড়ি অচিরায়,
গেলে চলি মোরে ছাড়ি,
বিশ্বাস করিতে নারি,
অন্ধ প্রেম দেখেও না দেখিতে যে চায়

দিন পরে দিন যায়,
তবু মনে হয় হায়,
কাল বুঝি আসিবে সে দেখিতে আমায়।
ক্ষীণ আশা লয়ে প্রাণে,
চেয়ে থাকি পথপানে,
প্রতারিত প্রতিদিন আশা-ছলনায়।
আজি কেন ভুলিলে আমায় ?—
বল, সখা, বল শুধু
ব্যথা কি দিয়েছি কভু
কোমল অন্তরে তব স্বার্থ-প্রেরণায় ?
ক'রে থাকি শত দোষ,
নাহিত তোমার রোষ ;
'ভাই' ব'লে কত ক্ষমা করেছ আমায়।
তবে কেন দূরে যাও,
একবার ফিরে চাও,
'ভাই' ব'লে একবার ডাক' পুনরায়।
এত ভালবাসা হায়,
ভোলা কি কখন' যায় ?
জানু পাতি' ভিক্ষা মাগি, ক্ষম গো আমায়।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য।

(আলোচনা ও সঙ্কলন)

বঙ্গদর্শন—বৈশাখ ১৩২০। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের লিখিত তিনটি প্রবন্ধই গবেষণাপূর্ণ। প্রথম প্রবন্ধে "অক্ষয়চন্দ্র ও সাহিত্য সম্মিলন"। এই প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন "বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রই যেন * * সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ছিলেন। তারাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি আঁর সকলেই অবসর মত সাহিত্যসেবা করিতেন। একমাত্র

অক্ষয়চন্দ্রই সাহিত্যসেবাকে জীবনের মুখ্যকর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এইজন্য এক সময়ে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রধান সহায় হইয়া উঠেন। সে কালের বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের কোন কোন রচনা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের বলিয়া সন্দেহ হইত। গ্রন্থ সমালোচনার ভার অনেকটা বোধ হয় অক্ষয়চন্দ্রের উপরেই অর্পিত ছিল।" * * অক্ষয়চন্দ্রের চিন্তার মৌলিকতা না থাকিলেও ভাষার একটা অনন্যসাধারণ শক্তি ও সরলতা আছে।" লেখকের মতে "অক্ষয়চন্দ্র যে গদ্যরচনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার মূল্যও আজিকার বাজারে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে।" ইহার কারণ "লোকচিত্ত এখন শব্দের মোহিনী মায়া কাটাইয়া গভীরতরভাবে অর্থের অন্বেষণে ছুটিতেছে। * * সাহিত্যের শক্তি এককালে ধ্বনিগত ছিল, এখন ক্রমে ক্রমে চিন্তাকে, গবেষণাকে, যুক্তি বিচারকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। * আজিকার বাঙ্গালাসাহিত্যে গদ্যরচনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের পরে অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, কি কালীপ্রসন্ন, ইহাঁরা সকলেই সাহিত্য-মহারথী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার ক্ষমতাটা যে কত বড় ইহা রবীন্দ্রনাথ যেমনটা প্রমাণ করিয়াছেন, ইহাদের কেহই তেমনটা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এমন নিরেট গাঁথুনী বাংলা ভাষার শক্তিতে যে সম্ভব ইহা লোকে পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারিত না।"

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করার পর লেখক মহাশয় "সাহিত্য সম্মিলন" সম্বন্ধে স্বকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "ইংরেজমনীষিসমাজে ব্রিটিশ এসোসিয়েসন্ যে স্থানটা অধিকার করিয়া আছে বাংলা সুধীমণ্ডলী মধ্যে আমাদের এই সাহিত্যসম্মিলন সেই স্থানটি অধিকার করুক।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ সম্বন্ধে প্রবন্ধকার বলিতেছেন—"অক্ষয়চন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের বঙ্কিমযুগের একজন প্রধান কর্ম্মী। তাঁর চক্ষের উপরে বাংলার এক নব যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি সাক্ষাৎভাবে এ যুগের জন্ম কর্ম্ম সকলই জানেন। আমরা তাঁর নিকটে বিগত চল্লিশ বৎসরের ভিতরকার বিকাশের ইতিহাসটি শুনিব, আশা করিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শন প্রথমে বাংলা দেশে ও বাংলা ভাষাতে যে নূতন আদর্শ ফুটাইয়া তোলে, তার পরে ক্রমে সেই ভাব, সেই শক্তি, সেই চিন্তা পরিপক্কতা

প্রাপ্ত হইয়া, তাঁর আপনার নবজীবনে ও বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রচারে" যে আকার ধারণ করে, কেমন করিয়া বঙ্গদর্শনের প্রথম বয়সের বহির্মুখীনতা ক্রমে আপনাকে খুঁজিতে যাইয়া, আপনাকে হারাইয়া ফেলিবার আয়োজন করিয়া তুলে, এবং ক্রমে পুনরায় আত্মস্থ হইয়া, নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার জন্য লালায়িত হয়, কেমন করিয়া একদিকে "নবজীবন" ও অন্যদিকে "প্রচার" এই প্রত্যাবর্ত্তনের ইতিহাস রূপে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তার পর ক্রমে আজ সেই প্রত্যাবর্ত্তনই পূর্ণতর, গভীরতর, বিশদতর আকারে, সমধিক সত্যোপেত হইয়া, এক বিরাট ও সর্ব্বতোমুখী সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছে বাঙ্গালীর, প্রাণপণের এই চল্লিশ বৎসরের এই পবিত্র পুরাণগাথা অক্ষয়চন্দ্রের মুখে শুনিয়া কৃতার্থ হইব, ভাবিয়াছিলাম। এ কথার সঞ্জয়রূপে, বাংলা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আজ এক অক্ষয়চন্দ্রই বাঁচিয়া আছেন। এই আশা করিয়া যাঁরা তাঁর চট্টগ্রামের অভিভাষণটি পড়িতে বা শুনিতে গিয়াছিলেন, তাঁরা যে হতাশ হইয়াছেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।"

অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে যাহা করেন নাই তাহার আভাস দেওয়ার পর, লেখক মহাশয় তিনি যাহা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। "অক্ষয়চন্দ্র তাঁর অভিভাষণে (বাংলা) এবারতের বা style এর একটা দিক্‌মাত্র দেখাইয়াছেন। ভাষা প্রাণময়ী হইবে। দেশের অর্থাৎ দশের প্রাণ বস্তু সংস্পর্শেই ভাষা আপনার প্রাণশক্তি লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং দেশের প্রাণের চাবিটি হাতে লইয়া সাহিত্যিককে সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"

লেখক এই আলোচনারও অপূর্ণতা দেখাইয়াছেন। লেখক বলেন "বাঙ্গালীর একটা মন আছে অর্থাৎ সমষ্টিগত এই যে বঙ্গসমাজ, বহু শতাব্দ সহস্রাব্দ ধরিয়া এই ভারতবর্ষে যে সমাজ অপরাপর ভারতীয় সমাজ হইতে একটু পৃথক হইয়া. একটা কিছু অল্প বিস্তর বিশেষত্ব লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ও বাড়িয়া উঠিয়াছে, তার মনের চেহারায় সেটি গাঁথিয়া আছে। বাংলা এবারতে বা styleএ বাঙ্গালীর এই মানসিক চেহারাটি ধরা পড়ে। এই চেহারাটি যেখানে নাই, বংলা এবারত, অর্থাৎ বাঙ্গালীর খাঁটি সাহিত্যের ছাঁচটিও সেখানে নাই।" লেখক বলেন বিদেশের বিদ্যাপ্রভাবে, অবশ্য সেই বিদ্যা হজম করিতে পারিনা বলিয়া, আমাদের "স্বদেশের অন্তঃপ্রকৃ

ও স্বদেশী সাহিত্যের এবারত" উভয়ই নষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে। এই মতের প্রমাণ স্বরূপে লেখক বলেন "বিদেশী ধর্ম্মের প্রভাবে, আমাদের মধ্যে আধুনিক স্বদেশিক ধর্ম্মসাহিত্যে, এমন কতকগুলি শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে, যার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার, লোক প্রকৃতির, সমাজ প্রকৃতির কোনই সঙ্গতি নাই।" লেখক দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, Conscience 'বিবেক' নহে ধর্ম্ম বুদ্ধি; আর Humanity বিশ্ব-মানব না বলিয়া 'নারায়ণ' বলিলে ঠিক হয়।

অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছেন "ভাষা প্রাণময়ী হইবে।" বিপিন বাবু এই উক্তি আশ্রয় করিয়া স্বকীয় সারবান প্রবন্ধের নিম্নরূপ উপসংহার করিয়াছেন—"ভাষা দেশের লোকের প্রাণ সংস্পর্শেই প্রাণময়ী হইবে, কথাটা অতি সত্য। কিন্তু প্রাণ বস্তুতো আর জড় নহে। নিয়তই যে এই প্রাণ স্ফুরিত হইতেছে; নিত্য নূতন জ্ঞান, নিত্য নূতন শক্তি ও নিত্য নূতন রস আকর্ষণ করিয়া দেশের প্রাণবস্তু উত্তরোত্তর বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এ প্রাণ যে সেই মহাপ্রাণেরই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম তরঙ্গভঙ্গ মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রাণের মধ্যে সেই অনাদি অনন্ত বিশ্বপ্রাণ অনাদি অনন্তরূপেই লুকাইয়া আছেন। এই জন্যই এই প্রাণ ক্রমে বাড়িয়া উঠে। এ বিকাশের বিরামও নাই, শেষও নাই। সুতরাং যতটুকু ফুটিয়াছে, তাহাকে ধরিয়াই পড়িয়া থাকিলে চলিবেনা, যা এখনও ফোটে নাই, কিন্তু ফুটিবার উপক্রম করিতেছে, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং কেবল স্থিতির দিক নয়, গতির দিক দেখিয়াও সাহিত্যকে চলিতে হইবে। দেশের পুরাভ্যস্ত কথার সাহায্যে, দেশের প্রাণের অন্তঃপুরে সাহিত্যিককে যেমন প্রবেশ লাভ করিতে হইবে, সেইরূপ আবার ভিতরেরও বাহিরের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের চিত্তে যে সকল নূতন নূতন ভাবও আদর্শ স্ফুটনোন্মুখ হইতেছে, অভিনব শব্দ সৃষ্টি করিয়া, সেগুলিকেও ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, নতুবা সাহিত্যকে সঞ্জীবিত রাখা যে অসাধ্য হইয়া পড়িবে।" বিপিন বাবুর দ্বিতীয় প্রবন্ধ "চরিত্র চিত্র শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।" এই প্রবন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে তাহা সারগর্ভ ও সত্যান্বেষী মাত্রেরই মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করা উচিত। লেখক মহাশয় বলিতেছেন "আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মিগণের মধ্যে কেবল একজনমাত্র প্রকৃত লোকনায়ক আছেন বলিয়া আমার মনে হয়, তিনি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত। অশ্বিনীকুমার শিক্ষিত, কিন্তু কোনও

বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন; সুবক্তা কিন্তু দৈবীপ্রতিভা সম্পন্ন বাগ্মী নহেন। সুললিত বাক্যযোজনা করিয়া তিনি বহুলোককে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু শব্দ ও ভাবের বন্যা ছুটাইয়া তাহাদিগকে আত্মহারা করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারেন না, তিনি সাহিত্যিক,—তাঁর ভক্তিযোগ বাংলা ভাষায় এক খানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; কিন্তু যে সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা সমাজে নূতন আদর্শ ও নূতন উৎসাহ ফুটিয়া উঠে, সে সৃষ্টিশক্তি তাঁর নাই। তিনি দরিদ্র নহেন, পিতৃদত্ত সম্পত্তির দ্বারা তাঁর সাংসারিক সচ্ছলতা সম্পাদিত হয়; কিন্তু যতটা ধনের অধিকারী হইলে, সেই ধনের শক্তিতে লোকে সমাজপতি হইয়া উঠে, অশ্বিনীকুমারের সে বিভব নাই। অশ্বিনীকুমার বি,এল পাশ করিয়া কিছুদিন ওকালতি করিয়াছিলেন; সে দিকে মনোনিবেশ করিলে তিনি আধুনিক ব্যবহারজীবিগণের অগ্রণী দলভুক্ত হইতে পারিতেন না যে, এমনও মনে হয় না। কিন্তু অশ্বিনীকুমার সে দিকে বিধিমত চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং বড় উকীল কৌন্সিলী হইয়াও লোকে সমাজে যে প্রতিপত্তি ও প্রভাব লাভ করে, অশ্বিনীকুমার তাহা পান নাই। সরকারী কর্ম্মে কৃতিত্বের দ্বারাও সমাজে এক জাতীয় নেতৃত্ব লাভ করা যায়। অশ্বিনীকুমারের পিতা বড় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; ইচ্ছা করিলে অশ্বিনীকুমারও সহজেই একটা ডেপুটিগিরি জুটাইতে পারিতেন, আর তাঁর বিদ্যা ও চরিত্রের গুণে রাজকার্য্যে তিনি যে খুব কৃতিত্ব এবং উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এ সকলের কিছুই করেন নাই। যে গুণ থাকিলে, যে কর্ম্ম ও কৃতিত্ব বলে সচরাচর আমাদের মধ্যে লোকনেতৃত্ব লাভ হয়, অশ্বিনীকুমার তার কিছুরই দাবী করিতে পারেন না। তথাপি তাঁর মতন এমন সত্য ও সাচ্চ লোক-নায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কর্ম্মিগণের মধ্যে আর একজনও আছেন বলিয়া জানি না।”

অশ্বিনীকুমারের এই লোকনায়কত্বের কারণ সম্বন্ধে লেখক বলেন যে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। আমাদের পিতৃ পিতামহেরা যেভাবে আপন আপন গ্রামের সঙ্গে একাত্ম হইয়া বাস করিতেন আমরা আর তাহা করিনা। কিন্তু অশ্বিনীকুমার সাধারণ ইংরাজী নবীসদের মত জীবনটা কাটান নাই। একবার অশ্বিনীকুমার কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বাবুর

নিষেধ তাহা তিনি করেন নাই। কলিকাতায় আসিলে আজ তিনি যে স্থান পাইয়াছেন সেস্থান পাইতেন না। অশ্বিনীকুমার প্রথমে মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশ সেবা আরম্ভ করেন। তাহার পর ওকালতী ছাড়িয়া শিক্ষকের কাজ আরম্ভ করেন। প্রথমে ইস্কুল করেন পরে সেই ইস্কুল কলেজ হয়। নিঃস্বার্থভাবে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা দেশের লোককে দিবার প্রবৃত্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরেই অশ্বিনীকুমারের। অশ্বিনীকুমারের চরিত্র প্রভাবে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী সকল প্রকারে দেশের লোকের রোগে বিপদে সর্ব্বদা সেবা করিয়াছেন। "অশ্বিনীকুমারের নৌকা কোথাও আসিয়াছে শুনিলেই সে স্থানের গরীব লোকেরা আপন আপন শরীর মনের বোঝা লইয়া নিতান্ত আপনার জন ভাবিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে।" বিপিনবাবুর তৃতীয় প্রবন্ধ "বিলাতের কথা, ইংরাজ চরিত্রের একদিক।" এই প্রবন্ধে আমাদের আজকালকার চরিত্রের সহিত ইংরাজ চরিত্রের তুলনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে ইংরাজের স্বার্থপরতার ভিতরেও একটা অদ্ভুত উদারতা আছে। ইংরেজ মাংসাশী কিন্তু পশুদের যেরূপ যত্ন করে আমরা তাহা করি না। ইংরাজ মনিব ভৃত্যদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করে আমরা তাহা করি না। ইংরাজ ব্যবসায়ী যেরূপ ভদ্রতার সহিত ব্যবসা করে আমরা তাহা করি না। "বিলাতের ব্যবসা বাণিজ্যের রীতি ও নীতি দেখিয়া এই জন্যই সত্য সত্য ইংরেজের প্রতি ভক্তি হয়।"

বর্ত্তমান সংখ্যা বঙ্গদর্শনের সমস্ত প্রবন্ধগুলিই মূল্যবান ও সারগর্ভ। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু মহাশয় "চণ্ডীদাস" এর কবিতার আলোচনা করিয়াছেন "চণ্ডীদাস আদৌ সাধক তারপর প্রেমিক". * * * চণ্ডীদাসের রাগাত্মক পদাবলী হইতে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারি যে তিনি একজন উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন। চণ্ডীদাস পরকীয়া নায়িকার গান গাহিয়াছেন, তাহাতে শিহরিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ পরকীয়া ভাবে ভগবানে প্রেমার্পণে শুধু যে উল্লাস বেশী তাহা নহে, ইহার স্বার্থহীনতা ও আত্মসমর্পণও অনেক বেশী মাত্রায় প্রগাঢ় ও সম্পূর্ণ। ইহাতে জোর নাই, দাবী নাই, কেবল ভালবাসা দিয়া পরকে আপন করার ভাব আছে, আর অযাচিত ভাবে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া আছে, তাই ইহার মাধুর্য্যের তীক্ষ্ণতা অত্যন্ত প্রখর।"

রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিয়াছেন যে "সমাজকে শাসিত করিবার উদ্দেশ্যে, এবং আমাদের বাঁধাধরা সামাজিক নিয়মের প্রতিকূলে স্বাধীন প্রণয়ের বিজয় ঘোষণার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব কবি তাঁহার পদাবলীর সূচনা করিয়াছেন।" লেখকের মতে এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ পুরাণকারই মধুর রসের প্রথম পথ প্রদর্শক। "বিদ্যাপতি ভালবাসার ক্রমপুরিপুষ্টি চিত্রিত করিয়াছেন" "বিদ্যাপতির যেখানে শেষ, চণ্ডীদাসের সেইখানে আরম্ভ।" যে গভীর আত্মবিলোপী প্রেমে বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বিরহ দশায় দিব্যোন্মাদ সেই দিব্যোন্মাদ চণ্ডীদাসের রাধার প্রথম হইতেই উপস্থিত।"

ব্রহ্মবিদ্যা—বৈশাখ ১৩২০—২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা। সমস্ত প্রবন্ধগুলিই সারগর্ভ ও মূল্যবান। শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের "চৈতন্য কথা" গত বৎসর হইতে বাহির হইতেছে। এবারে "রাধাকৃষ্ণ কে ?" এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দেখাইতেছেন—"মহাভারতের কৃষ্ণ পরব্যোমের অধিপতি বিষ্ণু। ভাগবতের কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।" তাহার পরই প্রশ্ন এই যে মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেবের অপ্রতিহত যোগ দৃষ্টিতে কি 'রাসলীলা' অজ্ঞাত ছিল ? "ব্যাসদেব কি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ লীলা মহাভারতে অপ্রকট রাখিয়াছিলেন ?" তাহার পর প্রশ্ন তুলিয়াছেন "তবে কি শ্রীমতীর কৃষ্ণ,গোপীজনবল্লভকৃষ্ণ, মহাভারতের অভিনয়ের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ?" লেখক বলিতেছেন "এ কথা বরং মানিব, তথাপি বলিব না যে রাধাকৃষ্ণ কাল্পনিক। বরং বলিব যে নিত্য যোগমায়া ভগবতী সেই শুদ্ধ নিত্যলীলা অবিচিন্ত্য অভেদ্য মায়ায় আবৃত রাখিয়াছিলেন—বলিব যে ব্রহ্মার অগম্য সেই লীলা প্রকটিত করিবার সময় তখনও হয় নাই—বলিব যে, বৃন্দাবনের অদৃশ্য চিত্রপটে যমুনালহরীর গভীর অন্তঃস্তরে, ললিতলবঙ্গলতা জড়িত নিভৃত কুঞ্জকাননে, সেই লীলা লুক্কায়িত ছিল ; তথাপি বলিবনা যে রাধাকৃষ্ণ কাল্পনিক।" তাহার পর লেখক বলিতেছেন ব্যাসদেবের দৃষ্টি ও শুকদেবের দৃষ্টি স্বতন্ত্র।" * * "ব্যাসদেবে ও শুকদেবে যে ভেদ, সগুণ ও নির্গুণে যে ভেদ, 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মঃ' ও "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" এ দুয়ে যে ভেদ মহাভারত ও ভাগবতে যে ভেদ, রুক্মিণীরমণ ও রাধারমণে সেই ভেদ। উপসংহারে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন "সে লীলা নিত্য লীলা। কখনও প্রকট, কখনও অপ্রকট। প্রেমের রাজ্যে সে লীলা নিত্য বিরাজিত। যেমন অন্ধকার সূর্য্যে স্থান পায়না, সেইরূপ সন্দেহ সে লীলাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।"

"বেদান্ত পরিভাষা (মূল ও ব্যাখ্যা) ব্রহ্মবিদ্যায় ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। লেখক শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল। ব্যাখ্যা অতি সুন্দর ও নির্দ্দোষ। এই বেদান্ত আলোচনার যুগে এই প্রবন্ধ শাস্ত্রানুরাগী অথচ অল্পসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। এবারে যেটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জ্ঞানগত ও বিষয়গত প্রত্যক্ষের প্রযোজক কি, এই প্রশ্নের মীমাংসা আরম্ভ হইয়াছে। প্রমাতৃ চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্ত ও বিষয় চৈতন্ত, বৃত্তি, অনুব্যবসায় প্রভৃতি হিন্দু মনোবিজ্ঞানের বিষয় সমুহের আলোচনা আছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় "যোগ শিক্ষা উপনিষদ্" মূল ও ব্যাখ্যা বাহির করিতেছেন। "যোগশিখা উপনিষদ্ অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ সমূহের অন্যতম। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদ্ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত; (১) বেদান্ত উপনিষদ্, (২) যোগ উপনিষদ্, (৩) সন্ন্যাস-উপনিষদ্, (৪) সাম্প্রদায়িক (শৈব বা বৈষ্ণব) উপনিষদ্। যোগ-উপনিষদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষুরিকা, চুলিকা, নাদবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, তেজোবিন্দু, হংস, যোগতত্ত্ব ও যোগশিখা পরিগণিত হয়। যোগ-উপনিষদ্ প্রায়ই পদ্যে রচিত। সন্ন্যাস উপনিষদে যেমন চতুর্থাশ্রমীর আচার ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছে, যোগ উপনিষদে সেইরূপ যোগীর সাধন প্রণালীও যোগতত্ত্ব সাধারণ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।" * * "যোগশিখা-উপনিষদের ভাষা ও রচনার ভঙ্গীতে বোধ হয় যে, ইহা অপ্রাচীন উপনিষদ্। কিন্তু তথাপি ইহাতে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে, বিশেষতঃ হৃদয়ে পরমাত্মার ধ্যান সম্বন্ধে, কয়েকটি গুহ্য উপদেশ নিবদ্ধ আছে। যোগসিদ্ধ ভিন্ন অপরের পক্ষে সে উপদেশের সম্যক মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা অসম্ভব। এই সকল বিষয়ে যে রহস্তবিদ্যা ভারতবর্ষে গুরু-পরম্পরায় বহুদিন হইতে উপদিষ্ট হইত, তাহাই বোধ হয় পরবর্ত্তীকালে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়া যোগশিখা প্রভৃতি যোগ উপনিষদের আকার ধারণ করিয়াছে।"

স্বামী পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিত "সরল যোগসাধন" প্রবন্ধটিও পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর। পাতঞ্জল দর্শনের পঞ্চ ক্লেশের মধ্যে "অস্মিতা" দ্বিতীয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই অস্মিতা কি এবং রাগ ও দ্বেষ কি তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "পঞ্চকোষবিবেক" লেখক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী। এই প্রবন্ধে পঞ্চদশী হইতে এ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সুন্দরভাবে

সরল বঙ্গানুবাদে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী লিখিত 'অনুরাগ' প্রবন্ধে বৈষ্ণব কবিদিগের অমৃতীময়ী কবিতা হইতে শ্রীমতীর 'রূপানুরাগ'এর বিশিষ্টতা বর্ণনা করা হইয়াছে। "প্রেমের উৎকর্ষহেতু চিত্তমধ্যে দুঃখ ও যখন সুখরূপে অনুভূত হয়, মনের তদানীন্তন অবস্থার নাম রাগ। যে অবস্থায় প্রেম-পাত্র সদাই অনুভব হয়, এবং প্রত্যেক অনুভবেই নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায় তাহারই নাম অনুরাগ। মিলনের পূর্ব্বে যেমন পূর্ব্বরাগ। মিলনের পর তেমনি অনুরাগ।"

ঘড়িওয়ালা।

স্বদেশীর ধূম যখন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে তখন আমরা ইস্কুলের বোর্ডিংএ থাকিতাম। স্বদেশীর প্রকৃত কাজ অন্য লোকেই করিত, কিন্তু স্বদেশীর ভূতটা বিশেষরূপে আমাদেরই যে ঘাড়ে চাপিয়াছিল, এখন তাহা সংসারে "অন্ন-চিন্তা চমৎকারা"র কৃপায় বেশই বুঝি। তখন রাস্তায় বাহির হইতে হইলেই দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইতাম এবং স্বদেশীর নিশান স্বরূপ চাদর কাঁধে না লইয়া পাগড়ী করিয়া মাথায় বাঁধিতাম; চলিতে চলিতে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতাম এবং সাহেব দেখিলে তাহার ঘেঁষিয়া ছাতি ফুলাইয়া চলিয়া যাইতাম এবং সেই চীৎকারে যখন সাহেব একবার মাত্র তাকাইয়া চলিয়া যাইত তখন আমরা গর্ব্বভরে হাসিতে থাকিতাম; যেন সাহেবকে খুব জব্দ করা হইয়াছে, সে ভয়ে ট্যাঁ ফোঁ করিতে পারে নাই, লজ্জায় বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।

আমাদের সিক্‌সথ্ মাষ্টার (sixth master) ছিলেন আমাদের বোর্ডিংএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। বয়স কম, নানা স্থানে চাকুরির চেষ্টা করিয়া পরিশেষে অতি অল্পবেতনে শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি স্বদেশী সম্বন্ধে আমাদের চেয়েও এক কাটী বাড়া। তিনি স্বদেশী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন; চটের মত পুরু এবং খাটো কাপড় পড়িতেন, চুলগুলোকে কাকের বাসা করিয়া রাখিতেন। মোট কথা তিনি এমন করিয়া স্বদেশীর ছাপ গায়ে মারিয়াছিলেন যে তাঁহাকে দেখিলেই একটা মূর্ত্তিমান স্বদেশীওয়ালা বলিয়া মনে হইত। তাঁহার মত, স্বদেশীর সর্ব্বোচ্চস্তরে আমরা আরোহণ করিতে পারি নাই। মোটা কাপড় পরিতে আমরা অভ্যস্ত হই নাই। বিশেষ

করিয়া আমি স্বদেশী মোটা কাপড় পরিতে পারিতাম না বলিয়া শান্তিপুরে বা ফরাসডাঙ্গার ধূতি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতাম। তত্রাচ মাষ্টার মহাশয় আমারও আদর্শ ছিলেন। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে, অন্যান্য সকলের মত আমার প্রাণ চাহিত না। বিশেষতঃ তাঁহার একদিনকার ব্যবহারে তাঁহার প্রতি, আমার আন্তরিক অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে। আজ সেইটাই পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

সে দিন রবিবার। সকাল বেলার পাঠ সাঙ্গ করিয়া সকলে মিলিয়া গুলতান করিতেছি, এমন সময় একটী জীর্ণপেণ্টুলানকোটপরিধায়ী এক সাহেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "Babu! is there any watch for repair?" "বাবু! কাহারও ঘড়ি মেরামত করাইতে হইবে?" ঘড়ি অনেকেরই খারাপ ছিল, কিন্তু সেই সাহেব দ্বারা মেরামত করাইতে হইলে, বিদেশীকে পয়সা দিতে হইবে বলিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "No" (না) আমার একটি সোনার ঘড়ি খারাপ হইয়াছিল, জুয়েল খুলিয়া লইবার ভয়ে স্থানীয় কোন দোকানে সেটী মেরামত করিতে দিই নাই। কলিকাতা আমাদের মধ্যে বড় একটি কেহ যাতায়াত করিত না যে কোন বিশ্বাসী দোকানে মেরামত করিতে দিব। আজ গৃহ-দ্বারে নিজে বসিয়া মেরামত করাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে দেখিয়া আমার ইচ্ছা হইল যে ঘড়িটি সেই সাহেবকে দিয়াই মেরামত করাইয়া লই। সে ইচ্ছা সকলের নিকট ব্যক্ত করিলাম। সকলেই সমস্বরে আপত্তি করিয়া উঠিল। কিন্তু ঘড়িটি অন্য দোকানে মেরামত করিতে দিবার সম্বন্ধে আমার আপত্তি তাহাদিগকে বলায় কেহ কেহ সম্মতি দিল। আমি ঘড়িটি বাহির করিয়া সাহেবের হাতে দিয়া, কত লাগিবে জিজ্ঞাসা করিলাম। সাহেব বলিল আগে ঘড়িটি খুলিয়া না দেখিলে বলিতে পারিবে না। সাহেব একটি বেঞ্চে বসিয়া তাহার যন্ত্রাদি বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমি ইত্যবসরে সাহেবকে একটু ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম তাহার মোটা মোটা আঙ্গুলগুলি যন্ত্রাদি খুঁজিবার সময় কাঁপিতেছে। সাহেবটির আকৃতি দেখিলে বোধ হয়, এককালে সে ভীষণ বলশালী ছিল, কিন্তু দুরন্ত ম্যালেরিয়া তাহার মোটা মোটা হাড়গুলি ব্যতীত মাংসের চিহ্ন খুব কমই রাখিয়াছে। চুলগুলা সোজা ও লম্বা, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, কিন্তু ভয়ানক রকমের উজ্জ্বল। মুখমণ্ডল শ্মশ্রু গুম্ফে পরিপূর্ণ। সে একটি কাল সার্জ্জের স্যুট পরিধান করিয়াছিল,

কিন্তু ধূলায় সেটির রং কটা হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে তাহার জীর্ণতার সাক্ষী স্বরূপ চৌকা তালি দেওয়া। হ্যাটটির সোলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে! জুতাদ্বয়ের একটির অগ্রভাগ হাঁ করিয়া আছে এবং দুই পাটিই শত তালিতে পূর্ণ, উভয়েরই তলভাগ হাফশুল এবং ত্রিশূলে শোভিত। তালিতে তালিতে জোড় লাগিয়াই তাহা এখনও জুতা বলিয়া গণ্য। নতুবা তাহার জুতা-জন্মের অবসান কোন্ দিন হইয়া যাইত।

লোকটা সাহেব হইলেও তাহার প্রতি আমার করুণার উদ্রেক হইতেছিল। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিয়া সঙ্গীদিগকে বলিতে গেলেই স্বদেশদ্রোহী প্রতিপন্ন হইব ভাবিয়া বলিতে সাহসে কুলাইল না। সাহেব ঘড়িটি খুলিয়া, দেখিয়া শুনিয়া বলিল "বাবু! ইহা অয়েল করা দরকার এবং হেয়ারস্প্রীংটি নূতন দিতে হইবে। বাবু আপনি জানেন--কেবলমাত্র অয়েল করিয়া দিলেই একটি টাকা পাওয়া যায়, তা'ছাড়া হেয়ার স্প্রীংটি নূতন দিতে হইবে। বাবু! আমি বেশী চাহি না, আমার আজকার খরচের মত পূরাপূরি একটি টাকা দিবেন"।

ঘড়ি মেরামত শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত আমার সঙ্গীগণ, তখন দর দস্তুর করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বলিল "সর্ব্বসমেত চারি আনা পাইবে"। কেহ মধ্যস্থতা করিয়া বলিল "আচ্ছা ছয় আনা হইল"। সকলেই দর সম্বন্ধে একটা না একটা মত জ্ঞাপন করিতে গিয়া মহা গোলযোগ করিয়া তুলিল এবং সে গোলযোগের মধ্যে কোন্‌টি যে শেষ দর তাহা বুঝিবার সামর্থ্য কাহারও রহিল না। আমি কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এরূপ অভদ্রভাবে সকলে মিলিয়া একটি লোককে বিরক্ত করা আমার ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু কিছু বলিবার উপায় নাই; বলিলেই স্বদেশদ্রোহী হইব। সাহেব শেষে মলিন নয়নে আমার মুখের পানে চাহিল। আমি বলিলাম "আচ্ছা সাহেব মেরামত কর সে জন্য কিছু আটকাইবে না" সাহেব আমাকে ধন্যবাদ দিয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। আমি এবং আমার সঙ্গে অনেকে তামাক টানিবার নিমিত্ত রান্না ঘরে ঠাকুরের নিকট গেলাম। বাকী সকলে কেহ বা মার্ব্বেল খেলিতে, কেহ বা কিছু করিতে, সে স্থান ত্যাগ করিল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ঘড়িটি সেই বেঞ্চের উপর পড়িয়া আছে, সাহেব তাহার যন্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া চুপি চুপি পলাইতেছে। কারণ, বুঝিতে পারিলাম

না। ঘড়িটা তুলিয়া লইয়া দেখি তাহার নীচের দিক টোল খাইয়া গিয়াছে এবং উপরকার ডায়েলটি বন্ধ হইতেছে না। এমন সময় আরও কয়েক জন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ব্যাপার দেখিয়া সাহেবকে ধরিতে ছুটিল। দুর্ব্বল সাহেব তখনও বোর্ডিংএর সীমানা অতিক্রম করিতে পারে নাই। বোর্ডারগণ সহজেই তাহাকে ধরিয়া আনিল। গোলমাল শুনিয়া স্বদেশীওয়ালা সিকসথ্ মাষ্টার মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি সাহেবকে ইংরাজীতে বলিলেন "চোর! তুমি পালাইতেছিলে কেন?" সাহেবের শীর্ণ শ্বেত মুখ লাল হইয়া উঠিল, সাহেব ধীরে ধীরে বলিল "বাবু আমি চোরের কাজ কিছুই করি নাই। তবে আমার দুর্ব্বলতাবশতঃ হাত হইতে ঘড়িটি পড়িয়া গিয়া টোল খাইয়া গিয়াছে—এবং উপরকার ডায়েলটি লাগিতেছে না। তাহাও আমি মেরামত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার হাত কাঁপিতেছে বলিয়া পারিলাম না। ইহার ক্ষতি পূরণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে তাহা আমি করিতাম; কিন্তু তাহা যখন নাই তখন অগত্যা আমি চলিয়া যাইতেছিলাম। চুরি করিবার মতলব থাকিলে ঘড়ি শুদ্ধ লইয়া যাইতাম"। কিন্তু তাহার যুক্তিতে কেহই কর্ণপাত করিল না। সকলেই বলিল হয় ঘড়ি ঠিক করিয়া দাও, নয় উহা ঠিক করাইবার দাম দিয়া যাও। সাহেব কাতর ভাবে বলিল "বাবু! দুইটিই যে আমার ক্ষমতার অতীত হইয়া পড়িয়াছে।"

মাষ্টার—"যদি মেরামত করিবার ক্ষমতা নাই তবে মেরামত করিতে লইয়াছিলে কেন?

সাহেব—ক্ষমতা ছিল জানিতাম কিন্তু এই একমাস ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া যে সে ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে তাহা জানিতাম না।

মাষ্টার মশায় জোরে বলিয়া উঠিলেন "Liar" (মিথ্যাবাদী) সাহেব পুনরায় লাল হইয়া উঠিল কিন্তু ধীরে ধীরে বলিল "বাবু আমি মিথ্যাবাদী নহি। এখন আমি দৈন্যের চরম সীমায় উপনীত হইলেও এককালে আমার অবস্থা ভাল ছিল। আমি কলিকাতার মধ্যে একজন বিখ্যাত ঘড়িওয়ালা ছিলাম। কিন্তু—যাক্ সে কথায় আবশ্যক নাই। ঘড়ি মেরামতের কার্য্যে আমি বহু সার্টিফিকেট পাইয়াছি কিন্তু এখন তাহা আমার সঙ্গে নাই বলিয়া আপনাকে দেখাইতে পারিতেছি না। আজ আমার সে ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ার কথা আমি নিজেই যদি জানিতাম, তবে কাহারও ঘড়ি

মেরামত করিতে লইতাম না। একমাস শয্যাগত থাকায় সকল কর্ম্মের বাহির হইয়া পড়িয়াছি। বাবু! অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমার ক্ষতিপূরণ দিবার ক্ষমতা নাই।"

কিন্তু ক্ষমতা নাই বলিলে ছাড়ে কে? মাষ্টার মহাশয়ের হুকুমে ছাত্রগণ সাহেবের যন্ত্রাদির ঝুলিটি কাড়িয়া লইল এবং মাষ্টার মহাশয় বলিলেন "ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইহাই রাখিয়া যাও।"

সাহেব। "Ah! Babu, Now those are the only sources of my mainteinance" "বাবু এইগুলিই আমার জীবিকার একমাত্র সম্বল।" বাবু আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমার যন্ত্রাদি আমাকে ফেরৎ দিন। একমাস কাল শয্যাগত ছিলাম—আজ পর্য্যন্ত পথ্য পাই নাই, কেবলমাত্র আমার রুগ্ন কন্যা ও স্ত্রীর পথ্য সংগ্রহের জন্য একমাস পরে আজ প্রথম কার্য্যে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু দেখিতেছি জগদীশ্বর আমার প্রতি বিরূপ, নতুবা হাত কাঁপিয়া, আমার স্ত্রী ও কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত একটী মাত্র টাকা সংগ্রহে অক্ষম হইব কেন?, বাবু! আমার কন্যাকে আমি মৃত্যুমুখে রাখিয়া আসিয়াছি। ডাক্তার বলিয়াছে প্রত্যহ তাহাকে মুরগীর ঝোল এবং ব্রাণ্ডি দিতে না পারিলে সে কেবলমাত্র দুর্ব্বলতার জন্য মারা যাইবে। সে আমার only daughter বাবু only daughter।" (একমাত্র কন্যা) ঝর ঝর করিয়া সাহেবের সেই কোটরগত চক্ষুদ্বয় হইতে জল ঝরিতে লাগিল।

আমরা বাঙ্গালীসন্তান সাহেবের সম্বন্ধে কত অদ্ভুত কল্পনা করিয়া থাকি—তাহাদের সম্বন্ধে কত অদ্ভুত ধারণা পোষণ করি। তাহাদের সন্তানেরা বড় হইয়া আর পিতা মাতার খোঁজ খবর লয় না বলিয়া, আমরা তাহাদের মধ্যে পিতৃভক্তির অভাব দেখি এবং সেই কারণেই তাহাদের পিতাদিগের বাৎসল্যস্নেহ পূর্ণতা লাভ করে না মনে করি। কারণ পিতা পূর্ব্ব হইতেই জানেন যে সন্তান সন্ততি বড় হইলেই তাঁহাদের সকল সংশ্রব, সকল মায়া কাটাইবে। আজ দেখিলাম পিতা সবই সমান—কি ইংরাজ, কি মুসলমান, কি বাঙ্গালী, পিতৃস্নেহ সম্পদে সকলেই সমান ঐশ্বর্য্যবান। সাহেবের অশ্রুবর্ষণ দেখিয়া আমারও চক্ষুদ্বয় জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

স্বদেশীওয়ালা মাষ্টার মহাশয় কিন্তু বিদেশীয়ের সেই কাতরতায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি রূঢ়স্বরে বলিলেন "ও সব মায়া কান্না

রাখিয়া এখান হইতে চলিয়া যাও" বলিয়াই সাহেবকে জোরে এক ধাক্কা দিলেন। দুর্ব্বল সাহেব সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল, ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল "God bless you Babu" (বাবু, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন) বলিয়াই কাতর নয়নে যন্ত্রের ঝুলিটির প্রতি একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

আমার মনে কি যন্ত্রণা উপস্থিত হইল তাহা গুছাইয়া বলিতে পারি না। মনে হইতেছিল হায়! যদি সাহেবের যন্ত্রের থলিটা কোনরূপে মাষ্টার মহাশয়ের ঘর হইতে চুরি করিতে পারি, তবে সাহেবের একমাত্র জীবিকার্জ্জনের উপায়টি তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া আসি। কিন্তু তাহা অসম্ভব। মাষ্টার মহাশয় বড় কড়া লোক। বিশেষতঃ ছাত্রেরা তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। অন্ততঃ আমি ত করিতাম।

ঘড়ি আমার—ক্ষতি স্বীকার করিতে আমি সম্পূর্ণ রাজী আছি, কিন্তু হইলে কি হয়, মাষ্টারকে কি সে কথা বলিবার উপায় আছে। মাষ্টারের রাগ সাহেবদের উপর। কিন্তু একটী বড়গোছ সাহেবকে তো কখন কিছু বলিতে শুনিলাম না। এই চুনোপুঁটী সাহেবকে মারিয়া তাঁহার গায়ের জ্বালা যে কি পরিমাণ মিটিল, তাহা ভগবানই জানেন।

ঘড়িটাকে তখন আমি আমার একটী কলঙ্কস্বরূপ বিবেচনা করিতেছিলাম। ঘড়িটার জন্যই নিরীহ সাহেবটীর আজ এ দুর্দ্দশা হইল। তাহার মরণোন্মুখী কন্যার যদি মৃত্যু হয় তবে তাহার জন্যও যেন আমি দায়ী বলিয়া মনে হইতেছিল। কলঙ্কের সাক্ষীস্বরূপ ঘড়িটাকে বাজারে ৪০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। ভাবিলাম না, তাহার জন্য আমার পিতার নিকট আমাকে কত লাঞ্ছিত হইতে হইবে। সেই টাকা কয়টী লইয়া সাহেবের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। লোকের নিকট বহুকষ্টে তাহার বাটীর ঠিকানার সন্ধান লইয়াছিলাম। দেখিলাম তাহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে এবং সাহেব তাহাকে "সকলই ঈশ্বরের হাত" যুক্তি দিয়া সান্ত্বনা দিতেছে। আমার মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে হইল সাহেবের রুগ্ন কন্যা নিশ্চয়ই মারা গিয়াছে।

আমি অতি সন্তর্পণে তথায় প্রবেশ করিলাম। আমাকে কেহই দেখিতে পাইল না। আমি পশ্চাৎ হইতেই ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম "সাহেব তোমার কন্যা কেমন আছে"? সাহেব তাহার মৃত কন্যাকে দেখাইয়া

বলিল "বাবু! ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিয়াও একটু মুরগীর ঝোল এবং ব্রাণ্ডি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।" কন্যাকে দেখিয়াই বুঝিলাম সে মৃতা। মুরগীর সুরুয়া ও একটু ভাইনাম্ গ্যালিসিয়া যথা সময়ে না পাওয়াই সে মৃত্যুর কারণ। আর উপলক্ষ্য আমি। আমারই ঘড়ি মেরামত করিতে গিয়া তাহার মুরগীর ঝোল এবং ব্রাণ্ডি সংগ্রহের উপযোগী অর্থ সংগ্রহে বাধা পড়িয়াছে। টাকা চল্লিশটী বাহির করিয়া সাহেবকে বলিলাম "সাহেব! তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা আমার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। তত্রাচ মৌন থাকিতে বাধ্য হইয়া আমাকে সেই সমস্ত দুর্ব্ব্যবহারের সমর্থন করিতে হইয়াছে। তাহার প্রায়ঃশ্চিত্ত স্বরূপ ইহা—" টাকা কয়টী দিতে গেলাম। আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক স্বরে সাহেব বলিল "God bless you my dear boy" (প্রিয় বালক! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন) কিন্তু কোন ক্রমেই টাকা কয়টী লওয়াইতে পারিলাম না।

এই ঘটনার অল্পদিন পরে আমাকে পড়া শুনা ছাড়িয়া দিতে হইল। অনেক দিন মাষ্টার মহাশয়ের কোন সংবাদ পাই নাই। মধ্যে একবার খবর পাইলাম মাষ্টার মহাশয়ের চাকুরিটি গিয়াছে। তারপর এই অতি অল্প দিন হইল কোনও কার্য্যোপলক্ষে আসাম অঞ্চলে গিয়াছিলাম। 'লক্সাম্' ষ্টেশনে আসামের ডাকগাড়ী থামিবার মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে একটি সুন্দর বিলাতী পোষাক-পরা বাঙ্গালী বাবু—মাথায় হ্যাট এবং গলায় নেক্‌টাই শোভিত—অবতরণ করিয়া সাহেবদের খাবার ঘরে কিছু খাইবার জন্য প্রবেশ করিলেন। আমি 'প্ল্যাটফর্ম্মে' দাঁড়াইয়াছিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল সেই মাষ্টার মহাশয়! তাঁহার সঙ্গে একটি চাপরাশি ছিল—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্তই জানিতে পারিলাম। মাষ্টার মহাশয় চট্টগ্রামে একটি স্বদেশী ইন্‌সিউর্যান্স কোম্পানি খুলিয়াছেন। মাষ্টার মহাশয়ের সেই কয়েকবৎসর পূর্ব্বের মূর্ত্তি মনে পড়িয়া গেল—আমি আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও পারিলাম না। মাষ্টার মহাশয়ের ইন্‌সিউর্যান্স কোম্পানি এখনও আছে কি, ফেল হইয়াছে তাহা পাঠকপাঠিকাগণ সামান্য সন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন।

শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়
লাভপুর।

ডাকাতি ।

কুসুম-কাননে কুসুম-সৌরভে
আবেশে হ'য়ে বিভোর
থাকিতে থাকিতে আমি তন্দ্রাতুর—
সংজ্ঞাহীন ঘুমে ভোর !
সেই নিদ্রা ভঙ্গে জাগিনু যখন,
নয়ন মেলিয়া দেখি ;—
গৃহ মোর একেবারে শূন্যময়—
যা' আছে তা' সব মেকী !
রেখে দিলে বাহিরের কোনো স্থানে
পাছে কেড়ে' লয় কেহ,
তাই তো গোপনে হৃদয়-নিকুঞ্জে
করেছিনু গুপ্ত গেহ ।
করিতাম খেলা নিজে নিজ সঙ্গে,
ভ্রমিতাম নিজে ল'য়ে,
নিজেই দিতাম শোকেতে সান্ত্বনা
নিজের আত্মীয় হ'য়ে !
ক্রমশঃ বাড়িল রবির কিরণ,
ক্রমশঃ বাড়িল বেলা ;
হারা'য়ে আমার একাকীত্ব শেষে
বহু সনে মিশে মেলা !
ধীরে ধীরে আলো নিভিল দিনের
সাঁঝের আঁধার এল ;
দেখি সে জনতা আর নাই হেথা
কোথায় লুকায়ে গেল !
হে চির-জাগ্রত, হে চির-নির্ভর,
জেনেও যে জানি নাই ;
তোমারে ভুলিয়ে ছিনু এতকাল,
যাচি আজি ক্ষমা তাই ।
হস্ত পদ বাঁধি, মোর, দস্যুদল
করে গেছে কী ডাকাতি !
বন্ধমুক্ত করি' এই অকিঞ্চনে
থাকো কাছে বাকি রাতি ।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

প্রকৃত বন্ধু।

মণি বলে মণিকার শুন মোর কথা
পাষাণে ঘসিয়া মোরে কেন দাও ব্যথা ?
মণিকার কহে, ভাই ঘসিয়া মাজিয়া,
অন্তরের আভা তব উজ্জ্বল করিয়া
আমিই ফুটায়ে দিব ; হে বন্ধু তখন,
ভূপতি মুকুট মাঝে শোভিবে কেমন !
এ মলিন রূপে ছিলে খনির আঁধারে,
আমি বই তখন কে চিনিত তোমারে ?

২। স্বাতন্ত্র্য।

দেখিয়াছি পুণ্য-তোয়া ভাগিরথী-নীরে
কত ক্ষুদ্র তরঙ্গিনী মিশায়েছে ধীরে
আপন জীবন-স্রোত ; তারি ফলে তারা
লভিয়াছে সাগর-সঙ্গম, আত্ম-হারা।
হেন মহা স্রোতে যদি তারা না মিশিত,
ডাঙ্গায় শুকায়ে যেত, কোথা কে জানিত ?
পাইত না সিন্ধু-সঙ্গ। ক্ষুদ্র বুদ্ধি যারা,
স্বতন্ত্রথাকিয়া মরে বিফলেতে তারা।

৩। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

পুত্রের ব্যারামে, পিতা শিয়রেতে ব'সে
মানস করেন পূজা দেবতা উদ্দেশে।
মূল্যবান মানসিক দ্রব্য সংখ্যাতীত,
শুনি পুত্র পিতারে কহিছে হয়ে ভীত।
কোথা এত পাবে বাবা কি দিয়া শোধিবে ?
পিতা কহে বাছা তোর ভাল হোক, তবে
একে একে সকলের মুখে দিব ছাই !
আমি তাহে সুচতুর তোর চিন্তা নাই।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নবলীলা তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।"

("রুক্মবিলা" হইতে গৃহীত)

বীরভূমি, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

আষাঢ়, ১৩২০।

আদর্শ-নাশ।

আমরা ছোট হইয়া পড়িতেছি। বাহিরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া, ধার-করা পোষাকে অন্তরের দৈন্য লুকাইয়া মুখে উন্নতির কথা যতই বলি না কেন, আমরা যে ছোট হইয়া পড়িতেছি তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সকল দিকেই আমরা ছোট হইয়া পড়িতেছি। শরীর দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র ও নিত্য-রোগাক্রান্ত, পরমায়ু যে কত কমিয়া যাইতেছে তাহা ভাবিলে ভয় হয়, আমাদের এই প্রাচীন জাতি অধিক দিন জগতে থাকিবে কিনা তাহাই সন্দেহ।

শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, শারীরিক অধোগতির সহিত মানসিক অধোগতিও সমান পরিমাণে চলিয়াছে। ছাপাখানা, খবরের কাগজ, আলমারি বোঝাই বই, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারীর তালিকাবৃদ্ধি দেখিয়া যতই সুখস্বপ্নে বিভোর হইতে চেষ্টা করি না কেন, মানসিক অধোগতি যথেষ্ট হইয়াছে। এখনও যাঁহারা অতি প্রাচীন তাঁহাদের স্মরণশক্তির নিকট, তাঁহাদের সামাজিক সদালাপের শক্তির নিকট, দেশের আবহাওয়া কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তাঁহাদের জ্ঞানের নিকট, সমাজের ও দেশের সকল বিষয়ের তাঁহাদের অভিজ্ঞতার নিকট আমাদের 'কেতাবী' জ্ঞান যে কেবল একটা দেখাইবার জিনিস মাত্র, ও বাস্তব জীবনে উপযোগীতা হিসাবে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা দেশের দূর পল্লীগ্রামে, প্রাচীনকালের শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র সমূহে ভ্রমণ করিলে এখনও বুঝিতে পারা যায়।

মানসিক অধোগতির সহিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধোগতিও যে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। মানুষকে যে পরার্থপর হইতে হইবে, এই উপদেশ একদিন এই প্রাচীন জাতির জীবনে স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। 'যে সমস্ত সংস্কার

লইয়া মানুষ জন্মাইত, যে সমাজের মধ্যে তাহাকে থাকিতে হইত সেই সকল সংস্কার ও সমাজের বিধি-ব্যবস্থা-গুলি মানবকে অতি-সঞ্চয়, বিলাসীতা ও স্বার্থপরতার হস্ত হইতে রক্ষা করিত।

আমরা ছোট হইয়া পড়িতেছি। নগরবাসী কবি ও দার্শনিক কলের জলে স্নান করিয়া বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে উন্নতির কথা যতই তারস্বরে ঘোষণা করুন না কেন, পল্লীজীবনের অর্দ্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতায় আমরা কোনদিকেই উন্নতি দেখিতে পাইতেছি না, সকল দিকেই অবনতি। নদী জলহীন, পুকুরগুলি ভরাট হইয়া আসিল, গরু, ছাগল, মেষ, মহিষ প্রভৃতি জন্তুরাও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, গাছে তেমন ফল ধরে না, ফলের তেমন স্বাদ নাই, মাঠে তেমন ফসল হয় না, কৃষকের তেমন শ্রমশক্তি নাই। আমাদের বাড়ীতে গ্রামোফোন্ বাজে, ছেলেরা বাইসিকেলে চড়েন, বৎসর বৎসর নূতন নূতন পোষাক পরিচ্ছদ, আর ঝাড় লণ্ঠন আমদানী হয়। কিন্তু পূর্ব্বেকার সে সব ক্রিয়া কলাপ নাই, দুঃস্থ সম্প্রদায় আর আমাদের বাড়ীতে পাতা পাড়িলেই খাইতে পায় না। নিজেদের বেশভূষা, রেলভাড়া আর চিকিৎসার ব্যয়ই কুলায় না এ সমস্ত কার্য্যে আর কি সাহায্য করিব?

সমস্ত অবনতির মূল কারণ আমরা। আমরা ছোট হইয়া যাইতেছি কিন্তু এ কথা প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিবার আমাদের সাহস নাই। আমরা সহরে থাকি, আমাদের জীবনের একমাত্র সাধনা অর্থ-সঞ্চয়। অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়া কখনও ৩ চারিহাজার সৎকার্য্যে দিই ও পঞ্চাশখানা কাগজে জয়ভেরী বাজাইয়া সেই কথা ঘোষণা করি। আমরা দেশের আদর্শ ছোট করিয়া দিতেছি। কপটতায় দেশ ভরিয়া গেল। আগে লোকে খালি গায়ে থাকিত। এই গরমের দেশে গরীবের দেশে তাহাই উপযুক্ত ব্যবস্থা। প্রাচীনেরা খালি গায়ে থাকিতে পারিতেন কারণ তাঁহাদের একটা শরীরের সৌন্দর্য্য ছিল, সুগঠিত শরীর লোকের চক্ষুর সম্মুখে বাহির করিতে তাহারা গর্ব্ববোধ করিতেন। আমরা অনাবৃত শরীর লোককে দেখাইতে লজ্জা বোধ করি। কি করিয়া দেখাইব? অস্থি পঞ্জর অবশেষ, পেট মোটা গলা সরু। ক্ষত বিক্ষত দেহ। তাই ভাল ভাল জামা আঁটিয়া কোন রকমে আত্মগোপন করা। কেবল শরীরের সম্বন্ধেই যে আত্মগোপন করি তাহা নহে, মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই আত্মগোপন। শুনিয়াছি কলিকাতায় যাঁহারা ইংরাজীতে নাম সহি করিতে পারেন না, তাঁহারা বড় বড় ইংরাজী বই

লিখিয়া দেশে ও বিদেশে সম্মান লাভ করেন। শুনিয়াছি অনেক লোকের ভাড়া করা লোক আছে, তাঁহারা পরের লেখা বই নিজের নাম দিয়া বাহির করেন। দুষ্ট ও কপট লোক সকল যুগেই আছে, কিন্তু আরও শুনিয়াছি যে ভদ্র সমাজ, অর্থাৎ সে সমস্ত দল দেশহিতৈষণার জন্য বড় বড় লোক লইয়া গঠিত হইয়াছে, ও বড় বড় লোকেরা যাহাতে অর্থবৃষ্টি করেন সেই সমস্ত দলেও এই সব লোকের খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি। সত্য মিথ্যা জানিনা, কিন্তু ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আর মানসিক ও নৈতিক কপটতার কথা বর্ণনা করাই নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্মেরও ব্যবসায় চলে। শুনিয়াছি অন্য ব্যবসায় বা অন্য কার্য্যে যাহারা কিছুই করিতে পারিলনা, তাহারা সব শেষে এই ব্যবসায়ে হাত দেয়। পল্লীগ্রামের লোক খুব সরল, তাহাদের মুগ্ধ করাই এই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, এই ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবার ভয় নাই। লাভ অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যবসায় করিতে হইলে একজনকে অবতার বা মহাপুরুষ করিতে হয়। খবরের কাগজ থাকে, শিষ্য থাকে, তাঁহারা এই মহাপুরুষের গুণগান করিয়া শিষ্য সংগ্রহ করেন। তাহার পর মন্দির প্রস্তুত করা, আশ্রম প্রস্তুত করা প্রভৃতির নাম করিয়া দেশে দেশে চাঁদা তুলিতে হয়। বড়লোকদের গুণগান করিতে হয়, কাহাকেও 'রাজর্ষি' কাহাকেও 'ধর্ম্মরাজ' বানাইতে হয়। অবশ্য যাঁহারা ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন বা ঈশ্বর ও পরলোক মানেন তাঁহারা ঐ ব্যবসায় করিতে পারেন না, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ সব কুসংস্কার নাই। দেশ-হিতৈষণা ও সমাজ-সংস্কার, তাহার কথা না বলাই ভাল। দিবসের তেইশ ঘণ্টা কাল ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায় এ সমস্ত চিন্তা না করিয়া যিনি অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন তিনি সমাজে নূতন আদর্শ চালাইয়া সমাজ-পতি হইতে চাহেন—স্বার্থত্যাগের বক্তৃতা করিয়া শত শত দরিদ্র ঘরের সরল বালককে ভুলাইয়া তাহাদের সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার করেন। এই সব দরিদ্র বালকের পিতা মাতা দারিদ্র্যে ও অভাবে কষ্ট পায়। ইহাই দৈনন্দিন ঘটনা। এ-দৃশ্য যিনি দেখেন নাই তাঁহার চোখ নাই।

এইরূপে দেশ চলিতেছে। আমরা ছোট হইয়া পড়িতেছি, আর নিজের কাছে ও পরের কাছে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি যে, না আমরা ছোট হই নাই আমরা প্রত্যহ বড় হইতেছি। কালের ধর্ম্ম, ছোট হইয়া পড়িতেছি দুঃখ নাই—একবার উন্নতি একবার অবনতি হয়। কিন্তু দুঃখের কারণ এই যে আমরা কেবল নিজেরাই যে ছোট হইতেছি তাহা নহে, আমাদের আদর্শ-

গুলিকেও ছোট করিয়া ফেলিতেছি। আমাদের কোমরে জোর নাই, আমরা মাটীর উপর পড়িয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছি, আর লাথি ঝাঁটা খাইতেছি। বেশ কথা! অতীতের আদর্শ আমাদের পার্শ্বে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহা খুব উচ্চ, কত উচ্চ তাহা আমরা এখন আর ধারণাও করিতে পারিনা, কারণ আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি তাহার শীর্ষদেশ দেখিতে পায় না। আমরা দুর্ব্বল হইয়া মাটিতে পড়িয়া যদি কাতর প্রাণে দুর্ব্বলের বল ও পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা পরমেশ্বরকে ডাকিতে পারি, তাহা হইলে একদিন একটু বল হইতে পারে, অতীতের উচ্চ আদর্শ খুঁটির মত প্রোথিত রহিয়াছে, যদি একটু বল পাই তাহা হইলে সেই খুঁটি ধরিয়া আমরা একদিন অনায়াসেই উঠিয়া খুব উঁচু হইয়া দাঁড়াইতে পারিব। এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।

কিন্তু আমরা মাটিতে পড়িয়া চুপ করিয়া তো শুইয়া নাই। আমরা শুইয়া শুইয়া অতীত আদর্শের খুঁটির মূলদেশ কর্ত্তন করিতেছি, এই আদর্শের খুঁটিও প্রায় পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছে। এই খুঁটিটি যদি পড়িয়া যায় তাহা হইলে আর আমাদের আশা নাই, কিছুই ধরিবার থাকিবেনা তাহা হইলে আর আমরা উঠিতে পারিব না।

আমাদের অতীত সাধনার প্রতি ক্রমাগত অত্যাচার চলিয়াছে, তাহা নিবারণ করা বড়ই কঠিন। যে সমস্ত কথা অত্যন্ত উচ্চ তাহা নিতান্ত সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বালককালে পল্লীগ্রামে থাকিতাম, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িয়া কলিকাতা সহর সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়াছিলাম। তখন মনে হইত, প্রাচীন কালের যত সব সাধু মহাত্মা কলিকাতায় আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর অন্য কাজ নাই, তাঁহারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দেশের হিতসাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, নিজেদের সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া পথের ভিখারী হইয়া বসিয়া আছেন, দেশের দুঃখে তাঁহাদের চক্ষু দিয়া সর্ব্বদাই জলধারা ঝরিতেছে। সেখানে আর অন্য আলাপ নাই, সর্ব্বত্র সকল সময়ে ঐ এক কথা, কি করিয়া দেশের মঙ্গল হইবে! এই উদ্দেশ্যে কেহ খবরের কাগজ করিতেছেন, কেহ বক্তৃতা করিতেছেন, কেহ সাহিত্য লইয়া আছেন, কেহ রাজনীতিবিৎ, আবার যাঁহারা এ সব করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বত ঘুরিয়া দৈবপ্রাপ্ত ঔষধ আনিয়া নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও কেবল দেশবাসীগণের হিতার্থে অতি সামান্য মূল্য লইয়া একরূপ বিতরণ করিতেছেন। মনে হইত প্রাচীন কালের নৈমিষারণ্য বুঝি কলিকাতায় উঠিয়া আসিয়াছে!

এখনও লোকে তপস্যা করে। এখনও লোকে মহর্ষি ও রাজর্ষি হয়। এখনও অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ আছেন—কে বলিল ইহা কলিযুগ? শেষে জানিলাম মুসৌরির ডাক-বাংলোতে অথবা দার্জ্জিলিঙের স্বাস্থ্যাবাসে দুইমাস থাকিয়া আসার নাম হিমালয়ে তপস্যা। চিরদিন মিথ্যা কথার ব্যবসায় করিয়া শত শত পরিবারকে নিরন্ন করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন পূর্ব্বক ধনবান হইয়া দেশের নামে বক্তৃতা করার নাম স্বার্থত্যাগ—আর পয়সা খরচ করিয়া শিষ্য পোষার নাম মহর্ষি হওয়া, আর বড়লোকের নিকট চাঁদা আদায় করিয়া নিজের অনুগত লোক লইয়া বিদ্যালয় করার নাম আশ্রম করা। এখন কলিকাতায় আশ্রম বলিলে 'হোটেল' বুঝায়। সমস্ত ব্যাপারটাকে—আমাদের জাতীয় উদ্যমের সমষ্টি ভাবটাকে লোকের নিকট ধরিবার জন্যই যেন 'আশ্রম নাম দিয়া' এই সব হোটেল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে!

এই জন্যই বলিতেছি শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই আমরা ছোট হইয়া পড়িতেছি। এই অবনতি অবশ্য জাতির সমষ্টি কর্ম্মফলে হইলেও কালের ধর্ম্মে হইয়াছে। এই অবস্থা হইতে আমাদের উঠিবার প্রধান অন্তরায় এই যে আমরা আমাদের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিনা, আমরা ভাবিতেছি যে আমাদের উন্নতি হইতেছে।—আবার উন্নতি হইতেছে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা আমাদের অতীত আদর্শকেও খাটো করিয়া ফেলিতেছি। অতীতের আদর্শ যদ্যপি খাটো হইয়া যায় তাহা হইলে আমাদের আর বাঁচিবার আশা নাই।

এই জন্য এখন অতীতের সহিত আমাদের যাহাতে পরিচয় ভাল করিয়া হয় সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে। অতীতের সহিত পরিচয় না হইলে বর্ত্তমানের সহিত প্রকৃত পরিচয় হইবে না এবং ফলে আমাদের মনের মধ্যে ভবিষ্যৎ একটা শূন্যের মত থাকিয়া যাইবে। আমাদের আদর্শগুলির প্রকৃত অর্থ কি তাহা চারিদিকে প্রচার করিতে হইবে। উন্নতিবাদীগণের কর্ণে তাহা ভাল লাগিবে না। অতীতের সম্বন্ধে যাহা সত্য তাহা ঘোষণা করিলে তাঁহারা হয়ত প্রথম প্রথম উপন্যাস ও কবির কল্পনা বলিয়া তাহা উড়াইয়া দিবেন। তাঁহাদের কথা দ্বারা অনেকেই চালিত হইবে। কারণ তাঁহারা নিজেদের অনুগত সংবাদপত্রে নাম ছাপাইয়া আগে সরকার বাহাদুরের নিকট, পরে তাহার সাহায্যে দেশকে বাধ্য করিয়া দেশের নিকট প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের চারিদিকে একটা গৌরবের ছটা মাথান

রহিয়াছে। এই সব নূতন যুবক, আজ যাহারা সত্য ও তত্ব লইয়া বড় বড় কথা বলিতেছে দু'দিন পরে তাহারা এই গৌরবের আলোকে অন্ধ হইয়া ইহাদেরই অনুবর্ত্তন করিবে, আজ যাহা বলিতেছে, আজ যাহা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে তখন তাহাই লইয়া উপহাস ও অবজ্ঞা করিবে. ইহাই তো আমাদের সত্য ইতিহাস!

কিন্তু তথাপি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া সেই অতীতের সহিত যাহাতে আমাদের যথার্থ পরিচয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া গিয়াছে, বেশ শান্ত-চিত্তে আমরা কোনও বিষয় ধ্যান করিতে পারি না। পেটের দায়ে পরীক্ষার চাবুক খাইয়া যে সমস্ত কথা মুখস্থ করিয়াছি তাহা ছাড়া সত্য যে অন্য রূপ হইতে পারে ইহা ভাবিবার সাহসও নাই, সময়ও নাই। আমরা যে ছোট নিতান্ত ছোট, আমরা যে অতি জঘন্য বর্ব্বরতার মধ্য হইতে মনুষ্যত্বের পদবীতে আরোহণ করিতেছি, এই কথা প্রতিপাদন করিবার জন্য হাজার হাজার লোক খাটিতেছে—আবার আমরা অনেক সময়ে দেশের উপকার করিব বলিয়া তাহাদেরই মতের প্রতিধ্বনি করিতেছি। এ স্রোতের উজানে যাইতে হইবে। কিন্তু সে দিকে চেষ্টা নাই অন্ততঃ প্রকাশ্যভাবে যাঁহারা দেশনেতৃত্বের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সে চেষ্টা নাই। সকলে যাহা বলে তাঁহারা তাহাই বলেন, সকলে যাহা ভাবে তাঁহারা তাহাই ভাবেন, সকলে যাহা শুনিতে ভালবাসে তাঁহারা তাহাই শোনান। কারণ তাঁহারা চাহেন খ্যাতি, তাঁহারা চাহেন অর্থ। কেবল দেশের কাছে খ্যাতি হয় না. কারণ দেশ এখন কাহাকেও খ্যাতি দিতে পারে না। তাই বিদেশে যাইয়া নাম কিনিয়া দেশে আসিয়া সেই নামের জোরে লোকনেতৃত্ব লাভ করিতে হয়।

আজ নির্লোভ হইতে হইবে, খ্যাতি চাই না, অর্থ চাই না, লোকনেতৃত্ব চাই না, তোমরা শুনিলে বা না শুনিলে, তোমরা বুঝিলে বা না বুঝিলে, তোমরা আদর করিলে বা না করিলে! আমরা দেশের বা বিদেশের নামজাদা বড়লোকের প্রশংসাপত্রের জোরে বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতে চাই না. আমরা চাই সত্য! নির্লোভ হইয়া সত্যের অন্বেষণ করিতে হইবে, কায়মনোবাক্যে যাহা সত্য কেবল তাহাই প্রচার করিতে হইবে। সত্যের সহিত কোনরূপ মিথ্যা মিশাইবার প্রয়োজন নাই, একটু কর্কশ হইবে হউক.

যাহারা বড়লোক তাহারা আদর করিবে না, না করুক, কাগজওয়ালারা প্রশংসা করিবে না, বড়লোকেরা অর্থ সাহায্য করিবে না, দারিদ্র্যে ও অনাহারে দিন কাটাইতে হইবে, তাহাই ভাল—এইরূপ যাঁহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সেইরূপ মানুষ চাই।

সত্যের জন্য তপস্যা করিতে হইবে। আরাম করিয়া দলে মিশিয়া হাত ধরা-ধরি করিয়া পরস্পর পরস্পরের গুণগান করিয়া চলিলে হইবে না। তপস্যা চাই, অতি কঠোর তপস্যা চাই। কোথায় গহন কানন মধ্যে, কোথায় বন্য জন্তু-সঙ্কুল গিরিগুহায়, কোথায় অতিদূর দুর্গম পল্লী বিতানে, সুদূর তীর্থক্ষেত্রে নিভৃতে সত্য রহিয়াছে, সেখানে প্রকৃত মনুষ্য আছেন—সকলের সঙ্গে মিশিয়া, অহঙ্কারের অন্ধ কারাগার চূর্ণ করিয়া সকলের সুখে দুঃখে মিশিয়া কোনও মত বা কোনও ভাবের সম্প্রদায়ভুক্ত না হইয়া, কাহারও তুষ্টির বা অতুষ্টির জন্য ব্যাকুল না হইয়া অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই সত্য রত্নের অন্বেষণ করিতে হইবে। অন্বেষণ আর অকাতরে বিতরণ, কেহ না লয় বিনামূল্যে ছড়াইয়া যাইবে, ভগবানের রাজ্য এখনও একেবারে শূন্য মরুভূমি হয় নাই, একজনের জীবনেও যদি প্রতিধ্বনি জাগে তাহা হইলেই সিদ্ধি। প্রকৃত প্রস্তাবে যিনি সাহিত্যিক হইতে চাহেন তিনি এই আদর্শের অনুসরণ করুন। যে দুর্ব্বল তাহার সাহিত্য-সাধনা শঠতার ব্যবসায়, সে দল চায়—নামের কাঙাল হইয়া—সে ধনীর দুয়ারে বসিয়া বসিয়া স্তবপাঠ করে—অর্থের কাঙাল হইয়া তাহারা দেশের আবর্জ্জনা তাহাদের দ্বারা কিছু হইবে না। কিছু বলিবার থাকে বেশী লোক না শোনে বৃক্ষমূলে বসিয়া একজনকে শিখাইব, তাহা হইলেই সিদ্ধি! তাহাও যদি না হয়, মৌন হইয়া নীরব সাধনায় শূন্য মধ্যে চিন্তা-তরঙ্গ বিকীরণ করিব—সত্যান্বেষী সহস্র যোজন দূর হইতে তাহা পাইবেন। ইহাই এ দেশের সাধনা, এ দেশের তপস্যা!

হে সত্য! তুমি আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছ! তুমি বুঝি অন্তরালে দাঁড়াইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছ আমরা সত্যই তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি কি না? আমরা এখনও তোমার জন্য ব্যাকুল হইতে পারি নাই। আমরা এখনও নিশ্চিন্তভাবে আহার নিদ্রায় ও রঙ্গরসে দিন কাটাইতেছি, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই আমাদের সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত উদ্যম পর্য্যবসিত হইতেছে। কিন্তু তোমার চরণ ব্যতীত অপর স্থানে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে না জানিয়া আত্মবিনাশ করা এ তত্ত্ব আমরা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমাদের

মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দাও, আমাদিগকে তোমার জন্য ব্যাকুল কর। আমাদের এই নিষ্ফল কোলাহল, ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ করিয়া তোমার অমৃতময়ী বাণী যাহা একদিন এই দেশে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে শ্রুত হইয়াছে তাহা আমাদিগকে অবধান করিবার সুযোগ দাও। জানি না আজ কোন্ দূর লোকে তোমার সেই সব জীবন্মুক্ত, মানবের হিতকর্ত্তা সেবকগণ সমাধিস্থ হইয়া আছেন, আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তাঁহাদের জাগাইতে পারিবে তাহার আশা নাই—তাঁহারা আসিলে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের উপাসক আমরা, আমরা তাঁহাদের আদর করিয়া গ্রহণ করিতে পারিব এরূপও আশা নাই, তবুও প্রার্থনা করি আবার তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দাও। আবার তাঁহারা তোমার নামের বিজয় ভেরী বাজাইয়া আমাদের স্বার্থ-কোলাহল স্তব্ধ করিয়া ফেলুন, তোমার প্রেমের বন্যা আনিয়া আমাদের সকল সংশয় ও সকল ক্ষুদ্রতার আবর্জ্জনা ভাসাইয়া দিয়া আমাদিগকে মানুষ করিয়া তুলুন।

অন্তরের অন্তরতম স্থল হইতে এই প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ করিয়া, দিনের পর দিন, একেবারে অসহায় ও একাকী তাঁহাদের সেই আগমনের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে হইবে। তাঁহারা আসিবেন। জগৎ জুড়িয়া লক্ষণ দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই আগমনের অভ্যর্থনা কল্পে কত উদ্যোগ ও আয়োজন হইতেছে, কিন্তু আমরা যে একেবারে নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম! জড়বাদ আশ্রয় করিয়া একেবারে জড়তায় ডুবিয়া গিয়াছি। বড় কথায় বিশ্বাস করিবার মত হৃদয়-বল নাই, শাস্ত্রবাক্য শ্রবণের প্রবৃত্তিও নাই, অবসরও নাই। আবার বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় ও সংযমে বলীয়ান কর, নূতন আশায় জাগ্রত করিয়া আমাদিগকে সেই আগমন প্রতীক্ষা করিতে প্রবৃত্তি দাও, আর আমাদের সকল শক্তি সেই আগমনীর গান গাহিতে নিয়োজিত কর।

সাধুর আত্মরক্ষা।

(গল্প)

এক মাঠে এক কেউটে সাপ থাকিত। যেমন তাহার বিশাল শরীর তেমনি তাহার ভীষণ বিষ। মানুষ, গরু, বাছুর দেখিলেই সে তাড়া করিত। একবার তাড়া করিলে আর রক্ষা নাই, নিশ্চয় আসিয়া কামড়াইত। কামড়াইলেই মৃত্যু, রোজার বাপেরও ক্ষমতা নাই যে বাঁচায়। মণি, মন্ত্র,

ঔষধ কিছুতেই তাহার বিষ নামিত না। লোকে বলিত এ সাপ তক্ষকের বংশে জন্মাইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে মাঠ জনশূন্য অরণ্য হইয়া পড়িল। চাষী চাস করিতে যায় না, রাখাল গরু চরাইতে যায় না, কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতে যায় না, পথিকেরা চলাচল করে না। এমনি করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গেল।

একদিন এক সন্ন্যাসী সেই মাঠের পাশের গ্রামখানিতে আসিয়া এক গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। কথায় কথায় সাপের কথা উঠিল, গ্রামের লোকেরা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সেই সাপের অত্যাচারের কথা বলিল, দুঃখ করিয়া আরও বলিল, সেই মাঠে ভাল ভাল জমি, ভাল ভাল বাগান, ভাল ভাল গো-চর সব নষ্ট হইয়া গেল!

সন্ন্যাসী ঠাকুর সকল কথা শুনিয়া বলিলেন "আমি সেই সাপটিকে দেখিতে চাই।"

গ্রামের বৃদ্ধ মণ্ডল বলিলেন "সে কি প্রভু! তাহা কি হয়? সে কি সহজ কথা।"

সন্ন্যাসী নিরস্ত হইলেন না। গ্রামের লোকেরা ভাবিলেন সন্ন্যাসী ঠাকুর ঈশ্বর-জানিত লোক, তাঁহার আর ভয় কি?

এই সন্ন্যাসী একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছেন —কেউটে সাপ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে সাপ! তুমি কি আমাকে কাম্‌ড়াইতে চাও?"

সাপ বলিল "এ রাস্তায় যিনি আসেন তাঁহাকেই তো কাম্‌ড়াইয়া থাকি, তবে আপনাকে কেন কাম্‌ড়াইতে পারিতেছি না!" সন্ন্যাসী বলিলেন "তোমার মন্ত্র হইয়াছে?"

সাপ বলিল "সাপের আবার মন্ত্র হয় নাকি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! তুমি এত বড় সাপ, এত তোমার বিষ, আর সাপের মন্ত্র হয় কিনা জান না। এ জগতে সকলেরই মন্ত্র হয়। মন্ত্রের দ্বারা পথ ঠিক করিয়া চলিতে হয়—যে নাদে সৃষ্টি স্থিতি লয়, মন্ত্র যে সেই নাদ, তাহা তুমি জ্ঞান না। তোমার মন্ত্র হয় নাই বলিয়াই তুমি আমাকে কাম্‌ড়াইতে পারিতেছ না। মন্ত্র হইলে কাম্‌ড়াইতে পারিতে।"

সাপ বলিল, "প্রভু, এ পথে তো আর কেহ আসে না। সকলেই

আমাকে ভয় করে। বহুকাল পরে আপনিই এ পথে আসিয়াছেন। আপনার কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে যে আমার মন্ত্র লওয়া দরকার। কিন্তু আমি আর কোথায় গুরু পাইব, আপনিই আমাকে মন্ত্র দিয়া গুরু হউন। আপনারা দয়ালু, আর আপনারা উচ্চনীচ বিচার করেন না, অতএব আমার এই অনুরোধ রাখুন।''

সন্ন্যাসী-ঠাকুর বলিলেন ''উত্তম কথা। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া আইস, আমি তোমাকে মন্ত্র দিতেছি।"

সর্প স্নান করিয়া আসিল। সন্ন্যাসী-ঠাকুর তাহাকে বলিলেন,—"প্রকৃতির বিকৃতি ঘটায় জীবের চিত্ত বেসুরে বেতালায় বাজে। মন্ত্রের দ্বারায় সেই সুর মিল হয়। যাহার যে দিকে বিকৃতি, সেই দিকের বিকৃতি নাশ করার মন্ত্র দিতে হয়। সকলের এক রকম বিকৃতি নয়, কাজেই সকলকার মন্ত্রও এক নয়। তোমাকে আমি মন্ত্র দিলাম ''অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।" এই মন্ত্র এখন নিয়ম করিয়া একশ আটবার জপ করিও। শেষে আর চেষ্টা করিতে হইবে না। আপনা হইতেই চব্বিশঘণ্টা ভিতরে ভিতরে জপ চলিবে। তখন জানিও জপসিদ্ধি হইয়াছে।"

সাপ মন্ত্র লইয়া জপ করিতে লাগিল। সিদ্ধপুরুষের মন্ত্র, সাপের মধ্যে এক অলৌকিক শক্তি সঞ্চার হইয়াছে, সে তন্ময় হইয়া সেই মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী গ্রামে ফিরিয়া গিয়া প্রধান মণ্ডলের নিকট বলিলেন "আর তোমাদের ভয় নাই। এইবার তোমরা চাষ আবাদ কর, গরু চরাও, সাপে আর কিছু বলিবে না।''

২

সন্ন্যাসী অভয় দিয়া চলিয়া যাওয়ার পরও অনেক দিন গ্রামের লোকেরা সাহস করিয়া সেই মাঠের দিকে যাইতে পারিত না। ভয় হইত। তাহার পর লোকে একটু একটু করিয়া আস্তে আস্তে আগাইয়া আসিতে আসিতে ক্রমে কয়েক মাসের মধ্যে সমস্ত মাঠ দখল করিয়া ফেলিল। প্রথম প্রথম ভয় হইত। পায়ে একটা কিছু ঠেকিলে বা সম্মুখে একটা কিছু দেখিলে চমকিয়া লাফাইয়া উঠিত। শেষে কিন্তু সে ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, কেউটে সাপের কথা বড় একটা কাহারও মনে নাই, এমন সময়ে একদিন এক কৃষক এক ডাঙ্গা জমিতে নূতন লাঙ্গল দিতেছে এমন সময় লাঙ্গলের ফালে লাগিয়া সেই কেউটে সাপ বাহিরে আসিয়া

পড়িল। আর যাও কোথায়? "ওরে বাপ্‌রে—" বলিয়া সেই কৃষক লাঙ্গল গরু ফেলিয়া একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। অনেক দূর গেলে লোকে জিজ্ঞাসা করিল "কি ব্যাপার?" সে বলিল "সেই কেউটে বাহির হইয়াছে।"

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিল "তোমার খুব অদৃষ্ট যে তুমি রক্ষা পাইয়াছ। সত্যপীরের পূজা দাও। তবে গরু দুটির আর রক্ষা নাই। গোহত্যা হইবে, গ্রামের সমস্ত লোককে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তাহার বিধান আনিবার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট লোক যাইতেছে, এমন সময়ে লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া বলদ দুইটি আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের লোক অবাক। অনেকে সেই কৃষককে বলিল তোমার ভুল হইয়াছে—তুমি হয়ত একটা ঢোঁড়া কি ডাঁরোস্‌ সাপ দেখিয়া মনে করিয়াছ সেই কেউটে সাপ। কখনই সে কেউটে সাপ নয়। সন্ন্যাসী ঠাকুর সে সাপকে ভস্ম করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

সে কৃষক শপথ করিয়া বলিল "আমি খুব ভাল করিয়া দেখিয়াছি, নিশ্চয়ই সেই কেউটে সাপ।" তাহার কথায় কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বিশ্বাস করিল না। কিন্তু মাঠে যাতায়াত কিছুদিন একেবারে বন্ধ হইল, তাহার পর আবার আস্তে আস্তে অল্প অল্প আরম্ভ হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের মত কাজ চলিতে লাগিল।

৩

একদিন রাখাল বালকেরা বলিল "কল্‌মিজোলের ঈশান কোণে তাহারা কেউটে সাপ দেখিয়াছে। সে চুপ করিয়া সেই ভাঙ্গা দেউলের ফাটালের মধ্যে একেবারে চুপচাপ শুইয়া আছে। দুই একজন করিয়া গ্রামের লোক দেখিতে গেল। বাবা, বিশ্বেশ্বরের ভাঙ্গা মন্দিরের ফাটালে সত্যই ত প্রকাণ্ড সাপ! গ্রামের বৃদ্ধলোকেরা দেখিয়া বলিল "হাঁ এ সেই কেউটে!" কি আশ্চর্য্য, এ তো মারা যায় নাই, তবে এত শান্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে কেন? মহা সমস্যা! প্রবীণেরা মীমাংসা করিলেন যে সাধু কোন মন্ত্রের দ্বারা সাপকে বন্দী করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক ছেলেদের সব ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, এ দিকে তোমরা গরু লইয়া আসিও না। এই অশ্বথ গাছে ব্রহ্ম-দৈত্য থাকে।

কল্‌মিজোলে ঘাস একেবারে লক্‌ লক্‌ করে, এমন ঘাস আর মাঠে কোন গো-চরে হয় না। গরুগুলি আপনি সেখানে আসে বালকেরা তাহাদের

আট্‌কাইতে পারে না। আর অশ্বথ গাছের নামালে দোলন খাওয়ারও ভারি সুবিধা, সুতরাং বৃদ্ধদের নিষেধ টিঁকিল না। বালকেরা সেইখানেই গরু চরাইতে লাগিল। তাহারা গরু চরায়, দোলন খায়, তামাক খায় আর মধ্যে মধ্যে যাইয়া সাপটিকে দেখিয়া আসে। ক্রমে সাপটির গায়ে দু একটী করিয়া ঢিলও পড়িতে লাগিল। শেষে বালকদের ভয় এতদূর ভাঙ্গিয়া গেল যে সাপের লেজ ধরিয়া বেশী সাহসী ছেলেরা এক আধবার টানও দিতে লাগিল।

বালকদের সাহস এখন চরমে উঠিয়াছে। তাহারা সাপের লেজে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে মাঠ হইতে গ্রামে লইয়া আসিয়াছে—পথে পথে টানিয়া টানিয়া লইয়া বেড়ায়—মস্ত সাপ! সাপ বেশ বাঁচিয়া আছে—ফণা আছে, চক্র আছে কিন্তু বেচারার কষ্টের আর সীমা নাই। কাঁটায় পাথরে শরীর কাটিয়া গিয়াছে, তাহার উপরেই ছেলেরা টানিয়া টানিয়া পথে পথে লইয়া বেড়ায়। বেচারার আর কষ্ট সহ্য হয় না। সে মন্ত্র জপ করে আর অসহ্য-যাতনায় কাতর প্রাণে গুরুদেবকে স্মরণ করে।

(৪)

সন্ন্যাসী ঠাকুর গ্রামে আসিয়া জনার্দ্দনের আখ্‌ড়ার বাগানে ধূনি জ্বালিয়া বসিয়াছেন। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেছে। গ্রামে উৎসব পড়িয়া গিয়াছে। যাহাদের রোগ হইয়াছে তাহারা সব সন্ন্যাসীঠাকুরকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। তিনি ঔষধ দিতেছেন—ঔষধ আর কিছুই নয়, ধূনির ভস্ম, আর কমণ্ডলুর জল। তাহাতেই রোগ সারিয়া যায়।

সন্ন্যাসীঠাকুর দেখিতে পাইলেন বালকেরা, তাঁহার শিষ্য সেই কেউটে সাপকে লইয়া লেজে দড়ি বাঁধিয়া পথে পথে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে। তিনি বালকদের সব চলিয়া যাইতে বলিলেন। সকলে চলিয়া গেলে সাপ আসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিল। গুরুদেব তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্প উত্তর করিল "সাধনার তো কুশল। কিন্তু দৈহিক কষ্টের সীমা নাই। আপনি শিখাইয়াছেন "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ", আর সেই মন্ত্র লইয়া আমি একেবারে শান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ফল হইয়াছে এই যে আগে যাহারা আমার নাম শুনিলে ভয়ে পলাইয়া যাইত, তাহারা আজ আসিতে

যাইতে আমার মুখে পদাঘাত করিয়া যায়, আর বলে 'ওরে সাপটার আর কোন ক্ষমতা নাই' ছেলেরাতো লেজে দড়ি বাঁধিয়া পথে পথে টানিয়া লইয়া বেড়ায়। তা' প্রভু, এই প্রকারের কষ্টই কি আমাকে চিরকাল ভোগ করিতে হইবে ?

গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন "বাপু আমি তোমাকে অহিংসা মন্ত্রের সাধন করিতে বলিয়াছি, কিন্তু ফোঁস্ করিতে তো নিষেধ করি নাই। তুমি ফোঁস্ কর না কেন ? দেখ লোকে বলে সাপ খল, কিন্তু সাপের অপেক্ষা মানুষ হাজারগুণে বেশী খল। দেখনা অকারণ, কোন ভয় নাই, কোন স্বার্থ নাই, কেবল খেলার জন্য লেজে দড়ি বাঁধিয়া তোমাকে অকারণ কষ্ট দেয়। মানুষের কাছে থাকিতে হইলে ভয় দেখাইতে হইবে। তুমি যে ইচ্ছা করিলে তাহাকে শিক্ষা দিতে পার, এটুকু সর্ব্বদা জানাইবে। নতুবা সকলেই লাথি মারিবে।

আমি তোমার লেজের বাঁধন খুলিয়া দিলাম। তুমি আপন স্থানে চলিয়া যাও। মন্ত্র জপ করিও। ভিতরে শম দম তিতিক্ষা অভ্যাস কর। কিন্তু ফোঁস্ ছাড়িও না। কাছে যাইলেই ফোঁস্ করিয়া ফণা দেখাইও, তাহা হইলেই আর কোন বিপদ হইবে না।"

তাহার পর সর্প গুরুদেবের আদেশ পালন করিল। ছেলেরা যেমন পরদিন বিশ্বেশ্বরের দেউলের ফাটালে সাপের লেজ ধরিতে গিয়াছে, অমনি সে ফোঁস্ করিয়া ফণা তুলিয়াছে—যেই ফণা তোলা আর বালকদের দৌড়। সাপের আবার তেজ হইয়াছে—এই কথা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল। আর কেহ সাপের কাছে যায় না। সাপ নির্ব্বিবাদে সেই মন্দিরে অনাসক্ত চিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিল।

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

জীবনের সমস্যা সত্যই খুব কঠিন, আবার আমাদের পক্ষে এই সমস্যা যেন কিছু বেশীরকমের কঠিন। ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে যত বড় করিয়া দেখিয়াছে এবং যত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছে এমন আর কেহ করে নাই। জীবনসমস্যার এই কাঠিন্যের উপলব্ধির জন্যই হউক, আর ইহলোকে

কিছু করিবার বা পাইবার না থাকার জন্যই হউক আমরা বড়ই গম্ভীর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অকালে বৃদ্ধ হইয়া পড়া আমাদের এই জাতিটার একটা উৎকট অভিশাপ হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য তরলচিত্ত হইয়া জীবনকে ছোট করিয়া উপলব্ধি করা ও কেবল হাসিয়া ও অবজ্ঞা করিয়া বেড়াইবার অভ্যাস ভাল নয়, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে হাসির অভ্যাসটা ভুলিয়া যাওয়াও কিছু ভাল নহে।

আমাদের হাসিতে হইরে। বুকের উপর সহস্র ব্যথা ও অভাব হিমালয় পর্ব্বতের মত চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তবুও হাসিতে হইবে। প্রভাতের আলোতে অন্ধকারের কৃষ্ণস্তূপ সরিয়া যাওয়ার পর যেমন কর্ম্ম-ক্ষেত্রের কর্ত্তব্যগুলি আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তেমনি অবসাদকর অন্যায় গাম্ভীর্য্য ও অকালবার্দ্ধক্য দূর করিয়া একটু হাসিতে হইবে। হাসিতে পারিলে কাজ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মাটির মধ্যে পতিত এই ছোট মানুষটি ছাড়া একটা বড় মানুষ আমাদের প্রকৃতির মধ্যে বসিয়া আছে—তাঁহার মূর্ত্তি উজ্জ্বল—তাঁহার স্বভাবে নৈরাশ্য নাই, আশা ও আনন্দদ্বারা তাঁহার মূর্ত্তি গঠিত। যে হাসি মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ, তাহা ছোট মানুষটির উপর এই বড় মানুষটির দৃষ্টির কিরণ-সম্পাত। দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রকারের হাসি লইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। অবাধ ও উজ্জ্বল হাস্য, অথচ তাহাতে আক্রমণ নাই, অবজ্ঞা নাই, তাহার অন্তস্তলে উদার সহানুভূতির করুণ অশ্রু বিদ্যমান। অথচ তাহা হাসি। এই হাসিই আজ আমাদের চাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলিয়া গিয়াছেন "হাস্য দুই প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া, আর এক প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া" দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য এই দ্বিতীয় প্রকা-রের। আমাদের এই যুগ একটা প্রকাণ্ড মোহের যুগ। যাহা হয় একটা কিছু করিতেছি—কিন্তু ভাবিবার বা সমস্ত ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিবার সামর্থ্য নাই। ভট্টাচার্য্যমহাশয় দলাদলি করিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেছেন, সমাজ সংরক্ষণ করিতেছেন, বিলাত ফের্ত্তা সভ্য হইয়া সংস্কার কবিতেছেন, ইংরাজীশিক্ষিতেরা দেশ উদ্ধারের জন্য সভাসমিতি করিতেছেন, এক এক দল এক এক কাজ করিতেছে, যেখানে মতের ভেদ সেই খানেই গালাগালি—এইভাবে সমস্ত দেশ ব্যস্তভাবে ছুটিয়াছে। সময় খুব কম।

পশ্চিম দেশ হইতে কর্ম্মের উত্তেজনা আসিয়াছে। এক একটা ভাব আসিয়া ভূতের মত ঘাড়ে চাপিয়াছে আমাদের বিচার বিবেচনার সময় নাই—অন্ধ-ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছি। ইংরাজী ভাষায় দুইটি বাক্য আছে তাহাতে মানবের দুইটি অবস্থা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা যায়—

"To be possessed by an idea" আর "To possess an idea."

আমাদের এখন প্রায়শঃ প্রথম অবস্থা। কিন্তু এ অবস্থা সব সময় ভাল নয়—দ্বিতীয় অবস্থায় আসা চাই—এই অবস্থায় আসিতে হইলেই পূর্ব্বে যে আমাদের প্রকৃতি মধ্যে অধিষ্ঠিত বড় মানুষটির কথা বলা হইল সেই মানুষটিকে জাগাইতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসি সেই বড়মানুষটিকে জাগাইতে সাহায্য করিয়াছে। তিনি সর্ব্বত্রই অসামঞ্জস্য দেখিয়াছেন—সে জন্য অন্যে যেমন গালি দেয়, নিন্দা করে তাহা তিনি করেন নাই। তাহা করিলে দেশের লোকে তাঁহার কথা এত শুনিত না। তিনি হাসিয়াছেন ও আমাদের হাসাইয়াছেন। তাঁহার বাণ আমাদের মর্ম্মে লাগিয়াছে কিন্তু সেজন্য আমরা বিরক্ত হই নাই—সে জন্য কবিকে ভালবাসিয়াছি। ইহাই দ্বিজেন্দ্র লালের প্রথম যুগ। দ্বিজেন্দ্রলাল অতি উচ্চাঙ্গের প্রতিভা-শালী ও স্বভাব কবি। কেবল তাহাই নহে তিনি নানা বিদ্যাবিশারদ ও সুপণ্ডিত।

মানুষের কাজে মধ্যে মধ্যে একটা প্রেরণা আসে। তখন একটা ভাবের বন্যা বহিয়া যায়। যাহা অচল বলিয়া মনে হইত বন্যা আসিলে তাহাও ভাসিয়া যায়। আট বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে এই প্রকারের একটা ভাবের বন্যা আসিয়াছিল। সমস্ত ভারতবর্ষ তাহাতে প্লাবিত হইয়াছিল। সেই প্লাবনের দিনের নাট্যকার ও সঙ্গীতকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এই প্রাচীন জাতিকে তাহার অতীতের অস্পষ্ট ইতিহাসের মধ্য দিয়া দেখিলেন—দেখিলেন তাহার শক্তির ও উদ্দীপনার উৎস কোথায়। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা সেই উৎসমুখের প্রস্তর অপসারিত করিয়া দিল—ভগীরথের ন্যায় শঙ্খ বাজাইল, উন্মত্ত বাঙ্গালী কি ঐন্দ্রজালিকের দৃশ্যই দর্শন করিল! ঐ মেবার পাহাড় দীর্ঘ সপ্তশতাব্দীর ম্লেচ্ছ দর্প তুচ্ছ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ঐ তাহার রক্ত-পতাকা! দেখিতে দেখিতে কি হইল "রক্তপতাকা উড়ে না আর—ঢেকেছে গভীর অন্ধকার"। ভাব যখন আসে, তখন হিসাব নিকাশ করিয়া আসে না—নূন চিনি কাপড়ের হিসাব পরে, আগে আমাদের প্রকৃতি

মধ্যে যে বড় মানুষটি রহিয়াছে তাহাকে জাগাইতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমস্তরে সেই জাগ্রত পুরুষের নয়ন কিরণপাতে আমাদের জীবনের অসামঞ্জস্য দেখাইয়াছিলেন। জন্মাবধিই এই পুরুষ তাঁহার প্রকৃতি মধ্যে জাগ্রত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনা দ্বারায় ইহা সিদ্ধ হইয়াছিল। দ্বিতীয় স্তরে তিনি দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের প্রকৃতি মধ্যে সেই বড় মানুষটিকে কি করিয়া জাগাইতে পারা যায় তাহার উপায় দেখাইলেন। ইতিহাসের মধ্যে জীবন্ত হৃদয় প্রবেশ করিয়া অমৃতের নদী সৃজন করিল—যে বঙ্গের অর্ণবপোত একদা ভারতসাগরময় ভ্রমণ করিত, যাহার সন্তানগণ চীন তিব্বত জাপানে উপনিবেশ গড়িয়াছিল, বুদ্ধ যাহায় আত্মা, যাহার মহিমা এখনও অর্দ্ধজগত জুড়িয়া বিদ্যমান, এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হঠাৎ সেই মহিমার মধ্যে জাগিয়া উঠিল—বাঙ্গালী বলিল আমরা মানুষ "আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য।"

বন্যা চিরদিন থাকে না। জল চলিয়া যায়। মাঠে পলি পড়ে। যাহারা বন্যার সময় নৌকায় চড়িয়া বেড়াইয়া আমোদ করিতে আসে, তাহারা ফিরিয়া যায়। ঋতুপক্ষী কোকিলের মত দেশান্তরে বা কর্ম্মান্তরে বসন্তের অন্বেষণ করে। কিন্তু কৃষক সেই পলিতে বীজ বপন করেন। বঙ্গের সে ভাবের বন্যা চলিয়া গিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলাল অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহার জীবনের তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিতেছিলেন। সাহিত্যজগতে নেতৃত্ব-পদে আসীন হইয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে নবসাধনার আদর্শবীজ বপন করিবার সঙ্কল্প লইয়া তিনি পরিশ্রম করিতেছিলেন। নানারূপ আলোচনার মধ্য দিয়া কিছুদিন হইতে তিনি সে কার্য্য আরম্ভও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্য পূর্ণ হইল না। অন্ততঃ পক্ষে আমাদের মত সসীমদৃষ্টিবিশিষ্ট মানব এইরূপ আক্ষেপ চিরকালই করিবে।

প্রথমযুগে তিনি আমাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিয়া হাসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার হাসিতে হাসিয়াছিলাম। কিন্তু মনে করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, যদিও তিনি সখা কিন্তু আমাদের অপেক্ষা উচ্চে তাঁহার স্থান। সখা হইয়াও গুরু। কেহ কেহ এ কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু বসন্তের কোকিল নিজের সহজ উচ্ছ্বাসের মধ্যে যে কিছু অলৌকিকত্ব আছে তাহা যেমন স্বীকার করেনা, তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালও তাহা স্বীকার করিতেন না। দ্বিজেন্দ্র-লালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় লিখিয়াছেন "তাঁহার হাসির গানে নীতি-শিক্ষা আছে, এ কথা বলিলে তিনি বলিতেন "আমি ঐ নীতি শিক্ষা-লক্ষ্য রাখিয়া লিখি নাই।"

দ্বিতীয়স্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল সতেজ, নির্ভীক অথচ প্রেমপূর্ণ। তাঁহার ভাষা, তাঁহার গান চেষ্টা করিয়া লোক দেখানো নহে—নিজে আড়ালে দাঁড়াইয়া তুবড়ি হাউয়ের বাজি করা নহে—ইহা হৃদয়-আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাব।

তৃতীয়স্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পাদকের আসনে বসিয়া মুখ্যতঃ শিক্ষকতা আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন। কি হইত বলা যায় না। তিনি যে পদ-নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি আপনাকে ঠিক বজায় রাখিতে পারিতেন কিনা, বাঙ্গালীর তাহা নির্ণয় করিবার অবসর হইল না। যাহা হউক দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেলেন।

যে কবি তাঁহার গীতমুগ্ধা পাত্রীবিশেষের দ্বারা গান করাইয়াছিলেন,—

"তুফান মাঝে সিন্ধুনীরে, আশা ভেলায় বেঁধে বুক,
থাকুক তারা, যা'দের কাছে বেঁচে থাকাই পরমসুখ;
যতদিন এ জীবন রাখি, আমি যেন সুখে থাকি;
সুখের বেলা ফুরিয়ে গেলে, আমি যেন চলে যাই।"

দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেলেন, অকালেই চলিয়া গেলেন। অল্পায়ু বাঙ্গালী জাতি—যাঁহাদের জন্মকর্ম্মের দ্বারা দেশ ধন্য হইতেছে তাঁহারা এমনি করিয়াই চলিয়া যাইতেছেন।

আমাদের 'দাহময় চিন্তামরুভূমে' স্বপ্নকুঞ্জ সৃজন করিয়া, জীর্ণপ্রাণে শত শত মন্দার-কুসুম ফুটাইয়া রাখিয়া তিনি এই 'অনন্ত-মৃত-সঙ্গীত শ্মশান' ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

(২)

১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের "বঙ্গবাসী" হইতে স্বর্গীয় কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জীবন-কথা।

দ্বিজেন্দ্রলাল নদীয়া-রাজবংশের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি সদ্বিবেচক ছিলেন। "ক্ষিতিশ-বংশাবলী চরিত" প্রণয়নে তাঁহার সাহিত্য-রচনা-কৃতিত্বের পরিচয় দেদীপ্যমান। তাঁহার অনেক পুত্র। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় জ্যেষ্ঠ। সকল পুত্রই আধুনিক ইংরেজি বিদ্যায় কীর্ত্তিমান।

কৃষ্ণনগরের ইংরেজি-বঙ্গবিদ্যালয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের লেখাপড়ার সূত্রপাত।

লেখাপড়ার সূত্রপাতেই তাঁহার প্রতিভায় সূত্র-সঞ্চার। ভবিষ্যৎ সাহিত্য-কীর্ত্তি-মহীরুহের অঙ্কুর বাল্যজীবনে। বাল্যকালে তিনি বক্তৃতা করিতে ভাল বাসিতেন।

এক দিন সন্ধ্যাকালে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। বালক দ্বিজেন্দ্রলাল বাড়ীর বাহির হইতে পারিতেছেন না। বালক এক প্রাচীরের উপর উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বাড়ীর ভৃত্যবর্গ শ্রোতা হইল। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণনগরে ছিলেন। যে সময় বালক দ্বিজেন্দ্রলাল বক্তৃতা করিতেছিলেন, সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বাড়ীর কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বালকের বক্তৃতা শুনিয়া বিমুগ্ধ হন। তিনি বক্তৃতা শুনিয়া বলেন,—"এই বালক কালে বড় লোক হইবে।"

বাল্যকালেই দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। একদিন তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে একটী কবিতা লিখিতে বলেন। তিনি পাঁচ মিনিট কাল চুপ করিয়া থাকিয়া তারা সম্বন্ধে একটী সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া আবৃত্তি করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে দ্বিজেন্দ্রলাল "আর্য্য-গাথা" নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। ইহাই তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক। কৃষ্ণনগরে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হন। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন স্কুলে পড়িতেন, তখন তিনি নির্ভুল মার্জ্জিত ইংরেজী লিখিতে পারিতেন। এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় তাঁহার ইংরেজি লেখা দেখিয়া রো সাহেব বলিয়াছিলেন.—"এমন লেখা লিখিয়া একজন ইংরেজ গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন।" তিনি সম্মানের সহিত এফ-এ এবং বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম, এ পরীক্ষার ইংরেজি সাহিত্যে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিলাত যান। সরকারী বৃত্তি পাইয়া বিলাতে কৃষিবিদ্যা শিখিবার জন্য তাঁহার বিলাত যাওয়া। তিনি বিলাতে সাইরেনসেষ্টার কলেজে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া উপাধি লাভ করেন। তিনি বাঙ্গালায় প্রবিন্সিয়াল সিভিল সার্ব্বিসভুক্ত হন। বিলাতেতিনি "Lyrics of Ind" অর্থাৎ "ভারতের গীতিকবিতা" নাম গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার জয়জয়কার হইয়াছিল। তিনি এডুইন আরণল্ডের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। আরণল্ড সাহেব এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। কলিকাতার ইংলিশম্যান ও ষ্টেটসম্যান সংবাদপত্র গ্রন্থের খ্যাতিবাদে মুক্ত-প্রাণ হইয়াছিলেন। এমন কি,

ষ্টেটসম্যান লিখিয়াছিলেন,—"যদি গ্রন্থে ডি, এল, রায়, নাম না থাকিত, তাহা হইলে ইহা কোন উচ্চাঙ্গের ইংরেজ কবির লেখা বলিয়া সিদ্ধান্ত হইত।"

বাঙ্গালার প্রবিন্সিয়াল সার্ব্বিসভুক্ত হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সুখ্যাতির সহিত নানা বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি আবকারী বিভাগের ইনস্পেক্টর ও কৃষিবিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর হইয়াছিলেন। শেষ তিনি জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্টর হন। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি কার্য্য হইতে অবসর লয়েন। তিনি নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু বিধি সাধে বাদ সাধিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিভাবান্; পরন্তু কীর্ত্তিমান। দ্বিজেন্দ্রলাল সাহেব সাজিয়া বসিয়া থাকিতেন না। দেশের প্রতি এবং স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁহার যে মমতা ছিল, তাঁহার রচিত গানে ও গ্রন্থে তাহার পরিচয়। তাঁহারই যত্নে "ইভিনিং ক্লবে"র প্রতিষ্ঠা হয় এবং তাঁহার উদ্যোগে কলিকাতার সুকিয়া ষ্ট্রীটে তাঁহার বাসাবাটীতে প্রথম পূর্ণিমা-মিলনের প্রতিষ্ঠা হয়। এ পর্য্যন্ত তিনি পূর্ণিমা-মিলনের মান রাখিয়া আসিতেছিলেন। নন্দরাম চৌধুরীর লেনে তাঁহার নিজের বাটী। ইহাই "সুরধাম।" এইখানেই এখন ইভিনিং ক্লব।" "সুরধাম", সুসজ্জিত সুন্দর উদ্যান-প্রাঙ্গণসহ সুদৃশ্য বাটী। সকলের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার বড় সাধ ছিল।

তিনি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'সাধনা'য় "বাঙ্গালী কেরাণী" সম্বন্ধে একটী রস-কবিতা লিখিয়াছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের গলাগলি ভাব ছিল; কিন্তু শেষে উভয়ের মতপার্থক্যে যে বিষময় দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতার সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী একটী কন্যা ও একটী পুত্র রাখিয়া ইহলোক সম্বরণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল আর বিবাহ করেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল পাঁচ ভ্রাতা, এক কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরে গিয়াছেন। তাঁহার সুরধাম এখন শূন্য। পুত্রকন্যা মাতামহের কাছে। তিনি এই কয়খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন,—

রাণা প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, তারাবাই, নুরজহান, মেবারপতন, সাজাহান, বিরহ, প্রায়শ্চিত্ত, পাষাণী, কল্কি অবতার, সোরাব রুস্তাম, সীতা,

মন্দ্র, আলেখ্য, আষাঢ়ে, হাসির গান, একঘরে, Lessons in English, চন্দ্রগুপ্ত, পরপারে।” ——

আর দুইমাস একদিন গত হইলে অর্থাৎ আগামী ৪ঠা শ্রাবণ তারিখে দ্বিজেন্দ্রলালের বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর পূর্ণ হইত। বাঙ্গালীজাতি দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট আরও কত আশা করিতেছিল—কিন্তু তিনি যে “আগন্তুক” “এই দ্বন্দ্ব, এই অন্ধ-অর্থ-লোলুপতা, এই স্বার্থ, এই শঠ্যে এই মিথ্যা কথা, এই ঈর্ষাদ্বেষ-ভরা নীচ মর্ত্ত্যভূমি” এখানে তিনি স্বর্গ-দূতের মত আসিয়াছিলেন—তাঁহার সংবাদ বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বালক বালিকাদিগেরও মুখে এখনও কীর্ত্তিত হইতেছে—চারিদিকেই বঙ্গমাতাকে আহ্বান করিয়া তারস্বরে মন্ত্র পঠিত হইতেছে—

“দেবী আমার, সাধনা আমার
স্বর্গ আমার, আমার দেশ”

এই মন্ত্রের অন্তরালে পুরোহিত রূপে দ্বিজেন্দ্রলালের অমর আত্মা প্রশান্ত মহিমায় সমাসীন।

মৃত্যু চিন্তা করিয়া একদিন এই কবি গাহিয়াছিলেন—

“—মরিবার ইচ্ছা নাহি! সত্য, না মরিতে চাহি।
তথাপি মরিতে হ’বে সৃষ্টির নিয়ম।
জন্মিলে মরিতে হয়; তবে কেন এই ভয়?
এই শঙ্কা, এই দ্বিধা ভ্রম, ভ্রম, ভ্রম।
মরিয়াছে পিতৃগণ; মরিয়াছে সর্ব্বজন—
বুদ্ধ ও বিক্রমাদিত্য—পুণ্যাত্মা মহৎ;
আমি কি সামান্য তুচ্ছ?— গেল দেশ কত, উচ্চ
গ্রীস, আসীরিয়া, রোম, মিসর, ভারত;—
কালের প্রবাহে, কত, জল বুদ্বুদের মত,
উঠি নব জীব জাতি অদ্য অধোগামী!
এ পৃথিবী লুপ্ত হ’বে; ওই সূর্য্য গুপ্ত হবে;
আমার মরিতে ভয়—তুচ্ছ জীব আমি?
না মরণে শঙ্কা নাই; আমিত প্রস্তুত ভাই;
যাদের ছাড়িয়া শেষে যাব এই ভবে,

তারাও আসিছে পিছে,　　কার জন্য শোক মিছে ?
পরে যাহা আছে, আছে ; ভাবিয়া কি হবে ?
আর যদি, পরমেশ !　　এ জগতে এই শেষ ;
এই ক্ষুদ্র জীবনের মৃত্যুই অবধি ;
যদি নাই পরলোক ;—　　তবে কে করিবে শোক,
মৃত্যুর অপর পারে আমি নাই যদি ?
আর যদি আমি থাকি,　　তাহাতেই দুঃখ বা কি ?
মৃত্যু যদি সুখ-শূন্য, মৃত্যু দুঃখ-হীন।
বিনা সুখ-দুঃখভার,　　একাকার, নির্ব্বিকার,
নির্ভয়ে হইয়া যাব পরব্রহ্মে লীন।
তবে এক সাধ আছে—　　মরিব যখন, কাছে—
রহে যেন ঘে'রি প্রিয়া পুত্র কন্যাগণ ;
আর বন্ধু যদি কেহ,　　করে ভক্তি, করে স্নেহ,
রহে যেন কাছে সেই প্রিয় বন্ধুজন ;
খুলে দিও দ্বার ! ভেসে　　পড়ে যেন মুখে এসে
নির্ম্মুক্ত বাতাস, আর আকাশের আলো ;
দেখি যেন শ্যাম ধরা　　শস্যভরা পুষ্পভরা
এতদিন যাহাদিগে বাসিয়াছি ভালো ;
আসে যদি মৃদু মন্দ　　পবনে চামেলী গন্ধ ;
একবার বসন্তের পিকবর গাহে ;
হয় যদি জ্যোৎস্না রাত্রি ;—　　আমি ওপারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে।"

কবির সকল ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হয় নাই—তবে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে তিনি যাত্রা করিয়াছেন। কবির যখন মৃত্যু হয় তখন শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশী। চাঁদের আলো দেখিয়া কবি গাহিয়াছিলেন

"এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান।"

জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার সেক্সপিয়র, বায়ান্ন বৎসরে পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহার নায়ক চন্দ্রালোকে গীতস্বর শুনিতে শুনিতে বিশ্বব্যাপী মিলনলীলা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—এ মিলনগীতি অমর আত্মার সম্পদ—ধ্বংসশীল

এই মাটির শরীর তাহা আবরণ করিয়া রাখে—আমাদের শুনিতে দেয় না*—আশা করি অনেক বিষয়ে তাঁহারই পদাঙ্কগামী বঙ্গগৌরব কবি দ্বিজেন্দ্রলাল আজ ভৌতিক বন্ধন মুক্ত হইয়া সেই গান শুনিতেছেন।

প্রাচীন মঙ্গলডিহি

"জয় জয় ভকত-বৎসল শ্যাম চাঁদ
পূর্ব্বে নন্দের গৃহে বাধা কভু নাহি বহে
'পানুয়ার পিরীতে বহে পান'
গঙ্গার পশ্চিম পাশে, ষোল ক্রোশ রাঢ় দেশে,
বক্রেশ্বরের পূর্ব্বে স্থিত
তার মধ্যে এক স্থান মঙ্গলডিহি নামে গ্রাম
শ্যাম চাঁদ যাহে বিরাজিত"

এখনও মঙ্গলডিহির আবাল-বৃদ্ধ বনিতার মুখে মুখে এই গান 'পানুয়ার পিরীতে বহে পান' শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবান ভক্তবৎসল। তাঁহার মধুর লীলা অমৃতের অফুরন্ত উৎস। ভগবান বাৎসল্য ভাববতী যশোদা জননীর রজ্জুর বন্ধন গ্রহণ করিয়াছেন, নন্দের বাধা মস্তকে বহন করিয়াছেন, সখ্যভাবে মুগ্ধ হইয়া রাখাল বালকদিগকে কাঁধে চড়াইয়াছেন, অর্জ্জুনের রথে সারথ্য করিয়াছেন। আবার মধুর ভাবের 'অপরিশোধ্য ঋণে বন্দী হইয়া তিনি 'যোগী সাজিয়াছেন," ভারতের ভক্ত কবির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার রাজ্যে এরূপ শত শত দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভারতের পল্লীতে পল্লীতে এই লীলা। ভারতের হাজার হাজার নর নারী নিজের জীবনে এ লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ভারতের কোটী কোটী নর নারী এই ভাবের ভাবুক, তাই সখ্য-ভাব-বিভোর কবির জোর কলমের লেখা—'পূর্ব্বে নন্দের গৃহে, বাধা কভু নাহি বহে, পানুয়ার পিরীতে বহে পান'। তাই প্রাচীন মঙ্গলডিহির কথাও এখনো অনেকে ভুলিয়া যান নাই, যাঁহার সুপবিত্র সখ্য-ভাবে

* "Such harmony is in immortal souls ;
But whilst this mundane vesture of decay
Doth grossly c ose it in, we cannot hear it.

Merchant of Venice V. I.

মুগ্ধ হইয়া ভগবান পান বহিতেন, শ্রীচৈতন্যপার্ষদ সুন্দরানন্দের ভাবানুপ্রাণিত ঠাকুর 'পানুয়ার' লীলাস্থলী এই প্রাচীন 'মঙ্গলডিহি'।

প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কৌমুদী-সুধাসিক্ত বঙ্গদেশে—তাঁহারই অনুযাত্রী মহাপুরুষগণের কৃপায় একদিন যে ভাববীজ উপ্ত হয় কালে তাহা হইতে দিকে দিকে বিরাট বিশাল বনস্পতি সমূহের সমুদ্ভব হইয়াছিল। স্পর্শমধুর সুখ-শীতল এই সমস্ত আশ্রম পাদপের পবিত্র আশ্রয়ে যে সমস্ত অগণিত পল্লী অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এক অপূর্ব্ব অপার্থিব শান্তি ছায়ায়, পবিত্র ও কৃতার্থ হইয়াছে—, 'প্রাচীন মঙ্গলডিহি' তাহারই মধ্যে অন্যতম। কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নহে, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীগণেরও ইহা একটি পবিত্র তীর্থ স্থান।

বীরভূম সিউড়ি হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে দশ মাইল পথ অতিক্রম করিলে এই 'মঙ্গলডিহি' গ্রাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম খানি দেশ বিদেশস্থ বহু শিষ্য প্রশিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলী কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রাচীনকাল হইতেই বীরভূমে এবং তাঁহার বাহিরেও নানাস্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রী৺শ্যামচাঁদ বিগ্রহ-মূর্ত্তি বহুকাল যাবৎ গ্রামস্থ ঠাকুরগণ কর্ত্তৃক প্রেমভক্তির সহিত পূজিত হইয়া আজিও মঙ্গলডিহি পবিত্র করিয়া আছেন। মঙ্গলডিহি ঠাকুর-বংশের আদি পুরুষ এই 'পানুয়া' (শ্রীশ্রী 'পর্ণিগোপাল') ঠাকুর। ইনি সার্দ্ধ চৌদ্দশত শকাব্দায় (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে) বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বর্ত্তমান ঠাকুরগণ কর্ত্তৃক সযত্ন-রক্ষিত পুরুষানুক্রমে হস্ত-লিখিত 'শ্রীগুরু প্রণালীতে' লিখিত আছে 'শ্রীচৈতন্য পার্ষদ ঠাকুর শ্রীসুন্দরানন্দ ৺শ্যামচাঁদ-বিগ্রহ-মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুরকে (বৈষ্ণব ধর্ম্মে) দীক্ষিত করেন।

শ্রীপানুয়া ঠাকুরের পিতার নাম 'মনসুখ'। মাতার নাম অজ্ঞাত। ইঁহার নিজের প্রকৃত নাম 'গোপালচন্দ্র'। পান বিক্রয় করিতেন বলিয়া ইনি 'শ্রীপর্ণিগোপাল' বা 'পানুয়া ঠাকুর' নামে বিখ্যাত হন। দীক্ষা গ্রহণের পর ইনি ঘটনাক্রমে শ্রীশ্রী৺শ্যামচাঁদ ও শ্রীবলরাম বিগ্রহ-মূর্ত্তিদ্বয় লাভ করেন। মঙ্গলডিহির কবি জগদানন্দ তাঁহার 'শ্যাম-চন্দ্রোদয়' নাটকে প্রবন্ধের শীর্ষোল্লিখিত কবিতা কয়ছত্রে ৺শ্যামচাঁদের ভক্তবাৎসল্য, পানুয়ার ঈশ্বর-প্রীতি ও মঙ্গলডিহির বর্ণনা করিয়া সুললিত পদ্য ছন্দে শ্রীশ্রী৺শ্যামচাঁদ প্রাপ্তির বিবরণ, লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ।

"নৈমিষারণ্য-বাসী শ্রীধ্রুব গোস্বামী নামক জনৈক সাধুপুরুষ স্বপূজিত বিগ্রহ মূর্ত্তিদ্বয় সমভিব্যাহারে, তীর্থপর্য্যটনব্যপদেশে মঙ্গলডিহি আগমন করিয়া শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুরের আতিথ্য গ্রহণ করেন, এবং আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হইয়া গোস্বামী, 'পানুয়া ঠাকুরের' উপরই স্বীয় বিগ্রহ মূর্ত্তি দ্বয়ের সেবার ভারার্পণ করিয়া শ্রীধাম পুরুষোত্তমতীর্থ দর্শনে গমন করেন। তীর্থ প্রত্যাগত সাধু কিন্তু আর বিগ্রহ-মূর্ত্তি-দ্বয় সঙ্গে লইতে পারেন নাই। তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ হয় যে দেব-বিগ্রহ পর্ণিগোপালের সেবায় কৃপাপরবশ হইয়া মঙ্গল-ডিহিতেই অবস্থানে ইচ্ছুক। সন্ন্যাসীও পানুয়ার দেবতাভক্তি এবং সেবার সুবন্দোবস্ত দেখিয়া তীর্থান্তরে গমন করেন, সন্ন্যাসীর সেই বিগ্রহ-মূর্ত্তি-দ্বয়ই—শ্রীশ্রী৺শ্যামচাঁদ ও বলরাম দুই ভাই আজিও মঙ্গলডিহিতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।"

শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুর বিগ্রহসেবার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন আজিও যত্নের সহিত সেই ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইতেছে। মঙ্গলডিহিতে এখনও প্রাচীন ভাব বিদ্যমান। সেই প্রাচীন অতিথি-সেবা এখনও রহিয়াছে। মুষ্টি-ভিক্ষা দান বন্ধ করিয়া অলস নিষ্কর্ম্মার সংখ্যা হ্রাস পূর্ব্বক সমাজে কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি করিবার নূতন আদর্শ এখনও এই সুদূরবর্ত্তী পল্লীভবনে প্রবেশ করে নাই।

শ্রীঅনন্ত, শ্রীকিশোর, শ্রীহরিচরণ, শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীকাণুরাম এই পাঁচ জন শ্রীপর্ণিগোপালের নাদপুত্র (শিষ্য) নামে বিখ্যাত। পানুয়া ঠাকুরের অবর্ত্তমানে ইহাঁরাই মঙ্গলডিহির 'গাদি' ও ৺বিগ্রহ সেবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তের বংশধরগণ ৺বলরাম বিগ্রহ সমভিব্যাহারে বীরভূম দুবরাজপুরের সন্নিহিত খয়রাশোলগ্রামে গমন করেন। তাঁহার বংশধরগণ আজিও খয়রাশোলে বর্ত্তমান আছেন। খয়রাশোলে ৺বলরাম বিগ্রহের 'গোষ্ঠোৎসব' বিশেষ সমারোহের সহিত নির্ব্বাহিত হয়। কিশোরের দৌহিত্রবংশ হইতে '৺মদনগোপালের 'পাঠ' নামে মঙ্গলডিহিতে অপর একটী পৃথক পরিবারের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাঁদের বাড়ীতে শ্রীশ্রী৺মদন-গোপাল বিগ্রহ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই বিগ্রহ শ্রীশ্যামচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কি পরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। হরি-চরণের কোনো পুত্রাদি ছিল না, লক্ষ্মণ ও কাণুরামের পুত্রগণই মঙ্গলডিহির ৺শ্যামচাঁদ বাড়ীর'ঠাকুর নামে বিখ্যাত, কাণুরামের পুত্র গোপালচরণ। ইঁহারই

দুই ক্ষণজন্মা পুত্র হইতে মঙ্গলডিহি গৌরবান্বিত। জ্যেষ্ঠ পরম প্রেমিক—সুগায়ক গোকুলানন্দ, (গোকুলচন্দ্র)। ইনি অনেকগুলি কীর্ত্তনের পদ রচনা করেন এবং কীর্ত্তন গানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া তৎসাময়িক পঞ্চকোট কাশীপুরাধিপতির নিকট হইতে 'গোস্বামীডিহি, ও 'মোতাবেল' নামক দুই খানি নিষ্করগ্রাম প্রাপ্ত হন। এই গ্রাম দুই খানি আজিও ৺শ্যামচাঁদের সম্পত্তি।

গোকুলানন্দের একটী গান—

"উঠ মোর ভে'য়ারে কানাই,
প্রভাত হইল নিশি, খগ গেল দশদিশি, আঁখ মেল আর ভোর নাই,
বদন মার্জ্জনা কর, খাও দধি দুগ্ধ সর, কটীতটে পর পীত বাস।
বৎস গাভী ল'য়ে সঙ্গে, আনন্দ কৌতুক রঙ্গে, চল যাই বৃন্দাবন পাশ॥
বৃন্দাবনে সুশীতল, আছে নানা পক্ক ফল, আম জাম রসাল পিয়াল।
তুলিব সে সব ফল, শিঙা ভরি লব জল, সুখে খাব আমরা রাখাল॥
বলরাম দাদা আগে, নিতুই বিহানে জাগে, তোরে কেন জাগাইতে হয়।
গোকুলানন্দেতে কয়, এত নিদ্রা ভাল নয়, মা যশোদা জল লয়ে রয়"॥

কনিষ্ঠ নয়নানন্দ। নয়নানন্দকে বক্ষে ধরিয়া মঙ্গলডিহি কৃতার্থ হইয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রেম-মন্ত্রে উজ্জীবিত যে সকল পুণ্যস্মৃতি ভগবৎপ্রেমিক পিক পাপিয়ার মধুর কণ্ঠ 'শান্তরসাস্পদ' সুপবিত্র পল্লী সমূহের নিভৃত নিকুঞ্জে ধ্বনিত হইয়া এক দিন সমগ্র বঙ্গদেশ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল, যাঁহাদের 'মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী' 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' আজিও সহস্র সহস্র নরনারীকে ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত করিয়া তোলে, তাঁহাদের অনেকেরই লীলাস্থলী, এই অরণ্যানি-ঘন, ছায়া-শীতল বীরভূমি।—'কেন্দু বিল্ব' ও 'নান্নুরের' ন্যায় 'মঙ্গল-ডিহি' ও তীর্থগৌরব লাভের যোগ্য অধিকারী। 'কেন্দু-বিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব রোহিনী-রমণ পরম-ভাগবত কবি-কুল-চূড়ামণি জয়দেব, বঙ্গবাণী-কুঞ্জে বাসন্তী উষার মদকল কোকিল চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, জগদানন্দ (১) প্রভৃতি বিশ্ব-বিশ্রুত নামের সঙ্গে "সখ্য-রস-রসিক কবি নয়নানন্দের" নামও সগৌরবে উল্লিখিত হইতে পারে। দুর্ভাগ্য, আমরা এত দিন অনুসন্ধান করি নাই, তাই সে নাম অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। কবি

(১) জগদানন্দ বীরভূম জেলার অন্তর্গত দুবরাজপুর থানার অধীন জোফলাই গ্রামের স্বনামধন্য ও সুপরিচিত বৈষ্ণব-পদ-কর্ত্তা।

নয়নানন্দ 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি-রস-কদম্ব ও 'প্রেয়ো-ভক্তি-রসার্ণব' নামে দুই খানি মূল্যবান গ্রন্থ ও অনেকগুলি কীর্ত্তনের পদ রচনা করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ন্যায় কবি ইহাতে স্বরচিত কবিতাবলীর মাঝে মাঝে নিজ রচিত ও নানা শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক সমূহ সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থের গৌরব ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রস-কদম্ব গ্রন্থখানি 'কবির নিজ হস্তে লিখিত তুলোট কাগজে দুই শত পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। গ্রন্থখানি আজিও মঙ্গলডিহিতে যত্নের সহিত পূজিত হয়। পুঁথি খানির পরিচ্ছেদ অন্তে এইরূপ লিখিত আছে—

'শ্রীরূপের লিখন গ্রন্থ বৈষ্ণব মুখে শুনি
তাহার আভাস কিছু ভাষাতে বাখানি,
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য,
অভিরাম সুন্দরানন্দ সর্ব্বগুণ-বর্য্য
শ্রীপর্ণিগোপাল প্রভু গোপাল চরণ
যাঁর পদে কায়মনে লইলাম শরণ।
কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-কদম্ব শ্রবণে উল্লাস
কাতরে বর্ণিলা এ নয়নানন্দ দাস'

পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্য, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান এবং অসাধারণ ভগবৎ প্রেম দর্শনে বিস্ময়ানন্দে বিমুগ্ধ হইতে হয়।

'কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-কদম্ব' 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের' এক শতাব্দী পরবর্ত্তী। গ্রন্থশেষে সমাপ্তিপ্রসঙ্গে কবি নয়নানন্দের আত্ম-পরিচয়ের পরে নিম্নের কবিতা কয় ছত্র লিখিত আছে।

"যুগ্ম বাণ ঋতু চন্দ্র শকে পরিগণি
বৃষ রাশি গত ভানু মাস তাহে জানি
ভূমি-পুত্রবারে তথা কুহু তিথি শেষে
হইলেন গ্রন্থ সাঙ্গ পঞ্চম দিবসে।
সেন-ভূম মধ্যে 'মঙ্গলডিহি গ্রাম'
শ্রীপর্ণি গোপাল প্রভুর যাহাতে বিশ্রাম
ঠাকুর পাণুয়ার সেবা 'শ্রীশ্যাম সুন্দর'
'বলরাম চন্দ্র' প্রভু রসিক নাগর

সে মূর্ত্তি দেখিতে ভক্তের বাড়ে প্রেম রঙ্গ
সেই স্থানে রহি এই গ্রন্থ হইল সাঙ্গ।
কৃষ্ণভক্তি-রস-কদম্ব শ্রবণে উল্লাস
কাতরে বর্ণিলা এ নয়নানন্দ দাস”

শকাব্দা ১৬৫২, ৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শুক্ল প্রতিপদ (বঙ্গাব্দ সন ১১৩৭ সাল) (খৃঃ ১৭৩০)

সুপ্রসিদ্ধ ‘অন্নদা-মঙ্গলের’ রচনা সমাপ্তি কাল ইহার দ্বাবিংশতি বৎসর পরে (১৭৫২ খৃঃ অঃ)। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক বিশ্ব-মাতৃকা-ধ্যান-পরায়ণ সাধক শ্রেষ্ঠ ‘রামপ্রসাদ’কে ভূমিদানের কাল তাহার আরো ছয় বৎসর পরবর্ত্তী (১৭৫৮ খৃঃ)। বীরভূম ‘জোঁফলাইয়ের’ বৈষ্ণব কবি-‘জগদানন্দ’, ‘ভবানী মঙ্গল’ কাব্যের কবি বীরভূমের ‘গঙ্গানারায়ণ’, বাঁকুড়ার অষ্ট কাণ্ডীয় রামায়ণের’ কবি ‘জগতরাম’, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সম-সাময়িক। বীরভূমির এই গৌরব মধ্যাহ্নে কবি নয়নানন্দ জীবিত ছিলেন কিনা, থাকিলেও ইহাদের সহিত পরিচিত ছিলেন কিনা, জানিবার কোনো উপায় নাই। যদি ইহাঁদের পরস্পর পরিচয় ছিল, যদি মাঝে মাঝে তাঁহাদের সম্মিলন হইত তবে সে মিলনানন্দের পবিত্র স্রোতে না জানি কত তৃষিত তাপিতের অক্ষয় তৃপ্তি বিধান করিয়াছে এবং বর্ত্তমানের মহা মহা সম্মিলন অপেক্ষা সে কালের সেই নির্জ্জনে অনাড়ম্বর মিলন না জানি কত সুফলপ্রসূ হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্থির যে বালক ভারতচন্দ্রের বিকাশোন্মুখ কবি-প্রতিভা যে সময় ‘রামচন্দ্র বক্সী’র সভায় স্বরচিত সত্যপীর ব্রত-কথা পাঠ করিয়া করতালী-মুখর সভাকে বিস্মিত ও আনন্দিত করিয়া তুলিতেছে, ‘কৃষ্ণভক্তি রস-কদম্ব’ এর রচনা তখনো শেষ হয় নাই—(সনেরুদ্র চৌগুনা, সন ১১৪৩ সাল, খৃঃ ১৭২৭ অঃ)

লক্ষ্মীর বিলাস-ভাণ্ডার হইতে কোলাহলময়ী জনবহুল নগরীর স্বর্ণ-শীর্ষ সৌধ-ক্রোড় হইতে দূরে, অতিদূরে এইরূপ কত শত মঙ্গলডিহির নিভৃত শান্তি-নিকেতনে, ‘নিরঞ্জন পাতের কুটীরে’ বসিয়া কত অগণিত ‘গ্রাম্য কবি’ সংসার-শ্রান্ত পথিকের অবসন্ন জীবনে এক দিন যে পবিত্র ভাবের উদ্দীপনা আনিয়া দিতেন কে সে চিত্র অঙ্কিত করিবে? পল্লীর শত শত ধ্বংসস্তূপে কাষ্ঠচাপের কবল-বদ্ধ জীর্ণ কীটদষ্ট অপ্রকাশিত পুঁথি সমূহের সম্যক অনুসন্ধান না করিয়াই, মাত্র দুই এক খানি পুঁথি দেখিয়া অনেকেই

খৃঃ অঃ অষ্টাদশ শতাব্দীকে, বিশেষতঃ 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের' সময়কে 'তথা-কথিত' অশ্লীলতার যুগ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক জেলার প্রধান প্রধান নগরী সমূহে, তথা বর্ত্তমান বঙ্গের ভাব-কেন্দ্র কলিকাতায় 'পাশ্চাত্য ভাবানুকরণ-বহুলতা' দর্শন করিয়া যে তাঁহাদের এই জ্ঞান বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন বঙ্গের তৎসাময়িক প্রধান প্রধান নগরী সমূহে যে মুসলমানগণের অধঃপতনের মুখ্যীভূত কারণ বিলাসিতা-ব্যাধি বিশেষ রূপেই অন্তর্প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত। সুতরাং দুই একজন প্রধান প্রধান নাগরিকের আশ্রয়ে রচিত দুই একখানা পুঁথি যে তাঁহাদের রুচি অনুযায়ী হইবে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু সে ভাব সেকালের সুদূর পল্লীবিতানে সংক্রামিত হইতে পারে নাই। তখনকার শত শত মঙ্গলডিহিতে শত শত নয়নানন্দ অমানুষিক পাণ্ডিত্যবলে স্বীয় চতুস্পাঠীপ্রদত্ত সংস্কৃত শিক্ষার নিবিড় নিগড়ে আবদ্ধ রাখিয়া পল্লী সমূহকে উপরি-উক্ত ভাবসংঘাত হইতে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য প্রদান করিতেছিলেন, স্বরচিত সদ্ভাবপূর্ণ নানা বিষয়িণী কবিতামৃত বর্ষণে অবসর-সায়াহ্নে শত শত শ্রমক্লান্ত নরনারীর বিশ্বাস-পূর্ণ হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব শান্তির উৎস সৃষ্টি করিয়া দিতেছিলেন এবং বর্ত্তমানে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার যে সর্ব্বতোভাবে বিলয় ঘটিয়াছে, অনেকেই তাহা বিস্মৃত হইয়া যান। কবি নয়নানন্দের গ্রন্থ দুইখানির সম্যক পরিচয় প্রদান এখানে অসম্ভব, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-রস-কদম্বের মাত্র অনুক্রমনিকা টুকু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল, গ্রন্থ-পরিচয় সম্বন্ধে আমার মনে হয়, ইহাই যথেষ্ট।

"এবে কহি গ্রন্থের অনুক্রম সূত্র।
যেবা যেই প্রকরণে হয়েছেন উক্ত॥
প্রথম প্রকরণে হৈলাম মঙ্গলাচরণ।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব বন্দনারূপ হন॥
সর্ব্ব-আরাধনা-পর কৃষ্ণের অর্চ্চন।
মনে সম্বোধিয়ে প্রশ্ন প্রথম প্রকরণ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণ সেবায় হয় জগতের প্রীতি।
ভক্তবশ্য ভগবান অভক্ত নিন্দাতথি॥
কৃষ্ণাশ্রয় বিনে ভবসিন্ধু নহে পার।

দ্বিতীয় প্রকরণে হৈল তাহার বিচার ॥ ২
বাল্যারভ্য কৃষ্ণ সেবা বিষয়াবিষ্ট ত্যাগ।
অনাশ্রিত পশুতুল্য ইত্যাদি বিভাগ ॥
ইন্দ্রিয় থাকিতে যে ইন্দ্রিয় হীন জন।
ভক্তি শ্রেষ্ঠ তৃতীয়ে হৈল নিরূপণ ॥
অকামা সকামা ভক্তি কৃষ্ণ-ভক্তি ফল।
অবিনাশী কৃষ্ণদাস তৃতীয়ে সকল ॥ ৩
চতুর্থে সাধন ভক্তি বৈধীর কথন।
উত্তম মধ্যম ভক্ত তটস্থ লক্ষণ ॥ ৪
পঞ্চমে চতুঃষষ্টী ভক্ত্যঙ্গ লক্ষণা। ৫
ষষ্ঠে সেবা নাম আদি অপরাধ বর্ণনা ॥ ৬
সপ্তমে রাগভক্তি প্রকটাপ্রকট লীলা। ৭
অষ্টমে ভাবভক্তি বর্ণন হইলা ॥ ৮
নবমে বিভাগ সূত্র পূর্ণ্ণ্য তম।
ধীরোদাত্ত্যাদি তথা নায়ক কথন॥৯
নিত্য সিদ্ধ্যাদি ভক্তি লক্ষণা নবমে।
দশমে অনুভাব তথা সাত্বিক কথনে ॥ ১০
ব্যাভিচারি কহিলাম প্রকরণ একাদশে ॥ ১১
স্থায়ী ভাব কথন হইয়াছেন দ্বাদশে। ১২
ত্রয়োদশে মুখ্য ভক্তি রস নিরূপণ।
শান্ত দাস্য পর্য্যন্ত তাহাতে লিখন। ১৩
চতুর্দ্দশে সখ্য ভক্তি রসের বিচার। ১৪
পঞ্চদশ প্রকরণে বাৎসল্যের সার। ১৫৷
ষোড়শ সপ্তদশে উজ্জ্বল বর্ণন।
এই তো কহিল ইনি শাস্ত্র অনুক্রম ১৬।১৭

গোকুলচন্দ্রের পুত্র কবি 'জগদানন্দ', পিতা ও পিতৃব্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নানাস্থান হইতে সমাগত বহু ছাত্র সমবায়ে গঠিত নয়নানন্দের গৌরবান্বিত 'চতুষ্পাঠী' ইঁহার হস্তে যে অতুল্য যশোভূষণে বিভূষিত হয়—তাহা বহুদিন মঙ্গলডিহির পরিচয়-স্বরূপ সমুজ্জ্বল ছিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ইনি "শ্যাম-চন্দ্রোদয়" নামক নাটক প্রণয়ন

করেন। গ্রন্থখানি কবিতায় লিখিত। ইহার রচিত গানগুলির যে দুই চারিটী পাওয়া যায় তন্মধ্যে নিম্নে একটী আরত্রিকের গান উদ্ধৃত হইল। 'রাস' 'দোল' প্রভৃতি মহোৎসবে বন-ভোজনের পর ৺দেববিগ্রহ, মন্দিরে তুলিয়া জগদানন্দের বর্ত্তমান বংশধরগণ কর্ত্তৃক যখন এই সংগীত গীত হয়—তখন কত কথাই না মনে জাগে! গানটী এই—

"আরতি করে নন্দরাণী বালক মুখ হেরি,
গাওত নব নাগরী সব রাখাল সকল ঘেরি।
রম্ভা ফল ঘৃত প্রদীপ পুষ্পরচিত থালি
সুন্দরীগণে হুলোতি দেই শিশুগণ করতালী।
রাখি শিঙ্গা বেণু যশোদা মা-ই কোরে নিল দুনো ভাই-ই
মাখন দেহি, দেহি ক্ষীর খাওয়ে রাম কানাই-ই।
সকল শিশুর মুখ তুলি তুলি যশোমতি চুমো খাওয়ে
মঙ্গল পুছে নন্দ ঘোষ জগদানন্দ গাওয়ে॥

নয়নানন্দের পৌত্র 'ব্রজানন্দ' ইনি পিতামহের মত যেমন সুকণ্ঠ ছিলেন সেই-রূপ সংগীত শাস্ত্রেও তাঁহার অসীম পারদর্শিতা ছিল। ইঁহারও অনেকগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে দুই একটী কীর্ত্তনের পদ পাওয়া যায়। জগদানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর পিতামহের অনুকরণে 'রামচন্দ্রোদয়' নামক নাটক প্রণয়ন করেন, গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহার দুই একটী শ্লোক অনেকেরই মনে আছে। রামচন্দ্রোদয়ের একটী সংস্কৃত শ্লোক—

"রামে মরকতশ্যামে জানকী কনকী লতা
নবীন জলদারম্ভে ঘনে সৌদামিনী যথা"

জগদানন্দের আর এক পৌত্র 'শ্যামসুন্দর' সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ও অসাধারণ সংগীতবিৎ ছিলেন, ইঁহারাও উত্তরোত্তর চতুষ্পাঠীর উন্নতি সাধন করিয়া যান।

শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুর ও তাঁহার সম সাময়িক স্থানীয় সাধকবৃন্দ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়—স্থানীয় 'খুষ্টীকুড়ী' গ্রামনিবাসী বুজরুক 'ফকির সাহ আবদুল্লা', বর্দ্ধমান 'কোঁদা' গ্রাম নিবাসী সাধক 'ঘনশ্যাম গোস্বামী' প্রভৃতির সঙ্গে ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। জগদানন্দের "শ্যাম-চন্দ্রোদয়ে" নান্দী-স্বরূপ গ্রন্থারম্ভে যে সংস্কৃত শ্লোক দুইটী লিখিত আছে এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

"মন্দিরে বর্ত্ততে যেন শ্যাম-সুন্দর-বিগ্রহঃ।
পর্ণ-বিক্রয়-দ্রব্যেন পূজা যেন কৃতা পুরা।
যবনান্নং কৃতং পুষ্পং ব্যাঘ্রে মন্ত্র-প্রদায়কং
তং নত্বা পর্ণি-গোপালং ক্রীয়তে পুস্তকং ময়া।"

প্রবাদ—শ্রীপর্ণি-গোপাল ব্যাঘ্রে মন্ত্র দিয়াছিলেন, ব্যাঘ্রও তাঁহার বশীভূত ছিল, এবং স্বীয় বন্ধু 'ফকীর' আবদুল্লার' প্রেরিত 'খানা' তিনি পুষ্পে' পরিণত করিয়াছিলেন। প্রবাদ—শ্রীপর্ণিগোপাল পান বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেক দিন 'পঞ্চোকোট কাশীপুরে' গমনাগমন করিতেন। 'পানের গাদি' ইহাঁর মস্তক স্পর্শ করিত না ইত্যাদি ইত্যাদি। বলিতে ভুলিয়াছি মঙ্গলডিহির ঠাকুরগণ সখ্য-ভাবের উপাসক। তবে ৺রাস-যাত্রাই কেন যে এখানে বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়—বলিতে পারি না, হইতে পারে কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাদেরই জ্ঞাতি গোষ্ঠী দুবরাজপুর অধীন 'খয়রা-সোলের' ঠাকুর বাড়ীতে গোষ্ঠোৎসব হয়।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

উষা।

এস উষা মৃদু পদে, বিশ্ব-ভবনের পথে,
অরুণের দীপ্তি বহি শিরে
দেখিয়া তোমার হাসি, দূরে যাক্ তমোরাশি
কল্যাণ আসুক পুনঃ ফিরে।
ধরার যতেক ফুল সুধাবিষ্ট প্রেমাকুল
বুকে করি তোমার চরণ
তরুলতা নত শিরে তুষার ফেলিছে ধীরে
হর্ষে যেন ঝরিছে নয়ন।
নিদ্রা ত্যজি পাখী সব করিতেছে কলরব
কত শান্তি-স্নিগ্ধ সেই গান
সুগন্ধ বাতাস আসে বুঝি বা নীরব ভাবে
করে দেবী তোমায় আহ্বান।

অদৃশ্যে নীরব পায়ে কনক অঞ্চল গায়ে
প্রতি গৃহে গিয়া দেবী তুমি,
অঙ্গুলী পরশ করি, তন্দ্রা দাও দূর করি
কর্ম্ম ক্লান্ত যারা রহে ঘুমি।
সবিস্ময়ে উঠি সবে দেখে বলারুণ যবে
তরু শিরে অঙ্গনের মাঝে
নবোৎসাহে যায় লোক, ত্যজি দুঃখ জ্বালা শোক
শ্রান্তিহীন নিজ নিজ কাজে।
রাখালেরা যায় মাঠে খেলা করি পল্লীবাটে
নিশ্চিন্তে লইয়া গাভীগণ
সরোবরে যায় যত কুলবধূ লজ্জানত
শোনা যায় নূপুর গুঞ্জন।
বালকেরা উষাকালে চলিতেছে পাঠ-শালে
শিশুকুল করিতেছে খেলা
সুপ্তি ত্যজি উঠে সবে জাগে বিশ্ব-কলরবে
ক্রমে যত বাড়িতেছে বেলা।
রৌদ্র যত উঠে ফুটে দেখি কত পান্থ ছুটে
পল্লী-পথে গাহি কত গান,
সে সঙ্গীতে কি আনন্দ কত প্রীতি কত ছন্দ
উতলা করিয়া তুলে প্রাণ।
বিস্ময়ে মুদিত চক্ষে জোড় কর রাখি বক্ষে
ডাকি আমি বিশ্ব-ভগবানে
জানিনা কতটা ভীতি কত দৈন্য কত প্রীতি
আছে মোর কাতর আহ্বানে।

শ্রীপ্রভাসকুমার সেন।

দাস ব্যবসায়।

প্রাচীন ভারতে দাস ব্যবসায়

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের ন্যায় সুপ্রাচীন গ্রন্থ পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ, এই ঋগ্বেদেও দাসের উল্লেখ'' দেখা যায়। য়ুরোপীয়গণ স্থির করিয়াছেন যে, আর্য্যগণ ক্রমশঃ অনার্য্যগণ বা ভারতের আদিম অধিবাসীগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাহাদিগকে দাসরূপে আপনাদিগের সমাজের অন্তর্ভূত' করিয়া লইয়াছিলেন। এই উক্তির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও, ভারতীয় আর্য্যগ্রন্থ সমূহে দাস-শব্দের বহুল প্রচলন দেখিয়া, আজ পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিকই দাস-ব্যবসায়ের অস্তিত্ব অপ্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। বরং মানব-ধর্ম্মগ্রন্থে দাসের প্রকার ভেদ প্রভৃতি দাস সম্বন্ধীয় যথেষ্ট আলোচনার দ্বারা দাস-ব্যবসায়ের অস্তিত্বই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মনু স্পষ্টতঃ সাত প্রকার দাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, যথা—(১) ধ্বজাহৃত বা যুদ্ধে জয় করিয়া যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, (২) ভক্তদাস বা অন্নের জন্য দাসত্বস্বীকৃত দাস (৩) গৃহজ বা দাস-দাসীর পুত্র (৪) ক্রীত বা মূল্যের দ্বারা যাহাকে ক্রয় করা হইয়াছে (৫) দত্রিম বা অন্য কর্ত্তৃক দত্ত দাস (৬) পৈত্রিক (৭) দণ্ডদাস।

ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীত দত্রিমৌ
পৈত্রিকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ।

(৮।৪১৫)

মুসলমান শাসনের পূর্ব্বে দাস ব্যবসায়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতে দাস-ব্যবসা প্রবলভাবেই প্রচলিত ছিল। মুসলমান-শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও যে দাস ব্যবসা ভারত হইতে লোপ পায় নাই, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই দাস-ব্যবসা প্রসঙ্গে হুইলার-

সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই আমাদিগের প্রতিপাদ্য বিষয়ের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। তাঁহার উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

All the while the Slave trade was an institution in Madras, and indeed throughout Southern India. In most of the Hindu kingdoms in the Peninsula, the farm-labourers were slaves or serfs attached to the soil ; they were probably aboriginal populations who had been conquered and reduced to slavery by their conquerors—India under British Rule P 18.

মুসলমান শাসনে ভারতে দাস-ব্যবসায়।

ইহার পর মুসলমান শাসনের সূত্রপাত। ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, এই দাস-ব্যবসায়ের কথা আরও সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক হিন্দু-দাস মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, সম্রাটের অনুগ্রহে শাসনদণ্ড পরিচালন পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস সে বিষয়ে একান্ত মূক নহে। কালাপাহাড়ের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও এইরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, তিনি প্রথম জীবনে একজন সামান্য দাস মাত্র ছিলেন। তারপর মোগলশাসনেও যুদ্ধে জীত ব্যক্তিগণকে দাসরূপে ব্যবহার করিবার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তখনও যে প্রকাশ্য স্থানে মুসলমান ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, এমন কি রমণীগণ পর্য্যন্ত উচ্চদরে বিক্রীত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। Pietro della valleএর বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, এক সময়ে য়ুরোপীয় বণিকগণ মূল্য দিয়া দেশীয় রমণীগণকে ক্রয় করতঃ তাহাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন এবং তাহাদিগের সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই ভারতে আবার দাস-ব্যবসায় প্রবল হইয়া উঠে। পর্ত্তুগীজগণ ব্যবসায় উপলক্ষে ভারতের নানাস্থানে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া অবাধে এই দাস ব্যবসায় চালাইয়া ছিলেন। তাঁহারা দাস ক্রয় করিবার জন্য ভারতের নানাস্থানে ডিপো খুলিয়া নানা উপায়ে দাস-সংগ্রহ করিতেন।

হুগলীতে দাস-ব্যবসায়।

বঙ্গদেশের মধ্যে হুগলীতে তাঁহারা ব্যবসায়কেন্দ্র খুলিবার সর্ব্বপ্রথমে অনুমতি পান। এই স্থানে এই কুঠী ও দুর্গনির্ম্মাণের পর, তাঁহারা নানা অসৎ উপায়ে দাস-সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের বেতন প্রাপ্ত

কর্ম্মচারিগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সুযোগ পাইলেই ছোট ছোট বালক বালিকাগণকে প্রলোভন দেখাইয়া চুরি করিয়া আনিয়া হুগলীর কুঠীতে পেঁছাইয়া দিত। তার পর জাহাজে করিয়া তাহাদিগকে গোয়ায় চালান দেওয়া হইত, একথা আমরা ইংরাজ ঐতিহাসিকের মুখ হইতেই জানিতে পারি। নিম্নে তাঁহার উক্তি প্রদত্ত হইল :—

"The Portuguese at Hugly were base enough to deal with these villians (agents) to buy the poor wretches who had been kidnapped and to ship then to Goa, where they were sold as slaves at the daily auctions on the Exchange, together with other comodities from all parts of the world."—B. Rule.

এক সময়ে যে তাঁহাদিগের এই ব্যবসা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা গোয়ায় রক্ষিত তাঁহাদিগের কাগজ পত্র হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। পাঠকের গোচরার্থ আমরা নিম্নে তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

Monday, 1st August 1683—The trade in slaves growing great from this port, by reason of the great plenty of poor, by the sore famine and their cheapness it is ordered for the future that each slave sent off this shore pay one pagoda Custom.—Early Records of the B. Empire P. 84.

উনবিংশ শতাব্দীতে হুগলীতে দাস-ব্যবসায়।

বঙ্গদেশে এই দাস-ব্যবসায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত চলিয়া থাকিবে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে Montigny নামক একজন ফরাসী চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে চন্দননগরে দাস ব্যবসায় রহিত করেন, এই কথা আমরা Selections from the Calcutta Gazette হইতে জানিতে পারি। নিম্নে পাঠকের গোচরার্থ ঐ অংশ উদ্ধৃত হইল :—

We understand Monsieur Montigny Governor of Chandernagore, has lately issued a proclamation prohibiting all persons within the jurisdiction of the French Government from perchasing or transporting any of the natives of these Province as slaves and in order to prevent this infamous practice,

a reward of forty rupees is offered to any person who shall give information of the offender, besides the sum of ten rupees to be given to each slave who shall be released in consequence. Selections from Calcutta Gazette vol II.

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুত চারু চন্দ্র রায় এম এ মহাশয় হুগলী জেলার দাস-ব্যবসায় প্রসঙ্গে Bengal Past and Present পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গের কোন কোন স্থানে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। শ্রীযুত সত্য চরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট উনবিংশ শতাব্দীর একখানি পুরাতন দলীল আছে, তাহাতে এক ব্যক্তি আপনাকে অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া কবুলতি দিয়াছে। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও যে বঙ্গের কোন কোন স্থানে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভারতে দাসের বিশেষত্ব।

বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই দাসের প্রতি সদয় ব্যবহারের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। দাসের প্রতি নির্য্যাতন ভারতেই অপেক্ষাকৃত কম ছিল। স্মৃতিতে লিখিত আছে "যশ্চৈনাং স্বামিনং কশ্চিন্মোচয়েৎ প্রাণসংশয়াৎ। দাসত্বাৎ স বিমুচ্যেত পুত্রভাগং লভেত চ ॥" অর্থাৎ দাস সকলের মধ্যে যে প্রভুকে প্রাণসংশয়কর বিপদ হইতে মোচন করে সে দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় এবং সে পুত্রবৎ পালনীয়। মনুতেও দাসের প্রতি সদয় ব্যবহারের আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র ভারতেই দাসের প্রতি সদয় ব্যবহারের আদেশ এবং তাহাকে পরিবার ও সমাজের অন্তর্ভূত করিয়া লইবার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র ভারতেই দাস সমাজের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

দাস-ব্যবসায়ের লোপ।

ইংরাজগণের চেষ্টায় ভারত হইতে দাস-ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে। ভগবানের সৃষ্ট ভ্রাতা ভগিনীকে এইরূপ হীন চক্ষে দেখা যে নিতান্তই পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা সমগ্র মানব জাতির বন্ধু, তাঁহারা ঈশ্বরের একটি প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

প্রভাত-স্বপ্ন।

(গল্প)

(১)

বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়া অনেকগুলি সংস্কারের অধিকারী হইয়াছি। যথা—যাত্রাকালে হাঁচি টিক্‌টিকি পড়িলে আর যাইতে নাই; বচন,— "হাচি টিক্‌টিকির বাধা, যে না মানে সে গাধা।" ধোপার মুখ, কলুর মুখের গুণাগুণও জানা আছে। "খালির চেয়ে ভর্ত্তি ভাল, যদি ভর্ত্তে যায়" 'বাঁয়ের চেয়ে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায়." "আগু চেয়ে পাছু ভাল যদি ডাকে মায়." "যদি পাও রাজ্য দেশ, তবু না যাবে বৃহস্পতির শেষ," "মঘা এড়াবি ক ঘা?" প্রভৃতিও অবিদিত নাই। সাপের স্বপ্ন দেখিলে বংশ বৃদ্ধি হয়; মহিষের স্বপ্ন দেখিলে মৃত্যু হয় প্রভৃতি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার আছে যে প্রভাতের স্বপ্ন দেখিলে এবং তারপর আর না ঘুমাইলে সে স্বপ্ন সফল হয়। বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাকে ইহার অধিক উদাহরণ দেওয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। একটু লেখা পড়া শিখিলে নিজেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া পরিচয় দিতে প্রায় সকলেই লজ্জা বোধ করেন এবং এইরূপ সকল সংস্কার হইতে মুক্ত বলিয়া লোকের নিকট একটু গর্ব্বও করিয়া থাকেন—তবু মনের খট্‌কা মরে না। যাত্রাকালে যদি পূর্ব্বোক্তরূপ কোন প্রকার বাধা পড়ে, তখন যদিও সে সমস্ত না মানিয়া বীরদর্পে বাহির হইয়া পড়া যায়, তবু মনে মনে হয় "একবার বসিয়া গেলেই ভাল হইত।" বাঙ্গালীর এ জন্মগত সংস্কার ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ঘুরিয়া আসিলেও থাকিয়া যায়। এ এমনি মজার জিনিষ।

আমিও এম, এ, পাশ করিয়াছি তত্রাপি ভূত না মানিয়াও ভুতের ভয় বা ঐ সমস্ত সংস্কার না মানিয়াও তাহার খট্‌কা মন হইতে চেষ্টা সত্ত্বেও দূর করিতে পারি নাই।

(২)

আমার বাসার একটু দূরেই ব্রাহ্ম-সমাজ। প্রতি রবিবারে ব্রাহ্মগণ তথায় সপরিবারে আসিয়া উপাসনা করিতেন। আমি যদিও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী তত্রাপি হিন্দু-সমাজের বাহিরে ছিলাম বলিয়া হিন্দু সমাজের কোন তোয়াক্কা রাখিতাম না। অবাধে সকলের সহিত একত্রে পানাহার

করিতাম এবং সকলের সহিত সমভাবে চলিবার চেষ্টা করিতাম। সমাজে গিয়া চোক বুজিয়া বসিয়া থাকিতাম, মাঝে মাঝে মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া কে কেমন ভাবে উপাসনা করিতেছেন দেখিয়া লইতাম—বিশেষ করিয়া দেখিতাম মিস্ রায়কে, যাঁহার প্রতি আমার কিছু অতিরিক্ত রকম শ্রদ্ধা।

মিস্ রায় শিশির রায়ের ভগ্নি। শিশির রায় আমাদেরই একজন ডেপুটী এবং বন্ধু, সুতরাং তাঁহার বাটীতে আমার এবং অনেকের বিশেষ-রূপ যাতায়াত ছিল। সেই যাতায়াত সূত্রেই শুধু শিশিরের সহিত নহে, এই পরিবারের সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। প্রত্যহ তাঁহার বাসায় সন্ধ্যার পর একটী সঙ্গীতের বৈঠক বসিত। আমি সঙ্গীত-শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও এই বৈঠকে একদিনের জন্যও অনুপস্থিত হই নাই। কেহ গাহিত, কেহ বাজাইত, আমি কেবল সমজদার শ্রোতার ন্যায় ঘাড় নাড়িয়া যাইতাম। সেই বৈঠকের এই কার্য্যটার ভার বিশেষভাবেই আমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম—এ বিষয়ে আমার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। হায়! অন্যান্য বিষয়েও যদি তাহাই হইত!

মিস্ রায় গান শেষ করিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন "মিঃ মিত্র, গানটা ভাল লাগিল ত?" আমি রাগ রাগিনী এবং তাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও, গীতটার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা জুড়িয়া দিতাম, কিন্তু সে সমালোচনার শেষ না শুনিয়াই মিস্ রায় আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে অন্য গান আরম্ভ করিতেন। আমি আমার সমালোচনায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া যদিও বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতাম, তথাপি তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ রকম শ্রদ্ধার জোরে মনে করিতাম—নিজের প্রশংসা শুনিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমার সমালোচনা শেষ হইবার আগেই মিস্ রায় গান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাছে আমি এই বাধা প্রাপ্তির জন্য কোন রূপ অপমান বোধ করি, সেই জন্য আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে গান আরম্ভ করিলেন। তখন কি জানিতাম যে আমি তাঁহার নিকট অতি নগন্য ছিলাম। বাধা-প্রাপ্তির অপমান ভুলিয়া গিয়া আমি তাঁহার সেই চাহনি, সেই হাসি, সেই গান গাহিবার বিশেষ ভঙ্গিটী তন্ময় হইয়া দেখিতাম। তখন যদি আমার মাথায় একটা আস্ত কড়ি কাঠও খসিয়া পড়িত, বোধ হয় আমার সান হইত না।

ঘোষ, ব্যানার্জ্জি, দত্ত, দে প্রভৃতি অনেকেই এই সভার নিয়মিত

সভ্য ছিলেন। তন্মধ্যে মিঃ ঘোষকে আমি তেমন সুনজরে দেখিতাম না। লোকটা অতিরিক্ত রকম গায়ে-পড়া। মিস্ রায় যদিও তাহার প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে গান করিতেন না, বা গীত সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন না, তবু সে গায়ে পড়িয়া "lovely, nice" (সুন্দর—অতি সুন্দর) প্রভৃতি এককথার সমালোচনা করিত এবং একেবারে গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইত, কখনও বা অবলীলাক্রমে কাঁধেও হাত দিত। মিস্ রায় তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না—ঘোষও সে অপমান আদৌ গ্রাহ্য করিত না। লোকটার অপমান-জ্ঞান ছিল না বলিলেই হয়। সজীবতার যেন প্রতিমূর্ত্তি, চট্‌পটে বক্তা—তখনই এখান সেখান করিতেছে, তখনই কোন একটী বিষয়ে জোরের সহিত মতামত প্রকাশ করিতেছে, কিছু বলিবার আবশ্যক হইলে মিস্ রায়কে গান বন্ধ করিতে আদেশ করিয়া, নিজের কথাটা আগে বলিয়া লইতেছে—যেন তাহার জন্যই সব, সে কাহারও জন্য নহে। আমি তাহার সহিত খুব অল্পই কথা কহিতাম—তবে প্রকাশ্য অসদ্ভাব কিছু ছিলনা।

আমার ইচ্ছা করিত আমিও ঐ ঘোষটার মত সঙ্কোচ-শূন্য হই, কিন্তু আজন্ম হিন্দু সংসারের লজ্জাশীলতার মধ্যে পালিত হইয়া কোন মতেই তাহা পারিয়া উঠিতাম না। যত পারিতাম না ততই ঘোষের উপর রাগ হইত।

(৩)

মিস্ রায়ের জ্যেষ্ঠা ভগ্নির বিবাহের আর দুই চার দিন বাকী। ঘর দুয়ার সাজাইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এখানে পাতা, ওখানে ফুল, সেখানে ছবি প্রভৃতি দ্বারা ঘর সাজান হইতেছে। মিস্ রায় এবং অন্যান্য সকলে স্বহস্তেই এই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন—চাকর বাকরের সাজানো পছন্দ হইতেছে না। মিস্ রায় একটী পাতার বৃত্ত রচনা করিতেছিলেন এবং মিঃ ঘোষ তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উপকরণ জোগাইতেছিল। যখন ফুল দরকার, ঘোষ তখনই ফুল হাতে হাজির, যখন যে পাতা দরকার তখনই ঘোষ সেই পাতা হাতে হাজির, যেন মিস্ রায়ের মনের কথা পাঠ করিয়া যখন যেটী চায় তখনই সেইটী হাতে তুলিয়া আছে। এমন সময় আমি সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইবামাত্র ঘোষ তাহার চার্জ্জ আমাকে বুঝাইয়া দিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল—ডেপুটীগিরির চার্জ্জ

নহে, ফুল জোগান দেওয়ার চার্জ্জ। পদে পদে আমার ভুল হইতে লাগিল—মিস্ রায়ের যখন ফুলের দরকার, তখন হয়ত পাতা তুলিয়া ধরি এবং যখন পাতার দরকার তখন হয়ত ফুল তুলিয়া ধরি; আর বারম্বার এই ভুলের জন্য মিস্ রায়ের কলহাস্য কক্ষ মুখরিত করিয়া দেয়। আমি অপ্রস্তুত হইয়া ভুলসংশোধন করিতে গিয়া, তাড়াতাড়িতে আর একটা ভুল করিয়া বসি।

বৃত্ত-রচনা শেষ হইয়া একটী ফুল বাঁচিল; মিস্ রায় মৃদু হাসিয়া আমার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ আমার বুকে সেটী গুঁজিয়া দিলেন। ঘোষ তখন সেই কক্ষ দিয়া অপর এক কক্ষে যাইতেছিল; বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে তাহার বুকে পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ কোন ফুল গোঁজা নাই। আমার এমন এক-চেটিয়া সৌভাগ্যটী পাকে প্রকারে ঘোষকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। সিগারেট চাহিবার অছিলায় তাহাকে ডাকিলাম এবং নিকটে আসিলে তাহার দিকে ফিরিয়া, বুক চিতাইয়া তাহার নিকট হইতে সিগারেট লইলাম। ঘোষেরও ফুলটীর উপর নজর পড়িল—বলিল "Miss Ray, the thief has stolon one of your flowers He should be punished under section 379 I ,P C, (কুমারী রায়! চোরে আপনার একটি ফুল চুরি করিয়াছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারা অনুসারে তাহার শাস্তি হওয়া উচিত।) মিস্ রায় হাসিয়া উত্তর করিল "No, No, he had got it from me as a present for his kind assistance" (না, না, তিনি আমাকে সাহায্য করার বিনিময়ে আমার নিকট উপহার স্বরূপ পাইয়াছেন।)

ঘোষ ভ্রূদ্বয় উত্তোলন করিয়া কহিল "Oh ! is it so ? I envy you, lucky man." (ওঃ, তাই নাকি, ভাগ্যবান্ আমার যে আপনার উপর হিংসা হইতেছে)

মিস্ রায়ের উপহার প্রাপ্ত হইয়া এবং সেই সৌভাগ্য-বার্ত্তায় ঘোষের হিংসা উৎপাদন করিয়া, আনন্দমনে বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

(৪)

ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—যেন মিস্ রায়ের সহিত আমার মালা বদল হইতেছে—এবং মিঃ ঘোষ দূরে দাঁড়াইয়া ঈর্ষাপূর্ণ নয়নে সেই দৃশ্য দেখিতেছে।

মিস্ রায়ের জ্যেষ্ঠা ভগ্নির যেন বিবাহ নয়, বিবাহ যেন মিস্ রায়েরই। আলোক, সঙ্গীত, সুগন্ধ এবং হাস্যে গৃহ মুখরিত, কেবল মুখর ঘোষ আজ চুপ।

নব বধূবেশের ঔজ্জ্বল্যে মিস্ রায়ের সৌন্দর্য্য যেন দ্বিগুণিত হইয়াছে। নয়ন দিয়া সেই সৌন্দর্য্য পান করিতেছি, এমন সময় মিস্ রায় নীচুস্বরে আমাকে বলিলেন, "কাল তোমার বুকে যখন ফুল গুঁজিয়া দিয়াছিলাম, তখনও কি বুঝিতে পারিয়াছিলে যে আমি ফুলের সঙ্গে কতটা ভালবাসা তোমাকে দিয়াছিলাম?" আমি একগাল আনন্দের হাসি হাসিয়া ফেলিলাম।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চোক চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে। শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। নিদ্রাভঙ্গের পর হইতেই দারুণ উদ্বেগ আমার হৃদয় অধিকার করিল। একবার মনে হইতে লাগিল যে ইহাও কি কখন সম্ভব? Dreams are without foundation. (স্বপ্ন সকল অমূলক) পরক্ষণেই মনে হইতে লাগিল বাস্তব ঘটনার সহিত যখন এই স্বপ্নের এত সৌসাদৃশ রহিয়াছে—বিশেষতঃ ইহা যখন প্রভাতের স্বপ্ন, তখন বোধ হয় বিধাতা আমার বিপত্নীক জীবনের ভাবী সুখের পূর্ব্বাভাষ এই প্রভাত স্বপ্নের দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং আমাকে প্রস্তুত হইতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। নতুবা সমস্ত রাত্রি পার করিয়া ঠিক প্রভাতেই এমন স্বপ্ন দেখিব কেন? বিশেষতঃ এরূপ ঘটনা ঘটাও একেবারে অসম্ভব নয়।

যাহা হউক নিয়মিত ভাবে কাছারি গেলাম, কাছারী হইতে বাটী আসিলাম, আহার করিলাম; কিন্তু ঐ প্রভাতস্বপ্নের মোহ কাটিল না। একটী প্রেমের পুলক যেন সারাটাদিন আমাকে ঘিরিয়া রহিল। নিয়মিত কার্য্য যেন কলের মত করিলাম। কিন্তু কি কি করিলাম— কেহ জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই তাহার সঠিক হিসাব দিতে পারিতাম না।

সন্ধ্যার সময় উপযুক্ত বেশ ভূষা করিয়া, বুকে সেই বাসি ফুলটী গুঁজিয়া রায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ঘোষ আমার পূর্ব্বেই তথায় হাজির হইয়া গানে, রসিকতায় আসর মাতাইয়া তুলিয়াছে। ঘোষ গাহিতেছিল "সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি।" মিস্ রায়ের গৃহে তাহার এই মমত্ব আরোপ আমার আদৌ পছন্দ হইল না। আমি একটু রসিকতার সুরে কহিলাম "Better say— বরং বলুন) সুন্দর রায়-গৃহে।" ঘোষ একটু মৃদু হাসিয়া, সেইরূপ সংশোধন করিয়াই গাহিতে লাগিল। স্বরের

মনোহারীত্বে সে সকলকে মুগ্ধ করিল এবং সকলের অবিসম্বাদিত প্রশংসা কুড়াইতে লাগিল—ভদ্রতার খাতিরেও আমি ঘোষের প্রশংসায় যোগ দিতে পারিলাম না!

স্বপ্নের মোহ আমার এখনও কাটে নাই; আজ মিস্ রায়ের গৃহ এবং মিস্ রায়কে যেন বেশী করিয়া আমার বোধ হইতেছিল—যেন ঐ প্রভাত স্বপ্নের জোরে মিস্ রায়ের উপর, তাহার বাটীর উপর আমার কেমন একটী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। চাকর বাকরকে আজ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোরের সহিত হুকুম করিতে লাগিলাম, নিজেকে রায় পরিবারের আপনার লোক ভাবিয়া আগন্তুকগণকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল—যদি গাহিতে পারিতাম তবে 'সুন্দর মম গৃহে' গানটী আজ আমারই গেয় ছিল।

ঘরটা ক্রমে পাতলা হইয়া গিয়াছিল, দুই চারি জন দূরে ব্রিজ খেলিতেছিল এবং কদাচিৎ দুই একজন সেই কক্ষ দিয়া কক্ষান্তরে গমনাগমন করিতেছিল।

মিস্ রায় আনন্দের ঝোঁকে তন্ময় হইয়া তখনও গানের জের চালাইতেছিলেন—শ্রোতা একমাত্র আমি। আমার মনে হইতে লাগিল—আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই তিনি এখনও গাহিয়া চলিয়াছেন। তাই ভদ্রতা করিয়া বলিলাম "তুমি—আপনি, বোধ হয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—এখন একটু বিশ্রাম করিলে ভাল হয়।

কথার আওয়াজে মিস্ রায়ের তন্ময়ত্ব ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিলেন শ্রোতা আমি ব্যতীত আর কেহই নাই; গান বন্ধ করিয়া টুল ছাড়িয়া উঠিলেন। চলিয়া যায় দেখিয়া এবং কক্ষ এমন জনশূন্য আর পাওয়া না যাইতেও পারে ভাবিয়া, আমি প্রেম-গদগদস্বরে ডাকিলাম "মিস্ রায়।" মিস্ রায় যেন এতক্ষণ পরে আমাকে লক্ষ্য করিলেন, আমার পানে ভাল করিয়া চাহিতেই সেই শুষ্ক ফুলটীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিলেন "কালিফার সেই ফুলটা নাকি?

"হাঁ। দুঃখের বিষয় ফুল চিরকাল তাজা থাকে না, নতুবা চিরকাল এই ফুল এমনি করিয়াই বুকে ধারণ করিতাম। আজ এই শুভদিনে ফুল অপেক্ষা স্থায়ী একটী জিনিষ আপনাকে উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করি"—বলিতে বলিতে অঙ্গুলি হইতে "Rememberme" (আমায় মনে রাখিও) লেখা একটী অঙ্গুরী খুলিয়া, সাহস সঞ্চয় করিয়া তাঁহার অঙ্গুলিতে পরাইতে গেলাম।

ভ্রুকুটীর সহিত মিস্ রায় উত্তর করিল "আপনি কি জানেন না যে আমি engaged ? (বাগ্ দত্তা) আংটী উপহার লইবার অধিকার আমার নাই।"

"Engaged !", (বাগ্ দত্তা) দুইহাত পিছাইয়া গেলাম। সত্য হইলেও, কথাটার সত্যতা যেন চট্ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। প্রশ্ন করিলাম "কাহার সহিত জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

"With Mr. Ghosh", (মিষ্টার ঘোষের সহিত) বলিয়াই মিস্ রায় গট্ গট্ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

"Mr. Ghosh" (মিষ্টার ঘোষ !) মনের অবস্থাটা যে কি হইল তাহা গুছাইয়া, বুঝাইয়া বলিতে পারি না। একেত মিস্ রায়ের প্রত্যাখ্যান, তার পর আবার সেই হতভাগা ঘোষটার সহিত engaged, (বাগ্দত্তা) বলিয়া ?"

হা মা ধনা ! তোমার বচন গুলি কি এমনিই অসার ? কেন মা হতভাগ্য বাঙ্গালী সন্তানকে প্রতারণা করিবার জন্য তোমার পাণ্ডিত্য ফলাইয়াছিলে ?

প্রভাত স্বপ্নের মোহ ভাঙ্গিল। অতিরিক্ত রকম লজ্জিত হইয়া বিবাহ সভা হইতে গোপনে সরিয়া পড়িলাম।

শ্রীনির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়
লাভপুর।

ভাগবত ধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে পরদেবতা বা পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি 'পরমার্থ সত্য'। পরমার্থ সত্য বলিলে কি বুঝিতে হইবে তাহা অবশ্য আমরা জানিনা ; আমরা সংসারে ব্যবহারিক সত্য লইয়া খেলা করিতেছি। আজ যাহা সত্য, মঙ্গলকর ও প্রিয় বলিয়া মনে করিতেছি, কাল বুঝিতেছি তাহা সত্য নহে, শুভকর নহে এবং তাহার প্রতি যে আসক্তি বা অনুরাগ তাহাও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই প্রকারে জীবনের পথে যতই অগ্রসর হইতেছি ততই নূতন নূতন বস্তু ও বিষয় সত্য, শুভকর ও প্রিয়রূপে আমাদের পুরোদেশে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে কামনাযুক্ত ও কর্ম্মশীল করিতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরমার্থ সত্য যে কি তাহা আমরা জানিনা, আর একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে একেবারে জানিনা তাহাও নহে। একটি বস্তুকে যখন 'সত্য' বলিয়া অনুভব করি, তাহার অন্বেষণে

যখন আমাদের সমুদয় ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানকে নিয়োগ করি—তখন সেই বস্তুকে আমি 'পরমার্থ সত্য' বলিয়াই মনে করিতেছি। কিছু দিন এই প্রকারের ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া থাকি, তাহার পর অবশ্য। সেই বস্তুটি আয়ত্ত বা ভুক্ত হইলে পর জানিতে পারি যে ইহা পরমার্থ সত্য নহে, বস্তুটির প্রতি হৃদয়ের যে অকৃতিম ভালবাসা ঢালিয়া দিতেছিলাম সেই ভালবাসার স্রোত শুকাইয়া যায়। এই প্রকারে আমরা জীবন-পথে পর্য্যটন করিতেছি। দুই একশত বা দুই এক সহস্র বৎসরব্যাপী এই পর্য্যটন নহে, বহু জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে ক্রমবিকাশ লাভ করিতে করিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি। জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক সেই পরমার্থ সত্য আমাদের মধ্যে 'গময়িতা' রূপে এবং আমাদের পুরোদেশে আদর্শ বা 'গম্য' রূপে রহিয়াছেন। সুতরাং সত্য কথা এই যে না জানিয়াও আমরা তাঁহাকে জানি, অথবা জানি এবং জানি না। ইহাই ভগবানের স্বরূপ লক্ষণ, এই লক্ষণেই মানবজীবনের সমস্ততত্ত্ব এবং সাধনার সমস্ত রহস্য রহিয়াছে।

এই পরমার্থ সত্যের উপলব্ধি সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা হইয়াছে যে আমরা আমাদের স্বরূপের দিকে যতই অগ্রসর হইব, তাঁহার স্বরূপ আমাদের নিকট ততই প্রকাশিত হইবে। আমরা তো এখন আমাদের স্বরূপে নাই। আমরা দেহের অধীন, ইন্দ্রিয়ের অধীন, প্রাণও মনের অধীন আমরা "প্রাকৃত মদনের" উপাসক, এই কারণেই, 'অপ্রাকৃত নবীন মদনের' প্রেমলীলা দর্শনে আমরা বঞ্চিত এবং নানা ক্লেশে মুহ্যমান। আমরা যে পরিমাণে এই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব, সেই পরিমাণেই ভগবানের স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে "দ্বিভুজ মুরলীধর, নব নটবর, শ্রীনন্দ নন্দন" রূপে বৃন্দাবনে যে শ্রীভগবানের প্রকাশ, তাহা তাঁহার স্বরূপ। কিন্তু এই স্বরূপ সকলে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কারণ সকলে ইহা উপলব্ধি করার অধিকারী নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকের মর্ম্ম আস্বাদন করিলে এই রহস্যটুকু অতি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরোমূর্ত্তিমান্।

গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।

মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড় বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০ম স্ব ৪৩অ ১৪শ শ্লোক।

অক্রূর শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া মথুরাপতি কংসের আদেশ মত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে মথুরায় লইয়া আসিয়াছেন। মহারাজ কংস এক মল্লক্রীড়া মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মল্লপুরুষেরা সকলে রঙ্গস্থানে উপস্থিত। তুর্য্য ও ভেরীর ধ্বনি হইতেছে—চারিদিকে অসংখ্য মঞ্চ (Gallery) প্রস্তুত হইয়াছে মাল্য, পতাকা ও পট্টবসনে চারিদিক অলঙ্কৃত। মল্লযুদ্ধ মহোৎসব দর্শনের জন্য বহু দূর দুরান্ত হইতে অনেক লোক আসিয়াছে। পুর ও জনপদবাসী, সকল জাতীয় দর্শকগণ মঞ্চের উপর বসিয়াছেন, অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া কংস আসিলেন ও রাজমঞ্চোপরি বসিলেন। নন্দ প্রভৃতি গোপগণও আসিয়াছেন, তাঁহারাও সভার একপার্শ্বে স্থান পাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রঙ্গস্থানে আসিতেছেন। কংস তাঁহাদের বধ করিবার জন্য নানারূপ চক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। রঙ্গস্থলের দ্বারদেশেই কুবলয়াপীড় নামক এক প্রকাণ্ড হস্তী—হস্তীপালক হস্তীকে ক্রুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ নিষেধ করিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি কংসের অনুচর, সে ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ আচরণ করিতেছে সুতরাং সে নিষেধ শুনিল না। ফলে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে একটু কৌতুকের সহিত ক্রীড়া করিয়া পরে অবলীলাক্রমে সেই হস্তীর দন্ত উৎপাটন করিয়া সেই দন্তের সাহায্যে হস্তী ও হস্তীপালককে বিনাশ করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ের হস্তে এক একটি হস্তি-দন্ত, বদনকমলে স্বেদবিন্দু, হস্তীর শোণিতবিন্দুও মধ্যে মধ্যে দীপ্যমান, সঙ্গে কয়েকজন গোপবালক, এইরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। রঙ্গস্থলে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোক—পুরুষ ও নারী, সকলেই বিস্মিত ও অনিমেষ নয়নে এই উভয় ভ্রাতাকে দর্শন করিতেছেন। কে কিরূপে দেখিতেছেন—পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটি তাহারই বর্ণনা। শ্লোকটির অর্থ এইঃ—

“মল্লানামশনিঃ” পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল শরীরসম্পন্ন চানূর প্রভৃতি, মল্লগণ যাঁহারা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রঙ্গস্থলে আসিয়াছিল. ও দম্ভের সহিত বুক ফুলাইয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা ভীত চকিত নেত্রে তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছে, সর্ব্বনাশ! একেবারে বজ্রসার

দিয়া বিধাতা যেন এই বালক দুইটিকে নির্ম্মাণ করিয়াছে! ইহারা যদি দু একটি কিল মারে তাহা হইলে আমাদের মত শত শত মল্ল ধূলা হইয়া উড়িয়া যাইবে। তাহাদের আর সাহস হইতেছে না। প্রত্যেকেই অপরকে বলিতেছে, তুমি আগাইয়া যাইয়া যুদ্ধ কর, আমি পারিব না। কি আশ্চর্য্য! এই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অঙ্গ অতি সুকুমার, অতি সুশীতল ও স্পর্শে সুমধুর! ব্রজদেবীগণ তাহার কোমল চরণ যুগলের বিষয় চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন—

"চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন,
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিল তৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥"

"হে কান্ত! যখন তুমি পশুচারণ করিতে করিতে ব্রজ হইতে যাও, তখন আমরা ভাবি, তোমার চরণ পদ্মের মত কোমল, আহা শস্যমঞ্জরী তৃণ ও অঙ্কুরে তাহা ক্লেশ পাইতেছে—এই ভাবনায় আমাদের মন অতিশয় ব্যাকুল হয়।"

মল্লগণ দেখিতেছেন 'অশনি', আর সেই একই সময়ে যুবতীগণ দেখিতেছেন যে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবতা যে মদন, তিনি মূর্ত্তিধারণ করিয়া আসিয়াছেন। "গোপানাং স্বজনঃ" বৃন্দাবন হইতে যে সব গোপ আসিয়াছেন, তাহাদের রাজদরবারে তেমন সম্মান নাই তাহারা একপাশে বসিয়া আছে—তাহারা যখন দেখিতেছে যে তাহাদেরই কৃষ্ণ, আর তাহাদেরই বলরাম, অথচ এই মথুরার রাজসভার সহস্র সহস্র লোকের অনিমেষ একাগ্র দৃষ্টি বিস্ময়ে তাহাদের উপর নিবদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহাদের আর আনন্দের সীমা নাই। আনন্দে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। তাহারা অপরের নিকট বলিতেছে "আমাদের কৃষ্ণ" "আমাদের বলরাম;" আর "আমাদের" এই কথাটি বলিবার সময় তাহাদের হৃদয়ে এমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হইতেছে যে সে আনন্দ সাগরের এক বিন্দুর নিকট ব্রহ্মানন্দও অতি অকিঞ্চিৎকর।

"অসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা" অনেক প্রজাপীড়ক দুষ্ট রাজা অনেক অন্যায়াচরণ করিয়া এখন ভাল মানুষের মত পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া সভাস্থলে আসিয়াছে, তাহারা দেখিতেবে "শাস্তা"; ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া

যেন তাহাদের পানে চাহিয়া নীরব ভাষায় তাহাদিগকে যাবতীয় দুস্কর্ম্ম মনে পাড়াইয়া দিতেছেন ও বলিতেছেন, আজ আর নিস্তার নাই যাবতীয় কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত দণ্ড শীঘ্রই বিহিত হইবে।

"স্বপিত্রোঃ শিশুঃ" বসুদেব ও দেবকী সভার একপার্শ্বে বসিয়া আছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন দুইটি অতি কোমলমূর্ত্তি শিশু! তাঁহাদের হৃদয়ে স্নেহরস উথলিয়া উঠিতেছে, তাঁহারা ভাবিতেছেন আহা এই ছেলে দুটিকে যদি পাই, পুত্রের মত বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়া জীবন সফল করি।

"মৃত্যুর্ভোজপতেঃ" ভোজপতি যে কংস, তিনি দেখিতেছেন আজ তাঁহার কালান্তক যম আসিয়াছে! গত রাত্রিতে তিনি যে সকল দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন,—মৃতব্যক্তিকে আলিঙ্গন, গর্দ্দভারোহণে গমন, মৃণালভক্ষণ প্রভৃতি, সেই সমস্ত দুঃস্বপ্ন সফল হইল মৃত্যু অনিবার্য্য, ভয়ে তাঁহার ঘন ঘন হৃৎকম্প হইতেছে।

"অবিদুষাং বিরাট্" যাহারা অবিদ্বান, কংসের পুরোহিত প্রভৃতি, তাঁহারা দেখিতেছেন—বীভৎস বিরাট মূর্ত্তি অথবা ব্যষ্টি বা প্রাকৃত মনুষ্য।

"তত্ত্বং পরং যোগিনাং" যাঁহারা যোগী, অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতির পথ ধরিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাযোগে সেই পরমার্থ সত্যের অন্বেষণ করিয়াছেন,তাঁহারা ভাবিতেছেন তাঁহাদের সমস্ত তপস্যা ক্লেশ আজ সফল হইল, জীবনও আজ সফল, আজ সেই পরমার্থতত্ত্ব মূর্ত্তিধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। যদুবংশীয়গণ দেখিতেছেন তাঁহাদের কুলদেবতা অথবা তাঁহাদের উপাস্য পরমেশ্বর।

এইবার প্রাচীন টীকাকারগণ এই শ্লোকটির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আলোচনা করা যাউক শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন ভগবান শৃঙ্গার প্রভৃতি সর্ব্বরস-কদম্ব-মূর্ত্তি,রঙ্গস্থলে যাঁহারা দর্শকরূপে সমাগত হইয়াছেনতাঁহারা দশ প্রকারের লোক, তাই ভগবান ও দশপ্রকারে বিদিত হইলেন। (ভগবান এখানে অগ্রজের সহিত আসিয়াছেন, শ্রীধরস্বামী এই কথাটুকু স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, এই ইঙ্গিতের একটি বিশেষ অভিপ্রায় আছে তাহা পরে বলিব): এই যে দশভাব, এই দশভাবকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের দশবিধ রস প্রকটিত হইল। শ্রীধরস্বামীর মতে এই রসগুলির

যথাক্রমে এইরূপ নাম—রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, দয়া, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত, প্রেমভক্তি। এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণকে আবার মোটামুটি চারিভাগে বিভক্ত করা যায়. প্রতিকূলজ্ঞানাঃ, অজ্ঞানাঃ, সজ্ঞানাঃ, অনুকূলজ্ঞানাঃ। এই বিভাগ শ্রীবৈষ্ণবতোষিণী টীকায় করা হইয়াছে। যাহার জিহ্বা পিত্তাধিক্যব্যাধি-প্রযুক্ত দূষিত হইয়াছে সে ব্যক্তি যেমন মিষ্টবস্তুতেও তিক্ত আস্বাদ পায় পরমসুখবিগ্রহ ভগবানের উপলব্ধি, দুঃখ বা ভয় প্রাপ্তিও সেইরূপ।

এই শ্লোকটির মর্ম্মগ্রহণ করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ভগবানের উপলব্ধি উপলব্ধিকারীর অধিকার অনুসারেই হইয়া থাকে। বৈষ্ণব সাধনায় ভাগবতধর্ম্মের সমগ্র রহস্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিত পাইব যে ভগবানের স্বরূপ কেবলমাত্র একস্থানে নিত্য প্রকাশিত। তাহা শ্রীমতী রাধিকার নিকট—শ্রীরাধিকার ভাবদর্পণে তাঁহার স্বরূপ অন্যরূপে প্রতিবিম্বিত হইবার উপায় নাই। ব্রজগোপীগণও সেই স্বরূপের সেবার ও উপলব্ধির অধিকারিণী সত্য. কিন্তু সকল সময়ে নহে। তাঁহারা যে সময়ে শ্রীমতী রাধিকার নিকটে তাঁহার সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে বিরাজমান কেবল সেই সময়ে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। নতুবা অন্যসময়ে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহারাও বঞ্চিতা হয়েন। এ বিষয়ে শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিগ্রন্থে একটি সুন্দর শ্লোক আছে

"রাসারম্ভবিধৌ নিলীয়বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ—
দৃষ্টং গোপয়িতুং সমুদ্ধরধিয়া যা সুষ্ঠুসন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা॥"

"রাসস্যারম্ভবিধৌ কুঞ্জে নিলীয় নিহ্নূত্য বসতা সা কৃষ্ণেন মৃগাক্ষী-গণৈরিতি তাসাং দৃষ্টিপথং বঞ্চয়িতুমশক্যমিতি ভাবঃ। গোপীগণৈর্দৃষ্টমাত্মানং গোপয়িতুং সমুদ্ধুরধিয়া ব্যাকুলচেতসা সতা যা চতুর্ব্বাহুতা সুষ্ঠু যথা স্যাত্তথা সন্দর্শিতা। হন্ত আশ্চর্য্যে রাধায়াঃ প্রণয়স্য প্রেম্ণো মহিমা দৃশ্যতামিতি শেষঃ। যস্য প্রণয়স্য শ্রিয়া প্রভাবসম্পত্ত্যা প্রভবিষ্ণুনাপি প্রভবনশীলেনপি হরিণা সা চতুর্ব্বাহুতা রক্ষিতুং ন শক্যাসীদিতি]॥

ইহার অর্থ এই শ্রীকৃষ্ণ কোন সময়ে গোবর্দ্ধনগিরির উপত্যকাপ্রদেশে পরাসৌলী নাম্নী রাসস্থলীতে রাসলীলা আরম্ভ করেন। রাসলীলার প্রথমকার্য্য

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান। তিনি অন্তর্হিত হইয়া নিকটবর্ত্তী এককুঞ্জে গুপ্তভাবে লুক্কায়িত হন। এদিকে মৃগাক্ষী গোপকন্যাগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে থাকেন। গোপীরা কুঞ্জের চারিদিকে আসিয়া পড়িয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন আর পলায়নের উপায় নাই। তিনি অকস্মাৎ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। গোপিকারা চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন, ইনি তো গোপরাজ-তনয় নহেন, ইনি চতুর্ভুজধারী নারায়ণ। এই মনে করিয়া তাঁহারা সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন ও চলিয়া গেলেন। এইবার শ্রীমতী রাধিকা আসিতেছেন। রাধিকার মহিমা অতি বিচিত্র। শ্রীহরি প্রভবিষ্ণু হইলেও রাধিকার সম্মুখে চতুর্ব্বাহুমূর্ত্তি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলেন না—তাঁহাকে বাধ্য হইয়া দ্বিভূজ মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইল।

রাধাতত্ত্ব কি ভাবে বুঝিতে হইবে তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। এস্থলে মনে রাখিবার কথা এই, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধিকার নিকট আপনার স্বরূপ লুকাইতে পারেন না। স্বরূপ লুক্কায়িত করাই তাঁহার ক্রীড়া—অনন্তকাল তিনি এই ক্রীড়া করিতেছেন। এ বিষয়ে বৈষ্ণবশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অন্যস্থান হইতে আলোচনা করিলে বিষয়টি বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীমৎ পূজ্যপাদ রূপগোস্বামীকৃত শ্রীলঘুভাগবতামৃতগ্রন্থে ভক্তদিগের একটি পর্য্যায় দেওয়া হইয়াছে, তাহা এইরূপ। মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, দালভ্য, পরাশর, ভীষ্ম, এবং নারদাদি ভগবানের ভক্ত। এই সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। এই প্রহ্লাদ অপেক্ষা পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবগণ অপেক্ষা কতিপয় যাদব শ্রেষ্ঠ। সমস্ত যাদব অপেক্ষা শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, উদ্ধব অপেক্ষা ব্রজ-দেবীগণ শ্রেষ্ঠা। আবার এই সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা শ্রেষ্ঠা, এই ভক্তপর্য্যায়।

ভগবানেরও প্রকাশের ভেদ বর্ণনা করা হইয়াছে। ভক্তের অধিকারানু-যায়ী তাঁহার প্রকাশ হইয়া থাকে। এইবার একটি ত্রিভুজ কল্পনা করা যাউক। ত্রিভুজের বাহু দুইটি ভূমির উপর দূরবর্ত্তী, কিন্তু বাহুদুইটি যতই শীর্ষবিন্দু বা vertex এর দিকে যাইতেছে ততই কাছাকাছি হইতেছে, শেষে এক বিন্দুতে যাইয়া দুই বাহুই একত্রে মিলিত হইল। এইবার এই ত্রিভুজের এক বাহুতে মার্কণ্ডেয়, প্রহ্লাদ, পাণ্ডব, যাদব, উদ্ধব, ব্রজদেবী ও শ্রীমতী রাধিকা, এই

ক্রমে ভক্তগণকে সাজাইয়া যাওয়া যাউক—আর ভগবানের প্রকাশ গুলি-কেও ক্রমে সাজাইয়া যাওয়া যাউক—শেষ বিন্দুতে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। এই রাধাকৃষ্ণের মিলনই ভাগবতধর্ম্মের শেষ রহস্য। রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের উপলব্ধিতে আসিয়াই ভক্তিসাধনার সমস্ত ইতিহাস শেষ সফলতা লাভ করিয়াছে। লীলাতত্ত্বের ইহাই যেন শেষ উত্তর। এই তত্ত্বটুকু বুঝিতে পারিলে আমরা লীলাতত্ত্বের সমস্ত কথা বুঝিতে পারিব। বিরহিনী ব্রজ-গোপীগণের কৃষ্ণান্বেষণেও এই তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে ব্রজ-গোপীগণ 'নন্দনন্দন'রূপে মনচোর শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ আরম্ভ করেন, ও 'রামানুজ' রূপে নানাস্থানে তাঁহার অন্বেষণ করেন। ইহা তাঁহাদের অন্বেষণের প্রথমস্তর, শেষে বুঝিতে পারেন, কৃষ্ণ যে গিয়াছেন একা যান নাই শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। এইটুকু বুঝিবার পর সকল রহস্য, সকল গোপনীয় কথা যেন তাঁহারা জানিয়া ফেলিলেন। এতক্ষণ বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতির নিকট কৃষ্ণের অন্বেষণ কবিতেছিলেন, এখন তাহা ছাড়িয়া লীলানুকরণ করিতে লাগিলেন। লীলানুকরণ করিতে করিতে বনমধ্যে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তৎপরে পদচিহ্ন অনু-সরণ করিতে করিতে শ্রীমতী রাধার সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। শ্রীমতীও তখন শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া বিলাপ করিতেছেন—যে শ্রীমতীকে রাসের আরম্ভে ক্ষণকালব্যাপী প্রথম মিলনের পর শ্রীকৃষ্ণ লইয়া গিয়াছিলেন, সেই রাধার সহিত ব্রজদেবীগণ মিলিতা হইলেন। তাহার পর মধুর সঙ্গীতে তাঁহারা সকলে মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। ইহাই গোপীগীত। গোপীগীতের পরেই রাস-মিলন। এক্ষণে শ্রীরাধাতত্ত্বই আমরা আলোচনা করিব, প্রথমতঃ এই রাসলীলায় শ্রীমতীর আমরা দুইটিভাব দেখিতে পাই-তেছি—এক সঙ্গতা রাধা, আর এক বিরহিণী রাধা। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গতা শ্রীমতী রাধিকার অন্বেষণ করিতে করিতে বিরহিণী শ্রীমতীর সহিত মিলিতা হইলেন। বিরহিণীর বিলাপধ্বনির সহিত তাঁহাদের বিলাপ-ধ্বনি মিলিত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন। শ্রীমতী রাধিকার এই যে দুইটিভাব, সঙ্গতা রাধা ও বিরহিণী রাধা এই দুইটি স্মরণ রাখিলে এই শেষ-তত্ত্বের রহস্য আমরা অনেকটা বুঝিতে পারিব।

কঠিন অঙ্ক যখন কসিতে না পারা যায়, তখন চতুর ছেলেরা একবার উত্তরটা দেখিয়া লয়, উত্তরটি দেখিতে পাইলে অনেক সময়েই কঠিন অঙ্কও

কিছু সহজ হইয়া পড়ে। লীলাতত্ত্ব যে অত্যন্ত কঠিন তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সাধারণতঃ আমরা যে ভাবে বিশ্বব্যাপ্যার দেখি, সে ভাব বদ্‌লাইতে হইবে। ইহাই লীলাদর্শনের বা লীলাতত্ত্ব উপলব্ধির প্রথম কথা, কিন্তু তাহা বড় সহজ নহে। এই জন্য লীলাতত্ত্বের যাহা শেষ উত্তর সেই "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ", তাঁহাদের চরণ স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলে এই তত্ত্ব তাঁহাদের কৃপায় আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

শ্রীরাধাতত্ত্ব বুঝিতে আমরা একটি উদাহরণ লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিতে পারি। আর এই উদাহরণটি প্রাচীনকালের সাধুগণ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক জলধারা। কেহ বন হইতে, কেহ প্রান্তর হইতে, কেহ নগর হইতে, কেহ গ্রাম হইতে বাহির হইয়া বহিয়া যাইতেছে, সকলেরই গম্যস্থান "সমুদ্র।" ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক জলধারামাত্রেরই গতি সমুদ্রের দিকে। সমুদ্র হইতে জলধারা আসিয়াছে, তাহা অবশ্য সাধরাণ লোকে জানে না, কিন্তু গতি তাহার সমুদ্রের দিকে। এখন এই অগণ্য জলধারাকে যদি স্বাধীনভাবে সমুদ্রে যাইতে হয়, তাহা হইলে তাহারা কি কখনও সমুদ্রে যাইতে পারিবে? কেহ মরুভূমিতে বালুকারাশির মধ্যে শুকাইয়া যাইবে, (অবশ্য বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন, তাহা হইলে উপস্থিত বাষ্প হইয়া, পরে যাইবে তো! আমরা বলিতেছি সে কথা সত্য. তবে জলধারারূপে যাইতে পারিবে না)। কেহ বাঁধে বাঁধা পড়িয়া স্রোতোহীন জলাশয় হইয়া যাইবে, সমুদ্রে উপস্থিতি সম্ভব হইবে না। কিন্তু এই সমস্ত জলধারা যদি কোনরূপে একবার গঙ্গায় গিয়া পড়িতে পারে, তাহা হইলেই নিশ্চিন্ত। সে নিশ্চয়ই ঐ গঙ্গাস্রোতে মিশিয়া সমুদ্রে যাইবে। এই গঙ্গা-ধারার সহিত প্রথমতঃ শ্রীমতী রাধিকার তুলনা। মানুষ ভক্ত যুগে যুগে এই দৃশ্যমান প্রাকৃত প্রপঞ্চে থাকিতে না পারিয়া, সেই কৃষ্ণের জন্য আকুল হৃদয়ে কাঁদিতেছে, কিন্তু তাহার এই আকুল হৃদয়াবেগ কি সেই শ্রীকৃষ্ণে গিয়া পঁহুছিতে পারিবে? স্বাধীনভাবে পারিবে বলিয়া মনে হয় না, এইবার এই মূল গঙ্গাধারার প্রয়োজন এবং তাঁহার আনুগত্য গ্রহণের একান্ত আবশ্যকতা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

গঙ্গাধারার সহিত শ্রীমতী রাধিকার আরও সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। গঙ্গা হরি-পাদোদ্ভবা, সেই স্থান হইতেই আসিয়াছেন। শ্রীমতী রাধিকাও

শ্রীভগবানেরই স্বরূপশক্তি। তাঁহার সহিত অভিন্ন। অথচ গঙ্গা যেমন জীবকুলকে সেই ভগবচ্চরণে লইয়া যাইবার জন্য মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা,ইনিও তেমনি এক হইয়াও কেবল লীলা প্রকাশ করিয়া জগৎকে ধন্য ও সফল করিবার জন্য পৃথকরূপে প্রকাশিতা। আরও সামঞ্জস্য আছে। গঙ্গা কেবল যে অসখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ জলধারাকে বুকে লইয়া অবিশ্রামগতিতে সাগরের দিকে ছুটিয়া চলিতেছেন, আর জলরাশি ঢালিয়া দিতেছেন তাহা নহে। গঙ্গার আর একটি বড় চমৎকার কাজ আছে। গঙ্গায় জোয়ার আছে, জোয়ারের সময় ঐ সমুদ্রের জলরাশি বিপুলবেগে গঙ্গার বক্ষ আশ্রয় করিয়া উজানে ছুটিয়া যায়; এই জোয়ারের জল ছোট ছোট জলধারাগুলিকে পুষ্ট করে, এমন কি শুষ্ক মরুভূমিসম ভূভাগের উপরও ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার উর্ব্বরতা-সাধন করিয়া থাকে। এই উদাহরণটির দ্বারা শ্রীরাধাতত্ত্বর প্রাথমিক ধ্যান করিয়া এইবার পরের তত্ত্ব বলিতেছি।

ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতার দিকে বা স্বরূপের অভিমুখে জন্মজন্মান্তরের মধ্য-দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে মানুষের নিকট ভগবান একদিন শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হইলেন। এই যে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবানের প্রকাশ, ইহা অবশ্য একটি আকস্মিক ব্যাপার নহে। ব্যক্তির জীবনেও যেমন বহুদিনের সাধনার পরে এই সৌভাগ্য, অবশ্য শ্রীভগবানের কৃপাবলে ঘটিয়া থাকে, তেমনি যে কোন জাতি, তাহার যে কোন ঐতিহাসিকযুগে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবানকে ধারণা করিতে পারে না। এই যে হিন্দুর দেশে হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবান প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহা একটী আকস্মিক ব্যাপার নহে, বহু যুগ ও বহু মন্বন্তরব্যাপী এক অতি বিপুল সাধনার ইতিহাস, তাহার শেষফলরূপে ভগবানের এই অপূর্ব্ব প্রকাশ প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে।

প্রথম অবস্থায় মানুষ তো ভগবানেরই আরাধনা করে না, বা করিতে পারে না। এই যে জগৎ জুড়িয়া একেশ্বরবাদের দুন্দুভি বাজিতেছে, এই যে সামান্য বালক পর্য্যন্ত দেবতাপূজার অবৈধতা প্রতিপাদন করিয়া সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এর আধ্যাত্মিক উপাসনা প্রচারের জন্য বক্তৃতা করিতেছে, প্রথম প্রশ্ন এই ঈশ্বরের উপাসনা করিবার এ জগতে অধিকারী কে? এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের মত একেবারে অকাট্য। জগতে অধিকাংশ লোকই, মুখে যাহাই বলুন না কেন, কার্য্যতঃ দেবপূজার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই।

কথাটা একটু ভাল করিয়াই ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রথমতঃ ভাবিতে হইবে আমরা কি চাই? প্রধানতঃ আমরা তিনটি জিনিস চাই। প্রথমতঃ চাই ভুক্তি। এ জগতে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে মানসম্ভ্রমে থাকি ইহাই আমাদের প্রথম কামনা। ইন্দ্রিয়গুলি যাহা পাইলে তৃপ্ত হইবে বলিয়া অনুভব করে, আমরা তাহারই অন্বেষণে ব্যস্ত। আবার এই জীবনে ও এই পৃথিবীতে কিছুকাল ভোগের বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহার পর বুঝিতে পারি, যে—এই জীবন ক্ষণস্থায়ী, অনেক পরিশ্রম করিয়া অনেক ভোগের বস্তু সংগ্রহ করিলাম বটে, কিন্তু বয়স হইয়া গেল, ইন্দ্রিয়গুলি দুর্ব্বল হইয়া গেল। তৃপ্তির সহিত ভোগ করা আর ঘটিয়া উঠিল না। তখন আমরা পরলোকে বা স্বর্গে সুখভোগের কামনা করি। হিন্দু শাস্ত্রের মতে স্বর্গও খুব একটা স্পৃহনীয় বস্তু নহে। সেখানকার যত কিছু ভোগ, তাহাও ইন্দ্রিয়েরই ভোগ এবং গীতার ভাষায় "আগমাপায়িনোঽনিত্যাঃ" উৎপত্তিশীল সুতরাং বিনাশশীল, অতএব অনিত্য। শুধু তাহাই নহে, সে সুখও যখন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগরূপ ব্যাপারের অধীন, তখন তাহা পরিণামে দুঃখকর।

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয়ঃ এব তে"

অতএব তাহাও পণ্ডিতগণের আশ্রয়ণীয় নহে

"ন তেষু রমতে বুধঃ"

আমরা কিন্তু এতদূর বুঝি না, আমার ভুক্তি চাই। তবে মুখে "ভগবান্ ভগবান্" করি কেন? ইহার কারণ অনেক। যাঁহারা চতুর ও সত্যবাদী তাঁহারা ভুক্তিই চাহেন, ভুক্তিই তাঁহাদের লক্ষ্য। তবে প্রাচীন কালের বিশেষজ্ঞগণের উপদেশের সাহায্যেই হউক, আর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যেই হউক তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে ভগবানকে ডাকিলে, এমন কি এই ভুক্তিও সহজে পাওয়া যায়। এই জন্য তাঁহারা ভগবান্‌কে ডাকেন। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে ভগবান্ 'উদ্দেশ্য' নহেন, 'উপায়'। এই শ্রেণীর উপাসকের মধ্যে যাঁহারা সরল ও সাধু তাঁহারা মনের কথা গোপন করেন না, স্পষ্টভাবেই সব কথা বলেন। তাঁহাদের ভগবান অচিরেই মঙ্গল করিবেন। তাঁহারা বলেন—

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" অর্থাৎ আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশঃ দাও, আমার শত্রু বিনাশ কর।

"দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।" সৌভাগ্য দাও আরোগ্য দাও, পরম সুখ দাও।

"বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্"
"বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ"
"বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু"
"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্"

আমার কল্যাণ বিধান কর, বিপুলা লক্ষ্মী দাও, যে আমার দ্বেষ করে তাহার বিনাশ সাধন কর, উচ্চ বল দাও। আমায় বিদ্বান, যশস্বী ও ধনবান কর। মনোবৃত্ত্যনুসারিণী মনোরমা ভার্য্যা দাও। এই প্রকারের প্রার্থনা সরলচিত্তে যাঁহারা করেন, তাঁহারা অবশ্য ভাল লোক, কারণ তাঁহারা যাহা চাহেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন! গীতাশাস্ত্রে যে সমস্ত লোককে "মিথ্যাচার" বলা হইয়াছে, ইঁহারা সে সম্প্রদায়ের মধ্যে নহেন।

আর এক দল লোক আছে, তাহাদের সংখ্যা আবার আজকাল বাড়িয়া যাইতেছে, তাহারা বড়ই ভয়ানক লোক। একালের শিক্ষার কপটতাটুকু তাহাদের চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান। তাহারা মুখে নিস্কাম কর্ম্মের কথা বলে, 'ভগবান ভগবান' করিয়া নাচে ও কাঁদে, সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হইয়াও পড়ে। সে কিন্তু অবসর সময়ে ; অন্য সময়ে যে প্রকারে পারে অর্থার্জ্জন ও অর্থসঞ্চয় করে, কেহ সাহায্য চাহিলে বড় বড় ধর্ম্ম কথা বলিয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়া দেয়, সরলচিত্ত অনেক লোক তাহাদের কুহকে ভুলিয়া আবার কেহ কেহ লাভের প্রত্যাশায় তাহাদের শিষ্যও হয়, এই প্রকারের লোক বড়ই বিপজ্জনক। তাহারা নিজের অধিকার বোঝে না, নিজে যাহার অনধিকারী তাহাই লইয়া চর্চ্চা করে, আবার অহঙ্কারী, অপরের উপদেশ শুনিয়া বা শাস্ত্রবাক্য অনুধাবন করিয়া তাহারা চরিত্র সংশোধন করিতেও পারে না।

ইহাদের অবস্থা সেই ইসপের গল্পের কাঠুরিয়ার মত। আমরা বাল্য-কালে পড়িয়াছি, এক দরিদ্র কাঠুরিয়া নদীর ধারে কাঠ কাটিতেছিল। গ্রীষ্মকাল, প্রখর রৌদ্রে বেচারা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাঠ কাটিয়া এক মস্ত বড় বোঝা বাঁধিয়াছে, কিন্তু তাহা মাথায় তুলিবার সাধ্য নাই। এইরূপ অবস্থায় সে নিজের দুঃখের কথা মনে করিয়া বলিতেছে "হে যমরাজ, আর দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছিনা, তুমি যদি দয়া করিয়া আমাকে লইয়া যাও, তাহা হইলে এই সংসার-যন্ত্রণা হইতে আমি পরিত্রাণ পাই।" যমের বোধ হয় তখন বিশেষ কিছু কাজ ছিলনা, সে দিন বোধ হয় বেশী আসামী

যমালয়ে যায় নাই। কাজেই যম আসিয়া স্বশরীরে সেই বনমধ্যে কাঠুরিয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। কাঠুরিয়া প্রথমে চিনিতে পারে নাই, শেষে যখন শুনিল যে তিনি স্বয়ং যম, তাহার আহ্বান শুনিয়া তাহাকেই লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন, তখন সে বলিল "আমার ছেলেপিলে ঘর কন্না, এসব ফেলিয়া কি আমি যাইতে পারি? তবে দেখিতেছি আপনি খুব ভাললোক। আপনি যখন এতটা দয়া করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন, তখন অনুগ্রহ করিয়া আমার কাঠের বোঝাটা যদি মাথায় তুলিয়া দিয়া যান, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই। এই সমস্ত নিষ্কামকর্ম্মী ভগবদুপাসকেরও ভগবানকে ডাকা ঠিক এই প্রকারের একটা ব্যাপার।

ইহা ছাড়া আমরা 'সিদ্ধি' চাই। অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি যদি একটা কিছু 'আজগুবি' ঐন্দ্রজালিক শক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে সংসারে বেশ দশজনের মধ্যে একজন হইয়া সহজেই বসিতে পারা যায়। মঠও করিতে পারা যায়, শিষ্যও করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ আজি কালিকার লোক এদিকে যতই চতুর হউক, বুজরুকি দেখাইয়া খুব সহজেই শিষ্য করিতে পারা যায়। এই অবস্থায় আমরা চাই 'সিদ্ধি'। তবে ভগবানকে ডাকি বা তাঁহার উপাসনা করি, তাহার কারণ এই যে ভগবানকে ডাকিলে সিদ্ধিলাভ সহজে ঘটে, এ স্থলেও দেখিতেছি যে ভগবান উদ্দেশ্য নহেন,—উপায়।

তাহার পর মানুষ দেখিয়া শুনিয়া একেবারে বিরক্ত হইয়া পড়ে। সবই বাঁধন, সোণার বাঁধনও বাঁধন, আর লোহার বাঁধনও বাঁধন। তখন মানুষ এই বাঁধন ছিঁড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে চায়। ইহারই নাম মোক্ষাভিসন্ধি বা মুক্তি কামনা। এ অবস্থাতেও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মানুষ মুখ্যরূপে বা উদ্দেশ্যরূপে ভগবানের আরাধনা করে না। লক্ষ্য তাহার 'মুক্তি', ভগবান উপলক্ষ্য বা উপায়। এ পর্য্যন্ত মানুষ মুখে যাহাই বলুক না কেন, আর ভ্রান্তি বশতঃ যাহাই মনে করুক না কেন, সে ভগবানের উপাসক নহে। এই সমস্ত কামনার অসারতা বুঝিয়া ভগবানকে পরমার্থ সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলে মানুষ আর কিছুই চাহে না, ভগবানের আরাধনা মাত্রই চাহে। পূর্ব্বে এ সমস্ত কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে।

যাহা হউক এই প্রকার অবস্থায় আসিয়া মানুষ ভগবানকে কৃষ্ণরূপে উপলব্ধি করে। 'নিষ্কাম হওয়ারও অনেক পরে কৃষ্ণরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। এই বার চিন্তা করিতে হইবে 'কৃষ্ণ', ভাবটি' তাঁহার কেমন?

তিনি আকর্ষণ করিতেছেন—এতক্ষণ আমরা চেষ্টা করিয়া কখনও ভগবানের আরাধনা করিতেছিলাম কখনও সংসারে অন্য কর্ত্তব্য, অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির অন্বেষণ করিতেছিলাম। তখন আমরা ঘর ও বাহির দু নৌকায় পা দিয়াছিলাম, বাহির ও অন্তর এই দুইটি বিষয় ছিল। কিন্তু এখন আর দ্বিতীয় বিষয় নাই।

কবি চণ্ডীদাসের ভাষায় এখন—

"ঘরে কৈলু বাহির, বাহির কৈলু ঘর।
পর কৈলু আপন আপন কৈলু পর॥"

শুধু তাহাই নহে—

"রাতি কৈলু দিবস, দিবস কৈলু রাতি।"

কিন্তু তবুও

"বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥"

কৃষ্ণ বড় দুষ্ট ছেলে, ছাড়িবার পাত্র নহেন। কৃষ্ণ আসিয়াছেন, আমরা ব্রজে আসিয়াছি।

"ব্রজ শব্দে কহি পথ সর্ব্ব পথ সার।
যে পথে যাইলে জন্ম নাহি হয় আর॥"

এবার ঘর ছাড়িয়া পথে দাঁড়ান গিয়াছে। তিনি আকর্ষণ করিতেছেন, কাহারও সাধ্য নাই যে এই আকর্ষণ উপেক্ষা করে।

"পুরুষ যোষিত কিবা স্থাবর জঙ্গম
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন।"

এই প্রকারে দেখা যাইতেছে যে নিগুর্ণ ভক্তিযোগের নিকটেই শ্রীভগবান কৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই নিগুর্ণাভক্তি নিম্নরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—

"মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগুর্ণস্য হ্যাদাহৃতং
অহেতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥"

তৃতীয় স্কন্ধ উনত্রিংশৎ অধ্যায় ১০ম শ্লোক॥

মদীয়গুণ শ্রবণমাত্রে সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে জাহ্নবী-জলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না, ফলানুসন্ধানশূন্যা, ভেদদর্শনরহিতা, মনোগতিরূপা যে ভক্তি, তাহাকেই নিগুর্ণ ভক্তিযোগের লক্ষণ জানিবে।

"সালোক্য সাষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১১শ।"

যাহাদিগের এই প্রকার ভক্তিযোগ হয়, কোন বিষয়েই তাহাদের অভিলাষ থাকে না। তাহাদিগকে সালোক্য (একলোকে অবস্থিতিরূপ মুক্তি), সাষ্টি (তুল্য ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি) সামীপ্য (সমীপে অবস্থিতি) সারূপ্য (সমান রূপত্ব) একত্ব (সাযুজ্য) প্রদান করিলেও সেই সমস্ত ব্যক্তি মৎসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই অভিলাষ করেন না।

এই যে নিগুর্ণা ভক্তি ইহাই জগতে প্রচার করাই শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য— এবং ধৰ্ম্মজীবনের ইহাই শেষ আদর্শ। শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থানেই এই আদর্শ বর্ণনা হইয়াছে। যথা—

"মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোন্যৎ কালবিপ্লুতং ॥"

নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ঊনপঞ্চাশত্তম শ্লোকং ॥

এই সমস্ত ভক্ত সাধুসেবাদ্বারা লব্ধ সালোক্যাদিচতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না—সেবা করিয়াই তুষ্ট থাকেন—সুতরাং সময়ে নষ্ট হয় এমন যে সব বিষয় বা বস্তু তাহাতে যে তাঁহাদের বাসনা হইবে, ইহা আর কি প্রকারে সম্ভব ?

এই অবস্থায় মানব ক্রমশঃ গুরু ও ভক্তের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবানকে উপলব্ধি করেন। এ এক অতি অপূর্ব্ব অবস্থা। ইহার আভাস মানব অনেক সময়েই পায়, জগতের সাহিত্যে তাহার পরিচয় আছে। শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবানের উপলব্ধি কালে, মানবের স্বাতন্ত্র্য থাকে সত্য, কিন্তু "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস" অথবা মানব শ্রীকৃষ্ণের "তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ" এই নিত্য সত্যের জ্ঞানে ভক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন। একটি প্রচলিত কথা আছে "ছেড়ে দিলে অহঙ্কার পাবি শ্যাম-কলঙ্ক-অলঙ্কার।" এই কথাটির অর্থ বড়ই গভীর। আমাদের বর্ণ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ। প্রকৃতির তিনটি গুণ— সত্ব, রজঃ, তমঃ। তিনটি গুণের তিনটি রং—শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণ। আমরা এখন এই ত্রিবর্ণে অভিরঞ্জিত। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ—ইন্দ্র-নীলমণি-শ্যাম—মূর্ত্ত শৃঙ্গাররস, এই যে কালো রং, ইহা আলোর আলো, অর্থাৎ জ্যোতির চরম বা নিত্য অবস্থা। ইহা আমরা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তার সাহায্যেও বেশ বুঝিতে পারি। ঈথরের একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্পন্দন পর্য্যন্ত

আমরা আলোক দেখিতে পাই, তাহার পর আলোক ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসে। এই যে অন্ধকার, ইহা আলোকের উজ্জ্বলতার বৃদ্ধি - আমাদের দৃষ্টি-শক্তির সীমা ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহারই শেষ অবস্থা শ্যামরূপ। "শ্যামমেব পরং রূপং"। এইবার চিন্তা করিতে হইবে—"শ্যামপ্রেমসাগরে" ডুবিলে আমাদের কিরূপ অবস্থা হয়। তিনি আমাদের মুগ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি গোবিন্দ—"গাঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি বিন্দসি আকৃষ্য প্রাপ্নোষি" সকলের সকল ইন্দ্রিয় জোর করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বয়ং তাহার বিষয়ীভূত হইতেছেন। আর রক্ষা নাই!

পূর্ব্বে আমার একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, মনে করিতেছিলাম আমার একটা স্বাধীনতা আছে, কিন্তু এখন বুঝিতেছি তাহা আর নাই। একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, সকল কর্ত্তৃত্ব তাঁহারই।

শ্রীকৃষ্ণরূপে যখন তাঁহাকে অনুভব করি, অথবা যখন সেই "কালিয়ার প্রেম কাঁদে" পড়িয়া যাই, তখনকার অবস্থা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রাচীন ভক্ত কবিগণ যে কত পদাবলী রচনা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই —এ কালের কবিরা এ টান, এ আকুলতা কিসের, তাহা না বুঝিয়াও এই ভাবের অভিব্যক্তি করিতেছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই ভাবটি নানাস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন।

"উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল সে দুখপুর
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
উপরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ
পরনারী বধে সাবধান॥
সখি হে না বুঝিয়ে বিধির বিধান
সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ॥
ফুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে
ক্রূর শঠের গুণ ডোরে, হস্তে পদে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে নারি উকাশিতে॥
যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।

অবলার শরীরে, বিন্ধি জর জর করে,
দুখ দেয় না লয় জীবন।
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্যজন কাঁহা লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবারে॥
কৃষ্ণ কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি তোর ব্যর্থ এ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্ম-পত্রের জল
ততদিন জীবে কোন জন?
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত
এই কথা কহনা বিচারি
নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন দুই চারি॥
অগ্নি যৈছে নিজ ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে,
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন
পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে॥"

কৃষ্ণ আকর্ষণ করিতেছেন, মুগ্ধ করিয়াছেন, টানে পড়িয়া আমি ছুটিয়া চলিতেছি। কিন্তু তিনি এত বড়, আমি এত ছোট আমি কি কখনও তাঁহাকে পাইব, ইহার তো কোন ভরসা দেখিতেছি না। এই অবস্থা কৃষ্ণের উপলব্ধির অবস্থা।

ব্রজদেবীগণ প্রথমে 'নন্দনন্দন'রূপে, পরে 'রামানুজ' রূপে এই কৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়াছেন! সে কি ব্যাকুলতা। শেষে তাঁহারা বুঝিলেন কৃষ্ণ প্রিয়ার সহিত গিয়াছেন অর্থাৎ কৃষ্ণ "রাধাকৃষ্ণ"। এই জ্ঞান সকল জ্ঞানের সীমা ও এই তত্ত্বের উপলব্ধিতে মানবীয় সাধনার পূর্ণতা তাহা আমরা আগামী বারে আলোচনা করিব।

নিকলসনের ন্যায় বিচার।

(ইংরাজী হইতে গৃহীত)

(১)

পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর পঞ্জাবে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, দেশে অরাজকতা,সবল দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবার কেহই নাই।

আল্লাদাদ খাঁ বান্নুচ গ্রামে একজন "নামজাদা" লোক। সে ক্ষমতাশালী, লোভী ও স্বার্থপর। সে গ্রামের কর্ত্তা, সকলেই তাহাকে ভয় করিত, কেহই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইত না। তাহার কোপে পতিত হইলে অমঙ্গল অনিবার্য্য, শত্রুতার প্রতিশোধে সে দয়ামায়া-শূন্য ও সিদ্ধহস্ত। তাহারা দুই সহোদর, জ্যেষ্ঠ সম্পত্তিশালী, তাঁহার একটী মাত্র পুত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বিধবা পত্নী ও নাবালক পুত্রকে ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন, আল্লাদাদ সুবিধা পাইলে ছাড়িবার পাত্র নহে। ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। সে অনাথা বিধবা ও পিতৃহীন বালককে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া তাহাদের সম্পত্তি হস্তগত করিল। মাতা ও পুত্র পথের ভিখারী হইল।

পঞ্জাব ইংরাজ অধিকারে আসিয়াছে। ইংরাজরাজ প্রাণপণে দেশে শৃঙ্খলা স্থাপনে চেষ্টা করিতেছেন। জন নিকলসন সাহেব বান্নু জেলার ডেপুটী কমিসনার। তিনি সদাশয়, ন্যায়ের অবতার, অনাথের আশ্রয় ও পরপীড়কের শাস্তিদাতা। তাঁহার যশঃ দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপামর সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করে। শিখগণ দেবতা ভাবিয়া তাঁহার পূজা করেন। আল্লাদাদ খাঁয়ের গৃহতাড়িত ভ্রাতুষ্পুত্রের বয়স প্রায় পনর বৎসর হইয়াছে। বালক, নিকলসন সাহেবের কথা লোকমুখে শুনিত। আপনার আনুপূর্ব্বিক অবস্থা মাতৃমুখে শুনিয়াছিল। বালক ভাবিত, এইবার তাহার দুঃখের অবসান হইবে। সে নিকলসন সাহেবের অনুকম্পায় পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার প্রতি অবিচারের কথা কর্ণগোচর হইলেই সাহেব তাহার প্রতিবিধান করিবেন। কিন্তু কেমন করিয়া সে সাহেবকে একথা জানাইবে? সে নিরাশ্রয় বালক, পথের ভিখারী। সাহেব জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, দরিদ্রের কথা কি তিনি শুনিবেন? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিন বালক মাকে বলিল, "মা, আমি নিকল সাহেবকে আমাদের দুঃখের কথা জানাইব।"

"কেমন করিয়া জানাইবে, বাবা? তিনি কি তোমার কথা শুনিবেন?"

"মা, তিনিত প্রত্যহ তাঁহার সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হন, আমি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিব। সাহেব যখন যাইবেন, আমি তাঁহাকে সব কথা বলিব; তিনি কি শুনিবেন না?"

"শুনিলেই বা কি হইবে, বাবা? কে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? সকলেই তোমার পিতৃব্যকে ভয় করে। সাহেব কি তোমার কথায় বিশ্বাস করিবেন? না বাবা যেমন আছি, তেমনি থাকি। পিতৃগৃহে বাস বিধাতা তোমার ভাগ্যে লেখেন নাই।"

বিধবার ভুনয়নে দর দর অশ্রুধারা বহিল।

"কাঁদিও না, মা, তিনি দয়ালু, তিনি ন্যায়ের অবতার। শুনিলেই তিনি আমাদের উপায় করিবেন।"

সেই দিন হইতে বালক প্রত্যহ পথিপ্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকিত। সাহেব যখন যাইতেন, তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিত। একদিন, দুইদিন, তিনদিন, সাহেব বালককে তদবস্থ দেখিয়া চতুর্থ দিনে অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন, বালককে অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিকটে ডাকিলেন। সেখানে কেহই নাই, বালকের হৃদয়ে অমিত সাহস আসিল; সে চক্ষুজলে গণ্ডস্থল সিক্ত করিয়া আনুপূর্ব্বিক আপনার অবস্থার কথা সাহেবকে জানাইল। সাহেব তীব্র দৃষ্টিতে একবার বালকের হৃদয় পরীক্ষা করিলেন ও "আচ্ছা" বলিয়া অশ্ব-চালনা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বালকহৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাটী আসিয়া মায়ের নিকট সমস্ত ব্যক্ত করিল। কিন্তু দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতীত হইল, কোন সংবাদ নাই, সাহেবের লোক আসিয়া আল্লাদাদ খাঁকে কাছারী লইয়া যাইল না, অথবা কাছারী হইতে কোন লোক আসিয়া বালককে তাহার জমিতে দখল দেওয়াইল না। মাতা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি তখনিত বলিয়াছিলাম গরীবের কথা কে শুনে? তিনি সব ভুলিয়া গিয়াছেন।" বালকের হৃদয়ে ক্রমে নিরাশার সঞ্চার হইতেছিল বটে, কিন্তু অন্ধকার গৃহে স্তিমিত প্রায় দীপ শিখার ন্যায় দুর্ব্বল আশা তখনও তাহার হৃদয়ে মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। সে শুনিয়াছিল নিকলসন সাহেব নিঃসহায়ের পরম সহায়।

(২)

ছয়মাস অতীত হইয়াছে। একদিন প্রত্যূষে বানুচি গ্রামে মহা গোল পড়িয়া গেল। নিকলসন সাহেবের সাদা ঘোড়া মাঠের মধ্যে চরিতেছে, নিকটে সহিস না রক্ষক নাই। নিমেষমধ্যে সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হইল। এক দুই করিয়া আবাল বৃদ্ধবনিতা সমস্ত গ্রামবাসী গ্রামের বাহিরে আসিল। সকলের মুখে বিস্ময় ও ভীতির চিহ্ন। সকলেই জানে ঘোড়াটী সাহেবের অতি প্রিয়, সাহেব নিজহস্তে তাহার যত্ন করেন, নিজ হস্তে তাহাকে খাইতে দেন। সেই ঘোড়া অদ্য রক্ষকশূন্য হইয়া গ্রামপ্রান্তে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে—ব্যাপার কি ? সকলেই বলিল "নিশ্চয়ই কেহ ইহা চুরি করিয়া আনিয়াছে, সাহেব জানিলে সর্ব্বনাশ হইবে। ইহাকে এখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক।"

বলিবামাত্র রাখালদল ঘোড়ার পশ্চাতে ছুটিল। ঘোড়া দৌড়িয়া নিকটস্থ এক বৃক্ষ বাটিকায় প্রবেশ করিল। বালকগণও তাহার অনুসরণ করিল; কিন্তু নিমেষমাত্রে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "সেই সাহেব—সাহেব একগাছে বাঁধা রহিয়াছে।"

গ্রামবাসীদিগের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। নিশ্চয়ই কেহ সাহেবকে হত্যা করিয়াছে; সর্ব্বনাশ হইল। ইংরাজ ইহার প্রতিশোধ লইতে ছাড়িবেন না, গ্রাম তোপে উড়াইয়া দিবেন—আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও আর রক্ষা নাই। ধীরে ধীরে আল্লাদাদ খাঁ প্রমুখ বৃদ্ধগণ সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন সাহেব জীবিত, আঘাতের চিহ্নমাত্র তাঁহার শরীরে নাই। তবে তিনি বৃক্ষে আবদ্ধ। তাঁহারা তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সাহেব জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমাকে স্পর্শ করিও না। কাহার জমিতে এই ঘটনা ঘটিয়াছে ? সত্য কথা বলিবে। এই কথা যতক্ষণ জানিতে না পারি, আমি এইরূপ বন্ধনাবস্থায় থাকিব।"

বৃদ্ধগণ নির্ব্বাক নিস্পন্দ, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। যাহার জমিতে জেলার ভাগ্য বিধাতার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহার আর নিস্তার নাই ! তাঁহাদের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

আবার পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন হইল, "এ জমি কাহার ?"

গ্রামের সকলেই আল্লাদাদ খাঁকে ভয় করিত। সুতরাং কেহই সত্য কথা বলিতে হঠাৎ সাহসী হইল না; কিন্তু সকলেই তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সাহেব আল্লাদাদ খাঁকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তোমার জমিতে আমার এই দুর্দ্দশা?"

আত্মরক্ষাই এখন আল্লাদাদের প্রধান চিন্তা, সে শশব্যস্তে কহিল, "না হুজুর, ইহা আমার নয়, আমার ভ্রাতার।

"তোমার ভ্রাতার? সত্য কথা বলিতেছ? কোথায় তোমার ভ্রাতা?"

"হুজুর সে মরিয়াছে"

"তবেত জমি তোমার?"

"না হুজুর, আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমান, পিতার সম্পত্তি পুত্রে পায়— হুজুর, আমার জমিতে আপনার কোন অপমান হয় নাই।"

সাহেব তখন অন্যান্য গ্রামবাসীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "এ লোকটা কি সত্য বলিতেছে?"

সকলেই কহিল, "হাঁ, হুজুর, ইহা সত্য"

সাহেবের বদন-মণ্ডল কিছু শান্ত ভাব ধারণ করিল। তিনি আল্লাদাদকে কহিলেন, "তুমি কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পার?

ঝড়ের বেগ মন্দীভূত দেখিয়া আল্লাদাদের হৃদয়ে বল হইল, সে কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে সে জমি তাহার নয়, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের।

সাহেব স্বহস্তেই নিজ বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি নিজ হস্তেই আপনাকে বন্ধন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "সাহেবের এ আবার কোন খেলা।"

সাহেব গম্ভীর স্বরে, কহিলেন, "গ্রামবাসিগণ, বহুদিন পরে আল্লাদাদ খাঁ আজ সত্য কথা বলিয়াছে। সে লোভ-পরায়ণ হইয়া আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ও বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে তাড়াইয়া দিয়া এই জমি অন্যায় পূর্ব্বক দখল করিয়া লইয়াছিল; তোমরা সকলেই সাক্ষী; অদ্য হইতে এই জমি বালকের হইল।"

সাহেব আর অপেক্ষা না করিয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন। পরদিন বালককে সঙ্গে লইয়া আসিয়া জমিতে দখল দেওয়াইলেন। গ্রামবাসীগণ সকলেই আহ্লাদিত হইল।

আল্লাদাদ নিজ নির্বুদ্ধিতার জন্য আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। সে জানিত তাহার পতনে সকলেই আহ্লাদিত। কেহ হাসিলে বা হর্ষ প্রকাশ করিলে তাহার মনে হইত, তাহাকেই বিদ্রূপ করিতেছে। আপন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সে মক্কা যাত্রা করিল। পরে সে আর কখনও গ্রামে ফিরিয়া আসে নাই।

গ্রামের সকলেই আজীবন নিকলসন সাহেবের গুণগান করিয়াছিল।

শ্রীআদ্যনাথ রায়।

ছলনা।

বলিতে চিত্তে, জাগিছে বেদনা,
ফাটিয়া যেতেছে হৃদয়-তল,
চূর্ণ হতেছে, স্বপন-কুঞ্জ,
নয়ন ছাপিয়া ঝরিছে জল।
গোপনেই থাক্, মর্ম্মকাহিনী,
বলিয়াই বা কি হইবে ফল?
নিঠুর বিশ্ব, বিদ্রূপ-শ্বাসে,
শুধু বাড়াইয়া দিবে হৃদয়ানল,
কিন্তু, সাস্ত্বনা আর, মানেনা চিত্ত,
ধৈর্য্য ধরিতে পারি না আর॥
সত্যই মম, হতেছে ধারণা।
স্নেহ প্রেম সবি ছলনা তার॥
ভিতরে তাহার, দারুণ আঁধার,
বাহিরেতে আলো কপটতার।
মৃদু হাসি হেসে, মুগ্ধ করিয়ে,
শেষে দেখে বসে' নয়নাসার॥
পরকে বাঁধিতে জানে প্রেমডোরে,
আপনি বাঁধনে বদ্ধ নয়,
এমনি করিয়া মায়াজাল পাতে,
পিছনে জগত ধাবিত হয়।
আমি কেঁদে মরি ছট্ ফট্ করি,
বারেক দরশ-পিয়াসু প্রাণ।
জানিয়াও তো সে ইঙ্গিতে কভু,
জানায় না তার হৃদয়-টান।
থাকুক সে তবে চির উদাসীন,
স্বাধীন সে থাক্ স্বাধীনতায়!
হে মোর উছল কামনা-উর্ম্মি,
যেওনা তাহার চরণাশায়!
স্মৃতিটুকু তার বক্ষে রাখিয়ে,
চিরদিন ঢালো নয়ন-জল,
ভুলিতে যাহার নাহিক শক্তি,
ইহাই তাহার করম-ফল।

শ্রী—

শ্রীশ্রীকুন্তী-দেবীর স্তব।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১মস্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়।)

ভক্তিশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের স্তবগুলি অত্যন্ত গম্ভীরার্থ-পূর্ণ। পূজ্য-পাদ প্রাচীন আচার্য্যগণ এই সমস্ত স্তব আস্বাদন করিয়া বিস্তৃত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত স্তবের সাহায্যে ভাগবত-ধর্ম্মের রহস্য, বিশেষতঃ ধ্যান ও ধারণার প্রণালী অবগত হওয়া যায়। আমরা প্রত্যেক মাসে কয়েকপৃষ্ঠা করিয়া এই স্তব বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ-সহ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। এই বাঙ্গালা কবিতা, মূলের অবিকল অনুবাদ নহে। প্রাচীন টীকাকারগণের ব্যাখ্যা অবলম্বনে ইহা করা হইয়াছে। প্রাচীন ধরণের বাঙ্গালা কবিতা পড়িবার অভ্যাস যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে না, তাঁহাদের জন্য গদ্যে ব্যাখ্যা করিলে সুবিধা হইত। কিন্তু এই প্রকারের কবিতার পাঠক সংখ্যাও কম নহে। এই জন্য কবিতাতেই অনুবাদ করা হইল। এই সমস্ত স্তবের তাৎপর্য্য ভাগবত-ধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক স্থলেই পরিদৃষ্ট হইবে। সম্প্রতি বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় যথাক্রমে ২৪ ও ৮৮ পৃষ্ঠায়, অদ্য যে অংশের অনুবাদ দেওয়া হইল, সেই অংশের আভাস সংক্ষেপে কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে। আশা করি যাঁহাদের ভাল লাগে, তাঁহারা সেই দুই স্থলের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিবেন।

ভূমিকা।

কেটে গেছে পাণ্ডবের বিপদের দিন,
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ হইয়াছে শেষ,
মহারাজ যুধিষ্ঠির সিংহাসনাসীন,
শত্রু-শূন্য শান্তি-পূর্ণ সমুদয় দেশ।

অশ্বমেধ যজ্ঞ-ত্রয় করি সমাধান
উড়াইলা পাণ্ডু-পুত্র কীর্ত্তির নিশান।
আর প্রয়োজন নাই, ভগবান কৃষ্ণ তাই
স্বরাজ্য দ্বারকা-ধামে করেন গমন,
কৃষ্ণেরে ছাড়িতে সবে বিষাদে মগন।

(২)

নিকটে দাঁড়ায়ে ছিলা কুন্তীমহারাণী,
কৃষ্ণেরে বিদায় দিতে কাতর পরাণ,
চিত্ত মাঝে জাগে সব অতীত কাহিনী,
আদ্যোপান্ত কৃষ্ণ কথা করেন ধেয়ান।
কৃষ্ণের সমস্ত লীলা ভাবিতে ভাবিতে।
নব-জাগরণ এক উপজিল চিতে ॥
দেখিলেন এতদিন, যোগ-মায়াসিন্ধু-লীন
ছিলেন, কৃষ্ণেরে তাই না পারি চিনিতে,
আচরণ করিলেন মনুষ্য-বুদ্ধিতে।
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ভাবি বিস্ময়ে মগন
এই মত পদে তাঁর করে নিবেদন ॥

"নমস্তে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্ব্বহিরবস্থিতং ॥"

তোমার চরণে আমি করি নমস্কার।
কনিষ্ঠ ভ্রাত্রেয় তুমি, তব গুরুজন আমি,
এত দিন এই জ্ঞান আছিল আমার,
আজি মোর কেটে গেছে মোহ-অন্ধকার।
দিব্য-জ্ঞানে আজি হেরি, ওহে নর-বপু-ধারি!
তুমিত মানব নও সাক্ষাৎ ঈশ্বর,
এ বড় আশ্চর্য্য কথা বুদ্ধি-অগোচর।
মানবের দেহ ধরে', ঈশ্বর ধরণী'পরে
আবির্ভূত হইলেন, এ বড় বিস্ময়
সাধারণ মানবের বিশ্বাস না হয়।

মূঢ় অসহিষ্ণু যারা, দম্ভ-ভরে বলে তারা,
মানবে ঈশ্বর বলে, অজ্ঞান যে জন।
ঈশ্বর কি মূর্ত্তি-ধারী হয়েন কখন ?
বিশ্বব্যাপী-নিরাকার, সকল ইন্দ্রিয়-পার,
অব্যয় ঈশ্বর-তত্ত্ব বিভু সুমহান্,
ধ্যান যোগে সাধু তাঁরে করেন সন্ধান।
অবোধ অজ্ঞান যারা, না বুঝিয়া শুধু তারা
ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখে এ ধরায়,
তত্ত্বের স্বরূপ নাহি বুঝে তারা হায়।
তাই দেব, সাধনার, যে সোপান হ'য়ে পার,
তোমারে ঈশ্বর বলি অনুভব হয়,
একে একে বিস্তারিয়া কহি সমুদয়।
প্রথমে দেহাত্ম-বাদী মানব সন্তান,
জড় বুদ্ধি, জড়াতীত কিছু নাহি জ্ঞান।
পরে তার বোধ হয়, দেহ, দেহী, এক নয়,
এ দেহ আশ্রয় করি আছে কোন জন,
আপন স্বরূপে তিনি দেহাতীত হন।
জড় ও চেতন দুয়ে, একত্রে মিলিত হ'য়ে,
সম্পাদন করিতেছে বিশ্বের ব্যাপার,
প্রকৃতি পুরুষ এই নাম দোঁহাকার।
এই রূপে অগণিত, পুরুষ প্রকৃতি-যুত,
তত্ত্বজ্ঞানে পুরুষের মোক্ষের সাধন,
সাধনার আদি-কথা সাংখ্যের বর্ণন।
বহু পুরুষের মাঝে তুমি এ প্রকার,
একটি পুরুষ নহ ওহে নির্ব্বিকার॥
এ বহু পুরুষ মাঝে, শুধু একজন রাজে,
আদি বা বিশেষ নামে খ্যাতি হয় তাঁর,
পতঞ্জলি করিলেন যাঁহার বিচার।
সে পুরুষ নিত্যমুক্ত, নিত্য নির্ব্বিকার
প্রকৃতি-বশতা কভু হয় নাই তাঁর।

তাঁহারই প্রণিধানে, ভক্তিযুত উপাসনে,
বদ্ধ পুরুষের হয় কৈবল্য সাধন,
সে আদ্য পুরুষ তুমি ওহে নিরঞ্জন।
প্রকৃতিতে বদ্ধ তুমি নহ সুনিশ্চিত।
স্বরূপেতে চিরদিন প্রকৃতি-অতীত॥

এই ত্রিগুণের খেলা, এই বৈচিত্র্যের মেলা,
ঘটনার ঊর্ম্মি-মালা সময়ের স্রোতে,
না পারে তোমারে কভু কাতর করিতে॥
এই জন্য কেহ কেহ ভাবে এ প্রকার।
প্রকৃতির সহ নাহি সম্বন্ধ তোমার॥

এই শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস, শোক, হর্ষ,
এই জন্ম, এই মৃত্যু, আশা ও নিরাশ,
ইহার মধ্যেতে নাই তোমার আভাস।
তুমি যেন প্রকৃতির ভয়ে হয়ে ভীত,
চির-দিন সসঙ্কোচে দূরে বিরাজিত!

কিন্তু ইহা ঠিক নয়, বুঝিয়াছি সুনিশ্চয়,
প্রকৃতি তোমারি শক্তি, তুমি শক্তিমান,
'লীলাময়' এই তথ্য স্বরূপ আখ্যান।
প্রকৃতির নিয়ামক তুমিই ঈশ্বর।
শুধু তত্ত্ব নহে, ইহা জ্ঞানের গোচর॥

যুগে যুগে এ ভুবনে, কতজন স্বজীবনে
প্রত্যক্ষ করিলা এই তত্ত্ব সুমহান,
পুরাণে লিখিত আছে সে সব আখ্যান।

শোকে দুঃখে অসহায়, কতজন নিরুপায়,
কাতরে তোমার পদে লইলা শরণ
অসম্ভব যাহা, তাহা হইল ঘটন।
কেহ যাহা ভাবে নাই, সত্যই ঘটিল তাই,
নহে ইহা শুধু এক কথা পুরাতন,
সাক্ষ্য দেয় সমুদয় মানব জীবন।

প্রকৃতির নিয়ামক তুমি সনাতন
এই ভাবে ভক্ত তোমা করিলা দর্শন ।
মানবের যত ভয়, সে দিন হইল লয়,
মানবাত্মা সেই দিন স্বাধীন হইল !
তোমার আশ্রয়ে আসি ভয় দূরে গেল ।
প্রথমে ভাবিত নর শত্রু-পুরী মাঝে
অবরুদ্ধ আছি মোরা জানিনা কি কাজে !
প্রকৃতির শক্তি যত, আমাদের অবিরত
ক্লেশ দিয়া বিনাশিতে রয়েছে তৎপর,
আপনার কেহ নাই ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ।
প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে তৃণ-খণ্ড যথা ।
মানবের দশা ঠিক সেই রূপ হেথা ॥
যতই না দম্ভ করি, বিজ্ঞানের বাহাদুরি,
প্রকৃতির শক্তি-মুখে অতি ক্ষুদ্র সব.
একদিন জ্ঞানী ইহা করে অনুভব ।
কে বলিল দীর্ঘকাল ভূকম্পন হ'য়ে
কিম্বা সমুদ্রের জল ছুটিয়ে আসিয়ে
কিম্বা কোন কক্ষচ্যুত, গ্রহ হ'য়ে নিপতিত,
একেবারে ধ্বংস নাহি করিবে পৃথিবী,
নহে কি মোদের হেথা অনিশ্চিত সবি !
মনে হয় দয়া-হীনা প্রকৃতির করে,
ক্রীড়নক সম মোরা চঞ্চল সংসারে ।
এই প্রেম ভালবাসা, এই জ্ঞান, এই আশা,
বুকে করে' কোটি কোটি মানব সন্তান
বিনাশের অভিমুখে সদা ধাবমান !
মরমের মাঝে জাগে যে সব কামনা
সকলি বিফল, ওগো সকলি ছলনা,
কিছুই নাহিক রবে, সকলি ফুরায়ে যাবে,
যে সময় ভাসি মোরা নয়নের নীরে,
দানবী প্রকৃতি শুধু উপহাস করে।

এই অবস্থায় পড়ি মানব সন্তান,
কে আছ মোদের বলি করয়ে আহ্বান,
সমুদয় কোলাহল, করি স্তব্ধ অচঞ্চল,
"আমি আছি চির দিন তব আপনার"
আসিল উত্তর এই, হে বিভো তোমার!
সেই দিন মানবাত্মা হইল স্বাধীন,
প্রকৃতির যত দম্ভ হইল বিলীন।
চেয়ে দেখি জলে স্থলে, তোমারি মহিমা খেলে,
এ বিশ্বে সকলি তব ইচ্ছার প্রকাশ
আনন্দে উথলে চিত্ত কি শুভ আশ্বাস!
প্রথমেতে হেরি বিধি, শেষে হেরি প্রেম,
বহিতেছে আশ্রিতের তুমি যোগক্ষেম।
করিলেন সুধীগণ, এই তত্ত্ব বিচারণ
অন্তরে বাহিরে আছ সর্ব্বব্যাপী তুমি
বাহিরেতে বিশ্বরূপ, হৃদে অন্তর্যামী।
তোমার আশ্রয় লাভ করি নরগণ।
প্রকৃতিরে রাখিয়াছে করিয়া শাসন।
শুনিলাম সবি তুমি, আছ সর্ব্বস্থলে।
কিন্তু তবে কেন তুমি অলক্ষ্য রহিলে?
চিন্তা করি এই তত্ত্ব বুঝেছি যেরূপ,
নিবেদন করিতেছি, ওহে বিশ্বরূপ!

বিশ্বাসের কথা।

আমরা মুখে যাহাই বলিনা কেন দেশের উপর আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা দলে দলে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের অর্দ্ধেক অংশ যে 'সুশিক্ষা' অর্জ্জনে ব্যয় করি, তাহার একটি অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয় যে দেশের উপর বিশ্বাস করিতে হইলে মেরুদণ্ডের যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তি আমরা প্রায় অধিকাংশ স্থলে একেবারে হারাইয়া ফেলি। এই প্রকারে শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছি।

'দেশের উপর বিশ্বাস কর' এই মন্ত্রোচ্চারণের পুরোহিত হইয়া যাঁহারা নিত্য আমাদের পূজা ও সম্মান আহরণ করিতেছেন, তাঁহাদের জীবনের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছি, তাহারা স্বয়ং কখনও দেশের উপর বিশ্বাস করেন নাই। তখন কি মনে হয় না, যে আমরা ফাঁকা আওয়াজ করিয়া দৈত্য-শিকারে বাহির হইয়াছি ?

দেশের হিতসাধনের জন্য যে সমস্ত সদনুষ্ঠান হইতেছে তাহার প্রায় সকলগুলিতেই দেখিতে পাই, যে দেশের উপর জীবনে কখনও যাঁহারা বিশ্বাস করেন নাই, প্রায় তাঁহারাই কর্ত্তৃপক্ষ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে আমরা কেবল দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি তাহা নহে, যাহারা সবল তাহাদিগকে পঙ্গু করিবার জন্য জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আমাদের মধ্যে একটি অতি প্রবল চেষ্টাও রহিয়াছে। আমরা আমাদের দেশের নিকট আমাদের বিদ্যার পরিচয় দিতে ব্যাকুল নই, দেশ যে এই বিদ্যার পরিচয় গ্রহণ করিতে অক্ষম, এ জন্য নহে। দেশের নিকট পরিচয় দিতে হইলে মেকি চলিবে না, এই জন্য। আমরা দেশের কাছে আমাদের দেশহিতৈষণার পরিচয় দিতে প্রায়ই সাহস করি না, কারণ তাহা হইলে সত্যই কাজ করিতে হইবে, গোঁজামিল দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে, ভেজাল ধরা পড়িয়া যাইবে। দেশহিতৈষণার পরিচয় খুব জোর দেশের ধনী লোকদিগের নিকট দিবার চেষ্টা করি। যে বড় বলিয়া প্রমাণিত হইবার জন্য চেষ্টা করে, অধিকাংশ স্থলে সেই বড় হয়। যে বড়, সেই যে সর্ব্বত্র বড় হয় তাহা নহে। আবার এই চেষ্টায় যে যতখানি কৌশল প্রয়োগ করিতে পারে, সেই ততখানি কৃতকার্য্য। কারণ, লোক খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনার শক্তিও আমাদের নাই, কে গুণবান তাহা বুঝিবার শক্তিও আমাদের নাই, এ পর্য্যন্ত দেশে এ প্রকারের চেষ্টাও কখন হয় নাই। বড় লোকে যাহাকে বিদ্বান বলে, আমরাও তাহাকে বিদ্বান বলি। অন্যকে যদি বিদ্বান বলিয়া মনে হয় তাহা হইলেও সাহস করিয়া তাহা বলিতে পারি না, কারণ নিজের উপরেও বিশ্বাস নাই। নিজের উপরে বিশ্বাস না থাকাটাই দেশের উপর বিশ্বাস না থাকার কারণ। দেশ কাল ও পাত্রভেদে যেমন প্রায় সমুদয় বিষয়েরই ভেদ হয়, তেমনি সদ্গুণের উদ্ভবও দেশকালপাত্রভেদে কিছু বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া হইয়া থাকে। দেশ যদি তেমন হইত, তাহা হইলে দেশের উপর বিশ্বাস হইতেই নিজের উপর বিশ্বাস জন্মাইতে

পারিত, কিন্তু এখন তাহা হইবে না, হইতে পারে না। নিজের উপর যাহার বিশ্বাস আছে, দেশের উপর তাহারই কেবল বিশ্বাস হইতে পারে।

এখন আমাদের বিচারণার পদ্ধতি এইরূপ! ইহাদের সাহেবে ভাল বলিয়াছে, অতএব ইহারা প্রথম শ্রেণীর ভাল লোক, সাহেবরা যাহাদের ভাল বলিয়াছে তাহারা যাহাকে ভাল বলিয়াছে, তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাল লোক। এই বিচারণা সর্ব্বত্রই। সুতরাং আজ যদি দেশে কোন শক্তিশালী আত্মবিশ্বাসী লোকের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে আদর করিতে পারিব না। আমাদের দেশহিতৈষণামূলক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে তাঁহার স্থান হইবে না। আমাদের সংবাদ-পত্রগুলি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিতে সাহায্য করিবে না। কারণ যিনি আত্মবিশ্বাসী, তিনি আপন আলোকেই শোভা পাইবেন, তিনি ধার-করা আলো গ্রহণ করিতে পারিবেন না, বড়লোকের নিদর্শনপত্রও তিনি জোগাড় করিতে পারিবেন না। হয়ত তিনি এমন কথা সব বলিবেন, যাহা আমরা কখন শিখি নাই, সুতরাং তাঁহার কথা ভাবা ও বোঝা তো দূরের কথা, শুনিতেও সাহস হইবে না। হয়ত তিনি আমাদের কর্ণমূলে তাঁহার যাহা বলিবার তাহা বলিবেন, আমরা তাহা না শুনিয়া, দূরে, যেখানে আমাদের শেখা কথার প্রতিধ্বনি হয়, সেখানে যাইয়া গম্ভীরভাবে বসিব ও ভাবিব "আমরা সব বড় লোক!" তিনি হয়ত এমন কথা বলিবেন, যাহা শুনিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকগণ গম্ভীরস্বরে বলিবেন, আমরা যে সব কেতাব পড়িয়াছি এবং যে সব কেতাব পড়াইয়া লোককে পণ্ডিত করিয়া তুলিতেছি, তাহার কোন স্থানেই এ প্রকারের কথা লেখা নাই।

সুতরাং 'আমরা দেশের মস্তিষ্ক, আমরা দেশকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছি। আমরা সভা করিতেছি, সমিতি করিতেছি, কাগজ করিতেছি, আর কি চাই? সভ্য ও উন্নত দেশে যাহা কিছু আছে প্রায়ই তো সব হইয়া আসিল—আর বাকি কি?" আমাদের নিত্য-ঘোষিত এই কয়টি কথার মূলে যতখানি সত্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি, বাস্তবিক ততটা সত্য নাই। আমরা আমাদের যে সব উন্নতিমুখী অনুষ্ঠান দেখি, তাহার অধিকাংশই যে 'শব', ইহা আমরা ভাবিতেও পারি না। এমন কথা যদি কেহ বলে তাহা হইলে ধীরভাবে তাহার যুক্তিগুলিও শুনি না—তাহাকে উপেক্ষা ও ঘৃণা করি।

'হলকেন্' একখানি উপন্যাসে দেখাইয়াছেন যে যীশুখৃষ্ট যদ্যপি বর্ত্তমান সময়ে খৃষ্টান জগতে পুনরায় আবিভূর্ত হয়েন, তাহা হইলে খৃষ্টানেরাই তাঁহাকে ক্রসে তুলিয়া মারিয়া ফেলিবে। তাঁহাদের দেশের কথা তাঁহারা ভাবুন, কিন্তু আমাদের দেশে সত্যই যদি কোন সত্যবাদী, আত্মোৎসর্গপরায়ণ ও স্বদেশসেবারত আত্মনিষ্ঠ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে আমা-দের 'ভদ্র সমাজে' তিনি স্থান পাইবেন না, উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া তাঁহাকে হিমাচলের গুহাতলে পলায়ন করিতে হইবে। . ,

আমরা এই শোচনীয় পরিণামের দিকে প্রত্যহই অগ্রসর হইতেছি। পূর্ব্বাপেক্ষা দেশসেবায়, সাহিত্য-সেবায় পুরস্কারের পরিমাণ বাড়িতেছে, তাই প্রতিযোগীতা বাড়িয়াছে, ফলে অসত্যপরায়ণ স্তাবকগণ এখন মাথা উঁচু করিয়াছে, ব্যবসাদারী বুদ্ধিসম্পন্ন চতুর ব্যক্তিদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হই-য়াছে। উদরান্নের জন্য দাসখত লিখিয়া যিনি আজীবন দিবারাত্রি খাটিতেছেন, তিনি একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক, তিনি অকৃত্রিম দেশবন্ধু—তাঁহাদের ইঙ্গিতে, তাঁহাদের নেতৃত্বে বড় বড় দেশহিতৈষণার অনুষ্ঠান! ধনীর উন্মুক্ত ধনভাণ্ডার তাঁহাদের সাহায্য করিতেছে। ফলে, দেশের জন্য সত্যই যাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাঁহারা কোলাহলের বাহিরে নির্জ্জন গঙ্গাতীরে বাস করিতেছেন। তাঁহারা আজ নীরব, দশ বৎসরপূর্ব্বে তাঁহারা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, দেশের যুবকগণের চিত্তে সত্যের ও ধর্ম্মের আলোক প্রজ্জালিত করিবার জন্য সন্ন্যাসী হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, আজ আর দেশে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র নাই! বড় বড় আয় ব্যয়ের তালিকার দ্বারা কতখানি কার্য্য হইল তাহারই পরিমাপ হইয়া থাকে, বড়লোকে ভাল বলিলে তবে তাহা ভাল হয়!

এখন চাই দলছাড়া লোক! আর চাই নিজের শক্তিতে বিশ্বাস, নিজের উপর বিশ্বাস কোন কোন স্থানে বিশেষভাবে ভগবানে বিশ্বাস না করিয়াও মানব-জগতে হইয়াছে—ইহার প্রমাণ আছে সত্য, কিন্তু সেখানে লোকমত আছে, একটা জীবন্ত ও শক্তিশালী দেশ আছে। কিন্তু এ দেশে ভগবদ্বিশ্বাস ব্যতীত আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস হইবে না—আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস না হইলে দেশের উপর বিশ্বাস হইবে না। সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন কিছুই হইবে না, আমরা একপদও অগ্রসর হইতে পারিব না, যদি না দেশের উপর বিশ্বাস হয়।

এখনকার সাধনা ভগবানের প্রতি চাহিয়া আত্মশক্তিতে বিশ্বাসলাভ বাহিরের কাহারও মুখাপেক্ষী হইব না—যাঁহারা পদস্থ, যাঁহারা ধনী তাঁহারা যাহা ভাল মনে করেন করুন, দলের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইতে চাহি না, নিজের পায়ের জোরে দাঁড়াইব। দেশ আমাকে পরীক্ষা করিবে! সৌধকিরীটিনী নগরীর রত্নমুকুটের লোভ ছাড়িয়া পল্লীর পথে দাঁড়াইব, তাহাদের দীন উপহার, তাহাই স্বর্গ, তাহাই বৈকুণ্ঠ, আর কিছু চাই না। এই ভাবের ভাবুক চাই, এই পথের পথিক চাই।

সম্পূর্ণরূপে একাকী! হে পরমার্থসত্য, কেবল তোমারি আলোক, যখন যে টুকু পাইব তাহাই ধরিয়া অগ্রসর হইব। কিছুই পাইবার আশা করি না, কিছুই করিবার দম্ভ রাখি না কেবল তোমারই আলোক অনুসরণ করিয়া চলিয়া যাইতে চাই। পার্শ্বে বা পশ্চাতে চাহিবার প্রবৃত্তি নাই, পথ নিরাপদ কি বিপদসঙ্কুল, তাহাও ভাবিতে চাই না, লাভালাভ গণনা করিবার সময় নাই—কেবল চাই তোমারি আলোকে বদ্ধদৃষ্টি হইতে, কেবল চাই তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিতে।

একদিন ভারতবর্ষ সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এখনও যে ভারতবর্ষ বাঁচিয়া রহিয়াছে, আমাদের এত চেষ্টাসত্ত্বেও যে মাঝে মাঝে তাহার জীবনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে, তাহাও এই সাধনার ফলে। ভারতবর্ষকে চিনিতে হইলে এই সাধনার পথ আশ্রয় করিতে হইবে। কিন্তু এই সাধনার পথ কে আমাদিগকে দেখাইয়া দিবে? বড় বড় জ্ঞানী লোকশিক্ষকে দেশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের এই সাধনার ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করিয়াছে কে? আমাদের ইতিহাস আছে। আমরা পুরুষানুক্রমে সকলেই তাহা জানিতাম, আমাদের অস্থিতে মজ্জাতে তাহা গ্রথিত হইয়া ছিল। এখনও আমরা যাহাদের অজ্ঞ ও নিরক্ষর বলি, যাহাদের অস্তিত্বও আমরা স্বীকার করি না, তাহাদের মধ্যে এই ইতিহাস এখনও আছে। কিন্তু আমরা অন্ধ হইয়া গিয়াছি, তাহা দেখিতে পাইতেছি না।

ইংরাজ বলিয়াছে আমাদের ইতিহাস নাই, আশ্রয় করিয়া চলিতে পারি এমন অতীত নাই! এক দল পণ্ডিত, দেশের যুবকগণকে তাহাই শিখাইতেছে। তাহারা ভাড়া-করা লোক, তাহাই শিখাইবে। ইহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এই সব লোক যখন আসিয়া জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রগুলিতে গম্ভীরভাবে উচ্চ আসনগুলি অধিকার করিয়া বসি-

তেছে, তখনই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছি। একদল লোক দেখাইতেছে ভারতের ইতিহাস আছে, তাহা পাঠ করা যায়, তাহা পাঠ করিবার প্রণালীও তাহারা বলিয়া দিতেছে, কিন্তু এই সব 'ভাড়া-করা' লোকশিক্ষক কি সাহস করিয়া মনে করিতে পারিবে, যে পেটের দায়ে তাহারা যে প্রণালীতে চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছে, মানুষে অন্য প্রকারে চিন্তা করিতে পারে? তাহারা পরপদাঙ্ক-চিহ্নিত নিরাপদ পথে যাইতে যাইতে কি কোথাও দাড়াইয়া অনুযাত্রীগণকে এটুকুও বলিয়া দিতে সাহস করিবে, যে এ পথ ছাড়া অন্য পথ আছে—অন্ততঃপক্ষে লোকে বলে অন্যপথ আছে। তাহাও যাহারা বলিতে পারেনা, তাহারাই জাতীয় সাহিত্য গড়িবে, দেশমাতৃকার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিবে। হায়রে অদৃষ্ট!

সকলেই যাহা বলে তাহাই বলিবে, তবে একটু উঁচু করিয়া, তাহা হইলেই লোকে তোমার কথা শুনিবে। সকলেই যাহা করিতেছে, ঠিক তাহাই করিবে, কেবল জোর করিয়া একটু কোলাহল জাগাইয়া তুলিবে, তাহা হইলেই তোমার কর্ম্মের উপর লোকের দৃষ্টি পড়িবে। সকলেই যাহা ভাবিতে শিখিয়াছে, তুমিও তাহাই ভাবিবে, কেবল দশজন লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা বলাইবে যে তোমার ভাবনা একেবারে নূতন, তাহা হইলেই ভাবুক হইয়া পড়িবে। ইহাই নিরাপদ পথ—এই পথ আশ্রয় কর। এই এক উপদেশবাণীতে সমগ্রদেশ প্রতিধ্বনিত।

কে আসিয়া এই কোলাহল স্তব্ধ করিবে?—আবার ভারতের যিনি আত্মা, তপোবনের বেদমন্ত্রধ্বনি যাঁহার উদ্বোধন করিয়াছিল, তিনি আসিয়া কোন্ ভক্তের দেহ আশ্রয় করিয়া আমাদের এই অসত্যের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, অতীতের সেই সাধনাবলে বলীয়ান্ করিয়া তুলিবেন—নীরবে বসিয়া আজ কেবল তাহাই ধ্যান করিবার দিন! তিনি আসিতেছেন, সমগ্র মানবজাতিকে প্রেমসূত্রে বাঁধিয়া শান্তির শুভ্র-পতাকা উড়াইবার জন্য, তিনি আসিতেছেন, আবার ব্রহ্মণ্য-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য, তিনি আসিতেছেন, আবার স্বর্গ মর্ত্ত্যের ব্যবধান দূর করিয়া উন্নততর জ্ঞানে মানবকে জ্ঞানী করিবার জন্য; আমাদের সকল হীনতা, সকল দুর্ব্বলতা, তাঁহার শুভ্র বিমল হাস্যে দূর হইয়া যাইবে। এখন প্রস্তুত হইতে হইবে যেন তাঁহাকে চিনিতে পারি, যেন তাঁহার সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি।

স্মৃতি

সে দিন গ্রামের মধ্যে বড় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল, কোথা থেকে এক বেদিয়ার দল আসিয়া চড়ক-তলার মাঠে নাকি ভারি চমৎকার 'খেল' দেখাইয়াছে।

একটু রোদ না প'ড়তেই মাঠে আর লোক ধরে না। গ্রামের শ্যাম-মণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া শিরোমণিঠাকুর অবধি কেহই বাদ গেলেন না। এমন কি গ্রামের জমিদার হরকালি বাবুও সে দিন খেলা দেখিতে মাঠে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ বেদিয়া ত একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। এত লোকের সাম্‌নে সে আর কখনও 'খেল' দেখায় নাই। বিশেষ নগেন্দ্রপুরের জমীদারের মত এত বড় লোকের সামনে 'খেল' দেখান, তাহার ভাগ্যে আব কখনও ঘটিয়া উঠে নাই, তাই সে আজ যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া 'খেল' দেখাইতে পারে, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

ওদিকে তাঁবুর ভিতর বেদিনী তাহার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দুটিকে সাজাইতে একেবারে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। সে সাজাইতেছে আর বলিতেছে, "দেখিস্ ঝারিয়া, দেখিস নিরু, আজ যেন ভাল করে খেল দেখাতে পারিস, মনে আছে আজ কে তোদের খেল দেখতে এসেছে ?"—

বালক তাহার বড় বড় দুটি চোখ গর্ব্বভরে আরও বিস্তৃত করিয়া বলিল, "জানি গো জানি, কে একজন জমিদার এসেছে বৈ ত নয়, তাতে আর কি হয়েছে ঝারিয়া, জমিদার ত আর মানুষ ছাড়া কিছুই নয়।"

ঝারিয়া কিন্তু কে জানে কেন, জমিদারের নাম শুনিয়া অবধি কেমন ধারা হইয়া গিয়াছিল। বালকের উত্তেজনা বাক্যে তাহার বিশেষ কোন ফল হইল না।

'খেল' আরম্ভ হইল, বৃদ্ধ যত প্রকার ভেল্কি জানিত সবগুলিই আজ খরচ করিয়া ফেলিল! লোকে তাহার অদ্ভুত অদ্ভুত অঙ্গচালনাশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। জমিদার বাবু আপনার শাল জোড়াখানি আপনার গাত্র হইতে খুলিয়া তাহাকে পুরস্কার দিলেন। সে ভয়বিকম্পিত-চিত্তে সেখানি গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিল।

এইবার ঝারিয়া আর নিরুর 'খেল' দেখাইবার পালা। তাহারা যখন তাঁবুর ভিতর হইতে সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইল, তখন সকলে বলাবলি

করিতে লাগিল, "দেখ দেখ কেমন মানিয়েছে, ছেলেটি যেমন সুন্দর, মেয়েটি তেমনি কাল।"

খেলা সাঙ্গ হইল। সকলেই বাহবা দিতে দিতে বাড়ী ফিরিল। কেবল একজনমাত্র জায়গা ছাড়িয়া উঠিলেন না, ইনি নগেন্দ্রপুরের জমিদার হরকালি বাবু।

হরকালি বাবু বিপত্নীক, আজ প্রায় ৫ বৎসর হইল তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে।

এ সংসারে তাঁহার আর কেহই নাই। তাঁহার একটি পুত্র ছিল, সেটিও তাঁহাকে ফাঁকি দিয়াছে। আহা পুত্র ত নয়, যেন সোণার চাদ! আহা এমন পুত্র, রোগ নয়, ভোগ নয়, কিনা নেকড়ের মুখে গেল!

হরকালি বাবু আর বিবাহ করেন নাই। পুত্রশোকে তিনি একপ্রকার পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলেন।

এই শোকের হা-হুতাশের মধ্যে তাঁহাকে সান্তনা দিবার একটি মাত্র জিনিষ ছিল, সেটি তাঁর পিতার আমলের পুরাণ সেতার। দ্বিপ্রহরে যখন রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকে, নির্জ্জন বৈঠকখানা গৃহ যখন পার্শ্বোপবিষ্ট ক্রীড়ারত একটি ঢলঢলে ছোট মুখের কথা মনে করিয়া দেয়, তখন সেই সেতারটি কেবল প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় ঝঙ্কার তুলিয়া বলে, "কেবা কার" তাহার গলাও সেই সঙ্গে কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলিয়া উঠে "কেবা কার।"

মাঠ জনশূন্য হইল, তথাপিও হরকালিবাবু উঠিলেন না। বেদে মনে করিল তবে বোধ হয় জমিদারবাবু আরও কিছু বক্‌সীস করিবেন, তাই সে হাতযোড় করিয়া ভীতত্রস্তভাবে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

ওদিকে ঝারিয়া আর নিরু 'খেল' দেখাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের ক্ষুধাও পাইয়াছিল। তাঁবুতে প্রবেশ করিবামাত্র বেদেনী তাহাদের কাপড়ের খুঁটে জলপান বাঁধিয়া দিল, তাহারা বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়া মহানন্দে সেই জলপানগুলি মুঠা মুঠা করিয়া মুখে তুলিতে লাগিল, আর গল্প করিতে লাগিল।

নিরু বলিল, "আচ্ছা ঝারিয়া জমীদার বাবুকে কেমন দেখ্‌তে বল্ দেখি।"

ঝারিয়া তাহার দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "ঠিক তোর মত দেখ্‌তে, তোর মুখে যদি গোপ দাঁড়ি থাকিত, তা' হলে তোকেও জমিদারের মত দেখাত। তুই ফরসা কিনা, তাই লোকেরা তোর দিকে চেয়ে কি বলাবলি কর্‌ছিল।"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে বৃদ্ধ বেদিয়া তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার সেই সময়কার চেহারা দেখিয়া, বালক, বালিকা, এবং বেদেনী তিন জনেই চমকিয়া উঠিল। তাহার মুখে কে যেন এক দোয়াত কালি ঢালিয়া দিয়াছে।

সে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিল, "বাবা নিরু," তাহার গলা বাধিয়া বাধিয়া যাইতে ছিল, সে অতিকষ্টে চোখের জল সাম্‌লাইয়া বলিল, "বাবা নিরু, তোমাকে আজ এক নূতন কথা শোনাব।"

বালক বালিকা হতভম্বের মত তাহার সেই অদ্ভুত মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

বেদে গম্ভীর গলায় বলিল, "শোন নিরু, তুমি আমাদের ছেলে নও, তুমি –" কথা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বেদেনী তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুই কি পাগল হয়েছিস নাকি, আজ বুঝি খুব মদ গেলা হয়েছে।"

তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বেদে বলিল, "তুমি ত বাপ আমাদের ছেলে নও, তুমি যে নগেনপুরের জমিদারের ছেলে।"

বেদেনী কাঁদকাঁদস্বরে বলিল, "ওরে সর্ব্বনেশে, ওরে অধঃপেতে, তোকে যমে নেয় না কেন? দ্যাখ্ না নিরুর মুখটি কতটুকু হয়ে গেছে; না বাবা তুই ওর কথা শুনিস নি, তুই যে বাপ আমাদেরই ছেলে।"

বেদে কর্কশ-কণ্ঠে বলিল, "থাম্‌রে মাগী থাম, তোর নিরু দুদিন পরে জমিদার হবে তাই চাস্, না কেবল নিজের সুখ চাস্।"

বেদেনী এবার কাঁদিয়া ফেলিল, সে নিরুকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ছোট মেয়ের মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বালক হতভম্বের মত একবার বেদে আর একবার বেদেনীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল। আর ঝারিয়া, সে ছেলে মানুষ, কিছু বুঝিতে না পারিয়া একপার্শ্বে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বেদে ভারি গলায় বলিল, "দেখ্ মাগী, নিজের সুখের জন্য নিরুর সুখে বাদ সাধিস্ নি। আমরা আর ক দিনই বা আছি, ভাব্ দেখি তার পর নিরু কত কষ্ট পাবে, তার চেয়ে সে যদি জমিদার হয়, ত কত সুখে থাক্‌বে।"

বেদেনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সে যে তখন আর আমাদের থাক্‌বে না।"

"নাই বা রইল! এখন সে কথা থা'ক্, শোন নিরু, যিনি আজ আমাদের খেলা দেখ্‌তে এসেছিলেন, উনি এই গ্রামের জমিদার, উনি তোমার বাপ, আমরা তোমার কেউ নই।"

এইবার ঝরিয়া কথা বলিল, সে ভীতকণ্ঠে বলিল, "আর আমি।"

এইবার বেদের চোখ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তুই যে মা বেদের মেয়ে, আর নিরু যে বড়লোকের ছেলে, সে কি তোর কেউ হ'তে পারে।"

বালিকা আর কথা বলিল না, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বেদে আবার বলিল, "শোন নিরু, একথা আমি আর ঝরির মা ছাড়া আর কেউ জানে না ; তোমার বয়স যখন দুই বছর কি তিন বছর ছিল, তখন তোমাদের ঝি তোমাকে আমাদের কাছে বিক্রি করেছিল। পাছে কেউ কিছু বলে, এই ভয়ে সে বাড়ীতে গিয়ে গুজোব তুলে দেয় যে তোমাকে নেকড়েতে নিয়ে গেছে। ঝি কিন্তু আমাদের বলে নি, যে তুমি জমিদারের ছেলে, সে বলেছিল এক গরীবের ছেলে, আমরাও তার কথা বিশ্বাস করেছিলুম। আজ'কে জমিদারবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "ও ছেলেটি কি তোমার?" আমি প্রথমে মিথ্যা কথা বলেছিলুম, কিন্তু যখন তিনি পা ছুঁয়ে দিবি ক'র্‌তে ব'ল্‌লেন তখন আমি সব কথা সত্যি বল্লুম। আমি তখনও মনে ভাবিনি যে তুমি তাঁহারি ছেলে, তাহ'লে আমি কখনও সত্যি কথা ব'ল্‌তাম না। তিনি আমার কথা শুনে বল্লেন, "বাপু ও ছেলেটি আমার,—তোমাকে অনেক টাকা দিব, তুমি ছেলেটিকে আমায় দাও, আমি প্রথমে কিছুতেই রাজি হ'লাম না, তখন তিনি আমাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, এখন বু'ঝতে পেরেছি যে তাঁহার ছেলে তাঁহাকে ফিরিয়ে দেওয়াই ভাল।" এই কথা বলিবার পর ঘরখানি নিস্তব্ধ হইয়া গেল, কাহারও মুখে একটি কথা নাই।

সে দিন রাত্রে কাহারও কিছু খাওয়া দাওয়া হইল না। বেদেনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিছানা ভিজাইয়া দিল।

পরদিন প্রাতঃকালে জমিদারের জুড়ি আসিয়া রোরুদ্যমান নিরুকে সগর্ব্বে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় জমিদারের লোক আসিয়া জানাইল, যে জমিদারবাবু তাহাদিগকে আজিকেই গ্রাম ত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছেন, তাহারা যেন আর কখনও তাঁহার গ্রামে খেলা দেখাইতে না আসে!

জমিদারের মৎলব বুঝিতে বেদিয়ার অধিক বিলম্ব হইল না, সে কাতর কণ্ঠে বলিল, "বুঝেছি নিরু যাকে আমাদের ভুলে যায়।"

সেই রাত্রেই বেদিয়ার দল গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আসিবার সময় ঢোল দামামা বাজাইয়া আসিয়াছিল, যাইবার সময় নিস্তব্ধে চলিয়া গেল।

উক্ত ঘটনার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, নীরদবরণ এখন আর ছেলেটি নাই. তাহার উপর দিয়া শোক দুঃখের অনেক ঝটিকা তুলিয়া প্রায় একটা গোটা জীবন বহিয়া গিয়াছে। তাহার পিতা হরকালি বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার পত্নীও তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে. কেবলমাত্র পুত্র ননীগোপাল অন্ধের যষ্ঠির মত তাহার অবলম্বন হইয়াছে।

তখন দ্বি-প্রহর, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, নীরদবরণ আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া কত সুখ দুঃখের কথা মনে করিতেছিল এমন সময় পুত্র ননীগোপাল সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাবা! বাবা! একটি ছোট, কাল কুচকুচে মেয়ে ভীক্ষে কবৃতে এসেছে, হরিয়া তাকে চাল দিয়েছে, সে তবু যেতে চায় না, সে কেবল ব'লছে নিরুবাবুর সঙ্গে আমার মার ভাব ছিল। মা আমাকে বলেছিল যে যদি কখনও কষ্ট পাস্, ত নিরুবাবুর কাছে যাস্।"

নীরদবরণের বুকের উপর দিয়া ধাঁ করিয়া একটা বিদ্যুৎ বহিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "হরিয়া! হরিয়া! ঐ ছোট মেয়েটিকে আমার কাছে নিয়ে আয় ত।"

কিছুক্ষণ পরে একটি কাল কুচকুচে ছোট মেয়েকে লইয়া হরিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া নীরদবরণের অনেক দিনকার কথা মনে পড়িয়া গেল, এ যে ঠিক তেমনিটি! নীরদবরণ তাহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি চাও গা।"

সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমার নাম তিতিয়া। তোমার নাম কি নিরুবাবু গা?"

নীরদবরণ কম্পিতবক্ষে বলিল, "হাঁ, কেন গা।"

"সে কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমার মার সঙ্গে তোমার ভাব ছিল না।"

নীরদবরণ এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "কে তোমার মা, ঝারিয়া, ঝারিয়া।"

বালিকা ভীত-ভাবে বলিল, "হাঁ গো হাঁ।"

নীরদবরণ সাগ্রহে বলিল, "ঝারিয়া কেমন আছে তিতিয়া?"

তিতিয়ার চক্ষুদুটি জলে ভরিয়া আসিল, সে কাতরকণ্ঠে বলিল, "মা ত নেই নিরুবাবু।"

নীরদবরণ পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল "ঝরিয়া নেই, তিতিয়া!"

তাহার চক্ষুদিয়া জলধারা বহিতে লাগিল, সে সেই মলিনবসনা বালিকাকে আপনার বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বালকের মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার চক্ষের জলে বালিকার গা ভাসিয়া গেল। শৈশবের কত কথা এই ভগ্নজীবনের ঐশ্বর্য্যের পুরোদেশে দাঁড়াইয়া যেন জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "সুখ কোথায়!"

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

(আলোচনা)

মান্যবর শ্রীযুক্ত 'চরিতাভিধান' সম্পাদক মহাশয়,

(১) গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বীরভূমি'তে আপনি পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের চরিত্র সংকলন করিয়াছেন। আমরা তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইলাম। কিন্তু উহার একস্থলে লিখিয়াছেন, "শ্রীপাদ জীব গোস্বামী 'শ্রীচরিতামৃত' নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন।" এ কথার ভিত্তি কোথায় পাইলেন, অনুগ্রহ করিয়া লিখিলে নিশ্চিন্ত হইব। কারণ কোন মহাত্মার বিরুদ্ধে কোন অযথা গ্লানি ঘোষিত না হয়। আমরা যতদূর জ্ঞাত আছি, তাহাতে শ্রীজীবের ওরূপ চেষ্টা কখনই ছিল না। এই গেল আমাদের এক নিবেদন।

(২) আমাদের দ্বিতীয় নিবেদন এই যে আপনি লিখিয়াছেন, মহারাজা বীর হাম্বীর কর্ত্তৃক চরিতামৃত লুণ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পাইয়াই কবিরাজ মহাশয় রাধাকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। আমাদের নিবেদন এই যে এই জনশ্রুতি ব্যতীত আর একটি জনশ্রুতি আছে, তাহা এই যে উক্ত সংবাদ পাইয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া কবিরাজ মহাশয় 'রাধাকুণ্ডে' ঝাঁপ

দেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই। "সেবকগণ তাঁহা'ক উঠাইলেন বটে, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর কোলে, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম জপ করিতে করিতে তিনি গোলক ধামে গমন করিলেন" (শিশির বাবুর 'নরোত্তম চরিত' ৫২ পৃঃ)। ঐ ৬০ পৃষ্ঠায় আবার দেখিবেন, 'কর্ণানন্দ রস' গ্রন্থকার, ঐ জনশ্রুতির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, গ্রন্থ পুনঃপ্রাপ্তির সংবাদ বৃন্দাবনে পৌঁছিলে, তাহা শুনিবার পর তাঁহার দেহান্তর ঘটে। সুতরাং এই উভয় মতই আপনার উক্ত 'চরিতাভিধানে' যেন স্থান পায়।

(৩) আর শ্রীজীবের অন্তর্দাহ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন যে, শ্রীজীব যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সংস্কৃত পত্রে পাঠ করিলেন যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হৃত হইয়াছে, পত্র পড়িয়া শ্রীজীবের হৃদয় ফাটিয়া গেল। ইহাতেই মনে হয় যে শ্রীজীব কখনই আপনার লেখার মত, অন্তর্দ্দাহের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থ বিনষ্ট করার চেষ্টা করেন নাই। বিশেষ 'চরিতামৃত' মধ্যেই 'শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যাঁর আশ। চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।' এইরূপ শ্রীরূপের বন্দনা আছে, তখন শ্রীজীবের মনে শ্রীরূপের পুস্তকের প্রসার নষ্ট হওয়ার কথা আসিবে কেন? তৎসওয়ায় চরিতামৃতের মধ্যেই 'বিদগ্ধ-মাধব' আদির শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা তুলিয়া তাহার বিশেষ প্রশংসা কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের গ্রন্থের আদর কমিবার কথা শ্রীজীবের মনে না হইয়া বরং আদর বর্দ্ধিত হওয়ার কথাই তাঁহার মনে হওয়া উচিত; কারণ রূপ, সনাতনের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায়, আর চরিতামৃত বঙ্গভাষায়, প্রচার বেশী হইবার সম্ভব। ফলেও দেখা যায়, চরিতামৃত না হইলে রূপ, সনাতনের গ্রন্থ-মাধুরী সাধারণের বিদিত হইত না, কেবল পণ্ডিতগণই জানিতেন। অধিক আর কি লিখিব। আপনার ওরূপ লেখায় আমরা বড়ই মর্ম্ম-বেদনা পাইয়াছি। আশা করি, আষাঢের বা শ্রাবণের "বীরভূমি"তে আপনি একটি সংশোধিনী বাহির করিবেন। ইতি

বিনীত নিবেদক
শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র বি,এল (উকীল হাইকোর্ট)
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম,এ,বি,এল

পুনঃ—শ্রীজীব কত যত্ন করিয়া এই সকল গ্রন্থ বাঙ্গালায় পাঠান তাহা 'নরোত্তম চরিতের' ৪৩ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। ইতি

সত্য।

বক্তব্য।

উল্লিখিত পত্রের লেখকমহাশয়দ্বয় জ্যৈষ্ঠের 'বীরভূমি'তে আমার "কৃষ্ণদাস কবিরাজ" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহাতে ভ্রমপ্রমাদাদি যাহা কিছু লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা সংশোধনের প্রয়াসী হইয়া আমাকে চরিতার্থ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি, আমার "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক", নামক পরলোকগত যাবতীয় বঙ্গ-সাহিত্য সেবীগণের বর্ণানুক্রমিক চরিতাভিধান গ্রন্থের জন্য সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ মধ্যে কোন প্রবন্ধেই আমি স্বকপোল কল্পিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করি নাই। কিন্তু তত্রাপি আমার অলক্ষ্যে ভ্রমাত্মক বিবরণ সন্নিবিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। যাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক কষ্ট স্বীকার করিয়া এই চরিতাভিধান গ্রন্থের ভ্রমাদি প্রদর্শন করিয়া ইহার নির্ভুলতা সম্পাদনে যত্নপর হন, তাঁহাদিগের নিকট আমি কি পরিমাণে ঋণী তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। যাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করেন তাঁহারা যদি মাতৃভাষার প্রতি চাহিয়া এই চরিতাভিধান গ্রন্থের ত্রুটী বিচ্যুতি সংশোধনের প্রয়াসী হন, তবেই আমরা কালে এরূপ গ্রন্থ নির্ভুল ও প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব। এইরূপ গ্রন্থ জাতীয় সম্পত্তি, একের নহে।

প্রথম অংশ—যে ব্যক্তি মহাত্মাগণের জীবনী কথা আলোচনা করিয়া ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা করে তাহার পক্ষে শ্রীলজীব গোস্বামীর ন্যায় মহানুভবের অযথা গ্লানির কথা প্রচারিত করিতে অগ্রসর হওয়া অতি অসম্ভব কথা। গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী তৎকালীয় বৃন্দাবন-বাসী বৈষ্ণব সমাজের নেতা শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সাধারণ্যে তাঁহার গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীজীব-গোস্বামী গ্রন্থের পাণ্ডিত্য ও সহজ ভাষায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্যনিচয় বিবৃত দেখিয়া এইরূপ গ্রন্থ প্রচারিত হইলে কি জানি রূপ, সনাতন প্রভৃতি বিরচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর আদর কমিয়া যায় এইরূপ আশঙ্কা করিয়া চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থখানি নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। এই বাক্যে আমি ইঙ্গিতে যাহা কহিয়াছি, তাহা অন্যান্য গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

(ক) 'এই গ্রন্থ রচিত হইবার পর, জীবগোস্বামী দেখিলেন, রূপ সনাতনের মহাদৃত গ্রন্থ আর আদৃত হইবে না; এই আশঙ্কা করিয়া,

তিনি কৃষ্ণদাসের চৈতন্য-চরিতামৃত খানি যমুনার জলে ভাসাইয়া দিলেন। (—'বঙ্গভাষার লেখক'—পৃঃ ১২০)

(খ) 'তৎকালে জীব-গোস্বামীই বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব সমাজের অধিনেতা ছিলেন; বৃদ্ধ কবিরাজ গ্রন্থখানি সঙ্গে লইয়া জীবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ইহা পাঠ করিতে ও প্রকাশের অনুমতি দিতে অনুরোধ করিলেন। জীব-গোস্বামী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ও চৈতন্যোপদেশ সকল বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে; তাহা অবলীলাক্রমে সাধারণেব আয়ত্তাধীন হইবে, অথচ রূপ, সনাতন ও তাঁহার স্বরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অপ্রচারিতে থাকিবে; কেহ আর সে সকলের আদর করিবে না। এই আশঙ্কায় * * জীবগোস্বামী কোপাবিষ্ট হইয়া যমুনার জলস্রোতে ঐ গ্রন্থ নিক্ষেপ করিলেন'—

(৺ জগদীশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত জীবনী-প্রবন্ধ; ।৵০—।৶০ পৃঃ)

(গ) "'চৈতন্য চরিতামৃতের' শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে "বিবর্ত্তবিলাস,' গ্রন্থে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে।·· প্রবাদটী এই, যখন শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত ভক্তিগ্রন্থনিচয় প্রেরণ করিবার জন্য শ্রীজীবগোস্বামী গ্রন্থের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি সকল গ্রন্থের উপরে রহিয়াছে, যদিও শ্রীজীব উহা অনেক গ্রন্থের নিম্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীজীব যেন ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন, ইহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থখানি বৃন্দাবনের অনেক ভাটিতে যমুনায় নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু গ্রন্থ ডুবিল না, ভাসিতে ভাসিতে উজান বাহিয়া মদনগোপালের ঘাটে আসিয়া লাগিল।'—(শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র সঙ্কলিত "শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী'—উপক্রমণিকা, ৫৯-৬০ পৃঃ)

সুতরাং, এ সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে যখন প্রায় তুল্যরূপ কথার প্রসঙ্গ বর্ণিত রহিয়াছে, তখন এ বিষয়টি একবারে অনুল্লিখিত রাখিতে পারি নাই। তবে, এ প্রসঙ্গটি একেবারে ভিত্তিহীন অমূলক প্রবাদ বলিয়া প্রমাণিত হইলে, আমি তাহা প্রত্যাহার করিয়া ধন্য হইব। আপাততঃ, 'প্রবাদ এই যে' এই বাক্যটি সংযোজিত করিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইতে পারে।

স্বর্গীয় শিরিশবাবু কিন্তু, এইরূপ প্রবাদ, হাস্যকর বিবেচনা করিয়াও তাঁহার 'নরোত্তম চরিত' গ্রন্থে উল্লেখ করিতে বিরত হন নাই—

'একটি প্রবাদ আছে যে জীবগোস্বামী, এই চরিতামৃত গ্রন্থখানি ভাষায় লিখিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া গৌড়ে পাঠাইতে আপত্তি করেন। কিন্তু কোন গ্রন্থে এরূপ হাস্যকর প্রবাদের কথা উল্লেখ নাই।' ('নরোত্তমচরিত' ৪১ পৃঃ)

দ্বিতীয় অংশ—কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় গ্রন্থলুণ্ঠন সংবাদ প্রাপ্তির পরই শোকাকুলিত হৃদয়ে রাধাকুণ্ডে পতিত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হন—'প্রেম-বিলাস' গ্রন্থানুযায়ী এই কথারই উল্লেখ করিয়াছি। "নরোত্তম চরিত' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আরও দুইটি প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। প্রথমটিতে কবিরাজগোস্বামীকে রাধাকুণ্ড হইতে উঠাইলে পর রঘুনাথ গোস্বামীর ক্রোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম জপ করিতে করিতে দিব্যধাম প্রাপ্তির কথা এবং দ্বিতীয়টীতে (যদুনন্দন দাস রচিত 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থের ৭ম নির্য্যাসে দ্রষ্টব্য) গ্রন্থ পুনঃপ্রাপ্তির সংবাদ বৃন্দাবনে পঁহুছিলে পর, তাঁহার দেহান্তর ঘটিবার কথা বর্ণিত আছে। আমি কিন্তু, এই অগ্রবর্ত্তী প্রসঙ্গের উল্লেখ না করিয়া 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ' প্রবন্ধের পাদটীকায় "নরোত্তম-বিলাস" গ্রন্থ হইতে

"তথা হৈতে গেলা জীবগোস্বামীর স্থানে
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি সেই খানে।" (পৃঃ ২২৬)

এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে গ্রন্থচুরির বহুদিন পর খেতরীর মহোৎসব হইয়া গেলে জাহ্নবা ঈশ্বরী যখন বৃন্দাবনে যান তখনও তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর সাক্ষাৎলাভ করিবার কথা বর্ণিত আছে। একই বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন মতের সমাবেশ দেখিয়া আমরা এই প্রবন্ধ মধ্যে প্রসঙ্গমুখে 'কথিত আছে' এই বাক্য সংযুক্ত করিয়াছি। মতান্তরে 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ লুণ্ঠিত গ্রন্থরাজির মধ্যে ছিল না—এই গ্রন্থ তখন প্রেরিত হয় নাই (শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত পৃঃ ১৩০-১৩৩ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

তৃতীয় অংশ—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর গ্রন্থ চুরি সংবাদমূলক পত্র পাঠ করিয়া শ্রীজীব-গোস্বামীর অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইবারই কথা। 'শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত' গ্রন্থেও 'পত্র পাঠ করিয়া গোস্বামী একেবারে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন' (পৃঃ ১৪১) এইরূপ বর্ণিত আছে। সম্পুট মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ছিল না—শ্রীমৎ রূপ সনাতন প্রণীত 'বিদগ্ধ মাধব', 'ললিত মাধব', ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু, 'উজ্জ্বল নীলমণি' 'ভাগবতামৃত', 'বৈষ্ণবতোষণী' প্রভৃতি, দাস-গোস্বামীর গ্রন্থাবলী' ভট্টগোস্বামীর 'হরিভক্তি-বিলাস' প্রভৃতি বহু সংখ্যক অমূল্য গ্রন্থ গাড়ীবোঝাই করিয়া প্রেরিত হইয়াছিল।

বঙ্গভাষায় রচিত নূতন 'চৈতন্য চরিতামৃতে' গ্রন্থে 'বিদগ্ধ মাধব' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ থাকায় তৎসমুদয়ের প্রসার বাড়িবে, এরূপ ধারণা তৎকালে মনে হওয়া সম্ভবপর কি না ভাবিবার কথা।

শ্রীলজীব গোস্বামী পরবর্ত্তী কালে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে চৈতন্য চরিতামৃত শব্দের পর 'কহে কৃষ্ণদাস' এই বাক্যটি লিখিয়া 'অনুমোদন স্বাক্ষর করিয়াছিলেন—প্রবন্ধে এ কথার উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রবাদের যদি কোনও ভিত্তি থাকে, তাহা হইলেও এ কথা অসম্ভব মনে হয় না। কেন না, প্রথমাবস্থার কথা যাহাই হউক, পরবর্ত্তী কালে যখন অনুমোদন করিলেন, তখন আর কোন রূপ অন্যভাব স্থান পাইতে পারে না; পরন্তু তাঁহার নিকট গ্রন্থখানি গুণানুরূপ অত্যধিক আদর যত্ন পাইবারই অধিকারী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিজের ইচ্ছা মত রচনা করিয়া কোন কথা লিখি নাই। সন্ধান গ্রন্থ নিচয়ে যাহা পাইয়াছি তাহাই সঙ্কলন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি। পরম ভাগবত মহামহোপাধ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত কবি শ্রীলজীব গোস্বামীর ন্যায় বৈষ্ণবের অযথা নিন্দা প্রচারের জন্য আমি আদৌ দায়ী হইলে আমার ক্ষোভের পরিসীমা থাকিতনা। সত্য অপ্রিয় হইলে সকলক্ষেত্রে প্রকাশ করা সঙ্গত নহে, তবে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত, একাধারে ধর্ম্ম ও চরিত গ্রন্থের প্রচার সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রসঙ্গ কথা প্রচারিত আছে, তাহা আলোচ্য প্রবন্ধে অনুল্লেখ রাখা সঙ্গত মনে করি নাই। ইহাতে আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকিলে আমি তাহার জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। ইতি।

শ্রীশিব রতন মিত্র।
বীরভূম।

"অদ্বৈতসিদ্ধিঃ"

'অদ্বৈতসিদ্ধি' বেদান্তদর্শনের একখানি প্রকরণগ্রন্থ; ইহার প্রণেতা, শ্রীমৎ-পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর শিষ্য পূজ্যপাদ ৺মধুসূদন সরস্বতী; তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জন্ম-

স্থান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়া গ্রাম। তাঁহার প্রণীত অতি গবেষণাপূর্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার শাঙ্কর ভাষ্যের একখানি বিস্তৃত টীকা বঙ্গদেশে সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচারিত আছে। তিনি আরও অন্যান্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে অদ্বৈতবাদের সুদৃঢ় স্তম্ভ-স্বরূপ এই 'অদ্বৈতসিদ্ধি'ই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও সুগভীর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। পূজ্যপাদ ৺মধুসূদন সরস্বতীর ন্যায় সুনিপুন বহুদর্শী দার্শনিক ও বৈদান্তিক, বাঙ্গালী পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অপর কেহ ছিলেন বলিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত কোন বিশেষ পরিচয় পাই নাই। মহামহোপাধ্যায় ৺রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধরভট্টাচার্য্য, মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে ৺মধুসূদন সরস্বতীর তুল্য সুতীক্ষ্ণ ধী সম্পন্ন পণ্ডিত অনেকেই বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে পারি; কিন্তু বেদান্তাদি নানা দর্শনে এরূপ কৃতিত্বের পরিচয় অন্য কাহারও পাওয়া যায়না, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবেনা।

জনশ্রুতি আছে পূর্ব্বে মৈথিলী পণ্ডিতগণ মৎস্যভোজী বলিয়া বাঙ্গালী দিগকে বেদান্তাদি অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতেন না। সেজন্য ৺মধুসূদন সরস্বতী দ্বাদশ বৎসর কাল আত্মগোপন পূর্ব্বক দণ্ডীর বেশ ধারণ করিয়া শুদ্ধাচারে মৈথিল পণ্ডিতের নিকট বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন, এবং বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে তাহার প্রচার করেন। যে সময়ে ৺রঘুনাথশিরোমণি প্রভৃতির শিষ্য-পরম্পরা নৈয়ায়িক সম্প্রদায় প্রবল হইয়া শতমুখে ন্যায়ের যুক্তি-যোজনায় শিক্ষিত মণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ পূর্ব্বক ন্যায়ের সিদ্ধান্তকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রাচারিত করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়েই ৺মধুসূদন সরস্বতী এই 'অদ্বৈতসিদ্ধি' প্রণয়ন করিয়া যুক্তিচক্ষে দেখাইয়াছেন যে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত সিদ্ধান্ত সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও চরম সিদ্ধান্ত।

মিথিলা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতগণ বেদান্তের যে সকল প্রকরণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র ন্যায় যুক্তিসর্ব্বস্ব ন্যায় শাস্ত্রের রীত্যবলম্বনে সূক্ষ্মতমবিচার পদ্ধতির অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থের বিচারনৈপুন্যে মুগ্ধ হইয়া অতি সমাদরের সহিত পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতগণ বহু কাল যাবৎ ইহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন। তাহার বিশেষ নিদর্শন এই যে পশ্চিম দেশীয় অনেক পণ্ডিত

এই অদ্বৈত সিদ্ধির 'লঘুচন্দ্রিকা' নামক একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন। পরে সেই লঘুচন্দ্রিকারও "বৃহৎচন্দ্রিকা" নামক অপর টীকা রচিত হইয়াছে।

(গ্রন্থের উদ্দেশ্য) নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই ধারণা-ছিল শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ কেবল কতকগুলি শ্রুতিবাক্য রূপ শব্দ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; পরন্তু তাহাতে কোন রূপ সুদৃঢ় যুক্তি বা অনুমানাদি প্রমাণান্তর নাই। আমাদের সেই কুসংস্কার দূরীকরণ মানসে বহুযুক্তির অবতারণা করিয়া অদ্বৈত-সিদ্ধ পদার্থ গুলিকে বিস্তৃতির সহিত সুশৃঙ্খল ভাবে বুঝাইয়া দেওয়াই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

(গ্রন্থের পরিচয়) গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র অক্ষরে ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এ গ্রন্থে ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত পদার্থের মিথ্যাত্বানুমান, মিথ্যাত্বের সংজ্ঞা, অবিদ্যার লক্ষণ, অবিদ্যার অস্তিত্বের প্রমাণ, জীবব্রহ্মাভেদ প্রভৃতি বেদান্ত সম্প্রদায় সিদ্ধ ৯৫পঁচানব্বইটী বিষয়ের সমাধান অতি সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত বিচার পূর্ব্বক নিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানি নৈয়ায়িকদের ভাষা ও যুক্তির অনুকরণে লিখিত হওয়ায় সাধারণের সুখবোধ্য হয় নাই। বিশেষতঃ বৈদান্তিক সম্প্রদায়-শূন্য বঙ্গ দেশে ইহার পঠন পাঠন অতি বিরল। বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের কিয়দংশ গবর্ণমেণ্ট উপাধি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় কথঞ্চিৎ আলোচনা হইতেছে।

যদিও এ পুস্তকের সম্যক্ মর্ম্ম সরল বঙ্গ ভাষায় প্রবন্ধাকারে পাঠকবর্গের গোচর করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য নহে; তথাপি প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে কয়েকটী কথা অবলম্বন পূর্ব্বক এ গ্রন্থের একটু আভাস প্রদান করিতেছি।

(ক) গ্রন্থকার প্রথমতঃ সত্যজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক একটী শ্লোক দ্বারা বক্তব্য সন্দর্ভের উদ্দেশ্য সূচনা করিয়াছেন। প্রমাণ বা যুক্তি দ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্ম নিশ্চয় করিতে হইলে পূর্ব্বে দ্বৈত জগৎ-প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা আবশ্যক, তাই তিনি প্রারম্ভেই অনুমাণ প্রমাণ উপন্যাস করিয়া ব্রহ্মভিন্ন সমস্ত বস্তুর মিথ্যাত্ব সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সেই অনুমান প্রণালী যথা "জগৎ মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, শুক্তিরৌপ্যবৎ" ইহার স্থূল মর্ম্ম এই যে ব্রহ্ম ভিন্ন নিখিল পদার্থই মিথ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তা নাহে, অচিরস্থায়ী, অনির্ব্বচনীয় পশ্চাদ্ভাবী

যথার্থ জ্ঞানদ্বারা বিলুপ্ত হয়, যে বস্তুর যাহা আশ্রয় বলিয়া আমরা মনে করি সেই আশ্রয়েই তাহার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রৈকালিক অভাব (নাসীৎ জগৎ ন ভবিষ্যতি জগৎ নেদং জগৎ) রহিয়াছে। ব্যবহার কালে আপাততঃ সত্য বলিয়া প্রতীত হয় বটে, বাস্তবিক পক্ষে বিবেচনা পূর্ব্বক পরমার্থ দৃষ্টিতে কখনও সত্য বলিয়া অনুভূত বা যুক্তি দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইবে না।

(হেতু) কারণ, ব্রহ্ম ভিন্ন সকল বস্তুই দৃশ্য, জড় এবং পরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ সকল সময় সকল স্থানে থাকেনা, অথচ পরস্পর বিভিন্ন। (উদাহরণ) যে যে বস্তু দৃশ্য, 'স্বপ্রকাশ নহে) জড় এবং পরিচ্ছিন্ন হইবে সে সমস্তই মিথ্যা হইবে; যেমন শুক্তিরূপ্য, (ঝিনুকের রূপা) মরু মরীচিকা, স্বপ্ন-প্রাসাদ, সর্পরজ্জু প্রভৃতি। শুক্তি, মরু প্রভৃতির অজ্ঞানবশতঃ তদীয় চাকচিক্যাদি দর্শনে তাহাতে যেরূপ রৌপ্য, জলাদির আপাততঃ ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তদনুযায়ী সেই সেই বস্তু হইতে রৌপ্য, জল প্রভৃতি গ্রহণ করিবার জন্য প্রবৃত্তি, প্রীতি, ভীতি প্রভৃতি ব্যবহারিক ফল নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, পরে কোন কারণ বশতঃ শুক্তি, মরু প্রভৃতির যথার্থ জ্ঞানোদয় হইবা মাত্র (নেদং রজতং শুক্তিরিয়ং নেদং জলং বস্তুতো মরুরয়ং) তৎসমস্তই—পূর্ব্বোক্ত ত্রৈকালিক অভাব নিশ্চয় দ্বারা মিথ্যা শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে; তদ্রূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যাপ্রযুক্ত জীবের ব্রহ্মরূপ পরমবিশাল মরুভূমিতে এ জগৎ প্রপঞ্চ—অধ্যস্ত হইয়া আপাত সত্যরূপে পরিণত হইয়া লৌকিক যাবতীয় ব্যবহার সম্পাদিত হইতেছে, বাস্তবিক সত্য নহে।

(খ) তুমি যে মিথ্যা বলিয়া অনুমান করিতেছ, সেই মিথ্যা কথাটা দ্বারা কি বুঝাইতেছে—? এই প্রশ্নোত্তরে তিনি পাঁচপ্রকারে 'মিথ্যাশব্দের' সংজ্ঞা করিয়া এরূপ পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়াছেন যে তাহাতে নৈয়ায়িক, বৌদ্ধ, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি সমস্ত বাদীগণের মতেই জগৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।

তৎপর তার্কিকগণ এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে তুমি জগতের উপর যেই মিথ্যাত্বের অনুমান করিতেছ সেই মিথ্যাত্ব পদার্থটি মিথ্যা কিনা? প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, মিথ্যাত্ব পদার্থটি যদি মিথ্যা হয়, তবে সাধনীয় মিথ্যাত্বের আশ্রয় জগৎপ্রপঞ্চ সত্য হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বের দ্বারা জগতের সত্যতা লুপ্ত হইতে পারে না, বিশেষতঃ একই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চে বাদীর অভিমতের সত্যতা ও প্রতিবাদীর অভিমতের মিথ্যাত্ব, আলোকও

অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ। এ দুইটী পদার্থের মধ্যে একটী মিথ্যা হইলে অপরটী সত্য হওয়া স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া জগতের মিথ্যাত্ব সাবিত হইতেছেনা। যদি সেই মিথ্যাত্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার কর, তবে ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, যেহেতু—মিথ্যাত্ব পদার্থটীও ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ প্রপঞ্চের অন্তর্গত।

এইভাবে ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় মিথ্যাত্বরূপ পদার্থটী সত্য বলিয়া পরিগণিত হইলে উভয়থাই অদ্বৈতবাদের হানি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এই প্রশ্নোত্তরে ৺মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, আমি সাধনীয় মিথ্যাত্ব পদার্থকে মিথ্যাই বলিব, সেজন্য মিথ্যাত্বের আশ্রয় জগৎপ্রপঞ্চ সত্য হইতে পারে না, আরোপিত শুক্তি-রজতে মরুজলে যেই মিথ্যাত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে সেই মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেই কি শুক্তিরজত, মরুজল কখনও সত্য হইয়া দাঁড়ায়? বিশেষতঃ আমি মিথ্যাত্ব পদার্থটীকেও জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত করিয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত সর্ব্বমিথ্যা সাধন করিতেছি,, তাহাতে আবার মিথ্যাত্ব মিথ্যা কিনা এ প্রশ্নের উদয় হয় কিরূপে?—

(গ) তৎপর, পূর্ব্বোক্ত হেতুর অন্তর্গত দৃশ্য, জড়, পরিছিন্ন কাহাকে বলে? ব্রহ্মইবা দৃশ্য, জড়, পরিছিন্ন নয় কেন? এ প্রশ্নের যথাযথ প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক* বাদীগণের সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন, এবং দৃশ্যত্বাদি, যুক্তির মধ্যে বাদীগণ যে সকল হেত্বাভাস (Fallacy) দেখাইয়াছিলেন, সে সমস্তই অতি নিপুণতার সহিত অপনয়ন করিয়াছেন।

(ঘ) পুনর্ব্বার তার্কিকগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—পরিদৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই সদ্বস্তু বলিয়া সর্ব্বজনীন (ঘটঃ সন্ বৃক্ষঃ সন্, গৃহং সৎ) প্রত্যক্ষ হইতেছে, এ অবস্থায় কতগুলি শুষ্ক যুক্তি বা অনুমান দ্বারা কিরূপে জগৎ প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিতে পার? তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন,—তোমরা জগৎ প্রপঞ্চের এমন একটা সত্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিবে না, যাহা প্রতীয়মান নিখিল পদার্থে প্রত্যক্ষ হইতেছে, অথচ আমার পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত মিথ্যাত্বের সহিত একসঙ্গে অবস্থান করিতে পারেনা। কারণ তোমাদের মনে রাখা উচিত যে বেদান্তীগন, মিথ্যাত্বের অভাবকেই সত্যতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না; কারণ, তাহা হইলে, বন্ধ্যাপুত্র, কুর্ম্মরোম, আকাশ-কুসুম প্রভৃতি যাহা নিতান্ত অপদার্থ বা অলীক তাহাতেও মিথ্যাত্বের অভাব আছে বলিয়া (অপদার্থে মিথ্যাত্বরূপ পদার্থও আসেনা) তাহাদের সত্যতা সিদ্ধান্তিত

হইতে পারে ? তোমাদের এরূপ আরও একটী সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্রহ্মের যেরূপ সত্যতা, তত্তুল্য সত্যতাই নিখিল পদার্থে উপলব্ধি হইতেছে। এরূপ সন্দেহ করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হয় না; কারণ, ব্রহ্মরে সত্যতা বলিলে, দেশ, কাল ও বস্তুগত অপরিচ্ছিন্নতা, স্বপ্রকাশাদ্বিতীয় চৈতন্যরূপতা বুঝিতে হইবে, সুতরাং তোমাদিগকে বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে, ব্রহ্মের তুল্য সত্যতা কখনও জগৎপ্রপঞ্চে উপলব্ধ হয় না। সে যাহা হউক সম্প্রতি তোমাদের স্থূল দৃষ্টির পক্ষপাতী হইয়াই বলিতেছি 'সন্ ঘটঃ' বলিয়া যে সত্যতার প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা ব্যবহারিক সত্যতামাত্র, পারমার্থিক নহে। (সত্ত্বং ত্রিবিধং পারমার্থিকং ব্যবহারিকং প্রাতিভাসিকঞ্চ পারমার্থিকং ব্রহ্মণঃ ব্যবহারিকং ঘটপটাদীনাং প্রাতিভাসিকং শুক্তিরূপ্যাদীনাং) বস্তুতঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বলিতে হইলে আমাকে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে লাঘবতঃ একমাত্র ব্রহ্ম-সত্যতা দ্বারাই যাবতীয় পদার্থের সত্যতা প্রত্যক্ষের উপপত্তি সম্ভব হইলে অতিরিক্ত ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন বা প্রমাণ নাই। আমি এই ভাবে 'ঘটঃ সন্' প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের সত্যতা প্রত্যক্ষের বিষয় নির্দ্দেশ করিব যে নিখিল বস্তুর আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মের সত্ত্বাই সেই সেই বস্তুতে প্রত্যক্ষ হইতেছে, ব্রহ্মসত্ত্বার অতিরিক্ত সত্ত্বা ঘটাদির নাই।—যদি বল; নিরাকার ব্রহ্মগত সত্যতার প্রত্যক্ষ, যাবতীয় বস্তুতে কিরূপে সম্ভবে? তদুত্তরে বলিব—'এ সময়ে আমি এখানে আছি' এরূপে যেমন রূপহীন সময়ের (কালের) সর্ব্বজনীন প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মসত্ত্বারও প্রত্যক্ষ নিষ্পন্ন হইতে কোন বাধা নাই; সুতরাং এখন বলিতে পারি প্রত্যক্ষ দ্বারা আমার মিথ্যাত্বানুমান কিছুতেই বাধিত হইতেছে না, প্রত্যুতঃ প্রতিকূলভাবে তোমাদের * প্রদর্শিত ঘটঃ সন্ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ আমার অদ্বৈত বাদের অনুকূলই হইতেছে।

(৬) তৎপর, বাদীগণ পূর্ব্বের প্রশ্নটীরই প্রকৃত অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিবার জন্য অন্য প্রণালীতে পুনর্ব্বার প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন, ব্রহ্মসত্ত্বার অতিরিক্ত সত্ত্বা নিখিল বস্তুর নাই একথা বরং আপাততঃ স্বীকারই করিলাম,

* "দৃশ্যত্বং নাম, অন্তঃকরণবৃত্তি ব্যাপ্যত্বং" সাধারণত্বং, কদাচিৎ কথঞ্চিৎ বিষয়ত্বং, অস্বপ্রকাশত্বং বা জড়ত্বং নাম, অজ্ঞানত্বং অনাত্মত্বং বা। পরিচ্ছিন্নত্বং, ত্রিবিধং দেশতঃ কালতো-বস্তুতশ্চ, তত্রদেশতঃ পরিচ্ছিন্নত্বং নাম, অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বং। কালতঃ পরিচ্ছিন্নত্বং নাম ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বং। অন্যোন্যাভাব প্রতিযোগিত্বং বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নত্বং"—ইতি অদ্বৈতসিদ্ধিঃ।

কিন্তু এই যে চন্দ্র, সূর্য্য, গিরি, সমুদ্র, গৃহ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি শ্বেত, রক্ত, হ্রস্ব দীর্ঘাদি আকার পরিমাণ বিশিষ্ট বস্তু সকল সর্ব্ব সাধারণের প্রত্যক্ষে ভাসমান হইতেছে, তাহাদের অপলাপ (অভাব নিশ্চয়) অনুমান দ্বারা কিরূপে সম্ভব হয় ? কারণ, অনুমান প্রমাণাপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনেক প্রবল, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ জ্ঞানোৎপাদন করিতে অপর কোন প্রমাণের সহায়তা গ্রহণ করেনা, রূপ আলোকাদির সমাবেশে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের (পদার্থের) সম্পর্ক হওয়া মাত্রেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, অনুমান প্রভৃতি অন্যান্য প্রমাণ সাক্ষাৎ-পরম্পরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহায়তা গ্রহণ করিয়া জ্ঞান উৎপাদন করে ; সুতরাং প্রত্যক্ষাপেক্ষা অনুমান দুর্ব্বল বলিয়া প্রত্যক্ষ দ্বারা তোমার মিথ্যাত্বানুমান বাধিত হওয়া উচিত। যেমন উষ্ণতা প্রত্যক্ষ দ্বারা অগ্নির শীততানুমান ("অগ্নিঃশীতঃ দ্রবত্বাৎ জলবৎ," অগ্নি উষ্ণ নহে, কারণ অগ্নি দ্রব পদার্থ, যেমন জল) বাধিত হয়। দুর্ব্বল কখনও প্রবলের বিষয় অপহরণ করিতে পারেনা, সিংহের সন্তান শৃগাল কর্ত্তৃক অপহরণ হওয়া সম্ভাবিত নহে। এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ৺মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন,—

প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণের প্রবলতা ও দুর্ব্বলতা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত তাহাদের নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষভাব কারণ রূপে গৃহীত হইতে পারেনা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপর কোন প্রমাণের সহায়তা গ্রহণ করে না বলিয়াই অনুমানাপেক্ষা প্রবল হইবে, একথার কোন অর্থ নাই

প্রত্যক্ষ প্রমাণ, স্বকার্য্যে অনুমানাদিকে অপেক্ষা না করিলেও রূপ, আলোক, মহত্ব,—বিষয়, সন্নিকর্ষ প্রভৃতির সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করে। একধারে নিরপেক্ষভাবে কোন কারণই কার্য্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যদি এই কারণেই প্রত্যক্ষ প্রবল বলিয়া মিথ্যাত্বানুমান দ্বারা বাধিত হইবেন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে বল দেখি, রঙ্গে রজত, শঙ্খে পীততা এবং গুড়ে তিক্ততার প্রত্যক্ষ হইলেও পশ্চাৎ—অনুমান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্যরূপ প্রমাণ দ্বারা সেই প্রত্যক্ষ সকল বাধিত হয় কেন ? আকাশে নীলতা, চন্দ্র-তারকার ক্ষুদ্রতার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, আত্মার রূপবত্ত্বা (গৌরোঽহং কৃষ্ণোঽহং) ও আংশিকতার (অহং গৃহে এব সাম্প্রতমস্মি) মানস প্রত্যক্ষ অনুমান ও শ্রুতি বাক্য দ্বারা বাধিত হয় কিরূপে ? অতএব তোমাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে সাপেক্ষ নিরপেক্ষভাব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রাবল্য দৌর্ব্বল্যের হেতু নহে ; পরন্তু নির্দ্দোষতা ও পরীক্ষিততাই তাহাদের প্রাবল্য দৌর্ব্ব

ন্যের অসাধারণ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমান বলিয়া কোন কথা নাই, যে স্থলে যেই প্রমাণটী নির্দ্দোষভাবে পরীক্ষিত হইবে সে স্থলে সেই প্রমাণই প্রবল হইবে। তাই,—অগ্নির শীততানুমান হেত্বাভাস দোষগ্রস্ত বলিয়া পরীক্ষিত হওয়ায় প্রবল উষ্ণতা-প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহা বাধিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আমার মিথ্যাত্বানুমান সেরূপ দুর্ব্বল হইবে না,—কারণ, যতই পরীক্ষা কর না কেন তাহাতে কোনরূপ দোষ উদ্ভাবন করিতে পারিবে না। আমি সমস্ত দোষ ক্ষালন পূর্ব্বক মিথ্যাত্বানুমানকে দৃঢ়তর প্রমাণরূপে অদ্বৈতবাদের পক্ষে দণ্ডায়মান করিব।

দ্বিতীয়তঃ—আমার পরীক্ষিত সঝমিথ্যাত্বানুমানের সহায়রূপে অকাট্য শ্রুতিপ্রমাণ অবস্থিত আছে, শ্রুতি প্রমাণ কখনও বিশ্বের পৃথক্ সত্ত্বা প্রত্যক্ষের পক্ষপাতী হইবে না। ভগবতী শ্রুতি সহস্র মুখ বিস্তার করিয়া বলিতেছেন, "একমেবাদ্বিতীয়ং" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "নেহনানাস্তি কিঞ্চন" "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি"। এই সকল শ্রুতির দ্বৈত-পক্ষে অর্থ করা কিছুতেই সঙ্গত বলিতে পারিবে না। বিশেষ বিচারপূর্ব্বক দেখিলেও অদ্বৈতপক্ষেই এসকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারিত হইবে। আমি পরবর্ত্তী গ্রহে বহু যুক্তি দ্বারা দেখাইব যে শ্রুতিপ্রমাণ সর্ব্বপ্রমাণাপেক্ষা দৃঢ়তম ও শীর্ষ স্থানীয়।

(চ) তবে কি পরিদৃশ্যমান এ বিচিত্র বিশ্বটা আকাশকুসুম, একেবারে অলীক?

তাহা নহে সামান্য একটু পার্থক্য আছে,—যাহা আমি তোমাদিগকে স্থূলদৃষ্টিতে ব্যবহারিক সত্ত্বার কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, যেমন প্রথমতঃ শুক্তি মরু প্রভৃতি গত অবিদ্যাপ্রযুক্ত রজত-জলাদির ভ্রম জন্মিয়া প্রবৃত্তি, প্রীতি হইয়া থাকে, তৎপর শুক্তি প্রভৃতির যথার্থ জ্ঞানোদয় হইবামাত্র অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায় তৎপর সেই প্রবৃত্ত্যাদি সমস্ত তিরোহিত হয়,—তদ্রূপ জীবগণের অবিদ্যাবশতঃ সমুদ্রে অনন্ত জল বুদ্‌বুদের ন্যায় পরমব্রহ্মে এ বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চ ভাসমান বা অধ্যস্ত হইতেছে, আবার যখন শম নিয়মাদি সাধন সম্পত্তি দ্বারা স্ফটিকের ন্যায় চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদিত হইয়া উদ্দীপ্ত অনন্ত শিখা বিস্তার পূর্ব্বক পরমাত্ম-জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে তখন অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত হইয়া জগৎ-প্রপঞ্চ তুলারাশির ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া পরমব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইবে। "অহং ব্রহ্মাস্মি" "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং"—বলিয়া পরমানন্দ মহা সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে, পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে না,

"যত্র ত্বস্য সর্ব্ব মাত্মৈ বাভূৎ তত্র তৎ কেন কং পশ্যেৎ
কেনকং বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারমরে কেন
বিজানীয়াদিতি। বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ"—ইতি——

শ্রীশিবঃ।　　শ্রীরমেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী।

বিদায়ের পর।

সেই গেছে সে,—

কাঁদাইয়া অভাগারে

ভাসাইয়া আঁখি-নীরে,

আবার আসিব বলি নীরব ভাষে,

সেই গেছে সে!

(২)

সেদিন নিকুঞ্জ বনে ফোটেনিত কোন ফুল,

আদরে চুমিতে তারে বসেনিত অলিকুল,—

কোকিল গাহেনি গান সুখতান তুলিয়া,

বিয়োগ কাতর ফুল পড়ে-ছিল ঝরিয়া

মলয় সে দিন কই যায়নিত বহিয়া

কুসুম সুগন্ধ-রাশি, বিনামুলে মাখিয়া,

বিমল কৌমুদী রাশি, বিধুর সে মধুহাসি,

মলিন হইয়ে ছিল মেঘ পরশে,

আজি শুধু মনে হয় 'সেই গেছে সে'।

(৩)

(শুধু) পিপাসিত চাতকের বুক ভরা দুঃখতান,

সুধালোভী চকোরের মিনতি মাখান গান,

" কেবল জাগিতেছিল সে দিনের বিমানে,

(আর) বিঁধেছিল খরশেল ব্যাকুলিত পরাণে

বিধুরা প্রকৃতি ছিল যেন এক আবেশে,

অজি শুধু মনে হয় 'সেই গেছে সে'।

(৪)

(আজি) মনে হয় সে দিনের প্রেম মাখা চাহনি,

তেমন নয়ন তার কখন'ত দেখিনি,

বিদ্যুৎ লতিকা সম, সে দেহ, সে মুখানি

অহিকুল- নিন্দিত কেশপাশ দোলানি,

(আর) যাতনার সাক্ষী দুই নয়নের দু'পাশে,

আজি শুধু মনে হয়—'সেই গেছে সে'।

শ্রীনিত্য গোপালমুখোপাধ্যায়

বাবর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী।

ভারতবর্ষে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি বাবরকে কোন কোন বিলাতী ঐতিহাসিক পূর্ব্বদেশের সিজার এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বাবর-সম্বন্ধে অনেক রকমের কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, এই সকলের সংখ্যা এত বেশী এবং এইগুলি এতই বিচিত্র রকমের যে বাবরকে "পূর্ব্বদেশের সার্লেমেন্" বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

বাবর সম্বন্ধে এই রকমের একটি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, যে বাবর এক বার তাঁহার কয়েকজন সভাসদের সহিত মুসলমান পরিব্রাজকের বেশে গুপ্ত-ভাবে সমুদয় অবস্থা অবগত হইবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এ অবশ্য তাঁহার ভারতবর্ষ জয় করার আগের ঘটনা। সিকন্দার লোদি তখন দিল্লীর বাদশাহ। বাবর ও তাঁহার সভাসদ্গণ ধরা পড়িয়া গিয়াছিলেন। সিকন্দর লোদি এত মহৎ লোক ছিলেন যে তিনি তাঁহাদের কোনরূপ শাস্তি দেন নাই, নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন, কেবলমাত্র এইটুকু স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন যে সিকন্দরের জীবিত কালে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন না। বাবর এই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন, সিকন্দর যত-দিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই, সিকন্দরের মৃত্যুর পর তিনি ভারতবর্ষে আসেন ও সিকন্দরের পুত্র ইব্রাহিমকে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করেন।

বড় বড় ঐতিহাসিকদের এই মত যে ছদ্মবেশে বাবরের ভারতবর্ষ আসা সত্য হইতে পারে না। কিন্তু এই কিম্বদন্তী খুব প্রাচীন। দে লায়েৎ (De Laet) নামক খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর হলাণ্ড দেশীয় ঐতিহাসিক ইহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই সংবাদ বান্ দেন্ ব্রইকি (Van den Broecke) নামক সুরাতের শাসন কর্ত্তার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে লাহোরের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে ইহা লিখিত ছিল। সম্ভবতঃ 'ফিঞ্চ' ও এই কিম্বদন্তী উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক 'মানুসি' ও এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি বলেন যে বাবর মুসলমান পরিব্রাজক সাজিয়া ভারতবর্ষে আসেন নাই, হিন্দুযোগীর বেশে আসিয়াছিলেন, আর তাঁহার 'প্রধানমন্ত্রী রঙ্গুইলদাস' তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

আফ্‌গান দেশে বাবর সম্বন্ধে আর এক গল্প প্রচলিত আছে। বাবর একবার ছদ্মবেশে আফ্‌গানিস্থানের অন্তর্গত 'য়ুসুফ্‌জাই' দেশে গমন করিয়াছিলেন। সেই দেশের যিনি সামন্ত নরপতি তাঁহার কন্যার নাম বিবি মবারিকা'। বাবরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়—এবং চারি চক্ষুর মিলনের পর তাঁহারা পরস্পর প্রণয়াসক্ত হয়েন। 'বিবি মবারিকা' বাবরকে একটি পাত্রে করিয়া খাদ্য দ্রব্য ও সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বাবর এই পাত্র খানি দুখানি পাথরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর তিনি 'য়ুসুফ্‌জাই' দেশের সামন্ত নরপতির নিকট দূতমুখে এই সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি 'বিবি মবারিকা' কে বিবাহ করিতে চাহেন। তাঁহার এইরূপ প্রার্থণার কারণ এই যে তিনি 'বিবি মবারিকা'কে দেখিয়াছেন ও তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। এই কথায় যদি তাঁহাদের বিশ্বাস না হয় তাহা হইলে যে পাত্র তিনি পাথরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার উক্তির প্রমাণ স্বরূপে তাঁহারা সেই লুক্কায়িত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে পারেন। 'য়ুসুফজাই' দেশের রাজা দূতমুখে বাবরের কথা শুনিয়া সেই পাত্রের অনুসন্ধান করিলেন এবং তৎকথিত স্থানে ও অবস্থায় তাহা পাইলেন।' ইহা ছাড়া রাজনীতিক কারণ ও ছিল, তিনি বাবরের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 'বিবি মবারিকা'র খুল্লতাত তাঁহাকে কাবুলে লইয়া আসিলেন, বাবরের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল, তিনি বাবরের একজন প্রেয়সী মহিষী ছিলেন। গুল বদন্ বেগমের জীবনস্মৃতিতে এই বিবি মবারিকাই 'আফ্‌গানী মহিষী' নামে কথিতা হইয়াছেন।

বাবর সম্বন্ধে যে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত থাকিবে, তাহা মোটেই আশ্চর্য্য নহে। ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বলেন যে এশিয়া মহাদেশে যত রাজা রাজ্য করিয়াছেন তন্মধ্যে বাবর সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। (The most admirable prince that ever reigned in Asia.) বাবরের জীবন চরিত বড়ই বিচিত্র, ও উপন্যাসের মত কৌতুকাবহ। তিনি বহুবার আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। খুব শৈশবেই তাঁহার দুরবস্থা আরম্ভ হয়। তাঁহার পিতা ফার্‌গনা প্রদেশের রাজা ছিলেন। এই ফর্‌গনা এখন রুশ রাজ্যের অন্তর্গত। বাবরের পিতার বয়স যখন একত্রিশ বৎসর সেই সময়ে পায়রার ঘর পড়িয়া তাঁহার অকালে অপঘাত মৃত্যু হয়। বাবরের বয়স তখন বার বৎসর, তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র কাজেই তাঁহার পিতৃব্যগণের আক্রমণ

হইতে পিতার রাজ্য রক্ষা করার ভার এই বাল্য কালেই তাঁহার উপর পতিত হয়। তাঁহার পিতৃব্য ও তাঁহার মাতুল তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। একজন আসেন উত্তর দিক হইতে, আর একজন আসেন দক্ষিণ দিক হইতে। 'আন্দিজান্' নামক স্থানে তখন বাবরের বাসস্থান। তাঁহারা দুইজন সসৈন্যে দুই দিক হইতে আক্রমণের অভিপ্রায়ে বাবরের বাসস্থানের কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে বাবরকে আক্রমণ করা প্রথমে তাঁহারা যতটা সহজ মনে করিয়াছিলেন, তাহা ততটা সহজ নহে। দেশের প্রজাগণ বাবরের চারিদিকে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাহাদের বালক রাজাকে প্রাণ-পাত করিয়াও রক্ষা করিবে। এ দিকে আক্রমণকারী সৈনিকদলের মধ্যে ভয়ানক ব্যাধি আরম্ভ হইল। একজন স্বদেশ প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়ে পথে মারা গেলেন, আর একজন মোগলিস্থানের বন-প্রদেশে ফিরিয়া গেলেন।

ইহার পর বাবরের ভাগ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনবার তিনি সমরকন্দ অধিকার করেন। দ্বিতীয়বার যখন অধিকার করেন তখন তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর। এই সময়ে তিনি যে সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন, তাহা একেবারে আশ্চর্য্য। তিনবার সমরকন্দ অধিকার করেন বটে কিন্তু মাসকয়েকের অধিক কোনবারেই সমরকন্দ নিজের অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। সমরকন্দ লইয়া তাঁহার সাইবানি খাঁর সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। সাইবানি খাঁ উজবেগ জাতীয় লোক—বাবর অপেক্ষা তাঁহার বয়স অনেক বেশী, আর তিনিও একজন বেশ যোদ্ধা ছিলেন। বাবর 'তাইমার লেন' এর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার মাতার দিক দিয়া জঙ্গিস্ খাঁর সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। বাবরের মাতামহ জঙ্গিস্ খাঁর দ্বিতীয় পুত্রের বংশে জন্মাইয়াছিলেন। সাইবানি খাঁ, জঙ্গিস খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বুজি খাঁর বংশধর। সমরকন্দের সিংহাসন লইয়া এই জন্যই উভয়ের বিবাদ।

সাইবানি খাঁ ও বাবর, এই দুইজনের মধ্যে চরিত্রগত অনেক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েই খুব নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন, উভয়েরই খুব সাহিত্যানুরাগ ছিল, উভয়েই কবি ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় সাইবানি খাঁ নিজের জীবন-কথা নিজে না লিখিয়া, একজন অপকৃষ্ট তুরস্ককবি দ্বারা তাহা রচনা করাইয়াছিলেন। সকলেই জানেন বাবর নিজেই নিজের জীবন কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই জীবন কথার মধ্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয়

বিষয় মোটেই বর্ণিত হয় নাই। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে বাবর যে কেন কিছু লেখেন নাই তাহা নির্ণয় করা যায় না। অবশ্য এই সমুদয় বিষয়ের মধ্যে এমন কিছু কিছু আছে যাহা প্রকাশ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু একবার তিনি পাঁচশত মাত্র সৈন্য লইয়া কাবুলে তিন হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিজয় লাভ করেন এবং দ্বৈরথ যুদ্ধে (in single combat) পাঁচ জন শত্রুকে ক্রমান্বয়ে হত্যা করেন। এত বড় একটি ঘটনা তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে যে কেন লিপিবদ্ধ করেন নাই, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। এক সময়ে তিনি ইস্মাল্ সুফির প্রজা ছিলেন ও আপনাকে 'সিয়া' মতাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিতেন, এই ঘটনাটি আত্মজীবনীতে উল্লেখ না করার কারণ বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি অসুখকর ঘটনা যখনই বর্ণনা করিয়াছেন, সমস্ত কথা প্রায়ই বলেন নাই, কিছু কিছু গোপন করিয়া গিয়াছেন। যেমন সমরকন্দ পরিত্যাগ করিতে যখন তিনি বাধ্য হইলেন, তখন তিনি এ কথাটুকু আর বলিলেন না, যে তাঁহার ভগ্নিকে সইবানির সহিত বিবাহ দিয়া তবে তিনি মুক্তি লাভ করিলেন। বাবরের এই ভগ্নির নাম খান্‌জাদ্। হতভাগিনী খান্‌জাদেরও জীবনের উপর দিয়া অনেক দুঃখ, কষ্ট ও ভাগ্য-বিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সাইবানির ঔরসে তাহার একটি পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু সাইবানি তাহাকে বড়ই সন্দেহের সহিত দেখিত। সাইবানি ভাবিত যে খান্‌জাদ্ তাহার ভ্রাতা বাবরকে বড়ই ভালবাসে, সুতরাং একদিন বাবরের হিতার্থে তাহার অনিষ্ট সাধনও করিতে পারে। এই প্রকার ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া সাইবানি খান্‌জাদ্‌কে যথারীতি পরিত্যাগ করে। সাইবানি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া খান্‌জাদ্ একজন সুপরিচিত সৈয়দকে বিবাহ করে। 'মার্ভ' এর যুদ্ধে এই সৈয়দ নিহত হয়, এই যুদ্ধে সাইবানিও প্রাণত্যাগ করে। সুতরাং এই একদিনেই খান্‌জাদের দুই স্বামীরই মৃত্যু হয়। বাবর বলিয়াছেন যে খান্‌জাদের পুত্র বেশ সুপুরুষ যুবক, পিতা সাইবানির মৃত্যুর পর সে 'বলখ' এর শাসন কর্ত্তা হইয়াছিল। কিন্তু দুই তিন বৎসরের অধিক রাজ্যভোগ তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। পূর্ব্বোক্ত সৈয়দের মৃত্যুর পর খান্‌জাদ্, মেহদি খোজা নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করে —এ লোকটিও বেশ ভাল লোক ছিল না, বাবরের মৃত্যুর পর এ ব্যক্তি হুমায়ুনকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং ভারতরাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করে। যাহা হউক খান্‌জাদ্ বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন, তাহার প্রিয় ভ্রাতা বাবরের পৌত্র আকবর যখন শিশু, তখন খান্‌জাদ্ তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন।

আকবরের বয়স যখন আড়াই বৎসর তখন খান্‌জাদ্‌ তাঁহার ভার গ্রহণ করেন। খান্‌জাদ্‌ শিশু আকবরকে বড়ই ভাল বাসিতেন। এইরূপ কথিত আছে যে তিনি আকবরের হস্ত ও পদ চুম্বন করিতেন ও বলিতেন এই হস্ত পদ আমার ভ্রাতা সম্রাট বাবরের হস্ত পদ। গুলবদন বেগমের জীবন-স্মৃতিতে এই ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়। কাবুলের নিকটে খান্‌জাদের মৃত্যু হয়, তাঁহার ভ্রাতা ও স্বামীর কবরের পার্শ্বেই তাঁহার দেহ সমাহিত হইয়াছে।

এগার বৎসর কালের ঘটনা অর্থাৎ ১৫০৮ হইতে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, বাবর তাঁহার জীবনের ঘটনা কিছুই বর্ণনা করেন নাই। এই সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনা সম্বন্ধে এক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা এইরূপ ঃ

সমরকন্দ তৃতীয়বার অধিকার করিয়া তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। ১৫১২ খৃষ্টাব্দ, বাবর সমরকন্দ হইতে পলায়ন করিতেছেন। তিনি খোজেন্দ নদের (প্রাচীন জাক্‌সার্‌তিস্‌) তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই নদ ফার্‌গনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে আরল সাগরে পতিত হইয়াছে। আফাক্‌ বেগম নামক বাবরের এক পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। এই নদতীরে তিনি একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। সম্ভবতঃ এই সন্তান প্রসবকালে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। ভীষণ শত্রুভয়ে ভীত হইয়া তাঁহারা দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছেন, এ অবস্থায় এই শিশু পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। কি করা যায়? ছেলেটিকে বেশ মুড়িয়া সুড়িয়া এক মূল্যবান দোলনায় শোয়াইয়া নদীতীরে রাখিয়া দেওয়া হইল। বাবর ও তাঁহার সঙ্গীগণের আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই, তাঁহারা দ্রুতবেগে পূর্ব্বমুখে ধাবমান হইলেন। চলিয়া যাইবার সময় বাবর একজন বিশ্বাসী অনুচরকে সেই নদতীরে রাখিয়া গেলেন, তাহাকে বলিয়া গেলেন "তুমি নিকটে এক জায়গায় লুকাইয়া থাক, ও পর্য্যবেক্ষণ কর, গ্রামের লোকেরা কেহ আসিয়া এই সদ্যজাত শিশুটিকে লইয়া যায় কি না। যদি লইয়া যায়, তাহা হইলে তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না, তুমি আমাদের অনুসরণ করিও।

কিছুক্ষণ পরে শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে উজবেগ জাতীয় কৃষকগণ নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মূল্যবান দোলনায় বহুমূল্য শয্যায় শায়িত সুন্দর শিশুটিকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইল। গ্রামের লোকেরা কিছুক্ষণ পরস্পর নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া দোল্‌না ও

শয্যাসহ শিশুটিকে লইয়া চলিয়া গেল। বাবরের যে অনুচর লুকাইয়া ছিল সে এই পর্য্যন্ত দেখিয়া তাহার প্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য সে স্থান ত্যাগ করিল।

যে সমস্ত লোক শিশুটিকে নদীতীরে প্রথম দেখিতে পায়, তাহারা তিন খানি গ্রামের অধিবাসী। তাহারা নদীতীরে যাহা পাইল তাহা তিন ভাগে ভাগ করিল। একখানি গ্রামের লোকেরা দোল্না খানি পাইল, একখানি গ্রামের লোক শিশুর অঙ্গের স্বর্ণ ও হীরকের অলঙ্কারগুলি লইল, আর এক-খানি গ্রামের লোক শিশুটিকে লইল। শিশুটির নাম হইল আলটান্ বেশাক। একজন ধাত্রী শিশুটিকে সযত্নে লালনপালন করিতে লাগিল। কথিত আছে যে বাবরের অবস্থার উন্নতি হইলে পর তিনি বালকের অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠাইলেন, যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে তাঁহার নিকট লইয়া আসিবেন এইরূপ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গ্রামবাসীগণ যখন জানিতে পারিল যে এই শিশু তাইমার লেনের বংশধর, তখন তাহারা তাহাকে কিছু-তেই ছাড়িয়া দিল না। তাহারা তাঁহাকে আপনাদিগের শাসন কর্ত্তার পদে অভিষেক করিল। তাঁহার বিবাহ হইল। এই আলুটানের বংশধরগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ফারগনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। 'এম্, নালিভকিনে' (ব্লাদিমির পেত্রোভিনে) নামক একজন রুশিয়া দেশীয় কর্ম্মচারী এই কিম্বদন্তী বর্ণনা করিয়াছেন। এই রুশীয় কর্ম্মচারী ফারগণা বা খোকন্দ এ বাস-স্থাপন করিয়াছিলেন। তারিখ সা-রুখি নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার মোল্লা নেওয়াজ মহম্মদও এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার পিতৃ-পুরুষগণ এক শতাব্দীর অধিক কাল ফরগনার রাজাদিগের অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে তাঁহার পুত্র ফারগনার রাজা হইয়াছে, এসংবাদ বাবর পাইয়াছিলেন। এ সংবাদ যদি পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বাবর নিশ্চয়ই খুব আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, কারণ বাবর যখন ভারতের সম্রাট, তখন সেই গৌরব ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসিয়াও তাঁহার পিতৃ রাজ্য হস্তচ্যুত হওয়ার জন্য তিনি দুঃখ করিতেন।

বাবর সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ কিম্বদন্তী যাহা প্রচলিত আছে তাহা অনেকেই জানেন। এই ঘটনাটি এই যে তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্র হুমায়ুনের রোগ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন সম্ভল দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সেখানে তাঁহার খুব ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। ফলে তাঁহাকে সম্ভল হইতে

আগরায় লইয়া আসা হয়, বাবর ও তাঁহার স্ত্রী একাগ্র চিত্তে পুত্রের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু চিকিৎসকগণ নানা চেষ্টাতেও কিছু করিতে পারিলেন না। আর আশা নাই, এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইল। পরিশেষে এক জন সাধু বলিলেন যে সম্রাট যদ্যপি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ও প্রিয় সম্পত্তি যে কোহিনুর হীরক, তাহা বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমুদয় দরিদ্রদিগকে দান করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্র আরোগ্য লাভ করিতে পারে। বাবর বলিলেন "একখানি পাথরের আর দাম কি ? হুমায়ুন আমার প্রিয়তম ধন আর আমি হুমায়ুনের প্রিয়তম ধন, সুতরাং হুমায়ুনের জীবন রক্ষার জন্য আমি আমার নিজের জীবন প্রদান করিব, আমি হুমায়ুনের রোগ গ্রহণ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্পাত্মিকা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা হুমায়ুনের রোগ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন ও তিনবার হুমায়ুনের শয্যার চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বলিলেন "আমি তাহার রোগ লইয়াছি।"

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে ইহার অব্যবহিত পরেই হুমায়ুন সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন ও স্নানাহার করিলেন, আর বাবর যে শয্যাশায়ী হইলেন আর উঠিলেন না। হুমায়ুনের নিকট বাবরের এই শেষ অনুরোধ ছিল যে কনিষ্ঠ সহোদরগণ তাঁহার যতই অনিষ্ট করুক না কেন তিনি যেন সর্ব্বদা তাহাদের ক্ষমা করেন। হুমায়ুন যদিও খুব দুর্ব্বলচিত্ত লোক ছিলেন তথাপি তাঁহার পিতার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রাণপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা কামরানকে শাস্তি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা তিনি একেবারে অনন্যোপায় হইয়া এবং তাঁহার রাজ্যের যাঁহারা প্রধান লোক তাঁহাদের অনুরোধে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই করিয়াছিলেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ,—রাইপুর, বীরভুম।

ভাগবত ধর্ম্ম।

মানব বহুজন্মের সাধনফলে ভক্ত হইয়া শ্রীভগবানকে দর্শন করিল। শ্রীভগবান যে কোন সময়ে মানবের সর্ব্বাপেক্ষা আপনার রূপে; সর্ব্বস্ব ও প্রিয়তমরূপে, একমাত্র হিতকারী বা বন্ধুরূপে, অন্তরেও বাহিরে ছিলেন না, তাহা নহে। তিনি ছিলেন, কিন্তু মানব তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, মানব চিরদিন

তাঁহারই আকর্ষণে তাঁহাকেই খুঁজিয়াছে, কিন্তু কি খুঁজিতেছে তাহা সে জানিত না। এই টুকুই লীলা। তাঁহাকে জানিতে হইবে, তাঁহাকে পাইতে হইবে, কিন্তু 'না জানা' না থাকিলে 'জানা' থাকে না, অপ্রাপ্তি বা প্রত্যাশা ব্যতীত প্রাপ্তি হয় না। 'ভগবান' রূপে পরতত্ত্বকে জানাই মানবের পক্ষে প্রকৃতরূপে পরমার্থ সত্যের পরিচয়-লাভ। ব্রহ্মরূপে; পরমাত্মারূপে যে জানা, তাহা আংশিক জানা। এই ভগবানরূপে তাঁহাকে সত্য সত্য জানিতে হইলেই তাঁহাকে "রাধাকৃষ্ণ" রূপে জানিতে হইবে। "রাধাকৃষ্ণ" তত্ত্বই সকল তত্ত্বের সার। জগতের সমস্ত দেশেরই আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে এই তত্ত্ব অল্পাধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়াছে, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। অদ্য আমরা আমাদের দেশের সাধন-শাস্ত্রে এই তত্ত্ব কিরূপভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহারই আলোচনা আরম্ভ করিব।

সকল লীলার শিরোমণি শ্রীরাসলীলায় ব্রজগোপীগণের কৃষ্ণান্বেষণের মধ্যে আমরা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সন্ধান প্রাপ্ত হই। এই তত্ত্ব সকল রহস্যের শেষ রহস্য এবং মানবীয় সাধনার শেষ তত্ত্ব তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং বেশ ধীরভাবে প্রাচীন বৈষ্ণব সাধকগণের পদরেণু মস্তকে গ্রহণ করিয়া ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

সর্ব্বপ্রথম ভাবিতে হইবে শ্রীরাসলীলা কি? ভগবান আত্মারাম, অথচ তাঁহার মধ্যে রমণেচ্ছা রহিয়াছে। ভক্তহৃদয়ে নির্ম্মল অনুভূতিগম্য শ্রীভগবানের এই রমণেচ্ছা (রিরংসা) ইহাই শ্রীরাসলীলার প্রবর্ত্তনা। প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন "হ্লাদিনী-শক্তি-বিলাসলক্ষণতৎপ্রেমবিশেষময়ী এব এষা রিরংসা ন তু প্রাকৃতকামময়ী" শ্রীভগবানের এই যে রিরংসা বা রমণেচ্ছা, ইহা স্বরূপতঃ শ্রীভগবানের প্রেমবিশেষ; আমরা তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তির দ্বারায় এই বিশেষ প্রেমকে লক্ষণান্বিত করি। অর্থাৎ এই প্রেমকে আমাদের সাধারণ চৈতন্যের ভাষায় 'অনুবাদ' করিয়া বর্ণনা করা বা অনুভব করা যায় না। হ্লাদিনী শক্তির যে বিলাস বা প্রকাশ তদ্দ্বারা আমরা এ সম্বন্ধে চিন্তা বা ধ্যান করিতে পারি। সুতরাং হ্লাদিনী শক্তির বিলাস কি এবং তাহাই বা কিরূপে ধ্যেয়, প্রথমে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

শ্রীভগবান স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ—সৎ, চিৎ, ও আনন্দ ঐ তিনটি একই অখণ্ড তত্ত্বের তিনটি বিভাব (Aspects) মাত্র। এই তিনটিকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের তিনটি শক্তি। ইঁহাদের নাম যথাক্রমে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও

হ্লাদিনী। ভগবান সৎ—তিনি আছেন তাই জগৎ আছে—তাঁহার থাকা, এই ব্যাপার যে শক্তির দ্বারা সাধিত হইতেছে সেই শক্তির নাম সন্ধিনী। তিনি চিৎ, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি তাঁহাতে আছে। যে শক্তির দ্বারা অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি আছে,' অথবা অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তিময় হইতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহার নাম সম্বিৎ। আর তিনি আনন্দ। ভগবানের স্বরূপই ইহাই। এই তিনটি ভাবের মধ্যে আনন্দই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ। শ্রীভগবানকে আনন্দময় হইতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। অগ্নিকে অগ্নি হইতে হইলেই যেমন দাহিকাশক্তি থাকা চাই, দাহিকাশক্তি ব্যতীত যেমন অগ্নি অগ্নিই হইতে পারে না, সেইরূপ যে শক্তি ব্যতীত ভগবান আনন্দময় হইতেই পারেন না অথবা তাঁহাকে আনন্দময় বলিতেই যে শক্তির সত্তা বুঝায়, তাঁহারই নাম হ্লাদিনী শক্তি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আনন্দই তাঁহার স্বরূপ সুতরাং এই হ্লাদিনী শক্তি তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান। পূর্ব্বে যোগমায়ার কথা বলা হইয়াছে, এই যোগমায়া হ্লাদিনী শক্তিরই ক্রিয়া বিশেষ।

এই বার 'হ্লাদিনী' শক্তি কি একটু ভাল করিয়া চিন্তা করা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ এই হ্লাদিনী শক্তির সাহায্যে সুখ আস্বাদন, করিতেছেন, ইহাই হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ লক্ষণ, কিন্তু স্বরূপ লক্ষণের দ্বারা আমরা কিছুই বুঝিব না। শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝি না, আবার তাঁহার সুখ আস্বাদন, ইহা আমাদের একেবারে ধারণাতীত। এই জন্য আচার্য্যগণ 'হ্লাদিনী' শক্তির তটস্থ লক্ষণ করিয়া বলিলেন "হ্লাদিনী দ্বারায় করে স্বভক্ত পোষণ" "ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।" তাহা হইলে আমরা এই পাইলাম যে শ্রীভগবানের যে শক্তির দ্বারা ভক্তের পোষণ হইতেছে, তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। এ জগতে ভক্তের পোষণ বলিয়া একটি কার্য্য আছে তাহাই বিশ্বের মুখ্য কার্য্য। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি।

ভগবান বা ভগবতী একই তত্ত্ব। * আমরা দেবীভগবতীর শরণাপন্ন হইয়া এই তত্ত্ব আলোচনার চেষ্টা করিতেছি। আনন্দময়ী জগজ্জননী

---

* যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শন আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন যে আমাদের ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান হেগেল দর্শনের যথাক্রমে Absolute Idea, Its heterization in Nature and Spirit ও the completed cycle of the dialectical process এর অনুরূপ।

কালীরূপে আমাদের পুরোদেশে বিরাজমানা। আমরা তাঁহাকে দেখিতেছি। কি ভীষণা তাঁহার মূর্ত্তি! এলোকেশী ও উলাঙ্গিনী, লোল-রসনা, বিকট-দশনা, অট্ট অট্ট হাস্য করিতেছেন। বামদিকে চাহিয়া দেখিতেছি জননীর হস্তে শাণিত খড়্গ, রৌদ্রকিরণে ঝল ঝল করিতেছে। সেই খড়্গের আঘাতে দানবের মুণ্ড ছিন্ন ও ভূপাতিত হইতেছে। অপর হস্তে দানবের মুণ্ড দোদুল্যমান, সেই মুণ্ড হইতে রুধিরধারা নিঃসৃত হইতেছে। গলদেশে মুণ্ডমালা। চারিদিকে অগণিত শৃগাল, শকুনি ও গৃধিনী মনের আনন্দে দানবকুলের মৃতদেহ ভোজন করিতেছে। আর ডাকিনী, যোগিনী ও ভৈরবীকুল ভীষণ হুঙ্কার করিতেছে, তাথিয়া তাথিয়া তালে নৃত্য করিতেছে। এই তাঁহার বেশ, এই বিকট ভীষণ বেশে, ভৈরব হুঙ্কারে দশদিক পরিপূর্ণ করিয়া তিনি মহাকালের বক্ষদেশে নৃত্য করিতেছেন। এই গেল এক দিক। ইহা তাঁহার একদিক—বামদিক।

বামদিকে চাহিয়া আমরা ভীত ও স্তম্ভিত! এই দিকে চাহিয়া আমরা ভাবিতেছি—এই বিশ্ব যাতনার লীলাস্থল। মৃত্যু, শোক, পাপ, তাপ, মোহ, ও নিরাশা, এই জগতে কেবল যুদ্ধ আর দ্বন্দ্ব, রক্তপাত আর বিভীষিকা। কিন্তু এখনও আমরা সমস্তটুকু দেখি নাই। আমরা কেবলমাত্র বৃত্তের অর্দ্ধেক অংশ দেখিতেছি। অপর অর্দ্ধেকের প্রতি অর্থাৎ জননীর দক্ষিণদিকে চাহিয়া দেখিতেছি, তিনি অভয়া ও বরদা। তিনি বাহু তুলিয়া মাভৈঃ মাভৈঃরবে আমাদের অভয়দান করিতেছেন। এই ভীষণ মৃত্যুলীলা, এই বিকট হুঙ্কার, এই শ্মশানের দৃশ্য, জননী বলিতেছেন হে পুত্র ইহাতে ভীত হইও না। এই প্রকারে অভয়দান করিয়া তিনি আমাদিগকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিতেছেন, তোমার কি চাই? ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যাহা তোমার প্রয়োজন, আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব। আমি যে জননী। সন্তানস্নেহ আমার বুকে ধরে না। সেই আনন্দের আবেগে আমি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছি।

এববার আমরা সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিলাম। প্রথমে বামদিকে চাহিয়া বুঝিয়াছিলাম এই বিশ্বরচনা, আমাদের মত জীবকুলকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। এখন বুঝিলাম 'ঠেলিয়া দেওয়া' উদ্দেশ্য নহে। টানিয়া তুলিয়া লওয়াই উদ্দেশ্য, ঠেলিয়া 'ফেলিয়া না দিলে টানিয়া তুলিয়া লওয়া হয় না বলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া। মনে করুন, দয়া বলিয়া একটা বৃত্তি

আছে, মানবের হৃদয়ে ইহা থাকে। এই দয়া বৃত্তিকে সত্য ও সফল করিতে হইলে জগতে দুঃখ ও অভাব থাকা চাই। দুঃখ ও অভাব না থাকিলে দয়া থাকিতে পারে না। স্নেহময়ী মাতা সন্তানকে চোখ রাঙ্গাইয়া ভয় দেখান, ছেলে ভয় পাইয়া কাঁদে, তখন জননী তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরেন ও স্নেহ ভরে মুখচুম্বন করেন। যে ছেলে খুব দুষ্ট বা চতুর সে মাতার এই সমস্ত ভাবটি শীঘ্র বুঝিয়া ফেলে, তখন সে আর ভয় করে না। সে তখন শ্রীরামপ্রসাদের মত বলে

"আমি নই আটাশে ছেলে।
আমি ভয় করি না চোক রাঙ্গালে॥"

ইনিই মহামায়া, ভগবতী। বাম ও দক্ষিণ এই উভয় ভাবই তাঁহাতে আছে। ইনি লীলাময়ী। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এই দুইটি ভাব নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিতেছেন।

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা॥
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্॥
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী॥
সংসারবন্ধহেতুশ্চসৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

দেবীমাহাত্ম্যে প্রথমচরিত্রম্
৫৪-৫৮।

জগৎপালক পরমেশ্বরের যোগনিদ্রা, স্বরূপা যে মহামায়া, তিনিই এই জগৎকে সম্যক্‌রূপে মোহিত করিতেছেন। অতএব এই মোহ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করিও না। দেবী ভগবতী জ্ঞানীগণেরও চিত্তকে স্বীয় শক্তিবলে বিবেক হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া মোহে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। তিনি এই সমগ্র স্থাবরজঙ্গম সৃষ্টি করিতেছেন, আবার তিনিই প্রসন্না হইয়া মুক্তির হেতুভূতা হইয়া থাকেন। তিনি বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণা) অতএব মুক্তির হেতুস্বরূপা এবং সনাতনী অর্থাৎ নিত্যা। আবার সংসারাদি বন্ধন তাহারও তিনি হেতু, তিনি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বরী।

এই বাম ও দক্ষিণ, এই যোগনিদ্রা ও যোগমায়া, এই উভয়তত্ত্বকে একত্রে বুঝিলেই মানব নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা লাভ করে ও ভগবান বা ভগবতীর পরিচয় পায়।

এই প্রকারে দুই দিক মিল করিয়া দেখিয়া শ্রীরামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হোয়ে ধর্ম্মতনয় ত্যজে আলয়
বনে গমন হেরে পাশা।
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক
তেঁই তো শিবের দৈন্য দশা॥"

* * * * *

হরিষে বিষাদ আছে মন
করোনা এ কথায় গোঁসা
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ
ডাকের কথা আছে ভাষা॥"

আবার শ্রীচণ্ডীদাসও অনুরূপ ভাবের প্রেরণায় বলিতেছেন—

"চণ্ডীদাস কহে, শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।"

আমরা শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বা শ্রীভগবান ও তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির বিলাস উপলব্ধি করিবার জন্য দেবী ভগবতীর শরণাপন্ন হইয়াছি। ইহা প্রাচীন পদ্ধতি। প্রাচীন আচার্য্যগণও এই উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক স্থলেই এই উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া শ্রীবস্ত্রহরণ লীলা যাহা শ্রীশ্রীরাসলীলার একটি দ্বার মাত্র, তথায় বর্ণনা করা হইয়াছে যে ব্রজের যুবতী ও কুমারী গোপকন্যা-গণ হেমন্ত ঋতুর প্রথমে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে হবিষ্যভোজিনী হইয়া কাত্যায়নীর অর্চ্চনারূপ ব্রত করিলেন। তাঁহারা পূজা করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥"

হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে নন্দগোপেব সুতকে পতিরূপে প্রদান করুন।

এই কাত্যায়নী দেবীর তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন টীকাকারগণ বিশদ-রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।

এই দেবী কাত্যায়নী, অর্থাৎ কাত্যায়ন মুনিবংশের প্রকাশিকা, তাঁহারই দ্বারা যখন এই বিখ্যাত মুনিবংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তাঁহার প্রথম গুণ মহাধর্ম্মদাতৃত্ব। তাহার পর তিনি মহামায়া শ্রীভগবানের মহাশক্তিরূপা অতএব তিনিই সকল অভীষ্ট লাভ করিবার যে শক্তি তাহা প্রদান করিতে সমর্থা। আবার তিনি মহাযোগিনী অর্থাৎ যাহা দুর্ঘট তাহাও ঘটাইতে সমর্থ। তিনি অধীশ্বরী অর্থাৎ তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর অপর কোন দেবতা নাই। সুতরাং ব্রজদেবীগণ বেশ জানেন যে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে আর অভীষ্ট পূরণের জন্য অন্য কাহারও শরণাপন্ন হইতে হইবে না। আবার তিনি দেবী অর্থাৎ ক্রীড়ারসাভিজ্ঞা সুতরাং ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের যাহা অভীষ্ট তাহা পূরণের জন্য এই দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রাচীন টীকাকারগণ বলিয়াছেন যে এই দেবী ভগবতীকে শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি বলিয়া ভাবিতে হইবে। কারণ শ্রীভগবানের শক্তি, সাধকগণ কর্ত্তৃক তিনভাবে অনুভূত হইয়াছে। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি অর্থাৎ যে শক্তি জগতের কারণ, তটস্থা জীবশক্তি যাহা ব্যষ্টিরূপে এই জগৎ ভোগ করে, আর অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি যাহা এতদুভয়কে সম্ভব, সফল ও সার্থক করে। ইংরাজী বা জার্ম্মাণ দর্শনের চিন্তায় এই তিনটিকে যথাক্রমে The objective, The subjective ও The Absolute phase বলা যায়। এই তৃতীয় স্তরে দেবীর যে উপলব্ধি তাহাই পূর্ণদর্শন—আর প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের যে উপলব্ধি তাহা আংশিক দর্শন। এই তিনটি স্তরের আর তিনটি নাম আছে তাহার নাম মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। সাধক-প্রবর মহাত্মা শ্রীরাম-প্রসাদের সাধনার ইতিহাসেও এই তিনটি স্তর সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক দেবী ভগবতীর চরণাশ্রয় করিয়া, সকল তত্ত্বের যাহা সার, সকল রহস্যের যাহা শেষ রহস্য সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব অবগত হইলে এই তৃতীয় স্তরের প্রকাশের মধ্য দিয়াই ভগবতীকে ধরিতে হইবে। যে স্তরে তাঁহাকে কাতরকণ্ঠে ডাকিয়া কোন সাধক ভক্ত বলিয়াছেন—

"কাজ কি আমার মুক্তি ল'য়ে।
বেশী কিসে ভক্তি চেয়ে॥

কাজ কি আমার জলধিতে জলবিম্ব মিশাইয়ে॥
চাঁদের শোভা চাঁদ কি জানে
চকোর জানে সুধা পিয়ে
চিনিতে কি স্বাদ বোঝে মা খাদক বোঝে চিনি খেয়ে॥
ভক্তের হৃদে কি আনন্দ
বুঝে বা কে বুঝায় কেরে
মা জানে না সে আনন্দ নিজে চিদানন্দময়ী হ'য়ে॥"

যাঁহারা প্রথম স্তরের সাধক তাঁহারা চাহেন ভুক্তি ও সিদ্ধি। যাঁহার দ্বিতীয় স্তরের সাধক তাঁহারা চাহেন মুক্তি। আর যাঁহারা তৃতীয় স্তরের সাধক তাঁহারা চাহেন পরাভক্তি ও সেবা। এই চাওয়ার শেষ চাওয়া ব্রজগোপীদের ঐ যে প্রার্থনা বাক্য "নন্দগোপ সুতং দেবি পতিং মে কুরু।" সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ এই তৃতীয় স্তরের উপলব্ধির প্রেরণায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
কালী হলে মা রাসবিহারী॥
পৃথব প্রণব, নানা লীলা তব
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি
এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল, নয়ন অপাঙ্গে
মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কালো, তনু রেখা ভালো,
ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস
এবে মৃদুহাস ভুলে ব্রজ কুমারী
পূর্ব্বে শোণিত সাগরে, নেচেছিলে শ্যামা
এবে প্রিয় তোমার যমুনা বারি॥

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
বুঝেছি জননী মনে বিচারি
মহাকাল কালী, শ্যামা শ্যামতনু
একই সকল বুঝিতে নারি ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন টীকাকারগণ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি শ্রীভগবতী দেবী সম্বন্ধে আরও কি বলিয়াছেন, তাহাও আলোচ্য। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই দেবীর তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন। “ইয়ং তাভিরুপাসিতা চিচ্ছক্তিবৃত্তি-স্বরূপ-ভূতা যোগমায়ৈব নতু বহিরঙ্গা মায়া যদুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সম্বাদে—

জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরাপরমা শক্তি র্মহাবিষ্ণুস্বরূপিনী ॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা ॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা শ্রীকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয়ঃ আদিদেবো হখিলেশ্বরঃ ॥
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎসর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ ॥”

অর্থাৎ ব্রজদেবীগণকর্ত্তৃক উপাসিত এই দেবী চিচ্ছক্তিবৃত্তিস্বরূপভূতা যোগমায়া। ইনি বহিরঙ্গা মায়া নহেন। যেমন নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যাসম্বাদে কথিত হইয়াছে। এক পরমা তদাত্মিকা (ভগবদাত্মিকা) দেবী কান্তকে (পরম কান্ত বা ভগবানকে) জানেন। তিনিই দুর্গা! তিনি পরা ও পরমা শক্তি এবং মহাবিষ্ণুস্বরূপিনী, তাঁহাকে জানিবামাত্র পরবস্তুরও যিনি পরমাত্মা, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই দেব দেবের প্রাপ্তি ঘটে। তিনি অদ্বিতীয়া ও প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা এবং কুলেশ্বরী। ইঁহার সাহায্যে অখিলেশ্বর যে আদি দেব তাঁহাকে সুলভে জানা যায়। যিনি অখিলেশ্বরী মহামায়া, তিনি ইঁহার আবরিকা শক্তি। সমস্ত জগৎ, সমুদয় দেহাভিমানী জীব তৎকর্ত্তৃক মুগ্ধ।

তন্ত্রশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার সমুদয় মন্ত্রেই শ্রীদুর্গা-দেবী অধিষ্ঠাত্রী। আবার লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীরূপে তাঁহার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এবার আমরা হ্লাদিনী শক্তির বিলাস কি তাহাই আলোচনা করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র এই হ্লাদিনী শক্তির বিলাসেই আরম্ভ এবং ইহাতেই শেষ। এইবার মানব জাতির, বিশ্বের বা ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস আলোচনা করা যাউক। বিশ্বে দেখিতেছি, সংহারলীলার বিভিষীকার অভিনয় হইতেছে। সমস্তই চঞ্চল, সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর। আজ যেখানে সুন্দর জনপদ, শস্য-শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ফলতরু পরিবেষ্টিত 'নয়নানন্দকর গ্রামে নর-নারীর ও বালক বালিকার হাস্যকলোচ্ছ্বাস, কল্য দেখিতেছি, বন্যার জলে সেই গ্রাম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পিতামাতার নয়নের মণি শিশুগুলিরও মৃত দেহ জল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। জাত কর্ম্ম বা বিবাহের সঙ্গীত-মুখরতা ধ্বংশ করিয়া মরণের করুণ আর্ত্তনাদ জগতের বুকের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

"যাতনা জনমে, যাতনা মরণে
যাতনা জীবন ধারণে
কোথা ব্যথা নাই বল দেখি তাহ
ব্যথাময় এহ ভুবনে।" *

আবার মানব জাতির ইতিহাসে দেখিতেছি ভীষণ শোণিত-স্রোত! যুদ্ধের বাজনা বাজিতেছে, অন্নমুষ্টি লইয়া কাড়াকাড়ি হইতেছে। এক জাতির পতন হইতেছে, আর এক জাতির উত্থান হইতেছে। কি ভীষণ ব্যাপার! যাহার শক্তি আছে সে বীরত্বের নামে দুর্ব্বলের অন্নমুষ্টি কাড়িয়া লইতেছে। প্রকৃতি যেখানে 'অন্নপূর্ণা, দানব সেখানে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিতেছে। মানবের লালসার ফলে মহাযুদ্ধ, মহামারি ও দুর্ভিক্ষ, মানুষে মানুষ খাইতেছে। এই মানব-জাতির ইতিহাস। মূলধনার অপরিমিত অর্থরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত বিলাস-বাসনার চারিদিকে কোটি কোটি অন্নহীন দরিদ্রের আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইতেছে।

তাহার পর ব্যক্তির জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি—কি তীব্র জীবন-সংগ্রাম! শৈশবের সুখময় কল্পনা-কানন, যৌবনের দাবদাহে দগ্ধ হইয়াযাইতেছে। বার্দ্ধক্যে হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে—"শুধু আঁখি-বারি শুধু হাহুতাশ" জীবন বাণিজ্যে আর কিছুই পাওয়া গেল না।

ইন্দ্রিয়-ভোগের উত্তেজনার মধ্য দিয়া যে সমস্ত বিলাসী ব্যক্তি যৌবনের আরাম-নিকুঞ্জ-কাননে জীবন পুষ্পের মধু পান করিতেছে, এ সমস্ত কথা তাহা-

* ললিত বিস্তার হইতে অনূদিত।

দিগকে শুনিতে ভাল লাগে না কিন্তু ইহাই সত্য ইতিহাস। কিন্তু ইহা শেষ সত্য নহে।

পূর্ব্বে বিশ্বের, মানব জাতির ও ব্যক্তির জীবনের যে চিত্র দেওয়া হইল তাহাকেই যাঁহারা শেষসত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা পূর্ব্বে মহামায়ার যে কালীমূর্ত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহাব সমস্তটা দেখেন না, কেবল বামদিক অর্থাৎ খড়্গ ও মুণ্ড, আর সম্মুখদিক অর্থাৎ মুণ্ডমালা ও লোল রসনা মাত্র দেখেন অর্থাৎ ভগবচ্ছক্তির কেবল মাত্র বহিরঙ্গ ও তটস্থ প্রকাশ দেখেন। দক্ষিণ দিকের অভয় ও বর যখন দেখেন তখনই স্বরূপ শক্তির আভাস প্রাপ্ত হয়েন। স্বরূপ শক্তির যখন আভাস পাওয়া যায় তখন লীলা রহস্যের যাহা, মর্ম্ম তাহা বুঝিতে পারা যায়, তখনই সমস্ত ঘটনার প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারা যায়। তখন বুঝিতে পারা যায়, ভগবানই সত্য এবং তাঁহার স্বরূপের যে হ্লাদিনী শক্তি তাহাই মুখ্য। অন্যান্য শক্তির যে খেলা তাহা ঐ হ্লাদিনী শক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য বা বিলাসের জন্য প্রয়োজন। তাহাদের আর কোন সার্থকতা নাই। ইহাই পরমার্থ সত্য-দর্শন, ইহাই নিত্যলীলার প্রথম আভাস। ইহারই চরমে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব।

তাহা হইলে দেখা গেল যে মনুষ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত মা, কালীর কেবল মাত্র বামদিক অর্থাৎ খড়্গ ও মুণ্ড দেখে, ততক্ষণ তাহার লীলা দর্শন হয় না দক্ষিণ দিকে যখন দৃষ্টি পতিত হয় তখনই লীলা-দর্শন আরম্ভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত লীলাগ্রন্থ। ইহার প্রথম শ্লোকে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য যে পরদেবতা তাহার সম্বন্ধে প্রথম বলা হইল যে, তাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। তিনি এই রূপে অনুস্যূত হইয়া অন্তর্যামী রূপে রহিয়াছেন। এই গেল একদিক। কিন্তু এখনও তাঁহার সঙ্গে আমরা কোনরূপ বিশেষ সম্বন্ধে আসিয়া উপস্থিত হই নাই। এই বিশেষ সম্বন্ধটুকু দেখাইবার জন্য বলা হইল। "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" তিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিলেন, যে বেদে দেবগণ ও মুগ্ধ। এই বেদ প্রকাশ, প্রাচীন আচার্য্যগণের মতে ভগবানের বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তকরূপে প্রকাশ, যাহা গায়ত্রীর মধ্যেও সূচিত হইয়াছে।

এইবার আমরা শ্রীভগবানের সহিত একটা সম্বন্ধে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তাঁহার স্বরূপের একটু ভালরূপ পরিচয় পাইলাম। এই পরিচয় টুকুর মর্ম্ম হৃদয় মধ্যে বেশ দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে না পারিলে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে

প্রথম শ্লোকের এই অংশটুকুর মর্ম্ম বেশ ভালরূপে অনুভব করিতে না পারিলে, আমরা শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্ব বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিব না।

মানব, জগতের মধ্যে পতিত হইয়া এইটুকু অনুভব করে যে আমরা একটা খুব বড় রকমের অনিশ্চয়তার মধ্যে, অন্ধকারে বাস করিতেছি। আমরা অসহায়। শোক আসে, মৃত্যু, বন্যা, ঝটিকা, ভূকম্পন, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ আসে, আমরা যাহা চাহি না, যাহা পরিহার করিবার জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করি, অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া তাহা আমাদের আক্রমণ করে। আমাদের বিদ্যা বুদ্ধিতে আমাদের যাহা যথার্থ মঙ্গল, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। মানুষের এই অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে ভগবান যিনি স্বপ্রকাশ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান, তিনি বেদ দিলেন অর্থাৎ যাহা আমাদিগকে ধরিয়া রাখিবে, যাহা আমাদিগকে রক্ষা করিবে, যদ্দ্বারা আমাদের নিঃশ্রেয়সও অভ্যুদয় হইবে, সেই ধর্ম্ম দিলেন। কারণ পূর্ব্বমীমাংসা বলিতেছেন "চোদনা লক্ষণোঽ অর্থঃ ধর্ম্মঃ।" বেদ বা প্রবর্ত্তক বাক্যের দ্বারা লক্ষিত অনর্থের বিপরীত যে অদৃষ্ট পদার্থ তাহাই ধর্ম্ম। ভাগবত বলিতেছেন "বেদ-প্রণিহিতো ধর্ম্মঃ হ্যধর্ম্মস্তৎবিপর্য্যয়ঃ"। ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির প্রথম পরিচয় এই-খানে, কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানেই আরম্ভ আর শ্রীভগবানেই শেষ। ভগবান হইতে হইলেই তাঁহাতে মুখ্য রূপে হ্লাদিনী শক্তি থাকা চাই। এই তত্ত্ব যখন আমরা ভাল করিয়া বুঝিব তখন বলিব শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

গতমাসে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত যে দুইখানি বৈষ্ণব গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হই-য়াছে তন্মধ্যে একখানি বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা গেল। গ্রন্থখানি ৩২ ফর্ম্মা ২৫৬ পৃষ্ঠা হইবার সম্ভব। আমরা চৈত্রমাসের মধ্যে গ্রন্থখানি শেষ করিতে চেষ্টাকরিব। আমরা কবির স্বহস্ত লিখিত মূল গ্রন্থখানিই পাইয়াছি। গ্রন্থে যেরূপ বানান আছে তাহাই রক্ষিত হইল। আমরা প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে এই উভয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থের মূল্য কি তাহা সহৃদয় ভক্ত পাঠকগণ অনুভব করিবেন। আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা যদি গ্রন্থ প্রকাশ শেষ হয়, তাহা হইলে বলিব। কবির বংশধরগণ কৃপাপূর্ব্বক এই সুপবিত্র গ্রন্থখানি আমাদিগের হস্তে প্রদান করার ভক্ত পাঠকগণের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীল শ্রীপূজ্যপাদ নয়নানন্দ ঠাকুর বিরচিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসকদম্ব।

৺শ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥ অপ্রকটায়াং লীলায়াং শ্রীব্রজাদিধামস্থ
প্রকাশতো বিরাজমানস্থ পুরুষোত্তমস্থ প্রকটায়ামেকেন
প্রকাশেন শ্রীদেবক্যামাবির্ভাব একেন শ্রীযশোদায়াং
প্রকাশস্থ বিগ্রহান্তরাভাবাৎ কৃষ্ণদ্বয়ংনাশঙ্কনীয়ং ইতি
শ্রীতোষণীভাগবতামৃতভাগবতসন্দর্ভসন্দর্ভবিদাং সাত্বতানাং পরামর্শণং॥

যোঽনাদি ব্রজরাজনন্দনতয়া খ্যাতঃ পুরাণাদিষু।
সশ্রীমদ্বসুদেববেশ্মনি কুতঃপ্রাদুর্ভবেৎ কার্য্যতঃ॥
পশ্চাত্তেন সযুজ্যমান উচিতং শ্রীমদ্যশোদাগৃহে
প্রাদুর্ভাবযসৌ ব্রজেন্মধুপুরীং শ্রীদ্বারকাঞ্চব্রজং॥
স শ্রীরূপসনাতনাদিরচিত গ্রন্থার্থ মর্ম্মস্পৃহাং।
সারাসারবিচার চারু বিদুষামেতৎ পরামর্শণং।
কৃষ্ণোঽন্যো বসুদেববেশ্মনি ভবেদন্যোব্রজেন্দ্রাত্মজঃ।
এতৎ কস্যমতং ভবেদ্যদিচ তেষাং ন তৎসম্মতং॥
ইতি শ্রীবৃন্দাবন তর্কালঙ্কারস্থ।—
শ্রীদশমে যাদবান্ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং॥
নাহং হালাহলং মন্যে বিষং যস্থ প্রতিক্রিয়া।
ব্রহ্মস্বংহি বিষং প্রোক্তং নাস্থ প্রতিবিধির্ভুবি॥
ব্রহ্মস্বং দুরনুজ্ঞাতং ভুক্তং হন্তি ত্রিপুরুষং।
প্রসহ্য তু বলাদ্ভুক্তং দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্॥

অপিচ

রাজানো রাজকুল্যাশ্চ তাবদন্ধানিরঙ্কুশাঃ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে ব্রহ্মদায়াপহারিণঃ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেত্তু যঃ।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥

সাদ্বৈতং সাবধৌতংচ সগণং সুন্দরপ্রিয়ং।
সর্ব্বাবতারবীজং তং কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রয়ে॥

সরামং নৌমিগোপালং গোপালচরণংপ্রভুং
সুন্দরানন্দ গোপালং পর্ণিগোপালকং তথা ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্থে ত্যাস্থৈঃ পস্থৈঃ পুরাতনৈঃ
নমামি গুরুগোবিন্দৌ বৈষ্ণবান্ ভগবৎপ্রিয়ান্ ॥

যথাতন্ত্রে ॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুরিত্যাদিঃ ॥

শ্রীদশমে

নৌমড্যাতেহব্ভ্রবপুষেতড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজেকবলবেত্রবিষানবেণু
লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥

দীর্ঘছন্দঃ

অজ্ঞান তিমিরে ধন্দ জীবজন ছিল অন্ধ
যিঁহো কৈল অন্ধকার নাশ।
জ্ঞানরূপ অঞ্জন দিঞা চক্ষুধন্দ ঘুচাইঞা
কৃপা করি করিলা প্রকাশ ॥
চক্ষুদান করিলা জিঁহো, জন্মদাতা পুন তিঁহো,
জন্মে জন্মে তিঁহো হউ গতি।
তার পাদপদ্মযুগে, প্রণতি করিয়ে আগে
যাহা হৈতে হয়ে সুদ্ধমতি ॥
অখণ্ড মণ্ডল ব্যাপ্ত, যিঁহো সর্ব্বভূতগত
ত্রিজগতে যেঁ হয় কারণ।
যাঁহা হৈতে চরাচর, ব্যাপ্ত ব্রহ্ম-মণ্ডল,
সকলের আদি সনাতন ॥
সেই কৃষ্ণ-পদ যিঁহো, দেখাইল গুরু তিঁহো
তাঁহার চরণে করি নতি।

যাঁহার করুণাবলে, ভবসিন্ধু তরি হেলে
পরিণামে দেন কৃষ্ণগতি॥
গুরু ব্রহ্মা বিষ্ণু গুরু, মহেশ্বর কল্পতরু
পরং ব্রহ্ম গুরু দয়াময়।
বিষ্ণু আদি দেবি দেবা, গয়া গঙ্গা ক্ষেত্রসেবা
গুরুর অধিক কিছু নয়॥
গুরু গতি, গুরু মতি, গুরু সত্য গুরু পতি,
গুরু বন্ধু বান্ধব স্বজন।
গুরু পিতা, গুরু মাতা গুরু ভক্তিপথদাতা
গুরু সর্ব্বসিদ্ধির কারণ।
শ্রীগুরু বন্দনা করি, প্রণাম করিয়ে হরি,
ভাগবত পদ্যে ব্রহ্ম-স্তুতি
বিঘ্ন-বিনাশন হেতু, ভবাব্ধিতরণ সেতু
এই পদ্যে করিয়ে প্রণতি॥

নৌমীত্যাদি,

নৌমি ক্রিয়া উপাদান, ঈড্য সম্বোধন গান,
বিরিঞ্চি সাক্ষাতে স্তুতি করে
মেঘ তুল্য বপু যার, তড়িত বসন তার
গুঞ্জামালা সুশোভিত শিরে॥
তাহে শিখিপাখা জানি, সুলক্ষিত মুখখানি
বনমালা বিরাজিত তনু।
বাম হস্তে সুবিচ্ছিন্ন, সফল সদধি অন্ন
জঠরে শোভিত বেত্র বেণু॥
মৃদু সুকোমল পদ, করযুগে শুভাঙ্গদ
পশুপা অঙ্গজ ভাব হয়।
জাতীতি ব্যুৎপত্তি করি পাশব্দ বাখান বলি
পশু শব্দ ধেনুগণে কয়॥
গোস্বামীর ব্যাখ্যা শুন, পশুপা তাহাকে কন
পশুপ কহিয়ে নন্দরাজে।

পশূন্ পাতি ব্যাখ্যা ইতি, অঙ্গে জাত কৃষ্ণ তথি
লীলাহেতু সাধুজন কাজে ॥
নন্দাত্মজ ব্রজে হরি, গোপবেশ অঙ্গিকরি
বিহার করিলা নরলীলা
নরাকৃতি দেখি বনে, বিস্ময় দেবতাগণে
সেই লীলা দশমে বর্ণিলা ॥
প্রারব্ধ কর্ম্মখণ্ডন, বহু বিঘ্নবিনাসন,
গোবিন্দ স্মরণ মাত্র হয়।
গ্রন্থ পরিসমাপ্তি হেতু, ভবসিন্ধু পার সেতু
নতিরূপ মঙ্গল আচরয় ॥
সেই কৃষ্ণ পদধূলি, শিরে লঞা কুতুহলি
গণপতি প্রণাম সময়ে।
ত্রিজগতের বিঘ্ন জত, খণ্ডে যেবা তাহে নত
বিঘ্ন বিনাশ তারে কহে ॥
বিঘ্ন বিনায়ক কলি, লঞা যার পদধূলি
গণপতি হইলা প্রধান।
সেই নন্দাত্মজ হরি, তাহাকে প্রণাম করি
আদি পুরুষ ভগবান ॥

যথা যামলে

যৎপাদ পল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ
দ্বন্দ্বে প্রণাম সময়েন্ গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্নিহন্তুমনমস্তি জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ইতি

বাঞ্ছাকল্প তরুময়, পতিত পাবন হয়
সাধু শান্ত বৈষ্ণব গোসাঞি।
কৃপার সমুদ্রতর, বৈষ্ণব ঠাকুর মোর
শত নতি তাঁহা সবার ঠাঞি ॥
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, কল্পবৃক্ষ রূপ হন
তবে মোর নাহি কাহুঁ ভয়।

আর এক কথা সুনি, পতিত পাবন জানি
ইহাতে ভরসা মনে হয়॥
আমিত পতিত জন, দুষ্টমতি অকিঞ্চন
পতিত পাবনের দিয়ে দায়।
পতিত পাবন জিঁহো, উদ্ধারিবে মোরে তিঁহো
কৃপাসিন্ধু জানি কহি তাঁয়॥
কল্পতরু জারা হন, বাঞ্ছাপূর্ণ বর দেন
বাঞ্ছিত মাগিয়া নিব বর।
অহে কৃষ্ণ ভক্তগণ, সভার পায়ে নিবেদন,
বাঞ্ছিত আমার সিদ্ধি কর॥
বৈষ্ণব মহিমা আমি, কি বর্ণিব কিবা জানি,
জার গুণ পুরাণে বাখানে।
তীর্থ অবগাহ কালে, সে তীর্থ কৃতার্থ বলে
তীর্থ তীর্থ হয় সেই দিনে॥

যথা শ্রীভাগবতে—
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।
ইতি

গোদাবরী আদি কত, জলময়ী তীর্থে জত,
শিলাদিময়ী যেবা দেবগণ।
দর্শন করিতে নরে, পাপ ঘুচাইতে নারে
অনুকালে করয়ে খণ্ডন॥
সাধুসঙ্গ সমাগমে পাপ খণ্ডে ততক্ষণে
এই হেতু মহিমা অপার।
সাক্ষাত দেবতাময় কৃষ্ণভক্তগণ হয়
তাহা সভে আগে নমস্কার॥

শ্রীভাগবতে
নহ্যপ্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

প্রথমে
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥

তাহে এই বিবরণ, শাস্ত্রে করে নিরূপণ,
সাধু আর তীর্থের মহিমা
তীর্থ স্নান অবগাহে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়ে
নাহি ঘুচে কুমতি বাসনা ॥
সাধুসঙ্গ গুণ ইথি, হৃদি খণ্ডে দুষ্টমতি
নির্ম্মল হৃদয় হয় জানি।
সাধু-সঙ্গ এই ফল, চিত্ত হয়ে নির্ম্মল
পাপতাপ খণ্ডয়ে আপনি ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবগণে, ভিন্ন ভাব করি মানে
সে জন পাষণ্ডী দণ্ডী হয়।
তার সাস্তি করে যমে, বৈষ্ণব যে নাহি মানে,
বিষ্ণুরূপ বৈষ্ণব নিশ্চয় ॥
এই মোর নিবেদনে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব স্থানে
ইষ্ট সিদ্ধি করহ নির্ব্বিঘ্নে।
ভাষা ছন্দে গ্রন্থখানি, সিদ্ধ কর গুণমণি
কৃষ্ণলীলা গাই প্রেমমগ্নে ॥
কুমতি ঘুচিব যবে, কৃষ্ণভক্তি হৈব তবে
এই হেতু মনে প্রবোধিয়ে।
মন হে বান্ধব মোর চরণে ধরিয়ে তোর
দন্ত তৃণে তোরে নিবেদিয়ে ॥
যতেক ইন্দ্রিয়গণ, তোর ভৃত্য তুল্য হন
তুমি তাহে হয় অধিরাজ।
তুমি সে সহায় হৈলে, তোমা বসে সভে চলে,
তোমা হৈতে সিদ্ধ হয় কাজ ॥
মেঘ নিজ বস নয় সদা বায়ু বস হয়
তেমত ইন্দ্রিয় তোমার বস।
তোরে মোর এ বিনতি অসৎ পথ ছাড় মতি
সাধুপথে না নিয় অযস ॥
সাধু সঙ্গ সঙ্গতি করি অকপটে ভজ হরি
বিশ্বাস করিঞা গুরু পায়।

সাধু কৃপাবান হৈলে　　সংসার তরিবে হেলে
সর্ব্বসিদ্ধি বৈষ্ণব কৃপায় ॥
মঙ্গলাচরণ আর　　মনঃশিক্ষা বারংবার
ত্রিপদি ছন্দেতে আরম্ভিল।
নিজগণ জানাইতে　　শ্লোক ভাঙ্গি ভাষা গিতে
এ নয়নানন্দ বিরচিল ॥

তত্রাদৌ ভাগবতান্ বৈষ্ণবান্ প্রণমামি। যথা পুরাণপদ্মেন।

প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক-
ব্যাসাম্বরীষ শৌনকভীষ্মদাল্‌ভ্যান্।
রুক্মাঙ্গদোদ্ধব-বিভীষণ-ফাল্গুনাদীন্
পুণ্যানিমান্ পরমভাগবতান্নমামি ॥

মনে প্রবোধিয়ে পুন শুন আর বার।
যদি বাঞ্ছা থাকে ভবসিন্ধু হৈতে পার ॥
ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম নায়।
কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ করি কৃষ্ণগুণ গায় ॥
অনায়াসে জপ তপ তীর্থ সেবা বিনে
সংসার তরিবে যদি থাকিঞা ভবনে।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি কর কৃষ্ণ সেবা।
কায়মনে শ্রীকৃষ্ণের অনুগত হবা ॥
ভাগবতে কহে ব্রহ্মা সাখ্যাত ভগবানে।
আপনাকে দৈন্য করি করে নিবেদনে ॥
তোমার অনুকম্পা হয় যেই সব জনে।
সে যদি ভুঞ্জয়ে আপন পূর্ব্ব প্রাক্তনে ॥
কাহেঁ নাহি জায় সেই তীর্থ নাহি করে।
ঘরে থাকি শ্যাম তনু চিন্তয়ে অন্তরে ॥
তনু মন বাক্য ক্রমে যেবাকরে নতি
অনায়াসে মুক্তিপদ তার হয় গতি ॥

শ্রীদশমে

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিবাকং।

হৃদ্বাক্ বপুর্ভিবি‍র্দধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে সদায়ভাক্ ॥ ইতি
সর্ব্বতীর্থ স্নান হয় ঘরেত বসিঞা।
কৃষ্ণ নাম লীলা শুনে মন নিষ্ঠা হৈঞা ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণগুণাদি কীর্ত্তন।
ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত পুরাণ বচন ॥
যেখানে কৃষ্ণের কথা সেখানে সর্ব্বতীর্থী।
গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী ॥

যথা শ্রীধরস্বামী—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র
গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বানি তীর্থানি বসন্তি তত্র
যত্রাচ্যুতোদারাকথাপ্রসঙ্গঃ ॥
কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ আর ভক্তের কীর্ত্তন।
সর্ব্বতীর্থসহ কৃষ্ণ তাঁহা আগমন ॥
বৎস রবে ধেনু যেন না রয় অন্যস্থানে ॥
ঐছে কৃষ্ণ করে গতি ভক্ত জনার স্থানে।

স্কান্দে—

যত্র তত্র মহীপালঃ বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা ইতি—
অতএব কৃষ্ণপদ সমাশ্রয় কর।
তাঁহা বহি কেহ নাহি সেবক বৎসল ॥
সেই পদ্মলোচন বিনে সংসার সাগরে।
দুঃখির দুঃখ ঘুচাইতে আর কেহ নারে ॥
সুনিতি কহিল ধ্রুবে এই কথা সার।
হরি বিনে দুঃখছেত্তা কেহ নাহি আর ॥

শ্রীভাগবতে যথা

তমেব বৎসাশ্রয় ভক্ত বৎসলং
মুমুক্ষুভির্ম্মৃগ্যপদাব্জপদ্ধতিং।
অনন্যভাবে নিজ ধর্ম্ম ভাবিতে
মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পূরুষং ॥

কে আছে এমত জানি দয়াময় আর ।
হেন প্রভু ছাড়িঞা শরণ নিবে তার ॥
হরি সম দয়াময় কাহু নাহি দেখি ।
পুরাণে বেকত তার পুতনায় সাখি ॥
অরিভাবে নষ্ট করিতে গেল জানি ।
শিশুবুদ্ধে কৃষ্ণকে করিল কোলে আনি ॥
বিষস্তন দিল মুখে মারিবার তরে ।
স্তনপান করি হরি বধিলেন তারে ॥
অন্তে তার গতি সুন বলিতে বিস্ময় ।
মাতৃ গতি দিল কৃষ্ণ তাহাকে নিশ্চয় ॥
কোলে করি অঙ্গনেতে পাইল মাতৃগতি ।
এমন দয়ার প্রভু আর পাব কতি ॥
স্নেহ করি অনুক্ষণে যেবা সেবে তারে ।
তাহার বিধান পুন কে কহিতে পারে ॥
শ্রীভাগবতে বিদুরোদ্ধব সম্বাদে যথা ।
অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ॥
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ইতি ॥
কি কহব সেই প্রভুর নামের মহিমা ।
নামাভাসে মুক্ত হয় এই জানি সিমা ॥
সংকেত রহস্য ছলে স্তোভক্রমে জানি ।
হেলাতে বা কোনজন কৃষ্ণ নাম সুনি ॥
পতিত হইঞা কিম্বা বাক্যের স্খলনে ।
অস্ত্রাদিতে বিদ্ধ হৈঞা করয়ে স্মরণে ॥
সর্পাদি ভয়ে কিম্বা অবস হইঞা ।
নামাভাসে লয় নাম বস্তু না বুঝিঞা ॥
তথাপি তাহাতে নাহি যম অধিকার ।
যে লয় আমার প্রভুর নাম একবার ॥
যথা ষষ্ঠে—অজামিলোপাখ্যানে
সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেববা ,

বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥
পতিত স্খলিতোভগ্ন সংদষ্টো সুপ্ত আহতঃ
হরিরিত্যবশোজল্পন্ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ ॥
আপনাতে মুক্তাভিমানি জানি যেবা জন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মযুগে মতিহীন হন ॥
সেই যদি বহু দুঃখে উচ্চ পদ পায়।
না ভজিঞা কৃষ্ণপদ অধঃপাত জায় ॥
অন্যের শরণে নহে ভবাব্ধি তরণ।
অতএব অন্য সেবায় কিবা প্রয়োজন ॥
এই ভবসিন্ধু তরে কৃষ্ণ ভক্তগণ
অভক্ত গৃহান্ধকূপে সদা পড়্যা রণ।
কূপেত পড়িলে পশুর না হয় উদ্ধার।
কৃষ্ণ যে না ভজে লোক তৈছে জানি তার ॥
যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবা দবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্যকৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥
অতএব ভাগবতে কহে দেবগণ।
কৃষ্ণ বিনে ভবসিন্ধু না হয় তরণ ॥
পরিপূর্ণ কাম কৃষ্ণ সান্ত দয়াময়।
তার পদ আশ্রয় কৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
হেন কৃষ্ণ ছাড়িঞা অন্যের করে আসা
সংসার সমুদ্র পার হৈতে ভরসা।
জাহাজ করিঞা ত্যাগ সিন্ধু তরিবারে।
বাহুবলে তরিব সিন্ধু হেন চিত্তে করে।
শৃগালাঙ্গুল ধরিঞা যায় সিন্ধু তরিবারে।
না পারে তরিতে আত্মঘাতি হৈঞা মরে ॥
কুঃকুর হইতে সিন্ধু যেন নহে পার।
অতএব অন্যাশ্রয়ে নাহিক উদ্ধার ॥
কৃষ্ণাশ্রিত বিনে এই সংসার সাগর।
পার নাহি হয় কেহ কহিল নির্ভর ॥

শ্রীভাগবত ষষ্ঠে

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণ কামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তং
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাপি তিতর্ত্তি সিন্ধুং ॥

তত্রৈব

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥

যথা শ্রীমুচুকুন্দ বাক্যং

লব্ধা জনো দুর্ল্লভমত্রমানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতিঃ
গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥
কৃষ্ণকথাদিবিমুখ জন নিন্দি অতিশয়।
শোচ্যাতিশোচ্য সেই ভাগবতে কয় ॥

যথা বিদুরোক্তিঃ

তান্ শোচ্যাশোচ্যানবিদোঽনুশোচে
হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবো নিমিষস্তু যেষা-
মায়ুর্থাবাদগতিস্মৃতীনাং।
দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ পাঞা যে রাজন।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ আশ্রয় না হন ॥
সেই জন্য শোচ্য অতি আয়ের বঞ্চক ॥
অধোগতি হয় তার শুন প্রভুর শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি রুদ্রবাক্যং

দেবদত্তমিমং লব্ধা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যোনাশ্রয়েত ত্বৎপাদৌ স শোচ্যোত্বাত্মবঞ্চকঃ ॥
আত্মবঞ্চক শোচ্য সেই সব হয়।
কৃষ্ণ কথা ত্যাগ করি অন্য কথা কয় ॥
তাঁহা সভার অধোগতি এ হেন নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যশ কীর্ত্তন বিনে অন্য কথা কয় ॥

যথা

যন্নব্রজত্যঘভিদো বচনানুবাদাৎ
শৃন্বন্তি যেঽন্য বিষয়াঃ কুকথামতিঘ্নীঃ।
যাস্ত শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিবালসারা
স্তাংস্তান ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমস্মহন্তুঃ
কৃষ্ণভক্ত ফল শুন অপার মহিমা।
ভাগবতে ব্রহ্ম উক্তি দশমে বর্ণনা॥
এই ভব সিন্ধু অতি দুস্তর অপার।
যাহাতে অনেক রিপু আছে দুরাচার॥
কৃষ্ণ ভক্তগণ সিন্ধু তরে অনায়াসে।
ভক্তের দুস্কৃতি কৃষ্ণ কৃপাবলে নাশে॥
এইত সংসার সিন্ধু বৎসখুরপ্রায়
অনায়াসে কৃষ্ণভক্ত সুখে তরি জায়॥
যে আশ্রেন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ভেলা।
সে পায় পরম পদ অন্যে করি হেলা॥
তাহার পরম পদ বিপদ না হয়।
কৃষ্ণ যে নাশ্রয়ে তার বিপদ নিশ্চয়॥

শ্রীদশমে

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎ পদং পুণ্যযশো মুরারেঃ
ভবাম্বুধি র্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাং॥
অম্বুজ-লোচন কৃষ্ণ অখিল সংস্থান
সেই পাদপদ্ম সদা যেবা করে ধ্যান।
কৃষ্ণপদ করি ভেলা সিন্ধু তরি জায়
এই ভবসিন্ধু জানি বৎস-পদ প্রায়।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রযশ জগত পবিত্র।
হেন চরিত্র নাহি দেখি, শুনি যত্র॥
যদ্যপি অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মাদি বর্ণন।
কৃষ্ণ যশ বিনা সেই কাকতীর্থ সম॥

প্রথমে শ্রীব্যাসং প্রতি শ্রীনারদঃ

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সংতীর্থমুশন্তিমানসাঃ
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্‌ক্ষয়া॥
ইত্যাদি বিধানে গর্ভবাসে দেবগণ।
দেবকীর নিকটে আসি করিলা স্তবন॥

শ্রীদশমে

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎ কৃতেন
কুর্ব্বন্তিগোবৎসপদং ভবাব্ধিং॥

দ্বাদশে শ্রীশুকঃ

সংসার সিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্ণান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবনমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধ দুঃখদবার্দ্দিতস্য॥
পৃথিবীতে জন্মিঞা জারা ভজে ভগবান।
তাহারা কৃতার্থ জারা কৃষ্ণ নাম গান॥

যথা বামনভরদ্বাজীয় তন্ত্রে

পৃথিব্যাং কতি বা লোকা ন জাতা কতিবামৃতাঃ।
মুক্তাস্তে তু ন সন্দেহো যে হরের্নামকীর্ত্তকাঃ॥
ঘোর কলি যুগে সর্ব্বধর্ম্মনষ্টজন।
সেই সে কৃতার্থ—জিহোঁ কৃষ্ণপরায়ণ॥

যথা।

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে।
বাসুদেবপরামর্ত্ত্যাস্তেকৃতার্থাঃ ন সংশয়াঃ॥
হরিনাম সংকীর্ত্তনপরায়ণ জারা।
হরিপূজা তত্তপর কলিযুগে জারা॥
তাহারা কৃতার্থ হয় কলিযুগে জানি।
হরি বিনে কলিযুগে গতিনাহি জানি॥

যথা বৃহন্নারদীয়ে

হরিনামপরা যে চ হরিকীর্ত্তনতৎপরাঃ।
হরিপূজাপরা যে চ তে কৃতার্থাঃ কলৌযুগে ॥
সর্ব্বারাধ্য ভগবান পূজ্য সভাকার।
কৃষ্ণ সম দেবতা না দেখে কেহ আর ॥
বেদের অপর কোন শাস্ত্র নাহি আর।
কৃষ্ণ সম দেব নাহি এই সারোদ্ধার ॥

বারাহে—

রটন্তিহি পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে।
নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রং ন দেবঃ কেশবাৎপরং ॥
তার জন্ম বিফল মনুষ্য দেহ পাঞা
গোবিন্দ যে নারাধিল আপনা বঞ্চিঞা ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে

তদপ্যফলতাং যাতং তেষাং দেহাভিমানিনাং।
বরাকানামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণাম্বুজং ॥

স্কান্দে ধ্রুববাক্যং

ইয়মেব পরাহানিরুপসর্গোযমেবহি।
অভাগ্যং পরমক্ষেতদ্বাসুদেবং ন যঃ স্মরেৎ।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি যেবা অন্যদেব ভজে।
গঙ্গাজল ত্যাগ করি কূপজলে মজে ॥
গঙ্গাতীরে তৃষ্ণার্ত্ত হৈঞা জলের লাগিঞা।
মূঢ়লোক জল খায় কূপকে খনিঞা ॥

যথা ভারতে

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
তৃষিতো জাহ্নবী তীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ ॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে যথা—

বাসুদেবং পরিত্যজ্যযোঽন্যং দেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং সমূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষং ॥
কেহ কহে কর ইথে দেবতা নিন্দন।
কিন্তু নিন্দা নহে শাস্ত্রে স্বরূপ কথন ॥

সর্ব্বারাধ্য—ভগবান সভার ভজন ।
কিন্তু কোন দেবতার না করি নিন্দন ॥
অবজ্ঞা না করি কারু না করি নিন্দন ।
মহতের নিন্দা হয় নরক কারণ ॥
সামান্য মনুষ্য নিন্দা হয়েত বিষম ।
দেবতার নিন্দা করে কোন নরাধম ॥
স্বরূপ কথনে জানি নিন্দা নাহি হয় ।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ইহা বিষ্ণু সর্ব্বাশ্রয় ॥
বিষ্ণু সম কহি যদি অন্য দেবগণে ।
পরমার্থ চ্যুত হন শাস্ত্রের সাসনে ॥

স্কান্দে শ্রীশিবং প্রতি পার্ব্বতীবাক্যং

অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ ।
ভবদাদি গুরুমূর্ত্তৈঃ সামান্যমিব লক্ষ্যতে ॥

ত্রিগুণাত্মক সমভাব কহ কোন জন ।
ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর সম তিন গুণ ॥
সত্ব রজ তম হয় প্রকৃতির গুণ ।
গুণাশ্রিত হৈঞা পুরুষ তিনরূপ হন ॥
স্থিত্যাদি নিমিত্ত হন পুরুষ তিনমূর্ত্তি ।
পালন সংহার সৃষ্টে তিন রূপ গতি ॥
পালনে সে বিষ্ণুরূপ সৃষ্টি প্রজাপতি ।
রুদ্ররূপে সংহার করয়ে সর্ব্বক্ষিতি ॥
যদ্যপি সে তিনমূর্ত্তি পুরুষের হন ।
তাহাতেহ সত্বতনু শ্রেষ্ঠ নিরূপণ ॥
সত্বতনু বাসুদেব কল্যাণদায়ক ।
মনুষ্যের শ্রেয় হেতু সেই সে নায়ক ॥
বাসুদেব বিনে দেখ মুক্তি নাহি হয় ।
জ্ঞানসাধ্য মুক্তিপদ কহিল নিশ্চয় ॥
সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং গীতায় কহিল ।
জ্ঞানের সুলভ মুক্তি শাস্ত্রে নিরূপিল ॥

শ্রীভাগবত প্রথমে

সত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥
সত্বতনু বিষ্ণুদেব শ্রেয়ঃ সভাকার।
প্রকৃতিজাত নহে বিষ্ণুর অবতার ॥
নিগুণ প্রকৃতির পর বিষ্ণুদেব হন।
তাঁরে যেবা ভজে সেহ হয়ে ত নির্গুণ ॥

শ্রীদশমে

হরির্হিনির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণোভবেৎ ॥
সত্বকে বিস্তার করি তবে তনু হন।
প্রকৃতিজাত বিষ্ণুর মূর্ত্তি কভু নন ॥
অতএব ভগবান কহিলা অর্জ্জুনে।
সত্ব রজ তম ভাব এ তিন বিধানে ॥
আমা হৈতে সেই তিন ভাবের উতপন্ন।
আমার কখন নয় প্রকৃতির জন্য ॥
তিনভাবে আমি নাই মো বস তিন।
অতএব তিনগুণ আমার অধীন ॥

শ্রীভগবদগীতাসু

যে চৈব সাত্বিকভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥
প্রকৃতির গুণযুত ব্রহ্মা সুরপতি।
রজোগুণে সৃষ্টিকর্ত্তা এ তিন জগতি ॥
নারায়ণের নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জনম।
জন্মমৃত্যু আছে তাঁর শাস্ত্রে ত নিয়ম ॥
দৈবী একত্তরি যুগে এক মন্বন্তর।
এক ইন্দ্র পতন হয় ইহার ভিতর ॥
চৌদ্দ ইন্দ্র পতন হয় ব্রহ্মার দিবসে।
তত কাল পুন ব্রহ্মার রাত্রের প্রকাশে ॥

ব্রহ্মার রাত্রিতে হয় প্রলয় উপস্থিতি।
সর্ব্ববীজ লাইঞা তাহাতে করে স্থিতি॥
হেন মতে দিন রাত্রি পক্ষ মাস গণনা।
তাহার দ্বাদশ মাসে বৎসর কল্পনা॥
শতবর্ষ ব্রহ্মার আয়ু পরিমাণ।
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসে ব্রহ্মা লয় জান॥
মহাবিষ্ণুর শ্বাসে ব্রহ্মাণ্ড অগণিত।
উতপন্ন প্রলয় হৈছে নিমিষে শতশতঃ॥
অতএব বিনাশে ফল ব্রহ্মাদিতে দেখে।
অবিনাশি বিষ্ণুপদ শাশ্বত বলি লেখে॥
অতএব ব্রহ্মাদি দেব নহে বিষ্ণু সম।
বিষ্ণু সম হয় তাঁর অবতারগণ॥

যথা বরাহে

মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদ্যাঃ সমা বিষ্ণোরভেদতঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বসমা প্রোক্তা প্রকৃতিস্তু সমাসমা।
সমা প্রকৃতিশব্দেন চিচ্ছক্তি রভিধীয়তে॥ ইতি

ভাগ্যবান জীবলোক স্বধর্ম্ম সাধনে।
ব্রহ্মপদ পায় সেই নিষ্ঠা আচরণে॥
শত জন্ম স্বধর্ম্মনিষ্ঠা হৈঞা ভাগ্যবান।
সেই জীব তবে জানি ব্রহ্মপদ পান॥
এই কথা ভাগবতে কহিলা পঞ্চানন।
প্রচেতস উপাখ্যানে এই বিবরণ॥
ব্রহ্মত্ব পায়িঞা জীব পুন মোরে পায়।
আমার পদবি পাঞা বৈষ্ণবকে পায়॥
আমি যেই মত তেমত সেই হয়।
অতএব ব্রহ্মাদি সম বিষ্ণু নাহি কয়॥
বিষ্ণুমন্ত্র জপিঞা বৈষ্ণব মহেশ্বর।
অতএব বৈষ্ণবপদ হয় পরাতপর॥

শ্রীভাগবতে শিববউক্তিঃ

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হিমাং।

অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধা কলাত্যয়ে ॥
কোন কল্পে ভাগ্যবান জীব ব্রহ্ম হয়ে।
কোন কল্পে যদি পুণ্যকারী নাহি রহে ॥
তবে মহাবিষ্ণু অংশে ব্রহ্মরূপ হন।
রজগুণে এই বিশ্ব করয়ে সৃজন ॥

যথা—

ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মাজীবানুপাসনৈঃ
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুঃ ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে ॥
রুদ্র হন একাদশ তমগুণ যুত
ব্রহ্মার ললাটে জন্ম শাস্ত্রেত লিখিত ॥
কোন কল্পে কালাগ্নিরুদ্র শঙ্কর্শণাংশ হয়।
সংহারে রহেত তিঁহো তমোগুণময় ॥

যথা—

বিধের্ললাটাজ্জন্মাস্য কদাচিৎ কমলাপতেঃ।
কালাগ্নিরুদ্রঃ কল্পান্তে ভবেৎ সঙ্কর্ষণাদপি ॥
শক্তিযুক্ত শিব হন গুণাত্মা আপনে।
কোন কল্পে সংহার হেতু হয় তমোগুণে ॥

শ্রীদশমে

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বত্রিলিঙ্গোগুণসংবৃতঃ
যিহো গুণাতীত হর সদাশিব নাম।
তমোগন্ধ রহিত তিহো সকলে প্রধান ॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরূপ সেই তনু হন।
ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে তাঁহার বিবরণ ॥

তত্র কারিকা

সদাশিবাখ্যাতন্মূর্ত্তেস্তমোগন্ধ বিবর্জ্জিতা।
সর্ব্বকারণ ভূতাসাবঙ্গরূপা স্বয়ং প্রভোঃ ॥

অপিচ

হরঃ পুরুষধাম যোনির্গুণ প্রায় এবসঃ ॥ ইতি
সদাশিব মূর্ত্তি হন শ্রীকৃষ্ণের তনু।
ব্রহ্ম সংহিতায় দেখ কহিছেন পুনঃ ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে নহি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুঃতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যা-
দ্গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
সেই সদাশিবের ধাম ব্রহ্মাণ্ড উপরি।
গোলোক সমিপে অধ সদাশিব পুরি ॥
নিত্য সত্য স্থান সেই নাহি তার ক্ষয়।
নিত্যানন্দ সুখ তাঁহা নাহি ত আময় ॥

যথাতন্ত্রে—

মহর্লোকঃ ক্ষিতেরূর্দ্ধমেককোটিস্তু যোজনঃ
কোটিদ্বয়েন বিখ্যাতো জনলোকস্ততঃ পরঃ ॥
চতুষ্কোটি প্রমাণস্তু তপলোকস্তু ভূতলাৎ
উপরিষ্টাত্ততঃ সত্যং কোটিরষ্টৌ প্রমাণতঃ ॥
সত্যাদুপরি বৈকুণ্ঠঃ কোটিষোড়শ সম্ভবঃ।
আপরিব্যাপ্ত কৌমার উমালোকস্ততঃ পরং
শিবলোকস্তদুপরির্গোলোকস্য সমীপতঃ।
জ্যোতির্ম্ময়ং পরং ধাম তত্র বৃন্দাবনং মতঃ ॥
যত্রাস্তে রাধিকা দেবী সর্ব্বশক্তিনমস্কৃতা।
যত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বদেবশিরোমণিঃ ॥
বলরাম সদা যত্র গোগোপাল গণামৃগাঃ।
নিত্যং সনাতনং ধাম গোলকং সকলোপরিঃ ॥
ইতি ॥

ব্রহ্মা রুদ্র আদি করি যত দেবগণ।
প্রায় বিষ্ণুদেব হৈতে গুণে ন্যূন হন।
অতএব দেখ কহে ভাগবত-পুরাণে।
মুমুক্ষু সব আরাধিলা অবতারগণে ॥
ভূতপতি দেবগণের ছাড়ি আরাধন।
নারায়ণের শান্তাংশকলা করিলা সাধন ॥
মুক্তিদাতা ভগবান্ বিষ্ণু অবতারি।
অতএব মুক্তিহেতু ভজিল তাঁহারি ॥

শ্রীভাগবতে প্রথমে

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥
অত্র স্বাংশা হরেরেব কলাশব্দেন কীর্ত্তিতাঃ।
গুণাবতারেতে হন তিন নিরূপণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সৃষ্ট্যাদি কারণ ॥
পুরুষ হইতে হয় তিনের উৎপত্তি।
যাঁহার নিশ্বাসে হয় ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি!
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডগণ করে যাতায়াত।
যাহার নিঃশ্বাস পথে উতপত্তি নিপাত ॥
সেই মহাবিষ্ণু হন ব্রহ্মাণ্ডের কারণ।
তিঁহো হন গোবিন্দের কলাতে গণন ॥
কলাতু ষোড়শভাগ কহিলা পুরাণে।
স্বয়ং রূপ নন্দসুত ভজ বৃন্দাবনে ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং

যস্যৈকনিশ্বসিত কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজাঃ জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহানপিযস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ইতি ॥

ব্রহ্মস্তুতি ভাগবতে দশমে বর্ণন।
আপনাকে দন্ত করি করিছে স্তবন ॥
অহে প্রভু কৃপাময় শ্রীনন্দনন্দন।
সর্ব্বভাবে আমি তোমায় লইনু শরণ ॥
তুমি সর্ব্ব অবতারি কারণের কারণ।
সৃষ্টাদি নিমিত্তে কর ত্রিরূপ ধারণ ॥
ব্রহ্মা হৈঞা কর তুমি বিশ্ব উৎপত্তি।
পালনার্থে বিষ্ণুরূপে জগত কর স্থিতি ॥
রুদ্র রূপ হৈঞা কর জগত সংহার।
আমি কি জানিব প্রভু মহিমা তোমার ॥
মোর দোষ নিবেদিয়ে সুন ভগবান।
তোমার প্রভাবে মোর এই অভিমান ॥

বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা এ করি গরিমা।
তোমার মায়া মুগ্ধ হৈঞা পাসরি আপনা॥
ভৌতিক দেহ মোর মহদাদি যুত।
পৃথিব্যপতেজ বায়ু আকাশাদিগত॥
সপ্তবিতস্তি দেহ নিজ পরিমাণে।
স্বেচ্ছাময় তুমি প্রভু কেবা তোমা জানে॥
এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা মোর অভিমান।
তোমাকে না চিনি প্রভু করি গ্যেপজ্ঞান॥
এমত ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটি অগণিত।
লোমবিবরে তোমার করে গতায়াত॥
গবাক্ষদ্বারে যেন পরমাণু রূপে।
ব্রহ্মাণ্ডগণ তৈছে তোমার লোমকূপে॥

যথা শ্রীদশমে

ক্বাহং তমো মহদহং খচরাগ্নিবাভূ
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
কেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চতেমহিত্বং॥
কৃষ্ণ মহিমার ওর না পায় চতুর্ম্মুখ।
এই কথা কহেন দেখ পরীক্ষিতে শুক॥
ব্রহ্মা কহেন নাহি জানি শ্রীকৃষ্ণ মহিমা!
মুনিগণ নাহি জানে যারগুণ সীমা॥
শনকাদি নাহি জানে অন্যের কি দায়।
সহস্র বদনে অনন্ত গুণ গায়॥
গুণ গাঞা গুণের অন্ত নাহি পান।
এই কথা ভাগবতে চতুর্ম্মুখ গান॥

যথা

নাহং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোপরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেব
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্যপারং॥ ইতি॥

ব্রহ্মা বরুণ ইন্দ্র রুদ্র পবন।
ইত্যাদি দেবতা যাঁকে করিছে স্তবন ॥
মুনিগণ সামবেদে গায় নিরবধি।
অন্তর্ম্মনা হৈঞা সদা জারে ভাবে যোগী
সুরাসুরগণ যাকে ধ্যানে নাহি পান।
সকলের আরাধ্য কৃষ্ণ ভাগবতে প্রমাণ ॥

যথা শ্রীভাগবতে

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্র রুদ্রমরুত স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যংসামগাঃ
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায়তস্মৈ নমঃ
সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বমূল কৃষ্ণের অবতার।
সকলের বন্দনীয় সকলের পার ॥
রামচন্দ্রে করে স্তুতি দেব পঞ্চানন।
তাহার প্রমাণ শুন অধ্যাত্ম রামায়ণ ॥
লঙ্কা বিজয় হৈলে সর্ব্বদেব আসি।
স্তুতি নতি পূজা করি সকলে প্রশংসি ॥
শিব কহে সুন প্রভু অখিলের নাথ।
তোমার লইঞা নাম আমরা কৃতার্থ ॥
নিরবধি কাশীবাস ভবানির সনে।
আনন্দে তোমার নাম গুণ করি গানে ॥
মৃয়মাণ জনে আমি দিয়ে তোমার নাম।
রাম এই মহামন্ত্র তারক আখ্যান ॥
তারকব্রহ্ম এই রাম নাম হন।
কাশীপুরে মুক্তিহেতু তোমার কীর্ত্তন ॥

যথা অধ্যাত্ম-রামায়ণং

অহং ভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো
বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা।
মুমূর্ষমানস্য বিমুক্তয়ে হহং।
দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম ॥

ব্রহ্মাদয়স্তেন বিদুঃ স্বরূপং
চিদাত্মতত্ত্বং বহিরর্থভাবাঃ।
ততো বুধস্ত্বামিদমেবরূপং
ভক্ত্যা ভজন্মুক্তিমুপেত্যদুঃখং॥ ইতি

অতএব সভার সেব্য শ্রীগোবিন্দ হন।
ব্রহ্মারুদ্র আদিযত দেখ দেবগণ॥
কৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব সাধ্য নিরুপণ।
সর্ব্বোৎকর্ষ কৃষ্ণসেবা প্রথম প্রকরণ॥
শ্রীচেতন্য নিত্যানন্দ প্রভু প্রণমিঞা।
অদ্বৈত সুন্দরানন্দ মস্তকে বন্দিঞা॥
শ্রীপর্ণিগোপাল পদ করি অভিলাস।
দীনহীন কহে এই নয়নানন্দ দাস॥

অথ দ্বিতীয় প্রকরণ।

জয় জয় রামকৃষ্ণ সখাগণ সাথ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মোর প্রাণনাথ॥
অভিরাম সুন্দরানন্দ গোপাল মহান্ত।
শ্রীপর্ণিগোপালপদ স্মরিঞা নিতান্ত॥
অতএব ভজমন কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
তিঁহ তৃপ্ত হইলে জগত তৃপ্ত হয়॥
বৃক্ষমূলে জল দিলে পত্র শাখার তৃপ্তি।
পত্রে জল দিলে নহে বৃক্ষের জানি প্রাপ্তি॥
মুখে ভুঞ্জাইলে হয় ইন্দ্রিয় তোসন।
নাসাকর্ণে অন্নদিলে নহে শরীর পোসন।
তৈছে কৃষ্ণার্চ্চনে হয় জগত পূজন।
বৃক্ষমূলে জল দিলে পত্রের তোসন॥
সর্ব্বদেব তার মূল হয় ভগবান।
মূলং হি বিষ্ণু দৈবানাং ভাগবত গান॥

যথা শ্রীভাগবতে—

যথা তরোর্মূল নিষেবনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ ভুজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাদ্যথাস্ত্রিয়ানাং
তথাহি সর্ব্বাহর্ণ মু চ্যুতেষ্যা॥ ইতি
কৃষ্ণ সর্ব্বদেবময় সর্ব্বদেবেশ্বর।
ভক্তবৎসল কৃষ্ণ ভক্ত প্রিয়কর॥
কৃষ্ণপূজা করিলে সর্ব্বদেব তুষ্ট হয়।
অতএব কৃষ্ণ হন সর্ব্বদেবময়॥

স্কান্দে—

"অর্চ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্ব্বময়ো হরিঃ॥
হরি ভক্তিহীন জনের সব অকারণ।
কিবা বহুশাস্ত্র তপস্যা করণ॥
তপ জপ যজ্ঞবিধি হরিভক্তি বিনে।
যে সব করয়ে ধর্ম্ম জায় অকারণ॥

বৃহন্নারদীয়ে—

কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্ব্বা কিম্বা তীর্থ নিষবণৈঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনানাং কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥
যে করে পরমভক্তি বিষ্ণু আরাধন।
তবে তার অন্য তপস্যার নাহি প্রয়োজন॥
হরি সেবায় হয় সর্ব্বতপ ফল।
অতএব অন্য তপে দেখি যে বিফল॥
"নারাধয়ে যদি হরি তার তপ বৃথা।
ক্লেশমাত্র ভাগি হয় ফল নাহি তোথা॥
হরি আরাধনা বিনে করে পুণ্যকর্ম্ম।
পুণ্যফল তাহে নাহি কেবল অধর্ম্ম॥
পুন কহি শ্লোকার্দ্ধ অর্থ বিবরণ।
অন্তর্ব্বাহে জার হরি চিন্তনীয় হন॥

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীকুন্তীদেবীর স্তব। (২)

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ং।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা॥

মায়া, জবনিকাসম করে আবরণ,
সেই হেতু নাহি ঘটে তোমার দর্শন।
শুনিয়াছি এই কথা জ্ঞানীগণ ঠাঁই,
ইহার কি অর্থ মনে ভাবিতেছি তাই।
কেহ কেহ মনে করে, মায়া তোমারেই ঘেরে,
কিন্তু ইহা অসম্ভব, তুমি যে অব্যয়,
কোনরূপ পরিচ্ছেদ তোমাতে না হয়।
মেঘে ঢাকে আমাদের যুগল নয়ন
মোরা ভাবি সূর্য্যে মেঘ করে আবরণ।
মেঘের উপর দেশে, ভাস্বর ভাস্কর হাসে
এ তত্ত্ব আমরা কিন্তু মনে নাহি ভাবি,
তাই বলি 'দেখ দেখ মেঘাবৃত রবি'॥
তুমি দেব অধোক্ষজ, ইন্দ্রিয় নিচয়
তোমারে ধরিতে কভু সক্ষম না হয়।
ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব মোরা, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে হারা,
তুমি অতীন্দ্রিয়, তাই না দেখি তোমারে,
মনে ভাবি মায়া তোমা আবরণ করে॥
কিঞ্চিৎ ভাবিলে মোরা করি নির্দ্ধারণ
ইন্দ্রিয়ই নহে শুধু জ্ঞানের সাধন।
নর্ত্তক নর্ত্তন করে, অরসজ্ঞ তাহা হেরে,
কিন্তু নৃত্য তার নাহি হয় অনুভব,
শুধু আঁখি দিয়া তাহা নহে তো সম্ভব।

রসের ভাবের সঙ্গে হ'লে পরিচয়
নর্ত্তকের নৃত্য-কলা অনুভূত হয়।
সেই মত ওহে হরি, তোমারে সাক্ষাৎ হেরি
প্রকৃতির পর বলি করিতেছি স্তুতি,
অথচ স্বরূপ তত্ত্ব নহে অনুভূতি॥
পাণ্ডবেরা ভক্ত তব, একান্ত আশ্রিত,
তুমিও তাদের সদা পালনেতে রত।
পুনঃ তুমি অন্তর্যামী, সর্ব্ব প্রেরণার স্বামী,
তবে কেন অশ্বত্থামা আদি বীরগণে
নিয়োজিত করিতেছ পাণ্ডব নাশনে॥
কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র নাহি করিবে ধারণ,
ইহাই প্রতিজ্ঞা তব ছিল নারায়ণ,
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, করে অস্ত্র নিলে হরি,
লীলার রহস্য তব দুর্জ্ঞেয় অপার
তুমি নিজে না বুঝালে বুঝে সাধ্য কার।
শিষ্টের পালনে রত তুমি অনুক্ষণ।
কিন্তু ভীষ্ম প্রভৃতিরে করিলে নিধন॥
দ্রৌপদীরে সুভদ্রারে, সদা দেখ স্নেহ ভরে,
অথচ তাদের পুত্র হইল নিহত।
নয়নের নীরে তারা ভাসে অবিরত॥
তাই দেব বলিতেছি দেখেও সম্মুখে
তোমার অপার তত্ত্ব মানুষে না দেখে॥

শ্রীজন্মাষ্টমী।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, আমাদের একমাত্র হিতকারী, জ্ঞানী ও ভক্ত আচার্য্যগণ, আমাদিগকে সকল শিক্ষা ও সকল সদুপদেশের সারস্বরূপে এই তত্ত্ব শিখাইয়া গিয়াছেন, যে শ্রীভগবান এই জগতে আসিয়াছিলেন।

ভাদ্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষ, শুভ অষ্টমী তিথি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি পড়িতেছে। মথুরায় কংস কারাগার, নিভৃতকক্ষে দেবকী ও বসুদেব বন্দীভাবে দীর্ঘকাল কালযাপন করিতেছেন।

সংসারে আসিয়া মানুষ হইয়া যত প্রকার কষ্ট হইতে পারে, দেবকী ও বসুদেবের ভাগ্যে পর পর তাহার সকলগুলিই হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর দিন আনন্দোৎসবের মধ্যে দেবকী শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলেন, সেই সময়েই দৈববাণী হয় যে তাঁহার অষ্টমগর্ভে কংসের বিনাশকারী আবিভূর্ত হইবেন। কংস এই আনন্দোৎসবের অগ্রণী হইয়া নিজে রথ চালাইয়া ভগিনীকে লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু দৈববাণী শুনিবামাত্র সে খড়্গ লইয়া ভগিনী দেবকীকে হত্যা করিতে গিয়াছিল। সে দিন সাধু বসুদেবের ধৈর্য্য ও সদ্বুদ্ধির দ্বারা দেবকী রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাহার পর ছয় পুত্র কংস হস্তে নিহত হইয়াছে। সপ্তম গর্ভের ইতিহাস রহস্যে আবৃত, কি হইল কেহই জানে না, লোকে জানে গর্ভ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই বার অষ্টম গর্ভ!

কংস মরণের গতিরোধ করিয়া চিরদিন বাঁচিয়া থাকিতে চায়। জীবনের আনন্দোৎসবের মধ্য হইতেই মৃত্যু যে আত্মপ্রচার করে এ তত্ত্ব কংস জানিত না। কংসের আত্মরক্ষার চেষ্টাতেই বসুদেব ও দেবকীর এই দুঃখ—সাধারণ মানবের কারণজ্ঞান এই পর্য্যন্তই বুঝিতে সক্ষম।

যাহা হউক ভূতভাবন ভগবান জগতে আসিলেন। তিনি কেন আসিলেন তাহা সাধারণ লোকে নির্ণয় করিতে অক্ষম। কেহ বলিলেন কংসকে বধ করিবার জন্য. কেহ বলিলেন দেবকী ও বসুদেব পূর্ব্বে ভগবানকে পুত্র রূপে পাইবার জন্য অনেক তপস্যার পর বর চাহিয়াছিলেন। পূর্ব্বে আরও দুইবার ভগবান তাঁহাদের পুত্র হইয়া আসিয়াছিলেন, এইবার তৃতীয় বার। এসমস্ত আনুসঙ্গিক কারণ, তিনি আসিলেন, তাঁহার লীলা কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া জগৎকে আত্মসাৎ করিবার জন্য। ইহাই মুখ্য কারণ। আমাদের এই দৃশ্য জগতের কার্য্যের বা ঘটনার মধ্যে ভগবদাবির্ভাবের কারণ নাই, ফল আছে। আমরা যেন ফলকে কারণ বলিয়া মনে না করি।

আজ কারাগারের সতর্ক প্রহরী ঘুমাইয়া পড়িল, সভায় উপবিষ্ট কংসের মাথার মুকুট খসিয়া পড়িল। আজ প্রাতঃকাল হইতে চারিদিকে কেমন সব নূতন ব্যাপার ঘটিতেছে, ধূলাময় জগতে যেন কোন্ আদর্শ শাশ্বত লোকের প্রভাব বিকশিত হইয়া উঠিতেছে—কংস তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কিন্তু তাহার তাহাতে আনন্দ হয় নাই, সে তাহার ছোট 'আমি' টিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, কাজেই তাহার চিত্তে কেবল দুর্ভাবনাই আসিতেছে—গতরাত্রিতে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে, প্রভাত হইতে সমস্ত দিন, কেবল দুর্লক্ষণ দেখিতেছে—

তাহার ঠিক ধারণা হইয়াছে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান আজ জন্ম গ্রহণ করিবে। সেই জন্য কংস আজ খুব বেশী রকম সতর্ক হইয়াছে। কারারক্ষকগণকে বলিয়া দিয়াছে, আজ কারাগার ভাল করিয়া যেন রক্ষা করা হয়, সমস্ত রাত্রি কেহ ঘুমাইবেনা। নিজে ও সভা করিয়া বসিয়া আছে, কংসের মথুরা আজ জাগিয়া থাকিতে চায়, কংসের জন্য মরণ লইয়া আজ কেহ আসিবে, তাহাকে ধরিতে চায়। চেষ্টার ত্রুটি নাই, স্থির হইয়াছে আজ আর কেহ ঘুমাইবে না। কিন্তু ঘুম আসিল। দেহাভিমানী জীব দেহের ক্লান্তিতে অবশ হইয়া পড়িল। কংসের মাথার মুকুট খসিয়া পড়িল! স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট কংসের মাথা লুটাইয়া পড়িল, নিমিষের মধ্যে নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হইল,মন্ত্রী বলিতেছেন "মহারাজ ঘুমাইতেছেন?" সমস্ত কথা মুখ হইতে বাহির হইল না, তিনিও ঘুমাইয়া পড়িলেন। একেবারে নিমিষের মধ্যে সেনাপতি, সভাসদ, পাত্র মিত্র, দৌবারিক সকলেই নিদ্রামগ্ন হইলেন।

আজ কি ভীষণ নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! দেবী মহামায়া আকাশে নিবিড় মেঘের স্তূপের উপর চরণ ছড়াইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার নিবিড় কুন্তলরাশি পবনে উড়িতেছে, আর বৃষ্টি বিন্দুর সহিত নিদ্রার মোহ জগতে অবতীর্ণ হইয়া আর্দ্র বায়ুতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, এত বড় ব্যাপার হইতেছে, কিন্তু একেবারে নিঃশব্দে! কারাগারের দ্বারে দ্বারে সমুদয় রক্ষীগণ নিদ্রায় অচেতন।

কারাকক্ষে দেবকী ও বসুদেব জাগিয়া রহিলেন। কি দুর্য্যোগ, বাহির হইতে বাতাসের শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, আর মধ্যে মধ্যে ভীষণ বজ্রধ্বনি শুনা যাইতেছে, তাঁহারা কারাকক্ষে শুইয়া আছেন, হস্ত পদে শৃঙ্খল, বক্ষে পাষাণ। "এমন করিয়া আর কতদিন যাইবে হরি!" "যতদিন যায় যাউক, অন্তরে স্বাধীন হও, ভিতরে স্বাধীন না হইলে বাহিরের বন্দীদশা যাইবে না। যাহার অধীন হইলেই সত্য সত্য স্বাধীন হওয়া যায়, আত্মা বুদ্ধি মন প্রাণ সমস্তই তাঁহার শুভ ইচ্ছার অনুকূলে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখ।" দম্পতীর মধ্যে এইরূপ কথা হইতেছে।

অকস্মাৎ বুকের পাথর পাতলা হইয়া উঠিল। এ কি! উভয়েই বিস্মিত, শুইয়াছিলেন উঠিয়া বসিলেন, হাতের পায়ের শিকল যে খুলিয়া গেল! "একি ইন্দ্রজাল না স্বপ্ন।" "ইন্দ্রজালও নয়, স্বপ্নও নয়, এ ভগবানের ইচ্ছা।"

হঠাৎ অন্ধকার কারাকক্ষে বিমল আলোকপাত হইল, ফুলের গন্ধে কক্ষ আমোদিত হইল। ভগবান আসিলেন—

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥"

পূর্ব্বদিকে যেমন চন্দ্র প্রকাশ পায়, তেমনি—দেবরূপিণী দেবকীতে সর্ব্বগুহাশয় হরি আবির্ভূত হইলেন।

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধং।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভি কৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদ সৌভগং॥
মহার্হ বৈদূর্য্য কিরীট কুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্ত সহস্র কুন্তলং।
উদ্দাম কাঞ্চ্যঙ্গদ কঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥"

অদ্ভুত, পদ্মপলাশলোচন, চতুর্ভুজে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলদেশে কৌস্তুভ। পরিধান পীতবাস, নিবিড় মেঘের মত সুভগবর্ণ, মহামূল্য বৈদূর্য্য, মুকুট ও কুণ্ডলের দ্যুতিতে অপরিমিত কেশপাশ দীপ্ত, আর অত্যুৎকৃষ্ট মেখলা, অঙ্গদ ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারে দীপ্ত।

সেই নীরব নিশীথকালে কারাগারের লৌহদ্বার আপনিই খুলিয়া গেল। কংস-কারাগার হইতে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেব নন্দগোকুলে রাখিয়া আসিলেন। যশোদার সদ্যপ্রসূতা কন্যা আসিয়া বসুদেবের স্থানান্তরিত পুত্রের স্থান অধিকার করিলেন। এক রাত্রির মধ্যে এত বড় ব্যাপার হইয়া গেল। জগতের সকলেই তখন নিদ্রাগত। এক রহস্যের অভিনয় হইয়া গেল। অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত কেহই জানিল না।

আমাদের পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন ভগবান, জগতে আসিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা আর বড় কথা কিছুই নাই। এই টুকু বুঝিতে পারিলেই মানবের যাবতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে। তিনি আসিয়া এই জগতকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই হিন্দু এখনও সংসারী। নতুবা নারদের শিষ্যগণ ইন্দ্রিয়ের সুখ বা তৃপ্তির জন্য এই ধূলার জগতে বাস করিত না। মদনকে জ্ঞানগুরু মহাদেব ভস্ম করিয়াছেন, ভগবান অপ্রাকৃত নবীন মদন রূপে আবির্ভূত হইলেন। হিন্দু দেখিলেন জগতের বা জীবনের যে সাধারণ অর্থ সমুদয় লোক বোঝে, তাহা ঠিক নয়। জগতের একটি অসাধারণ অর্থ আছে। এই অসাধারণ অর্থ হিন্দু তাঁহার সকল সাধনার শেষ অবস্থায়, ভগবানের এই জন্মের দ্বারা অনুভব করিয়াছে। আজ

যদি এই দেশ সত্য সত্যই বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তাহা হইলে সেই অসাধারণ অর্থ টুকুর সহিত দেশবাসীগণের পরিচয় সাধন করিতে হইবে।

ভগবান আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার দিকে যাইতে পারি নাই, তিনি আমাদের আপনা হইবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা কোনরূপ অভ্যর্থনাও করি নাই, আমরা ঘুমে অচেতন হইয়াছিলাম। তিনি আসিলেন, আমাদের সাধনক্ষেত্র ও তপোবন, এ সমস্তের প্রতি তিনি চাহেন নাই—কারাগারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা জানিতে ও পারি নাই।

তাহার পর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ শুনিতেছে, তিনি আসিয়াছিলেন, আমরা তখন ঘুমাইয়া ছিলাম। একটি মিষ্ট কথাও বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে পারি নাই। আমরা কংস রাজের অধীন প্রজা, সে সাহস আমাদের ছিলনা, তাহার উপর আবার যোগনিদ্রা আমাদের অভিভূত করিয়াছিলেন। প্রভাতে নন্দগোকুলে উৎসব আরম্ভ হইল, আর মথুরায় হইল বালিকাহত্যার আয়োজন!

সরলচিত্ত ভক্তগণ আজ এই ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিয়া সমস্ত দিন কাঁদিতেছেন, হরি আজ তুমি আসিয়াছিলে, তুমি আমাদের একমাত্র আপনার, অথচ আমরা তোমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা পর করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু তোমার তাহাতে অভিমান নাই, রোষ নাই। বার বার তুমি আসিতেছ, শেষে একেবারে পূর্ণতমরূপে আসিলে, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ হইয়া রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ সমস্তের মধ্য দিয়া আমাদের করুণা করিলে! এতদিন যাহা বন্ধনের হেতু ছিল, এতদিন যাহা দুঃখের সহিত, পৃথিবীর সহিত আমাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহাই আমাদিগকে, হে আমাদের চির-সুখ, তোমার সঙ্গে বাঁধিয়া দিল। যে নাম, রূপ আমাদের ছাড়িবার জন্য সাধুগণ উপদেশ করিতেছিলেন, অথচ আমরা বহু জন্ম জন্মান্তর চেষ্টা করিয়াও যাহা ছাড়িতে পারি নাই, আজ তুমি স্পর্শমণি, সেই নামে ও সেই রূপে তোমার স্পর্শ দিয়া গেলে—আজ সম্বল হইল আমাদের তোমার জগন্মঙ্গল হরিনাম, আর তোমার ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ব্রজ-যুবরাজ রূপ! যাহা হইতে ব্যাধি হইয়াছিল, তাহার দ্বারাই তুমি আসিয়া চিকিৎসা করিলে, মানবের অধ্যাত্ম-সাধনা শেষ হইল।

"আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুণাতি চিকিৎসিতং ॥"

যাহা হইতে রোগ জন্মায় দ্রব্যান্তরের দ্বারা ভাবিত হইলে তাহাই আবার রোগ নাশ করে।

এমনি করিয়া ভগবান আসিলেন, অপূর্ব্ব লীলা করিলেন। যাহা নিত্য ও অপ্রাকৃত, দেশ ও কাল যাহা ধারণ কবিতে পারেনা, যোগমায়া প্রভাবে তাহা দেশ ও কালের মধ্যে, অনিত্য প্রাকৃত প্রপঞ্চের মধ্যে অভিনীত হইয়া গেল।

এই লীলার মধ্য দিয়া হরি আমাদের আপনার হইবার জন্য আসিয়াছিলেন, এই লীলার সূত্র ধরিয়াই তাঁহাকে আমরা আপনার করিবার চেষ্টা কবিব—আর অন্যপথ নাই—ইহাই যুগধর্ম্ম, হিন্দু সাধনার ইহাই শেষ কথা।

"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥
যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনং।
ছিন্দন্তি কোবিদস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিং॥
শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব কথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রা পুণ্যতীর্থ নিষেবণাৎ॥
শৃন্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থোহ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাং॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠকী॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্বে প্রসীদতি।"

অতএব একাগ্রচিত্তে সর্ব্বদা ভক্তবৎসল ভগবানের নাম, গুণ, লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা করিতে হইবে। ভগবানের এই অনুধ্যান ইহা অসির মত, এতদ্বারা সংযতচিত্ত বিবেকীগণ দেহাত্মবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত বন্ধনমূলক যে কর্ম্মপাশ তাহা ছেদন করেন। অতএব সেই ভগবানের কথায় কাহার না রতি হইবে? যদি কাহারও রতি না হয় তাহা হইলে তিনি পবিত্র তীর্থসমূহের সেবা করুন, নিস্পাপ হইবেন, মহৎ সেবায় প্রবৃত্তি হইবে, মহতের ধর্ম্মে শ্রদ্ধা হইবে। তখন মহতের ধর্ম্ম শ্রবণের দ্বারা এই ভগবানের কথায় রুচি হইবে। পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ আপনার কথা শ্রবণকারী পুরুষের হৃদয়স্থ হইয়া তাঁহার হৃদ্গত সমস্ত অশুভ কামাদিবাসনা বিনষ্ট করেন।

ভক্তের বা ভাগবতশাস্ত্রের এই নিত্য সেবাদ্বারা অশুভ সকল বিনষ্ট প্রায় হইলে উত্তমঃশ্লোক ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি হয়। রজো ও তমোগুণ হইতে উৎপন্ন কামলোভ প্রভৃতি আর চিত্তকে বিদ্ধ করিতে পারে না, চিত্ত সত্বগুণে স্থিত হইয়া প্রসন্ন হয়।

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে দেশে ও কালে আরম্ভ হইয়া যে সমস্ত ব্যাপার শেষ হইয়া যাইতেছে, আমরা যাহাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলি এই আবির্ভাব ও এই লীলা এ প্রকারের ঘটনা নহে। ভগবানের যে রূপ তাহাও ভৌতিক নহে। যেমন বৃহদ্বৈষ্ণব পুরাণ বলিয়াছেন—

"যো বেত্তি ভৌতিকং দেহংকৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বস্মাদ্বহিস্কার্য্যোঃ শ্রৌতস্মার্ত্ত বিধানতঃ।"

শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী বলিতেছেন—"অতিমর্ত্ত্যানি মর্ত্ত্যানতিক্রান্তানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি মনুষ্যেষু অসম্ভবিতানীত্যর্থঃ। ননু কথং মানুষঃ সন্ অতিমর্ত্ত্যানি কৃতবান্—তত্রাহ কপটমানুষঃ। পার্থিব-দেহ-বিশেষ এব মানুষশব্দঃ প্রতীতঃ। তস্মাৎ কপটেনৈব অসৌ তথা ভাতীত্যর্থঃ। বস্তুতস্য নরাকৃতেরেব পরব্রহ্মত্বেন অসত্যপি প্রসিদ্ধ মানুষত্বে নরাকৃতি—নরলীলত্বেন-লব্ধঃ অপ্রসিদ্ধ মানুষত্বমস্ত্যেব। তৎ পুনরৈশ্বর্য্যাব্যাঘাতকত্বাৎ ন প্রত্যাখ্যায়তে ইতি ভাবঃ। অতএব প্রাকৃতত্বং নিষিধ্য পুরুষত্বং স্থাপ্যতে।"

আবার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গীতাভাষ্যে বলিলেন "মম সর্ব্বেশ্বরস্য জন্ম চ কর্ম্ম চ দিব্যং অপ্রাকৃতং নিত্যং ভবতি। মজ্জন্মাদি নিত্যতা জ্ঞানেন বহুনাং বিমুক্তিঃ।"

পুনরায় বলিতেছেন—"মানুষী তনু খলু পঞ্চভৌতিক্যেব। ন চ ভগবত্তনুস্তাদৃক্। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহমিতি শ্রবণাৎ যত্তু "মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ইতি" মানুষ্যসংনিবেশিত্বমেব তত্তনোর্ম্মনুষ্যত্বমুক্তং, মনুষ্য চেষ্টাপ্রাচুর্য্যাত্তস্যাস্তত্বং। তস্মাৎ দ্বিভুজ চতুর্ভুজশ্চ স মনুষ্যভাবে নোক্তহেতুদ্বয়াদ্ব্যপদিশ্যঃ। ন চ দ্বিভুজত্বং সাদি। তস্মিন্ দ্বিভুজত্বাদীনি সিদ্ধান্যেব যথারুচি উপাস্যানি ইতি শাস্তোদিত-ত্বনিত্যোদিতত্ব-কল্পনা দূরোৎসারিতা।

শ্রীবলদেব বেদান্তস্যমন্তকগ্রন্থে এই তত্বের শেষ মীমাংসা করিয়া বলিলেন

"স চ পুরুষোত্তমঃ ক্বচিদ্দ্বিভুজঃ ক্বচিচ্চতুর্ভুজঃ ক্বচিদষ্টভুজশ্চ পঠ্যতে। তত্র দ্বিভুজ যথা অথর্ব্ব-মূর্দ্ধি তৈত্তিরীয়কে দ্বৌবাহু আত্মৈব পঞ্চবিংশকঃ। শ্রীসাত্বতে চ—সঙ্কর্ষণে চ চতুর্ভুজো যথা বিষকসেন সংহিতায়াং

অপ্রাকৃত তনুর্দেবো নিত্যাকৃতিধরো যুবা।
* * * নিত্যৈর্মূর্ত্তৈশ্চ সেবিতঃ ॥
বদ্ধাঞ্জলিপুটৈর্হৃষ্টৈর্নির্মলৈর্নিরুপদ্রবৈঃ।
চতুর্ভুজঃ শ্যামলাঙ্গঃ শ্রীভূলীলাভিরন্বিতঃ ॥

শ্রীদশমে চ শ্রীগীতাসুচ তেনৈবরূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্র-বাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ইতি। অষ্টভুজো যথা চতুর্থে। আনন্দাখ্য সংহিতায়াস্তু রূপত্রয়মুক্তং

"স্থূলমষ্টভুজং প্রোক্তং সূক্ষ্মঞ্চৈব চতুর্ভুজং।
পরং তু দ্বিভুজং প্রোক্তং তস্মাদেতৎ ত্রয়ং যজেৎ ॥

তেষু চারুত্বাধিক্যাৎ কৃৎস্নগুণ ব্যক্তেশ্চ দ্বিভুজস্য পরত্বং উক্তং। ন তু বস্তন্তরমস্তি নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদি বচনাৎ। যত্তু মন্যন্তে পরমব্যোম্নি নিত্যোদিতঞ্চ চতুর্ভুজং রূপং পরং—দ্বিভুজাদিরূপং তু শান্তোদিত-মপরমিতি তৎ খলু অবিচারিতাভিধানমেবং।

সর্ব্বে নিত্যা শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদান রহিতা নৈব প্রকৃতিজা ক্বচিৎ ॥
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ ॥

ইতি মহাবরাহোক্তিব্যাকোপাৎ ॥ *

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এই সমস্ত আলোচনা করিয়া নিম্নরূপে সমস্ত কথা সংক্ষেপে ইংরাজী ভাষায় বলিতেছেন,—

The following points may be noted (1) that the Lord's Incarnation is real, but supernatural (দিব্য) and eternal (নিত্য) (2) the body is incorruptible and non-natural, not the natural gross body of men (অপ্রাকৃত—অপার্থিব); and (3) that the body has an Intelligential essence, is only 'concrete' bliss and intelligence (জ্ঞানমাত্র সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমানন্দসন্দোহ) (4) that the Lord Incarnate retained absolute knowledge, absolute bliss, omnipotence, and power to grant salvation. (জ্ঞানানন্দাত্মত্ব সর্ব্বেশ্বরত্বমোক্ষদত্বস্বভাব—বলদেব গীতাভাষ্য) (5) that at the same time the Lord assumes human nature, in two ways, first the shape and from of man, and, secondly, ordi-

nary human acts (or volition) মানুষ্যসংনিবেশিত্বং মানুষ্যচেষ্টাপ্রাচুর্য্যং (6 that the Lord's humanity means only this, and not real humanity with its real imperfections (Baladeva)—according to Jiva Goswami, it is real humanity পুরুষত্বং, but without the imperfections of ordinary men (অপ্রসিদ্ধ মনুষ্যত্বং without পার্থিবত্বং and অনৈশ্বর্য্যত্বং) (7) that the Lord ascended to Heaven (স্বধাম) without burning the body to ashes, as yogis usually do, but 'in his eternal and incorruptible body অদগ্ধা ধামাবিশৎ স্বকং—ভাগবত) (8) that the supreme Being has a human shape, though this body is eternal and intelligential (নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ—নরাকৃতি) (9) that the supreme Being at the same time manifests himself in various forms, all perfect, eternal and intelligential (e. g. দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ) of which the human shape proper (with two arms) is peculiarly befitting (10) that the জন্ম, কর্ম্ম the Lord's birth, and the story of his life, are real and not illusory (মায়িক or ঐন্দ্রজালিক), as Nilkantha contends in the বনপর্ব্ব,—and (11) the perception of the Lord's body as a gross material aggregate is an illusion due to the Lord's maya.

The cheif heresies were (1) that the Lord's birth, death, body were all illusory appearances (2) that the body was natural, corruptible and created, and was left behind at the ascension (3) that the divine nature was all in all, and that there was no real humanity, in other words, that Krishna was no man and (4) that Krishna was only a man.

ইনায়াৎ খাঁ ও হিন্দুসঙ্গীতের আধ্যাত্মিকতা।

অধ্যাপক ইনায়াৎ খাঁ পঞ্জাব প্রদেশের লোক, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বরোদায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহের নাম মৌলা বক্স্। তিনি তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ছিলেন, তিনি হিন্দু সঙ্গীতের এক স্বরলিপির (notation system) আবিষ্কারক। তিনি স্বকীয় অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞানের দ্বারা ইনায়তের প্রতিভা-বিকাশে শক্তি-সঞ্চার করেন। ইনায়ত মহারাজ গুইকোয়াড়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বরোদার সঙ্গীত বিদ্যালয়ে সঙ্গীতবিদ্যা ও কবিতা এই দুইটি বিদ্যা অর্জ্জন করেন। তিনি এই বিদ্যালয়ে সঙ্গীত বিদ্যায় বরাবর প্রথম পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতের সঙ্গীতবিদ্যার জন্য এক বিশ্বজনীন পদ্ধতি গঠন করা তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি ভারতের সমস্ত প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, রাজা প্রজা সকলেই তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন। হায়দরাবাদের নিজামবাহাদুর তাঁহার সঙ্গীতে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েন, তাঁহাকে "তানসান" এই নাম প্রদান করেন ও বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে সম্মানিত করেন। ইনায়াত খাঁ কেবল যে সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ তাহা নহে, ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অন্তর্দৃষ্টি আছে। হাইদারাবাদের আচার্য্য সাইয়েদ্ মহম্মদ মাদনি'র নিকট তিনি সুফিমতে দীক্ষালাভ করেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে এই আদেশ করেন যে সঙ্গীতের দ্বারা পূর্ব্বদেশ ও পশ্চিম দেশকে সম্মিলিত কর এবং সুফীমত জগতে প্রচার কর। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইনায়েত খাঁ চারিজন সঙ্গীতবিদ্যাবিৎ সহচর সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা গিয়াছিলেন, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নানাস্থানে সুফীমত ও সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া পরিভ্রমণ করেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে তিনি এক সুফী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোনগরে ইহার প্রধান কেন্দ্র। গত বৎসর তিনি ইউরোপে বেশ প্রশংসা ও কৃতকার্য্যতার সহিত নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়াছেন। তিনি এখন ইংলণ্ডে লণ্ডন নগরে রহিয়াছেন।

প্রাচ্যদেশীয় অন্তর্জগৎবিৎ (mystic) গণের মতানুসারে ইনায়াত খাঁ সঙ্গীত শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেন, তাহার সাহায্যে হিন্দুসাধনার অনেক রহস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাঁহার মত প্রদান করিলাম।

অন্তর্জগতের রহস্যবিৎগণের মতে সঙ্গীতই বিশ্বের আদি ও শেষ। সমস্ত কার্য্য, সমস্ত গতি, দৃশ্য বা অদৃশ্য জগতে যাহা কিছু ঘটে, সেমস্তই সঙ্গীতময় (musical) অর্থাৎ লোক (Plane of existnce)-বিশেষের স্পন্দন আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়। সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীত বলিতে তিনটি জিনিস বুঝায়। গীত, বাদ্য ও নৃত্য। সমস্ত কার্য্যই এই তিনটির সমষ্টি। যেমন বাক্য, ইহাতেও তিনটি জিনিস আছে। প্রথম স্বর—ইহা গান, উচ্চারণ—ইহা বাদ্য (playing) আর দেহের গতি, বা মুখভঙ্গী, ইহা নৃত্য।

প্রাচ্য সঙ্গীতবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মহাদেব ইহার আবিষ্কর্ত্তা, ইনি যোগীদিগের গুরু। তাঁহার প্রিয়া পত্নী পার্ব্বতী ইহার গায়িকা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রধান সঙ্গীতবিদ্যাবিৎ, দৃশ্য ও অদৃশ্য এই উভয় জগৎকেই তিনি বংশীগীতের দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছিলেন, যোগীরা তাহা শুনিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

ভরতমুনি সঙ্গীতশাস্ত্রের আদি প্রণেতা, নারদ, তুম্বুর প্রভৃতি ভক্ত যোগী-গণ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতবিদ্যাবিৎ। স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র গন্ধর্ব্বদিগের গান ও অপ্সরাদিগের নৃত্যে নিত্য আপ্যায়িত। সরস্বতী সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি জ্ঞানেরও দেবী, বীণা তাঁহার অতি প্রিয় বস্তু। সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু দর্শন, স্পন্দন বিজ্ঞানের (Science of vibrations) উপর প্রতিষ্ঠিত। নাদ ব্রহ্ম। কবি তাব্রাজ স্থষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে শব্দের মধ্যে বিশ্বের সমস্ত রহস্য নিহিত। কোরান এবং বাইবেলেও এই মত পরিদৃষ্ট হয়।

সূক্ষ্ম স্পন্দন, কর্ম্মের দ্বারা ক্রমে ক্রমে স্থূলে পরিণত হয়। এই প্রকারেই ভিন্ন ভিন্ন লোকের (Planes of existence) সৃষ্টি হইয়াছে। ভূর্লোক বা এই দৃশ্যমান স্থূলজগতে এই স্থূল হওয়ার প্রক্রিয়া চরমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জল শীতাধিক্যে যেমন জমিয়া বরফ হয়, সেইরূপ ক্রিয়াশক্তির আধিক্যে স্পন্দন জড়ত্বলাভ করে (is materialised) আবার ক্রিয়াশক্তির অল্পতায় সূক্ষ্ম হইয়া যায় (is etherialised) ইহাতে বুঝা যায় যে জড় ও চৈতন্য পরমার্থতঃ একই, ভিন্ন নহে। চৈতন্য, স্পন্দনের নিয়মানুযায়ী জড়ভাব প্রাপ্ত হয়, আবার জড় চৈতন্যাভিমুখীও হয়।

যোগী ও সুফীগণ চিরদিন যোগানুষ্ঠানের দ্বারা উচ্চতম অবস্থার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা এই স্পন্দন বিধির জ্ঞানের দ্বারা জড়কে ক্রমশ চৈতন্যাভিমুখী করিয়াছেন।

যন্ত্রের যে জড়ীয় ধ্বনি (Material sound), অথবা মানবের বাগীন্দ্রিয়ের দ্বারা উদ্ভূত ধ্বনি, প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বজনীন ব্রহ্মাণ্ডগীতি (Universal sound of the sphere) হইতেই উদ্ভূত। এই ব্রহ্মাণ্ডগীতির সহিত সুর মিল করিতে পারিলে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। যোগীরা ইহাকে অনাহত নাদ বলেন, আর সুফিরা বলেন "শান্তি সারমদ্দি" (Santi Sarmaddi) বলেন।

গায়ক ও সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি সঙ্গীতের দ্বারা ক্রমশঃ পবিত্রীকৃত হয়েন এবং শব্দের যে উন্নততর ও সূক্ষ্মতর জগৎ আছে তাহার অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। সুফিগণ শব্দের মধ্যে আত্মহারা হয়েন এবং এই অবস্থাকে সমাধির (ecstasy) অবস্থা বলেন। তাঁহাদের নিজেদের নাম "মাস্তি"। অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম শক্তি সমূহ (Psychic occult powers) এই সমাধি অবস্থা আস্বাদনের পর সমাগত হয় এবং এই সময়েই অদৃশ্য ও দৃশ্য জগতের যাহা রহস্য তাহার সহিত পরিচয় ঘটে। এই যে সুখ ও শান্তির অবস্থা ইহা সঙ্গীতবিদ্যানুরাগী যোগী ও সুফিদিগের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে।

সঙ্গীত বিদ্যার প্রভাবে প্রাচ্যদেশের প্রায় যাবতীয় সঙ্গীতবিদ্যা বিশারদ মহত্মাগণ ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন! এ যুগেও তানসান ও মৌরসা বকস্ ইহার উদাহরণ।

শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ।

মনীষা-মন্দিরে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

প্রায় চারি মাস পূর্ব্বে, কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সুরধামে গিয়াছিলাম, তখন তাঁহার হাস্য-মধুর সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া কল্পনাও করিতে পারি নাই, যে দুরন্ত কাল-কীট তাঁহার জীবন-তরুর মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে। আর তাহারই ফলে তিনি এত শীঘ্র আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া দীনাহীনা বঙ্গজননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিবেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে প্রথমেই বঙ্গীয় সাময়িক ও মাসিক পত্রিকার কথা হইয়াছিল। তিনি মাসিক-সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন আজ কাল প্রত্যহ এক খানি

করিয়া নূতন মাসিক-পত্রিকা বাহির হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাসিক-পত্রিকার সংখ্যা যত বাড়িতেছে, লেখকের সংখ্যা তত বাড়িতেছে না,— অবশ্য এখানে সুলেখকের কথাই বলিতেছি। বাঙ্গালায় কয়জন সাহিত্যকে আরাধনার বস্তু বলিয়া মনে করেন, বলিতে পারি না। আমি ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলিতেছিনা। কিন্তু অধিকাংশ লেখকের রচনা পড়িয়াই মনে হয় লেখকের জ্ঞান ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ; তাহাতে আবার তাহার অনুশীলনও নাই। কোনরকমে দুটা কথা লিখিতে পারিলেই ছাপাইতে হইবে, ইহা অধিকাংশ লেখকের ধারণা। ইহার একটা কুফল এই যে, বিলাতে মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা গুলির যেমন একটা স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশের বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যে সেরূপ বিশেষত্ব বা স্বাতন্ত্র্যের একেবারেই অভাব। রাম কোন দিন সাহিত্যের এক কড়াও ধার ধারে নাই, কিন্তু হঠাৎ তাহার সম্পাদক হইবার খেয়াল হইল। আর অমনি চারিদিক হইতে তাহার পরিচিত বন্ধু ও উপবন্ধুপ্রমুখ মসরু-মলাইক লেখকের দল, যাহারা সাহিত্যের সিংহদ্বার হইতে প্রবেশ অধিকার না পাইয়া, অনাদৃত ভাবে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা আপনাদিগের অপমানের ও অক্ষমতার প্রতিশোধ লইবার সুযোগ পাইয়া, মহতের নিন্দা ও প্রতিভার অপমান করিতে বসিল। এইরূপে দলাদলি ও আত্মম্ভরীতা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। আজকাল প্রায় প্রত্যেক ছোট বড় পত্রিকায় এক একটা দল হইয়া পড়িয়াছে। দল বাঁধার যেমন সুবিধা আছে, ইহার তেমনি অসুবিধাও আছে। বিশেষতঃ সাহিত্যে দল বাঁধা একেবারেই নিরাপদ নহে। এক দলের লোক অন্য দলে ঢুকিতে পারে না, সব আলাদা আলাদা ছাড়া ছাড়া ভাব। এই আইসোলেসনের (Isolation) ফলে ছোট ও বড়র মধ্যে, সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকের মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন, একটা সহৃদয়তার ভাব একান্তই লোপ পাইতেছে। ফলে বড় আর ছোটকে স্নেহের শীতল ক্রোড়ে টানিয়া লয় না। ছোট বড় সমস্ত সাহিত্যিকের মধ্যেই একটা রেষারেষি ও দ্বেষাদ্বেষী ভাব। মাতৃভাষার সেবা করিতে আসিলেও, প্রেম অপেক্ষা বিদ্বেষ, অসির চকচকি ও নিন্দা হলাহলের অধিকতর ছড়াছড়িই দেখিতে পাওয়া যায়। এখন নূতন লেখককে উৎসাহ দিবার ও বন্ধুভাবে তাহার রচনার দোষগুণ দেখাইয়া দিবার কথা খুব কমই শুনা যায়। কয়জন সম্পাদক তাঁহার পত্রিকার লেখকগণকে আত্মীয় মনে করিয়া তাঁহাদিগের তথ্য লইয়া থাকেন।

পূর্ব্বে এ ভাবটার অভাব ঘটে নাই।" এইখানে আমি বলিলাম আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আমি শ্রীশম্ভুচরণ দে মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে তিনি অল্প বয়স হইতেই হিন্দু পেট্রিয়টে প্রবন্ধ প্রকাশার্থ পাঠাইতেন। তখন স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল উহার সম্পাদক। কৃষ্ণবাবু শম্ভুবাবুকে চিনিতেন না। একদিন শম্ভুবাবুর সহিত কৃষ্ণবাবুর কোন সুযোগে দেখা হয়। কৃষ্ণবাবু শম্ভুবাবুর পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ করিয়া নানাভাবে তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। আজকাল এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করা নূতন লোকের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

এইবার নবীন লেখকের কথা উঠিল। দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন, আজ কালকার বঙ্গসাহিত্যে নবীন লেখকগণ একটা কথা ভুলিয়া যাইতেছেন, সেটা সাহিত্যের গোড়ার কথা। লেখার জন্য লেখা নয়, বলার জন্য লেখা। বিশ্বের হৃদয়-তন্ত্রীতে যে অস্ফুট স্বর রহিয়াছে, যদি তাহাকে বাক্যের দ্বারা এমনি ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পার যে তাহাতে মানব-মনে ভাবের ঝঙ্কার উঠিবে, তবেই তোমার লেখনী সার্থক হইল। যদি তোমার মানস-দর্পণে বিশ্বের কোন ছবি প্রতিফলিত না হইয়া থাকে, তবে "মন্দকবি যশঃপ্রার্থী" হইয়া কোন ফল নাই। এমার্সন কবিকে Representative of mankind বলিয়াছেন। আমার হৃদয়ের যে কথা ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিতেছেনা, আমি হৃদয়ের যে ভাবকে ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারিতেছি না, কবি সেই কথা, সেই ভাব ফুটাইয়া তুলেন। এমার্সন বলেন আমি আমার হৃদয়ের সব কথা সম্পূর্ণভাবে জানি না, কবিই আমার সমস্ত হৃদয়টার সহিত আমাকে পরিচয় করাইয়া দেন। অতএব আমি আমার নিকটে যতটা আপনার, কবি আমার নিকটে তাহার অধিক আপনার। এটা বড় উচ্চদরের কথা। ইহা সমস্ত সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সম্বন্ধেই খাটে। উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ইহাই মাপ কাটি। এই কথাটা যাঁহারা ভাল করিয়া না বুঝিয়া লিখিতে বসেন তাঁহারা কবিতাই লিখুন, আর গল্পই লিখুন, আর প্রবন্ধই লিখুন, তাহার দ্বারা মাসিক-সাহিত্যের উদর পূর্ণ হয়, হৃদয়ের ক্ষুধা মিটে না।

আমি বলিলাম কবিতা কিরূপ হওয়া উচিত, এ বিষয়ে আপনার মত কি? দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন, একথা আমি ত একাধিক বার মাসিক সাহিত্যে আলোচনা করিয়াছি। আমার বিবেচনায় কবিতা সরল, ব্যাপক ও প্রাণ স্পর্শিনী হয়, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ থাকা উচিত নয়। আজকাল "মিস-

টিসিজম্” বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে, এবং তাহারই অজুহাতে যত আড়ষ্ট, অবোধ্য ভাবহীন, অর্থহীন কবিতা সাহিত্যের বাজারে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু একথা ঠিক যে কালিদাস, সেক্ষপিয়র প্রভৃতি মহা কবির আসনের নিকটে আজও মিস্‌টিক পোয়েটগণ দাঁড়াইতে পারেন নাই।

বিলাতে ব্রাউনিং খুব বড় মিসটিক কবি। কিন্তু তিনিও অবোধ্য নন। তাঁহারই কাব্য সমালোচনা করিতে গিয়া একজন সমালোচক একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন্। সে কথাটি এই :—A great poet may tax our brains, but he ought not to puzzle our wit: we may often have to ask in humility, what does he mean? but not in despair. What can he mean? ব্রাউনিং এর কবিতা চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারা যায়, আর বাঙ্গালার যাঁহারা ব্রাউনিং এর দোহাই দেন, মাথা কুটি-লেও তাঁহাদিগের রচনার ‘অর্থভেদ’ হয় না; উভয়ের মধ্যে ইহাই পার্থক্য।

প্রত্যেক যুগে কতকগুলি কথা বলিবার থাকে। আমিও দুটো একটা নূতন কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু বোধ হয় এখনও সেগুলি সকলে ধরিতে পারে নাই। বর্ত্তমান্ সময়ে আমার নাটকগুলি লইয়াই কিছু অধিক আলোচনা হইতেছে। দেশের ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া শেষজীবনে আমি কয়খানি নাটক লিখিয়াছি। ঐতিহাসিক নাটকের একটা সুবিধা আছে। একজন ইংরাজ সমালোচক বলেন “Perfection of culture, art for arts' sake, has no deep root in the heart of man, and flowers but to fade rapidly; it strikes a deep root only when it is a moral representation of life”. Moral representation কথাটার অর্থ, তাহার মধ্যে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ প্রভৃতি মানবীয় উচ্চ বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি চাই। কিন্তু এ কাজটা সহজ নয়। একটা বাস্তব চরিত্র লইয়া, এ কাজটা অনেক সহজে হয়। আসল ঘটনাগুলিকে গুছাইয়া, এখানে ওখানে একটু একটু রং ফলাইতে পারিলেই চরিত্রগুলিকে বেশ ফুটান যায়। কল্পনার এইরূপে আশ্রয় লইলে, ইতিহাসকে নষ্ট করা হয় না, বরং Facts যাহা অসম্পূর্ণ রাখে কল্পনা তাহাই সম্পূর্ণ করে। সেটা হ'চ্চে একটা ফুটন্ত চরিত্রের-সৃষ্টি। আমার সাজাহান পুস্তকের ভূমিকায় এই কথা আভাযে বলিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তথাপি এই কথা লইয়া, বাঙ্গালার অর্ব্বাচীন সমালোচকগণ সমালোচনীর ডাঙ্গস আমার মাথায় মারিতে ছাড়েন নাই।”

"তুমি কি আমার "পরপারে" পড়িয়াছ? ঐ নাটকে আমি একটি সামাজিক সমস্যার উল্লেখ করিয়াছি। বেশ্যা সমস্ত সভ্য জগতেই ঘৃণ্য জীব সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য দেশের সহিত আমাদের দেশের এ বিষয়ে একটা প্রধান পার্থক্য এই যে, আমাদের দেশের কোন স্ত্রীলোকের একবার চরিত্রস্খলন হইলে আর তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই, পাপের পিচ্ছল পথ হইতে তাহার ফিরিবার উপায় নাই। মানুষের জীবন উত্থান ও পতন লইয়া, এই মোটা কথা তাহার সম্বন্ধে একেবারেই খাটে না। একটি বাল্যবিধবার নিমিষের ভুলের জন্য তাহার চিরজীবন মরুভূমি হইয়া পড়ে, কেহ তাহাকে একটা উপদেশের কথাও বলিবে না, গভীর হইতে গভীরতর পতনের পথে যাত্রা ভিন্ন তাহার উপায় নাই। ইহা নিতান্ত কঠিন শাস্তি। মানবাত্মাকে এইরূপে নষ্ট করার জন্য সমাজই দায়ী। মানব আত্মাকে উন্নতির জন্য সমাজ ধ্বংশ করিবার তাহার অধিকার নাই। আমি বলিতেছি না যে বেশ্যার আবার বিবাহ হওয়া উচিত। আমি "পরপারে" বলিয়াছি যে, দুদণ্ডের ভুল দুইদিনে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তারপর যে উঠিতে চায়, তাহাকে উঠিতে দিবার জন্য একটা Provison থাকা চাই।

আমি বলিলাম আপনি আমাদিগের বঙ্গীয় রঙ্গালয় সম্বন্ধে কিছু বলুন। তিনি বলিলেন "প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বঙ্গে রঙ্গালয়ের যথেষ্ঠ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু উন্নতি এখনও অনেক বাকি। বঙ্গীয় রঙ্গালয় এখনত সাধারণের শিক্ষার উপযোগী হইতে পারে নাই। তাহার কারণ আমাদিগের রঙ্গালয়ের প্রতি এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায় ভ্রূকুটী করিয়া থাকেন তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদিগের দেশের লোকেরা আটআনা পয়সা খরচ করিয়া সমস্ত রাত্র বসিয়া আমোদ করিবে। এইজন্য আমাদিগের রঙ্গালয়ে অনেক সময়ে বাজে নাটকের অভিনয় করিয়াও নৃত্যগীতে দর্শককে ভুলাইয়া, রঙ্গালয়ের খরচ যোগাইতে হয়। য়ুরোপের মধ্যে মিউনিকের রঙ্গালয় নানা বিষয়ে অনেকটা উন্নত। তথায় সেক্সপিয়র ও জাতীয় কবির উৎকৃষ্ট নাটকই অধিক অভিনীত হয়, বাজে নাটক বড় সহনি পায় না। কিন্তু আমাদিগের দেশে সে দিন আসিতে এখনও দেরী আছে।

আমাদিগের রঙ্গালয়ের একটা প্রধান দোষ এই যে একখানি নূতন নাটক একেবারে বহু রজনী উপর্য্যুপরি অভিনয়ের পর তাহাকে একেবারে পরি-

ত্যাগ করা হয়। ইহাতে তাহার রস শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যায়। মিউনিকে কোন নাটকেরই তিন চার রজনীর অধিক অভিনীত হয় না। আমার বিবেচনায় রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণের উচিত তাঁহারা এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হন। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নাটকের নাম পর্য্যন্ত আজ শুনা যায় না। অথচ এক সময়ে তাহা অভিনয় দেখিবার জন্য রঙ্গালয়ে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। মধ্যে মধ্যে এরূপ নাটকের পুনঃ পুনঃ অভিনয় করিবার বন্দবস্ত করা উচিত। তাহাতে তাহাদিগকে সাহিত্যে সহায় সম্পদরূপে পরিণত হইবার একটা অবসর দেওয়া হয়। নতুবা দুইচারি দিন করতালি মুখরিত রঙ্গালয়ে অভিনয়ের পর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে ক্রমশঃ তাঁহারা বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া যায়।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

প্রেম।

বাগান-বাড়িতে চায়ের টেবিলে বসিয়া 'প্রেম' সম্বন্ধে নানা গল্প ও তর্কবিতর্ক করিতে ছিলাম। তখনো ঘরে সন্ধ্যা-বাতি জ্বলে নাই। সম্মুখে সমুদ্র—নিথর—নিস্পন্দ, যেন একখানা বৃহৎনীল আরসী পড়িয়া রহিয়াছে! অস্তগামী সূর্য্যকিরণে তাহা ঝল-ঝল করিতেছিল!

দূরে—বহুদূরে দক্ষিণে তরঙ্গায়িত পর্ব্বতশ্রেণী পশ্চিমের পাণ্ডু-লোহিত গগনে আপনাদের মসীচিত্র অঙ্কিত করিতেছিল!

সন্ধ্যার শান্ত মাধুর্য্যে আমাদের সেই চিরপুরাতন গল্প ক্রমেই মৃদুতর হইয়া আসিতেছিল, হৃদয়ের সমস্ত তারগুলি এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

একব্যক্তি কহিলেন,—"একটানা কয়েক বছর ধরে' কেহ কি প্রেমাসক্ত থাকতে পারে?"

কেহ কেহ উত্তর করিলেন, "হাঁ পারে।"

কেহ বা বলিলেন, "না, পারে না।"

আমরা এই বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছিলাম, ঘটনার পার্থক্য দেখাইয়া প্রেমের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছিলাম, কত দৃষ্টান্ত দিতেছিলাম। স্ত্রী পুরুষ সকলেই আপন আপন কষ্টকর স্মৃতিতে পীড়িত হইতেছিলেন; সে সকল কথা তাঁহাদের ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া কাঁপিতেছিল, কিন্তু উহা প্রকাশ

করিতে না পারিয়া তাঁহারা গভীর আবেগে সেই সর্ব্বলোকপূজ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু—তুটি কোমল ও রহস্যময় মিলনের কথা অতি আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন।

হঠাৎ একজন দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, ওটা কি ওঃ।"

সমুদ্র-বক্ষে দিগ্‌বলয়ের ঠিক নিম্নে ধূসরবর্ণ কি একটা প্রকাণ্ড স্তূপিকৃত বস্তু দৃষ্টিগোচর হইল।

প্রায় সকলেই আসন হইতে উঠিয়া অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন, এমন দৃশ্য তাঁহারা আর কখনো দেখেন নাই! তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না জিনিষটা কি! এমন সময়ে একজন বলিয়া উঠিলেন, "ও যে কর্সিকা! বায়ুমণ্ডল খুব পরিষ্কার থাকলে বছরে দু'তিনবার ওরূপ দেখা যায়। দূরের জিনিষ সাগরের কুজ্ঝটিকায় ঢাকা থাকে বলে' দেখা যায় না বটে, কিন্তু মরীচিকা বেশ দেখা যায়।"

ভিন্ন ভিন্ন গিরিশ্রেণী আমরা অস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। মনে হইল, যেন ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর শৃঙ্গস্থ তুষার পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। অকস্মাৎ সমুদ্রোত্থিত এই কুজ্‌ঝটিকাময় দৃশ্যে—হঠাৎ একটি নূতন রাজ্যের আবির্ভাবে সকলেই অত্যন্ত চমৎকৃত ও ভীত হইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেবল একজন বৃদ্ধ এতক্ষণ নীরব থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—

"আমার কিছু বক্তব্য আছে। ঐ যে নূতন দ্বীপটি আমাদের সম্মুখে এখন প্রকাশিত, ওটি বোধ হয় আমাদের আলোচ্য বিষয়ের একটা সদুত্তর দিবার জন্য, আমার সেই বিশেষ স্মৃতিটিকেই জাগাইবার অভিপ্রায়ে আবির্ভূত হইয়াছে! ওখানকারই একটি বাস্তব প্রেমের মধুর কাহিনী আমি জানি। আর সে প্রেম অনির্ব্বচনীয় সুখকরই হয়ে ছিল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি সকলের মুখের দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন; এবং ক্ষণকাল পরেই আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন;

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার ওখানে গিয়েছিলুম। আজ আমরা ফ্রান্সের এই প্রান্ত হ'তে যেমন ঐ কর্সিকা দেখ্‌লুম, এরূপ অনেক সময়ই দেখা যায় বটে, কিন্তু উহা আমেরিকা অপেক্ষা ও অধিক দূরবর্ত্তী বলে' মনে হয়। আপনারা সকলে এমন একটি জগতের অস্তিত্ব কল্পনা করুন, যা এখনো জড়পিণ্ড মাত্র। একত্রীভূত পর্ব্বতশ্রেণীর কল্পনা করুন, তা'দের মাঝে মাঝে

কেবল খরস্রোত সুগভীর পার্ব্বত্য নির্ঝর; সমতল জমি একটুও নেই, কেবল ভয়ানক চড়াই ও উৎরাই—বিবিধ পার্ব্বত্য গুল্ম ও বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। ভূমি জনশূন্য, শস্যশূন্য; কচিৎ কোথাও গিরিশৃঙ্গে প্রস্তর-স্তূপের ন্যায় দু'একটি গ্রামের নিদর্শন পাওয়া যায়! তথাকার অধিবাসিগণ শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি-বিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুন্দর ও সুশ্রী দ্রব্যাদির প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র ও অনুরাগ নেই!

ইটালি কি রমণীয় দেশ! তার প্রত্যেক সুরম্য হর্ম্ম্য কেমন সূক্ষ্ম কারু-কার্য্যের পরিচায়ক! এবং তারপর অভ্যন্তর কত বিচিত্র দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ! তথাকার মর্ম্মর, বহুমূল্য রত্ন, কাষ্ঠ এবং বিবিধ ধাতু প্রভৃতি সমস্তই মানবের উন্নত কলাবিদ্যা এবং প্রতিভার পরিচায়ক। ইটালি তো আমাদের নিকট চিরসাধের পুণ্যদেশ, কারণ সেখানেই আমরা সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার ঐকান্তিক উদ্যম ও চরিতার্থতার চরম পরিচয় পাই।

আর সেই ইটালির সম্মুখেই ঐ কর্সিকা! আবহমান কাল সেই পূর্ব্বতন অসভ্য বর্ব্বর অবস্থায় বিরাজমান! তথায় নরনারী যৎসামান্য আহারেই তৃপ্ত হ'য়ে অতি দীন ভাবে সামান্য গৃহে বাস করছে। তাদের মধ্যে পারিবারিক ঝগড়া বিবাদ যে হয় না এমন নয় কিন্তু বর্ব্বর জাতির দোষগুণ উভয়ই তাদের মধ্যে বিদ্যমান। এক দিকে যেমন তারা অত্যন্ত কোপন স্বভাব, হিংসাপরায়ণ, শোণিত পিপাসু ও অনুতাপ শূন্য; তেমনি অপর দিকে তারা উদার, সরল-চেতা, অতিথিবৎসল ও আনুগত্যশীল!

এই বিস্ময়সঙ্কুলন দ্বীপে আমি এক মাস ছিলুম। সে সময় মনে হ'ত, বুঝি জগতের এক সীমায় বাস করচি! তথায় সরাই নেই, পান্থশালা নেই, প্রশস্ত রাজপথ নেই, গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি কিছুই নেই। কেবল মাত্র অশ্বতরই যাতায়াতের একমাত্র উপায়; উহার সাহায্যে ছোট ছোট পল্লীতে গেলে দেখা যায় যেন সেগুলি গিরিদেহে ঝুলছে! উহাদের নীচে গভীর খাত—সন্ধ্যাকালে ঐ গহ্বরের গম্ভীর স্রোত-ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। ঐ পল্লীর কোনো বাড়ি গিয়ে দরজায় আঘাত করলে গৃহস্বামী এসে অভ্যাগতকে সাদরে ভিতরে নিয়ে যায় এবং তার অনুমতি হ'লে তাদের সেই সামান্য খাদ্যদ্রব্য ও গৃহতলে দীন শয্যা পেতে' দেয়। পরদিন সেই গৃহস্বামী অতিথির সঙ্গে সঙ্গে এসে পল্লীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত পথ দেখিয়ে দেয়, পরে তার করমর্দ্দন পূর্ব্বক বিদায় লয়।

আমি একদিন রাত্রে দশ ঘণ্টা পথ চলার পর এক নির্জ্জন উপত্যকার একটি ছোট বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হই।

সেই ক্ষুদ্র বাটীর চারিধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্র, ছোট একটি বাগান এবং কিছু দূরে কতকগুলি বাদাম গাছ; এর দ্বারাই সেই ক্ষুদ্র পরিবারের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। সে দরিদ্র দেশে উহাই যথেষ্ট সম্পত্তি!

গম্ভীরপ্রকৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক বৃদ্ধা এসে আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলে। একজন পুরুষ একটি মোড়ায় বসেছিল, আমাকে নমস্কার করবার জন্য সে উঠে দাঁড়া'ল,এবংএকটিও কথা না বলে' পুনরায় উপবেশন করল!

বৃদ্ধা অত্যন্ত বিনীত ভাবে বল্লে,—"ওঁকে ক্ষমা করুন, ওঁর বয়স ৮২ বৎসর, উনি এখন কালা।"

বৃদ্ধার মুখে পরিষ্কার ফ্রেঞ্চ্ ভাষা শুনে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলুম! জিজ্ঞাসা করলুম,—"আপনি কি এখানকার লোক নন?"

"না, আমরা কন্টিনেণ্টের লোক, কিন্তু এখানে পঞ্চাশ বৎসর যাবত আছি।"

লোকালয় হ'তে এত দূরে এই বিপদ্সঙ্কুল গিরিগহ্বরে পঞ্চাশ বৎসরের বসতি শুনে আমি স্তম্ভিত হলুম!

তাদের কৃষাণ বাড়ি এলে আমরা এক সঙ্গে আহার করলুম। তথাকার খাদ্য —আলু, কপি ও শূকরের বসা!

আহারান্তে আমি দরজায় গিয়ে কিছুক্ষণ বসলুম। এই ভয়াবহ স্থানের বিষণ্ণ মূর্ত্তি দর্শনে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হ'তে লাগ্‌ল। মনে হ'তে লাগল যে, এখানকার প্রত্যেক জিনিষ, প্রত্যেক চিহ্ন, এমন কি এই বিশ্ব-সংসার পর্য্যন্ত মুহূর্ত্ত মধ্যেই বুঝি প্রলয়-সলিলে নিমজ্জিত হবে। জীবিত প্রাণীদের মর্ম্মান্তিক দারিদ্র্য, জীবনের শূন্যতা, পদার্থ মাত্রেরই অসারতা স্পষ্ট দেখে হৃদয়ে দারুণ ক্লেশ অনুভব করলুম। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মানব-প্রাণে যে একটা তীব্র আশঙ্কাজনক নিবিড় অন্ধকার ও একান্ত অসহায় অবস্থা অনুভূত হয়, আমার ও তখনকার মানসিক অবস্থা তদ্রূপ হ'য়েছিল।

বৃদ্ধা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করলে,—"তা' হ'লে আপনি ফ্রান্স থেকেই আস্‌ছেন?"

"হাঁ, চিত্তবিনোদনার্থ আমি নানা স্থানে ভ্রমণ করছি।"

"বোধ হয় আপনি প্যারিস্ থেকে আস্‌ছেন?"

"না, আমি Nancy থেকে আস্‌ছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধা যেন হঠাৎ কেমন এক প্রকার অস্বাভাবিক বেগে উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ল! আমি যে কেমন করে' তা' বুঝ্‌তে পারলুম জই তা জানিনে।

বৃদ্ধা আস্তে আস্তে বল্লে,—"Nancy থেকে আস্‌ছেন্?"

যে বৃদ্ধটি দরজার নিকট বসেছিল, তাকে বধিরের ন্যায় সুখ-দুঃখের অতীত াই বোধ হ'ল!

বৃদ্ধা পুনরায় বল্‌লে,—"তাতে কিছু এসে যায় না, উনি কিছুই শুন্‌তে া না।"

এই কথার পর ক্ষণকাল নীরব থেকে বৃদ্ধা পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা র্‌লে,—"তবে আপনি Nancyর লোকদের জানেন?"

"নিশ্চয়ই, প্রায় সকলকেই জানি।"

"Sainte allaizc পরিবারকে ও?"

"হাঁ, খুব জানি; তাঁরা আমার পিতার বিশেষ বন্ধু।"

"আপনার নামটি জান্তে পারি কি?"

তাকে আমার নাম বল্লুম। সে যেন কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে অন্যমনস্ক বে মৃদুস্বরে বল্লে,—

"হাঁ, হাঁ, আমার বেশ মনে পড়েছে। আর Brisemares, তাদের বর কি?"

"তাদের কেহই এখন জীবিত নেই।"

"আহা!—আর আপনি Sirmontদের জানেন?

"হাঁ, জানি তাদের শেষ পুরুষ একজন সৈন্যাধ্যক্ষ।"

এই কথা শুনেই সে যেন শিউরে উঠ্‌ল! তাদের নাম শুনেই যে সে বচলিত হ'য়েছিল, তা'তে সন্দেহ নেই। এবং যে সকল কথা এতদিন সে দয়ের নিভৃত প্রদেশে গোপন করে রেখেছিল, আজ হঠাৎ তা'ই বল্‌তে চেষ্টা র্‌লে,—

"হাঁ, Henride Sirmont, আমি তাকে খুব ভালোবাসি, সে আমার াই।"

আমি বিস্ময়-চকিত হ'য়ে তার দিকে তাকালুম। অকস্মাৎ আমার মস্ত ঘটনা'ই মনে পড়্‌ল।—

Lorraine এর সম্ভ্রান্ত পরিবারে এক সময়ে একটি গুরুতর কলঙ্কের কথা জনসমাজে প্রচার হয়েছিল। Suzannede Sirmont নামে একটি যুবতী এক সৈনিকের সঙ্গে পলায়ন করেছিল, যুবতীর পিতা সেই সৈন্যদলের অধ্যক্ষ ছিলেন।

যে সৈনিকটি সেনাপতির কন্যার মন হরণ করেছিল, সে বেশ সুন্দর—কৃষকের পুত্র। কিন্তু তার চালচলন বেশ সভ্যধরণের এবং পোষাক পরিচ্ছদে একটা পারিপাট্য ছিল। সৈন্যদল যখন শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছিল, তখনি সেনাপতির কন্যা তাকে দেখ্‌তে পায় এবং সেই দেখা হ'তেই তাকে জীবন যৌবন সমর্পণ করে! কিন্তু কি উপায়ে সে ঐ সৈনিকের সহিত কথা বল্‌ত, কেমন করে' উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হ'ত এবং কেমন করেই বা বলিকা নিজের প্রেম তা'কে জানা'লে, তা' কেউ জান্‌তো না। কখনো জান্‌তেও পারা যায় নি!

কিছুমাত্র সন্দেহ কারো মনে নেই। সৈনিক পুরুষটির চাকুরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'লে একদিন রাত্রে উভয়ে অদৃশ্য হ'ল! আর তাদের কোন সংবাদই পাওয়া গেল না! সকলে ভাব্‌লে, সেনাপতির কন্যার মৃত্যু হ'য়েছে!

তার পর সেদিন সেই শোকাচ্ছন্ন অভাবনীয় স্থানে তাকে দেখ্‌লুম! তাকে আমি বল্‌লুম,—"হাঁ, আমার সব মনে পড়েছে; আপনি Modemoiselle Suzanne."

সে মাথা নত করে' জানা'লে, 'হাঁ' এবং চক্ষুও অঙ্গুলি সঙ্কেতে দরজায় উপবিষ্ট বৃদ্ধকে দেখিয়ে বল্লে,—"এই সেই!"

আমি বুঝ্‌তে পারলুম, তাদের সে প্রেমে প্রাচীনতার মরিচা ধরে নাই!—সে এখনো তেমনি তাকে ভালবাসে এবং লুব্ধ দৃষ্টে এখনো তাকে দেখে! আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম,—

"আপনি সুখী হ'য়েছিলেন তো?"

সে বল্লে,—"কোন্ ভাগ্যবতী স্বামী প্রেমে আমার চেয়ে বেশি সুখী?"

তার স্বর আন্তরিকতায় পূর্ণ।

প্রেমের এই বিশ্বজয়ী ক্ষমতা দেখে আমি কিছুক্ষণ বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হ'য়ে রইলুম। পরে করুণ নয়নে সেই বৃদ্ধার দিকে তাকালুম। সে অতুল ঐশ্বর্য্যশালীর কন্যা হ'য়ে এই সামান্য দীন কৃষককে পতিত্বে বরণ করলে!" সাধ করে' দরিদ্র কৃষকের গৃহিণী হ'ল! এতটুকু দ্বিধা

বোধ হ'ল না! বিলাস-বিভব-বর্জ্জিত এক ঘেয়ে জীবন সে পছন্দ করলে! ভোগৈশ্বর্য্যের সমস্ত প্রলোভনের পাশ ছিন্ন করে' স্বেচ্ছায় দরিদ্রকে আলিঙ্গন করেছে! প্রেমের মোহিনী মন্ত্রে সে কখনো কোনোরূপ অভাব বা ক্লেশ বোধ করে নি। এক মাত্র সেই দরিদ্র কৃষক ব্যতীত সেই রমণী আর কিছুই জানিত না—আর তার কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। সেই তার জীবনের সকল সাধ, সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল অভাব পূর্ণ করে' রেখেছিল! পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু সকলের বিরহ সে ভুলেছিল—ঐ একজনকে পেয়ে!

বুঝি এর চেয়ে অধিকতর সুখী সে আর কিছুতেই হ'তে পারত না!

সমস্ত রাত্রি সেই আশ্চর্য্য প্রেমিকার পার্শ্ব-শায়িত বৃদ্ধ সৈনিকটির নাসিকা-গর্জ্জন শুন্‌তে শুন্‌তে আমি এই অত্যাশ্চার্য্য অথচ সরল আত্ম-বিস্মৃতির—নির্ম্মল সুখ শান্তির কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লুল। সেই অনাবিল আনন্দ এত সহজেই পাওয়া গিয়াছিল!

পরদিন প্রাতে ঐ বৃদ্ধ সুখী দম্পতির নিকট বিদায় নিয়েছিলুম।

* * * * * *

বক্তা থামিলেন। তখন একজন মহিলা বলিলেন,—"অত্যন্ত সহজ কথা, —তার বাসনা অতি অল্পেই পরিতৃপ্ত হয়েছিল। তার অভাব যেমন অল্প, আকাঙ্ক্ষাও তদ্রূপ অল্পায়াসলভ্য ছিল। সে কেবল বোকার মত কাজ করেছিল।"

অপর একজন বলিলেন,—"তা'তে কি এসে যায়? সে প্রকৃত সুখী ছিল।"

এ দিকে ক্রমশঃ রাত্রির অন্ধকার আসিয়া কর্সিকাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল; আপনার বিরাট প্রতিমূর্ত্তি মুছিয়া দিয়া সে যেন দিগন্তরেখার নিম্নে সাগর-গর্ভে ডুবিল। যে দুটি দরিদ্র প্রেমিক তাহার আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের বিষয় বলিবার জন্যই যেন কর্সিকা সহসা দেখা দিয়াছিল।*

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

* গীদে মোপাসার ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে।

চার্ব্বাকের দেহাত্মবাদ খণ্ডন।

ধর্ম্মবীজের উর্ব্বরতম ক্ষেত্র এ ভারতবর্ষ দিন দিন ধর্ম্মহীন হইতেছে। যে ভারতবাসিগণ বাল্যাবধি শ্মশান পর্য্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষশূন্য, সর্ব্বকল্যাণকর, অমৃতময় ঋষিবাক্যানুসারে প্রতি মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক একমাত্র ধর্ম্মস্বরূপ ধ্রুব নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া অনিয়ত দুঃখসঙ্কুল এ সংসার সমুদ্র অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইতেন। মনুষ্য-জীবনের প্রতিকর্ত্তব্যে পরম মুক্তিধামের অনন্ত গবাক্ষ উন্মুক্ত দেখিতেন। প্রতি পর্ব্বাহে ধর্ম্মাচরণের দিব্যজ্যোতিঃতে নিরানন্দ তমোরাসি বিদূরিত করিয়া পরম আনন্দ-সঙ্গীতে এ মাতৃভূমিকে "স্বর্গাদপি গরিয়সী" করিয়া তুলিতেন। সংযম শক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে আপাত রমণীয় বিপুল রাজ-ভোগ সন্দর্শন করিয়াও অবিকম্পিতভাবে তাহা বমন জ্ঞানে উপেক্ষা করিতে পারিতেন। সামান্য পাপ-কণিকাকেও সর্ব্বভুক্ হুতাশন ভাবিয়া ভীত হইতেন। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য "একমাত্র ধর্ম্মসেবা,—বিনশ্বর দেহপূজা নহে," এ কথা প্রতি যমার্দ্ধে স্মরণ করিতেন। ইহার কারণ—আত্মা—দেহ হইতে স্বতন্ত্র, অবিনাশী, পরজন্ম-সম্বন্ধী, সকল কর্ম্মের ফলভোক্তা—এই শাস্ত্রবাণীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

যে দিন হইতে ভারতবাসীদের এই সত্যবিশ্বাস ক্রমে ক্রমে শিথিল হই-তেও শিথিলতর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সে দিন হইতে এ ভারতভূমির ক্রমদুর্দ্দশার সূত্রপাত হইয়াছে। শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ শক্তিসঞ্চয়ে বঞ্চিত হইতেছে। তাহারই ফলে বর্ত্তমান দেবভাবের বিনিময়ে পশুভাব পরি-বর্দ্ধিত হইতেছে। সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রতি আর সে আস্থা নাই।

বেদোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ অসভ্য বা নির্ব্বোধের আচরণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। পবিত্র তপশ্চর্য্যা বঞ্চনায়, অমিতযোগশক্তি, ঐন্দ্র-জালিকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মাত্র দেহ-পূজার অনুকরণ-স্পৃহার বশ-বর্ত্তী হইয়া অব্যবস্থিতভাবে স্বকপোলকল্পিত বিধিপ্রণয়নে ধর্ম্মশৃঙ্খলবদ্ধ ভারতভূমিকে উচ্ছৃঙ্খলতার লীলাভূমি করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেছে। শান্তির প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ বিচলিত হইয়া নিদাঘতপ্ত, তৃষ্ণার্ত্ত মৃগকুলের ন্যায় পানীয়ভ্রমে মরীচিকায় দ্বিগুণ যাতনায় অযথা জীবন বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতেছে। সহজন্মা, অগণনীয় ভোগ-বাসনা সমাপ্ত করিবার জন্য মক্ষিকা নিবারণেচ্ছু

বালপ্রযত্নের ন্যায় লৌকিকউপায়ের অন্বেষণে ব্যস্ত হইতেছে, কিন্তু যুগপৎ সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাপনকারী পরমানন্দ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী হইতে পারিতেছে না। মূলতঃ ইহার একমাত্র কারণ দেহাত্মবাদে বিশ্বাস, অবিনশ্বর পরজন্ম সম্বন্ধি আত্মার প্রতি অবিশ্বাস। যতদিন না সেই সত্য আত্মা-বিশ্বাস পুনঃ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিবে, ততদিন এ দেশে প্রকৃত দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্-গুণনিচয় এবং সদাচারের সহিত প্রকৃত ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

আজকাল ভারতের গৃহে গৃহে সেই দেহাত্মাবাদী চার্ব্বাকের শিষ্যসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে বলিয়াই ভারতীয় সনাতনধর্ম্মের বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হই-তেছে। আমি এ প্রবন্ধে চার্ব্বাকের দেহাত্মবাদ কতদর যুক্তিসঙ্গত, তাহা-রই একটু আভাষ প্রদান করিতে চেষ্টা পাইব।

১। চার্ব্বাকসম্প্রদায় বলেন, এ চাতুর্ভৌতিক দেহই আত্মা, দেহ ছাড়া বা দেহ হইতে অতিরিক্ত এমন কোন আত্মা নাই যাহা অবিনশ্বর, পরলোক বা পরজন্ম সম্বন্ধী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। যদি কেহ মরণের পর স্বর্গ, নরক গমন করিতে প্রত্যক্ষ করা যাইত তবে তাহা স্বীকার করা সঙ্গত হইত। একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ বলিয়া গণনীয়, অনুমান শব্দ প্রভৃতি বস্তুর যথার্থ নিশ্চয় উৎপাদনে অসমর্থ বলিয়া তাহাদিগকে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ পক্ষে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

এখন একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এ চতুর্ভূত সমষ্টি শরীরকেই আত্মা বলিয়া সুসিদ্ধান্ত করা যায় কি না।

প্রঃ—যদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই দেহই আত্মা হয়, তবে জ্ঞানরূপচৈতন্য, প্রাণনচেষ্টা, স্মৃতি প্রভৃতি কোথা হইতে আসে? কারণ, শরীরান্তর্গত কোন ভূতেই এ সকল গুণ দেখা যায় না।

উঃ—যেমন মদের পৃথক্‌কৃত উপাদান গুলিতে (ক্ষোদ্ জল, প্রভৃতি) কোন বিশেষ সামর্থ্য দেখা যায় না, অথচ সকলে মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব মত্ততা-শক্তি উৎপাদন করে এবং পান, সুপোরী, চূণ প্রভৃতি মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব রক্তবর্ণ জন্মাইতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ পৃথকভাবে অবস্থিত পৃথিবী, জল প্রভৃতি প্রত্যেকভূতে চৈতন্য, প্রাণন চেষ্টা প্রভৃতি গুণসমূহ পরিদৃষ্ট না হইলেও ভূতনিচয় হইতে উৎপন্ন হইতে পারে সুতরাং চৈতন্য স্মৃতি প্রভৃতির কারণ বা আশ্রয়রূপে অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আমরা মদশক্তি ও তাম্বুলরাগের সহিত দেহচৈতন্যের দৃষ্টান্তের সমতা বা সারবত্তা সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, কারণ, মদ্যের পৃথক্‌ভূত উপাদানগুলিতে তরতমভাবে মত্ততা-সামর্থ্য বিদ্যমান থাকায়, সমবেত হইয়া বিশিষ্টশক্তি সম্পাদন করা সম্ভাবিত, এরূপ তাম্বুলেরও পান, সুপোরী চূণ প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুতে যে কোন শুক্ল, কৃষ্ণাদিরূপ বর্ত্তমান থাকায় সকলে সমবেত হইয়া অপর একটি বিচিত্র রক্তরূপ সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু শরীরের উপাদানভূত কোন পদার্থেই চৈতন্য, প্রাণন চেষ্টা প্রভৃতি গুণ নাই, এ অবস্থায় মিলিত হইয়াই বা কিরূপে চৈতন্যাদি নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে? যাহা উপাদান কারণে দেখা যায় না তাহা শরীররূপ গুণ বলিয়া কিরূপে পরিগণিত হইবে?— দ্রব্যগুণজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রত্যেক বস্তুর উপাদানের গুণবিচার করিয়াই বিচিত্র শক্তি সম্পন্ন মদ্য ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন, কিন্তু চৈতন্যবিহীন চতুর্ভূত হইতে চৈতন্য শক্তিসমন্বিত শরীর সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না।

যদি বল, পৃথক্‌কৃত ক্ষিতি, জল প্রভৃতিতেও সূক্ষ্মভাবে চৈতন্য অবস্থান করে, তাহা আপাততঃ দেখা যায় না বটে, পরন্তু সমষ্টির চৈতন্য দর্শনে কল্পনা করা যাইতে পারে। এ কথা প্রত্যক্ষ কেবলমাত্র প্রমাণবাদী চার্ব্বাকের পক্ষে শোভা পায় না; কারণ এরূপ কল্পনা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি অনুমানের সাহায্যে কল্পনা করাই অভিপ্রেত হয়, তবে এ ক্ষেত্রে উপাদানভূত প্রত্যেক ভূতের চৈতন্য কল্পনা করা অপেক্ষা লাঘবতঃ চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র একটি আত্মার গুণ বা আত্মার সম্পর্কে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করাই সঙ্গত হইবে।

সে যাহা হউক, সম্প্রতি মানিয়া লইলাম যে চতুর্ভূত সমষ্টির মেলনেই চৈতন্য প্রভৃতি জন্মে। যদি তাহাই হয়, বৃক্ষ, লতা গুল্ম প্রভৃতিতে বিন্দুমাত্রও চৈতন্য জন্মে না কেন? তাহাদের মধ্যেও চৈতন্যোৎপত্তির কারণ চতুর্ভূত বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদুত্তরে হয়ত দেহাত্মবাদিগণ বলিবেন, চক্ষুকর্ণাদি বিশিষ্ট শরীরাকারে পরিণত হইলেই চৈতন্য পরিলক্ষিত হয় বলিয়া প্রত্যক্ষানুসারে একমাত্র শরীরই চৈতন্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত। সম্প্রতি বস্তুর কার্য্যকারণসম্বন্ধ বিচার রাখিয়া দিলেও এ কথার পরে আমাদের একটু বক্তব্য এই যে চতুর্ভূতের মেলনের তারতম্য নিবন্ধন বরং বহিঃস্থিত বৃক্ষলতা প্রভৃতিতে চৈতন্যের তারতম্য হওয়া সঙ্গত হইতে পারে কিন্তু একবারে লুপ্তচৈতন্য হওয়া কিরূপে

সম্ভব হয়? মদিরা বা তাম্বুলের পৃথক্‌ভূত উপাদানগুলির পরিমাণও সমাবেশের তারতম্যানুসারে তাহাদের শক্তিও রূপের তারতম্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু লুপ্তশক্তি বা লুপ্তবর্ণ কখনও হয় না। দেহাত্মবাদীর মদিরা দৃষ্টান্তের উপর আমাদের আর একটী বক্তব্য এই যে, মদশক্তি যেরূপ প্রত্যেক মদিরাবয়বে মাত্রানুসারে বর্ত্তমান থাকে তদ্রূপ দেহের চৈতন্য দেহাবয়বেও মাত্রানুসারে আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রকারান্তরে ইহা বলা হইতেছে যে এক শরীরের চৈতন্য-কর্ত্তা বহু! বহু কর্ত্তার অভিপ্রায় ও চেষ্টা পরস্পর বিভিন্ন হওয়া উচিত; যদি তাহাই হয় তবে প্রত্যেকের অভিপ্রায় ও ক্রিয়ানুসারে হঠাৎ শরীরাবয়ব বিশ্লিষ্ট হয় না কেন? অথবা এক পাশে আবদ্ধ পক্ষিগণ যেমন শক্তিসত্ত্বেও বিরুদ্ধদিক্ ক্রিয়া হইয়া কিছুই করিতে পারে না, তদ্রূপ শরীরও সমস্ত কার্য্যে অসমর্থ হইয়া নিশ্চেষ্টভাব ধারণ করে না কেন?—সুতরাং প্রযত্ন অভিপ্রায় প্রভৃতির সর্ব্বদা সামঞ্জস্য ব্যবস্থা করিতে হইলে এ সকলের নির্ব্বাহকরূপে স্বতন্ত্র আত্মা স্বীকার করিতে হইবে।

২। দেহাত্মবাদীগণের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, যে বস্তু বা গুণ যাহার বিদ্যমানতায় বিদ্যমান থাকে, যাহার অবিদ্যমানতায় অবিদ্যমান হয় অর্থাৎ থাকে না, সেই বস্তু বা গুণ তাহারই ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত হইবে। যেমন অগ্নির বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা প্রযুক্ত তদীয় উষ্ণতাও প্রকাশের বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা দেখা যায়, সেজন্য উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নির ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, সেইরূপ প্রাণন-চেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতির বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা দেহের সত্ত্বা ও অসত্ত্বা সাপেক্ষ বলিয়া তাহাদিগকে দেহধর্ম্ম বলিয়াই স্থির করিতে হইবে, স্বতন্ত্র আত্মধর্ম্ম বা আত্ম সম্বন্ধাধীন উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ এ সকল দেহ ধর্ম্ম বলিয়াই সকলের প্রতীতি হইতেছে দেহাতিরিক্ত আত্মধর্ম্ম বলিয়া কাহারও প্রত্যক্ষ হইতেছে না ইত্যাদি।

(ক) প্রদর্শিত যুক্তিটি সত্য বলিয়াই আমরা স্বীকার করি, কিন্তু দেহ-চৈতন্য পক্ষে এ যুক্তি যোজনা সমীচীন হইতেছে না। কারণ, দেহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও চৈতন্য, প্রাণন চেষ্টা প্রভৃতির অবিদ্যমানতা দেখা যাইতেছে, মৃতাবস্থায় দেহ থাকে, অথচ চৈতন্য থাকে না। নিদ্রিতাবস্থায় থাকিলেও তোমার অভিপ্রেত (জাগ্রতবস্থার ন্যায়) চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতি থাকে না। অগ্নির ঔষ্ণ্য প্রকাশ অগ্নিরূপ ধর্ম্মীর সমকাল স্থায়ী অর্থাৎ

কোনরূপ ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না বলিয়া অগ্নির ধর্ম্ম হইতে পারে। চৈতন্য প্রভৃতি সেরূপ ধর্ম্মীর সমকাল স্থায়ী নয়, সুতরাং তাহাদের আশ্রয়রূপে পৃথক্ আত্মাস্বীকার্য্য। যদি বল, সমকালস্থায়িতার প্রয়োজন কি? শুদ্ধ যে কোন সময় ধর্ম্মীর বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা দ্বারা বস্তুর গুণ বা ধর্ম্ম নিশ্চয় করিতে হইলে ধূমকে ঔষ্ণ্য প্রকাশের ন্যায় অগ্নির গুণ বা ধর্ম্ম, চাক্ষুষ জ্ঞানকে আলোকের গুণ বা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু, অগ্নি ব্যতীত ধূম, আলোকের সাহায্য ব্যতীত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দেখা যায় না।

সে যাহা হউক, সম্প্রতি এই কথাই স্বীকার করিলাম যে 'যতকাল অবিকল দেহের বিদ্যমানতা, ততকালই চৈতন্য, প্রাণনচেষ্টা প্রভৃতির বর্ত্তমানতা প্রত্যক্ষ নিশ্চিত,'—কিন্তু দেহের অবিদ্যমানতায় চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতির অবিদ্যমানতা কোনরূপেই নিশ্চয় করিতে পারে না, কারণ এই দেহের পতন হইলেও চৈতন্য স্মৃতি প্রভৃতি দেহান্তরে সঞ্চারিত হইলেও হইতে পারে, এরূপ সংশয় আছে, অর্থাৎ দেহাত্মবাদীও প্রত্যক্ষ নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ ঠিক্ করিয়া বলিতে পারিবেন না যে এক দেহের চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতি দেহান্তরে সঞ্চারিত হয় না। সুতরাং এরূপ সংশয়াত্মক জ্ঞান ও চৈতন্য প্রভৃতিকে দেহধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করার পক্ষে বাধা দিতেছে।

(খ) পক্ষান্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে চৈতন্য প্রভৃতি যদি শরীরের গুণ বলিয়াই স্থির হয়, তবে তাহাদিগকে শরীরের বিশেষ গুণ বলিয়াই দেহাত্মবাদিগণ অস্বীকার করিবেন, পরিমাণাদির ন্যায় সামান্য গুণ নহে। যে যাহার বিশেষ গুণ হইবে, তাহাকে তাহার সমকাল স্থায়ী ও তদনুবর্ত্তী হইতে হইবে, যেমন জলের দ্রবত্ব, অগ্নির উষ্ণতা প্রভৃতি। দ্রবত্ব, উষ্ণতা প্রভৃতি ভূতবিশেষগুণের তুলনায় চৈতন্য বিলক্ষণ ধর্ম্মাক্রান্ত অর্থাৎ ধর্ম্মীর সমশীল চৈতন্যকে শরীরের বিশেষ গুণ বলিয়া মানিতে পারা যায় না, বা সমভাবে তদনুবর্ত্তী নহে।

(গ) শরীরের অপর গুণ, রূপাদির সহিত চৈতন্য প্রভৃতি গুণের বহু বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, দেহ গুণ রূপাদি অন্যের প্রত্যক্ষ গোচর হয়, চৈতন্য, স্মৃতি, ইচ্ছা প্রভৃতি অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় না, মাত্র স্বপ্রত্যক্ষ গম্য। ঐসকল শরীর গুণ হইলে দেহের সঙ্গে সঙ্গে অন্যকর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ হইত; সুতরাং ঐরূপ বিলক্ষণতা নিবন্ধন চৈতন্য প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র আত্ম-ধর্ম্ম বা আত্ম-সম্পর্কজাত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত।

(ঘ) সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি দেখা যায়। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিচার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে জীবের প্রবৃত্তি সকল ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান হইতে (অর্থাৎ এই বস্তু বা কার্য্য আমার ইষ্টজনক, এরূপ জ্ঞানের পর) উৎপন্ন হয়, তদনুসারে সদ্যোজাত শিশুরও 'স্তন্যপান আমার ক্ষুন্নিবৃত্তিরূপ ঈপ্সিতের জনক' এরূপ ইষ্ট সম্পাদকতা জ্ঞান হইতেই প্রথম স্তন্য পানেও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; ইহা স্বীকার করিতে হইবে। প্রথম ঐ শিশুর এরূপ ইষ্টসাধনতা জ্ঞান কি কারণে উৎপন্ন হইল? সে ত এজন্মে পূর্ব্বে আর কখনও স্তন্য পান করিয়া দেখে নাই যে 'স্তন্যপান ক্ষুধা নিবৃত্তির কারণ।' সুতরাং বলিতে হইবে পূর্ব্ব জন্মে এইরূপ জ্ঞান সম্পাদিত হইয়াছে এবং সেই জ্ঞান জন্য একটি সংস্কার দেহাতিরিক্ত অবিনশ্বর পদার্থে স্থায়িভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহারই ফলে সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপানে ইষ্টসাধনতার স্মৃতি-রূপ জ্ঞান জন্মিয়া প্রথম প্রবৃত্তি নির্ব্বাহ করিতেছে। ভস্মীভূত দেহকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে তৎকালিক প্রবৃত্তি সকল কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না। এরূপ, নবজাতের প্রানাদ-পতনভীতি, জন্মের সময় উদরস্থ বানর শিশুর শাখা ধারণ, অপ্রযত্নলভ্য আলৌকিক জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়া শক্তি প্রভৃতি জন্মান্তরীয় সংস্কারমূলক অসংখ্য উদাহরণ দেহাতিরিক্ত আত্মাস্তিত্বে প্রমাণরূপে বুঝিতে হইবে।

(ঙ) ইন্দ্রিয়দিগের নিয়মিত বিষয় ব্যবস্থার জন্যও দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিতে হইবে। জড়বর্গের প্রকাশক ও যথা নিয়মে পরিচালক যদি একটা স্বতন্ত্র না থাকিত তবে দেহ চৈতন্যপ্রভাবে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব দেশকাল ও বিষয়ে অব্যবস্থিত হইয়া জীবের মহান্ অনর্থ সম্পাদন করিত।

৩। দেহাত্ম-বাদের তৃতীয় যুক্তি এই যে 'অহং' শব্দে আত্মাকেই বুঝায়, ইহা সর্ব্ববাদি-সিদ্ধ; অথচ আমি সুন্দর, আমি কুৎসিত, (গৌরোঽহংকৃষ্ণোঽহং) এইভাবে সকলেরই সেই 'অহং' পদার্থের (আমির) সহিত দেহের অভিন্ন বা অপৃথক বলিয়া প্রতীতি বা মানস প্রত্যক্ষ হইতেছে, কেহই দেহ হইতে আত্মাকে ভিন্ন বলিয়া ভাবে না; সুতরাং দেহই আত্মা।

তদুত্তরে আমরা বলিতে পারি, 'আমার শরীর, আমার হাত, আমার ইন্দ্রিয়'—এরূপ" ভাবে দেহ ও দেহাবয়ব হইতে 'আত্মাকে সকলে পৃথক্ পদার্থ বলিয়াই জানে ও তদনুসারে ব্যবহার করে। অভিন্ন বস্তুতে কখনও এরূপ প্রতীতি বা ব্যবহার হয় না, গৃহের গৃহ বা ঘটের ঘট, জলের জল এরূপ

প্রতীতি কাহারও বাস্তবিক হয় না। ভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই "আমার দেহ" ইত্যাদি প্রতীতি ও ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে। এরূপ, দেহ ও আত্মার পরস্পর ভিন্ন প্রতীতিই যথার্থ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবলে স্বীকার করা সঙ্গত। পরন্তু "আমি সুন্দর" ইত্যাদি প্রতীতি ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রযুক্তই এরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে।

যদি তাহাই না হয়, তবে 'আমি অন্ধ আমি বধির' ইত্যাদি ভ্রমাত্মক প্রতীতি মূলে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি প্রত্যেক অবয়বকেই—"অহং" পদ বাচ্য আত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

(ক) আমাদের অপর বক্তব্য এই যে একই ব্যক্তি স্বপ্নদশায় শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া (স্বপ্নাবস্থায় অনেক সময় নিজকে অন্য দেহ ধারণ করিতে দেখা যায়) জাগ্রদবস্থায় (স্বপ্নের বিষয় স্মরণ করিয়া) সেই দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞান করিয়া থাকে, যদি দেহই আত্মা হইত তবে কখনও এরূপ ভিন্ন বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা হইত না।

উপসংহারে চার্ব্বাক সম্প্রদায়ের উপর আমাদের দোষারোপ করিবার বিষয় এই যে তাহারা প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ স্বীকার করেন না, তাই একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বনে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে সূর্য্যের পরিমাণ করার মত দেহাত্মবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যদি একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ বলিয়া গণনীয় হয়, তবে তাহারা অপর ব্যক্তির কথা শুনিয়া তাহা অভিপ্রায় কিরূপে বুঝেন? এবং অপ্রত্যক্ষীভূত সুখের কারণ সংগ্রহে প্রবৃ হয় কেন? আত্মীয়, বন্ধু প্রত্যক্ষের অগোচর হওয়া মাত্রেই কাঁদিয়া আকু হয়েন না কেন? বাস্তবিক পক্ষে চার্ব্বাক সম্প্রদায়ও অনুমানাদি প্রমাণ ব সমস্ত বিষয় নির্ণয় করেন অথচ একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ, এই কথা বলি লোকের নিকট মিথ্যাবাদী বা আত্মাপলাপী বলিয়া পরিচিত হন।

যদি অনুমান প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তবে প্রত্যক্ষে প্রমাণত্বই বা কিরূপে স্থির হইতে পারে? কারণ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্থি করিতে হইলেও অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং আম অসংখ্য অনুমান ও শ্রুতি প্রভৃতির প্রমাণের সাহায্যে আত্মা দেহ হই স্বতন্ত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

শ্রীরমেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রী।

প্রাচীন ভারতে ইতিবৃত্ত।

প্রাচীন ভারতবাসিগণ অনেক বিষয়ে পারদর্শী হইলেও ইতিবৃত্তমূলক সাহিত্যে নিতান্ত অপটু ছিলেন, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। আমাদের বিবেচনায় এই বিশ্বাস একেবারে অমূলক না হইলেও অনেক পরিমাণে ভ্রান্ত।

এইরূপ বিশ্বাসের একমাত্র কারণ এই যে কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী ব্যতীত প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণ কর্ত্তৃক রচিত অন্য কোন ইতিবৃত্ত-গ্রন্থ বর্ত্তমানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন এই যে বর্ত্তমান অভাবই এই সমুদয় গ্রন্থের অনস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে সমর্থ কি না। আমাদের বিবেচনায় অন্য দেশের কথা যাহাই হউক ভারতবর্ষের পক্ষে এ প্রমাণ কদাচ প্রযুজ্য নহে। ভারতবর্ষের বক্ষের উপর দিয়া কত অত্যাচার ও লুণ্ঠনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে—তাহার ফলে কত অমূল্য গ্রন্থরাজি আমরা হারাইয়াছি—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। ইহা অনুমান-মাত্র নহে—সত্য ঘটনা। এই বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ দিতেছি।

চীন দেশে এরূপ বহু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র—কিন্তু অনেক স্থলে ভারতবর্ষে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। এই সমুদয় গ্রন্থ এক-কালে বিদ্যমান ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু যে কোন কারণেই হউক তৎসমুদয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এ বিষয়ে আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। উপরে যে 'রাজতরঙ্গিণী'র উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ভূমিকায় গ্রন্থকার কহ্লন পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন "কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত বিষয়ে দ্বাদশখানি গ্রন্থ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমি পুনরায় আর একখানি ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি কেন, তদ্বিষয়ে কয়েকটি কারণ প্রদর্শন করা আবশ্যক।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত বিষয়ক আরও দ্বাদশখানি গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে তাহার একখানিও পাওয়া যায় না।

উল্লিখিত দুইটি ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ বর্ত্তমানকালে একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। বিদেশীয় আক্রমণ, লুণ্ঠন ও অত্যাচারই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। যদি তাহা হয়, তবে ইতিহাস গ্রন্থ বিলুপ্ত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ এই সমুদয় গ্রন্থ

সাধারণতঃ রাজধানী এবং রাজপ্রাসাদেই রক্ষিত হইত। লুণ্ঠনকারীগণের আক্রোশ এবং অত্যাচারও সাধারণতঃ এ দুয়ের উপরই প্রবাহিত হইত। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালের যে সমুদয় গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়। এই সমুদয় গ্রন্থ সাধারণতঃ রাজধানী ও প্রধান প্রধান নগর হইতে দূরে অবস্থিত মঠ বা সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রমে রক্ষিত হইত। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষের নিভৃততম পল্লীতেও যে এ সমুদয় গ্রন্থ না পাওয়া যাইত তাহা নহে। সুতরাং এ সমুদয় অনেকাংশে বিদেশীয় লুণ্ঠনকারীগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে।

অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা ইতিহাস গ্রন্থ বিশেষভাবে বিলুপ্ত হইবার আরও একটি কারণ আছে।

পরাধীন জাতির ইতিহাসের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ থাকে না, ইহা একটি সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য কথা। এই কারণে মুসলমান রাজত্বের পর হইতে এদেশে ইতিহাসগ্রন্থ তাদৃশ আদৃত হয় নাই, এরূপ অনুমান করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার হয় নাই, বংশপরম্পরানুক্রমে গ্রন্থ-সমূহ তালপত্রে লিখিত হইত। এরূপ অবস্থায় সে সমুদয় গ্রন্থ জনসমাজে সেরূপ আদৃত ছিল না, এবং যাহাদের রক্ষার জন্য কাহারও বিশেষ যত্নশীল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না—সে সমুদয় গ্রন্থ নকলকারীর অভাবে অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। বর্ত্তমান কালে যে সমুদয় প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই মুসলমান রাজত্বের সময়ে লিখিত। ঐ সময়ের পূর্ব্বে লিখিত পুঁথি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নিতান্তই কম। এরূপ অবস্থায় মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি?

উপরে যে কথাগুলি বলা হইল তাহা আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের গৌণ প্রমাণ—অর্থাৎ আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে প্রাচীন ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না, এই বিশ্বাসের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। অতঃপর আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মুখ্য প্রমাণ উপস্থিত করিব অর্থাৎ আমরা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব যে প্রাচীন হিন্দুগণ ইতিহাস রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন।

রাজতরঙ্গিণীর ভূমিকায় যে অন্য দ্বাদশজন প্রাচীন ইতিবৃত্তকারের কথা লিখিত আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একমাত্র

কাশ্মীরেই অন্ততঃ ত্রয়োদশখানি ইতিবৃত্ত গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। কাশ্মীরবাসীগণও ভারতবাসী সুতরাং ভারতবাসীগণ ইতিহাস লিখিতে জানিতেন না এইরূপ মন্তব্য কতদূর সঙ্গত পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েনসাংএর বিবরণী। হুয়েনসাং লিখিয়াছেন যে "ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশেই ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। এই সমুদয় লিখন নি-লো পি-চ নামে অভিহিত হয়।

অন্যত্র হুয়েনসাং শ্রাবস্তী রাজ্য সংক্রান্ত কোন প্রাচীন ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন "এই বদান্যতার কাহিনী প্রধান ইতিবৃত্ত লেখক কর্ত্তৃক ইতিহাসের ঘটনাভুক্ত করা হইয়াছিল।

ইহা হইতে আমরা প্রমাণ পাই, যে হুয়েনসাংএর সময় প্রতি প্রদেশেই ইতিহাস লেখার পদ্ধতি ছিল, এবং তৎকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে আরও প্রাচীনকাল হইতেই এই প্রথা বিদ্যমান আছে।

আমাদের তৃতীয় প্রমাণ 'পুরাণ' গ্রন্থাবলী। বায়ু, বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, ভাগবত ও মৎস্য পুরাণে ভারতবর্ষের (বিশেষতঃ মগধ দেশের) রাজগণের নামের তালিকা, রাজ্যকাল, প্রভৃতি লিখিত আছে। বর্ত্তমান কালে প্রাচীন মুদ্রা শিলালিপি প্রভৃতির সাহায্যে আমরা এই সমুদয় রাজগণের ঐতিহাসিকত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। বর্ত্তমান কালের আবিষ্কার দ্বারা এই রাজগণের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায় পুরাণোক্ত বিবরণের সহিত তাহা এত অভিন্ন যে ঐতিহাসিক মাত্রেই পুরাণবর্ণিত রাজবংশের তালিকার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। অবশ্য এই তালিকার মধ্যে দুই একটি ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু এগুলি অজ্ঞ লিপিকারগণের অনবধানতা প্রযুক্তই ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ মূল পুরাণোক্ত রাজবংশের তালিকা যে যথার্থ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর গঠিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করা অসম্ভব। এই পুরাণগুলিতে আমরা গুপ্ত বংশের উল্লেখ দেখিতে পাই, সুতরাং পুরাণের এই অংশ চতুর্থ খৃষ্টাব্দের পরে লিখিত। অথচ খৃষ্টজন্মের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে যে শিশুনাগ বংশ মগধে রাজত্ব করেন তাহার বিবরণ পুরাণকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তৎকালে কোন ইতিহাস প্রচলিত না থাকিলে সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেকার ঘটনা পুরাণকার কোথায় পাইলেন?

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র একখানি ঐতিহাসিক নাটক। ইহার

নায়ক অগ্নিমিত্র, ও তাহার পিতা পুষ্পমিত্র উভয়েই ঐতিহাসিক ব্যক্তি, নাট্যোক্ত অশ্বমেধযজ্ঞও যে ঐতিহাসিক ঘটনা, তাহারও অন্যবিধ প্রমাণ আছে। যবনেরা (গ্রীকগণ) সিন্ধুতীরে পুষ্পমিত্রের অশ্ব অবরোধ করিয়াছিল গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে। প্রাচীন মুদ্রাদির সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে বাস্তবিকই পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালে গ্রীকরাজগণ সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন! আধুনিক মতানুসারে কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। তৎকালে কোন ইতিহাস প্রচলিত না থাকিলে কালিদাস ৮০০ শত বৎসরের পূর্ব্বেকার ঘটনা কিরূপে সংগ্রহ করিলেন।

কবিশ্রেষ্ঠ বাণ হর্ষচরিত গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক রাজা ও বিশ্বাসঘাতকের হস্তে তাহাদের মৃত্যুর বিবরণ লিখিয়াছেন। ইতিহাস না থাকিলে ইহাদের বিবরণী কোথা হইতে আসিল?

এই সমুদয় গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয়, যে পুরাকালে ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল—অনাদরে ও অত্যাচারে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

বধূ উর্ম্মিলা

হে উর্ম্মিলা, হে দুঃখিনি, অয়ি আশা-হতা,
তোমারে স্মরিলে আজো চক্ষু ভরে জলে;
আজো তব ব্যর্থ নারী-জীবনের কথা,
শোনা যায় সরযূর কল কোলাহলে।

২

সে দিন সে পুণ্যক্ষণে বিদেহ নগরে,
বিবাহ মণ্ডপে, আলো গীতি গন্ধ মাঝে,—
প্রথম হেরিনু তোমা, আজিও অন্তরে
সে পবিত্র চিত্র খানি জাগে সর্ব্বকাজে।

৩

অবারিত জন-সঙ্ঘ, দৃষ্টি নত ভূমে,
দাঁড়াইলে বধূ বেশে অনবগুণ্ঠিতা ;
স্বর্ণাঞ্চল রক্ত পদ্ম শ্রীচরণ চুমে,
পুষ্প আভরণা অয়ি নির্ব্বাক্‌কুণ্ঠিতা।

৪

তার পর যেই দিনে কুললক্ষ্মীগণ,
রাম অভিষেকে ব্যস্ত, মাঙ্গল্য রচনে
সীমন্তের 'পরে তুলি' অর্দ্ধাবগুণ্ঠন,
তুমি ও নিমগ্ন ছিলে সেই শুভক্ষণে।

৫

সে প্রফুল্ল জ্যোৎস্নালোকে মঙ্গল উৎসবে,
সহসা আঁধার ঘন, সবে বজ্রাহত ;
রাম সীতা বনপথে চলিল নীরবে,
স্বামী তব সঙ্গে গেল দৃষ্টি অবনত।

৬

হায় দেবি, সেদিন ত দেখে নাই কেহ,
রাজহর্ম্ম্য মাঝে তুমি শোকে ভূলণ্ঠিতা ;
অব্যক্ত বেদনা তব প্রেম অপ্রমেয়,
সুগভীর দীর্ঘশ্বাস হে সুখবঞ্চিতা।

৭

জানি আমি জানি দেবী পতিব্রতা সীতা,
লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি বিশ্বে অতুলন ;
কিন্তু তুমি পরহিতে কান্ত-বিরহিতা,
বিসর্জ্জিত তব শ্রেষ্ঠ সাধনার ধন।

৮

চতুর্দ্দশ বর্ষ যাপি বনে বনান্তরে,
যখন ফিরিল স্বামী, স্বচ্ছ নবীনতা
তখন ছিল না তব প্রেমার্ত্ত অন্তরে
যৌবনের শেষে, অয়ি পতিধ্যান-রতা।

শ্রীপ্রভাস কুমার সেন।

ভাগবত ধর্ম্ম।

বেদ-প্রদানে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই পরদেবতার সহিত আমাদের পরিচয় যে সমস্ত ভাবের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল, তাহার ইতিহাস শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের শ্রীরাসলীলার একটি শ্লোকে অতিশয় স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আমরা সেই শ্লোকটি প্রাচীন আচার্য্যগণের উপদেশানুযায়ী ব্যাখ্যা করিতেছি। তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য বিষয় বেশ সুস্পষ্ট হইবে। শ্লোকটি এই—

"যৎপত্যপত্য সুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্মইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তং।
অস্ত্বেব মে তদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাং স্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।"

১০ম ২৯-২৯

শ্রীব্রজদেবীগণ বংশীধ্বনির আহ্বানে ত্রৈবর্গিক কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে উপনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অর্থদ্বয়-স্পর্শী যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি কথা ছিল—

"ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণং॥"

১০।২৯—২২

অর্থাৎ হে কল্যাণি বা সাধ্বীগণ, অকপটে পতির ও তাঁহার বন্ধুগণের সেবা এবং আশ্রিতগণের পালন স্ত্রীলোক-দিগের পরম ধর্ম্ম। (অবশ্য এই শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ আছে তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণী টীকায় দৃষ্ট হইবে।)

যাহা হউক এইরূপ কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন শ্রীব্রজদেবীগণকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশের উত্তরে "যৎপত্যপত্য" ইত্যাদি শ্লোকটি বলিতেছেন। শ্লোকটির অর্থ এই।

আপনি আমাদিগকে স্বধর্ম্ম দেখাইতেছেন ও বলিতেছেন যে পতি, অপত্য ও সুহৃদদিগের অনুবৃত্তিই স্ত্রীলোকদিগের স্বধর্ম্ম। হে অঙ্গ, আপনি ধর্ম্মবিৎ (এই পদটি উপহাস সহকারে প্রযুক্ত—এবং এই শ্লোকটির যাহা রহস্য তাহা 'উপহাস-সহকারে' প্রযুক্ত এই পদটির উপরেই নির্ভর করিতেছে।); অর্থাৎ যত কিছু শাস্ত্র-উপদেশ তাহার মূল উৎসও আপনি আর সমস্ত উপদেশের লক্ষ্যও আপনি। উত্তর মীমাংসায় সূত্রে বলা হইতেছে

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ও "তত্তু সমন্বয়াৎ"। সুতরাং প্রথমতঃ আপনি উপদেষ্টা বা আচার্য্য, তাহা পর ঈশ—তাহার পর শ্রেষ্ঠ—প্রিয়তম ও চিত্তাকর্ষক, ও নিরুপাধি প্রেমাস্পদ—তাহার পর বন্ধু, নিরুপাধি হিতকারী। তৎপরে আত্মা হৃদয়াধিষ্ঠাতা ও প্রেরয়িতা অথবা পরমাত্মা।

এই শ্লোকটির মধ্যে অনুভূতির স্তরগুলি যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা একটু মনোযোগের সহিত আলোচ্য। ইহা ছাড়া এই শ্লোকটির মধ্যে বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ, এই দুইটি মত কিরূপ চিন্তার ক্রমের মধ্য দিয়া উদ্ভূত হয়, তাহাও ব্যাখ্যাকালে শ্রীবৈষ্ণবতোষণী টীকা বর্ণনা করিয়াছেন।

বিবর্ত্তবাদ বা অদ্বৈতমত আশ্রয় করিয়া এই শ্লোকের অর্থ এই-রূপ দাঁড়ায়। আপনি বলিতেছেন পতি পুত্র প্রভৃতির সেবা করা আমাদের ধর্ম্ম। এখন এই পতি পুত্র কেন, নাম রূপাত্মক সমস্ত জগৎই রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, সেই রূপ মিথ্যা। এই মিথ্যা বা ব্যবহারিক জগৎ বা সেই জগতের প্রতি কর্ত্তব্য, যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না হয় ততক্ষণই থাকে। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিবার মাত্রই যেমন তাহাতে আরোপিত যে সর্পত্ব তাহা থাকেনা, সেই রূপ, এখন আমরা তোমাকে জানিয়াছি কাজেই অন্যের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য তাহা সুসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

অন্যদিক হইতে দেখা যাইতেছে, যেমন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় বলিতেছেন, যে পতি সেবা। কিন্তু কতক্ষণ? যতক্ষণ আত্মা তাহাতে আছেন। আত্মা ত্যাগ করিয়া গেলে সেই পতির দেহ নদীতীরে লইয়া গিয়া দগ্ধ করা হইয়া থাকে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে পতিত্বের কারণ আত্মা। অতএব হে কৃষ্ণ, তোমারই অনুবৃত্তি নিবন্ধন অর্থাৎ তুমি আছ বলিয়াই পতির পতিত্ব।

যাহা হউক এই শ্লোকে আমরা দেখিলাম যে সর্ব্ব প্রথম বেদ বা ধর্ম্ম। এই বেদ যিনি দিয়াছেন তাঁহাকে আমরা জানিনা, তাঁহার স্বরূপ কি, কি প্রকারেই বা তিনি বিশ্বে লীলা করিতেছেন তাহা আমরা কিছুই জানিনা। প্রথম অবস্থায় বিধি বা ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম পালন করিতেই হইবে। ধর্ম্ম পালনের দ্বারাই--আমরা ধর্ম্মের যিনি উপদেষ্টা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব। ইহাই দ্বিতীয় স্তর। (from the Law to the Law-giver) এখন অর্থাৎ এই দ্বিতীয় স্তরে তিনি কঠোর শাস্তারূপে আত্ম প্রকাশ করেন। তাহার পর তৃতীয় স্তরে

বাহিরের লোক, শেষে দেখা গেল তিনি আত্মা। তিনি সর্ব্বস্ব ও নিরুপাধি হিতকারী। এই প্রাথমিক চিন্তটুকু চিত্তের মধ্যে ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীভগবান যখন আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়েন তখনকার অবস্থা কিরূপ হয় তাহা বর্ণনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে তিনি মুগ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার দিকে যাইতেই হইবে, কিন্তু তাঁহাকে যে পাওয়া যাইবে তাহার কোন ভরসা দেখা যাইতেছে না। ব্রজদেবীগণও ও শ্রীরাসলীলায় প্রথমে মনচোর নন্দনন্দন ও মানিনীদিগের মানধন হাস্যদ্বারা হরণকারী রামানুজরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন।

এইবার চিন্তা করিতে হইবে যে শ্রীভগবান পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি, আকর্ষণ করা বা মুগ্ধ করা রূপ যে শক্তি তাহা তাঁহাতে পরিপূর্ণ রূপেই রহিয়াছে। কিন্তু মুগ্ধ করা যেমন একটি শক্তি, মুগ্ধ হওয়াও তেমনি একটি শক্তি এবং এই শক্তিদ্বয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নিজে মুগ্ধ হইতে না পারিলে অন্যকে মুগ্ধ করা যায় না। তাহার পর অন্যকে টানিতে হইলে নিজেকেও টানে পড়িতে হয়। এইটুকু বিশুদ্ধ চিত্তে চিন্তা করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদিগকে টানিতেছেন তখন নিশ্চয়ই তিনিও টানে পড়িয়া আছেন, তিনি যখন মুগ্ধ করিতেছেন তখন মুগ্ধ হইয়াও আছেন. এই তত্ত্বটুকু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার নিম্নরূপ ভাষায় আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন্ বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥"

ভগবান 'চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।' সুতরাং যিনি শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করিতেছেন বা মুগ্ধ করিতেছেন তিনিও 'চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব" ও আকর্ষণ কালে বা প্রেমরস আস্বাদনের সময় তাঁহাদের মধ্যে একটা প্রভেদ থাকিলেও স্বরূপে অভেদ। এই কারণে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীভগবানেরই স্বরূপ শক্তি। তাঁহারা ভেদ হইয়াও ভিন্ন অথবা অভিন্ন ও ভিন্ন।

'জানা'র দিক দিয়াও শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করা যায়। পূর্ব্বে আমরা

দেখিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ একমাত্র শ্রীমতী রাধিকার নিকট ব্যতীত অন্য কোথায়ও নিত্য প্রকাশ হয় না, এমন কি শ্রীব্রজদেবীগণও যে সময়ে শ্রীমতী রাধিকার সহিত একত্রে বিরাজ করেন সেই সময়েই সুনিশ্চিত রূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ উপভোগ করিতে পারেন নতুবা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে চতুর্ভূজ রূপ ধরিয়া বা ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া স্বরূপ লুকাইয়া বঞ্চনা করিতে পারেন।

এইবার 'জানা' এই ক্রিয়াটির স্বরূপ আলোচনা করা যাউক। মনে করুন আমি একটী মানুষ, আমার নানারূপ প্রকাশ আছে। জগতে কেহই আমার ষোল আনা, বা স্বরূপ জানে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকার অনুসারে আমার এক একটি অংশের সহিত পরিচিত হয়। তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে আমার স্বরূপ কে জানিতে পারে? ইহার উত্তর এই যে আমি যদি অন্তর্মুখী হইয়া বিশেষ সাধনা করি তাহা হইলে একদিন আমাকে সম্পূর্ণরূপে আমিই জানিতে পারিব। অর্থাৎ যখন এক আমিই, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপে প্রকাশিত হইব, তখন আমার স্বরূপ আমার নিজের নিকটেই প্রকাশিত হইবে। কাজেই 'জ্ঞান' ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইতে হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের যে ভেদ তাহা অভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। এই জন্যই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এক। 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিতেছেন

"কিম্বা প্রেমরস-ময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধা নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্য পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব-জগতের মাতা॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীরায় রামানন্দ যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরস-পূর্ণ॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম বীজ কাম গায়ত্রী যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষান্মন্মথ-মদন॥
নানাভক্তে নানামত রসামৃত হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর॥
লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণ করে আকর্ষণ॥
আপনার মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।"

শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"সৎ চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ !
ললিতাদি সখী যাঁর কায়ব্যূহ রূপ ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম-পট্ট শাড়ী পরিধান ॥
কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিত কান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥”

এই শ্রীরাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশেষ তত্ত্ব। ভাগবত ধর্ম্মের ইহাই আদি এবং ইহাই অন্ত। কঠিন অঙ্ক কসিবার সময় যেমন উত্তর জানা থাকিলে পর অঙ্কটি সহজে বোকা ছেলেও কসিয়া দিতে পারে, তেমনি শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা করিলে, ভাগবত ধর্ম্মের দুরূহ তত্ত্ব বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই জন্য আমরা এই তত্ত্ব প্রথমেই সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। এই তত্ত্বের আলোকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সমুদয় রহস্যই বেশ সুন্দররূপে ধারণা করিতে পারা যায়।

শ্রীরাসলীলায় কৃষ্ণান্বেষণ-কাতরা ব্রজদেবীগণের নিকট এই যুগল তত্ত্ব কিরূপে প্রকাশিত হইল, আমরা তাহা আলোচনা করিলে এই রহস্যের আভাস পাইব। অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রজদেবীগণ মৃগপত্নীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন! এতক্ষণ তরুলতা প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন “কৃষ্ণ কোথায়? তিনি আমাদের মন চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহার সংবাদ জান?”

এবারে এণপত্নীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন ”হে সখি এণপত্নী সেই অচ্যুত প্রিয়ার সহিত কি তোমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন?

তোমার চক্ষু দুইটীতে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তৃপ্তির চিহ্ন রহিয়াছে, ইহা সেই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপদর্শনের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।”

এখন এণপত্নী এই প্রকারের রহস্যভেদী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা, তিনি বলিতে পারেন “বাঃ তোমরা তো বেশ লোক দেখিতে পাইতেছি! তোমরা কৃষ্ণহারা হইয়া 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ। বেশ কথা! কিন্তু কৃষ্ণ একা গিয়াছেন কি প্রিয়ার সহিত গিয়াছেন, এত ভিতরের গোপনীয় খবর তোমাদের জানিবার প্রয়োজন কি? আর এত বড় একটা গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে এমন ভাবে স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্নই বা করিতেছ কোন্ সাহসে?”

মৃগপত্নী যেন নীরব ভাষায় এই প্রকারের প্রশ্ন করিতেছেন। তিনি বুঝি ব্রজদেবীগণকে বাহিরের বাজে লোক মনে করিয়াছেন, তাই এত বড় একটা গোপনীয় সংবাদ প্রদান করিতে অনিচ্ছুক। ব্রজদেবীগণ যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব তাহা মৃগপত্নী জানেন না। আর একথাও সত্য যে ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জন হইলেও এতক্ষণ এক-রূপ বাহিরের লোকই হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ এই যে তাঁহাদের সৌভাগ্য-গর্ব্ব আসিয়াছিল, ফলে শ্রীমতীরাধিকা মানিনী হইয়াছিলেন। এখন ব্রজদেবীগণের আর সৌভাগ্য-গর্ব্ব নাই। এখন আবার শ্রীমতী রাধার কথা তাঁহাদের মনে পড়িয়া গিয়াছে, হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ করিয়া, এই সুখময়ী শারদী পূর্ণিমা রাত্রি বনে বনে ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের সৌভাগ্য-গর্ব্ব দুর হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী রাধিকার কথা মনে পড়ায় যে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা গুপ্ত তত্ত্ব, তাহা এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।

মৃগপত্নীর সন্দেহ দুর করিয়া তাঁহারা যে সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের একান্ত অন্তরঙ্গ তাহা জানাইবার জন্য বলিতেছেন—

“কান্তাঙ্গ সঙ্গকুচকুঙ্কুম রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতিগন্ধঃ॥”

“এই দেখ কুন্দফুলের গন্ধ বাতাসে উড়িয়া বহুদূর হইতে আসিতেছে। কিন্তু এই গন্ধ যে সে কুন্দফুলের গন্ধ নহে। ইহা কুলপতি শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে যে কুন্দফুলের মালা আছে সেই মালার ফুলের গন্ধ। শুধু কি তাই, কান্তার অঙ্গের কুচকুঙ্কুমের গন্ধ ইহার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। আমরা বহুদূর

হইতে গন্ধের দ্বারা বুঝিতে পারি, সখি মৃগপত্নি ! আমাদের বাহিরের লোক বলিয়া মনে করিও না।"

এই কথা বলিতে বলিতেই যেন তাঁহারা ভাব-নেত্রে কুঞ্জবিহারী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। তাই বলিতেছেন—

"বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজ স্তুলসিকালি কুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহবস্তরবঃ প্রণামং
কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥"

এই প্রশ্নটি তাঁহারা বৃক্ষকুলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কারণ মৃগপত্নী তখন চলিয়া গিয়াছেন। এই শ্লোকে বলিতেছেন দেখ, রামানুজ হাস্য করিয়া আমাদের মানধন চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখন আর তাঁহার সে ভাব নাই। এখন তিনি যেন আর চলিতে পারিতেছেন না। তাই শ্রীমতী রাধিকার স্কন্ধে নিজের বাহুটি রাখিয়াছেন। তাঁহার চরণে চন্দনমিশ্রিত তুলসী, বনে নানা স্থানে মধুকরগণ বসিয়াছিল। এই হরিচরণের চন্দন-তুলসী গন্ধে আত্মহারা হইয়া তাহারা ফুল ছাড়িয়া দলে দলে তাঁহার সেই চরণের লোভে ছুটিয়াছে। পাছে মধুকর আসিয়া প্রিয়ার অঙ্গে উপবেশন করে এই জন্য তিনি হস্তে একটি পদ্ম লইয়া, সেই পদ্ম ঘুরাইয়া প্রিয়ার অঙ্গ রক্ষা করিতেছেন। হে তরুগণ ! এই প্রকারে বনপথে ভ্রমনকারী শ্রীকৃষ্ণ কি প্রণয়-পূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তোমাদের প্রনাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

প্রিয়ার অঙ্গ রক্ষার জন্য ব্যাকুল, কৃষ্ণের আবেগ জগতে সঞ্চারিত হউক, শ্রীরাধার অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণের আঁখি বক্র হইয়াছে সেই বাঁকা আখির অমৃত দৃষ্টি জগতে বর্ষিত হইতেছে। ইহা দ্বারাই ভক্তের পোষণ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কেবল শ্রীকৃষ্ণ নহেন তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ। তিনি কেবল গম্য নহেন, তিনি গময়িতা। বেদ প্রদান করায় তিনি যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ রূপে নিজের স্বরূপ দেখাইয়া সেই ক্রমিক আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ করিলেন। শ্রীরাধারাণীর কৃপা আপনাদের উপর বর্ষিত হউক !

শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত মিলিত হইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেন। এই স্থলে শ্রীমতীর দুইটি ভাব দেখা যাইবে। একটি সঙ্গতা রাধা আর একটি বিরহিনী রাধা। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে হারাইলেন তাহার কারণ এই ব্রজদেবীগণকে সঙ্গিনী করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে ও নিজের সঙ্গে তাঁহাদের মিলিত করিবার জন্য। এই যে দুটি ভাব সঙ্গতা ও বিরহিনী, এই দুইটি শ্রীমতীতে নিত্য বিদ্যমান। গোলকের দুইটি মেরুর মত। প্রেমবৈচিত্ত্যে ইহা ভাল করিয়া দেখা যায়। এ রহস্য পরে আলোচ্য। এখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ আমাদের সকলের হৃদয়ে বিরাজ করুন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

(গতানুবৃত্তি)

শ্রীদশমে অক্রূরঃ

সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরং।
যে হপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়ো হন্ততঃ॥
সর্ব্বতীর্থ সর্ব্ব যজ্ঞ হয় ফলোদয়।
অন্তর্বাহে যার হরি কহিল নিশ্চয়॥
অন্তর বাহিরে যার হরি সম্বন্ধ হীন।
তার তপ অকারণ সেই ভাগ্যহীন॥

যথা স্কান্দে

আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং॥
অন্তর্বহির্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্ব্বহির্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং।
এই কথার বিবরণ স্কন্দপুরাণে।
পদ্মপুরাণেও পুন কহিল আপনে॥
কৃষ্ণভক্ত জন হয় সর্ব্বধর্ম্ম কর্ত্তা।
কৃষ্ণের অভক্ত সর্ব্ব অধর্ম্মের ভর্ত্তা॥
ধর্ম্মকর্ম্মকরে পুন নারাধয়ে হরি।
নরকে বসতিতার পুণ্য কর্ম্মকরি॥
কৃষ্ণ হেতু দৈবে ভক্ত করে পাপকর্ম্ম।
পাপহেতু নাহি হয় সেই হয়ে ধর্ম্ম॥

স্কান্দে—

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মানাং ভক্তো যস্তব কেশবঃ।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যোন ভক্তস্তবাচ্যুতঃ॥
পাপং ভবতি ধর্ম্মোপি তবভক্তৈঃ কৃতো হরি।
নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরিঃ॥

পাদ্মে শ্রীভগবদুক্তি

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্প্যতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ ॥
এই বাক্য দৃঢ় দেখ প্রভুর বচন।
ভগদ্গীতায় কহে শুনহ অর্জ্জুন ॥
অত্যন্ত আচারহীন নীচ চণ্ডাল জাত।
অনন্যভাবে মোরে যে সেবে অবিরত ॥
নীচ হঞা সেহ হয় মহতের সম
সর্ব্বধর্ম্ম ব্যবসায়ী হয় সেই জন।

শ্রীভগবদ্গীতাসু

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হো অপর।
কোন বর্ণ হউ মাত্র জে ভজে ঈশ্বর ॥
বিষ্ণুভক্তি যুত ভক্ত হয়ে সর্ব্বোত্তম।
ধর্ম্মি কর্ম্মি যেবা কহ কেহ নহে সম ॥

স্কান্দে

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদিবেতরঃ
বিষ্ণুভক্তি সমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ।
কৃষ্ণ পদাশ্রয় বিনে অন্যের শরণে।
নাহি হয় ভবত্রাণ কহিলা পুরাণে ॥
প্রধান পুরুষ কৃষ্ণ বিনে এ সংসার।
দুঃখ সমুদ্র হৈতে নাহি দেখি পার ॥
সর্ব্বপ্রাণির মহৎ ভয় যমের জন্ত্রণা।
কৃষ্ণ বিনে ঘুচাইতে নারে অন্যজনা ॥

যথা শ্রীভাগবতে কপিল বাক্যং

নান্যতঃ মদ্ভগবতঃ প্রধান পুরুষেশ্বরাৎ।
আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ॥
ভক্তবৎসল কৃষ্ণ ভক্তপ্রিয় হয়।
ধ্রুবপ্রতি সুনীতি বাক্য করহ শ্রবণ ॥

যথা শ্রীভাগবতে।

তমেব বৎসাশ্রয়ভক্তবৎসলং মুমুক্ষুভির্মৃগ্যপদাব্জপদ্ধতিং।
ইত্যাদি।

ভক্তপ্রিয় ভক্তবশ্য হয় ভগবান।
শুকবাক্য ভাগবতে কর অবধান॥
উদূখলে বান্ধিতে নারে যশোদা সুন্দরী।
মাতার দেখিয়া শ্রম সচিন্তিত হরি॥
কৃপা করি আপনি বন্ধন লইল।
ভক্তবশ্য ভগবান গ্রন্থে বিবরিল॥

যথা ভাগবতে

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়াঃ বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বাপরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥

ভক্তের অধীন কৃষ্ণ ভক্তবসে চলে।
অম্বরীষ প্রসঙ্গেত ভগবান বলে॥
দুর্ব্বাসা ত্রিজগত ভ্রমি স্থান না পাইঞা।
বিষ্ণুর শরণ লৈলা বৈকুণ্ঠেত জাঞা॥
অম্বরীষ স্থানে প্রভু কর্য্যাছি অপরাধ।
তুমি তুষ্ট হয় প্রভু করহ প্রসাদ॥
সেই কালের সুন কথা কহেন ঈশ্বর।
আমি ভক্তপরাধীন নহি সতন্তর॥
সাধুর হৃদয়ে বদ্ধ আমার অন্তর।
এইত কহিল সত্য সুন দ্বিজবর॥
দুর্ব্বাসাকে এই কথা কহে ভগবান।
অপরাধ ক্ষমাইতে ভক্তস্থানকে পাঠান॥
কৃষ্ণসম ভক্তবশ্য কে আছে দয়াল।
হেন প্রভু না ভজিঞা গোঁঞায়িল কাল॥

শ্রীভাগবতে শ্রীভগবদ্বচনং

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজঃ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশসে মদ্ভক্তসাধুভির্বিনা।
শ্রেয়মাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহংপরা॥

ভক্তগণের কৃষ্ণ বহি অন্য নাহি গতি।
সংসার সমুদ্রপার এইত যুগতি ॥
ত্রিতাপে তাপিত তনু জত জীব জন।
তাহে জুড়াইতে সেই যুগল চরণ ॥
আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক আর।
এই তিন তাপে সব তাপিত সংসার ॥
কৃষ্ণপদদ্বন্দারবিন্দ অমৃত বর্ষণে।
তাপীত জনার দুখ্খ খণ্ডই আপনে ॥
কৃষ্ণাশ্রয় বিনে তাপ না হয় খণ্ডন।
কৃষ্ণোদ্ধব সংবাদ একাদশেত বর্ণন ॥

যথা একাদশে উদ্ধবঃ ॥

তাপত্রয়েনাভি হতস্য ঘোরে
সংতপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ!
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি
দ্বন্দাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥

অতএব পুন কহি স্নন বন্ধুগণ।
কৃষ্ণভক্তের না হয়ে কভু যম দরশন ॥
কৃষ্ণ কহেন মোর ভক্ত ভক্তি অনুসারে!
নিরন্তর মোর নাম যেবা স্মৃতি করে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম এই লইতে শুনিতে।
আনন্দ পুলকভাব যার হয় চিত্তে ॥
সেই হয় ভক্তোত্তম নাম গ্রহণ স্মরণে।
অন্তে তাহার স্থিতি আমার সদনে ॥
নাম ফলে সুখে তরে সংসার জলধি।
জাহে আছে স্ত্রীপুত্রাদি কুম্ভীর বিরোধী ॥
ভবসিন্ধু তরি ভক্ত কৃষ্ণ পদ পায়।
কৃষ্ণভক্ত যমালয় কভু নাহি জায় ॥

কাশ্যপ পঞ্চরাত্রে

যে গৃহ্ণন্তি নিরন্তরং মমপদং কৃষ্ণেতি ভক্তোত্তমাঃ।
অন্তঃসন্তত.হর্ষজাত পুলকাঃজাতপ্রমোদাশ্রবঃ ॥

তে নিস্তীর্য্য ভবার্ণবং সুতকলত্রাদ্যৈস্তনক্রৈর্যুতং।
দৃষ্ট্যাবারিধি সুদুস্তরং ময়িপুনঃ সাযুজ্য মায়ান্ত্যপি ॥
কৃষ্ণভক্ত জনে নাহি যম অধিকার।
অজামিল উপাক্ষান ভাগবতে প্রচার ॥
মহাপাপী অজামিল বিপ্রকুলে জন্ম।
নিজধর্ম্ম ত্যাগ করি করিল নীচকর্ম্ম ॥
মদ্যমাংস ভক্ষণ কৈল ব্যাধ আচরণ।
স্বক্রিয়া করিঞা ত্যাগ বেশ্যাতে গমন ॥
বেশ্যাগর্ভে জন্মাইল ছয়পুত্র তার।
চৌর্য্যবৃত্তি মিথ্যা কামুক ব্যবহার ॥
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম থুইল নারায়ণ।
অতিসয় তাহে স্নেহ বাৎসল্যকরণ ॥
কালক্রমে জরাগ্রস্ত হইল আতুর।
যমদূত আইল তারে লইতে সত্বর ॥
যতদূত আইল ছয় অতি ভয়ঙ্কর।
লৌহদণ্ড চর্ম্ম দড়ি কম্পিত অধর ॥
ঘোররূপ ঘোর আঁখি দন্ত কড়মড়ি।
মার মার বিকট শব্দ হাতে চর্ম্মদড়ি ॥
ভয় পাঞা অজামিল মুর্চ্ছাগত হন।
অরে পুত্র পুত্র রাখ নারায়ণ ॥
নামাভাসে নারায়ণ বলিল যখন।
মৃয়মান কালে নাম হইল স্মরণ।
সর্ব্বপাপ খণ্ডিল তার নামাভাস বলে।
ভয় পায়া যমদূত কম্পিত সকলে ॥
হেনকালে বিষ্ণুদূত আইল চারিজন।
অজামিলের ঘুচাইলা সকল বন্ধন।
যমদূত পলাইল যম বিদামান।
অজামিলের কহিলেন সকল আখ্যান ॥
নামাভাসে মুক্ত হৈল সকল বন্ধন।
ভক্তিভাব নাম বলের কে করে বর্ণন ॥

এই ত প্রসঙ্গে যম কন দূতগণে।
বিষ্ণুভক্তগণ নিকট না জাবে কভু স্বপ্নে ॥
বিষ্ণুভক্ত জনার দণ্ডকর্ত্তা আমি নহি।
নিশ্চয় করিঞা এই দুতগণে কহি ॥

তত্র বিষ্ণুদূতা উচুঃ

অয়ং হি কৃত নির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশোনাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥

অপিচ

এতে নৈবহ্যঘোনোহস্ত কৃতং স্যাদঘ নিষ্কৃতং।
যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরং ॥

যমরাজ উক্তিঃ

স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং।
বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে ॥
পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্
ন প্রভু রহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাং ॥
বৈষ্ণবের দণ্ডকর্ত্তা আমি কভু নহি।
সুন অরে দূতগণ তোমা সভে কহি ॥
এ কথা সুনিয়া পুন কহে দূতগণ।
কে দণ্ডী কারে আনিব যমের সদন।
যম কহে শুন তাহে কহি বিবরণ।
কৃষ্ণ সম্বন্ধহীন যেই সব জন ॥
কৃষ্ণ নাম গুণযশ জিহ্বায় নাস্ফুরে।
যার চিত্ত কৃষ্ণ নাম ধ্যান নাহি করে ॥
যাহার মস্তক কৃষ্ণে না করে প্রণাম।
একবার কৃষ্ণমূর্ত্তি নাহি করে ধ্যান ॥
কৃষ্ণকর্ম্ম হীন যেবা মূঢ় নরাধম।
তার শাস্তিকর্ত্তা আমি দণ্ডধর যম ॥
সেই সব লোকেরে আনহ যমপুরে।
কৃষ্ণ সম্বন্ধহীন যে আছয়ে সংসারে ॥

শ্রীভাগবতে

জিহ্বা ন ব্যক্তি ভগবদ্‌গুণ নামধেয়ং।
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরনারবিন্দং॥
কৃষ্ণায় ন নমতি যচ্ছিরং একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽ-কৃত বিষ্ণুকৃত্যান্॥ ইতি
কৃষ্ণসেবা পরিচর্য্যা কৃষ্ণভক্তি বিনে
কলিযুগে গতি নাঞি কৃষ্ণ নাম বিনে!
এবকার দিঞা ব্যাস কহে বারবার।
গতি নাঞি নাঞি নাম বিনে আর॥
কৃষ্ণ নাম বিনে গতি নাহি কলিকালে।
এই সত্য সত্য ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে॥

যথা

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ইতি
কলিকালে সর্ব্বসার নাম সঙ্কীর্ত্তন।
সর্ব্বধর্ম্ম লভে নামে এই নিরূপণ॥

শ্রীভাগবতে

কলিং সংভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপিলভ্যতে॥
দোষের সমূহ কলি পাপের নিচয়।
কিন্তু এক কলিযুগে মহাগুণ হয়॥
কৃষ্ণনাম সর্ব্বসার কলিযুগে ধর্ম্ম।
শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে হয় সিদ্ধ সর্ব্ব কর্ম্ম॥
কৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তনে লোক কৃতার্থ হইঞা।
পরমপদ পায় সেই মুক্তবন্ধ হৈঞা॥

শ্রীভাগবতে

কলেদোষ নিধেঃরাজন্নস্তিহ্যেকো মহান্‌গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
যাগযোগ যজ্ঞধর্ম্মের অপেক্ষা নাই কল্যে।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় লোকের কৃষ্ণ নাম লৈল্যে॥

সত্যযুগে ধ্যানযোগে হইতা কৃতার্থ।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞধর্ম্মে হইতা দীক্ষিত ॥
দ্বাপর যুগে কৃষ্ণসেবা অর্চ্চন পূজন।
সর্ব্বসিদ্ধি কলিযুগে নাম সংকীর্ত্তন ॥
ধ্যান যজ্ঞ পূজাবিধির তিন যুগের ফল।
কলিযুগে কৃষ্ণ নামে সিদ্ধি সকল ॥

যথা নারদীয়ে

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং ॥

বিষ্ণুরহস্যে যথা

অভ্যর্চ্চিতোহরিং ভক্ত্যাকৃতে বর্ষশতত্রয়ং।
ফলমাপ্নোত্যবিকলং কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনং ॥

অস্যার্থঃ

সত্যযুগে বিধিমতে ভক্তি করি হরি।
তিনশত বর্ষ যদি আরাধন করি ॥
সেই ফল কলিযুগে নাম সংকীর্ত্তনে।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় লোকের নামাদি গ্রহণে ॥
নারদীয় পুরাণে শুন যুগধর্ম্ম কথন।
চারি যুগের ফল কলৌ নাম সংকীর্ত্তন ॥
অতএব মনে আমি পুন প্রবোধিয়ে।
ভজ কৃষ্ণ চিন্ত কৃষ্ণ কহিল নিশ্চয়ে ॥
না করিহ অন্য সঙ্গ অন্য আলাপন।
অন্য দেব না ভজিয় অন্যের অর্চ্চন ॥
অসৎ কথা অসৎ চেষ্টা অসতের সঙ্গ।
অসৎশাস্ত্র অপবাদ অসৎ ক্রীড়ারঙ্গ ॥
এ সব ছাড়িয়া মন সাধুসঙ্গ করি।
অকপটে কায়মনে সদা ভজ হরি ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ করহ তেজন।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ছাড়িঞা বাসনা।
সাধুসঙ্গ করি কর গোবিন্দ অর্চ্চনা॥
সাধুসঙ্গ তুলনা নহে চতুর্ব্বর্গ ফল।
স্বর্গাদি পদ জানি তুচ্ছ সকল।

শ্রীভাগবতে

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং। ইত্যাদি
ধর্ম্মাধর্ম্ম করি ত্যাগ কর কৃষ্ণার্চ্চন।
পাপ পুণ্য দুই হয় বন্ধের কারণ॥

যথা ভক্তিরসমঞ্জর্য্যাং

অধর্ম্মো লৌহ নিগড়ো ধর্ম্মো হি স্বর্ণশৃঙ্খলঃ।
ঈষন্মাত্রবিশেষোপি প্রতিবন্ধ করাবুভৌ॥

অপিচ

অবশ্যমেবভোক্তব্যং কৃত কর্ম্মশুভাশুভং॥
ইত্যাদি

অতএব মনে কহি হবে সাবধান।
অভিলাষ শুভাশুভ ছাড়িবে সর্ব্বকাম॥
অন্য অন্য দেবতার তৎপর না হবে।
অবিনাশি নহে পদ বিনাশি জানিবে॥

যথা শ্রীভগবদ্গীতায়াং

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।
ইত্যাদি

সাধুসঙ্গ কর মন যদি হবে পার।
সাধু সঙ্গ হয় মুক্ত পথের দুয়ার॥
যোষিতক্রীড়াসক্ত যত কামুক লুব্ধগণ।
তাহা সভার সঙ্গ সদা করিবে তেজন।
ধর্ম্ম বিনাশন হেতু অসতের সঙ্গ।
কুমতি বাড়ায় তাহে বাড়ে দেহ বন্ধ॥
সত্য শৌচ দয়া মৌনবুদ্ধি বিনাশন।
যশ শোভা ক্ষমা শম দমক্ষয় হন॥

এই সব নষ্ট হয় অসতের সঙ্গে।
কুমতি বাড়য়ে নিতি দেহ গর্ব্বরঙ্গে ॥

শ্রীভাগবতে পঞ্চমে—

মহৎসেবাচ দ্বারমাহুর্বিমুক্তে
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গীসঙ্গং।

অপিচ

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রী শ্রীর্যশঃক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেত্যচ্ছসঙ্গাৎ যাতিসংক্ষয়ং ॥
তেহশান্তেষু মূঢ়েষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষুচ ॥
সঙ্গং নদর্য্যা চ্ছোচ্যেষু খণ্ডিতাত্ম স্বসাধুষু ॥
ইতি

স্বজাতীয়াশয় ভক্ত করিয়া সঙ্গতি।
ভজ কৃষ্ণ অরে মন কহিল যুগতি ॥
তবে যে দেখিয়ে অন্য দেবের মহিমা।
আগম পুরাণ তন্ত্র রহস্য রচনা ॥
সে সব জানিহ কেবল ব্যামোহ কারণ।
চরাচর মনুষ্যের ভুলাইতে মন ॥
কল্পাবধি জপিঞা তাহা নাহি পরিত্রাণ।
পরম দেবতা জাকে বলে অল্প জ্ঞান ॥
অন্তে বিষ্ণু বিনে গতি অন্যে নাহি হয়।
সিদ্ধান্তে জানিহ মূল বিষ্ণু সর্ব্বাশ্রয় ॥

যথা পাদ্মে

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তেতেপুরাণা
গম্যন্তাং তমেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তি কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণু সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচন ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥
আগমে দেখিয়া যে অন্যের প্রধানতা।
শিব দ্বারে করেন কৃষ্ণ আপনার গোপতা ॥
তাহার কারণ কহি শুন বিজ্ঞজন।
যম অধিকার নাহি যে বৈষ্ণব জন।

সর্ব্বলোক বৈষ্ণব হলে ঘুচে যমাধিকার
জন্ম মৃত্যু গতাআত ঘুচে বারম্বার ॥
সর্ব্বপাপ ধ্বংশ হয় কৃষ্ণ আরাধনে।
মুক্ত বন্ধ হয় লোক কৃষ্ণের সাধনে ॥
সর্ব্বজীব মুক্ত হৈলে সৃষ্টি না বাঢ়য়ে।
পাপ পুণ্য ক্রমে যমালয়ে নাহি জায়ে ॥
ব্রহ্মার না হয় সৃষ্টি এত চিন্তি মনে।
রহস্য দেখিতে কৃষ্ণ কহিলা আপনে ॥
কৃষ্ণ কহেন শুন অহে দেব পঞ্চানন।
আমাতে বিমুখ যেন হয় মূঢ় জন ॥
স্বমতে আগম তুমি করহ রচনা।
জা দেখিঞা লুব্ধ হয় অহিক ভোগীজনা ॥
তোমার স্বাগম তন্ত্র আমার মায়াতে।
মুগ্ধ করহ তুমি এই ত্রিজগতে ॥
এইরূপে ভগবান মহাদেবে আজ্ঞা দিল।
স্বাগম করিঞা ব্রহ্মার সৃষ্টি বাঢ়াইল ॥

যথা পাদ্মে—

স্বাগমৈঃ কল্পিত স্বং হিজনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎসৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরাঃ ॥ ইতি ॥

তত্রৈব পার্ব্বতীং প্রতি মহেশঃ

বেদৈঃ পুরাণৈঃ সিদ্ধান্তৈর্ভিন্নৈর্বিভ্রান্তচেতসঃ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি কিং তত্ত্বং কিং পরংপদং ॥ ইতি
শিবমুখ বিনির্গত শ্রোতা ভগবতি ॥
বাসুদেবের যেই মত আগম খেয়াতি ॥
বাসুদেব মত ভিন্ন যে সব আচার
স্বাগম বলিঞা সেই জানিহ বিচার ॥

যথাগমলক্ষণং ॥

আগতং শিববক্ত্রেভ্যঃ গতঞ্চ গিরিজামুখং।
মতঞ্চবাসুদেবস্য তেনৈবাগমঃ উচ্যতে ॥

এইরূপে আগম স্বাগম ভেদ হন।
তৈছে পুরাণ সুন ব্যাসের বর্ণন ॥
অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাস করিলা বর্ণনা ॥
তাহে তরতম সুন পুরাণ লক্ষণা ॥
সত্ব রজ তম এই তিন গুণ জানি।
তিন গুণে পুরাণ করিলা ব্যাস মুনি ॥
অতএব সাত্বিক রাজসিক তামসিক মতে।
তিন হয় অষ্টাদশ পুরাণ শাস্ত্রতে ॥
১ ব্রহ্ম পুরাণ আর ২ পদ্মপুরাণ।
৩ বৈষ্ণব পুরাণ আদি কর অবধান ॥
৪ শৈবপুরাণ আদি অনেক বেকত।
সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি ৫ শ্রীভাগবত ॥
৬ নারদীয় আর ৭ মার্কণ্ডেয় পুরাণ।
৮ আগ্নেয় ৯ ভবিষ্যতথা ১০ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নাম ॥
১১ লিঙ্গ পুরাণ ১২ বামন ১৩ বরাহ আদি করি।
১৪ মাৎস্য ১৫ কৌর্ম্ম ১৬ গরুড় পুরাণ বিচারি ॥
১৭স্কন্দ পুরাণ আর ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।
এই ত কহিল অষ্টাদশ পুরাণ প্রমাণ ॥
তার মধ্যে সাত্বিক পুরাণ ছয় খানি।
রাজসিক ছয় তামসিক ছয় গণি.॥
বৈষ্ণব পুরাণ আর নারদী পুরাণ।
শ্রীভাগবত আর গারুড় আখ্যান ॥
পদ্মপুরাণ আর পুরাণ বরাহ।
সাত্বিক পুরাণ মধ্যে জানি এই ছয় ॥
যথা পদ্মপুরাণে শিব পার্ব্বতী সম্বাদে
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনে॥
সাত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ
রাজস পুরাণ ছয় করহ শ্রবণ।
ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মার্কণ্ডেয় হন ॥

ভবিষ্যবামন আর ব্রহ্মপুরাণ।
রাজস এই ছয় পুরাণ প্রমাণ ॥

যথা তত্রৈব পাদ্মে

ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈবচ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত ॥
তামস পুরাণ ছয় কর অবধান।
শৈব স্কান্দ মাৎস্য আর লিঙ্গ পুরাণ ॥
কূর্ম্ম পুরাণ অগ্নিপুরাণ এই ছয়।
তামসের মধ্যে হইল নির্ণয় ॥

যথা তত্রৈব

শৈবং স্কান্দং তথা লৈঙ্গং মাৎসং কৌর্ম্মং তথৈব চ।
আগ্নেয়ং বৈষড়েতানি তামসানি নিবোধত ॥
সাত্বিক পুরাণ হন মোক্ষের কারণ।
রাজসিকের ফল স্বর্গাদি ভ্রমণ ॥
তামস জানিহ কেবল নিরয় কারণ।
তাহার প্রমাণ শুন পাদ্মীয় বচন ॥

যথা

সাত্বিকা মোক্ষদা প্রোক্তাঃ রাজসা স্বর্গদা শুভাঃ।
তথৈব তামসা দেবি নিরয়প্রাপ্তিহেতবঃ ॥
তথৈব স্মৃতয়ঃ প্রোক্তা ঋষিভিস্ত্রিগুণান্বিতাঃ।
সাত্বিকা রাজসাশ্চৈব তামসা শুভদর্শনে ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন পুরাণেষু শতেষ্বপি।
তামসা নরকায়ৈব বর্জ্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ ॥

এবং শ্রীভগবদ্গীতায়াং

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥
অতএব সত্বাশ্রয় বাসুদেব হন
সত্বভাবে সভে ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
কৃষ্ণমায়াতে মুগ্ধ এ তিন ভুবন।
মোহক্রমে কৃষ্ণতে বিমুখ লোক হন ॥

প্রাক্তন অদৃষ্টক্রমে মূঢ় অচেতন।
আসুরী ভাবপ্রপন্ন জাঞা হন॥
সেই সেই কালেত জীব হতচিত্ত হৈঞা।
অন্যদেব সেবা করে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িঞা॥
কৃষ্ণ কহেন সুন সখা হে অর্জ্জুন।
আসুর ভাবে মোরে ছাড়ে মূঢ় অচেতন॥
দম্ভ দর্প অভিমান ক্রোধ পারুষ্যতা।
আসুর ভাবেতে এই জানিহ সর্ব্বথা॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াং

নমাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

অপিচ

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃত জ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্য দেবতাঃ।
ইত্যাদি বিধানে মন শিখাইল তোরে।
না ভজহ হেন কৃষ্ণ দুঃখ পাবার তরে॥
কর্ম্মক্রমে দুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ পাঞা।
নাহি তরে ভবসিন্ধু গুরু পদাশ্রিয়া॥
অসত্ দেহের গর্ব্ব করি অভিমান।
পশু বুদ্ধে মূঢ় না ভজে ভগবান॥
মহা অন্ধকূপে যেন পশু পড়ি রয়।
তৈছে গৃহ মহাকূপে রহয়ে নিশ্চয়॥

শ্রীভাগবতে মুচুকুন্দ রাজা

লব্ধ্বা জনো দুর্ল্লভমত্রমানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ!
পাদারবিন্দং ন ভজেত্যসন্মতি-
র্গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ॥
সেই লোক আত্মবঞ্চক নাশেন আপনা।
সকল হইতে নিন্দিত জানি সেই জনা॥
দেবদত্ত দুর্ল্লভ মনুষা দেহ পাঞা।
কৃষ্ণপদ নারাধিল আপনা বঞ্চিঞা॥

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরুদ্রঃ

দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যোনাশ্রয়েত ত্বৎপাদৌ স শোচ্যহ্যাত্মবঞ্চকঃ॥
হেন কৃষ্ণ সেবা ধর্ম্ম অর্চ্চন শ্রবণ।
ইহা ছাড়ি অন্য দেব করে আরাধন॥
নিশ্চয় জানিহ সেই দুর্দ্দৈব ঘটনা।
কৃষ্ণ কথা ত্যাগ করি সুনে অন্য বর্ণনা।
কৃষ্ণ কথা রসময় অমৃত সমান।
এ অমৃত ত্যাগ করি সুনে অন্যগান॥
অসৎকথা আলাপন যত্নেত সুনয়ে।
অন্য দ্রব্যছাড়ি সুকর বিষ্ঠাগর্ত্তে ধায়ে॥
কৃষ্ণ কথা ছাড়িঞা অসৎবার্ত্তা শ্রবণ।
অমৃত ছাড়িয়া যেন গরল ভক্ষণ॥

যথা

নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুত কথাং সুধাং।
হিত্বাশৃণন্ত্যসৎগাথাঃ পুরীষমিববিড্‌ভুজঃ॥ ইতি
ভবসিন্ধু পারাপার সেই জন হয়।
কৃষ্ণসেবা করে লঞা গুরুতে আশ্রয়॥
কৃষ্ণ কহেন সেই তরে এই ত সংসার।
ভবার্ণবে কাণ্ডারি জার গুরু কর্ণধার॥
দেহীর দেহ প্লব করি তাহাতে উদ্ধারি।
গুরুরূপ আমি তাহে হৈএত কাণ্ডারি॥
অনুকূল রূপে বায়ু করিয়ে সঞ্চার।
ভবসিন্ধু এইরূপে করি আমি পার॥
এতে কেহ তরিবার উপায় না করে।
না পারে তরিতে আত্মঘাতি হৈয়া মরে॥
যমের যন্ত্রণা দুঃখ নানা যোনিতে ভ্রমণ।
কৃষ্ণ না ভজিলে হয় নরক গমন॥

শ্রীভাগবতে

নৃদেহ মাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্যং গুরুকর্ণধারং।

ময়ানুক্ষণেন নভস্মতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥
যদবধি কৃষ্ণানুশীলন না হয়ে শরীরে।
তদবধি জন্মমৃত্যু দুঃখ এ সংসারে ॥

যথা পাদ্মে

যাবজ্জনো ভজতিনো ভুবি বিষ্ণুভক্তি-
বার্ত্তাসুধারস মশেষ রসৈকসারং।
তাবজ্জরামরণ জন্ম শতাভিঘাত
দুঃখানি তানিলভতে বহুদেহজানি ॥ ইতি
চৌরাশি লক্ষযোনি জীব করিয়া ভ্রমণ।
ভাগ্যফলে মনুষ্য জন্ম আসি হন ॥
হেন জন্ম পাইঞা যে না ভজিল হরি।
আত্ম-বঞ্চক শোচ্য সংসার ভিতরি ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে

অশীতিং চতুরশ্চৈব লক্ষাং স্তান্ জীবজাতিষু,
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষ্যং জন্ম পর্য্যায়াং।
তদপ্যফলতাং যাতং তেষাং দেহাভিমানিনাং,
বরাকানামনাশ্রিত্য গোবিন্দ চরণাম্বুজং ॥
ইথে কেহু কহে জানি না ভজিঞা হরি।
সংসার তরিব মোরা স্ব স্ব ধর্ম্ম করি ॥
ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ করি নিজাচার।
নিজাচারে সংসার সমুদ্র হৈব পার ॥
ব্রাহ্মণের দ্বাদশগুণ ধর্ম্ম আদি করি।
ক্ষত্রির যুদ্ধাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রে ত বিচারি ॥
বৈশ্যের বাণিজ্যাদি সত্য আচরণ।
শূদ্রের ধর্ম্ম হয় ব্রাহ্মণ সেবন ॥
এইসব স্বধর্ম্মে মোরা কৃতার্থ হইব
অতএব অলভ্য আর কিছু না রহিব ॥
ব্রাহ্মণের দ্বাদশ গুণ করহ শ্রবণ।
সত্যকথা ধর্ম্মাচার তপ ইন্দ্রিয় দম ॥

মাৎসর্য্যহীন লজ্জান্বিত জার বুদ্ধি সম।
অনসূয়া তিতিক্ষা যজ্ঞ দান ইতি।
ব্রাহ্মণের দ্বাদশ.ব্রত এই কথা শ্রুতি॥
এই দ্বাদশ গুণ হয় ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।
ইত্যাদি নিষ্ঠ হৈঞা করে নিজ কর্ম্ম॥
সব আচরে আর কৃষ্ণেতে বিমুখ।
ইহকালে পরকালে নাহি তার সুখ॥
কৃষ্ণ ভজে কায় মনে চণ্ডাল কুলে হয়।
কৃষ্ণ বিমুখ দ্বিজ তার সম নয়॥

যথা শ্রীভাগবতে

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ যুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
ইতি

বিপ্র হৈতে চণ্ডালের কহিল গরিমা।
তাহার আসয় শুন সেইখানে বর্ণনা॥
চণ্ডাল হইয়া হয় কৃষ্ণ পরায়ণ।
আত্মাসহ কোটি পুরুষ করয়ে তারণ॥
কৃষ্ণ বিমুখ দ্বিজ সর্ব্ব ধর্ম্ম করি।
অন্য কি আপনাকে পূত করিতে নারি॥

তত্রৈব তস্যাঙ্কং

মন্যেতদর্পিত মনোবচনে হিতার্থ।
প্রাণং পুনাতি স্বকুলং নতু ভূরিমানঃ॥
স্বধর্ম্মাচাররতোপি শ্রীকৃষ্ণকর্ম্মহীনঃ যমযাতনার্হো ভবতি

যথা ষষ্ঠে যমবাক্যেন—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
ইত্যাদি পূর্ব্বেণৈবোক্তং॥
স্বধর্ম্মাচার রত যত মুক্ত অভিমানি।
বাদবিরুদ্ধ বুদ্ধি যেই সব জানি॥
বহু দুঃখে তপ করি উচ্চ পদ পায়।
কৃষ্ণ বিমুখ হইলে অধঃপাত জায়॥

শ্রীদশমে

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ইতি

তত্র

তথা নতে মাধব তাবকাঃ ক্বচি-
দ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধ সৌহৃদাঃ
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়াঃ
বিনায়নানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

শ্রীদশমে

ধিক্‌জন্মনস্ত্রিবিদ্‌যত্তদ্ধিক্‌ ব্রতং ধিক্‌ বহুজ্ঞতা।
ধিক্‌ কুলং ধিক্‌ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥
অতএব মনে আমি কহি বার বার!
হরি ভজ হরি চিন্ত হরি কর সার॥
আত্মঘাতি হৈলে সেবা পাপ কয়
না ভজহ যদি হরি সেই পাপ হয়॥
শ্রীগুরুগোপাল জয় কৃষ্ণভক্তগণ।
কৃপা করি দেহ মোরে চরণ শরণ॥
শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ শ্রীপর্ণিগোপাল
কৃপা কর গুণনাথ ঠাকুর দয়াল॥
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সার্ব্বভৌমশ্রীগোকুলচন্দ্র
দীন হীন মন্দমতি এ নয়নানন্দ
গোপাল চরণ প্রভু করি অভিলাস।
কৃষ্ণ ভক্তি-রস-কদম্ব করিলা প্রকাশ॥
কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-কদম্ব অমৃতের সম।
সর্ব্বোৎকর্ষ কৃষ্ণ সেবা দ্বিতীয় প্রকরণ।

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরস কদম্বে সর্ব্বোৎকর্ষ কৃষ্ণসাধন
নিরূপণং দ্বিতীয়ঃ প্রকরণং।

তৃতীয় প্রকরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণং ভজে।

জয়রে জয়রে হরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ধন্য ধন্য অবতার।
দীন জনার বন্ধু কেবল করুণাসিন্ধু দীন দেখি করহ উদ্ধার।
পরম আনন্দ জয় জয় নিত্যানন্দ ঠাকুর পরম দয়াল।
জয় জয় জয়াদ্বৈত প্রেম-রসযুত জয় জয় সুন্দর গোপাল॥
শ্রীচৈতন্য অনুগত, ভক্তিভাব যুত জয় জয় বৈষ্ণব সমাজ।
সভাকার পদে নতি শতকোটি কোটি স্তুতি, সদ্ধি এই
নিজ কাজ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাহি কালাকাল নিয়ম।
দিবা নিশি ভজ কৃষ্ণ ছাড়ি অন্যকর্ম্ম॥
বালককাল আরম্ভিঞা জীবন পর্য্যন্ত।
ভজ কৃষ্ণ নিরবধি করিঞা একান্ত॥

সপ্তমে প্রহ্লাদঃ

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্য-ধ্রুবমর্থদং॥
বাল্য হৈতে যে না ভজে পাপ মূঢ়মতি।
বৃদ্ধ হৈলে ভজিব কৃষ্ণ এই আসা তথি॥
আজি কালি করিতে তার আয়ু বহি জায়।
সেবা ধর্ম্মনাহি হয় মরিঞা ক্লেশপায়॥
বাল্য কালে কহে কৃষ্ণ ভজিব যৌবনে।
নানা ক্রীড়া করে শিশু বালকগণ সনে॥
বাল্য কাল এইরূপে বৃথা দেখ জায়।
হিতাহিত নাহি জানে ঈশ্বর মায়ায়॥
যৌবন বয়েসে হয় যুবতি বিলাস।
বিষয় বাসনা বাড়ে ধনেতে প্রয়াস॥
ধন উপার্য্যন আদি বাড়ে নানা রঙ্গ।
গ্রাম্য সুখে হয় মগ্ন বিষয়ীর সঙ্গ॥
দেহ গর্ব্বে তখন না জানে ভালমন্দ।
ঈশ্বরের মায়াতে বিষয়ে হয় বন্ধ॥
যৌবন দশাতে করি ধন উপার্য্যন।
বৃদ্ধাবস্থা হইলে কৃষ্ণ করিব সাধন॥
এই রূপে যুবা জায় বার্দ্ধক উপস্থিতি।
বৃদ্ধাবস্থা হৈলে ভাই বড়ই দুর্গতি॥
সর্ব্বকার্য্য অসামর্থ সদাই পীড়িত।
ক্ষুধা তৃষ্ণা সহিতে নারে সদা পিপাসিত॥

কর্ণ পথ রুদ্ধ হয় নাম নাহি সুনে।
চক্ষুদৃষ্টি খাট হয় কম্প ক্ষণে ক্ষণে ॥
কাস শ্বাস জরাগ্রস্থ কণ্ঠ ঘর ঘর হয়।
কফ বাত শ্লেষ্মা গ্রস্থ সদত আসয় ॥
পরাধিন হয় তখন লোভ হয় সদা।
স্ত্রী পুত্র বান্ধবগণে করে অমর্য্যাদা ॥
তখন কহয়ে বৃদ্ধ কাল মোর গেল।
তিন কালের মধ্যে কভু হরি সেবা নৈল ॥
বৃদ্ধ হৈলে কেহ জানি লোক লাজে কয়।
কোন মূঢ়ের বৃদ্ধ হৈলে ও চিন্তা নাহি হয় ॥
অসৎ সঙ্গের ফল কৃষ্ণ কর্ম্মহীন।
অসৎ ব্যাপার করি মজাইল দিন ॥
তিন কাল এইরূপে বৃথা তার জায়।
নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে লোক ঈশ্বর মায়ায়।
তাহে বৃদ্ধ কেহ হৈছে কেহ বাল্যে মবে।
যুবা কালে মৃত্যু বা দেখহ কোন নরে ॥
এতেক দেখিঞা মূঢ় না বুঝয়ে যারা।
ঈশ্বরের মাঁয়ারজ্জু তরিতে পারে কারা ॥

যথা বিষ্ণুপুরাণে

বাল্যোহহং তাবদিচ্ছাতো যতিষ্যে শ্রেয়সে যুবা।
যুবাহং বার্দ্ধকে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যাত্মনোচিতং ॥
বৃদ্ধোঽহম্ মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে।
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মা সমর্থে ন চ যৎকৃতং।
পাইঞা দুল্লর্ভ দেহ যদি বাঞ্ছ সুখ।
ভজ কৃষ্ণ সদা তবে ছাড়ি বিষয়োন্মুখ।
নানা যোনি ভ্রমি জীব বহুপুণ্য ফলে।
নরদেহ পায় যদি এই ভূমি তলে
পাপ পুণ্য কহ সব নর দেহে জানি।
শুভাশুভ কর্ম্মকাণ্ড এই কর্ম্মভূমি ॥
পাইঞা দুল্লর্ভ দেহ হেলে হারাইল।
কাঁচ মুল্যে চিন্তামণি আপনি বিচিল ॥
অমূল্য রতন দেহ পাইঞা জতনে।
মিথ্যা বিষয় পাঞা বিচিলাম আপনে ॥

ক্রমশঃ।

বীরভূমি, ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
আশ্বিন, ১৩২০।

আগমনী *

কয়েক বৎসর হইতে এই কলিকাতা সহরে নিয়মিত ভাবে প্রায় প্রত্যহই 'দেবালয় সমিতি'তে যাহা হউক একটা কিছু কার্য্য হইয়া থাকে। দৈনিক সংবাদপত্রের পাঠকগণ প্রত্যহ প্রভাতেই কলিকাতার সংবাদ স্তম্ভের মধ্যে 'দেবালয়'এর নাম দেখিতে পান। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন 'দেবালয়'এ কি ঠাকুর আছেন? এই প্রশ্নের উত্তর অনেকবার দেওয়া হইয়াছে। 'দেবালয়'এর আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্ম্মপদ্ধতি ও ইতিহাস অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন, আমিও এ সম্বন্ধে অনেকবার বলিয়াছি। তবুও প্রশ্ন হয়, 'দেবালয়'এ কি ঠাকুর আছেন অর্থাৎ 'দেবালয়'এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি? এই প্রকারের প্রশ্ন চিরকালই জিজ্ঞাসিত হইবে এবং চিরকালই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। বিশেষতঃ ছাত্রমণ্ডলীর নিকট এই কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করা দরকার। এই জন্য দেবালয় সমিতি স্থির করিয়াছেন যে মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত স্থানে ছাত্রগণকে পাওয়া যায়, এই প্রকারের প্রকাশ্য স্থানে আজিকার মত সভা করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। অদ্য এই সঙ্কল্পিত কার্য্য আরব্ধ হইল। এক দিনে বা দুএক ঘণ্টায় 'দেবালয়' সম্বন্ধে সব কথা বলিয়া দেওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা হইবে। অনেক দিক হইতে দেবালয়ের আদর্শ ও উদ্দেশ্য আলোচনা করা যায়, আজ তাহার একটি দিকমাত্র আলোচনা করিতেছি।

দেশে একটি বিশেষ সুসময় আসিয়াছে। বড়ই বিষম দুঃসময়ের মধ্য দিয়া এই সুসময় দেখা দিয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের দেখিতে ও বুঝিতে ভুল হয় নাই—সুসময় আসিয়াছে। সুসময় চিরকালই দুঃসময়ের মধ্যেই আবির্ভূত হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংস কারাগারে বড়ই দুর্য্যোগের দিনে

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে গত ১৬ই আগষ্ট তারিখে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'দেবালয়' সমিতির অধিবেশনে সম্পাদক মহাশয় যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারমর্ম্ম।

আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আজ আমাদের পশ্চিম বঙ্গে চারিটি জেলা একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। দামোদর নদের জলরাশি একেবারে পাগল হইয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়াছে। গ্রামের পর গ্রাম, জনাকীর্ণ জনপদ একেবারে বিধ্বস্ত। গৃহহীন সহস্র সহস্র নরনারী অনাহারে হাহাকার করিতেছে, গরু বাছুর ভাসিয়া গিয়াছে কত লোক মারা গিয়াছে, বাঙ্গালাদেশের এমন দুর্দ্দিন বহুকাল হয় নাই! রুদ্রের তাণ্ডব নর্ত্তন! এক খণ্ড প্রলয়ে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া হাহাকার উঠিয়াছে।

কিন্তু এই বন্যা বিভীষিকার আর একটা দিক আছে আজ আমাদিগকে সে দিকেও বেশ ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বন্যার দুঃসংবাদ কলিকাতায় আসিবামাত্র চারিদিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। যুবক ছাত্রগণ দল বাঁধিয়া বাহির হইলেন, বক্তাগণ বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, সমিতির পর সমিতি গঠিত হইল, যাহার যাহা সাধ্য তাহাই দিলেন। টাকা আসিল, চাউল আসিল, বস্ত্র আসিল, দুগ্ধ আসিল, ঔষধ আসিল, কেহই কৃপণতা করিলেন না, কেহই আলস্য বা ঔদাস্য করিলেন না, বালকেরা বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; সমস্ত কলিকাতা এক হইল, ভেদাভেদ নাই। মারোয়াড়ী বণিকগণের উপর মা লক্ষ্মীর কৃপা আছে তাঁহারা মুক্তহস্ত হইলেন, কলিকাতায় রুটী, লুচি প্রস্তুত করিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া বন্যাপীড়িত স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। ধন্য যুবক ছাত্রগণ। তাঁহাদের কথা ভাবিতে আজ হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, নয়ন উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তাঁহারা স্বাস্থ্য তো দূরের কথা, প্রাণের মায়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া খাদ্য দ্রব্যের ও বস্ত্রের বোঝা মাথায় করিয়া জল কাদা ভাঙ্গিয়া বন্যাপীড়িত দুর্গম গ্রাম সমূহে ভগবানের করুণার যেন মূর্ত্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন, একবার অর্দ্ধোদয় যোগের সময় যাহার আভাস দেখিয়াছিলাম আজ তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ষা কাটিয়া যাইতেছে, আনন্দময়ী আবার আমাদের দেশে আসিতেছেন. এই দুর্দ্দিনের অন্ধকার ও ভয়ের মধ্যে আমরা তাহাই অনুভব করিতেছি। অসুর আসিয়াছিল, দেশ লণ্ডভণ্ড করিয়াছে, সিংহ-বিক্রমে সদাশয় যুবকগণ অসুরকে দমন করিবার জন্য বাহির হইয়াছে—আর কি চাই, এই ত আনন্দময়ী জননীর সিংহাসন প্রস্তুত! আর বর্ষা ফুরাইয়া আসিল, বাঙ্গালা

দেশে শুভ শরতের আবির্ভাব হইয়াছে, নির্ম্মল আকাশতল, নির্ম্মল নদীর জল, সরোবরে পদ্ম ফুটিয়াছে, কাশ পুষ্পের শুভ্র হাস্যে প্রান্তর ভরিয়া আনন্দস্রোত বহিতেছে, মা আসিতেছেন! দশ করে দশ প্রহরণ, দশ দিক সুরক্ষিত। তিনি সঙ্গে আনিয়াছেন শৌর্য্য, শিখিবর বাহনে, সঙ্গে আসিয়াছেন সিদ্ধি, আমাদের সকল আশা সকল আকাঙ্ক্ষা সকল শুভ স্বপ্ন সফল করিতে। আর আনিয়াছেন, সাত্বিকী জ্ঞানময়ী দেবী, হৃদয় সরোরুহবাসিনী, আমাদের অজ্ঞান ও মোহের অন্ধকার কাটিয়া গেল, আর আনিয়াছেন ধন ধান্যের ও ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী মহালক্ষ্মী—আমাদের দারিদ্র্যক্লেশ অবসান! এই বন্যা বিভীষিকার মধ্যে দেখিলাম মা আসিতেছেন! যাহার চক্ষু আছে সেই দেখিতে পাইতেছে, যাহার কর্ণ আছে সেই শুনিতে পাইতেছে, ঐ মা আনন্দময়ী আসিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে দেশে কি পরিবর্ত্তনই না হইয়া গেল। এ কালের প্রধান ভাব দেশাত্মবোধ—ইহাই আমাদের যুগধর্ম্ম। এই যুগধর্ম্ম আমরা পালন করিতেছি! এই ধর্ম্ম পালনের তিনটি স্তর আমরা দেখিলাম। বেশ নিপুণভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া আবেদন পত্র লিখিতে পারা, কৌশল করিয়া রাজসরকার হইতে কিছু আদায় করা ইহাই ছিল প্রথম স্তরে আমাদের স্বদেশ-সেবার আদর্শ। হৃদয় ছিল, বুদ্ধিও ছিল, আমার দেশ এ জ্ঞানও ছিল, কিন্তু ইহা ছাড়া স্বদেশের সেবা বিষয়ে আরও যে কিছু কর্ত্তব্য আছে বা থাকিতে পারে এ জ্ঞান বেশ উজ্জ্বলরূপে ছিল না। তাহার পর দ্বিতীয় স্তরে ভাল ভাল শব্দ যোজনা করিয়া বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মাতাইয়া তোলা, কাগজে নিপুণভাবে সুন্দর ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করা ইহারই মধ্যে আমাদের দেশাত্মবোধ বা স্বদেশসেবা পর্য্যবসিত ছিল। এখন আর সে দিন নাই, এখন আমাদের স্বদেশ প্রেম তৃতীয় স্তরে উপস্থিত হইয়াছে। আজ দেশের জন্য প্রকৃত তপস্যা আরম্ভ হইয়াছে। যাহারা চিরদিন সুখের মধ্যে পালিত, পল্লী-জীবনের দুঃখ কষ্ট ও অসুবিধার মুখ যাহাদিগকে কখনও দেখিতে হয় নাই, আজ তাহারা নগ্নপদে মাথায় মোট লইয়া জল কাদা ভাঙ্গিয়া আনন্দের সহিত সুদূরবর্ত্তী পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তের সেবা করিতেছে—আজ আর মুখের কথা নয়, আজ আর কলমের মাথায় করিয়া সাদা কাগজের উপর ভাল ভাল কালির আঁচড় ফুটাইয়া তোলা নয়, আজ সত্য সত্যই শরীরপাত করিয়া দেশের সেবা আরম্ভ হইয়াছে।

এক দল লোক আমাদের কাণের কাছে বহু দিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন যে ভারতবর্ষে মহাভারত বা জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব। তাহার কারণ এই যে এখানে বহু ধর্ম্মাবলম্বী, বহু ভাষাভাষী, বহু জাতীয় লোকের বাস, একটা সাধারণ ভাবের উদ্দীপনায় এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব গড়িয়া তোলা অসম্ভব। আমরা তর্ক করিয়া তাঁহাদের ভুল দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি, উদাহরণ স্বরূপে ইউরোপের নানাদেশের ইতিহাস দেখাইয়াছি। কেহ কেহ বলিয়াছেন জাতিভেদপূর্ণ হিন্দুসমাজে রাষ্ট্রীয় একতা হইবে না। এই সব ভুল ধারণা আজ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ বন্যাপীড়িত দেশে খৃষ্টান প্রচারক, মারোয়াড়ী বণিক, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলে সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিতেছেন।

একটু চিন্তা করিলে পর হিন্দুগণ বলিবেন যে আমাদের যাহা প্রাচীন ভাব, আজ দেশে তাহাই ফিরিয়া আসিয়াছে, হিন্দু জীবনের যাহা আদর্শ এই সেবার মধ্যে আমরা তাহাই দেখিতে পাইতেছি। "নৃযজ্ঞোঽতিথিসেবনম্" হিন্দু গৃহস্থ এই জগতে বড়ই সঙ্কোচে বাস করেন, অধিকার অপেক্ষা দায়িত্বের দিকে তাঁহার দৃষ্টি অধিক। সংসারে থাকিয়া নিজের জীবন রক্ষার জন্য আমরা প্রত্যহই পঞ্চসূনা পাপে লিপ্ত হইতেছি। আমাদিগকে চুল্লী জ্বালিতে হয়, পাক করিয়া খাইবার জন্য, তাহাতে অনেক প্রাণীর প্রাণ যায়, আমাদের পেষণী, সম্মার্জ্জনী, উদূখল ও জলের কলস এই সমস্তের দ্বারা সর্ব্বদাই প্রাণি হিংসা হইতেছে। নিজেদের জীবনধারণের জন্যই প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমরা জগতের নিকট ঋণী। সুতরাং পঞ্চ মহাযজ্ঞ আমাদের নিত্য কর্ম্মের মধ্যেই গণ্য অর্থাৎ ইহা করায় কিছু বেশী বাহাদুরী নাই, না করিলে প্রত্যবায় আছে। এই পঞ্চ মহা যজ্ঞের মধ্যে জনসেবা অন্যতম। অবশ্য সে কাল ও এ কালের মধ্যে প্রভেদ আছে। এখন আমাদের জীবনের ও চিন্তার যতটা ব্যাপকতা আসিয়াছে পুর্ব্বে তাহা ছিল না। সেকালে বীরভূমে বন্যা হইলে চট্টগ্রামের অধিবাসীগণ তাহা জানিতেও পারিতেন না। এখন আর সে দিন নাই, এখন এক ঘণ্টার মধ্যে একটি জেলার বিপদ কেবল বাঙ্গালা কেন সমস্ত ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। এই জন্যই বলিতেছি যে আজ দেশে সেই প্রাচীন হিন্দুভাবই এ কালের উপযোগী নূতন বেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এই যে নূতন ভাব দেশে আসিয়াছে, এই যে আনন্দময়ীর আগমনী গান

বন্যার কল্লোল ও অভাবগ্রস্তের আর্ত্তনাদের মধ্যে বাজিয়া উঠিয়াছে, এই ভাবটি যেন ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা মাত্রে পর্য্যবসিত না হয়! বন্যার জল আসে, জল চলিয়া যায়, যিনি নিপুণ কৃষক তিনি সেই জল ধরিয়া রাখেন, সেই জলে কৃষিকার্য্য হয়। তেমনি আজ যে ভাবের বন্যা আসিয়া, ধনী দরিদ্র, বৃদ্ধ যুবক, পুরুষ নারী সকলের চিত্তকে জাগরিত করিয়া তুলিয়াছে এই ভাবটিকে ধরিতে হইবে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে এই ভাবটিকে একটি বিশেষ স্থান দিতে হইবে। মানবীয় ব্যাপারে এই প্রকারের ভাব-বন্যা মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে, যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা এই স্রোতে পাল তুলিয়া কর্ম্মতরী ছাড়িয়া দেয় ও অনায়াসে উদ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, যাহারা এই স্রোতে ভাসিতে না পারে তাহারা পড়িয়া থাকে। ব্যক্তির জীবনেই হউক আর জাতির জীবনেই হউক এই প্রকারের স্রোত আসার নিদর্শন আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইব। আজ দেশে যে ভাবটি আসিয়াছে তাহা ধারণ করিতে হইবে, সযত্নে পোষণ করিতে হইবে। নবম্যাদি কল্পারম্ভে দেবীর বোধন হইল, এখন নিত্য পূজা ও নিত্য চণ্ডী পাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আজ বোধনের বাজনা বাজাইয়া বিল্বমূলে ঘট পাতিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রথমেই কথা উঠিয়াছে 'দেবালয়'এ কি ঠাকুর আছে. এইবার আমি তাহার উত্তরে বলিতেছি যে এই যে দেবী আনন্দময়ী আসিতেছেন, এই বন্যার মধ্যে যাঁহার বোধন হইয়া গেল সেই দেবীর নিত্য পূজার ব্যবস্থার জন্যই এই 'দেবালয়' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপনারা একটু ধীর ভাবে 'দেবালয়'এর আদর্শ কি তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আগে 'দেবালয়'এর ইতিহাস সংক্ষেপে বলি, তাহার পর 'দেবালয়'এর ভবিষ্যৎ এবং 'দেবালয়' এ যুগে কি করিতেছেন ও কি করিতে পারেন তাহার আলোচনা করিব। ইংরাজী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী বরাহনগরে 'সাধারণ ধর্ম্ম সভা' নাম দিয়া এই 'দেবালয়' সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। সে আজ ঠিক চল্লিশ বৎসরের কথা। সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী প্রায় সকলেই জানেন, তাঁহার সমুদয় মতই যে এখানকার সকলেই অনুমোদন করিবেন, তাহা অমি বলিতেছিন। কিন্তু আজীবন যে তিনি দেশের ও সমাজের সেবা করিয়াছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আদর্শ ও প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেকের

কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও তাঁহার যাহা লক্ষ্য তৎসম্বন্ধে আজ কাল সকলেই একমত। দেশে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। এই শিক্ষা ধর্ম্মমূলক হইবে ও দেশের যাহা উৎকৃষ্ট প্রচীন ভাব তাহার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। লোকশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সুরাপান নিবারণ, বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা, লাইব্রেরী গঠন, ঝটিকা বন্যা প্রভৃতি দুঃসময়ে আর্ত্ত ও অভাব গ্রস্তের সেবা প্রভৃতি নানা কার্য্যে আজীবন দেশের সেবা করিয়া সর্ব্বশেষ তিনি 'দেবালয়' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং দেশের স্বদেশভক্ত যুবকগণের হস্তে তিনি তাঁহার এই প্রিয়তম 'দেবালয়' অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনব্যাপী দেশহিতমূলক বহুমুখী চেষ্টা এই 'দেবালয়' এ আসিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে—ইহাই 'দেবালয়' এর ইতিহাস।

'দেবালয়'এ কি হয়, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। 'দেবালয়' এ মুখ্যরূপে ধর্ম্মালোচনা হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালেই ধর্ম্মালোচনা হইয়া থাকে। ধর্ম্মালোচনা শুনিলেই একালের অনেকে, বিশেষতঃ যুবকগণ ভয় পাইয়া থাকেন। তাঁহারা যে ভয় করেন ইহা ন্যায়সঙ্গত, আমি নিজে এই ভয়ের অনুমোদন করি। তাহাদের ভয়ের কারণ এই যে 'ধর্ম্ম' বলিলেই আমরা বুঝি উন্নতিশীল মানবজাতির বিচিত্র চেষ্টা গুলির সহিত সম্পর্কহীন একটা ব্যাপার। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্য, লোকসেবা প্রভৃতি ব্যাপার আমরা বুঝি এবং এ সকলের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে, ধর্ম্ম বলিলেই মনে হয়, একজন কেবল চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতির কথা উঠিলেই বলেন, আমরা ধার্ম্মিক লোক এ সকলের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, এ সব ইহলোকের কথা, আমরা পরলোকের যাত্রী। ধর্ম্ম যদি এই প্রকারের একটা কিছু হয়, তাহা হইলে ভয় পাইবারই ত কথা, কাজেই আমাদের দেশের এই সব সেবাপরায়ণ উন্নতমনা যুবকগণ, যাঁহাদের দৃষ্টিতে আমি দৃঢ়সংকল্প ও বৈকুণ্ঠের পবিত্রতা দেখিতে পাইতেছি, যাঁহাদের অনাবৃত কর্ণ মাতৃভূমির কাতর আবেদন সর্ব্বদা শ্রবণ করিতেছে, আমাদের ভবিষ্যতের আশাস্থল, বর্ত্তমানের নয়নানন্দ এই যুবকগণ যদ্যপি ধর্ম্মের নাম শুনিয়া একটু ভয় পান বা পিছাইয়া পড়েন তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কোনই কারণ নাই।

কিন্তু 'দেবালয়' এর ধর্ম্মালোচনা মানবীয় সাধনার অন্যান্য বিভাগের সহিত সম্পর্কহীন, কেবল মাত্র অদৃশ্য পরলোকের জন্য উদ্‌গ্রীব একটা ব্যাপার

নহে। ইহা আপনারা দৈনিক সংবাদ পত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আজ দেবালয়ে "মিশর দেশের সভ্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে, কল্যকার বক্তৃতার বিষয় "হিন্দু ও গ্রীক" তাহার পরদিন "বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" তাহার পরদিন "রাস্কিন্ ও কার্লাইল" তৎপরদিন "উইলিয়ম্ কেরি" এই সমস্ত বিষয়ের নামের সহিত বক্তাদেরও নাম গুলি দেখিবেন, তাঁহারা সকলেই বিশেষজ্ঞ, যিনি যে বিষয়ে বলিবেন তিনিই সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে দেখিতে পাইতেছেন যে বিজ্ঞান, দর্শন ইতিহাস, সাহিত্য প্রত্নতত্ব, সকল বিষয়েরই আলোচনা বেশ নিয়মিত ভাবে বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'দেবালয়' এ হইতেছে। সুতরাং 'দেবালয়' এ ধর্ম্মালোচনা হয় বলিয়া আপনারা ভয় পাইবেন না।

এইবার সাধারণ ভাবে চিন্তা করুন, 'দেবালয়' এ যে ধর্ম্মালোচনা হয় তাহাব প্রকৃতি কি? আজ কাল ইউরোপের বিশেষ করিয়া নব্য জার্ম্মাণের চিন্তার মধ্যে এ কথা বেশ ভাল রূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে সকল বিদ্যা ও সকল সাধনা ধর্ম্মের বা আধ্যাত্মিক জীবনের দ্বারা নিত্য নিয়ন্ত্রিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন সমস্তই ধর্ম্মের সেবক (Feeders) এ সম্বন্ধে আমি আর একদিন বলিব—আজ কেবল আপনাদিগকে বর্ত্তমান জার্ম্মাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, জার্ম্মাণির মস্তিষ্কস্বরূপ যে 'জেনা', সেই জেনার অধ্যাপক রাডল্‌ফ্‌ ইউকেনের পুস্তকাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অধ্যাত্ম জীবনই সে সকল চিন্তার ও সকল চেষ্টার আদি ও অন্ত এবং প্রতিষ্ঠা ইহা একালের চিন্তাপদ্ধতির সাহায্যে তিনি প্রতিপাদন করিতেছেন। এ বিষয়ে আমরা আর একদিন আলোচনা করিব।

এই বার একটু ভাবিয়া দেখুন যে ইউকেন্ পাশ্চাত্য দেশে যে তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন তাহা আমাদের হিন্দুদিগের প্রাচীন কথা। ব্রহ্মবিদ্যাই সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা। সুতরাং কোন বিদ্যাই অধ্যাত্ম জীবনের বিরোধী নহে। যদি মনে হয় এই বিদ্যা অধ্যাত্মজীবনের বিরোধী তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সেই বিদ্যার স্বরূপ আমরা এখনও ঠিক ধরিতে পারি নাই। 'দেবালয়' এ যে ধর্ম্মালোচনা হয় তাহাতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি মানবীয় সাধনার এবং শিক্ষাবিস্তার, জনসেবা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি মানবীয় চেষ্টার সকল বিভাগের স্থান আছে। সুতরাং নব্য ইউরোপের উচ্চতম মনীষীর দ্বারা স্বীকৃত প্রাচীন হিন্দুর সুপরিচিত যে অধ্যাত্ম সাধনার আদর্শ

ও প্রণালী তাহাই 'দেবালয়' এ অনুসৃত হইতেছে! সুতরাং ভয়ের কারণ কিছুই নাই। আপনারা কেহ ঐতিহাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ সাহিত্যিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, 'দেবালয়' আপনাদের সকলেরই। যাহার যাহা দেশকে দিবার আছে 'দেবালয়' এ বসিয়া সকলেই তাহা দিতে পারেন। 'দেবালয়' আপনাদের সকলেরই সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা আপনারা ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

ধর্ম্মালোচনার নাম শুনিলে আমাদের মনে যে ভয় হয় তাহার আর একটি কারণ আছে। আজকাল দেশে একটা সুদিন আসিয়াছে, প্রাচীনেরা যাহাই করুন না কেন, সেবাপরায়ণ যুবকগণ একতার জন্য, মহাভারতের মহামিলনের জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। বিরোধ বা অনৈক্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। ধর্ম্মালোচনার নাম শুনিলে অনেকে ভয় পান, তাঁহারা মনে করেন সেখানে নিশ্চয়ই কোন বিরোধ হইতেছে, হিন্দু ব্রাহ্মকে গালাগালি করিতেছে, ব্রাহ্ম হিন্দুকে গালাগালি করিতেছে, খৃষ্টান হিন্দুকে গালাগালি করিতেছে, প্রত্যেকেই আপন আপন দলপুষ্টির জন্য ব্যস্ত। এই প্রকারের যেমন হউক একটা স্থায়ী বিরোধের বীজ বপন করাই ধর্ম্মালোচনার চলিত অর্থ। যুবকগণ, যাঁহাদের প্রাণ সত্য সত্যই দেশের জন্য কাঁদিয়াছে, যাঁহারা জীবন পাত করিয়া দুঃস্থ নরনারীর জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া হিন্দুমুসলমান, মগ, ম্লেচ্ছ, নির্ব্বিশেষে অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধ বিতরণ করিতেছেন তাঁহাদিগকে ইহা ভাল লাগে না। এই জন্য ধর্ম্মালোচনার নাম শুনিলে তাঁহাদের ভয় হয়।

'দেবালয়' এ যে ধর্ম্মালোচনা হয় তাহার প্রকৃতি এরূপ নহে। দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিয়া দেখিবেন, আজ দেবালয়ে একজন হিন্দুসমাজের নেতা—বিদ্যাভূষণ মহাশয় বক্তৃতা করিবেন, কল্য একজন মুসলমান মৌলভী—কলিকাতার মুসলমান সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি কোরান শরিফ্ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, তৎপরদিন ব্রাহ্ম আচার্য্য, নববিধানেরই হউন আর সাধারণ বা আদি সমাজেরই হউন, তৎপরদিন বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভা, তাহার পর জৈন, এই ভাবে দিনের পর দিন 'দেবালয়' এ কার্য্য হইতেছে, কার্য্যের বিরাম নাই। এত বড় দেশে এত নিয়মিত ও এত বিচিত্র রূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা আর কোথায়ও নাই। 'দেবালয়' এর নিয়মাবলীতে এবং 'দেবালয়' পত্রের মলাটের উপর লিখিত আছে যে এই 'দেবালয়' কে সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজস্ব মনে করিয়া কার্য্য করিবেন, কেবল মাত্র কেহ কাহাকেও উপহাস বিদ্রূপ বা আক্রমণ

করিবেন না, এই প্রকারের পূর্ণ মত সহিষ্ণুতা ও উদারতার ভিত্তির উপর 'দেবালয়' এর কার্য্য চলিতেছে। সুতরাং ধর্ম্মালোচনা বলিতেই যে একটা সাম্প্রদায়িক বিরোধের ভাব আসিয়া আমাদের মনে উপস্থিত হয় 'দেবালয়'এর ধর্ম্মালোচনা সে রূপ প্রকৃতির নহে। পরন্তু তাহার ঠিক বিপরীত। 'দেবালয়'ই একমাত্র অনুষ্ঠান যাহা আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও ধর্ম্মের নামে যে অনৈক্য উপস্থিত হয় তাহার মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই বার আর একটি ভয়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। 'দেবালয়' বুঝি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় করিয়া একটি বিশ্বজনীন মহাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন! এই বিশ্বজনীন মহাধর্ম্মের বা Universal Religion এর নাম শুনিলেও অনেকে ভয় পাইয়া থাকেন, বিশেষতঃ যাঁহারা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ তাঁহাদের ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিশ্বজনীন মহাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এ কালের অনেকেই করিয়াছেন ও করিতেছেন। তুলনামূলক ধর্ম্মালোচনা বা ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি নিরূপণে মোক্ষমূলর, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, হেগেল প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতগণ অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। 'দেবালয়,' যদি এই প্রাচীন দেশে এই প্রকারের একটা চেষ্টা করেন তাহা হইলে ভয়ের কারণ যথেষ্ট আছে। এ কালে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের বা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার যে সমস্ত চেষ্টা হইয়াছে তাহার গোড়ার কথা এই যে সব ধর্ম্মই অজ্ঞান ও অসভ্যাবস্থায় বিদ্যমান মানবজাতির কতকগুলি ধারণা ও উদ্দাম কল্পনা হইতে উদ্ভূত। সব ধর্ম্মেরই উদ্ভব এইখানে। মানবজাতি যখন অসভ্য ছিল তখন তাহাদের অজ্ঞান চিত্তভূমিতে বাহিরের ঘটনাসমূহ কর্ত্তৃক কতকগুলি কুসংস্কারের বীজ উপ্ত হয়, সেই বীজ ক্রমে ক্রমে বিকাশলাভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মসমূহের যে আকার তাহা ধারণ করিয়াছে। এ বেশ সুন্দর চিকিৎসা, দুঃখের বিষয় রোগী মরিয়া গেল। অর্থাৎ সব ধর্ম্মেরই যখন গোড়ার কথা ভ্রান্তকল্পনা তখন আর ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ কেন? এই অবস্থায় মানব ঐহিক সুবিধা অথবা ভোগায়তনের প্রসার বৃদ্ধিতেই মনোযোগ করিল। আধ্যাত্মিক জীবন বলিয়া যদি একটা কিছু থাকে তাহা মুখ্য নহে, তাহা গৌণ, ইহজীবনের সুখ সুবিধার জন্য তাহা প্রয়োজন। অধ্যাপক ও দার্শনিকদিগের যে বিশ্বজনীন মহাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার আয়োজন বা ধর্ম্মসমন্বয় তাহার ভিতরের রহস্য এই। আমরা একালে যাহা বুঝিতে পারি না তাহাই কুসংস্কার, তাহাই অসভ্য ও অনুন্নত অবস্থার

পরিচায়ক, এইরূপ মনে করা একালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুসংস্কার। এই এক-দেশদর্শিতার হস্ত হইতে জগৎকে ও মানবজাতিকে উদ্ধার করিতে হইবে। একটা উদাহরণ দিই, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন। ইংরাজ কবি মিল্টনের যে সব পুস্তক আমাদের কলেজের ছেলেদের পড়ান হয় সেই সব পুস্তকে খৃষ্টান ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সব ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পূজা-পার্ব্বণ প্রচলিত ছিল তাহার বর্ণনা আছে। সয়তানের অনুচরেরাই এই সব দেবতা, আর এই সব অনুষ্ঠান কুসংস্কার ও দুর্নীতিমূলক। মিল্টন এই-রূপ বলিয়াছেন। মহাত্মা মিল্টনকে আর বেশী খোঁজখবর লইতে হয় নাই, তিনি যেধর্ম্মের লোক সেই মতকেই তিনি একমাত্র সত্য বলিয়া জানি-তেন, আর সব মিথ্যা এই সংস্কারে তিনি পালিত হইয়াছিলেন, কাজেই এক কথাতেই তিনি প্রাচীনকালের ধর্ম্মানুষ্ঠানকে উড়াইয়া দিলেন। আজ যদি মিল্টন বাঁচিয়া থাকিতেন, আর প্রাচীন মিশরের, প্রাচীন সিরিয়ার, গ্রীকদেশের প্রাচীন পূজাপদ্ধতির রহস্যও গভীর মর্ম্মসম্বন্ধে এ কালে সত্য-প্রিয় পণ্ডিতেরা যে সব কথা প্রচার করিতেছেন, তাহা পাঠ করিবার ও সে সম্বন্ধে উদারভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ যদি তাঁহার ঘটিত তাহা হইলে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল লেখনী সংযত হইয়া আসিত।

মনে করুন হিন্দুধর্ম্ম, ইহার কোন আচার বা অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সহজে একটা মত আজকাল আর প্রচার করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান ইউ-রোপে অন্তর্জগতের রহস্য লইয়া খুব আলোচনা হইতেছে, আমাদের সাধারণ বিচারণা পদ্ধতি ছাড়া অন্যরূপ বিচারণা পদ্ধতি আছে তাহাও ইউরোপ এখন বুঝিতে পারিতেছে। যে Mysticism এতদিন নিন্দিত ও উপেক্ষিত অবস্থায় ছিল, এখন ইউরোপে তাহার পুনরুত্থান হইতেছে পরলোক শুধু মানিয়া লওয়ার কথা নয়, তাহার রহস্য বৈজ্ঞা-নিকের আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন ধর্ম্মসম্বন্ধে য-সহজে একটা মত প্রচার করা যাইত এখন ভদ্রলোকে আর তাহা পারে না, তবে যাহাদের চাকুরীর অনুরোধে বা নিজের সম্প্রদায়ের তুষ্টিসাধন করিয় উদরান্ন সংগ্রহের জন্য করিতে হয়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

এই তো বর্ত্তমান যুগের লক্ষণ। সুতরাং সেকালের মত হাতগড়া একট বিশ্বজনীন মহাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা একালে উপহাসাস্পদ হইয়া পড়িয়াছে দেবালয়ে এ প্রকারের হাতগড়া সমন্বয়ের চেষ্টা নাই।

আর এক রকম ধর্ম্ম সমন্বয় আছে—তাহাকে ইংরাজিতে Ecclecticism বলে। প্রত্যেক ধর্ম্ম হইতে কিছু কিছু লইয়া জোড়াতাড়া দিয়া একটা কাল্পনিকমূর্ত্তি গড়া তাহার লক্ষ্য। এখন সে চেষ্টাও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইবার এ সম্বন্ধে দেবালয়ের ধারণা কি তাহাই বলি। আপনারা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

প্রথম কথা এই যে আমাদের মত একজন সাধারণ লোক একটা নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। অগস্ত কোমৎ খুব পণ্ডিত ছিলেন, খুব ভাল লোকও ছিলেন, তিনি অনেক চিন্তা করিয়া জগৎকে একটা ধর্ম্ম দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। তাঁহার মতের যাহা ভাল জিনিস অর্থাৎ মানবিকতা তাহা খৃষ্টীয়জগতে ভাল করিয়া গৃহীত হইল বটে, কিন্তু কোমৎএর মত পরবর্ত্তীকালের আলোচনার মুখে দাঁড়াইতে পারিল না।

উচ্চতর সমালোচনা বা Higher Criticism খৃষ্টান ধর্ম্মকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছে, প্রমাণ করিয়াছে যে খৃষ্ট একজন ঐতিহাসিক পুরুষ নহেন। বাইবেলের উপদেশ অন্যান্য দেশের প্রাচীন গ্রন্থে সমস্তই পাওয়া যায়। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন খৃষ্টধর্ম্মের ঐতিহাসিকভিত্তি ভাঙ্গিয়া দিলেই খৃষ্টানধর্ম্ম চলিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা গেল না। হেগেলের খৃষ্ট ধর্ম্ম, টলষ্টয়ের খৃষ্টধর্ম্ম, একত্ববাদীদের খ্রীষ্টধর্ম্মে বেদান্তের ছায়া পড়িয়াছে, থিওজফিষ্টগণ আধ্যাত্মিক খৃষ্টধর্ম্মের রহস্যে হিন্দুধর্ম্মের রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমাদের দেশে শ্রীকৃষ্ণের যত নিন্দা করা হইয়াছে এত নিন্দা বোধ হয় আর কাহারও করা হয় নাই। অবশ্য আমরা অর্থাৎ হিন্দুরা এই নিন্দাকারীদের উপর রুষ্ট হই নাই, কারণ শ্রীকৃষ্ণ এমনি যে তাঁহার নিন্দা করিয়া নাম করিলেও তিনি তাহাকে সদ্গতি প্রদান করেন সুতরাং আমরা মনে করি যে এই নিন্দাকারীগণের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল করিবেন। পূতনাকে তিনি মাতৃগতি দিয়াছেন, কংসকে তিনি মুক্তি দিয়াছেন সুতরাং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিবার জন্য হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া কি লইয়া নিন্দা করা যায় তাহাই অন্বেষণ করেন, আপনারা তাঁহাদের উপর রুষ্ট হইবেন না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরও সদ্গতি দিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের শক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের এক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি অগাস্ত কোমৎ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, কাজেই বৃন্দাবনলীলার রহস্য তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এতদিন বাঁচিয়া থাকিলে, এবং নূতনভাবে চিন্তা করিতে

হইলে চিত্তের যে সরলতা ও যে সত্যানুরাগের প্রয়োজন তাহা থাকিলে তিনি তাঁহার মত বদ্‌লাইতেন।

কাজেই দেখুন ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা হউক একটা কিছু মত প্রচার করা যায় না। তাড়াতাড়ি একখানি বই বা তাহার বঙ্গানুবাদ পড়িয়া কোন ধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা যায় না। আমরা বলি যে হিন্দুধর্ম্মের গভীর রহস্য বুঝিতে হইলে কেবল দুচারিখানা বই পড়িলে হইবে না, সাধক ও আচার্য্যগণের শরণাপন্ন হইতে হইবে তাঁহাদের পাদাশ্রয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পরিচয় ব্যতিরেকে হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে না। যাঁহারা এপ্রকারের কিছু না পাইয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার করা উচিত নহে। বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের কথায় উপহাসমাত্র করিবেন। তাঁহারা দুচারিটি শেখাবুলি আওড়াইয়া মনে করিবেন খুব বাহাদুরি করিতেছি, কিন্তু অনেকে যে তাহাতে হাসিবেন ইহা তাঁহারা জানেন না।

মধ্যে একটা ভারি অহঙ্কারের যুগ আসিয়াছিল। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ব্যক্তিগত অনধীনতার আদর্শ প্রচারিত হয়, এই অহঙ্কার ও অশ্রদ্ধা সেই আদর্শের শেষ ফল। সেই সময়ে বেশী ভাবিবার বা প্রতিপক্ষের কি বলিবার আছে তাহা শুনিবার অবসর ছিল না। এমনি একটি আত্মম্ভরীতার যুগ জগতে আসিয়াছিল। 'দেবালয়' বুঝিয়াছেন আত্মম্ভরীতার দিন চলিয়া গিয়াছে, শ্রদ্ধার দিন জগতে আসিয়াছে। এই শ্রদ্ধার ও মতসহিষ্ণুতার আদর্শের উপর 'দেবালয়'প্রতিষ্ঠিত। আত্মম্ভরীতার একটি উদাহরণ দিই।

কাউয়েল সাহেব কবিকঙ্কণচণ্ডীর বঙ্গানুবাদ করেন। বিলাতে বসিয়া তিনি এই অনুবাদ করিয়াছিলেন। এক জায়গায় আছে "সতৃষ্ণ নয়নে দেবী চাহে লঙ্কাপানে।" সাহেব ভাবিতে লাগিলেন "পানে" এই পদটার অর্থ কি? অভিধান, অবশ্য সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান খুলিয়া দেখিলেন "পা" ধাতুর অর্থ 'পান করা, to drink. একটি ইংরাজী ইডিয়মের সহিত মিল হইয়া গেল, সাহেব তর্জ্জামা করিলেন She looked towards Lanka as if to drink it একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত কাউয়েল সাহেবের দেখা হয়। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি বলিলেন যে "পানে" পদটি আপনি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা সে ভাবে ব্যবহার করি না। সাহেব বলিলেন "তোমরা মূল অর্থ ভুলিয়া গিয়াছ।" একা কাউয়েল সাহেব নহেন, অনেক বিলাতি গুরু ও তাঁহাদের গুরুমারা চেলা এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন,

আমাদের ঘরের জিনিস আমরা বুঝি না আর সাহেব বিলাতে বসিয়া তাহা বোঝেন। এতদিন আমাদের দেশে যে সব কথা লইয়া দলাদলি হইয়াছে তাহার অধিকাংশই সাহেবের কথার তর্জ্জমা। মনে করুন কৃষ্ণচরিত্র, সাহেবরা তাহার নিন্দা করিয়াছেন এই অজুহাতে একদল লোক তাহার নিন্দা করেন, তাঁহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া তাঁহাদের ভুল দেখাইয়া দিলেও তাঁহারা প্রতিপক্ষের কথা শোনেন না, আর শুনিলেও তাহার উত্তর দিতে সাহস করেন না। প্রাচীন আচার্য্যেরা এই কৃষ্ণ-চরিত্র কি ভাবে লইয়াছেন তাহা তাঁহাদের ধীর ভাবে শুনিবার সময় নাই, বুঝিবার মত শ্রদ্ধা নাই, বুঝিতে পারিলেও তাহাতে বিশ্বাস করিবার বা তাহা প্রচার করিবার সাহস নাই। একজন লোক উপরওয়ালা সাহেবকে তুষ্ট করিয়া চাকুরীর উন্নতির জন্যও একবার কৃষ্ণ চরিত্রকে গালাগালি দিয়া এক অতি তীব্র গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এ ঘটনা অনেকেই জানেন। এ প্রকার দৃষ্টান্তের এখনও অভাব নাই। যাহা হউক দেবালয় তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের দ্বারা কলিকাতা সহরে এই কথা ঘোষণা করিতেছেন যে সেই অশ্রদ্ধা, আত্মম্ভরীতা ও ক্ষুদ্রবুদ্ধিতার দিন শেষ হইয়াছে। পৃথিবীতে এক নবযুগ আসিয়াছে।

'দেবালয়' এর ধর্ম্মালোচনার প্রণালী দেখুন? হিন্দু—হিন্দুসমাজের স্বীকৃত আচার্য্য—হিন্দুমত প্রচার করিবেন। খৃষ্টান—খৃষ্টান সমাজের স্বীকৃত আচার্য্য—খৃষ্টানমত প্রচার করিবেন। এই প্রকারে মুসলমান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি সকলেই দেবালয়ে আসেন। অথচ বিরোধ নাই—তর্ক নাই। সমস্ত কার্য্য বিশ্বজনীন প্রেম বা ভগবৎপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইবার 'দেবালয়' যে বিশ্বজনীন মহাধর্ম্মের স্বপ্ন দেখিতেছেন তাহার প্রকৃতি কিরূপ সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। সকল ধর্ম্মই বিশ্বজনীন অথবা বিশ্বজনীনতার আদর্শ বীজ-রূপে জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে রহিয়াছে, সাধনার মধ্য দিয়া তাহা বিকাশ লাভ করিতেছে। প্রত্যেক ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের ভাব ও চিন্তা আপনার করিয়া লইয়াছে, সকল ধর্ম্মই ভগবান হইতে আসিয়াছে, সকল ধর্ম্ম আবার সেই খানেই চলিয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বলিয়া একটা জিনিস নাই এবং হইতেও পারে না। সকলকেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে হইবে। নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রত্যেকে যথার্থ ভাবে পালন করুন, সত্যানুরাগী হউন, অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আচার্য্যগণ যাহা বলিতেছেন তাহা শুনুন, তাহাতে অপকার হইবে না, উপকার

হইবে। যখন এক সম্প্রদায়ের আচার্য্য অযথা অন্য সম্প্রদায়কে গালাগালি করেন তখন কোমলচিত্ত ব্যক্তির সেই আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করা বিধেয় নহে, কারণ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির তাহাতে বুদ্ধিভেদ ঘটিতে পারে। এই প্রকারের বুদ্ধিভেদ নিবন্ধন জগতে অনেকেরই অনিষ্ট হইয়াছে। 'দেবালয়' এর বিশেষত্ব এই যে এখানে সে ভয় নাই। এখানে সকলেই অপর ধর্ম্মের আচার্য্যগণের উপদেশ শুনিতে পারেন, কোনও ভয়ের কারণ নাই।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিরোধ হইয়াছে, কিন্তু এই বিরোধের অন্তরালে যে একটি খুব বড় রকমের আদান প্রদানও চিরকাল ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সেমিতিক জাতির mysteries, Hebraic Codes and prophecies, Egyptian Symbolisms, Platonic and Aristotelian philosophies, Gnostic and Neo-platonic ecstacies and emanations, বৌদ্ধ ধর্ম্মের ত্যাগ ও সন্ন্যাস, গ্রীক স্বভাববাদ (Naturalism), শিল্প, নীতি শাস্ত্র, রোমের আইনবিজ্ঞান (Jurisprudence) গথ জাতির custumaries, Romanesque art এই সমস্তই খৃষ্টীয় চিন্তার সহিত ক্রমে ক্রমে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং এই সমস্তের সাহায্যেই খৃষ্ট ধর্ম্ম পুষ্টি লাভ করিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় জগতে দেশ দেশান্তরে ধর্ম্ম প্রচারের খুব ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তাহার ফলে খৃষ্টান ধর্ম্মের আর একদিকে বিকাশ হইতেছে, নিম্নতম শ্রেণীর অসভ্য জাতি সমূহেরও ধারণাশক্তির অনুযায়ী খৃষ্টীয় চিন্তার প্রসার হইতেছে। এখনও খৃষ্টান ধর্ম্মের বিকাশ হইতেছে, চীন, ভারত ও আরবের সভ্যতার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু তাহা ক্রমে ক্রমে খৃষ্টীয় চিন্তার ও খৃষ্টীয় সাধনার অন্তর্ভূত হইয়া যাইতেছে। ইহা স্বাভাবিক, ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এই আদান প্রদান চিরকালই চলিতেছে।

হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাসও এক অতি বিচিত্র জিনিস। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে নারদের শ্বেত-দ্বীপ যাত্রা হইতে একদল পণ্ডিত অনুমান করেন যে ভারতের বৈষ্ণব ধর্ম্ম খৃষ্টান ধর্ম্ম হইতে গৃহীত। সাহেবরাই এই মত প্রচার করেন। গ্রীয়ারসন্, ওয়েবার এই মতের প্রবর্ত্তক। এই মত যে ঠিক নয়,

বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে বৈদিক বীজেরই বিকশিত অবস্থা তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই উভয় ধর্ম্মের মধ্যে যে একটা আদান প্রদান চলিয়াছে, ইহাও বোধ হয় একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। একটি মতের পার্শ্বে আসিয়া যখন আর একটি মত দাঁড়ায়, তখন একটা প্রতিযোগীতা বা প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিতে থাকে; যাহারা বহির্ম্মুখ তাহারা কেবল এই টুকুই দেখিতে পায়। কিন্তু যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত হইয়াছে তাঁহারা দেখেন যে এই বিরোধ যতই তীব্র হউক ইহা সাময়িক। যে সময়ে বাহিরে বিরোধ হইতেছে সেই সময়ে অন্তরে অন্তরে একটা মিলনও হইতেছে। বিরোধ বিশ্বে একটা স্থায়ী জিনিস নহে—মিলনে যাইয়া বিরোধকে পর্য্যবসিত হইতেই হইবে। এমনি করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মমতের অন্তর্নিহিত বীজ বিকাশ লাভ করিতেছে। এই মহাসত্যের ভিত্তির উপর ইউরোপের চিন্তারাজ্যে এক নবযুগের প্রবর্ত্তক মহামতি হেগেল এক নূতন আদর্শের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। ইহার নাম Dialectic—আপনার সর্ব্বত্রই এই আদর্শের পরিচয় পাইবেন।

এই প্রকারের আদান প্রদানের দ্বারাই প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত শক্তি যে বিকশিত হইয়াছে ইহা একটি অবিসম্বাদিত সত্য। মনে করুন ইউরোপে বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের কতই না বিরোধ হইয়াছে। ইহার কারণটাও আপনারা জানেন। বিজয়ী মুসলমানগণই বিজ্ঞানের বর্ত্তিকা হস্তে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে উপস্থিত হয়! খৃষ্টানেরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানকে ভাল চক্ষুতে দেখিতে পারিলেন না। বিজ্ঞান তখন শিশু, আর ধর্ম্ম তখন সবল। ধর্ম্মের হস্তে বিজ্ঞানের অশেষ লাঞ্ছনা হইল, গাইয়ার্দ্দানো ব্রুনো, গ্যালিলিও, রোজার বেকন, প্রভৃতির জীবনী আপনারা জানেন। কিন্তু ক্রমে এই শিশু বিজ্ঞান সবল হইল, সত্যের গতি রোধ করে কে? বিজ্ঞান বড় হইয়া প্রতিশোধ লইল। বৈজ্ঞানিকেরা ইহসর্ব্বস্ববাদ, জড়বাদ, সংশয়বাদ, ক্ষনিকবিজ্ঞানবাদ বা শূন্যবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, প্রভৃতি মত প্রচার করিয়া ধর্ম্মকে তাহার গৌরবের সিংহাসন হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। শেষ অজ্ঞেয়তা-বাদ আর হিতবাদ ধর্ম্মের আসন অধিকার করিবার যখন উপক্রম করিতেছে তখন যেন প্রতিক্রিয়া শেষ হইয়া জার্ম্মাণ দেশ হইতে সমন্বয় আরম্ভ হইল। ক্যাণ্ট সমন্বয় আরম্ভ করিলেন, ধর্ম্মের ও বিচারের রাজ্য পৃথক করিয়া ভাগ করিয়া দিলেন এখন এই সমন্বয় চলিতেছে। ইহাতে উভয় পক্ষেরই লাভ হইয়াছে।

হিন্দুর দেশে পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও বেদবাদী ব্রাহ্মণের বিরোধ হইয়াছিল তাহার সমন্বয় হইয়াছে। একালে খৃষ্টান ও হিন্দু অনেক বিরোধ করিয়াছে, এখনও বিরোধ চলে। কিন্তু খৃষ্টানের একত্ববাদ বেদান্তের দ্বারা পুষ্ট হইতেছে একালের খৃষ্টান ধর্ম্মের উদার ব্যাখ্যামূলক যে কোন গ্রন্থ অথবা এন্‌কোয়ারার, খৃষ্টান কমন্‌ওয়েলথ্ প্রভৃতি যে কোন সাপ্তাহিক পত্রের যে কোন সংখ্যা পাঠ করিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন। হিন্দু ধর্ম্ম কি খৃষ্টান ধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই? বিশেষ ভাবেই হইয়াছে। হিন্দুর ভক্তিবাদে খৃষ্টীয় প্রভাব বিশেষরূপেই পরিলক্ষিত হয়। মহাত্মা খৃষ্টকে ভগবানের অবতার বলিতে বা একজন খুব উচ্চাঙ্গের মহাপুরুষ বলিতে হিন্দুর কোনই আপত্তি নাই, তাঁহার ত্যাগ, প্রেম, বৈরাগ্য ও ঈশ্বরনির্ভরতা হিন্দু অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবেন। তবে আপত্তি কি জানেন? খৃষ্টান ধর্ম্ম শুনিলেই মনে হয় কাপড় চাদর ছাড়িয়া এই গরমের দেশে যেমন তেমন হউক কোট প্যাণ্ট পরিতে হইবে। আর সকালে উঠিয়া টেবিল না থাকে একটা কাঠের বাক্‌সের উপর রাখিয়াও একটু চা বিস্কুট খাইতে হইবে। আমাদের আচার হানি হয়, আমাদের সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আসে, অশান্তি আসে, তাহার কারণ, খৃষ্টান্ ধর্ম্মের নামে ইউরোপের সামাজিক আদর্শ, স্বৈরাচার অনধীনতা প্রভৃতি প্রচারিত হয়। এই খানেই আপত্তি। নতুবা মহাত্মা খৃষ্টকে কে অমান্য করিবে? গোলকগত মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ, বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনরুত্থানের যিনি অন্যতম আচার্য্য তাঁহার গ্রন্থ বেশ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন দেখিবেন খৃষ্টের আদর্শ তাঁহার সাধনায় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্য দিয়া কেমন বিকাশ লাভ করিয়াছে। কবি নবীনচন্দ্রের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মুসলমানের সহিত হিন্দুর সমন্বয় অনেকদিনই চলিতেছে। সত্যপীরের পাঁচালি ও সিন্নি সকলেই জানেন।

তাহার পর এই বিশাল হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেও এই সমন্বয় যে কি পরিমাণে ক্রিয়াশীল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গের তৎকালীন মস্তিষ্কস্বরূপ নবদ্বীপে হিন্দু সাধনার চারিটি ধারা প্রকট হইয়া উঠে। রঘুনন্দনের স্মার্ত্ত আন্দোলন, রঘুনাথের ন্যায়ের আন্দোলন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তান্ত্রিক আন্দোলন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তির আন্দোলন। এই চারিটি ভাব ধারা তাহার পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলনেও ঠিক এই চারিটি ধারা আছে। কোন কোন

ধারার কে কে প্রতিনিধি তাহা সময়ান্তরে বলা যাইবে। এটুকু জানা বিশেষ দরকার। এই চারিটি ধারার মধ্যেও বেশ স্তরে স্তরে সুন্দর আদান প্রদান চলিতেছে। হরিভক্তি-বিলাসের মধ্য দিয়া স্মৃতি আসিলেন, সমস্ত মন্ত্র, আগম বা তন্ত্রে, বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর দর্শন প্রধানতঃ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, অধিক কি বাঙ্গালী দার্শনিক মধুসূদন সরস্বতী, শঙ্করের অদ্বৈবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া ন্যায়দর্শনের সমস্ত পদ্ধতি নিলেন। কেহই কাহাকেও উপেক্ষা করেন না। আদান প্রদানের মধ্য দিয়া প্রত্যেক চিন্তা প্রণালী বিস্তৃত ও গভীর হইতেছে, প্রত্যেক সাধনপথ পরিষ্কৃত হইতেছে। ইহাই জগতের নিয়ম।

তাহার পর দেখুন পঞ্চ উপাসক। গাণপত্য, সৌর, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব; এই সকল সম্প্রদায়ের প্রাথমিক ইতিহাসে দেখিবেন বিরোধ বেশ আছে। পরে মিল হইল। এক পক্ষ যেমন শ্রদ্ধার সহিত অপর পক্ষের কথা শুনিতে লাগিলেন, অমনি বন্ধুতা ও মিলন আরম্ভ হইল। এখন হিন্দুমাত্রকেই প্রত্যেক ক্রিয়ায় ও প্রত্যেক পূজায় সর্ব্বাগ্রে পঞ্চদেবতার পূজা করিতে হয়। প্রকাশ্যভাবে যে কোন ক্রিয়া হয় তাহাতে এই ব্যবস্থা। এইখানেই শেষ নহে। মহামায়ার দুইটি দিক দেখা গেল—যোগমায়ারূপে তিনি কৃষ্ণলীলার সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন। যশোদার গর্ভসম্ভবা, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী! কবি চণ্ডীদাস বিশালাক্ষীর কৃপায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রবর্ত্তক। এইভাবে অন্তর্জগতে এক মহামিলনের উদ্যোগ চলিতেছে।

মিলন যে চাই—বিচ্ছেদে মৃত্যু, মিলনে জীবন। মিলন যতটা কঠিন বলিয়া মনে হয় ততটা কঠিন নয়। কোন ইংরাজ কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন আমরা যে পরস্পর পরস্পরকে ধীরভাবে ভাল করিয়া দেখি না, ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি না। এইটুকু করিলেই জগতে প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

"Oh, we'd love each other better
If we only understood."

'দেবালয়' এ কি ঠাকুর আছেন, এইবার আপনারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। বন্যাপ্রপীড়িত দেশে আর্ত্তের সাহায্যের জন্য আপনারা যে ঠাকুরের প্রেরণায় ছুটিয়াছেন 'দেবালয়' এ সেই ঠাকুরের নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। এই মিলনেই শক্তি ইহা আমরা বুঝিয়াছি, প্রেমেই মুক্তি ইহাও আমরা বুঝিয়াছি। এই মিলন ও প্রেম সাধনার বস্তু। যে বিশিষ্ট সাধনার দ্বারা আমরা এই প্রেম ও মিলনে উপস্থিত হইতে পারিব 'দেবালয়' সেই সাধনার

ক্ষেত্র। দেশে সুসময় আসিয়াছে, 'দেবালয়' আপনাদের সকলের, আপনারা 'দেবালয়'এ আসিয়া মিলিত হউন।

চণ্ডীদাস।

জগদ্বিখ্যাত বৈষ্ণবপদকর্ত্তা চণ্ডীদাস, অনুমান ১৩০৫ শক বা ১৩৮৩ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। *। পিতা ভবানীচরণ; মাতা—ভৈরবী সুন্দরী; জাতি ব্রাহ্মণ।

চণ্ডীদাস; বীরভূম জেলার মধ্যে নান্নুর † নামক গ্রামে বাস করিতেন। নান্নুর গ্রাম এখন একটি স্বতন্ত্র থানা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ‡ নান্নুর, ইষ্টইণ্ডিয়া রেল লুপলাইন আহামদপুর ষ্টেসন হইতে পনর মাইল, সিউড়ী হইতে ২৮ মাইল বা ১৪ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত।

চণ্ডীদাসের পিতা, গ্রামস্থ বিশালাক্ষী দেবীর পূজক ছিলেন বিশালাক্ষী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি একখণ্ড পাষাণে খোদিত—চতুর্ভুজাকৃতি, শিব বক্ষোপরে সংস্থিতা। বিশালাক্ষীদেবীর ভোগাদি পূর্ব্বে তান্ত্রিক মতে সম্পন্ন হইত—"বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞপূজা করে।"

* ১২৮০ সালের ১০ই পৌষ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে একজন লিখিয়াছিলেন—চণ্ডীদাস ১৩০০ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩৯৯ শকে পরলোক গমন করেন—ইহাঁর পিতার নাম দুর্গাচরণ বাগচী, ইহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ"ইত্যাদি। কিন্তু এ কথার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও কৃত্তিবাস সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

† কেহ কেহ বলেন, মজঃফরপুর জেলার মধ্যে উঘোট নামক গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়, পরে তিনি বঙ্গদেশে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। এ কথার এক প্রবাদ ভিন্ন প্রমাণ নাই।

‡ বীরভূমের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্টিক্ট জজ সুকবি শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম-এ সি, এস্. মহোদয়ের চেষ্টায় এবং বীরভূমের বর্ত্তমান ডিষ্টিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের যত্নে, চণ্ডীদাসের জন্মভূমির নামানুসারেই সাকুলীপুর থানার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নান্নুর থানা নামকরণ হইয়াছে (Calcutta Gazette 22' May" 1913)

(চৈতন্য-ভাগবত)। এখনও প্রত্যহ মৎস্যভোগ হইয়া থাকে ; মধ্যে মধ্যে ছাগবলি হয়। *

পিতার মৃত্যুর পর চণ্ডীদাস, শৈশব অবস্থাতেই স্বয়ং বিশালাক্ষীদেবীর পুরোহিত নিযুক্ত হন। সুতরাং বাল্যকালে রীতিমত বিদ্যাধ্যয়ন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তবে প্রথমাবধি, সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ বা আকর্ষণ ছিল। বামাচারী পূজারীর সন্তান চণ্ডীদাস, বালক-কালেই "চণ্ডে মাতাল" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

তথাপি তিনি—

"নান্নুরের মাঠে পত্রের কুটীর নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথা ভজনকরয়ে নীতি॥"

তদনন্তর বাঁকুড়াজেলার অন্তর্গত মেঝিয়া গ্রামের নিকট—

"শালতড়া † গ্রাম,　অতি পিঠস্থান,　নিত্যের‡ আলয় তথা।
ডাকিনী বাশুলী, §　নিত্য সহচরী　বসতি করয়ে তথা।
চণ্ডীদাস কহে　সে এক বাশুলী　প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারি চাপড়ে　নিদ্রা ভাঙ্গিল　পিরীতি হইল সুরু॥"

এই—

"নিত্যের আদেশে, বাশুলি চলিল, সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামে, প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া, চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপতপ, করহ আরোপ, একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি, শুনহে চৌষট্টি সনে॥"

এবং—

'বস্তুতে গ্রহেতে, করিয়া একত্রে, ভজহ তাহারে নীতি।
বানের সহিতে, তাহারে যুজিতে সহজের এই রীতি॥

---

* বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থে চণ্ডী, চামুণ্ডা ও বাশুলীদেবীর নামোল্লেখ আছে ('মালদহের গম্ভীরা' পৃঃ ২৬৪, ২১৪-২৭) চণ্ডীদাস আরাধিতা বাশুলীদেবী প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব ইতিহাস অনুসন্ধানের বিষয়।

† এখন এইগ্রামে একটি ডাকঘর আছে।

‡ বনদেবী

§ নিত্যদেবীর দাসী বা পরিচারিকারা। চণ্ডীদাস আরাধিতা বিশালক্ষীদেবী ও "বাশুলী" নামে অভিহিত।

দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিত, যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথামনে ভাব রাত্রিদিনে আনন্দে থাকিবে তবে ॥
রতি পরকিয়া যাহারে কহিয়া সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি রজক ঝিয়ারি রামিণী নাম যাহার ॥'

কিন্তু চণ্ডীদাস সন্দিহান হইলেন—

"প্রবর্ত্তদেহের, সাধন করিলে, কোন বরণ হবে।
কোনকর্ম্ম, যাজন করিলে, কোন বৃন্দাবনে যাবে॥"

বিশেষতঃ তিনি, "উত্তমকুলেতে, লভিয়ে জনম, নীচসহ ব্যবহার" কেমন করিয়া করিবেন? নিত্য-সহচরী বাশুলী এই নিমিত্ত তাহাকে 'সাধনবীজ' কহিয়া দিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া চণ্ডীদাস প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইলে বাশুলী অন্তর্দ্ধান হন। অনন্তর বিশালাক্ষীদেবী চণ্ডীদাসকে "রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে" দীক্ষিত করেন তদবধি তিনি "গোপীভাবে" ভজন সাধন করিতেন। এতদ্ব্যতীত, চণ্ডীদাসের বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিগ্রহ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য, সকল গুলিই অলৌকিক ব্যাপার অবলম্বনে রচিত।

চণ্ডীদাস কখনও বিবাহ করেন নাই—তিনি আজীবন "কুমার" ছিলেন।

নান্নুরের তিন ক্রোশ পূর্ব্বাংশে কোন গ্রামে (তেহাই) সনাতন ও লক্ষ্মী নামে এক রজক দম্পতী বাস করিত; ইহাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। কিন্তু, এই রজক পরিবার মধ্যে সনাতন ও রামমণি বা রামী নাম্নী একটি কন্যা ব্যতীত সকলেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কিছু দিন পর, সনাতন গৃহত্যাগী হইলে রামমণি নিরাশ্রয় অবস্থায় কতকদিন স্ব গ্রামেই অবস্থান করে। কিন্তু দারুণ অভাব বশতঃ পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে পৈতৃক কুটিরের-মায়া পরিত্যাগ করিয়া নান্নুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। গ্রামবাসিগণ, রামমণিকে বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির-মার্জ্জনা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন—ক্রমে রামমণি 'শশিকলার' ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং "কাজেতে নিপুণা" বলিয়া ক্রমে সকলের প্রিয়তমা হইয়া উঠিল। পরে,

"পিরীতি করিল, জগতে ভাসিল, ধোপানী দ্বিজের সনে।
জগতে জানিল, কলঙ্ক ভাসিল, কানাকাণি লোকজনে।"

এবং "চণ্ডীদাস বিনা জগত আঁধার" দেখিতে লাগিল। এদিকে চণ্ডীদাসও ধোপানীর

'ও দুটিচরণ, শীতল জানিয়া, শরণ লইনু আমি।'

চণ্ডীদাস ও রজকিনীর এই প্রেমে 'কামগন্ধ নাহি তায়' ;

কেন না, যিনি প্রণয়িনীকে

'তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও পিতৃ মাতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমারি ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥'
'তুমি সে তন্ত্র, তুমি সে মন্ত্র, তুমি সে উপাসনা রস।"

এরূপভাবে দেখেন, তাঁহার প্রেম পার্থিব নহে—'স্বর্গীয় নিকষিত হেম' তুল্য। বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

নায়িকা সাধন, শুনহ লক্ষণ যেরূপে করিতে হয়।
শুষ্ক কাষ্ঠেরসম আপনার দেহ করিতে হয়।"
"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যেজন কেহনা দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি যেজন জানয়ে সেই সে পাইতে পারে॥"

এবং

"পিরীতি পিরীতি　　সর্ব্বজনে কহে
পিরীতি সাধন কথা
বিরিখের ফল　　নহেত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পিরীতি অন্তরে　　পিরীতি বাহিরে
পিরীতি সাধন যে।
পিরীতি রতন　　লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে ॥
পিরীতি লাগিয়া　　আপন ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন　　করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥
পিরীতি সাধন　　বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া　　এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ ॥"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণমুখে এক জয়দেব কবি,

"দেহি, পদপল্লবমুদারং"

কহাইতে পারিয়াছেন ; আর পারিয়াছেন তুল্যরূপ অদ্বিতীয় কবি চণ্ডীদাস। তিনি নিজেও যেমন

'সব ছেয়াগিয়া ওরাঙা চরণ
শরণ লইনু আমি।'

বলিয়াছেন, সেইরূপ আবার প্রাণের আরাধ্য-দেবতা শ্রীকৃষ্ণমুখে কহাইয়াছেন—

'আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি রসময়ী নিধি।'

একি অপূর্ব্ব তন্ময়ের ভাব ! এ উপাসনা-রস কি সহজ-বোধ্য ?

গ্রামবাসিগণ কিন্তু ইঁহাদের ব্যবহারে বিরূপ হইয়া পড়িলেন—ফলে, চণ্ডীদাস সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া রজকিনী গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ;

"পিরীতি চরচা লোকজনে করে কুটুম্বে দুই এক বলে।
সেকথা শুনিয়া দ্বিজগণ বলে কলঙ্ক ভাসিল কুলে॥
সকল মেলিয়া একত্র হইয়া সন্ধ্যাকালে সবে আসি।
নকুল সাক্ষাতে সভাই বলিছে চণ্ডীদাস কাছে বসি॥
বলে দ্বিজগণ করি নিবেদন শুন শুন চণ্ডীদাস।
তোমার লাগিয়া আমরা সকলে ক্রিয়াকাণ্ডে সর্ব্বনাশ॥
তোমার পিরীতে আমরা পতিত নকুল ডাকিয়া বলে।
ঘরে ঘরে সব কুটুম্বভোজন করিয়া উঠাব কুলে॥
পিরীতির পাড়া বেদবিধি ছাড়া বিধির ভিতরে নাঞি।
পিরীতি যাহার বিধি অগোচর ব্রজপুরে তার ঠাঞি॥
শুন চণ্ডীদাস ছাড়িয়া নিশ্বাস ভিজিয়া নয়ন জলে।
ধোবানী সহিতে আমি যেন তাথে উদ্ধার হইব কুলে॥
পিরীতি আলম্ব পিরীতি কুটুম্ব পিরীতি সমুদ্র বিধি।
পিরীতি উন্মাদ পিরীতি আস্বাদ পিরীতে পাইব নিধি॥
পিরীতি আচার পিরীতি ব্যাভার পিরীতে তোমরা ভাই।
পিরীতের তরে দুয়ারে দুয়ারে আদর করিতে চাই॥"

শুনহে নকুল ভাই।

"কুটুম্ব-ভোজন সব তুমি জান সে সব তোমার ঠাঞি॥
আমার এ চিতে খাইতে শুইতে কেবল পিরীতি সার।

যা করে পিরীতি তাহা মোর মতি আপনে কি বল আর ॥
তুমি একজন বিজ্ঞ মহাজন সকলে পূজিত বট।
ধোপানী-আশ্রয় চণ্ডীদাস কয় কে বলে পিরীতি ছোট ॥"

এইরূপে দুই জনের মধ্যে 'বিচার' হইয়া অবশেষে চণ্ডীদাস নকুলকে বলিলেন,

'তোমার বচনে, অমৃত সিঞ্চিল কাটিতে না পারি আমি।'

ইহার পর নকুল কুটুম্ব সকলকে অতি অনুনয় করিয়া জ্ঞাতিতে তুলিবার জন্য ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। এদিকে, রজকিনী, এই সব ব্যাপার শুনিয়া—

'নয়নের জলে, কান্দিয়া বিকল, মনে বোধ দিতে নারে ॥
গৃহেকে জাইঞা, পালঙ্ক পাড়িয়া, শয়ন করিল তায়।
কান্দিয়া মুছিছে, নিশ্বাস রাখিছে, পৃথিবী ভিজিয়া যায় ॥'

অনন্তর চণ্ডীদাস, অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিলে পর যখন সুখে 'খায় দ্বিজগণে' সেই সময়,

'ধোপানি দাড়াঞা, দ্বিজপানে চাঞা পিরীতি পিরীতি ভজে ॥
দ্বিজগণে ডাকে ব্যঞ্জন আনিতে, ধোবিনী যখন ধায়।"

এইবার এক অলৌকিক কাণ্ড সংঘটিত হইল, তৎসম্বন্ধে কিম্বদন্তী * এইরূপ প্রচলিত আছে—যখন চণ্ডীদাস সমবেত কুটুম্ববর্গকে পরিবেশনে ব্যস্ত, রামমণি সেই সময় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কি রে চণ্ডে, তুই নাকি আমাকে ছেড়ে জেতে উঠেছিস্'? চণ্ডীদাস ইহাতে কিয়ৎক্ষণ একটু স্তম্ভিত রহিয়া অপর দুইটি হস্ত বাহির করিয়া রামমণিকে আলিঙ্গন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তখন আপনাদের ভ্রম বুঝিয়া রামীকে সামান্য জ্ঞান না করিয়া তাহাকেই পরিবেশন করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরিবেশনকালে, রামীর অবগুণ্ঠন স্থানচ্যুত হইলে অপর দুইটি হস্ত বাহির করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল। ইত্যাদি।

ফলে, 'পিরীতে হইল জয়ী'—জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাদিগের স্বচ্ছন্দ-আচরণে আর বিরোধী হইল না—তাঁহারা সুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সাক্ষাত।

বাঙ্গালার দুই প্রধান ও শীর্ষস্থানীয় কবি, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি একই

* চণ্ডীদাস ও রামমণি সম্বন্ধে এইরূপ বহুতর কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বর্ত্তমান ছিলেন। তৎকালে দূরদেশে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা ছিল না ; সুতরাং, এই দুই কবির একত্র মিলন, বঙ্গসাহিত্যের একটি স্মরণীয় ঘটনা। মিথিলাধিপতি শিবসিংহ কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমান আগমন করিলে তাঁহার প্রিয় বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার মানসে তাঁহার সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমান আগমন করেন। এই বিষয়াবলম্বনে "পদকল্পতরু" গ্রন্থে একটি পদ যথা—

'চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ। বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ॥ দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল॥ সঙ্গহি রূপ নারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥ চণ্ডীদাস তব রহই না পারই চললহি দরশন লাগি।" ইত্যাদি॥

তদনন্তর, 'সময় বসন্ত যামদিন মাঝহি বটতলে সুরধুনী তীরে।" চণ্ডীদাস কবির সহিত কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির মিলন হইল। উভয়েই তখন পুলকাবেশে 'ধৈরজ ধরই না পার'। কিছুক্ষণ পর,

'ধৈরজ ধরি দুঁহু নিভৃতে আলাপই পুছত মধুর রস কি। রসিক হইতে কিয়ে রস উপজায়ত রস হইতে রসিক কোহি॥ রসিক হইতে কিয়ে হোয়ত রসিক হইতে রসিকা। রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে রতি, কিয়ে তাহে মানব অধিকা॥ পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে শুনতঁহি রূপ নারায়ণ। কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ লছিমা পদ করি ধ্যান॥'

বিদ্যাপতি এই প্রশ্নের, 'রসের কারণ রসিকারসিক, কায়াটি ঘটনে রস। রসিক কারণ রসিকা হোয়ত যাহাতে প্রেম বিলাস॥' ইত্যাদি রূপ উত্তর প্রদান করিলে 'দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন ভাসল প্রেম তরঙ্গে॥' তদনন্তর উভয়ে স্নানাদি করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে চণ্ডীদাস নান্নুর গ্রামে উপস্থিত হন। বিদ্যাপতি, নান্নুরে কিছুদিন মাত্র চণ্ডীদাসের অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি বিশালাক্ষী দেবীর পূজা এবং রজকিনী রামীর সহিত এই সময় সদালাপ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন।

পদাবলী :—চণ্ডীদাস বহুসংখ্যক পদরচনা করিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক কতকগুলি পদ জনসাধারণের মধ্যে সমধিক প্রচলিত রহিয়া স্থায়িত্বলাভ করিয়াছে ; অবশিষ্টগুলি প্রাচীন কীটদষ্ট পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া ধ্বংস মুখে পতিত হইতেছে। আনন্দের কথা, 'বীরভূমি'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি. এ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্প্রতি

চণ্ডীদাসরচিত রাসলীলাত্মক ৭০টি পদ নান্নুর গ্রামেই আবিষ্কৃত হইয়াছে (১) এতদ্ব্যতীত তিনি নান্নুর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে কৃষ্ণলীলা এবং সহজ সাধন বিষয়ক অনেকগুলি পদ (সাত আট শত) আবিষ্কৃত করিয়া সাহিত্যজগতের পরমোপকার সাধন করিয়াছেন। এই পদগুলি সুসম্পাদিত হইয়া অচিরে প্রকাশিত হইবে। 'বীরভূমি' পত্রিকায় এই পদাবলীর মধ্যে কয়েকটি পদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও চণ্ডীদাসবিরচিত অপ্রকাশিত দুই প্রস্ত চতুর্দ্দশপদী পদাবলী প্রকাশিত করিয়া চণ্ডীদাসের জীবনী আলোচনার পথ কিঞ্চিৎ সুগম করিয়া দিয়াছেন। (২) পূর্ব্বপরিচিত এবং নবাবিষ্কৃত পদসমূহ একত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে চণ্ডীদাস রীতিমত ধারাবাহিকরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনাত্মক এক সুবৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের একটি পদের কিয়দংশ 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায়' (৭ম বর্ষে) প্রকাশিত হইয়াছে ; যথা—

বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবান।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নিয্যা।
আদি বিধেয় রসচণ্ডীদাস কিয্যা ॥

অর্থাৎ, চণ্ডীদাস ১৩৫৫ শাকে (১৪৩৩ খ্রীঃ) তাঁহার পদাবলী রচনা সমাধা করেন—এই পদাবলীর সমষ্টি ৯৯৬ টি মাত্র। উহা হইতে অনুমান হয়, চণ্ডীদাস দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ন্যূনাধিক সহস্র পদ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু লিপিকারগণের প্রকৃতি অনুসারে কতকগুলি গানের অনুলিপি রক্ষিত হইয়া অবশিষ্টগুলিই বর্জ্জিত হইয়াছিল। সুতরাং, এখন যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনার সমষ্টি মাত্র। আবার যে সকল প্রাচীন বৈষ্ণবগণের নিকট চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদ রহিয়াছে, তাঁহাদের ধারণা যে সাধন-ভজন-বিষয়ক পদাবলী ভক্তগণের উপভোগ্য, সাধারণের মধ্যে প্রচারিত করা মহাপাতকের কার্য্য। চণ্ডীদাসের পদাবলী সংগৃহীত হইবার ইহারা প্রধান অন্তরায়।

---

(১) পরিষদ্-পত্রিকা ৫।৮১ পৃঃ।
(২) পরিষদ্-পত্রিকা ৫।১৭৩ পৃঃ।

চণ্ডীদাসের রাস লীলাত্মক একটি পদ—

'কোন গোপী ছিল গৃহপরিবারে করিতে গৃহের কাজ।
গৃহকাজ ত্যজি চলিলা তখনি যেমত আছিলা সাজ॥
কোন গোপী ছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে তেজিল দুগ্ধের খুরি।
আবেশে দুগ্ধেতে ঢালিয়া দিয়াছে গাগরি ভরিয়া বারি॥
চলিলা ত্বরিতে সব তেয়াগিয়া দুগ্ধ আবর্ত্তন ছাড়ি।
বৃন্দাবন মুখে অমনি চলিলা রহল তেমতি পড়ি॥
কোন গোপী ছিল রন্ধন করিতে শুধুই হাঁড়িতে জ্বাল।
আনহি ব্যঞ্জনে আনহি দেওল আনহি হাঁড়িতে ঝাল॥
রন্ধন উপেখি চলে সেই সখী শ্রবণে শুনিয়া বাঁশী।
চণ্ডীদাস কহে আবেশে গমন হইয়ে উথল হাসি॥

* * * *

কেহবা আছিল শিশু কোলে করি পিয়াইতে আছিল স্তন।
দুগ্ধপোষ্যবালা ভূমে ফেলি গেলা ঐছন তাঁহারি মন॥ *
চলিলা গমন সেই বৃন্দাবন কাঁদিতে লাগিল শিশু।
তেমতি চলিল সব পরিহরি চেতনা নাহিক কিছু॥

ইত্যাদি। চণ্ডীদাস বাল্যকাল হইতে রীতিমত বিদ্যাধ্যয়ন করিতে সুবিধা প্রাপ্ত না হইলেও পরে যে সংস্কৃত ইত্যাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা উপরি উদ্ধৃত রচনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—শ্রীমদ্ভাগবতের মূলের সহিত এই স্থলের সহিত কেমন সুন্দর মিল রহিয়াছে। চণ্ডীদাস তাঁহার 'ভাই' নকুলঠাকুর কর্ত্তৃক 'বিদ্যাতে বিদ্যাভিরাম' বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছেন।

চণ্ডীদাসকবি সমগ্র জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা করিয়া, কত সামাজিক অত্যাচার সহ্য করিয়া ভগবানের মধুর লীলার যতটুকু সন্ধানলাভ করিয়া-

* এই পদটুকু যদ্যপি জাল না হইয়া সত্যই শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুরের রচনা হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তিনি শ্রীরাসতত্ত্ব সম্বন্ধে পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট তত্ত্বের সহিত পরিচিত ছিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুরের পদাবলী যেরূপ আনন্দের সহিত আস্বাদন করিতেন তাহাতে এরূপ মনে করা ও খুব সঙ্গত নহে। যদি বলা যায় যে ব্রজগোপীদের পুত্র কন্যাদি হইয়াছিল তাহা হইলে রাসতত্ত্বের রহস্যটুকু একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং 'এই সমস্ত পদ' চণ্ডীদাসেরই রচিত কিনা, ইহার অন্তরালে কোন 'জয়গোপাল' লুকাইয়া আছে কিনা তাহা খুব ভাল করিয়াই 'সুধাভির্বিভাব্যম্।' বীরভূমি—সম্পাদক।

ছিলেন, সুমধুর পদাবলী দ্বারা জীবন্তমূর্ত্তি রচনা করিয়া তিনি আমাদিগকে তৎসমুদয়ই নিঃশেষে অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। সেই নিঃস্বার্থের দান —সেই ভগবদ্ভক্তের প্রেমানুরক্তিলব্ধ নির্ম্মাল্য, লাভ করিয়া কেনা নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিবে? ভগবানের লীলায় তন্ময় হইয়া, আত্মহারা হইয়া তিনি যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যে প্রত্যক্ষদর্শীর কথা, তাহা যে অমূল্য! তাহা কি আর বিচারের অপেক্ষা রাখে—তাহা যাহারই 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পরশে' তাহা তিনিই 'শুনিবামাত্র আত্মহারা হইবেন!

বঙ্গভাষার ইতিহাসে আমরা এখনও চণ্ডীদাসকবির পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের সবিশেষ পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু সেই সুদূর অতীতে, বঙ্গ-ভাষার অধুনাধৃত আদিযুগে, যে ভাষায় চণ্ডীদাসকবি মানবহৃদয়ের বৃত্তি-নিচয়ের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ করিয়াছেন—তাহাকে আজ পর্য্যন্তও এই পঞ্চশত বর্ষের ক্রমিক চেষ্টা আলোচনায়, কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই—ইহা কি সাহিত্য ইতিহাসে কবি-প্রতিভার অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত নহে?

সময়ে ভাষার পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য; ইহা জগতের যে কোন সাহিত্যেই দেখিতে পাওয়া যায়? কিন্তু চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভা এই সাধারণ নিয়-মের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছে। চণ্ডীদাসের রচনা যেন আধুনিককালের ভাষা লইয়া গঠিত। বঙ্গভাষায় বৈষ্ণব, শাক্ত ও লৌকিক সাহিত্যে নানাপ্রকার তুমুল আন্দোলন বহিয়া গিয়াছে, তৎসত্ত্বেও চণ্ডীদাসের রচনা মলিন হয় নাই, ইহা অতি বিস্ময়ের কথা। চণ্ডীদাস ত ছন্দ রচনা করেন নাই—তিনি ভগবৎ-প্রেরণা দ্বারা যাহা কিছু পাইয়াছিলেন, তাহাই হৃদয়ের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—তাহা যে চিরন্তন সত্য, তাহা শাশ্বত ও অব্যয়—তাহা নিত্য পরিবর্ত্ত্যমান জগতে দৃঢ়, অচল এবং চিরসত্য ও চিরনূতন।

চণ্ডীদাসের পদাবলী, ভাবুক ও ভক্তজনের জীবন-সঙ্গী ও উপভোগের জিনিস; উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার প্রাণারাম পদাবলীর পরিচয় প্রদান করা একেবারে অসম্ভব। তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে মাত্র তিনটি পদ এই স্থানে প্রদত্ত হইল—

(১)

"পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল প্রেমসরোবর নিরমল তার জল।
দুঃখের মকর ফিরে নিরন্তর প্রাণ করে টলমল॥

গুরুজন জ্বালা জলের শিহালা পড়শী জিয়ল মাছে।
কুল পাণিফল কাঁটা যে সকল সলিল বেড়িয়া আছে ॥
কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায় ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে সুখে দুখ দিল বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখদুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুখ যায় তার ঠাঞী ॥

(২)

সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাশরিতে করি মনে পাশরা না যায় গো কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুলনাশে আপনার যৌবন যাচায় ॥

(৩)

শ্যাম শুক পাখী সুন্দর নিরখি ধরিল নয়ন ফান্দে।
হৃদয় পিঞ্জরে রাখিল সাদরে মনোহি শিকল বান্ধে ॥
তারে প্রেম সুধানিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি ধরাইল বুলি ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥
এখন হয়ে অবিশ্বাসী কাটিয়া আকুশী, পলায়ে এসেছ পুরে।
সন্ধান করিতে পাইলু শুনিতে কুবুজা রেখেছে ধরে ॥
চণ্ডীদাসদ্বিজে তব ভজবিজে পেতে পারে কিনা পারে।

পদকর্ত্তা কালুদাস, চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যথার্থই লিখিয়াছেন—
'কবিকুলে রবি চণ্ডীদাস কবি ভাবুকে ভাবুক মণি।
রসিকে রসিক প্রেমিকে প্রেমিক সাধকে সাধক গণি ॥
উজ্জ্বল কবিত্ব ভাষার লালিত্য ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে উভয় অধীন যেন ॥

সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা।
যেই পশে কাণে সেই লাগে প্রাণে শুনামাত্র আত্মহারা ॥
রামতারা ধনি রাধাস্বরূপিণী ইষ্টবস্তু যাঁর হয়।
যাহার দরশে চণ্ডী-রস ভাসে কবিতার স্রোত বয় ॥
হয় নাই হেন না হইবে পুনঃ হেন রস পদ তবে।
দীন কালুদাসে রাখ পদপাশে নামের ঘোষণা রবে ॥"

নরহরি, চণ্ডীদাসের বন্দনা উপলক্ষে বলিতেছেন—

"শ্রীনন্দ নন্দন নবদ্বীপপতি গৌরাঙ্গ আনন্দ হঞা।
যাঁর গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ রায় রামানন্দ লঞা ॥
পরমপণ্ডিত সঙ্গীত গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁহার গান।
অনুক্ষণ কীর্ত্তন আনন্দে মগন পরমকরুণা নিধান ॥"

"চৈতন্য চরিতামৃত"—মধ্য খণ্ডে আছে—'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি শ্রীগীত-গোবিন্দ। এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ॥' বৈষ্ণবদাস, তাঁহার "পদকল্পতরু" গ্রন্থে বন্দনাগীতি মধ্যে চণ্ডীদাসকে, "জয়জয় চণ্ডীদাস রস-শেখর" এইরূপ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

"শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন" নামক একখানি চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ গ্রন্থ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে * শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কপট মূর্চ্ছা অপনোদন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনা এইরূপ—

'রাধাবোলে কলঙ্কিনী হইয়াছি আমি সব লোকের ঠাঞি।
কেমনে আনিব জল যমুনাতে যাই ॥ ধ্রু ॥
নিবেদি তোমার ঠাঞি। আমার সমান কলঙ্কিনী নাই ॥
মনের দুখ নিবারিতে যাই যার ঘরে। কলঙ্কিনী ব'লে খোঁটা দেই মোরে ॥"

বৈষ্ণবদাস চণ্ডীদাসের "গদ্যপদ্যময়" গীতের উল্লেখ করিয়াছেন—চণ্ডীদাসের গদ্যরচনা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

অপ্রকৃত। চণ্ডীদাস কবির পদাবলী প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি যেমন সুদূর অতীত বঙ্গসাহিত্যের অন্ধকার-ময় ক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়া সাহিত্যিকগণের হৃদয়ে কত ফলগর্ভ-আশা সঞ্চারিত করিয়াছেন, তদ্রূপ তিনি প্রেমাবতার

* সাহিত্য, ১৩০৮ সাল, ৪০০-৪ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মঙ্গলময় সংবাদ অগ্রদূতরূপে বহন করিয়া আনিয়া ভক্ত ও ভগবৎ-প্রেমিকের হৃদয়ে কত নিত্যানন্দময় মহোল্লাসের স্ফূর্ত্তি করিয়াছেন—

"অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কান্দে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলী যেন ভূমেতে গড়ায় ॥
পুছয়ে কানুর কথা ছলছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি ॥"

আবার

"আজ কে গো মুরলি বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায় ॥
ইহার গৌর বরণ করে আলো।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল ॥
ইহার ইন্দ্র নীলকান্তি তনু।
এত নহে নন্দসুত কানু ॥
* * *
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে ॥"

আবার তাঁহার এইরূপ ভাবাত্মক পদাবলী পাঠ করিয়া, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব জন্য, সমাগতপ্রায় প্রিয়তম মিলনাকাঙ্ক্ষীর মত, প্রতিপলেই সেই পুণ্য-মুহূর্ত্তের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। সাধকের কথা, দিব্যদর্শীর কথা, কি কখন ব্যর্থ হয়? এরূপ সাধকের ঋণ কি আমরা পরিশোধ করিতে পারি?

মানুষ যখন ভগবৎ-সঙ্গ বা সান্নিধ্যলাভের জন্য একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, যখন মানুষ দেখিতেছে,

"আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।"

তখন চণ্ডীদাস আমাদিগকে কি অপূর্ব্ব আশ্বাসবাণী শুনাইতেছেন তখন তিনি বলিতেছেন,

"কহে বড় চণ্ডীদাস মিলিবে হে তাই ॥*

---

* এই আশ্বাসবানী যথার্থ প্রীতি বা প্রেম লাভের আকাঙ্খা যে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল,

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস—তুলনা—

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে কয়েকটীতে পরস্পর মধ্যে ভাবগত, এমন কি, শব্দগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এরূপ উচ্চদরের কবি কেহ কাহারও অনুকরণ করিয়াছেন, এরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। বিভিন্ন দেশের কবির মধ্যে একইভাব সমুদিত হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় শিক্ষিত ছিলেন না—ইহাই সাধারণ মত। লেখাপড়া পুষ্পের ন্যায়—ফল জন্মিলে পুষ্পের বিলয় হয়; শাস্ত্রভাব কি ভক্তির নিকট পৌঁছাইতে চেষ্টা করে; যিনি নিজে ভাবুক বা ভক্ত তিনি শাস্ত্রের মুকুরে প্রতিবিম্বিত প্রকৃতির মূর্ত্তির প্রতি কেনই বা লক্ষ্য করিবেন—প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় উপমা প্রয়োগ করেন নাই—সুন্দরের স্বভাব-ভঙ্গীই অলঙ্কার হইতে বেশী আকর্ষক; উপমা, কবির একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু যিনি ভাবটি নিজের তুলিতে আঁকিতে পারেন না, তিনি উপমার অঙ্গুলী সঙ্কেতে গৌণ বস্তু দ্বারা মুখ্যবস্তুর আভাষ দিতে চেষ্টা করেন। তাই উপমার রূপবর্ণনা অপেক্ষা জীবন আঁকিয়া রূপবর্ণনা উৎকৃষ্ট। এই অংশে কালিদাস হইতে শেক্ষপীয়র শ্রেষ্ঠ—বিদ্যাপতি হইতে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ। * * * কাব্যক্ষেত্রে চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায় অন্য এক প্রেমাবতার। বিদ্যাপতির কবিতা টীকা টিপ্পনী দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদ যিনি নিজে আস্বাদন করিতে না পারিবেন, তাঁহার নিকট অপরাপর বৈষ্ণবীয় পদের সঙ্গে সে গুলি একই মূল্যে বিকাইবে; তাদৃশ পাঠক সম্বন্ধে' বিদ্যাপতির কথায় বলা যাইতে পারে—'কাচ কাঞ্চন নী জানয়ে মূল। গুঞ্জারতন করই সমতুল॥ যো কিছু কভু নাহি কলারস জান। নীর ক্ষীর দুঁহু করই সমান॥" *

"বিদ্যাপতির কল্পনাশক্তি বিবিধ বিচিত্রভাব চিত্রণে সুপটু, চণ্ডীদাসের কল্পনা স্বীয় নটবর নায়ককে নাটকাভিনায়ক বালকের ন্যায় বিবিধ বেশে সাজাইতে সুনিপুণ। তিনি কৃষ্ণকে কখন রাজীকর, কখন দেয়াসিনী, কখন

তাহা জগতে কাহারও অবিদিত নাই। এই প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া যে অগনিত কবিপ্রতিভার উন্মেষ হইয়াছিল, এবং সমুদয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে কিরূপ উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত ও অমূল্য ধনে সম্পৎশালা করিয়াছে, তাহা মাতৃভাষানুরাগীর নিকট বর্ণনা অনাবশ্যক।

* "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ২য় সং পৃ, ১৯৩, ২১০।

নাপিতানী বেশে, কখন অন্যবিধ বেশে সাজাইয়া রাধার নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। চিত্রগুলি সুরম্য হইয়াছে এবং চণ্ডীদাস ইহাতে কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।” *

শেষ—চণ্ডীদাসের মৃত্যু ও তাহার সমাধিস্থান লইয়াও মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাস শেষাবস্থায় বৃন্দাবনে গিয়া দেহত্যাগ করেন ও তথায় সমাধিস্থ হন। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় তাহার “চণ্ডীদাসের জীবনচরিত” গ্রন্থে, বীরভূম—সিউড়ীর পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ভাণ্ডীরবনে (‘বৃন্দাবন’ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে) সমাধিস্থ হইবার কথা লিখিয়াছেন †। মতান্তরে—

‘চণ্ডীদাস-আরাধিতা বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির দোষলামা মন্দিরটি সংস্কার করা হইয়াছে—নূতন বলিয়া বোধ হইল। দেবীর মন্দির প্রাঙ্গনের দক্ষিণ ও সম্মুখভাগে কয়েকটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে * * * প্রাঙ্গনসম্মুখস্থ মন্দির-গুলির পশ্চাতে আরও কতকগুলি শিবমন্দির আছে। তৎপশ্চাতে একটি উচ্চভূমি আছে। দেখিয়া বোধ হইল, ইহা একটি অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ। কেহ কেহ বলেন, উহাই চণ্ডীদাসের আবাসবাটী ছিল। সময়ে সময়ে ঐ স্থান হইতে প্রাচীন মোহর পাওয়া যায়। বিশ্বস্তসূত্রে শুনিলাম, ঐ স্থান খনন করিতে করিতে একটী নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল * * যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, উহা সপ্ত হস্ত পরিমিত মানবদেহের কঙ্কাল * * রজকিনীর ভিটা এখনও আছে—তথায় অপর একজন বাস করিতেছে।

‘কীর্ণহারে আমাদের কার্য্যালয়ের অনতিদূরে একটা প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ আছে। তাহার শিরোদেশে নানাজাতীয় বৃক্ষলতা অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। স্তূপের পাদদেশে একটি বৈরাগী-আশ্রম। প্রবাদ এই যে, চণ্ডীদাস গান করিতে করিতে মন্দির পতনে ঐ স্থানেই সমাহিত হন। * * লোকে ঐ আশ্রমকে “চণ্ডীদাসের আখড়া” বলিয়া থাকে।” *

“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য”রচয়িতা শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহা-

† ‘বঙ্গভাষা’-গঙ্গাচরণ।

* বীরভূমবাসী আমরা একথা ইতিপূর্ব্বে অবগত ছিলাম না ভাণ্ডীরবনে গিয়া, এ বিষয়ে কোন সন্ধান জানিতে পারি নাই। তবে ভাণ্ডীরবন সংলগ্ন বীরসিংহপুরে জ্ঞানদাস নামক এক দীর্ঘজীবী পুরুষের সমাধি আছে। তিনি এই স্থানে বহুদিন ধরিয়া বসবাস করিয়াছিলেন

—লেখক।

শয়ের নিকট সে দিন কথা প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের অপর একটি নামের কথা অবগত হইয়াছি। চণ্ডীদাসের কোন কোন পদে নাকি 'অনন্ত' নামে ভনিতা আছে। আমাদের সংগ্রহ মধ্যে কিন্তু 'অনন্ত' ভনিতাযুক্ত কোন পদ দেখিতে পাই নাই।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

শ্রীশ্রীকুন্তী-দেবীর স্তব। (৩)

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাং !
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ ! ৩

তোমার এ লীলা প্রভো, বিশ্বে আবির্ভাব,
অতীব দুর্জ্জেয় তত্ত্ব অচিন্ত্য-স্বভাব।
কত যুগ যুগান্তর- ব্যাপী সাধনার পর,
সর্ব্বতত্ত্ব-চূড়ামণি তোমার এ লীলা
পুণ্যস্থান এ ভারতে প্রকাশ হইলা।
পরমহংসের দল, জ্ঞানমার্গে অবিচল,
আত্মানাত্ম বিবেকের পথ অনুসরি
আরাধনা করিলেন তোমারেই হরি !
এ দিকেতে মুনিগণ, যোগমার্গ পরায়ণ
সংলীন মানস হয়ে তোমার ধেয়ানে
যাপিলেন কতযুগ কঠোর সাধনে ॥
অমলাত্মা সাধুগণ কর্ম্মযোগে অনুক্ষণ
অলীক বিষয়রাগ করি পরিহার
করিলেন আরাধনা হে প্রভু তোমার ॥
জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, এই তিন পথ ধরি
অগ্রসর সাধকেরা সত্ত্বশুদ্ধি করি।
কিন্তু সাধনার শেষ হইল না হে দেবেশ !
তাঁহাদের ভক্তিযোগ করিতে অর্পণ
লীলাময় তব লীলা ! শাস্ত্রের বর্ণন।

প্রতিকূল বিনষ্ট হয় সেই দুর্গাকেই সর্ব্বাশুভহারী হরি, (হরতিপাপানি, সর্ব্বাণ্যশুভানি বা হৃ+ই=হরি) স্ব শক্তি স্বরূপা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কোন কোন ঋষি বলেন,—

"দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মনি।
শোকে দুঃখেচ নরকে যমদণ্ডেচ জন্মনি॥
মহাভয়ে হতি রোগেচ আশব্দো হন্তৃ বাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥"

অর্থাৎ—দুর্গশব্দের অর্থ,—মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কুকর্ম্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, রোগ প্রভৃতি যাবতীয় দুঃখের নিদান; আ শব্দের অর্থ, হননকর্ত্তা, সুতরাং—পূর্ব্বোক্ত দুঃখদায়ক মহাবিঘ্ন প্রভৃতি যিনি অপহরণ করেন তিনিই 'দুর্গা' নামে অভিহিত হন।

আবার এভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়া পুরাণান্তরে উক্ত হইয়াছে,—

"দুর্গেতি দৈত্যবচনোঽপ্যাকারো নাশবাচকঃ।
দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্ত্তিতা॥"
অপিচ—"বিপত্তি বাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ।
তাং ননাশ পুরা তেন বুধৈ দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা॥"

দুর্গপদ, দৈত্যবাচক, আকার নাশবাচক, যিনি যুগে যুগে সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবলীলা ক্রমে স্বর্গরাজ্যের কণ্টক দৈত্যগণকে নিহত করেন তিনিই 'দুর্গা'। অথবা—দুর্গশব্দ বিপত্তি বোধক, আকার নাশবাচক, পূর্ব্বকালে দেবাসুর সংগ্রামে তিনি দেবগণের অশেষ বিপত্তি বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া জ্ঞানীগণ তাঁহাকে দুর্গা বলিয়া কীর্ত্তন করেন (তাই অসুর প্রপীড়িত দেবগণ একদিন নিজের নিজত্ব ভুলিয়া জগতের সহিত একপ্রাণে ভক্তি বিনম্রভাবে সমস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—

"কিং বর্ণয়াম তবরূপ মচিন্ত্যমেতৎ,
কিঞ্চাতি বীর্য্য মসুর-ক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি,
সর্ব্বেষু দেব্যসুরগণাদিকেষু॥
দৃষ্টৈবকিন্নভবতী প্রকরোতিভস্ম,
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিনোষি শস্ত্রং।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোপিহি শস্ত্রপূতা

ং মতির্ভবতি তেষপি তে হৃতি সাধ্বী
যা সাম্প্রতং চোদ্ধত দৈত্যতাপিতৈ
রস্মাভিরীশাচ সুরৈর্ণমস্যতে।
যাচস্মৃতা তৎক্ষণ মেব হন্তিনঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তি বিনম্রমূর্ত্তিভিঃ।
দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে,—
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ সমং নয়াশু,
উৎপাত পাক জনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥" চণ্ডী।

অর্থাৎ—হে দেবি! বিষ্ণুবিরিঞ্চি প্রভৃতিও যে রূপের বিষয় চিন্তা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই তোমার সেই অসীম অচিন্তণীয় বিশ্ববিচিত্র রূপের কথা আমরা কি বলিব? অসুরবংশধ্বংসসাধিনী অমিত শক্তির বিষয়ই বা কিরূপে বর্ণনা করিব? সকল দেবাসুর সংগ্রামে প্রকটিত বিচিত্র চরিত্রের কথাই বা কত বলিব?—

মাগো! তুমি কি কটাক্ষ মাত্রেই সমস্ত অসুরদিগকে তুলারাশির ন্যায় ভস্মীভূত করিতে পার না! (অবশ্যই পার) তথাপিও তুমি শত্রুদের উপর শস্ত্র নিক্ষেপ কর বলিয়া আমাদের মনে হয়,—"রিপুগণও পুণ্যময় শস্ত্রাঘাতে নিস্পাপ হইয়া অনন্তস্বর্গধামে চলিয়া যাউক"—তোমার এরূপ অপার দয়াদ্র্র্বুদ্ধিই তাহার কারণ। যাঁহার স্মরণমাত্রেই সকল প্রকার বাধা বিপত্তি বিদুরিত হয়, সম্প্রতি অতিদৃপ্ত দৈত্যকুলকর্ত্তৃক নিপীড়িত আমরা ভক্তি বিগলিত ভাবে সেই জগদীশ্বরীকে নমস্কার করিতেছি। হে দুর্গতিনাশিনি, দেবি! তুমি আমাদের প্রতি সুপ্রসন্না হও,—আমাদিগকে সর্ব্বদা বৈরি-ভয় হইতে রক্ষা কর, স্মরণমাত্রেই সম্প্রতি যেরূপ অসুরদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ, সেরূপ অবিলম্বে সমস্ত জগতের পাপও উল্কাপাত ভূকম্পাদি নাভসিক উৎপাত জনিত দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুঃখ-নিদান সকল বিনষ্ট কর।

দুর্গানাম মাহাত্ম্য।

সেই 'দুর্গা'—নাম জপ, ও স্মরণের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন প্রসঙ্গে মুণ্ডমালাতন্ত্রে লিখিত আছে,—

"দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গানাম পরং মনুং ।
যোজপেৎ সততং চণ্ডি ! জীবন্মুক্তঃ সমানবঃ
মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদি সঙ্কটে ।
মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয় সমুত্থিতে ॥
যঃ স্মরেৎ সততং দুর্গাং জপেৎ যঃ পরমংমনুং
সজীবলোকে দেবেশি ! নীলকণ্ঠত্বমাপ্নুয়াৎ ॥"

চিন্ময়ী সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী দুর্গাদেবীর বাচক—মহামন্ত্র "দুর্গা"—এই নামটি যে ব্যক্তি তদ্গতচিত্তে (দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা—এইভাবে) সতত জপ করেন, হে চণ্ডি ! তিনি সংসারে থাকিয়াও সনক, জনক প্রভৃতির ন্যায় জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। দৈবিক বা নাভসিক মহোৎপাতে, গলিত কুষ্ঠ প্রভৃতি মহারোগে, রাজদণ্ড নিবন্ধন কারাগারাদি মহাবিপদ, চৌর, দস্যু, এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আক্রমণজনিত মহাসঙ্কট, মহাদুঃখ, স্ত্রীপুত্রাদির বিয়োগ জন্য শোক, সর্ব্বস্ববিনাশশঙ্কা নিমিত্তক মহাভীতি প্রভৃতি সমুপস্থিত হইলে যে মানব দুর্গাকে নিরন্তর স্মরণ বা দুর্গা মন্ত্র জপ করেন তিনি অবশ্যই সে সকল বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। দেবেশি ! অধিক কি বলিব ? এ পরম মন্ত্র জপের প্রভাবে জগতে মনুষ্যগণ 'নীলকণ্ঠত্ব' অর্থাৎ পরমশিবত্ব পর্য্যন্ত পাইবার অধিকারী হইতে পারেন।

তন্ত্ররাজ রুদ্রযামলতন্ত্রে কথিত আছে—

"তবর্গস্যতৃতীয়োহর্ণঃ পঞ্চমস্বরসংযুতঃ ।
কবর্গস্য তৃতীয়োহর্ণঃ বহ্নিস্তস্যোপরিস্থিতঃ ॥
দ্বিতীয় স্বরসংযুক্তং নামেদং পরিকীর্ত্তিতং ।
আরোগ্যস্যচ সম্পত্তেঃ জ্ঞানস্য চ মহোদয়ে ।
নামেদং পরমো হেতুর্মুক্তয়ে ভবসঙ্গিনাং ।
কলিকালে বিশেষেণ মহাপাতকিনামপি
নিস্তারবীজং বিজ্ঞেয়ং নাম সংস্মরণং প্রিয়ে !
পরদার রতোহপিস্যাৎ পরদ্রব্যাপহারকঃ ।
সোহপি পাপাৎ প্রমুচ্যেত যদিস্যাদতি পাতকী ।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ—
এতেভ্যোহপি বিমুচ্যেত যদি নাম স্মরেৎ সুধীঃ ।"

পঞ্চম স্বরবর্ণ উকার যুক্ত, ত বর্গের তৃতীয় বর্ণ দ,—ক বর্গের তৃতীয় বর্ণ

গ—তাহার বহ্নি অর্থাৎ র—তৎপর দ্বিতীয় স্বর আকার সংযোগে এই "দুর্গা"—নাম বিহিত হয়। এ নাম আরোগ্য সম্পত্তি, বৈরাগ্য সম্পাদক, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং পরিণামে অনাদি বিচিত্র বাসনা বশীভূত পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণশীল জীবগণের পরম মুক্তির কারণ হইয়া থাকে; বিশেষতঃ দুরন্ত কলিযুগে মহাপাতকীদের পক্ষেও এ দুর্গা নামের সম্যক্ স্মরণ পরিত্রাণের উপায় বলিয়া জানিবে। পরস্ত্রীগামী পরস্বাপহারী এমন কি, যদি অতি পাপী (মাতৃগামী, দুহিতৃগামী, স্নুষাগামী) হয়, নাম প্রভাবে সেও পাপ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণাপহরণ, গুর্ব্বঙ্গনা গমন (বিমাতৃগমন) প্রভৃতি পাপ হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারে, যদি বিশুদ্ধ-জ্ঞানে এই নাম স্মরণ করেন।

দুর্গার স্বরূপ।

যাঁহাকে অচিন্তনীয়া, অদ্বিতীয়া,—'চিন্ময়ী—আনন্দময়ী' বলিয়া সর্ব্বশ্রুতি স্মৃতিতে নির্দ্দেশ করেন, তিনিই 'দুর্গা' তিনি মহামায়া বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া বিশ্বমূর্ত্তি, অনন্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয়ের পরম কারণ বলিয়া তিনি—বিশ্বেশ্বরী' সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিশক্তি, স্থিতিকালে পালন শক্তি, সংহার সময়ে সংহৃতি শক্তি, তিনি মূর্ত্তমাত্রের আকর্ষণী শক্তি, বহ্নির দাহিকা শক্তি, সূর্য্য চন্দ্র, নক্ষত্রে প্রভাশক্তি, জলের শীতলা শক্তি, বায়ুতে প্রবাহিণী শক্তি, প্রাণীর প্রাণশক্তি, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য শক্তি—তপস্বীর তপস্যা শক্তি, ক্ষত্রিয়ে বাহুশক্তি, দাতার দাতৃত্ব শক্তি, ভক্তের ভক্তি-শক্তি, সুতরাং তিনি—'সর্ব্বশক্তি স্বরূপিনী'। 'তিনি সর্ব্বজীবে বুদ্ধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ক্ষমা, জুগুপ্সিত কার্য্য করণে লজ্জা, স্মৃতি, ভ্রান্তি, শান্তি, কান্তিরূপে বর্ত্তমান। এ সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া তিনি সর্ব্বভূতে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজমানা। তিনিই স্বধাস্বরূপে পিতৃকার্য্যে পিতৃলোকের কব্য প্রাপয়িত্রী, যজমানের যজ্ঞে 'স্বাহা' স্বরূপে দেবগণের হব্যবহনকারিণী, সুকর্ম্ম দুষ্কর্ম্মে সম্যক্ ফলদাত্রী, অবিদ্যান্ধকার বিনাশিনী মহা বিদ্যাস্বরূপে মুমুক্ষুগণের পরম কৈবল্যদায়িনী, সুতরাং দুর্গাদেবী সকল কল্যাণময়ী। তাঁহার এরূপ সর্ব্বাত্মকতা, সর্ব্বকারণত্বতা ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপতা প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিয়াই দেবগণ বলিয়াছিলেন,—

"সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্য স্ত্রাহিনো দেবি দুর্গে দেবি নমোহস্তুত ॥"

সেই দুর্গা দেবী আবার দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা দশভুজাদি নানারূপ ধারিণী মূর্ত্তিমতী। তিনি অনন্ত লীলাময়ী তাঁহার রূপের সংখ্যা করা কার সাধ্য! ঋষিগণ ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি বলে জীবের সর্ব্ব কল্যাণময়ী যে যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন তাহারই ধ্যান-মন্ত্র রচনা করিয়া লোকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাই পুরাণাদিতে সাধনা ও সাধক ভেদে বহু প্রকার ধ্যান লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। যদিও তিনি স্বরূপতঃ 'চিন্ময়ী' তাঁহার উৎপত্তি বিনাশ নাই এবং কোনরূপ অঞ্জন বা রূপ নাই; তথাপি উচ্ছৃঙ্খল অসুর কুল দলন, ও জগতের মহোৎপাতাদি বিনাশ মানসে বিশেষতঃ ভক্তগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সেই শিবানী ভগবতী সশস্ত্রে যুগে যুগে অবতীর্ণা হইয়া থাকেন। কখনও বা বরাভয়করা সৌম্যমূর্ত্তি দ্বিভুজা, কখন—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হস্তে রক্তবস্ত্র পরিধানা নানালঙ্কার ভূষিতা চতুর্ভুজা, কখনও বা ষড়্ভুজা অষ্টভুজা, রূপে প্রকাশমানা। ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণ বাণ, শক্তি, খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু হস্তে, অতসী কুসুম বর্ণা কৃপা-বিগলিত ত্রিনয়না, বিচিত্রভূষণ ভূষিতা সিংহবাহিনী দশভুজা সর্ব্বকাম প্রদারূপে প্রতি বর্ষে আমাদের পূজনীয়া। দেবাসুর সংগ্রামে তিনি প্রয়োজনানুসারে নানারূপ ভয়ঙ্কর, সৌম্য ও বিমিশ্র বেশে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন। সেই নির্ব্বিকার চৈতন্যশক্তি হইতে সাকার বিশ্বমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। সেই চিন্ময়ী শক্তি হইতে প্রয়োজনানুসারে দ্বিভুজা চতুর্ভুজা দশভুজা শতভুজা সহস্রভুজার উৎপত্তি অসম্ভব হইবে কেন? তাই করুণা বারিধি দুর্গাদেবী একদিন বলিয়াছেন,

"ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরং।
... ...
ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি,
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ং ॥"

ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য আমি মহাসুরদিগকে বধ করিব এরূপে যে কোন সময়ে যে কোন দুশ্চরিত্র কর্ত্তৃক জগতের উৎপাত উৎপন্ন হইবে সে সময় আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া সে সমস্ত বিনাশ করিব।

অহো! বিশ্ববাসীর পক্ষে কি আশ্বাসের কথা!!! কি নির্ভয়ের কথা!

শুনিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়। এই মাভৈ বাণীতে উৎফুল্লে শতধা নাচিয়া উঠে, মৃত শরীরেও যেন সহস্রধা শোণিত প্রবাহিত হয়! আমাদের জগজ্জননী শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্ম ধনুঃ কুঠারাদি হস্তে অভয় মূর্ত্তিতে সিংহবাহিনী রূপে ধরাতলে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। শুধু তা নয়, তিনি সর্ব্বক্ষণে যোগী ও ভক্তগণের হৃদয় মন্দির আলোকিত করিয়া তাঁহাদের অভিমত প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন। স্বভাবতঃ অগ্নি শূন্য অরণিকাষ্ঠ মন্থনে যেরূপ সাকার বহ্নি মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়; তদ্রূপ যোগী ও ভক্তগণের পরিশুদ্ধ চিত্তসঙ্ঘর্ষে রূপহীন চৈতন্য শক্তি হইতেও সাকারা দ্বিভূজা দশভূজাদি মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তাই আর্য্যগণ তাঁহার সেই অভয় ও সর্ব্বকুশল মূর্ত্তি মৃত্তিকা দ্বারা আত্মবৎ সেবায় প্রাণ শীতল করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন, সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিনী চিন্ময়ীর এ প্রতিবিম্ব সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিলে আমরা সর্ব্বদা তাঁহার চরিত্র ও বিশ্বরূপতার কথা ভাবিতে পারিব।

দুর্গাপূজা প্রকাশ।

জীবের ক্ষুধাবৃত্তির ন্যায় সহজতঃ প্রকাশমানা উপাসনা বা অর্চ্চনা প্রবৃত্তির মূল কারণ পর্য্যালোচনায় এবং পুরাবৃত্ত পাঠে আমাদের মনে হয়, দিবারাত্রির ন্যায় প্রবাহমান অনাদি সৃষ্টি বা যুগতরঙ্গের মধ্যে এই চিন্ময়ী বিশ্বনিয়ন্ত্রী দুর্গার পূজা কোন কালেই বিচ্ছিন্ন হয় নাই। স্বরূপবর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—'তিনি সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজননী, বৃত্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজমানা'—সুতরাং বাহ্য বা মানস যে কোন উপহারে জীবের নিকট ব্যষ্টি বা সমষ্টি শক্তি নিত্যপূজিতা। জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, গ্রহ নক্ষত্রে যাঁহার অপার শক্তির সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে, সেই প্রত্যক্ষ দেবতাকে পূজা না করিয়া কোন্ পামর উপেক্ষা করিতে পারে? যে নৈসর্গিকী মাতৃভক্তি তরতমভাবে নিখিল মানবে পরিলক্ষিত হয়, তাহাই একদিন সহস্রধারায় বিশ্বজননীর দিকে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলে। দুরতিক্রমণীয় অনন্ত ভবযাতনায় নিষ্পেষিত হইয়া কোন্ জীব একদিন সেই আনন্দময়ী জগদম্বার অভয়চরণকমলে ভক্তি বিনত মস্তকে অঞ্জলি প্রদান না করিয়া স্থির হইতে পারে? সৃষ্টিকর্ত্তাই স্বয়ং প্রতি সৃষ্টিতে তাঁহার পূজা প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন—

"প্রথমে পূজিতা দেবী কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
বৃন্দাবনেচ সৃষ্ট্যাদৌ গোলকে রাস মণ্ডল

মধুকৈটভ ভীতেন ব্রহ্মনা সা দ্বিতীয়তঃ
ত্রিপুরপ্রেষিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিনা
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেণ শাপাদ্দুর্ব্বাসসঃ পুরা।
চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যাভগবতী সতী॥
তদা মুণীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈঃ দেবৈশ্চ মনু মানবৈঃ
পূজিতা সর্ব্ববিশ্বেষু বভূব সর্ব্বতঃ সদা।

কালান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা
রাজ্ঞা মেধসশিষ্যেণ মৃন্ময্যাঞ্চ সরিত্তটে॥"

নির্ব্বিকার পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির প্রারম্ভে মহামায়া বা প্রকৃতিরূপিণী সর্জ্জন-শক্তি দুর্গাদেবীকে প্রথম পূজা করেন; আবার তিনিই লীলান্তরে যশোদা-নন্দন সাজিয়া বৃন্দাবনে ও গোলোক রাসমণ্ডলে অনেকবার তাঁহার পূজা করিয়াছেন।

অনন্ত শয়ন শায়ী বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে উৎপন্ন মধু ও কৈটভ দৈত্য কর্ত্তৃক ভীত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা দ্বিতীয়তঃ পূজা করেন। তৃতীয়ে—ত্রিপুরাসুরের অত্যাচারে ক্রোধিত মহাদেব, চতুর্থে দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে হতশ্রী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। সে সময় সমস্ত বিশ্বে সর্ব্বদিকে মুণীন্দ্র, সিদ্ধ, দেব, মনু, মানব কর্ত্তৃক দেবীর পূজা সম্পাদিত হইয়াছিল। তৎপর, মেধস মুনির শিষ্য মহাত্মা রাজা সুরথ, মৃণ্ময়ীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সরোবরের তীরে বিবিধ উপচারে পূজা করেন। রাবনারি শ্রীরামচন্দ্রের শারদীয়া দুর্গাপূজার ইতিবৃত্ত বিশ্ববিশ্রুত। তাই কৃপাপরবশ শাস্ত্রকারগণ মর্ত্ত্যদিগকে এ মঙ্গলময় উপদেশ বিতরণ করিয়াছেন,—

"বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং স্থাপনঞ্চ বিসর্জ্জনং।
যো মোহাদথবালস্যাদ্দেবীং দুর্গাং মহোৎসবে॥
ন পূজয়তি দম্ভাদ্বা দ্বেষাদ্বাপ্যথ ভৈরব।
ক্রূদ্ধাভগবতী তস্য কামানিষ্টান্ বিহন্তিবৈ॥
কৃত্বৈবং পরমামাপুঃ নিবৃত্তিং ত্রিদিবৌকসঃ।
এবমন্যৈরপি সদা দেব্যাঃ কার্য্যং প্রপূজনং।
বিভূতিমতুলাং লব্ধুং চতুর্ব্বর্গ প্রদায়কং॥

সাচত্রিধা, শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিকীর্ত্তিতা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসীচেতি বিশ্রুতিঃ॥
সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা॥
সুরামাংসাদ্যুপহারৈ র্জপযজ্ঞৈ র্বিনাতুযা।
বিনা মন্ত্রৈস্তামসীস্যাৎ কিরাতানান্ত সম্মতা।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ॥
এবং নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ
স্বয়ং বাপ্যন্যতো বাপি পূজয়েৎ পূজয়েত বা॥"

অর্থাৎ—প্রতি বর্ষে দুর্গাদেবীর পূজা বিসর্জ্জনাদি যথাবিধি সমাপন করিবে; মোহ, আলস্য, দম্ভ, বা দ্বেষবশতঃ যে ব্যক্তি দেবী পূজা না করে, ভগবতী তাহার প্রতি রুষ্টা হইয়া অভীষ্ট নষ্ট করেন। স্বর্গবাসীরা এরূপে দেবীর পূজা করিয়া পরম নিবৃত্তি অর্থাৎ কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং মনুজগণেরও পরমৈশ্বর্য্য লাভেচ্ছায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এ চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদায়িনী দুর্গাপূজা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসীভেদে এই চণ্ডিকা পূজা তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে। নিরামিষ নৈবেদ্য, জপ, যজ্ঞাদি দ্বারা সম্পাদিত পূজা সাত্ত্বিকী, আমিষযুক্ত নৈবেদ্য ও বলিদানাদি বিবিধ উপচারে রাজসী, এবং জপ, যজ্ঞ, মন্ত্রাদি বিহীন, মদ্যমাংসাদি উপচারে আচরিত পূজাই তামসী নামে অভিহিত।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এমন কি বিবিধ ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃকও তিনি পূজিতা হইয়া থাকেন। কর্ত্তা স্বয়ং তাঁহার পূজা করিবেন অথবা অন্য দ্বারা পূজা করাইবেন।"

এ সকল শাস্ত্রীয় বিধানুসারে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে দুর্গাপূজা সকলের পক্ষেই নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত; কারণ, "বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং" এরূপ দ্বিরুক্তি ও 'মোহাদ্বা' ইত্যাদি নিন্দা-শ্রুতি থাকায় এই পূজার নিত্যতা, গ্রহপীড়াদি নিমিত্তপাতে কর্ত্তব্য বলিয়া নৈমিত্তিকতা, এবং "বিভূতি মতুলাংলব্ধ্বং" এই অংশ দ্বারা কাম্যতা জ্ঞাপিত হইয়াছে।

এ সনাতন শাস্ত্রবাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই হিন্দুগণ প্রতিবর্ষে

শারদীয় পুণ্য তিথিতে শঙ্খ ঘণ্টার পবিত্র ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রধূপিত পবনমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া "দুর্গেদেবি! সমাগচ্ছ" মন্ত্রে জগদম্বাকে আহ্বান করিতে থাকেন। কি সুরম্য হর্ম্ম্যে, কি দেবায়তনে, কি তীর্থে, কি পর্ণকুটীরে কোথাও তাঁহার সুমধুর আবাহনধ্বনি বিলুপ্ত হয় না। সে সময় জগতীতল সকল প্রকার শোক, দুঃখ, হিংসা, দ্বেষ বিস্মৃতির অগাধ গহ্বরে ডুবাইয়া আনন্দময়ীর অনন্ত আনন্দ-প্রস্রবণে ভাসিতে থাকে; মৃত কঙ্কালেও যেন তড়িদ্বেগে নবজীবন সঞ্চারিত হইতে থাকে। অহো! কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয়-স্মৃতি! কি সাম্যপ্রকৃতি! কি ধনী, কি দরিদ্র কোন হিন্দুই যথাশক্তি মধুমক্ষিকার ন্যায় উপচার সংগ্রহ করিয়া ঘটে, পটে প্রতিমায় প্রতিবিম্বিতা চিন্ময়ীর পূজা না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না; এমন কি, এদেশের ভিক্ষাশীগণও ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর এ বিশ্ববন্দ্য শ্রীচরণকমলে একদিন (নবমী দিন) তিনবার চন্দনবিলেপিত বিল্বদলাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকে। ভক্তাধীনা জগন্মাতা ভক্তোপহৃত কিছুই উপেক্ষা করেন না; পরন্তু তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। তাই জনশ্রুতি আছে—ভাববিগলিতা ভগবতী 'একদিন রাজপ্রাসাদের আড়ম্বরপূর্ণ শত শত উপকরণ উপেক্ষা করিয়া এক ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে ক্ষুধার্ত্তা বালিকার ভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া নিবেদিত শাকান্ন অমৃত জ্ঞানে ভক্ষণ করিয়াছিলেন'—তাই বলিতেছিলাম, এই দুর্গাপূজা কোনকালেই বিছিন্ন হইবার নহে, যতদিন বিশ্বের চৈতন্যশক্তি বিদ্যমান থাকিবে, তত দিনই শারদীয় পূর্ণশশী মানবদিগকে সেই পূজার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আবহমানকাল যে পূজার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন; কৃপাময়ীর কৃপাবিতরণের অভাবেই হউক, অথবা অনৈসর্গিক কারণ কূটসংক্রান্তির ফলেই হউক ইদানীং কোন কোন লোক এ দুর্গোৎসবকে অপব্যয়ের তালিকা বা অসভ্যের প্রক্রিয়া বলিয়া প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে আমাদের আর একটি বক্তব্য শেষ করিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানদুর্ব্বল কতকগুলি লোকের ধারণা 'এই দুর্গাপূজা মাত্র শাক্তদিগেরই কর্ত্তব্য, এমন কি তাঁহার নাম গ্রহণ বা প্রণাম করা পর্যন্ত তাহাদের পক্ষে গর্হিত কার্য্য, ইহার কারণ, শাস্ত্র পর্য্যালোচনার অভাব বা সূক্ষ্মভাবে

শাস্ত্রীয় মর্ম্মের সম্যক্ অনুপলব্ধি; আমাদের বিশ্বাস, দুর্গা ও রাধার সহস্র নাম মাত্র পাঠ করিয়াও বুঝিতে পারিবেন যে বৈষ্ণবীশক্তি দুর্গা তাঁহাদের চির-আরাধ্যা,--

পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, নন্দকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"বৈকুণ্ঠে সা মহা সাধ্বী গোলকে রাধিকা সতী।
মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে, দক্ষকন্যা সতীচ সা॥
সা দুর্গা মেনকা-কন্যা দৈত্য-দুর্গতিনাশিনী।
সা বাণী সাচ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা॥
মদ্ভক্তানাং ভক্তি-শক্তি র্ময়িভক্তিপ্রদা সদা॥"

অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী পূর্ব্বোক্তা নারায়ণীশক্তিই বৈকুণ্ঠে মহা সাধ্বী রূপে বর্ত্তমানা, আবার তিনিই অপর মুর্ত্তিতে গোলোকবিহারী হরির অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী রাধিকা সতী। মর্ত্ত্যের প্রতি দেব-নিকেতনে প্রফুল্ল-প্রতিমা, পদ্মাসনস্থিতা রত্নালঙ্কার ভূষিতা বরদায়িনী লক্ষ্মীস্বরূপে মানব কর্ত্তৃক নিত্য পূজিতা, ক্ষীরোদে ক্ষীরোদশায়ীর পার্শ্বচারিণী মহালক্ষ্মী। তিনিই মানবের সর্ব্বকল্যাণ কামনায় মানবীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দক্ষরাজের দুহিতৃরূপে সতী নামে বিশ্ববিশ্রুতা হইয়াছেন। সেই সতী বিশ্বস্তুতি-সম্পত্তি, পতির অবমাননায় দেহত্যাগ করিয়া দম্পতীযুগলের যুগযুগান্তব্যাপিনী কঠোরতর যোগ-চর্য্যার অমৃতময় ফল প্রদান করিবার জন্য এক সময় হিমালয় গৃহে পুত্রীরূপে অবতীর্ণা হইয়া বিশ্বজ্যোতিতে মেনকার ক্রোড়দেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি বাণী,—তিনিই আবার কালান্তরে সত্যবানের গেহিনী, নিখিল মহিলাকুলের শিক্ষয়িত্রী 'সাবিত্রী', তিনি সুসংযত বিপ্রজনগণের মানসমন্দিরে অধিষ্ঠান করিয়া প্রত্যক্ষ দেবতারূপে বিরাজ করেন। সেই দুর্গা আবার ভক্তগণের ভজন-শক্তি, এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণ-ভক্তি প্রদায়িনী।

কোন কোন পুরাণে কৃষ্ণের প্রতি পার্ব্বতীর উক্তিতে জানা যায়,—

"একাহং রাধিকারূপা গোলকে রাসমণ্ডলে।
রাস-শূন্যঞ্চ গোলোকং পরিপূর্ণং কুরুপ্রভো।
পরিপূর্ণতমাহঞ্চ তব বক্ষঃস্থলস্থিতা।
তবাজ্ঞয়া মহালক্ষ্মী রহং বৈকুণ্ঠবাসিনী॥
স্বরস্বতীচ তত্রৈব বামপার্শ্বে হরেরপি।
তবাহং মনসাজাতা সিন্ধুকন্যা তবাজ্ঞয়া॥"

একমাত্র আমিই গোলকের রাসমণ্ডলে রাধিকারূপে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করি, অতএব হে প্রভো! সম্প্রতি রাস-শূন্য গোলকধাম রাসক্রীড়া কৌতুকে পরিপূর্ণ করুন্। যেহেতু, আমি পরিপূর্ণতমা, আপনার বক্ষঃস্থলবিহারিনী, আপনার আজ্ঞানুসারেই আমি বৈকুণ্ঠবাসিনী মহালক্ষ্মী এবং হরির বামপার্শ্বে সরস্বতীরূপা, আপনার সঙ্কল্প ও আদেশ ক্রমেই সমুদ্রমন্থনকালে সিন্ধু-কন্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছিলাম।

আবার এ সকল ভাবেরই প্রতিধ্বনি গ্রন্থান্তরে হরপার্ব্বতী সংবাদে শুনিতে পাওয়া যায়,—

"বৈকুণ্ঠেঽহং মহালক্ষ্মীঃ গোলকে রাধিকাস্বয়ং।
শিবাহং শিবলোকেঽপি ব্রহ্মলোকে সরস্বতী।
অহং নিহত্য দৈত্যাংশ্চ দক্ষকন্যা সতীপুরা।
ত্বন্নিন্দয়া পুরাত্যক্তা সাচাহং শৈলকন্যকা॥
রক্তবীজস্য যুদ্ধেচ কালীচ মূর্ত্তিভেদতঃ।
সাবিত্রী বেদমাতাহং সীতা জনককন্যকা॥
রুক্মিণী দ্বারাবত্যাঞ্চ ভারতে ভীষ্মকন্যকা।
ধর্ম্মপত্নীচ কৃষ্ণস্য পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে॥" ইতি—

পার্ব্বতী শঙ্করকে বলিলেন,—'আমি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, গোলকে স্বয়ং রাধিকা, শিবলোকে শিবাণী, ব্রহ্মলোকে সরস্বতী, আমি পূর্ব্বকালে দৈত্য-দিগকে দলন করিয়া দক্ষরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তৎপরে তোমার নিন্দাশ্রবণে যোগবলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া শৈলরাজের কন্যা হইয়াছিলাম। রক্তবীজের যুদ্ধে আমিই কালী মূর্ত্তিতে রক্তপান করিয়া-ছিলাম। আমি বেদ-মাতা সাবিত্রী, সীতারূপে জনকরাজের ঘরে কন্যারূপে অবস্থান করিয়াছি। দ্বারাবতীতে রুক্মিণী, ভারতে ভীষ্মকন্যা, পবিত্র শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপত্নী হইয়া বিবিধ লীলা সম্পাদন করিয়াছি।

"বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং,
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বং।
বিশ্বেশ বন্দ্যা ভবতী ভবন্তি,
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তি নম্রাঃ॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা,—
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।'

সম্মোহিতং দেবি, সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈপ্রপন্নাভুবি মুক্তি হেতুঃ ॥
সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥ ইতি—

শ্রীশিবঃ—

শ্রীরমেশচন্দ্র সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

মহালয়া।

আশ্বিন মাসে গৌণচান্দ্র কৃষ্ণপক্ষ—অপর পক্ষ বা পিতৃপক্ষ বলিয়া অভিহিত। ভাদ্রমাসের ব্রতপক্ষের পর এবং আশ্বিন মাসের দেবীপক্ষের পূর্ব্বে যে গৌণচান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয় আমাদের শাস্ত্রকারগণ তাহাকেই পিতৃপক্ষ কিংবা অপর পক্ষ বলিয়া গিয়াছেন। এই পক্ষে প্রতিদিন পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যদি এই অপরপক্ষে প্রত্যহ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া করিতে শক্তি না হয় তাহা হইলে দশদিন অথবা পাঁচদিন কিংবা তিনদিনও শ্রাদ্ধ করিতে হয়, ইহাতেও যদি শক্তি না হয় তাহা হইলে অন্ততঃ কলাকাটা অমাবস্যা অর্থাৎ শেষদিন শ্রাদ্ধ নিশ্চয়ই করিবে; এই শেষ দিনটীই আমাদের মহালয়া। যথা ঃ—

"অন্বয়ুক্ কৃষ্ণপক্ষেতু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ দিনে দিনে।
ত্রিভাগহীনং পক্ষং বা ত্রিভাগং ত্বর্দ্ধমেব বা"

অর্থাৎ আশ্বিন মাসে গৌণচান্দ্র কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে অসমর্থ হইলে এক পক্ষের তিন ভাগের ভাগ অর্থাৎ দশ দিবস, তাহাতেও অসমর্থ হইলে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ পাঁচ দিন, তাহাও না পারিলে তদৰ্দ্ধ অর্থাৎ তিনদিন শ্রাদ্ধ করা উচিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবস পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়; তাহাতে অশক্ত হইলে কৃষ্ণষষ্ঠী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত দশ দিন,—তাহাতেও অসমর্থ বিবেচনা করিলে কৃষ্ণ একাদশী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত পাঁচ দিন,—ইহাও না পারিলে কৃষ্ণ ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী এবং অমাবস্যা এই তিন দিন শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে। আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ কলির জীবের শক্তাশক্ত ভেদে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের চারিটী কল্প স্থির করিয়াছেন। এই চারিটী কল্পে যে কোন কল্পে শ্রাদ্ধাদি

করিলে অপরপক্ষ-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে ফলাধিক্য। এক্ষণে এরূপ পক্ষব্যাপী শ্রাদ্ধ ক্রিয়া প্রায় কাহাকেও অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায় না। তবে অনেকে এই পনর দিন পিতৃলোকের তর্পণ মাত্র করিয়া থাকেন, এবং কেবল মহালয়া—অমাবস্যার দিনই পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। তাই এই মহালয়া হিন্দুদিগেয় একটী পর্ব্ব দিন। শাস্ত্রে, অসমর্থ হিন্দু সন্তানগণের প্রতি বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন যে উল্লিখিত চারিটী কল্পের কোন কল্পেই যদি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না হয় তাহা হইলে কেবল মাত্র মহালয়া অমাবস্যাতে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে। সম্বৎসরপ্রদীপে কথিত হইয়াছে যে ঃ—

"অমাবস্যাস্তু কন্যার্কে তীর্থপ্রাপ্তৌ তথা নৃপ।
কৃত্বা শ্রাদ্ধং বিধানেন দদ্যাৎ ষোড়শ পিণ্ডকং॥"

অর্থাং হে রাজন্ আশ্বিন মাসের অমাবস্যাতে এবং তীর্থ গমনে—সেই পূত স্থানে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া ষোড়শ পিণ্ড দান করিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই সময়ে হিন্দু মাত্রেরই পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে এই অমাবস্যাকে মহালয়া বলে কেন? ইহা পিতৃলোকদিগের বিশেষ আশ্রয় স্থান; সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ মহালয়া শব্দের যৌগিক অর্থ এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন ঃ—

"মহান্ পিতৃণাং আলয়ো যত্র"

অর্থাৎ যে তিথিতে পিতৃপুরুষগণের মহান্ আলয় অর্থাৎ বাসস্থান, তাহাকেই মহালয়া বলে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে পিতৃগণ এই সময়ে যমলোক পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এবং দীপান্বিতা অমাবস্যাতে অর্থাৎ যে দিন শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা হইয়া থাকে সেই দিন পর্য্যন্ত পিতৃলোকগণ মর্ত্ত্যভূমে অবস্থান করতঃ সেই রাত্রে স্ব স্ব স্থানে গমন করেন। তাই দীপান্বিতা অমাবস্যাতে যে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয় তাহার মন্ত্রে এই ভাব স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে,—

"যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে।
উজ্জ্বল জ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তুতে"॥

অর্থাৎ যে পিতৃপুরুষগণ মহালয়া তিথিতে যমলোক পরিত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতে আগমন করেন তাঁহারা এই উজ্জ্বল জ্যোতিদ্বারা পথ দর্শন করিয়া আপন আপন স্থানে গমন করুন।

কাল-সহকারে আমাদিগের মধ্যে অনেকে আজকাল পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি বিষয়ে তাদৃশ আস্থাবান নহেন। তাঁহারা মনে করেন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে দান করা প্রয়োজন কি? তাঁহারা কি আর সে সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকেন? কিন্তু সকল জাতি এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ উৎসবাদি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তবে আমরা যাহাকে শ্রাদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করি তাঁহারা তাহাকে "Anniversary" বলিয়া থাকেন—আমরা হিন্দু তাই তিথি ধরিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করি, তাঁহারা দিন ধরিয়া বার্ষিক উৎসব করিয়া থাকেন, এই মাত্র প্রভেদ।

যখন আমরা পিণ্ডদান এবং জলাঞ্জলি দ্বারা তর্পণাদি করি, তখন পিতৃগণ 'ভাস্বর মূর্ত্তি সূর্য্যরূপে' আমাদের মানসাকাশে উদিত হইয়া আমাদের যথাসাধ্য প্রদত্ত শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করেন। আমরা পিতৃগণের মানসপ্রত্যক্ষতা লাভে যে কি আনন্দ অনুভব করি, তাহা এ আর সামান্য লেখনির দ্বারা কিরূপে প্রকাশ করিব! আমরা পিতৃগণের আশীর্ব্বাদে চিরদিন সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিব, ইহা স্থির নিশ্চয়। ইহাতে সন্দিহান হইলে আমাদের আর উপায়ন্তর নাই। অতএব এই অপর পক্ষ আমাদিগের অতি পবিত্র কাল! এ সময়ে পুত্রকৃত শ্রাদ্ধ তর্পণাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া শাস্ত্রকারগণ ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীউপেন্দ্র মোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

নবদ্বীপে অষ্টপ্রহর।

শুক্রবার রাত্রি ৯টা ২৪ মিনিটের সময় গাড়ীতে উঠিয়া পৌনে বারটার সময় কৃষ্ণনগরে উপনীত হইলাম। কৃষ্ণনগর হইতে জলাঙ্গী বা খড়ে নদীর তীরস্থ স্বরূপগঞ্জ প্রায় ছয় মাইল। অশ্বযান যোগে নিবিড় জঙ্গল ও উন্মুক্ত প্রান্তর মধ্যস্থ পথে এই ছয় মাইল যাইতেও প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগিল। স্বরূপগঞ্জের ঘাটে নৌকায় উঠিলাম। আর এক ঘণ্টা কালের মধ্যে অর্থাৎ রাত্রি প্রায় তিনটার সময় আমাদের নৌকা শ্রীপাট নবদ্বীপ ধামের পদলগ্ন হইল।

নৌকাতেই শেষ রাত্রিটুকু যাপন করা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিলাম। কারণ সমস্ত নগরী তখন তমসাচ্ছন্ন ও সুষুপ্তি-মগ্ন। শুধু

পশ্চিমাকাশে বিনিদ্র শুকতারা বাঙ্গালার সেই পূর্ব্বতন রাজধানী, জ্ঞান মন্দির ও ধর্ম্ম-কেন্দ্রের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া নবদ্বীপের উপর ক্ষীণরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিল।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেই শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ স্মরণ করিয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। অপ্রশস্ত রাস্তা ধরিয়া প্রথমেই "নদের বাজার" দিয়া অগ্রসর হইলাম। বাজার তখনও খুলে নাই। ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে সোনার গৌরাঙ্গের গৃহদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বাটীটী সুবৃহৎ ও সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট! ভিতরে মধুর কণ্ঠে চৈতন্য মঙ্গল গীত হইতেছিল। নিস্তব্ধ প্রভাতে ভাব, সুর ও স্বরের মাহাত্ম্যে সে গান বড়ই মিষ্ট লাগিল। আগ্রহ সহকারে ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলাম—আর অমনি "সত্তেরা পয়সা ভেট লাগেগা"—ভোজপুরী কণ্ঠের এই কর্কশ আলাপে সমস্ত ভাব ছুটিয়া গেল। দেবতার সেবাইত প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ও সশরীরে বর্ত্তমান ছিলেন। অনুমতি হইল ব্রাহ্মণেতর জাতীয় সকলকেই সতের পয়সা করিয়া ভেট দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। আমরা বন্ধুগণ মধ্যে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ দুইই ছিলাম—কিন্তু এতদিন ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না। আজ শ্রীপাট নবদ্বীপ ধামে আসিয়া এই সপ্তমীর প্রাতে জানিলাম যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে সতের পয়সার পার্থক্য। আর ইহাও জানিলাম যে যে পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ জীবদ্দশায় ব্রাহ্মণ শূদ্র এমন কি যবন নির্ব্বিশেষে আপামর সর্ব্বসাধারণকে সমভাবেই কোল দিয়াছিলেন, সেই উদার হৃদয় ঠাকুর আমার, আজ সুবর্ণ কলেবর পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতির উপর "জিজিয়া" কর ধার্য্য করিতে শিখিয়াছেন!

প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু মন্দির মধ্যস্থ কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্কীর্ত্তন আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়াছিল। অগত্যা গোস্বামী প্রভুর প্রশংসা জ্ঞাপক মুদ্রিত ছাড় পত্রে স্বাক্ষর করিয়া এবং বিহিত দর্শনী দিয়া গৃহপ্রবিষ্ট হইলাম। অভক্ত আমরা, সোণার গৌরাঙ্গের ব্যাপার দেখিয়া তৃপ্ত না হইলেও সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া প্রীতিলাভ করিলাম।

সোণার গৌরাঙ্গের পার্শ্বস্থ ভবনটীর নাম শ্রীবাস অঙ্গন(১)। শ্রীবাস অঙ্গনের সম্মুখে যাইয়াই—

(১)। শ্রীবাস অঙ্গন পূর্ব্বে পুরণগঞ্জের দক্ষিণে রাধী কলুর পোতায়

"উঠিল মঙ্গল ধ্বনি শ্রীবাস অঙ্গনে
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে সিংহের গর্জ্জনে।"

এই কথাগুলি মনে পড়িল, আর সেই চারি শতাব্দী পূর্ব্বেকার "শান্তিপুর উঠু ডুবু করা ও নদে ভাসান" শ্রীচৈতন্য লীলার কথা স্মরণ হওয়ায় হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। দুঃখের বিষয় ভাব আসিয়াও জমিতে পাইল না। শুনিলাম ও বাটীতে সোনার গৌরাঙ্গের ভেট ১৭ পয়সা আর এ বাটীতে বুঝি মাটির গৌরাঙ্গ, (তখনও দ্বার খোলা হয় নাই ঠাকুর দর্শন-লাভ ঘটে নাই) তাঁহার ভেট ১৬ পয়সা। বাহির হইতেই তুলসীমঞ্চ সমন্বিত শ্রীবাস অঙ্গন দেখিয়া দূর হইতে নমস্কার করিয়া সেস্থান হইতে দূরীভূত হইলাম। সম্মুখেই জগন্নাথ মিশ্রের ও জগাই উদ্ধারের বাটী—সেখানেই বা কত পয়সা লাগে কে জানে? সে দিকে যাইলাম না।

নগরের কেন্দ্রাভিমুখে যাইয়া "পোড়ামা" তলায় উপস্থিত হইলাম। পাড়ামা নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত শাখা প্রশাখা বিলম্বিত করিয়া এক সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। সেই বিশাল তরুকোটরেই কুসুমদামাবৃতা জননী বিরাজমানা। স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়াময় দুই তিনখানি ফুল বিল্বপত্রের দোকান। সেই দোকান হইতে ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া ভক্তিমতী কুললক্ষ্মীগণ শিশুক্রোড়ে করিয়া শিশুরই মঙ্গল কামনায় মায়ের পূজা করিতেছেন। মা আমার কতকাল ধরিয়া সেখানে আছেন কে জানে? প্রবাদ এই যে এই বৃক্ষতলস্থ পাঠশালাতেই চৈতন্যদেব অধ্যয়ন করিতেন। ভাগ্যবান্ তরুরাজ আজিও মৌনভাবে তাহার সেই চারি শতাব্দীর পূর্ব্বের গৌরবময় দিনগুলির কথা ব্যক্ত করিতেছে। স্থানটী বড়ই শান্তিময়। (১) পোড়ামার পার্শ্বেই ভবতারণ ও ভবতারিণীর মন্দির সেটীও নিতান্ত আধুনিক নহে।

অবস্থিত ছিল, পরে তথা হইতে গঙ্গার চড়ায় এবং এক্ষণে বাজারের দক্ষিণে স্থাপিত হইয়াছে।

১। নবদ্বীপের বঙ্গ বিবুধজননী সভা মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতীকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আজকাল দেশবিখ্যাত হইয়াছে। এই সভার পূর্ব্বনাম ছিল "বিদগ্ধজননী (পোড়ামা) সভা।" সভার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ভালই হইয়াছে। নতুবা "বিদগ্ধ জননী" আমাদিগকে অতীতের পুণ্যময় স্মৃতিকাহিনী "পোড়ামা"কে বিস্মৃত হইতে প্রয়াস পাইত। মায়ের শিশু আমরা। আমাদিগের নিকট "পোড়ামা" শব্দই বেশী মিষ্ট—বেশী স্নেহমাখা বলিয়া বোধ হয়।

পথিপার্শ্বে সাহাদিগের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা অতিক্রম করিবার পর একটী বাটীর দ্বারদেশে দেখিলাম "মহাপ্রভুর টোল" লেখা রহিয়াছে। পাদুকা মোচন করতঃ আগ্রহের সহিত ভিতরে প্রবিষ্ট হইলাম। কিন্তু টোল কোথায়? এ যে এক গৃহস্থের বাটী—ভিতরে পুরমহিলাগণের কলরব। ত্রস্তে বাহির হইয়া আসিলাম—ভাবিলাম এ কি বিড়ম্বনা?

অগ্রসর হইয়া নিত্যানন্দের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। নিতাই ঠাকুর দেখিয়া ফিরিবার সময় এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবী আমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "পয়সা দেবান না ঠাহুর দেহা কেমোন?"

বিষ্ণুপ্রিয়ার বাটীতে মহাপ্রভু দর্শনে যাইয়া দেখিলাম তথায় সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। কীর্ত্তনকারী একজন বৈষ্ণব কীর্ত্তনে বিরত হইয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতে আসিলেন। কিন্তু আমরা সিঁদুরে মেঘ দেখিয়াই দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। ইহা আমাদের এক প্রকার প্রতারণা বলিতে হইবে। কারণ সে বাটীতেও চারি আনা ভেট দিতে হয়—আমরা কিন্তু সেই ভেট আদায়ের অবসর না দিয়াই পলাইয়া আসিয়াছি। পার্শ্বেই অদ্বৈত আচার্য্যের বাটী—সে স্থানের দর্শন ও দর্শনী দানাদিও পূর্ব্ববৎ।

নবদ্বীপের কথা যখন লিখিতে বসিয়াছি তখনই জানি যে "নিন্দুক" আখ্যা আমাদের অদৃষ্টে আছে। তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য তিরস্কার পুরস্কার সমজ্ঞানে লিখিতেছি যে নবদ্বীপের প্রায় সমুদায় ঠাকুর-বাটীতেই দুই চারি পয়সা, দুই চারি আনা অথবা সত্তের পয়সা ভেট লাগে, এবং সমস্ত বাটীরই দ্বারদেশে সাইন্ বোর্ড দ্বারা বিজ্ঞাপিত আছে যে এটী অমুক বাটী, ওটী অমুক বাটী। প্রথম দর্শনে তত্রলিখিত বিষয় সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মানই স্বাভাবিক। কিন্তু সবই যে আধুনিক ও অপ্রকৃত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিকাতায় খাদ্যদ্রব্যাদি ভোল ফিরায় বেশী দামে বিক্রীত যইবার জন্য—মানুষ ভোল ফিরাইয়া সাধু সন্ন্যাসী সাজে পয়সা উপায়ের জন্য—আর অপ্রকৃত নবদ্বীপের এই অপ্রকৃত বাটীগুলি প্রকৃত বাটীরূপে ভোল ফিরায় কেন? কিসের জন্য?(১)

১। আমরা নানাস্থানেই বর্ত্তমান নবদ্বীপের নিন্দা শ্রবণে ব্যথিত চিত্ত বলিয়াই এবং পবিত্রকে নিষ্কলঙ্ক দেখিতে চাই বলিয়াই এই অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতেছি। ঠাকুরবাটীর অধিকারীগণকে জিজ্ঞাসা করিতে

নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য বিশ্ববিশ্রুত। আজ পর্য্যন্ত তথায় অনেক সংস্কৃত শিক্ষার চতুষ্পাঠী বিদ্যমান। আমরা ব্রজরাজ গোস্বামী ব্যকরণরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী দর্শনে গিয়াছিলাম। টোলটী এক দ্বিতল বাটীতে অবস্থিত। প্রায় শতাধিক ছাত্র ইহাতে বিদ্যাভ্যাস করেন। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়ের সরল ও সদয় ব্যবহারের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। তাঁহার সহিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম, কাণভট্ট শিরোমণি, স্মার্ত্তপ্রধান রঘুনন্দন, শঙ্কর তর্কবাগীশ, আনন্দরাম তর্কবাগীশ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি নবদ্বীপের পূর্ব্বতন জগৎ-বিখ্যাত পণ্ডিতগণের কথা এবং তাঁহাদের জ্ঞান গরিমার অনেক কথারই আলোচনা হইল। আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ তদীয় বন্ধু নড়াইল কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক মহাশয়ও তথায় আসিলেন। তাঁহার সহিত পূর্ব্বতন নবদ্বীপ সম্বন্ধে চর্চ্চা হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে(১) সম্প্রতি গৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটা আবিষ্কারের চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া কেহ কেহ গঙ্গার পরপারস্থ মিঞাঁপুর বা মায়াপুরে তাঁহার জন্মভিটা নির্দ্দেশ করিয়া সেই স্থলেই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই মায়াপুরেই লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের এবং বিখ্যাত চাঁদ কাজির সমাধির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপকদ্বয় উভয়েই বর্ত্তমান নবদ্বীপের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষতঃ—গণের অর্থলোলুপতা সম্বন্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। আর কিছুক্ষণ থাকিয়া সাহিত্য ও ব্যাকরণের অধ্যাপনা শুনিয়া আমরা টোল ত্যাগ করিলাম।

নবদ্বীপের প্রায় প্রতি গৃহস্থই যাত্রী রাখিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের যাত্রী আবাস অপেক্ষা বৈষ্ণবীর যাত্রী আবাস সংখ্যাই অধিক। প্রত্যেক

ইচ্ছা হয় যে দর্শনী সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ না করিয়া, ভক্তগণের ইচ্ছার উপর দাবী না করিয়া ভক্তির উপর দাবী করিলে ফল সর্ব্ব প্রকারেই শুভ হয় না কি?

১। একশত বর্ষের কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও গঙ্গার পূর্ব্বকূলেই নবদ্বীপ স্থাপিত ছিল। সে সময়ে জলাঙ্গী নদী উহার পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত হইত। প্রবাদ এইরূপ যে ১২০৬ সালের প্রবল বন্যায় গঙ্গাস্রোত পশ্চিমস্থ খাত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকস্থ খাতে প্রবাহিত হয়। আদিম খাতটি অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়। এই ঘটনায় প্রাচীন নবদ্বীপের প্রায় সমুদয়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বাটী সংলগ্ন কাষ্ঠফলকে স্বত্বাধিকারী ও স্বত্বাধিকারিণীর নাম এবং কে কত যাত্রী রাখিতে পারিবেন তাহা লিখিত আছে। কিন্তু এই সমস্ত বাটীতে থাকিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। সৌভাগ্য বশতঃ আমরা রাধারমণবাগ ললিতা সুন্দরীর কুঞ্জ নামক আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম। আশ্রমটী গঙ্গার নিকটবর্ত্তী, সুবৃহৎ ও রমনীয়। আশ্রমস্থ ফলফুল সমন্বিত বৃক্ষগুলি দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া গেল এবং আশ্রমের বৈষ্ণবগণের বৈষ্ণবোচিত নিষ্ঠা, বিনয় ও উদারতায় প্রাণ মোহিত হইল। নিত্যধামগত রমণদাস বাবাজী মহাশয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। কিছুদিন পূর্ব্বে ইঁহার তিরোভাব হইয়াছে। এই রমণদাস বাবাজীও তাঁহার গুরুদেব উভয়েরই সমাধি একটী সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে অবস্থিত। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের স্বর্গীয় গুরুদিগের স্মৃতির উদ্দেশে যে প্রকার ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত পূজা অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন তাহা দেখিলে অনেক জীবিত গুরুরও হিংসার উদ্রেক হইতে পারে। একটী মন্দিরে রাধাশ্যামের যুগলমূর্ত্তি বিরাজমান। আর একটী প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে আশ্রমস্থ বৈষ্ণবগণের এবং অতিথি অভ্যাগতের বিশ্রামস্থান।

আমরা কলিকাতার নব্য যুবক। সাধারণতঃ যে "সংকীর্ত্তন" শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের বিরাগ ব্যতীত শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় না। কিন্তু নবদ্বীপের এই আশ্রমে বৈষ্ণবগণের গীত সংকীর্ত্তনে আমরা যোগদান না করিয়া থাকিতে পারি নাই। সংকীর্ত্তনের সুর ও ভাব মাধুর্য্যে এবং গায়ক-দিগের আদর্শ ভক্তি ও রতির গুণে আমরা আবাল্যশ্রুত "ভজনানন্দ" শব্দের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। পরম বৈষ্ণব তারক দাদার সেই শ্রবণানন্দ সঙ্গীত "শুধু তোমায় যেন চাই প্রভু—যেন আর কিছু চাহি না হে—আমি চাইলেও যেন পাই না হে—মূঢ় মন চাইলেও চাইতে পারে"—কখনও ভুলিতে পারিব মনে হয় না।

আশ্রমের ললিতা সুন্দরীর ব্যাপারও অসাধারণ। পাঠক মহাশয় যেন "ললিতাসুন্দরী" নাম শুনিয়াই বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক সেই ললিতা সখীর কথা, অথবা কোনও রসকলিশোভিতা আধুনিক বৈষ্ণবীর কথা ভাবিয়া বসিবেন না। সখ্য দাস্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ সাধনার মধ্যে ভগবানকে পতিরূপে ভাবিয়া সাধনাও অন্যতম। এ সাধনা অতি উচ্চ অঙ্গের—আমার মত অপ্রেমিকের বোধগম্য নহে। পুরুষ সাধকগণের মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও ইহার অধিকারী ছিলেন।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গের সাধক একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। পাঠকমধ্যে অনেকেই পরম ভাগবৎ "ভক্তি" সম্পাদক স্বর্গীয় দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন। বর্ত্তমান সাধক ইঁহারই কনিষ্ঠ সহোদর। ইনি বিগত দ্বাদশ বৎসরকাল স্ত্রীবেশযুক্ত ও স্ত্রীআচারে সিদ্ধ। পরিধানে, তুলসীর আভরণে, হাবভাবে ও সরমভরমে স্ত্রীজাতীর সহিত ইহার বিশেষ বৈষম্য নাই। ইহারই প্রস্তুত অন্নে ও ছত্রিশ ব্যঞ্জনে দেবসেবা হইবার পর বেলা দ্বিপ্রহরের ফলভারে অবনত ঘনপত্র আম্রবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর সহিত যখন হরিধ্বনিসহকারে মধ্যাহ্ন ভোজনের সুখানুভব করিতেছিলাম তখন পরিবেষণ ব্যাপৃতা ললিতা সুন্দরীকে দ্রৌপদী বলিয়া ভ্রম হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি। নবদ্বীপের প্রায় সমস্ত ঠাকুরবাটীই যে "দেহি" "দেহি" শব্দ দ্বারা মুখরিত, এ আশ্রমে তাহা মোটেই শ্রুত হয় নাই। আশ্রমবাসীগণ অর্থের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নাই বা আকারে ইঙ্গিতে তাহার আভাসও দেন নাই। মনে হয় আকাঙ্ক্ষার রাজ্য মধ্যে ইহা যেন সংযমের এক নিভৃত নিকেতন। নবদ্বীপের অনেক স্থানের নিন্দা করিয়াছি এবং আরও করিব। এরূপ স্থলে রাধারমণবাগের এতদূর প্রশংসা করায় কেহ যেন মনে না করেন যে তত্রস্থ বৈষ্ণবগণের প্রদত্ত "মালসা ভোগের" আস্বাদে মুগ্ধ হইয়াই আমরা এমন কথা বলিতেছি। দোহাই—যে ঠাকুরেরই বলুন—আমরা নিরপেক্ষভাবেই বলিতেছি।

অপরাহ্নে বনচারী নামক সাধুর আশ্রম দেখিবার জন্য প্রসিদ্ধ যাত্রাকার ৺মতিলাল রায়ের বাটী অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলাম। নগর প্রান্তে গঙ্গার তটভূমে বাউল সম্প্রদায় অবলম্বী এক বৈষ্ণবপল্লী। পল্লীটী আলখাল্লা পরিহিত কণ্ঠিধারী বৈষ্ণব ও একতারাধারিণী বৈষ্ণবীগণ দ্বারা অধ্যুষিত। সেই পল্লীমধ্যে বনচারীর আশ্রম। আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম তিন ব্যক্তি গঞ্জিকা সেবন সুখানুভবে ব্যপৃতা। একজন ত্রস্তে উঠিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। অতঃপর কুটীর মধ্যস্থ কতকগুলি মৃণ্ময় মুর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া বলিল "ঐ দেখুন দিগ্বিজয়ী পরাজয়। এইখানেই শ্রীচৈতন্যদেব দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঐ দেখুন গঙ্গাদেবী। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গাস্তব করায় চৈতন্যদেব সেই স্তবের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন।"

আমরা আশ্রমের পশ্চাৎভাগে যাইলাম। দেখিলাম সেখানকার ব্যাপার রহস্যময়। সেস্থলে কুটীরমধ্যে মঞ্চের উপর চণ্ডীদাস নামক এক মহাত্মা কুসুমমাল্যে সুশোভিত হইয়া উপবিষ্ট। সম্মুখে পয়সার রেকাবী বিন্যস্ত আর একটী সুসজ্জিত সুন্দর গুড়গুড়ি বিরাজিত। মৃন্ময় দেওয়াল গাত্রে নানাপ্রকার ছোট বড় মলিন ও ছিন্ন এবং কতকগুলি কদর্য্যভাব ব্যঞ্জক চিত্র সংলগ্ন রহিয়াছে। চালের মাচানে ছিন্ন কন্থা ও মাদুর এলোমেলো ভাবে রক্ষিত। কুটীর প্রাঙ্গনে দুইটী কুকুর মক্ষিকা বিতাড়নে ব্যতিব্যস্ত।

কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সেস্থলে এক অতি সুন্দরী যুবতী বৈষ্ণবীর আবির্ভাব হইল। বৈষ্ণবী তামাকু সাজিয়া ফুঁ দিতে দিতে কলিকাটী বাবাজির গড়াগড়াতে বসাইয়া দিল—বাবাজি গুড়ুক খাইতে লাগিলেন। আমরা ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর ভাণ করিয়া বাবাজিকে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মোপদেশ দিতে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন "উপদেশ আর কি দিব—আমার রচিত এই বইখানা কিনিয়া পড়—সব জানিতে পারিবে।" পুস্তকের মূল্য ।৴০ ছয় আনা। আমরা একখানি পুস্তক পড়িয়া দেখিলাম পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাতেই সেই দীর্ঘ কেশ নখর যুক্ত বাবজী ও তাঁহার শোভনা সেবাদাসীর প্রতিকৃতি। নিম্নে লেখা আছে "পুরুষ ও প্রকৃতি।" পুস্তকখানি কতকগুলি—বোধ হয় শ্রীরাধার আমলের—পুরাতন কৃষ্ণ সঙ্গীত ও কুরুচি সঙ্গত গীতে পূর্ণ।

সেবাদাসীটী ইতিমধ্যে বাবাজির পশ্চাৎভাগে এক কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমাদের পুস্তক পাঠ সাঙ্গ হইলে দেখিলাম তিনি বাহিরে আসিয়া ধীরে ধীরে বাবাজির পার্শ্বে বসিলেন। কিন্তু এবার আর পূর্ব্বের সাধারণ বেশ নহে। এবার তিনি আপনার কোমল অঙ্গটী হরিদ্রারঙ্গে রঞ্জিত আলখাল্লায় আবৃত করিয়া এবং নাসিকায় রসকলি রচনা করিয়া মোহিনী সাজিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবীর রূপ যেমনই হউক না কেন আমরা ভাবিতেছিলাম যে এই সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী কি ভাবে ভগবানের সাধনা করিতেছে। ইহারা যে ধর্ম্মের ভাণ করিতেছে, সেই পবিত্র ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যিনি—সেই চির প্রণম্য চৈতন্যদেব বৃদ্ধা মাধবী বৈষ্ণবীর নিকট প্রভুরই সেবার জন্য শালি তণ্ডুল ভিক্ষা করা অপরাধে আপনার প্রিয়তম পরিষদ হরিদাসকে চিরবর্জ্জন করিয়াছিলেন আর স্থানীয় তথা-কথিত বৈষ্ণবগণ এক বা ততোধিক সেবাদাসী লইয়া এ কোন বিসদৃশ সাধনায় ব্যাপৃত হইয়াছে? ডোর কৌপিন বা কণ্ঠী ধারণ করিয়া যে সমস্ত ব্যক্তি

পুণ্যময় সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করে—বিধিনির্ব্বন্ধে সংযুক্তা ধর্ম্মের সহায় সহধর্ম্মিনীর পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ করে—তাহারাই আবার সংসারত্যাগিনী কুলটাগণকে সঙ্গিনী করিয়া নূতন সংসার পাতিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হয়! কি বীভৎস ব্যাপার!! ইহাদিগকে বান্তাশী ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

এইবার "পাপোস" বাবাজির কথা বলিব। ইহার দ্বারদেশে লিখিত আছে "অবধূত সাধু ওরফে পাপোস বাবাজি।" এক যোগী পুরুষ ভূগর্ব্বে অবস্থিত থাকিয়া যোগ সাধনা করিতেছেন ইহা শুনিয়া অতি উৎসুক হইয়া মহাপুরুষের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু যাঁহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষু স্থির হইল। দেখিলাম মাটীর মধ্যে একটী পরিস্কার একতালা ঘর। তার যে যে স্থল উপরের দিকে উন্মুক্ত, সেই সেই স্থলে এক একটী ব্যাঘ্র চর্ম্ম, রুদ্রাক্ষ মালা বা গৈরিক বাস বিলম্বিত হইয়া দর্শকগণের নিকট যোগীর অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে।

যোগীর পরিচারকগণের কথানুসারে আমাদিগকে বলিতে হইল "বাবা অনেক দূর থেকে এসেছি—একবার দয়া করে দর্শন দিন।" নিঃশব্দে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে হইল। তারপর আবার সেই প্রকার অনুনয় ও কাতরোক্তি, দেখিতে দেখিতে এক মনুষ্য মূর্ত্তি ভূগর্ব্ভস্থ প্রকোষ্ঠ দ্বারে মুখ বাড়াইয়া অস্বাভাবিক অনুনাসিক স্বরে বলিল "কেঁ বাঁবাঁ—আঁশীর্ব্বাঁদ কঁরিঁ আঁনন্দে থাঁকঁ।"।" আমরা ভণ্ডামি করিয়াই বলিলাম "সাধুদর্শনে আসিয়াছি কিঞ্চিৎ উপদেশ দিন।" তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে যাত্রার উচ্চারণ ভঙ্গিতে বলিলেন "বাঁবাঁ আঁমিঁ অঁতিঁ পাঁষঁণ্ড—কেঁবঁল এই প্রাঁর্থঁনা কঁরি যেঁ বাঁলঁকেঁরাঁ পিঁতৃঁ মাঁতৃ ভক্তঁ হঁ'কঁ, আঁরঁ স্ত্রীঁলোঁকেঁরাঁ পঁতিঁব্রঁতা হঁকঁ।" আমরা সাধুর এই অশ্রুতপূর্ব্ব উপদেশ (?) শুনিয়া কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিলাম। বিদায় প্রার্থনা করিলে সাধু বিকৃত ও উৎকট স্বরে যেরূপ "হরিঁবোঁলঁ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন তাহাতে যুগপৎ বিরক্তি ও হাস্যের উদ্রেক হইয়াছিল।

এই প্রকারে নবদ্বীপের সু ও কু উভয়বিধ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সন্ধ্যাকালে স্থানীয় বুড়োশিব, আগমেশ্বরী মাতা ও স্বর্গীয় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন স্থাপিত হরিসভা ও বিদ্যালয়াদি দেখিয়া নবদ্বীপের বাজার হইতে পিতল কাংস্যের তৈজস, মাটীর বাসন কিঞ্চিৎ, তুলসীর মালা প্রভৃতি স্থানীয় উৎপন্ন

দ্রব্য ক্রয় করিয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময় আবার বৈষ্ণবদিগের আশ্রমে ফিরিলাম। রাত্রিতে পুনরায় কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিয়া তাঁহাদিগের আবাস বাটীতে নিদ্রাসুখে নিশাযাপন করতঃ ব্রাহ্মমুহুর্ত্তেই গঙ্গাতটে সমুপস্থিত হইলাম। অতঃপর পুনরায় মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করতঃ নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া স্বরূপগঞ্জের ক্ষুদ্র বাজারে চাউল ডাউল ও হাঁড়ী কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া জলাঙ্গী নদীবক্ষে নৌকার উপর রন্ধন ও আহার ক্রিয়া সমাধা করতঃ বেলা দ্বিপ্রহরে কৃষ্ণনগরে উত্তীর্ণ হইলাম। তথা হইতে বাষ্প শকটযোগে অপরাহ্নে কলিকাতায় পঁহুছিয়া নবদ্বীপ পর্য্যটনের উপসংহার করিলাম।

শ্রীপান্নালাল দে।

ভাগবত ধর্ম্ম।

নানা প্রকারের বিরোধী চিন্তা তরঙ্গের দ্বারা একালে আমাদিগের চিত্ত আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সমুদয় বিরোধী চিন্তাতরঙ্গকে উপেক্ষা করা অসাধ্য। একালের চিন্তাশীল হিন্দু ঠিক সেকালের শ্রদ্ধাবান হিন্দুর মত নহেন, হইতে পারেনও না। কাজেই আমাদিগের শাস্ত্রাদি বিশেষতঃ লীলাগ্রন্থের কথা বলিতে হইলেই প্রতিপদে সুদীর্ঘ ভূমিকার আবশ্যক হইয়া পড়ে। আমাদিগকেও এইজন্য পুনঃ পুনঃ নানাপ্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের বা শ্রীকৃষ্ণলীলার ভূমিকা নির্ণয় করিতে হইবে।

কেহ কেহ একালের বিরোধী চিন্তাকে বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন, আবার কেহ কেহ বিরোধী চিন্তার ঠিক স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া প্রতিবাদ করেন। যাঁহারা বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের চেষ্টা নিস্ফল, কারণ এই বিরোধী চিন্তার সমস্তটুকু বর্জ্জন করা সম্ভবও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। যাঁহারা বিরোধী চিন্তার প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা না করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে প্রতিবাদ করেন তাঁহাদের চেষ্টা আরও খারাপ, কারণ এই চেষ্টার দ্বারা তাঁহারা নিজেরাও চিন্তাশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এই চেষ্টার ফলে লোকের শাস্ত্রাদির প্রতি অনুরাগও কমিয়া যায়।

এ অবস্থায় আমাদিগকে প্রতিকূল মতাবলম্বীগণের কথাও বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে হইবে, তাঁহাদের চিন্তা পদ্ধতির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইতে হইবে। এই প্রতিকূল চিন্তার মধ্যেই এমন জিনিস আছে, যাহার

সাহায্যে প্রাচীন শাস্ত্রের তত্ত্ব এ কালের চিন্তাভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এই জন্যই দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন। এই ভূমিকা যে কল্পিত তাহা নহে, ইহা যে এ কালের আবিষ্কার তাহাও নহে। পূর্ব্বে ইহা সুপ্তভাবে (Implicit) ছিল, এ কালে তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে অর্থাৎ explicit করিতে হইবে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বা জন্ম, একটি ঘটনা। ভাদ্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষ, অষ্টমী তিথি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দেবকী ও বসুদেবের পুত্ররূপে কংসকারাগারে আবির্ভূত হইলেন বা জন্মগ্রহণ করিলেন। এই একটি ঘটনা, আর একটি ঘটনা, রাজ্যচ্যুত অবস্থায় যে সময় হুমায়ুন ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই সময়ে অমরকোট নামক স্থানে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র আকবরের জন্ম হয়। এই দুইটি ঘটনা। এখন প্রশ্ন এই, এই দুইটি ঘটনা কি একদরের ঘটনা? বিলাতী পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে আমাদের দেশের সমালোচকগণ ধরিয়া লইয়াছেন, এ দুইটি একই দরের সত্য (Truths of the same universe of thought) এইটুকু ধরিয়া লওয়াতেই লীলাগ্রন্থ, বিশেষতঃ সকল লীলার সার শ্রীভগবানের নরলীলা আমরা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। মনীষি বঙ্কিমচন্দ্রের ও অন্যান্য অনেকেরই এইখানে প্রাথমিক ভুল হইয়াছে। ভুলে আরম্ভ করিলে প্রতিপদেই ভুল হইবে এবং শেষে ভুলে যাইয়াই উপস্থিত হইতে হইবে। ফলে হইয়াছেও ঠিক তাহাই।

আমাদের প্রথম কথা এই যে এই দুইটি একদরের সত্য নহে। এই মতটি আমাদের কল্পিত জার্ম্মান দর্শন হইতে আমদানী করা বিদেশী মত নহে, ইহা প্রাচীন ও খাঁটি স্বদেশী মত। লীলা যে নিত্য!—

"কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ।"

লীলা হইলেই তাহাকে নিত্য হইতে হইবে। আমরা যাহাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলি, যেমন আকবরের জন্ম বা অশোকের রাজ্যারোহণ তাহা লীলা নহে অর্থাৎ নিত্য নহে, তাহা চঞ্চল জগতের পরিবর্ত্তনশীল ঘটনা—একটি নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে আরম্ভ হইয়া অপর মুহূর্ত্তে শেষ হইয়া যায়, তাহার পরের মুহূর্ত্তে আর থাকে না। আবার একদেশে হয়, অন্যদেশে হয় না। কয়েক জন লোকে প্রত্যক্ষ করে, অপরে চেষ্টা করিলেও প্রত্যক্ষ করে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে এই আবির্ভাব, ইহা কি সেই প্রকারের ঘটনা? অমরকোটে হুমায়ুনের শিবিরে যদি আমি থাকিতাম, তাহা হইলে আকবর যে জন্মাইলেন তাহা দেখিতে পাইতাম, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। (অবশ্য ঐতিহাসিক যদি সত্য কথা লিখিয়া থাকেন!) কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন কংসকারাগারে বসুদেব দেবকীর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, আমি যদি সে দিন সেখানে থাকিতাম, তাহা হইলে আপনারা কি মনে করেন আমি সেই জন্ম বা আবির্ভাব দেখিতে পাইতাম? আপনারা বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র পড়িয়াছেন, অন্য গ্রন্থকারের "শ্রীকৃষ্ণের জীবনী" পড়িয়াছেন কাজেই আপনারা বলিবেন "নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম।" আমরা প্রাচীন আচার্য্য ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত "লীলা" যৎসামান্য আলোচনা করিয়া বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি যে কিছুতেই দেখিতে পাইতাম না। "সেদিন সেখানে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দেখিতে পাইতাম" আমার এই অনুমান যদ্যপি সত্য হয়, তাহা হইলে আজও এইখানে বসিয়া সেই লীলা দেখিতে পাইতে পারি। কারণ এই আবির্ভাবে 'এদিন' 'ওদিন' 'সেদিন' বা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নাই। এই আবির্ভাব একটি লীলা, ইহা নিত্য Everlasting now এখনও তো লীলা দেখা যায়

"অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ"

কংস বেচারা নিজের সমস্ত সতর্ক কর্ম্মচারীগণকে লইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পায় নাই। তাহারই কারাকক্ষে শিশুর আবির্ভাব হইল, দুয়ারে দুয়ারে সশস্ত্র প্রহরী সতর্ক ভাবে রাত্রি জাগিয়া বসিয়াছিল, একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকারও গতিবিধি তাহাদের অগোচরে হইবার উপায় ছিল না। অথচ তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই।

মনে করুন, সে সময়ে মথুরায় কংসরাজার নিজের দৈনিক খবরের কাগজ ছিল, সেই খবরের কাগজের পুরাতন সংখ্যা খুঁজিয়া বাহির করিয়া ঠিক জন্মাষ্টমীর পরের দিনের কাগজখানির সংবাদস্তম্ভ পড়িয়া দেখুন। দেখিবেন শ্রীমদ্ভাগবতাদি লীলা গ্রন্থে যাহা লেখা আছে, কংসের খবরের কাগজে তাহার কিছুই লেখা নাই। সে কাগজে এইটুকু মাত্র লেখা আছে যে 'কাল রাত্রিতে খুব দুর্যোগ গিয়াছে। আকাশ মেঘাবৃত ছিল, সমস্ত রাত্রিই বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, যাহা হউক, কারারুদ্ধা দেবকীর সন্তান প্রসূত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকায় মহারাজা বাহাদুর স্বয়ং এবং পাত্রমিত্র পরিষদ্ আদি সকলে সমস্ত রাত্রি

জাগিয়া বসিয়াছিলেন। প্রহরীগণও সকলে খুব সতর্কভাবে জাগিয়া বসিয়াছিল। কয়েক দিন হইতে মহারাজা বাহাদুর দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহার পর সারাদিন নানারূপ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, এজন্য লোকে মনে করিয়াছিল রাত্রিতে দেবকীর সন্তান প্রসবের সময় কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু রাত্রিতে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই। রাত্রি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন দেবকী একটি কন্যা প্রসব করিলেন। নিমেষের মধ্যে সংবাদ পাইয়া মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং কারাকক্ষে প্রবেশ করিলেন ও স্বয়ং স্বহস্তে বালিকাকে লইয়া আসিয়া নদীতীরে পাথরের উপর আছাড় মারিয়া মারিতে চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। মহারাজা বাহাদুর যেমন সদ্য প্রসূত বালিকাকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য হাত উপরে তুলিয়াছেন অমনি সেই বালিকা হাত হইতে পিছলাইয়া অদৃশ্য হইল। সহরে সাধারণ অশিক্ষিত লোকসকল এইরূপ জনরব তুলিয়াছে যে সেই বালিকা শূন্যে উড়িয়া গেল ও অস্ত্রে শস্ত্রে ভূষিতা উজ্জ্বল গৌরবর্ণা অষ্টভূজা মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া মহারাজা বাহাদুরকে সতর্ক হইবার জন্য আদেশ করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। অশিক্ষিত লোকের এই জনরব বিজ্ঞানসম্মত নহে এবং সর্ব্বৈব মিথ্যা।”

জন্মাষ্টমীর পরদিন মথুরায় যে দৈনিক পত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ কথাই লিখিত ছিল। তাহার পরদিনের কাগজে সম্পাদক মহাশয় (এই সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় কংসরাজার একজন পুরোহিত। এই পুরোহিতদিগের অমোঘ দৃষ্টির (?) কথা শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় দৃষ্ট হইবে) লিখিলেন “কতকগুলি ধূর্ত্ত ও কুসংস্কার রোগগ্রস্ত পাগল লোক সহরে রাষ্ট্র করিতেছে যে কাল রাত্রিকালে স্বয়ং মহারাজা বাহাদুর হইতে অরেন্ত করিয়া প্রহরীগণ পর্য্যন্ত সকলে দীর্ঘকাল নিদ্রায় অচেতন হইয়াছিল। এত অচেতন হইয়াছিল যে কতক্ষণ সময় যে ঘুমাইয়াছিল তাহা তাহারা জানে না। এই পাগলদিগের দলের সেই সর্দ্দার বলিতেছে যে শুধু তাহাই নহে ঘড়ির কাঁটা তো দূরের কথা, আকাশের তারকা পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল গতিহীন হইয়াছিল। এই সভ্য যুগে, এই উন্নত মথুরা রাজ্যে যে এই প্রকারের বিজ্ঞান ও দর্শন বিরুদ্ধ কথা প্রচারিত হয় ইহাই আশ্চর্য্য! তারকারা গতিশূন্য ছিল, কাল-স্রোত প্রবাহিত হয় নাই, সমস্ত লোক ঘুমাইয়া ছিল, ইহা হইতেই পারে না। কারণ বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের সমস্ত সিদ্ধান্ত ইহার বিরোধী।

পরম্পরায় রাষ্ট্র যে পাগলেরা সহরবাসীকে উত্তেজিত করিতেছে ও বলিতেছে "ভাই সকল প্রস্তুত হও, সুসময় আসিতেছে,—বিরজার পরপারে পরব্যোম-মধ্য হইতে বৈকুণ্ঠ রাজ্য আসিতেছে—এই মথুরায় বৈকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হইবে তোমরা সকলে প্রস্তুত হও। হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ কর। অহঙ্কারের নঙ্গর তুলিয়া মহীয়সী ও মঙ্গলময়ী ইচ্ছার স্রোতে নিজ নিজ জীবন তরণী ছাড়িয়া দাও, সুসময় আসিতেছে, বৈকুণ্ঠ সমাগত প্রায়—প্রস্তুত হও। আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করি মহারাজা বাহাদুর কঠোর আইন করিয়া এই সমস্ত দুষ্ট লোক এইরূপ পাগলের প্রলাপ যাহাতে সহরে রাষ্ট্র করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।"

মথুরার সংবাদ পত্রে এইরূপ সংবাদ লিখিত হইয়াছিল। আমরা যদি মথুরায় থাকিতাম তাহা হইলে এই পর্য্যন্তই জানিতে পারিতাম। ইহার বেশী আর আমাদের জানিবার শক্তি নাই।

কিন্তু যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত বা অন্য লীলা গ্রন্থ পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে পূর্ব্ব রাত্রিতে কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু কংস ও তাঁহার স্বপক্ষীয়গণ এই সমস্ত ঘটনার কিঁছুই জানিতেন না। কংসকে তাঁহার গুরু দেবর্ষি নারদ আসিয়া আভাষে কিছু কিছু বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সামান্য আভাষ পাইয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারেন নাই।

যিনি যোগমায়া তিঁনি সে দিন য়াহাদের ঘুম পাড়াইয়া ছিলেন তাহারা কেহই এই আবির্ভাব বুঝিতে পারে নাই।

শ্রীবৃন্দাবনে যে প্রেমলীলা হইল তাহা কেমন, যেমন গড়ের মাঠে সার্কাস হইতেছে। প্রকাণ্ড এক কাপড়ের ঘর। ঘরের মধ্যে যত সব আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে। যাহারা দেখিতে গেল তাহারা আসিয়া কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প করিল। তাহাদের মুখে শুনিয়া আমিও দেখিতে যাইলাম। মাঠে দাঁড়াইয়া দেখিলাম একজন সং, মুখোস্ পরিয়া করতাল বাজাইতেছে ও নানারূপ মুখভঙ্গী করিতেছে। পয়সা কড়ি কিছু লইয়া যাই নাই কাজেই ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরিয়া আসিলায়। মনে করিলাম এই তো সার্কাস দেখা হইয়া গেল। লীলা-গ্রন্থ পড়িয়া আমাদেরও আজকাল প্রায় এই দশাই ঘটিয়া থাকে।

আমার যদি বুদ্ধি থাকিত, যদি অভিজ্ঞের উপদেশ লইয়া যাইতাম তাহা হইলে শুধু হাতে যাইতাম না, কিছু সম্বল লইয়া যাইতাম। অবশ্য ব্যাকুলতাই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বল। সম্বল লইয়া যাইয়া কাপড়ের ঘরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতাম। উপস্থিত হইয়া দেখিতাম একজন টিকিট্ বিক্রয় করিতেছেন। প্রথমটা তাঁহাকে চিনিতে পারিতাম না। শেষে ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিতাম, তিনি মা, আমাদের সকলের চিরদিনের একমাত্র মা। মাকে দেখিয়া চিনিতে পারিবার মাত্র, ও কাঁদিতে আরম্ভ করিবামাত্র মা বলিলেন ধর্ম্ম লও, অর্থ লও, কাম লও, মোক্ষ লও,। বাড়ী ফিরিয়া যাও। এখানে কেন? দুষ্ট ছেলে কাঁদিল আর বলিল আমি কিছুই চাই না, কিছুই চাই না। তখন তিনি একখানি টিকিট দিলেন। টিকিটের গায়ে লেখা আছে "প্রেম ভক্তি" টিকিট হাতে পড়িবা মাত্র দেখিলাম কাপড়ের ঘরের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে—ভিতরে যাইয়া দেখিতাম সব সত্যের দেশ—এতদিন দেখিয়াছি জড় ও চেতন এই দুইএর মধ্যে নিত্য বিরোধ। আজ আর জড় নাই, এখানে আর অসৎ নাই।

"ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং।" মাটি, মাটি নয়, চিন্তামণি, জল জল নয়, অমৃত। স্পর্শমণির স্পর্শে সব চিন্ময় হইয়া গিয়াছে। একালের চিন্তায় কি বলিব? হয় বলি Spiritual Alchemy অথবা Spiritualisation of Matter or Materialisation of Spirit.

যে দৃষ্টি দেখে ঘর ও বাহির, পর ও আপন, দিন ও রাত্রি তাহার এই বিরোধ রহিয়াছে, তাহারা ইহা দেখিতে পায় না। এখানে

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
তবু বুঝিতে নারিনু নাথ তোমার পিরীতি।"

নাথের এই পিরীতির জন্য মানব হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠুক!

আগমনী

স্বচ্ছ নীলিমায় ভরা শরৎগগন,
ঊষার অরুণ লেখা, প্রকাশ করিছে আজি
বিশ্ব মাঝে তব আগমন;
জননী তোমারি তরে হেরিতেছি ঘরে ঘরে
উৎসুক সবার চিত্ত আনন্দ মগন।

২

বাতাস হয়েছে আজ পুলক চঞ্চল,
দিকে দিকে দিগঙ্গনা তোমারি বন্দনা রত
জয়শ্রী মণ্ডিত বনতল ;
সুবাসিত প্রতিকুঞ্জ পুষ্পিত শেফালি পুঞ্জ
গুঞ্জরিছে গন্ধ মুগ্ধ মধুকর দল।

৩

উঠে কোথা পল্লী প্রান্তে নবতের সুর,
সবার অন্তর আজি উতলা করিয়া তুলে
আবাহন গীতি সুমধুর ;
নির্ম্মল ফুলের মত খেলা করে শিশু যত
মিলন আনন্দ মুগ্ধ বিরহ বিধুর।

৪

ক্ষৌম বস্ত্র পরিহিতা কুল বধূগণে,
শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই, পাদ পীঠ খানি তব
অঙ্কিত করিছে আলিম্পনে ;
অর্ঘ্য রচে হৃষ্টমতি শুদ্ধ চিত্তে ভাগ্যবতী
কি লাবণ্য. কত ভক্তি উছলে নয়নে।

৫

পূর্ণ ঘট হেরি আজি স্থাপিত মন্দিরে,
তব বোধনের মন্ত্র শোনা যায় ক্ষণে ক্ষণে
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে ধীরে ;
চারিদিকে ধূপ গন্ধ ভেসে যায় মৃদুমন্দ
বিস্ময়ে পুলকে আমি নমি নত শিরে।

৬

এস তুমি এস মাতঃ কর স্নেহ দান,
ব্যথিত কাতর যারা শোকে দুঃখে ভাবনায়
তাহাদের কর মা কল্যাণ ;
জনে জনে দাও আশা দাও স্নিগ্ধ ভালবাসা
নির্ম্মাল্যের মত পূত দাও নব প্রাণ।

শ্রীপ্রভাসকুমার সেন।

শ্রীল শ্রীপূজ্যপাদ নয়নানন্দ ঠাকুর বিরচিত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভক্তি রসকদম্ব।(৩)

তৃতীয় প্রকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভবভোগ বিষয় লাগি হেন দেহ গেল।
পাইঞা দুর্লভ দেহ হরি না ভজিল॥
যথা শান্তি শতকং
জন্মেদং বন্ধতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতাহন্ত শ্চিন্তামনির্ম্ময়া॥ ইতি
হেন জন্ম বন্ধ্যা হৈল নহিল সফল।
সকল ঈশ্বরমায়া মোহ কেবল॥
তবে কহ জান্যা শুন্যা কেন মোহ কর।
মোহরূপ বিপদ জালে বদ্ধ কলেবর॥
অগ্নিশিখা দেখিঞা পতঙ্গগণ ধায়।
ভক্ষ সামগ্রি বলি উড়ি পড়ে তায়॥
ভক্ষাভক্ষ নাহি জ্ঞান তারা অচেতন।
ভাল মন্দ না জানিয়া হইল নিধন॥
অজ্ঞানে দেখহ মিন বড়সি ভক্ষয়ে।
তাহার যাতনা তারা আগে না জানয়ে॥
না জানিঞা মৃত্যু হয় তারা অচেতন।
আমা সভার দেখ আছে বিশিষ্ট চেতন॥
জানিঞা আমরা তভু অজ্ঞান সকলে।
বদ্ধ হইছি দেখ সংসার বিপৎ জালে॥
যথা তত্রৈব
অজানন্দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং।
ন মীনোঽপি জ্ঞানাদ্ধৃত বড়িশ মশ্নাতিপিশিতং।
বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জাল জটিলা।
ন্নমুঞ্চামঃ কামান্নহহ গহনো মোহমহিমা॥

বিষয় আবিষ্ট মতি না হইয় আর।
বিষয়ী জনার কভু না দেখি উদ্ধার ॥
সর্ব্ববিষয় ছাড়ি ভজ ভগবান।
বিষয়ি জনার দেখ নাহি পরিত্রাণ ॥
বিষয় কাহাকে কহি কর অবধান।
গ্রাম্যসুখ গ্রাম্যকর্ম্ম গ্রাম্যগীত গান ॥
বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমাভাব অজিতেন্দ্রিয়।
নিজ অভিলাস জাথে সেইত বিষয় ॥
স্বদেহ সুখ তাৎপর্য্য যেবা কর্ম্ম হয়।
কৃষ্ণ সম্বন্ধহীন তারে বিষয় কয় ॥
বিষয় আসক্ত দোষ করহ স্মরণ।
ভগবান অর্জ্জুনে কন গীতায় বর্ণন ॥
বিষয় ভাবত পুরুষের বিষয় সঙ্গ হয়।
সঙ্গ হইলে তাহে আশক্তি বাড়য় ॥
কামাশক্ত হৈলে পুন কার্য্যে হয় ক্রোধ।
ক্রোধে হয় মোহ জাহে ক্ষীণ হয় বোধ ॥
মোহে হয় স্মৃতিনষ্ট শাস্ত্রজ্ঞান জত।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান তাহে হয় হত ॥
স্মৃতিভ্রষ্ট হৈলে হয় বুদ্ধি বিনাশন।
বুদ্ধিলোপ হৈলে হয় তাহাতে মরণ ॥

যথা শ্রীভগবদ্গীতায়াং

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহো সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥
বিষয়ীতে কৃষ্ণাবেশ কভু নাহি হয়।
পুরাণ প্রমাণ তাহে সুনহ নিশ্চয় ॥
বিষয়ী জনার চিত্ত বিষয় আবেস।
তার দেহে দূরগত সদা কৃষ্ণাবেশ ॥

তাহাতে সামান্য এক সুনহ উপমা।
বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক ব্যাসের বর্ণনা॥
একদেশে এক বস্তু রাখিয়া যদি জায়।
সেই বস্তু অন্য দেশে উকটিবে জায়॥
পশ্চিম দেশে রাখ দ্রব্য উকট পূর্ব্বদেশে।
জাহা না রাখিল পুন তাহা পাব কিশে॥
বিষয়ী জনার মন বিষয় বাসনা।
তার দেহে দূরগত সদা কৃষ্ণপ্রেমা॥
কৃষ্ণাবেশ থাকে যেবা কৃষ্ণপ্রেমী হয়।
বিষয়ীর চিত্তে সদা বিষয়ধর্ম্ম রয়॥
অতএব বিষয়ীতে নাহি কৃষ্ণাবেশ।
এই ত কহিল দোষ বিষয় আবেশ॥
কৃষ্ণভক্তগণে হয় কৃষ্ণাবেশ সদা।
কৃষ্ণবিনু তার চিত্ত না রহে একদা॥
অতএব ভাগবতে কহে ভগবান।
বিষয় ভাবত জন বিষয়কে পান॥
আমাকে চিন্তয়ে যেবা সে আমাকে পায়।
আমাছাড়ি ভক্তচিত্ত কাহেঁ নাহি যায়॥
ভক্তজনার চিত্ত আমাতে সদালীন।
অতএব বিষয়ী লোক সদা আমায় হীন॥
যথা বিষ্ণুপুরাণে—
বিষয়াবিষ্ট চিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥
বিষয়ান্ ধ্যায়ত শ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরতাশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥
ইতি শ্রীভাগবতে শ্রীভগবদুক্তিঃ॥
বিষয়বাসনা লঞা যদি বন জায়।
বনে ত থাকিয়া তার বিষয়ে মন ধায়॥
কিবা বন কিবা গৃহ বিষয়াবেশ যার।
দেহে নাহি উপজয়ে কৃষ্ণাবেশ তার॥

রাগীজন যদি করে বনেত বসতি।
তথাপি সকল দোষ সঙ্গে করে স্থিতি ॥
গৃহে থাকি পঞ্চেন্দ্রিয় করয়ে দমন ।
নিবৃত্তি রাগের হয় গৃহ তপোবন ॥
গৃহীভক্ত অম্বরীষ আদি মহাশয় ।
বন্ধন নিমিত্ত তার গৃহ নাহি হয় ॥
যথা শান্তিশতকং
বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং।
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয় সংযমস্তপঃ ॥
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্ত রাগস্য গৃহং তপোবনং ॥ ইতি
তাহা দেখ ভাগবতে কহে ভগবান।
সাধুজন গৃহে থাকিও দুঃখ নাহি পান ॥
গৃহে থাকি কৃষ্ণ কর্ম্মকরি হর্ষমনে।
প্রহর প্রহরার্দ্ধ কৃষ্ণ কথা আলাপনে ॥
তার গৃহ বন্ধন নিমিত্ত নাহি হয়।
দিনরাত্রি চারি দণ্ড কৃষ্ণকে সেবয়।
যথা—
গৃহেষ্বাবিশতাং বাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাং।
মদ্বার্ত্তাযাত যামানাং ন বন্ধায় গৃহামিতা ॥ ইাত
জিতেন্দ্রিয় জন বাস করু জাহা তাহা।
কৃতার্থ শ্রীকৃষ্ণভক্ত বাস করে যাহা ॥
গৃহাসক্ত জন যেই করে গৃহকর্ম্ম।
গৃহে থাকে করে সদা গৃহাচার ধর্ম্ম ॥
সেজনার নহে কভু কৃষ্ণপদে রতি।
পরে শিখাইলেহ না হয় কৃষ্ণে মতি ॥
পরস্পর শিক্ষা শ্রবণ সঙ্গগুণে।
নাহি হয় কৃষ্ণেমতি গৃহাসক্ত জনে ॥
অজিতেন্দ্রিয় বিষয়ী বিষয় আস্বাদন।
পুনঃ পুনঃ করে তারা চর্ব্বিত চর্ব্বণ ॥

গৃহাসক্ত বিষয়ীর কভু নহে গতি।
শ্রীকৃষ্ণ সেবায় যার নাহি দেখি মতি॥

শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদোক্তিঃ

মতিস্তু কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথো বিপদ্যেত গৃহব্রতানাং।
অদান্ত গোভিবিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত চর্ব্বণানাং॥
অদান্তগোভিরিতি অজিতেন্দ্রিয়ৈ রিত্যর্থঃ।
কৃষ্ণ কর্ম্ম বহির্ম্মুখ সদা শোচ্য হয়।
কৃষ্ণ কর্ম্মহীন জনের বৃথা আয়ুব্যয়॥
সূর্য্য উদয় অস্ত দিবস রজনী।
এইরূপে দিন মাস বৎসরাদি গণি॥
দিন মাস বর্ষ ক্রমে আয়ু পূর্ণ হয়।
মৃত্যু হয় যমপুরে প্রাক্তন ভুঞ্জয়॥
সেইক্ষণ নাহি জায় বৃথা আয়ুবাদ।
যেবা ক্ষণে কৃষ্ণ কথা সাধুর সম্বাদ॥
কৃষ্ণ বিষয়ে যেবা কাল ব্যয় করে।
সদ্ব্যয় আয়ু সেই কহিল বিচারে॥
ইহা নাহি জানে মূঢ় বিষয়ের ভোলে।
কোনরূপে দিন জাউক এই মাত্র বলে॥
কিন্তু দিন মাস বর্ষ শীত গ্রীষ্ম যত।
চক্রপ্রায় সেই সব ফিরে অবিরত॥
কাল নিত্য রূপ হন তার নাহি ক্ষয়।
মনুষ্যের আয়ুমাত্র হরয়ে নিশ্চয়॥

যথা শ্রীভাগবতে

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যনস্তঞ্চযন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণোনীত উত্তম শ্লোকবার্ত্তয়া॥
দিন রাত্রি প্রহর দণ্ড ক্ষণ আদি করি।
কৃষ্ণ কর্ম্মহীন কাল বিফল হয় তারি॥

সেই দিন দীন হয় দরিদ্র তুল্য মানি।
কৃষ্ণ কর্ম্মলীলাগুণ যবে নাহি শুনি॥
সেইক্ষণ ক্ষীণ হয় জল বিধপ্রায়।
কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনে জেবা ক্ষণ যায়॥
অষ্ট প্রহর মধ্যে না স্মরে জবে হরি।
প্রহর প্রহার তুল্য জানিহ তাহারি॥
কৃষ্ণ কর্ম্ম কৃষ্ণ বার্ত্তা যার নাহি হয়।
সেই সব জানিহ ভাই বৃথা আয়ুক্ষয়॥
রুদ্রযামলে
দিনং দীনং ক্ষণঃ ক্ষীণদণ্ডো ভবতি দণ্ডবৎ।
প্রহরোপি প্রহারং স্যাদযত্র ন স্মর্য্যতে হরিঃ॥
কৃষ্ণ কথা বিমুখ জনের আয়ু বৃথা।
বৃক্ষগণ বহুকাল বাঁচি রহে যথা॥
তদ্‌যথা শ্রীভাগবতে
তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রা কিং ন স্বশন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে।
কৃষ্ণ বিমুখ জন পশুতে গণনা।
পশু মধ্যে অস্তি নিন্দিত তাহার বর্ণনা॥
কুঃকুর শূকর উষ্ট্র গর্দ্দভ সমান।
নাহি গেল কর্ণপথে যার কৃষ্ণ নাম॥
তত্রৈব
শ্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ।
সেই লোকের বৃথা জন্ম নরাধম সেই।
পুরাণ পুরুষ কৃষ্ণ নারাধিল যেই।
ভাগবত পুরাণ যে না কৈলশ্রবণ।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মুখে না কৈল হবন॥
সেই লোক নরাধম বৃথা জন্ম তার।
এই ত কহিল কথা পুরাণের সার॥
শ্রীভাগবতে
যৈন্নশ্রুতং ভাগবতং পুরাণং
নারাধিতো যৈঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
মুখে হুতং যৈর্নধরামরাণাং
তেষাং বৃথা জন্ম নরাধমাণাং॥
কৃষ্ণ কথা শ্রবণাদি রহিত জেবা জন।
ব্যর্থ ইন্দ্রিয় তার কহহ শ্রবণ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয় থাকিতে সেই ইন্দ্রিয় বিহিন।
যে ইন্দ্রিয় নাহি হয় কৃষ্ণ সম্বন্ধ অধীন॥
জার কর্ণে নাহি প্রবেশিল কৃষ্ণ নাম।
তার দুই কর্ণ বিল গর্ত্তের সমান॥
জার জিহ্বা কৃষ্ণকথা না করে কীর্ত্তন।
ভেক জিহ্বা তুল্য তার জিহ্বার গণনা॥
ভেক যেন কন কন শব্দকে করিঞা।
সর্পকে আহ্বান করে গর্ত্ততে থাকিঞা॥
তেন মতে পুরুষ নানা গ্রাম্য কথা গানে।
আত্ম আয়ু বৃথা নেয় নষ্ট করে যমে॥
স্বর্ণ মুকুট রত্ন যদি শিরে ধরে।
সে মস্তকে গুরুকৃষ্ণ প্রণাম নাহি করে॥
তাহার মস্তক কেবল ভারের সমান।
না করিল শ্রীগোবিন্দ জাহাতে প্রণাম॥
স্বর্ণ কঙ্কণ আদি যেবা হস্তে ধরে।
কৃষ্ণ পরিচর্য্যা সেই হস্তে নাহি করে॥
আর দুই হস্ত থাকি কিবা প্রয়োজন।
মৃত দেহের হস্ত তুল্য তাহার গণন॥
সাধুমূর্ত্তি কৃষ্ণমূর্ত্তি না দেখে লোচনে।
তার চক্ষু বৃথামাত্র অন্ধের সমানে॥
ময়ুরের পুচ্ছ যেন চক্ষু সমাকার।
শ্রীমূর্ত্তি না দেখিল তৈছে চক্ষু তার।
কৃষ্ণক্ষেত্র সাধুতীর্থ শ্রীগুরুদর্শনে।
যেবা জন নাহি জান থাকিতে চরণে॥
তাহার চরণ দুই সচল বৃক্ষোপম।
ইন্দ্রিয় থাকিতে হয় অনীন্দ্রিয় সম।
কৃষ্ণপদ ধূলি বাঞ্ছা রহিত যত জন।
দেহ থাকিতে তার জীবনে মরণ॥
জীবনে সে মৃত তুল্য কৃষ্ণ ভক্তি বিনে।
না মজিল জার চিত্ত গোবিন্দ চরণে॥
শ্রীভাগবতে সৌনিকবাক্যং সূতং প্রতি যথা।
বিলে বতোরুক্রম বিক্রমান্ যে
ন শৃন্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বা সতী দার্দ্দুরিকেব সুত
ন যোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ।
ভারং পরং পট্টকিরীট জুষ্ট

মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌ নো কুরতঃ সপর্য্যাং।
হরের্ন্নসৎ কাঞ্চন কঙ্কনৌবা ॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ননিরীক্ষতো যে।
পাদৌনৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজ্যৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুন্
ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেতযস্ত।
ইত্যাদি প্রকারে মন সিক্ষাইল তোরে।
ভজিঞা গোবিন্দ পদ কৃতার্থ কর মোরে।
ভক্তি করি ভজ হরি সকল ছাড়িঞা।
কায় মন বাক্যনিষ্ঠা সুদৃঢ় করিঞা ॥
আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগ সাংখ্য জ্ঞান জত।
কর্ম্মযোগ ক্রিয়াযোগ হইঞা বিরত ॥
ভক্তিযোগে সেব হরি পরম আনন্দে।
মতি নিবেসিঞা পুন গুরুপদ দ্বন্দ্বে ॥
ভক্তিভাবে ভক্তবশ্য হয় ভগবান।
উদ্ধবে কহেন কৃষ্ণ ভাগবতে প্রমাণ ॥
কৃষ্ণ কহেন সুন উদ্ধব প্রিয় মোর।
ভক্তিভাবে বসীভূত আমি হই তোর ॥
যোগের সাধনে আমি জত বস নই।
সাংখ্য যোগ দান তপস্যা আদি কই ॥
এ সব সাধনে বস করিতে সে ত নারে।
ভক্তিভাবে ভক্তগণ বস করে মোরে ॥
একাদশে
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্মউদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়ো তপো যোগো যথা ভক্তি মমোর্জ্জিতা ॥
এই কথা কহেন ব্রহ্মা সাক্ষাতে ভগবানে।
দন্তকরি আপনাকে প্রভুর চরণে ॥
মুক্তি হেতু ভক্তি ছাড়ি জ্ঞান উপাসয়ে।
তার সিদ্ধি নাহি-হয় ক্লেশভাগি হয়ে ॥

বীরভূমি ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা,
কার্ত্তিক, ১৩২০।

বিজয়া।

আনন্দময়ীর আগমন জগতের অন্যান্য ঘটনার মত চঞ্চল জগতের একটি সাধারণ ঘটনা নহে। আমাদের মায়িক জগতের ঘটনাগুলি দেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ—এক স্থানে হয়, অন্য স্থানে হয় না; সময়ের এক মুহূর্ত্তে আরম্ভ হয় অন্য মুহূর্ত্তে শেষ হইয়া যায়,। প্রাচীনকালের সাধুগণ বার বার বলিয়া গিয়াছেন আনন্দময়ীর আগমন এপ্রকারের একটি ঘটনা নহে। ইহা নিত্যলীলা। আগমনও নিত্য, বিসর্জ্জনও নিত্য। তিনি সর্ব্বদাই আসিতেছেন, সকল যুগে, সকল দেশে সকল জাতির ও সকল ব্যক্তির জীবনে স্বচ্ছ শরতের হরিদ্রাভ কোমল কিরণ সঞ্চারিত করিয়া তিনি আসিতেছেন, তাঁহার চরণ নখরের বিমল আভায় আমাদের সকল মোহ, সকল হিংসা, সকল দ্বন্দ্ব ও সকল ভেদ দূর করিয়া তিনি আবির্ভূত হয়েন, স্পর্শমণির স্পর্শে কয়েকদিনের জন্য পৃথিবীর ধূলাও সোণা হইয়া যায়। মাটির জগতের মধ্য দিয়া গোলকবৈকুণ্ঠের দিব্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠে। তিনি আসেন, নিত্যই আসেন। আমরা ধরিতে পারিনা—তিনি চলিয়া যান, কিন্তু এই চলিয়া যাওয়া, চলিয়া যাওয়ার জন্য নহে "পুনরাগমনায় চ" আবার আসিবার জন্য। বিজয়ার দিন বিসর্জ্জন হয়—আমরা কাঁদি—কিন্তু এই ক্রন্দনের মধ্যেই বিজয়া। আনন্দময়ী চলিয়া গেলেন—এইটুকু বুঝিয়া যদি কাঁদিতে পারি—সত্যই যদি অনুভব করি—

"এই ছিল কোথা গেল কমলদলবাসিনী" তাহা হইলেই আমরা বিজয়ী। তুমি ছিলে, চলিয়া গিয়াছ, আবার আসিবে—এই চিন্তায় তন্ময় হওয়া, ইহার সাধারণ অর্থ এই, আমরা বিশ্বজননীর সন্তান—'অমৃতস্য পুত্রাঃ' কিন্তু কি জানি কেন আজ মরণের আঁধারে ডুবিয়াছি, কিন্তু এ আঁধার থাকিবে না—আবার, আমরা নিজের স্বরূপে আরোহণ করিব, এই, জ্ঞান ও বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়াইয়া বিজয়ার উৎসব করা। বিজয়ার উৎসব কি? প্রেমে কোলাকুলি করা—হৃদয়ে হৃদয়ে সুমধুর মিলন প্রতিষ্ঠা করা। আর কি? আজ এই বিজয়া। আমরা এই আগমনী ও বিজয়ার নিত্যলীলা অনুভব করিতে চাই—এই, নিত্যলীলার অনুভূতিতে বিশ্ববাসীকে আনয়ন করিয়া ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে চাই।

এই কার্য্য সাধনে শক্তি আছে কি নাই তাহা আমরা জানি না, তাহা ভাবিবার চেষ্টাও আমাদের নাই। মায়ের এই আবাহন, জগজ্জননী মহামায়ার এই নিত্য পূজা আমাদের করিতেই হইবে। মায়ের দশ হস্ত দশ দিক রক্ষা করিতেছে—মায়ের ত্রিনয়ন ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান ত্রিকাল ব্যাপ্ত করিয়াছে—এমনি করিয়া দেশ কাল ব্যাপ্ত করিয়া বরাভয়করা প্রসন্নবদনা দেবী আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার সিদ্ধি, শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান। আমরা এমন মায়ের পূজা না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। আমরা শক্তিহীন, তাহা জানি, জানি মা মহাশক্তি, আরও জানি "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ॥ কিন্তু তবু আমরা নিজের সামান্য শক্তিতেও তাঁহার পূজার অর্ঘ্যডালা সাজাইব।

শ্রীশ্রীকুন্তীদেবীর স্তব। (৪)

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

দুরূহ এ শেষ তত্ত্ব নরলীলা তব।
আমার শকতি নাই, করি অনুভব॥
তাই মগ্ন নিরাশায়, আমার হৃদয়, হায়,
অবসাদে ডুবে যাই বেদনা কাতর,
এ লীলা আমার কভু হবে না গোচর।
আপনারে শক্তিহীন, জানি আমি অনুদিন,
চেষ্টা ছেড়ে বসে থাকি আশা শূন্য মন,
কিন্তু, তুমি কৃষ্ণ, তবু কর আকর্ষণ॥
মোরা চাই—ভুলে যাই, কিন্তু তুমি সর্ব্বদাই,
আলস্য ও সুপ্তি ভেঙ্গে দাও জাগাইয়া,
আপন চরণ পানে নিতেছ টানিয়া।
তোমার এমনি টান, থাকে নাকো কোন জ্ঞান,
পাব কি না পাব চিন্তা জাগেনাকো মনে,
ব্যাকুল পিপাসা শুধু তোমার কারণে।

এইবার ভাবিতেছি, প্রেম ফাঁদে পড়িয়াছি,
পেতেই হইবে তারে নাহিক নিস্তার,
উপায় কি নাই কিছু তোমারে পাবার ?
মনে হয় এইবার, নাই কেহ এ প্রকার,
মধ্যস্থ করিতে যারে পারি তোমা পেতে !
প্রবলা এ চিন্তা জাগরিত হয় চিতে।
নাই কেহ এ প্রকার, তোমার সহিত যার,
ভাল পরিচয় আছে, অথচ সে জন,
অন্যদিকে সম্বন্ধেতে আমারো আপন ?
ওহে কৃষ্ণ গুণধাম, **বাসুদেব** তব নাম
বসুদেব ভ্রাতা মোর আপনার জনা।
বসুদেব পুত্ররূপে করিলে করুণা॥
এই সম্পর্কেতে হরি, তোমারে আপন করি,
তোমায় পাইতে পারি হতেছে সাহস,
তুমি ভক্তিপ্রিয় নাথ, ভক্তজন বশ॥
পিতা বসুদেব হ'তে, জননী শ্রীদেবকীতে,
তোমার করুণা বেশী, করুণা নিলয়
দেবকীও প্রেমবতী অধিক নিশ্চয়।
দেবকীনন্দন তুমি ওহে অখিলের স্বামী,
গর্ভে থাকি আনন্দিত করিলে তাহারে,
সর্ব্বোচ্চ সমৃদ্ধি তারে দিলে অকাতরে॥
শ্রীদেবকী প্রেমবতী, আমার আত্মীয় অতি,
দেবকীর সম্পর্কতে তুমিও আপন
এই কথা ভাবি সাহসেতে পূর্ণ মন।
কিন্তু তব প্রেমলীলা, মধুর বাল্যের খেলা,
বসুদেব দেবকী না করিলা দর্শন।
সে সৌভাগ্য তাহাদের হয়নি কখন॥
সে লীলা ব্রজের লীলা, ব্রজধামে সম্পাদিলা,
সেখানেতে তুমি হরি **শ্রীনন্দকুমার,**
মধুর তোমারলীলা মাধুর্য্য অপার।

দেবকী ও বসুদেবে, আপনার জন ভেবে,
তাহাদের সম্পর্কেতে নন্দেও আপন,
ভাবিয়া তোমারে হেরি শ্রীনন্দনন্দন ॥
এই ব্রজধামে হরি, তোমারে স্বরূপে হেরি
পূর্ণতম সুপ্রকাশ তব এই স্থানে,
গোবিন্দ বলিয়া ভক্তজনেতে বাখানে ॥
'গা' বলিতে সকলের সর্ব্বেন্দ্রিয় হয়
তাহা আকর্ষিয়া হও তাহার বিষয় ॥
তব কৃপাপাত্র যাঁরা, ভবে সাধু গুরু তাঁরা,
তাঁদের পদারবিন্দ করিলে আশ্রয়
এ প্রকারে ক্রমে ব্রজে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়।
এই পথ সাধনার সর্ব্ব পথ সার
এই পথে মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

দেশ ও কাল।

বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বোধোদয়ে" যে দিন প্রথম পড়িয়াছিলাম "ঈশ্বর নিরাকার", "চৈতন্যস্বরূপ", "সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান" সেই দিন হইতে "সর্ব্বদা" ও "সর্ব্বত্র" এই শব্দ দুইটী আমার প্রাণের একাংশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের অর্থ বুঝিবার জন্য কত চিন্তা করিয়াছি; শাস্ত্রে, দর্শনে, বিজ্ঞানে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়াছি; এতৎসম্পর্কে জ্ঞানীলোকের অভিমত অবগত হইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু দেশ ও কালের স্বরূপ আমার জ্ঞানে সম্যক ফুটিয়াছে বলিয়া বলিতে পারি না। তথাপি দেশ ও কাল, জ্ঞানের অনধিগম্য নহে। ভগবান বলিয়াছেন—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তো জ্ঞানিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।"

জ্ঞানীগণ নিত্যানিত্য উভয় প্রকার বস্তুরই শেষ দেখিয়াছেন। অতএব আশা আছে দেশ ও কালের শেষ একদিন দেখিব। সে দিন কবে আসিবে, বলিতে পারি না। হয়ত আমার সে শুভদিন আসিবার পূর্ব্বে

কত মন্বন্তর চলিয়া যাইবে, কত ব্রহ্মার আয়ুঃশেষ হইবে, কত কল্পান্ত হইবে। তথাপি বিশ্বাস করি একদিন আমি দেশ ও কালময় ব্যাপ্ত হইয়া, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া, দেশ ও কালের স্বরূপ অবগত হইব।

এ আশা পাগলের খেয়াল নহে; এই আশা পূর্ণ হইবার অবশ্যম্ভাবিতা অনিবার্য্য। দেশ ও কালেই আমাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। দেশ ও কালের দ্বারা খণ্ডিত হইয়া আমরা মৃত্যুর আবর্ত্তে ঘুরিতেছি, কিন্তু এই খণ্ডতা অতিক্রম করিয়া অখণ্ডমণ্ডলাকারে মিলিলেই অমৃতত্ব লাভ করিব। মানুষের মধ্যে অনেকেই "বেদাহং পুরুষম্" ইত্যাদি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের অগ্রবর্ত্তী পথিক, দ্রুতগতিতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছেন; আমরা দুর্ব্বল ও মন্দগামী বলিয়া পথেই পড়িয়া থাকিব না; শীঘ্র বা বিলম্বে হউক, আমরা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইব। এ মিলন অবশ্যম্ভাবী, কারণ মৃত্যু আমাদিগকে অনেক পরিমাণে দেশের খণ্ডতা অতিক্রম করাইয়া লয়, আর পারম্পর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া গেলেই কালের খণ্ডতা আপনা হইতেই অন্তর্হিত হয়। কিন্তু এ সকল কথা পরে বলিব, এখন ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দিক হইতে বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক্।

দেশ ও কালের প্রথমলক্ষণ এই যে ইহারা সর্ব্বপ্রকার আধেয়ের আধার। পদার্থমাত্রকেই জড় ও অজড়ভেদে দ্বিধা বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে জড়পদার্থ দেশে (Space) অবস্থিতি করে,—কোন জড় পদার্থই স্থান অধিকার না করিয়া অবস্থিত হইতে পারে না। বাস্তবিক বিজ্ঞান বলেন যে দেশ জুড়িয়া থাকা বা extension জড় পদার্থের প্রধান ও মৌলিক লক্ষণ। এইজন্য একই সময়ে দুইটী জড়পদার্থ একই স্থানে বা দেশের একই অংশে থাকিতে পারে না। কাগজে যখন সূচী বিদ্ধ করি, তখন কাগজের অণুগুলি সূচীর জন্য স্থান ছাড়িয়া দেয়, ইহারা স্থান ছাড়িয়া না দিলে, সূচী দেশের সেই অংশ অধিকার করিতে পারে না। তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে দেশই জড়পদার্থের উপকরণ। শক্তিপ্রভাবে দেশই জড়পরমাণুতে পরিণত হয়। চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে দুইটী সমবল অথচ বিপরীতগামী শক্তি দেশের যে বিন্দুতে মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রকট-ক্রিয়া অপ্রকট করিয়া দেয়, তাহাই পরমাণু। এই পরমাণু অন্তঃশক্তিপ্রভাবে দেশের

অংশ হইতে অংশান্তরে পরিচালিত হয়। কিন্তু যখন যে বিন্দু পূর্ব্বকথিত শক্তিদ্বয়ের মিলনকেন্দ্র হয়, তখন সেই বিন্দুই ঐ পরমাণুর প্রধান উপাদান। বিন্দুই পরমাণু, শক্তিদ্বয় বিন্দুর পরমাণুতে পরিণতির সহযোগী কারণ মাত্র। অতএব দেশই জড়পদার্থে পরিণত হয়। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে এই পরিণতি ক্রিয়া লক্ষ্য করিতে পারি না; এইজন্য দেশ জড়পদার্থের আধাররূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।

পক্ষান্তরে অজড়পদার্থমাত্রেই কালে অবস্থিতি করে—কোন অজড়পদার্থ (যথা—চিন্তা, ঘটনা ইত্যাদি) কালের অংশ বিশেষ অধিকার না করিয়া অবস্থিত হইতে পারে না। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী শিশু জন্মিয়াছিল। এই জন্মরূপ ঘটনা কালকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত, কালই এই ঘটনার আধার। রামের দয়া আছে, এই দয়া কোথায় আছে? তাহা বর্ত্তমান কালে আছে, অতীতকালে হয়ত ছিল না। ভবিষ্যৎকালে হয়ত থাকিবে না। অতএব কালই দয়ার আধার।

দেশ ও কালের দ্বিতীয় লক্ষণ অসীমতা। আমরা এক্ষণে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে আকাশে যত নক্ষত্র আলোর বেগে স্পন্দিত হয়, তাহাদের প্রত্যেকটী একটী সূর্য্যমণ্ডল ও তাহা গ্রহ-উপগ্রহ পরিবৃত। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে এমন নক্ষত্ররাশি রহিয়াছে, যাহাদের আলো প্রতি সেকেণ্ডে বহুসহস্র মাইল চলিয়াও এ যাবৎ পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে নাই। ইহা হইতেই দেশের (space) বিস্তৃতি সম্বন্ধে কল্পনাসাহায্যে ধারণা করাও আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। ইহার উপর যখন জ্যোতির্ব্বিদ্গণ অনুমান করেন যে নক্ষত্ররূপী সূর্য্যমণ্ডলসমূহ কোন কেন্দ্রীভূত বৃহত্তর সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিক গ্রহরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং ঐ প্রকার কেন্দ্রীভূত সূর্য্যমণ্ডল কোটী কোটী বর্ত্তমান থাকিয়া তদপেক্ষা বৃহত্তর মণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন; এবং এইরূপে কেন্দ্রীভূতের কেন্দ্রীভূত গননা করিয়া অন্ত পাইবার উপায় নাই, তখন

ডুবে যাই, বলি, হে অপার!
অনন্ত কি, তুমি জান! আমি ক্ষুদ্র কীট
তব তত্ত্ব তত্ত্বাতীত! কি আর বর্ণিব?

অতএব দেশ অনন্ত। কালেরও সীমা পাইবার যো নাই। কাল ছিল না এমন একটী অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে কাল ছিল।

পরেও থাকিবে। অবস্থা অনবস্থা উভয়েরই আধার কাল; কারণ যে চিন্তার সাহায্যে আমরা অবস্থা বা অনবস্থার ধারণা করি সেই চিন্তাস্রোত কালবাহী।

আর একটী বিষয় আমাদিগকে অনুধাবন করিতে হইবে। দেশ ও কাল যেমন অনন্ত, দেশ ও কালের অতি ক্ষুদ্রতম অংশও সেইরূপ অনন্ত। একলক্ষ পদ্মপত্র উপর্য্যুপরি রাখিয়া তাহা কল্পনার সাহায্যে সুচীবিদ্ধ করিলে, একটী পদ্মপত্র ভেদ করিতে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহাও অনন্ত; কারণ সময়ের এই ক্ষুদ্রতম অংশ যে পৃথিবীর সকল বিভিন্ন স্থানেই বর্ত্তমান। কেবল পৃথিবীতে কেন, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক প্রভৃতির মধ্যে কোন্‌লোকে এই মুহূর্ত্তাংশ অবর্ত্তমান? একই সময় কেহ পদ্মপত্র ভেদে, কেহ চিন্তায়, কেহ পাঠে, কেহ পরোপকারে, কেহ বা নিদ্রায় অতিবাহিত করিতেছে, সকলের নিকটেই কিন্তু তাহা সমভাবে উপস্থিত রহিয়াছে। এইরূপে কালের ক্ষুদ্রাংশ অনন্ত দেশের সর্ব্বাংশে বর্ত্তমান থাকিয়া অনন্ত হইয়াছে। আবার দেশের যাহা ক্ষুদ্রতম অংশ, যাহাকে সাধারণতঃ বিন্দু বলা যায়, তাহাও কাল সম্পর্কে অনন্ত। দেশের কোন অংশই ধ্বংশ নিয়মের অধীন নহে, তাহা অস্তিত্বের আধাররূপে সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকিয়া অনন্তত্ব প্রাপ্ত হয়।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা চারিটী ভাবিবার বিষয় প্রাপ্ত হইতেছি। (১) দেশ দেশে অনন্ত, অর্থাৎ কল্পনাতেও তাহার সীমা পাইতে পারি না। আধেয় পরিমিত হইতে পারে, কিন্তু আধাররূপী দেশের পরিমাণ করা অসম্ভব। কারণ সর্ব্বপ্রকার সীমার বাহিরেও তাহা বর্ত্তমান আছে। (২) দেশ কালে অনন্ত। সমগ্রদেশ যেমন কালের সর্ব্বাংশে বর্ত্তমান, তাহার ক্ষুদ্রতম অংশও সেইরূপ অনন্তকালে বর্ত্তমান। (৩) কাল কালে অনন্ত, অর্থাৎ তাহার আরম্ভ বা শেষ কল্পনা করা যায় না। (৪) কাল দেশে অনন্ত। সমগ্রকাল দেশের সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া যেমন বর্ত্তমান, কালের ক্ষুদ্রতম অংশও সেইরূপ দেশ সম্পর্কে অনন্ত।

দেশ ও কালের তৃতীয় লক্ষণ অচলতা বা স্থাণুত্ব। এ দেশে ঘটাকাশ নামে একটা কথা নৈয়ায়িকদের কৃপায় প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ ঘটের ভিতরের অবসর মাত্র অথবা ঘট-পরিচ্ছিন্ন দেশ। ঘট স্থানান্তরিত করিলেও ঘটাকাশ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তজ্জন্য "আকাশ" বা ঘট-পরিচ্ছিন্ন দেশ স্থানান্তরিত হয় না। দেশ অচল ও স্থাণু। দেশ গতিবিশিষ্ট হইতেই পারে

না। কারণ তাহার গতির অবকাশ নাই। অপরিচ্ছিন্নতা ও অসীমতা বশতঃ তাহার নড়িবার যো নাই। আপনার ভিতরেও তাহার কোন গতি নাই, কারণ প্রপঞ্চগত পদার্থের ন্যায় তাহা পরমাণু গঠিত নহে; পরন্তু ইহা অচ্ছিদ্র ও সনাতন অর্থাৎ সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ রহিত। অতএব দেশের স্থাণুতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

কালের অচলতা এদেশে প্রসিদ্ধই আছে। শাস্ত্রে কালকে "অখণ্ড দণ্ডায়মান" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। "অখণ্ড" শব্দ দ্বারা আভ্যন্তরিক অচলতা ও "দণ্ডায়মান" শব্দ দ্বারা সমগ্রকালের গতিহীনতা প্রতিপাদিত হইতেছে। "সময় গেল" "বহুকাল অতীত হইয়াছে" ইত্যাদি প্রচলিত কালের গতিসূচক বাক্যাবলী, "সূর্য্য উঠিয়াছে" "পশ্চিমাকাশে রবি হেলিয়া পড়িলেন" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় ভ্রান্তিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন।

দেশ ও কালের চতুর্থলক্ষণ অবিকারিতা। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ দেশকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান আছে। বিজ্ঞান নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে শক্তির তিনটি লক্ষণ আছে। গতির চেষ্টাই শক্তির স্বরূপ। শক্তির এই গমন চেষ্টা কোন নির্দ্দিষ্টদিকে হইবে, তাহার বলের একটা পরিমাণ থাকিবে, এবং শক্তির একটা অবলম্বন থাকিবে। আমরা মনে করি জড় পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই শক্তি ক্রিয়া করে। কিন্তু যথার্থতঃ শক্তিই জড়। জড় পদার্থের সুক্ষ্মতম অংশ যে পরমাণু, তাহা বিপরীতগামী সমবল শক্তিদ্বয়ের মিলন ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেশের অংশ-বিন্দুতেই এই শক্তিদ্বয়ের মিলন হয়। সুতরাং শক্তির প্রকৃত অবলম্বন দেশ (Space)। শক্তি দেশকে অবলম্বন করিয়া কত ক্রীড়াই করিতেছে!—পরমাণু গড়িতেছে এবং পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ দ্বারা কতপ্রকার সৃষ্টি ও ধ্বংশ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে। অবিরাম পরিণামের ভিতর দিয়া জগৎ ছুটিতেছে এবং জগদুপাদান বস্তুসমূহের শক্তিকৃত বিকার ক্রিয়া জগতের স্থিতি রক্ষা করিতেছে। কিন্তু এই অনন্ত বিকার সমষ্টির আধারভুত দেশ অবিকৃত থাকিয়া যাইতেছে। যাহা দেশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, তাহাতেই বিকার ঘটিতেছে, দেশে বিকার নাই। দেশ যাহা ছিল, তাহাই আছে ও চিরকাল থাকিবে। বজ্রপাত, ভূমিকম্প. ভীষণ ঝড়, মানুষের উপদ্রব, দেশের বুকের উপর সংঘটিত হয় বটে, কিন্তু দেশের তাহাতে কোন প্রকার বিকারই ঘটাইতে পারে না। দেশ সর্ব্বদা বিকারশূন্য।

মহাকালও ঠিক এইরূপেই অবিকারী। কালের উপর দিয়া ও তাহাকে আশ্রয় করিয়া কত ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সে স্বয়ং অবিকৃত ও অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যাইতেছে। মানসিক চিন্তা মাত্রেরই আশ্রয়, কাল। মনের কতপ্রকার বিকার অনবরত ঘটিতেছে, চিন্তাস্রোত পরিণামের ভিতর দিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতনাকার ধারণ করিতেছে, কিন্তু কালের বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন বা পরিনমন নাই।

দেশ ও কালের পঞ্চম লক্ষণ অখণ্ডতা। মনে করুন একটী মৃণ্ময় কলস আছে। যখন তাহার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্য মৃৎপাত্র হইতে তাহাকে পৃথক বলিয়া ভাবি, তখন ইহাকে কলস নামে অভিহিত করি। কিন্তু যদি কেবল তাহার উপাদানের প্রতি লক্ষ্য স্থির হয় এবং একটী ধাতু নির্ম্মিত পদার্থের সহিত তাহার তুলনা করি, তবে ইহা মৃত্তিকা মাত্র। এইরূপে চৈতন্যের সহিত তাহার তুলনা করিলে, ইহাকে জড়পদার্থ বলি। অতএব দেখিতেছি যে দেশের যে অংশটী শক্তির আশ্রয়স্বরূপ হইয়া শক্তি-নির্ম্মিত পরমাণুর স্পন্দন সাহায্যে আমাতে কলসজ্ঞান জন্মাইয়াছিল, তাহাই অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া মৃত্তিকা জ্ঞান, জড় জ্ঞান প্রভৃতির কারণ হইতে পারে। যে অজ্ঞব্যক্তি জড় ও অজড়ের ভেদ বুঝিতে পারে না তাহার নিকট কলস জড়জ্ঞান উপস্থিত করিতে পারিবে না। আবার সিদ্ধ পরমার্থদর্শী পূজকের নিকট এই কলস ব্রহ্মঘটের আকারে স্থাপিত হইয়া দেবজ্ঞান, এমন কি, ব্রহ্মজ্ঞান আনয়ন করিতে পারে। দেশকে খণ্ডভাবে চিন্তা করিয়া আমরা যে জ্ঞানলাভ করি, তাহা দেশজ্ঞান নহে, প্রত্যুত তাহা দেশাশ্রয়ী বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের পরস্পর তুলনাজ্ঞান। যেমন দেশকে কল্পনায় খণ্ড করিয়া এক খণ্ডকে ঘট, অন্য খণ্ডকে কলস, অন্য খণ্ডকে গ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করি, তেমনই কালকেও কল্পনায় খণ্ড করিয়া, এক খণ্ডকে দিবা, অন্য খণ্ডকে সন্ধ্যা, একখণ্ডকে জীবন, অন্য খণ্ডকে মরণ, একখণ্ডকে সাধুতা, অন্য খণ্ডকে নরহত্যা ইত্যাদি বলিয়া থাকি। এইগুলি প্রকৃত-পক্ষে কালের খণ্ড নহে। ইহারা কালের আধেয় শক্তিসমূহের ক্রিয়াজনিত অবস্থামাত্র। বস্তুতঃ দেশ ও কাল অখণ্ড।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে আমরা দেশ ও কালের সনাতনত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। তখন দেশ ও কাল আর পৃথক থাকে না, এক হইয়া পড়ে; সনাতন অর্থ সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য। মানুষ ও পশুতে যে ভেদ তাহা

বিজাতীয় ভেদ, আর মানুষে মানুষে যে ভেদ তাহা সজাতীয় ভেদ। বায়ু ও জলে যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ। আর বায়ুর বিভিন্ন স্তরে যে ঘনত্বের ভেদ তাহা সজাতীয় ভেদ। এখন, দেশ ও কালের যে সজাতীয় ভেদ নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু দেশ ও কালের পৃথক সত্ত্বা স্বীকার করিলে ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিজাতীয় ভেদ ঘটিয়া পড়ে এবং সনাতনত্ব টিকিতে পারে না। কিন্তু স্বরূপতঃ দেশ ও কালের সত্ত্বা পৃথক নহে। উভয়েই জগদাধার রূপে বর্ত্তমান। যাহা দেশে আছে, তাহা কালেও আছে আর যাহা কালে আছে, তাহা দেশেও আছে। আমার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি শরীর অবলম্বনে আমি দেশে আছি এবং আমার চৈতন্যের ক্রিয়া দ্বারা আমি কালে আছি। এই পাষাণ খণ্ড যেমন দেশের একাংশ জুড়িয়া আছে তেমনই কালের একাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে ও করিবে। কাহারও জন্ম বা মৃত্যুরূপ ঘটনা যেমন কালে ঘটে তেমনই দেশকে আশ্রয় না করিয়া তাহার অস্তিত্ব প্রকট করিতে পারে না। দেশ আশ্রয়েই জন্ম বা মৃত্যু আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারি; এবং কালাশ্রয়েই জন্ম বা মৃত্যু আমাদের চিন্তায় উপলব্ধ হয় এবং স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। দেশ সচ্চিদানন্দের সদংশ, আর কাল তাঁহার চিদংশ। দেশ ও কাল, সৎ ও চিৎরূপে, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তির মহাযোগ দ্বারা হ্লাদিনী শক্তির বিকাশের ফলে যে আনন্দের বিকাশ সাধন করে, মহাযোগী মহেশ্বর সেই আনন্দে বিভোর হইয়া আছেন।

আমরা দেশ ও কালের স্বরূপ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিব যে তাহারা এক পারম্পর্য্য মাত্র। দেশ আমরা তাহাকে বলি যাহার মধ্যে একটীর পর একটী করিয়া জড় পরমাণু সজ্জিত থাকিতে পারে। কালের মধ্যেও এইরূপে ঘটনা, চিন্তা বা ভাবের পর পর সমাবেশ আছে। একটীর পর একটী চিন্তা মনের মধ্যে উদিত হয়, একটীর পর একটী ভাব হৃদয় আন্দোলিত করে; এই পরম্পরা বিষয়ক জ্ঞানের নামই আমরা কাল রাখিয়াছি। বস্তুতঃ কাল বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ স্বীকার না করিলেও চলে। জড় বিষয়ক পরম্পরা-জ্ঞান দেশ, ও অজড় বিষয়ক পরম্পরা জ্ঞান, কাল নামে অভিহিত। আমার পার্শ্বে গৃহের দেওয়াল, তাহার পরে প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের পরে বৃক্ষ, বৃক্ষের পরে মাঠ অবস্থিত। পৃথিবীর পরে মঙ্গল গ্রহ, মঙ্গলের পর বৃহস্পতি, বৃহস্পতির পরে শনি, তৎপরে আরও কত কি আছে অথবা থাকিবার অবকাশ

আছে। এই পরম্পরা জ্ঞানই মূলতঃ দেশ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। যখন বলি দেশ অনন্ত, তখন এই মাত্র বুঝি যে পর পর করিয়া কত বস্তু সাজান যাইতে পারে, তাহার কোন সীমা নাই। এইরূপে জ্ঞানের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সীমা থাকিলে, কালের অনন্তত্ব থাকিত না। অতএব প্রতীত হইতেছে যে পরম্পরা জ্ঞানের একদিক দেশ ও অপর দিক কাল; এতদুভয়ই একই বস্তুর অবস্থা-ভেদ মাত্র।

পূর্ব্বে বলিয়াছি জড়বস্তুর মূল উপাদান দেশ। সমবল বিপরীতগামী শক্তিদ্বয়ের সংঘর্ষে দেশই জড় পরমাণুতে পরিণত হয়। শক্তিদ্বয় সংহত হইলে পরমাণুরূপ দেহ সৃষ্ট হয় বলিয়া তাহাকে সংঘাত বলে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে এই অর্থে সংঘাত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শক্তির সংহননের পূর্ব্বাবস্থা ভবিষ্যৎ, সংহননের অবস্থা বর্ত্তমান, এবং সংহনন হইয়া গেলে "ভূত" উৎপন্ন হয়। জড় উপাদান কালের পরিণাম বলিয়া তাহাকে ভূত বলে। এক দিক দিয়া দেখিলে তাহা কালের পরিণাম। অথচ দেশ ও কালের পরিণাম নাই, তাহারা অবিকারী, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জ্ঞান রাজ্যে অসংখ্য স্তর আছে এবং বিভিন্ন স্তরে একই বস্তুর প্রকৃতি বিভিন্নরূপে উপলব্ধ হয়। এই অবোধ্য অবস্থাটীকেই শাস্ত্রকারেরা মায়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মায়া "অনির্ব্বচনীয়" এইজন্য তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া অসম্ভব। মায়িক জগতে সকল বস্তুই পরিণামী, তবে আপেক্ষিক ভাবে অপরিণামী পদার্থও আছে। দেশ ও কাল জগতের নির্ব্বিশেষ উপাদান বলিয়া তাহাদিগকে অপরিণামী বলা যাইতে পারে।

হিন্দুর শাস্ত্রে দেশ ও কালের পৃথকত্ব স্বীকৃত হয় নাই। শাস্ত্রমতে কালের অপরিজ্ঞাত অবস্থার নাম ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্মাবস্থার নাম বর্ত্তমান, এবং স্থূলাবস্থার নাম ভূত। এই ভূত সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হইয়া আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূতে বিভক্ত হয়। সত্ত্বাদি গুণত্রয় শক্তির অবস্থাত্রয় মাত্র। সুতরাং শক্তির উপযোগে কাল পঞ্চভূতের আকার ধারণ করে। এই দৃশ্য জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই ভূতের অন্তর্গত। কিন্তু স্বরূপ অবস্থায় কাল অখণ্ড দণ্ডায়মান ও ব্রহ্মপদ বাচ্য। এই সর্ব্ব সমষ্টি হইতে যখন ব্যষ্টি ভাবের প্রারম্ভ হয়, তখনই দুইটী বিন্দু লক্ষিত হয়—ইহার একটী পরিণামী অপরটী অপরিণামী। এই দুই বিন্দুর

নাম বিসর্গ (ঃ)। অর্থাৎ বি=বিশেষ+সর্গ=সৃষ্টি। অপরণামী বিন্দুটী গীতার অক্ষর পুরুষ এবং পরিণামী বিন্দু ক্ষর পুরুষ। মাতৃগর্ভে পুংবিন্দু অক্ষর ও স্ত্রীবিন্দু ক্ষর। পরমাণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সকল ভূতই বিন্দুদ্বয় হইতে উৎপন্ন The universe is built between two points—the two poles, প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থ ই মেরুদ্বয় বিশিষ্ট।

কালের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই বিভাগত্রয় মানবের কল্পনা মাত্র। 'বস্তুতঃ কালের . সর্ব্বাংশই যুগপৎ বর্ত্তমান। আমরা যে অংশ অতিক্রম করিয়াছি তাহাকে ভূত, যে অংশ অতিক্রম করিতেছি তাহাকে বর্ত্তমান এবং যে অংশে এখনও পৌঁছিতে পারি নাই তাহাকে ভবিষ্যৎ বলি। কালের দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ প্রভৃতি অশেষ প্রকার আয়তন আছে, তন্মধ্যে মানবের ক্রমবিকাশ একটী মাত্র সরলরেখা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। একটী বিন্দু হইতে অসংখ্যদিকে যেমন অসংখ্য সরলরেখা টানা যাইতে পারে, তেমনই একটী মুহূর্ত্ত, ভূত ও ভবিষ্যৎ উভয়দিক দিয়া অসংখ্য কাল রেখা অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। এই অসংখ্য কালরেখার মধ্যে একটীমাত্র মানবীয় ক্রমবিকাশের আশ্রয়। অন্যান্য রেখা পৃথক পৃথক জাতীয় ক্রম-বিকাশের আশ্রয় ভূমি। এই বিশ্বে অসংখ্য সৌরমণ্ডল ও তদন্তবর্ত্তী গ্রহ উপগ্রহাদি রহিয়াছে। তন্মধ্যে কোন্‌টী কোন কালরেখা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, তাহা আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই।

মানবের ব্যক্তিগত চৈতন্য মানবীয় কালরেখাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। এই ব্যক্তিগত চৈতন্যাশ্রিত জ্ঞান (Consciousness) জ্যামিতির বিন্দুর ন্যায় মানবীয় কালরেখার অনুগ হইয়া যে গতিলাভ করিয়াছে, সেই গতিই মানব-জীবন। জীবনরূপী কালরেখার যে অংশে আমার চৈতন্যাশ্রিত জ্ঞান (Consciousness) বর্ত্তমানে উপস্থিত আছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ আমার স্মৃতি ও পরবর্ত্তী অংশ আমার জীবনাদর্শরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা মনে করিয়া থাকি যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু আদর্শরূপী ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তন যোগ্য। বস্তুতঃ ভূত ও ভবিষ্যৎ উভয়েতেই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কারণ মানবীয় কালরেখাটীও গতিবিশিষ্ট। যেমন পৃথিবীকে বেষ্টন পূর্ব্বক পরিভ্রমণকারী চন্দ্র পৃথিবীর গতি প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য-মণ্ডলকেও পরিভ্রমণ করে, তেমনই মানবীয় কালরেখা ঐশ্বরিক কালরেখার গতি প্রাপ্ত হয়। এই গতি বশতঃ মানবের ভূত ও ভবিষ্যৎ উভয়েতেই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে।

এখন মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে যে মানবীয় কালরেখার সমগ্র-ভাব অর্থাৎ সর্ব্বাংশই মানবজীবন। মানবজীবন অর্থে এস্থলে মানবীয় ক্রম-বিকাশের সর্ব্বাংশ বুঝিতে হইবে। আজ পর্য্যন্ত মানবের যে পরিমাণ জ্ঞান বিকাশ হইয়াছে, তাহাতে আমরা কেবল এই কালরেখার একটীমাত্র বিন্দু যাহাকে বর্ত্তমান বলি—জানিতে পারিতেছি। অতীতাংশ সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই ; অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই আমাদের নিকট অনুপস্থিত। মানবীয় কালরেখার সমগ্রটাই আমি, আমার চেতনা বা চৈতন্যাশ্রিত জ্ঞান (Consciousness) এই রেখার এক বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুতে সঞ্চারিত হইতে হইতে যে চলিয়াছে, তাহাতে আমারই বিভিন্নাংশ সম্বন্ধে আমি জাগ্রত হইতেছি ; সমগ্র রেখাটীই আমি। যে সকল বাধা আমার বা মানবীয় কালরেখার সমষ্টিজ্ঞান হইতে আমাকে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে অতিক্রম করা অসম্ভব নহে। উপনিষদের ঋষি মানবীয় কালরেখার সমষ্টি-জ্ঞান লাভ করিয়াই বলিয়াছিলেন "বেদাহম্ পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" যখন এই জ্ঞান উপস্থিত হয়, যখন মানবীয় কালরেখার একটী মাত্র বিন্দুর (বর্ত্তমানের) পরিবর্ত্তে সমগ্র রেখাটি যুগপৎ জানিতে পারি, তখন মানবীয় কাল সম্পর্কে যে ভ্রান্তজ্ঞান বা মায়া আমার আত্মজ্ঞান বিকাশের প্রতিবন্ধতা করিতেছে, তাহা তিরোহিত হয়। তখন আর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান থাকে না, এক অনন্ত বর্ত্তমান্ মহাকালরূপে মহাজ্ঞান বা মহাবিদ্যার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়। তখন আর ভূতজ্ঞান থাকে না ; তখন যে কালের ভূতাদি বিভাগত্রয় লোপ পাইয়াছে, এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাদেব মহাদেবীকে বলিতেছেনঃ—

"কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥"

মহাকাল সর্ব্বভূতের সঙ্কলন করেন, তাঁহাতে যুগপৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জানিতে পারা যায়, কিন্তু এই মহাকাল একটী মাত্র নহে। মানবের ক্রম-বিকাশ যে কালরেখা বহিয়া চলিয়াছে, তাহা মানবীয় মহাকাল, দেবতারা যে কালরেখার আশ্রয়ে ক্রমবিকাশ সাধন করিতেছেন, তাহা দেব সম্বন্ধী মহাকাল ; এইরূপ অসুর সম্বন্ধী মহাকাল, গন্ধর্ব্ব সম্বন্ধী মহাকাল প্রভৃতি অনন্তবিধ মহাকাল আছেন। তৎসমুদয় যিনি সঙ্কলন করেন, তিনিই আদ্যা কালিকা। পরম্পরা জ্ঞানে কালের যে মূর্ত্তি প্রকটিত হইতেছে, তাহাকে

ভূত,—বর্ত্তমান ভবিষ্যৎরূপী কালরেখারূপে কল্পনা করিলে, কালের ক্ষেত্ররূপী একটী ধরাতল (Surface) ও কল্পনা করিতে হয়। বহু সংখ্যক রেখা পাশাপাশি অবস্থিত থাকিয়া একটী ধরাতল গঠিত করে। বিভিন্ন প্রকার ক্রমবিকাশের আশ্রয়স্বরূপ বহুসংখ্যক কালরেখার একত্র সমাবেশকে কাল-ধরাতল বলিতে পারি। কালরেখার উপাদানভূত বিভিন্ন কালবিন্দুগুলিই আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানের আধার। কালরেখার অন্তর্গত সকল বিন্দুসম্পর্কে যুগপৎ জ্ঞান জন্মিলেই মহাকাল সর্ব্বভূতের সঙ্কলন করিলেন বলিয়া বলিতে পারি। আর কাল-ধরাতলের উপাদান ভূত কালরেখা গুলি সম্পর্কে যুগপৎ জ্ঞান জন্মিলেই বলিতে পারি যে আদ্যাকালিকা মহাকালের সঙ্কলন করিলেন। এই অবস্থায় দেবতা, গন্ধর্ব্বাদিভেদে বিভিন্ন প্রকারের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়, এবং যাহাকে কালধরাতল বলিয়াছি তাহার সর্ব্বাংশের জ্ঞান এক সঙ্গে জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত হয়। ইহাই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্ম। চণ্ডীর রহস্যত্রয়ে এই সকল জ্ঞানের বিবরণ প্রাচীন যুগের ভাবে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকেই বিজ্ঞতার হাসি হাসিতে পারেন, আর শিরোভঙ্গি সহকারে ভাবিতে পারেন যে "এই সকল খেয়ালের কথা চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত করিবার প্রয়োজন কি! অসম্ভব ও অনাবশ্যক বিষয়ের আলোচনাতেই চিরকাল বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার ঘটিয়াছে। এখন খেয়াল ছাড়িয়া দিয়া কাজে প্রবৃত্ত হও।" এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখিবেন যে প্রকৃতির বিপরীত গতি ব্যতীত জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। বর্ত্তমানে যাহা অসম্ভব, ভবিষ্যতে তাহা কেবল সম্ভব নহে, স্বাভাবিক হইয়া উঠিতেছে। ভবিষ্যতের সম্ভাবিতা ("Possibilities) সম্বন্ধে আলোচনা, তাহার কার্য্যে পরিণতি সহজ ও সুগম করিয়া তুলে। বিশেষতঃ সকল সভ্যজাতির মধ্যেই তত্ত্ববিচার (দর্শন বা Metaphysics) নামক একটী জ্ঞানশাখার আলোচনা প্রচলিত আছে। কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত তত্ত্ববিচারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, কিন্তু এই তত্ত্ববিচারের ফলেই কর্ম্মবিজ্ঞান গুলি (Arts) উন্নত হয়। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মা বা সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। মনোরাজ্য হইতেই বহির্জগৎ শক্তিসংগ্রহ করিতেছে। মানসিক বলের প্রভাবেই মানব জীবশ্রেষ্ঠ।

উপসংহারে আমরা কাল সংকলনকারিণী শক্তিকে প্রণাম করিতেছি—

"নমঃ সর্ব্বস্বরূপিণ্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমোনমঃ।
আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে কর্ত্র্যৈ হর্ত্র্যৈ নমোনমঃ॥"

শ্রীভারতচন্দ্র চৌধুরী।

শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাব।

বঙ্গদেশে ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গায় ন্যায় দুইটি ধর্ম্মভাবের ধারা প্রবাহিত হইতেছে। একটি শাক্ত ধর্ম্ম, আর একটি বৈষ্ণব ধর্ম্ম। শাক্ত ধর্ম্মে বহুল রূপে দেব দেবী পূজা-অর্চ্চনা, বলিদান, সুরাপান প্রভৃতি সাধনের বিষয়। এক সময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ সময়ে মহাযান সম্প্রদায় দেবদেবী পূজায়—নানা প্রকার অনীতি আচরণে প্রবৃত্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে বিলুপ্ত হইল; কিন্তু তাঁহার বংশধর রূপে তান্ত্রিক ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইল। "বামাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ যে সমুদয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা নীতি ও ধর্ম্মবিধ্বংসী। এই সময় ভৈরবী চক্র প্রভৃতি দ্বারা পুরুষ ও রমণীগণ নৈতিক আদর্শ হইতে একান্তরূপ স্খলিত হইয়াছিলেন। অপর পক্ষে তান্ত্রিকগণের খাদ্যাখাদ্যের কিছুমাত্র বিচার ছিল না। তাহারা গলিত শবের মাংস, মল মূত্রাদি কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ভক্ষণ করিত। বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে এই প্রকার তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচারিত হইয়া বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল।"

তন্ত্র শাস্ত্র বঙ্গদেশের লোক কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। তাহার— অনেক আধুনিক সংস্কৃত। ঐতিহাসিকগণ বলেন "বারাহী তন্ত্র, তন্ত্র চূড়ামণি, দেবীপুরাণ চট্টগ্রাম অঞ্চলকে চট্টল প্রদেশ বলা হইয়াছে। অনুমিত হয়, বারাহী তন্ত্র ও তন্ত্রচূড়ামণি চট্টগ্রাম অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বোয়াল ও রুই মাছ খাদ্যের মধ্যে ধরা হইয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয়, ঐ তন্ত্রখানি বঙ্গদেশে রচিত হইয়াছে।

তন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মপ্রতিষ্ঠা, শক্তি লাভ। শক্তি দ্বিবিধ, আধ্যাত্মিক এবং বাহ্য। এই উভয়বিধ শক্তি লাভ করাই তান্ত্রিক সাধকগণের লক্ষ্য। সর্ব্বপ্রকার ভয় নিবারণের জন্য তান্ত্রিকগণ ঘোর অমাবস্যার নিশীথ সময় একাকী শ্মশান ক্ষেত্রে গমন করিয়া মৃতদেহের উপরে উপবেশন করিয়া সাধন করিতেন। গলদেশে নরাস্থি মালা, নর-করোটিতে সুরা স্থাপিত। সাধন ক্ষেত্র, আসন, সময় যেমন ভীষণ, তাঁহার আরাধ্য দেবতাও তেমনি ভীষণ প্রকৃতি। দেবীর বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। তাঁহার গলায় নর মুণ্ডমালা, হস্তে নরমুণ্ড এবং করবাল। দেবী উলঙ্গ হইয়া পতি বক্ষে নৃত্য করিতেছেন। তান্ত্রিক সাধক সেই করালবদনী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির ধ্যানে রত।

তান্ত্রিক সাধকের প্রকৃতি কঠোর। রুদ্র মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া তাঁহারা রুদ্র প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। সাধকগণের লক্ষ্য এই যে, সাধন দ্বারা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিবেন। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে তন্ত্রধর্ম্মে আসিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের পুরুষকার তন্ত্রধর্ম্মের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তন্ত্র ধর্ম্ম, সেশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ। কর্ম্মজগতে—ধর্ম্মজগতে এই পুরুষকারের প্রয়োজনীয়তা আছে। মানব যদি আত্মশক্তি-মূল্য বুঝিতে না পারে,, শক্তিকে প্রকাশ করিবার তাহার যে ক্ষমতা আছে, এই তত্ত্ব ধ্রুব বিশ্বাস করিতে না পারে, তবে তাঁহার উন্নতি সুদূর পরাহত।

তন্ত্রধর্ম্মে সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি পুরুষভাব গৃহীত হইয়াছে। শৈবধর্ম্মের এবং সাংখ্যের প্রকৃতি শাক্ত ধর্ম্মে শিব পার্ব্বতীর আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই তন্ত্রে বেদান্তের নিগূঢ় ভাবও প্রকাশিত হইয়াছে। শাক্ত ধর্ম্মে শক্তিরই লীলা। নিখিল বিশ্বে মনোরাজ্যে এক অনন্ত বিরাটশক্তি প্রকাশিত। জলে স্থলে অনলে অনিলে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি বিরাজিত। বালকের ক্রীড়ায়, বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বালোচনায়, ধ্যানীর হৃদয় রাজ্যে একই অনন্ত জ্ঞানময়ী শক্তি নিয়ত লীলাপরায়ণা। সেই শক্তি স্বেচ্ছাচারিণী নহে—বিঘ্ন উৎপাদনকারিণী নহে—সেই শক্তি জ্ঞানময়ী মঙ্গলময়ী। সেই পরমাশক্তি শিবের সহিত নিত্য যুক্তা সেই শক্তি শিববিহারিণী। শক্তি ও শিব একীভূতা। তন্ত্র ধর্ম্মের—শাক্তধর্ম্মের গূঢ় ভাব এই, সাধনা দ্বারা শক্তি লাভ করিয়া সেই শক্তিকে মঙ্গলের সহিত যুক্ত করা। কিন্তু তন্ত্রের এই অপূর্ব্ব সাধনা, রাষ্ট্রীয় জগতে, সামাজিক জগতে মণ্ডলী ও পরিবারের মধ্যে বিশেষভাবে সাধন ব্যবস্থা হওয়া চাই। কেবল ব্যক্তিগত ভাবে সাধনের আয়োজন হইয়াছিল। যদিচ গোপনে—চক্রে সকলে সমবেত হইবার বিধি আছে; কিন্তু সেই বিধান শিবশক্তি লাভের প্রতি মনোযোগী হওয়া, কেবল বাহিরের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছে। তন্ত্রের সাধন গোপনীয়—ধর্ম্ম গোপনীয়—লক্ষ্যও গোপনীয়। জনসমাজের সহিত এ ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিপুল ভাবে বদ্ধমূল না হওয়ায় ইহা জাতীয় জীবনকে উন্নত করে নাই, বরং দুর্ব্বল করিয়াছে। এজন্যই যখন মুসলমানগণ এদেশে অভ্যুদিত হইল, তখন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ অবোধ্য—সাধারণের অযোগ্য তন্ত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ

করিয়া মুসলমান নিসানের তলে সমবেত হইতে লাগিল। অচিরকাল মধ্যে মুসলমান ধর্ম্ম বঙ্গে ব্যাপ্ত হইল। তান্ত্রিক ধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের নবধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। বৈষম্যময় তান্ত্রিক ধর্ম্মের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম সাম্যের মোহন বীণাধ্বনি করিতে লাগিল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিল ?

বৈষ্ণবগণ তান্ত্রিকদিগের ন্যায় ভগবানের রুদ্র মূর্ত্তি দর্শন করেন না। ভগবানকে কোমল কান্তরূপে—সুন্দর প্রেমময় রূপে দর্শন করাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষ্য। বৈষ্ণবের দেবতা শ্যামসুন্দর। তাঁহার শিরোভূষণ শিখিপুচ্ছ, গলায় বনফুলের মালা, হস্তে বংশী। তাঁহার বর্ণ শ্যাম, তিনি পীত বসন পরিহিত। তালতমালরাজিশোভিত যমুনাপুলিনে তিনি বিহার করেন। যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের পক্ষে দুর্ব্বোধ, উপনিষদ সমূহের একমাত্র গতি, মুনিগণের সর্ব্বস্ব, তিনিই ভক্ত বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ মাধুর্য্য স্বরূপ।" বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম ; ইহার মধ্যে পুরুষকারের নাম গন্ধ নাই,—আত্মপ্রতিষ্ঠার স্থান নাই ; আছে কেবল দীনতা বোধ। "তৃণের অপেক্ষা নীচের নীচ হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় সহগুণ আশ্রয় করিয়া, আপন অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া ও অন্যের সম্মান দান করিয়া নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।" তান্ত্রিকের শক্তিসাধনা বৈষ্ণবের প্রেম সাধনা। তান্ত্রিকের পুরুষকার, বৈষ্ণবের দীনতা। তান্ত্রিকের সাধনক্ষেত্র শ্মশান ঘাট, বৈষ্ণবের সাধনার স্থান রমণীয় নিকুঞ্জ কানন, ফল পত্রশোভিত বৃন্দাবনস্থলী। আত্মশক্তিতে উন্নত হইবার জন্য তান্ত্রিক সাধন পরায়ণ ; বৈষ্ণব বলেন, "হে জগদীশ! আমি ধন কামনা করিনা, সুন্দরী নারী প্রার্থনা করিনা, কবিত্বশক্তিও চাইনা ; কিন্তু জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহেতুকী ভক্তি থাকে।" তান্ত্রিক জাতিভেদ রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তান্ত্রিকগণ গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া চক্রে উপবেশন করেন, তখন লোক-চক্ষুর অগোচরে জাতিভেদ বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আপত্তি নাই ; কিন্তু মুক্তভাবে জাতি ভেদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে অসমর্থ। বৈষ্ণব প্রকাশ্য ভাবে জাতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন ;—

"প্রভু বলে যে জন ডোমের অন্ন খায়,
কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ সেই প্যায় সর্ব্বথায়।"

তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন ;—

"শক্তিপূজায় নীচকে উচ্চে তুলিতে পারে; কিন্তু উচ্চ নীচের ব্যবধান সমানই রাখিয়া দেয়—সক্ষম অক্ষমের প্রভেদকে সুদৃঢ় করে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের শক্তি—হ্লাদিনী শক্তি—সে শক্তি বলরূপিনী নহে, প্রেমরূপিনী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈত বিভাগ স্বীকার করে, তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। তিনি বল ও ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই, তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে—এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার আনন্দ নিয়ত মিলনরূপে প্রতিষ্ঠিত। শাক্ত ধর্ম্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ, বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ, শক্তি লীলায় কে দয়া পায়, কে না পায়, তাহার ঠিকানা নাই; কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে সকলেরই নিত্য দাবী। শাক্ত ধর্ম্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়েছে—বৈষ্ণব ধর্ম্মে এই ভেদকে নিত্য মিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।"

কাশীচন্দ্র ঘোষাল

কালিয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অভিসম্পাত।

দক্ষদুহিতা কদ্রু ও বিনতা উভয়েই স্বামী কশ্যপের বহুসেবা করিয়াছিলেন। তাহাদিগের শুশ্রূষাগুণে পরিতুষ্ট কশ্যপ উভয়কেই বরদানে প্রতিশ্রুত হইলে কদ্রু অতি বিনীতভাবে করজোড়ে মুনিপ্রবরের নিকট সহস্র নাগ-কুমার প্রার্থনা করিলেন। বিনতাও কদ্রুপুত্রগণ অপেক্ষা অধিকবলশালী সরলপ্রকৃতি দুইটী মাত্র পুত্রপ্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বনিতাদ্বয়কে পুত্রপ্রাপ্তির জন্য একান্ত সমুৎসুক জানিয়া মুনিপ্রবর কশ্যপ উভয়কেই অভিলষিত বরদানে সন্তুষ্ট করিয়া তপশ্চরণ মানসে বনভূমি আশ্রয় করিলেন। এদিকে কদ্রু ও বিনতা উভয়েই মুনিবরে গর্ভবতী হইয়া একত্রগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুদিবস অতীত হইলে কদ্রু সহস্রেক ডিম্ব ও বিনতা দুই ডিম্ব প্রসব করিলেন। প্রত্যেকেই গর্ভজাত ডিম্ব বহুযত্নসহকারে সুবর্ণ পাত্রের মধ্যে রক্ষা করিয়া স্বীয় স্বীয় প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করিলেন। কালক্রমে কদ্রুর ডিম্ব সমূহ হইতে

সহস্রেক নাগ উৎপন্ন হইল। তদ্দৃষ্টে বিনতা অতীব পরিতপ্তা হইলেন। উভয়েই এক সময়ে ডিম্ব প্রসব করিয়া সৌভাগ্যবতী কদ্রু সহস্রতনয়ের জননী হইল, কিন্তু বিনতাগর্ভজাত ডিম্ব হইতে পুত্রোৎপত্তির কোন লক্ষণই দৃষ্ট হইল না। এজন্য সপত্নীদ্বেষিণী বিনতা অতীব অধীরা হইয়া উঠিলেন। সপত্নী পুত্র-মুখকমল দর্শনে চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে, পুত্র ক্রোড়ে লইয়া তাপিতাঙ্গ শীতল করিতেছে; ফলতঃ বর্ষণানন্তর কাদম্বিনী যেমন লঘুভার হইয়া চঞ্চল ও আনন্দগতি হয়, সপত্নী কদ্রুও তেমনি সন্তানপ্রসবানন্তর হর্ষ ভরে বিচরণ করিতেছে,, এতাদৃশী চিন্তামালা বিনতার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। ঈর্ষানল-তাপিতাঙ্গী বিনতা এজন্য নিজপ্রকোষ্ঠে গমন করিয়া সুবর্ণপাত্র হইতে একটী ডিম্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ভঙ্গ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তন্মধ্য হইতে পক্ষীর আকৃতি অর্দ্ধাঙ্গবিহীন অপরিপুষ্টদেহ লোহিতবর্ণ এক পুত্ররত্ন বহির্গত হইল। কুমার ডিম্বনিঃসৃত হইয়াই মনুষ্যবাক্যে জননীকে ক্রোধোদ্দীপ্ত স্বরে বলিতে লাগিলেন "মাতঃ! পরপুত্রদর্শনে হিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া অকালে ডিম্ব হইতে অজাতসর্ব্বাঙ্গ অপরিপুষ্ট দেহেই আমাকে নিঃসারিত করিলেন, একারণ আমি আপনাকে এই শাপ দিতেছি, যে, আপনি যাহার পুত্রদর্শনে হিংসানলবিদগ্ধা হইয়া আমার এতাদৃশী দুর্দ্দশা করিলেন, তাহারই দাসীবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিবেন।"

পুত্রমুখদর্শনে একান্ত লালসান্বিতা বিনতা অকালভগ্ন ডিম্বনিঃসৃত সুন্দর তনয়ের অপরিপুষ্টদেহ নিরীক্ষণ করিয়া ও তৎকর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া অতীব ব্যথিতহৃদয়া হইলেন। জলগর্ভা কাদম্বিনীর ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিষাদান্ধ-কারাবৃত হইল। প্রফুল্লশতদলসদৃশ জননীর বদন মণ্ডলে বিষাদকালিমা নিরীক্ষণ করিয়া কুমার স্বতঃ অনুতপ্ত হইলেন এবং জননীকে সম্বোধন করিয়া স্বপ্রদত্ত শাপোদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া বলিলেন মাতঃ! আপনার ম্লানমুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া আমি বড় ক্ষুব্ধ হইয়াছি। এজন্য আমি আপনাকে শাপো-দ্ধারের উপায় বলিতেছি, আপনি শান্ততাপ হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। আপনি কালপ্রাপ্ত না হইতেই ডিম্ব ভঙ্গ করিয়া আমাকে হীনাঙ্গ করিলেন, দেখিবেন অপর ডিম্বটী কদাচ ভঙ্গ করিবেন না। উহা হইতে অমিততেজসম্পন্ন বিশ্বভয়াবহ এক মহাজীবের আবির্ভাব হইবে। তিনিই আপনাকে দাসীত্ব হইতে মোচন করিবেন।" বিনতা পুত্রের আশ্বাসে আশ্বস্তা হইয়া দিনাতি-পাত করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনতার দাসীবৃত্তি।

কদ্রুগর্ভসম্ভূত নাগগণ ক্রমশঃই মহাবীর্য্যবন্ত হইয়া উঠিল। এই সকল নাগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শেষ ও দ্বিতীয় বাসুকী। ইঁহারা উভয়েই জিতেন্দ্রিয়, সুপণ্ডিত, ধার্ম্মিক ও বিনীতস্বভাব। অবশিষ্ট ঐরাবত, তক্ষক, কালিয়, বামন প্রভৃতি সর্পগণ খলমতি, অহঙ্কারী, দ্বন্দ্বাভিলাষী ও নরহন্তারক হইয়া উঠিল। ভ্রাতৃগণের এবংবিধ কুপ্রবৃত্তি দর্শন করিয়া শেষ ও বাসুকী তাহাদিগকে সৎ-পথে আনয়ন জন্য অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া, সর্পদষ্ট অঙ্গুলি যেমন লোকেরা পরিত্যাগ করে তদ্রূপ তাঁহারাও তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপঃসাধনার্থে স্থানান্তরে গমন করিলেন।

একদা সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত, দুগ্ধফেননিভবর্ণ, সহস্ররশ্মিসমপ্রভ, সর্ব্বালঙ্কারভূষিত, পরমসুন্দর উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ববরকে দর্শন করিয়া কদ্রু ও বিনতা সপত্নীদ্বয়ে বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। বিনতা কহিলেন অশ্ববর শ্বেতবর্ণ ও কদ্রু তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া তৎসমর্থনে যত্নবতী হইলেন। সে দিবস লোকচক্ষু রবি অস্তাচল শিখরশায়ী হইয়াছেন বলিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে সূর্য্যদেব তমঃ নাশ করিয়া উদয়াচলে অধিরোহণ করিলে তাঁহাকে দর্শনানন্তর যাহার বাক্য সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, অন্যে তাহার দাসীবৃত্তি করিবেন এই পণ নির্দ্ধারিত হইল।

অনন্তর গৃহাগতা কদ্রু স্বীয় তনয়গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "পুত্রগণ! বিনতা-সহ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববরের বর্ণ সম্বন্ধে আমার বচসা হইয়াছে। বিনতা কহিয়াছেন অশ্ববর শ্বেতবর্ণ, কিন্তু আমি তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া এই পণ রাখিয়াছি যে যাহার বাক্য সত্য হইবে অন্যে আজীবন তাহার দাসীবৃত্তি করিবে"। নাগগণ ক্রূরমতি ও নির্দ্দয় হইলেও মাতৃবাক্য শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া কহিল "মাতঃ! আপনি ভাল কর্ম্ম করেন নাই। উচ্চৈঃশ্রবা দুগ্ধফেন-নিভ শ্বেতবর্ণ ইহা চরাচর বিশ্বে কাহারও অবিদিত নাই"। কদ্রু উত্তর করিলেন "যদি সত্য সত্যই অশ্ববর ধবলাকৃতি হয় তাহা হইলে যে উপায় অবলম্বনে সে কৃষ্ণকায় হয় তাহার উপায় বিধান কর, নতুবা বিনতার সহিত পণে পরাজিত হইলে আমাকেই দাসীরূপে তাহার সেবাপরায়ণা হইতে হইবে।

আর তোমরাও দাসীপুত্র বলিয়া জগতে বিদিত হইবে”। নাগগণ বিরস বদনে মাতৃচরণে নিবেদন করিল “মাতঃ! বিনতা দেবী আপনার সপত্নী হইলেও আমাদিগের জননী, আপনার ন্যায় তিনিও আমাদিগের পূজনীয়া; বিশেষতঃ তাঁহারই অনুমান যথার্থ, অতএব কেমন করিয়া কপটাচরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কঠোর দুঃখভাগিণী করিব। তিনি আমাদিগের গর্ভধারিণী না হইলেও কেমন করিয়া আমরা সত্য গোপন পূর্ব্বক মিথ্যাকে সত্যের সুবেশে সাজাইয়া তাঁহাকে প্রতারণা করিব? আপনি সপত্নী দ্বেষবশে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা কি জন্য সেই নিরপরাধা বিমাতাকে অকারণে যাবজ্জীবন দুঃখপাথারে ভাসাইব”? কদ্রু তনয়গণের এতাদৃশ ধৃষ্টতাচরণে ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ শাপ দিলেন “তোমরা ঈদৃশ খলমতি ও ক্রূর যে মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করিতেও কুণ্ঠিত নহ, তোমরা ক্রমশঃ বিস্তার প্রাপ্ত হইলে, তোমাদিগের দুর্জ্জয় বিষদহনে ভূমণ্ডলের যাতীয় লোক অচিরে বিনষ্ট হইবে, এজন্য মহাত্মা জন্মেজয় যজ্ঞে ফণীকুল বিনাশ প্রাপ্ত হইবে”।

মাতার অভিসম্পাতবাণী শ্রবণ করিয়া অহিকুল যেন বজ্রাহত হইল। বিরসবদনে বিষণ্ণহৃদয়ে তখন তাহারা মাতৃলালসাতৃপ্তি বিষয়ে যত্নশীল হইয়া উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের নিকট গমন পূর্ব্বক তদীয় শ্বেতপুচ্ছ বেষ্টনে কৃষ্ণবর্ণ করিল এবং তাহাদিগের প্রখর নিশ্বাস বায়ুদ্বারা দুগ্ধফেনশ্বেতকায় উচ্চৈঃশ্রবা কৃষ্ণকায় হইয়া উঠিল। কদ্রুর ইচ্ছানুরূপ কার্য্যসম্পন্ন করিয়া সর্পগণ মাতৃসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক সংবাদ জানাইলে কদ্রু পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে কাহার বাক্য সত্য প্রতিপন্ন করণার্থে কদ্রু ও বিনতা সপত্নীদ্বয় উচ্চৈঃশ্রবা সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং অশ্ববরকে কৃষ্ণকায় প্রত্যক্ষ করিয়া বিনতা কদ্রুর দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গরুড়।

বিনতা সপত্নীর দাসীভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। একদা মহাশব্দে তাঁহার দ্বিতীয় ডিম্ব দ্বিধাবিভক্ত হইয়া মহাবীর গরুড়ের জন্ম হইল। প্রাতঃ সূর্য্যকিরণ-তেজ যেমন অনুক্ষণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অচিরে অসহনীয় তীব্র ভাবধারণ করে তদ্রূপ বিনতানন্দন অনুক্ষণ বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া বিদ্যুৎবৎ দেহরশ্মি বিকীর্ণ করিতে লাগিল। তাহার গগনস্পর্শী মস্তকের দুই ধারে

উজ্জ্বল রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় যেন পূর্ণিমা রজনীর সন্ধ্যাকালে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য ও পূর্ব্বগগনাবলম্বী চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রবল ঝটিকায় যেমন প্রকাণ্ড মহীরুহ মূলোৎপাটিত বা মধ্যভগ্ন হইয়া পতিত হয় তদ্রূপ সেই মহাবীর পক্ষিরাজের নিশ্বাসপবনে পর্ব্বতশিখর ভগ্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। অমরগণ স্বর্গপুরী হইতে মহাবীর পক্ষিরাজের বিদ্যুৎপ্রভ বিশালদেহ বিলোকনে ও ক্ষণে ক্ষণে তাহার জলদগম্ভীর রব শ্রবণে তাহাকে অগ্নি দেবজ্ঞানে করযোড়ে স্তব আরম্ভ করিলেন। তখন অগ্নিদেব কম্পান্বিতকলেবর দেবগণ সমক্ষে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "দেবগণ! আপনারা কি জন্য আমার স্তবে নিযুক্ত হইয়াছেন? আমি কাশ্যপেয়, বিনতানন্দন নহি। আপনাদিগের ভয়জড়ীভূত হইবার কোনই কারণ নাই। বিনতানন্দন মহাবীর গরুড় সর্ব্বলোকহিতকারী ও হিংস্রকহিংসন।" অগ্নি-বাক্যে প্রবোধিত দেবগণ তখন গরুড়ের স্তব আরম্ভ করিলেন "হে কাশ্যপেয়! আপনার গগনবিদারী সমুন্নত কায় দর্শনে আমরা ভয়ে জড়ীভূত হইয়াছি; আপনার দেহরশ্মি আমাদিগের চক্ষুর পীড়াকর হইয়া উঠিয়াছে ও আপনার ভীষণ গর্জ্জনে আমাদিগের শ্রবণ বধির হইয়া যাইতেছে। হে বিনতানন্দন! আপনার এই অসহনীয় দেবগণত্রাসকর তৈজ সম্বরণ করুন।" দেবগণস্তবে সুপ্রসন্ন গরুড়, রশ্মি সংবরণ পূর্ব্বক নিজ প্রকাণ্ড দেহ খর্ব্ব করিলেনও দেবগণকে এই প্রকারে বিগতত্রাস করিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত যাবতীয় নর নারী পশু পক্ষী ও দেবগণ সহ ধরিত্রীর রক্ষাসাধনে যত্নবান হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে দেবাসুরে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। সমুদ্রমন্থনো-দ্ভূত অমৃত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দেবগণকে বণ্টন করিতেছিলেন। সুযোগপ্রয়াসী দৈত্য রাহু ইত্যবসরে তাহা ভক্ষণে নিযুক্ত হইল দেখিয়া সূর্য্যদেব এই বিষয় জনার্দ্দনকে জ্ঞাপন করিলেন। দেব চক্রপাণিও তৎক্ষণাৎ স্বকরস্থিত সুদর্শন চক্রদ্বারা তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন। সূর্য্যদেবের এই অপরাধে অমৃতভক্ষণে অমরত্বপ্রাপ্ত ছিন্নমুণ্ড রাহু পাপগ্রহ, দিবসে তাঁহাকে গ্রাস করেন। ইহাতে সূর্য্যদেব ক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ ও ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন সকলের মঙ্গলের জন্য আমি রাহুর চৌর্য্যবৃত্তি জ্ঞাপন করিলাম। এই অপরাধ পাইয়া দুর্ব্বৃত্ত রাহু আমাকে গ্রাস করিতেছে; আপনারা সকলে আমার রক্ষাবিধান না করিয়া মদীয় নিগ্রহ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া অবলোকন করিতেছেন? আমিও স্বকীয় তেজে পৃথিবী দহন করিব, দেখিব আপনারা কেমন কৌতুহল পরবশ হইয়া তাহা নিরীক্ষণ

করেন !" সেই অবধি সহস্ররশ্মি সহস্রধা কিরণবিস্তার পূর্ব্বক ধরিত্রীকে বিশোষিত করিয়া তুলিলেন। এক্ষণে বিনতানন্দন গরুড় অপরিপুষ্টদেহ সহোদর অরুণকে লইয়া সূর্য্যরথে সারথি করিয়া দিলেন। মহাবীর অরুণ সূর্য্যদেবের সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিয়া দিনমণির প্রখর কিরণ মন্দীভূত করিয়া দিলেন। ধরিত্রী ও যাবতীয় নরনারী পশুপক্ষী মার্ত্তণ্ডদেবের ক্রোধ হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইলেন।

খলমতি, ক্রূর, হিংসক সর্পগণমধ্যে কালিয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি পূর্ব্বজন্মে রাজা ছিলেন, খলমতিপ্রযুক্ত নারায়ণের অভিসম্পাতে সর্পযোনিপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় খলপ্রকৃতির চরিতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। মাতার দাসীপুত্র গরুড়কে তিনি সহস্র প্রকারে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। কোন স্থানে গমন করিতে হইলে কদ্রু বিনতার স্কন্ধারোহণে গমন করিতেন। কালিয় প্রভৃতি দুরাচার সর্পগণও মাতার অনুকরণে দাসীপুত্র গরুড়ারোহণে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের প্রবল অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধান্ধ গরুড় কখন কখন পক্ষতাড়নে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতেন। পুনরায় মাতৃ আজ্ঞানুরোধে তাহাদিগকে স্কন্ধে গ্রহণ করিতেন। একদা গরুড় সর্পগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া মাতৃসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন "মাতঃ! সর্পগণের অত্যাচার অসহনীয় হইয়াছে। কি হেতু আপনি উহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী এবং আমাকেই বা কি জন্য উহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন? সিংহ কি কখন শৃগালের দাসভাবে জীবনাতিবাহিত করিতে পারে? আপনি মা হইয়া কেমন করিয়া দেবগণপূজিত তনয়ের এতাদৃশী দুর্দ্দশা করিতেছেন? ইহার যদি কোন নিগূঢ় কারণ থাকে বলুন, আমি তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিব।" গরুড়ের বাক্যে বিনতা বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন "বৎস! আমি কদ্রুর দাসী একারণ তুমি দাসী পুত্র, তাহাদের সেবা না করিলে চলিবে কেন?" গরুড় মাতৃবাক্য শ্রবণে তাপিত হইয়া আরক্তলোচনে কহিলেন "পক্ষীন্দ্র গরুড় কি দাসীপুত্র? সুরাসুর অমরগণ যাহার তেজে ভীত হইয়া করযোড়ে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সুপর্ণ দাসীপুত্র? যদি অনুমতি হয়, বলুন, আমি এক্ষণেই কদ্রুসহ নাগকুল নিহত করিব। প্রবলের নিকট দুর্ব্বলই চিরকাল দাস হইয়া থাকে; আজ্ঞা করুন, আমি উহাদিগকে দাসত্বে পরিণত করিব।" বিনতা, পুত্রের রোষকষায়িত লোচন দর্শন ও সগর্ব্ববচনাবলী শ্রবণ করিয়া বিনীত ও নম্রভাবে পুত্রকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন "না বাবা! তাহা করিতে নাই, আমি পণে পরাজিত হইয়া দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। তুমি কেন অধর্ম্মাচরণ করিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবে? তোমাকে পাপ কলুষিত করা অপেক্ষা আমি চিরকাল দাসীবৃত্তি করিব তাহাও শ্লাঘনীয়।" গরুড় মাতার সহিত বাক্যব্যয় নিস্প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ বিমাতা কদ্রুর নিকটবর্ত্তী হইয়া সংযোজিত করযুগলে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন" "মাতঃ! অনুমতি করুন, কি প্রকারে জননীর দাসীত্ব মোচন হয়? পুত্র জীবিত থাকিতে মাতা দাসীবৃত্তি করিবেন, ইহা কোন্ পুত্র সহ্য করিতে পারে? জননী পণে পরাজিত হইয়া আপনারই দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং কোন্ কার্য্য সাধন করিতে পারিলে আপনি প্রসন্নমনে তাঁহাকে মুক্তিদান করেন।" কদ্রু গরুড়ের পরাক্রম বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, একারণ গরুড়ের বাক্য শেষ হইবামাত্র তিনি কহিলেন "বৎস! আমি তোমার পরাক্রম বিলক্ষণ জানি, এ জগতে তোমার অসাধ্য কার্য্যই নাই। তুমি যদি জননীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাক, যদি জননীর দাসীত্ব মোচন করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে সুরলোক হইতে অমৃত আনিয়া দাও, আমি প্রসন্নমনে তোমার মাতাকে দাসীবৃত্তি হইতে মুক্তিদান করিব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ!

পিতৃদর্শন।

অমৃত আনিয়া দিলে মাতা দাসীবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভ করিবেন অবগত হইয়া মহাবীর গরুড় সন্তুষ্ট চিত্তে দ্রুতপদ সঞ্চালনে মাতৃসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিয়া কহিল "মাতঃ! আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, আমাকে আহার দান করুন, বিশেষতঃ অমৃত অনায়াস-লব্ধ হইবে না। সুরগণ কখনই বিনা যুদ্ধে অমৃত দিবেন না। আমি ক্ষুধায় কাতর ও হীনবল হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, দেবগণ সহজেই আমাকে পরাস্ত করিবেন এবং আপনার দাসীত্ব মোচনেও সমর্থ হইব না।" ক্ষুধার্ত্ত পুত্রের উদর পুরণোপযোগী আহার দ্রব্য মুনিবনিতা বিনতা কোথায় পাইবেন? ক্ষুধাতুর পুত্রকে কি প্রকারেই বা দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিবেন, প্রকাণ্ডদেহ পুত্র দেবগণের ভীতিপ্রদ ও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইলেও ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় সমুহ দেবঅনীকিনীসহ

যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইবারই সম্ভাবনা। এজন্য তিনি পুত্রকে সমুদ্রতীরে কৈবর্ত্ত গ্রামের নিশাচরগণকে ভক্ষণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। গরুড় ক্ষুধানলে কাতর, আহারের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই সমুদ্রতীরে গমনোদ্যোগী হইলে বিনতা পুনরায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎস! সমুদ্রতীরস্থ যাবৎপ্রাণী তোমার ভক্ষ্য, কিন্তু সাবধান, তন্মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাকে কদাপি ভক্ষণ করিও না। তুমি ক্ষুধার্ত্ত, এজন্য তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। ব্রাহ্মণ অবধ্য, উদ্ধার নাই, অগ্নি বল, সূর্য্য বল, গরল বল, ইহাদের প্রতিকারোপায় আছে, কিন্তু ব্রহ্মবাক্য অখণ্ডনীয়। তুমি আমি কে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষে ব্রাহ্মণপদচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন।" ব্রহ্মতেজ মাহাত্ম্য শ্রবণে গরুড়কে চিন্তান্বিত অবলোকন পূর্ব্বক বিনতা কহিলেন "যাও বৎস, তুমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ, ত্বরায় কৈবর্ত্তগ্রামে গিয়া নিশাচরগণকে ভক্ষণ কর। ব্রাহ্মণ তোমার উদরস্থ হইলে এক অভূতপূর্ব্ব যন্ত্রণা অনুভব করিবে। যন্ত্রণা অনুভূত হইবামাত্রই তুমি ব্রাহ্মণকে উদ্গীর্ণ করিয়া ফেলিবে, তাহা হইলে আর তোমাকে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না। তুমি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ তাহা তোমার জননীর পরমহিতকর, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সফল মনোরথ হইয়া তোমার জননীর দাসীত্ব মোচন কর।" মাতার আশীর্ব্বাদবাণী শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত উন্নতকায় গরুড় তথা হইতে উড্ডীন হইলেন। উড্ডয়ন কালে তাঁহার পদতাড়নায় ধরিত্রী সঘন কম্পিত হইতে লাগিল। পক্ষ-সঞ্চালনে প্রবল ঝড় উত্থিত হইয়া বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত ও পর্ব্বত শিখর ভগ্ন হইয়া পড়িল। বজ্রনিনাদ-ভীষণ গর্জ্জনে মরামর জীব প্রমাদ গণিল। কৈবর্ত্তদেশে উপনীত হইয়া খগরাজ গরুড় পক্ষপ্রাচীর বেষ্টনে সমস্ত নরনারী পশুপক্ষীকে বেষ্টিত করিয়া পক্ষসঞ্চালনোদ্ভূত বায়ু বেগ তাড়িত প্রাণী সমুদায় তাহার মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পরম পরিতোষসহকারে ভক্ষণ করিতে করিতে খগরাজ সহসা উদরজ্বালা অনুভব করিলেন। তৎক্ষণাৎ মাতৃ-আজ্ঞা তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হইল। তখন তিনি ব্রাহ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "ব্রাহ্মণ! উদর জ্বালায় বুঝিতে পারিতেছি আপনি আমার উদরস্থ হইয়াছেন। সত্বর বহির্গমন পূর্ব্বক যদৃচ্ছা প্রস্থান করুন। বিলম্ব করিলে মদীয় জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইবেন।" ব্রাহ্মণ কহিলেন "আমার প্রাণতুল্যা কৈবর্ত্তিনী ভার্য্যা তোমার জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হইবার উপক্রম

হইয়াছে। সে তোমার ভোক্ষ্য হইলেও, আমার অনুরোধে তাহাকে উদ্গীর্ণ করিয়া দেও, তাহা হইলে আমিও বহির্গত হইব।" পক্ষীন্দ্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও উদর জ্বালায় একান্ত কাতর হইয়া ব্রাহ্মণের প্রার্থনানুসারে কৈবর্ত্তিনীকে উদ্গার্ণ করিয়া দিলেন। অনন্তর নিশাচর ও যাবতীয় প্রাণী ভক্ষণ পূর্ব্বক অতৃপ্তজঠরানল পক্ষীন্দ্র অমৃত সংগ্রহাভিলাষে উড্ডীন হইলেন। যোজনব্যাপী পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক বনভূমির উপর দিয়া গমনকালে কশ্যপ তাঁহাকে চিনিলেন এবং আশীর্ব্বাদ সহকারে কুশল জিজ্ঞাসিলেন। পিতা কশ্যপ যে বনভূমির মধ্যে তপশ্চারণে নিযুক্ত আছেন তাহা গরুড় জননীর নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন ; এজন্য বনভূমির মধ্য হইতে জনৈক মুনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন শ্রবণ করিয়াই বুঝিলেন ইনিই মদীয় পিতা কশ্যপ। সসম্ভ্রমে আকাশমার্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃদেবের চরণে প্রণাম পুরঃসর স্বীয় কুশল বার্ত্তাসহ জননীর দাসীত্ব মোচনার্থে বিমাতৃ আজ্ঞায় অমৃত সংগ্রহের কামনা জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন "পিতঃ অমৃতসংগ্রহ অনায়াসসাধ্য নহে। দেবগণ কখনই বিনাযুদ্ধে অমৃতদানে স্বীকৃত হইবেন না। আমি অতিশয় বুভুক্ষু, মাতৃ-আজ্ঞানুসারে কৈবর্ত্তদেশের যাবতীয় প্রাণী ভক্ষণ করিয়াও উদরপূর্ণ হয় নাই। আপনি যদি আমাকে কিছু আহার দান করেন, তাহা হইলে উদরপূর্ণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সুরাসুর মধ্যে কেহই আমার নিবারণক্ষম হইবে না, এবং আমিও অনায়াসে মাতার দাসীত্ব মোচন করিয়া জন্ম সার্থক করিব।" কশ্যপ, তনয়ের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন "বৎস ! দেবনরে বিখ্যাত একটী সরোবর আছে। তাহার তীরে বন হইতে এক প্রকাণ্ড গজবর আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং এই সরোবরের জল হইতে দশযোজন বিস্তৃতদেহ অতিবৃহৎ এক কূর্ম্ম বহির্গত হইয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিযুক্ত থাকে, তুমি তাহাদিগকে ভক্ষণ কর। তাহাতে তোমার পর্য্যাপ্ত ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে এবং মুনিতনয়-দ্বয়েরও রক্ষা সাধন হইবে।" প্রকোষ্ঠ যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের প্রসরজ্বালা বিস্তারে আলোকরাশি দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া পরক্ষণেই হ্রস্বতেজঃ আলোকে অন্ধকারাচ্ছন্নবৎ হয়, পর্য্যাপ্ত আহার প্রাপ্তি সংবাদে গরুড়েরও প্রফুল্ল মুখকমল মুনিকুমারদ্বয়ের উল্লেখে তাদৃশ বিষণ্ণতা প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি পিতৃদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "পিতঃ ! আমি মুনিকুমারদ্বয়কে ভক্ষণ করিতে পারিব না। ব্রাহ্মণ আমার অভক্ষ্য। জননী আমাকে

বলিয়াছিলেন "বিষপানেও লোকের জীবনরক্ষা হইয়া থাকে; সূর্য্য, চন্দ্র, যম, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ রুষ্ট হইলেও প্রাণভিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়ান্তর নাই। কৈবর্ত্তদেশে এক ব্রাহ্মণ উদরস্থ হইলে যে যন্ত্রণা উপভোগ করিয়াছিলাম, তাদৃশ যন্ত্রণা আর আমি ভোগ করিতে অভিলাষী নই। মাতৃ উপদেশে আমি সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম, পুনরায় আমি সেই কার্য্য করিতে সাহসী হইতে পারি না।" তনয়ের এতাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া কশ্যপ অপার আনন্দ লাভ করিয়া কহিলেন "বৎস! পিতা কি কখন জ্ঞাতসারে তনয়ের অমঙ্গল কামনা করেন? তুমি এবংবিধ চিন্তা কখন মনোমধ্যে স্থানদান করিও না। আমি সেই মুনিকুমারদ্বয়ের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করিলে তোমার ভয়চকিত হৃদয় শান্তি প্রাপ্ত হইবে। এই মুনিকুমারদ্বয়ের জ্যেষ্ঠের নাম বিভাবসু ও কণিষ্ঠের নাম সুপ্রতীক। পিতৃদত্ত বহুধন প্রাপ্ত হইয়া শত্রুগণ মতে চালিত উভয় ভ্রাতাই পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন। সুপ্রতীক জ্যেষ্ঠ হইতে পৃথক হইয়া প্রতিদিন ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার জন্য জ্যেষ্ঠকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ অংশমত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলেও শত্রুচালিত অসন্তুষ্ট সুপ্রতীক জ্যেষ্ঠকে বিরক্ত করিতে ক্রটী করিতেন না। একারণ জ্যেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত দিলেন "তুমি গজদেহ ধারণ করিয়া অরণ্য মধ্যে বাস কর।" সুপ্রতীকও জ্যেষ্ঠকে কহিলেন আমি ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে কহিলাম, তাহা না দিয়া যখন শাপ দিলে, আমিও তোমাকে অভিসম্পাত দিতেছি "যে তুমি কূর্ম্ম হইয়া সলিল মধ্যে বিচরণ করিবে।" এই প্রকারে উভয় কর্ত্তৃক উভয়ে শাপগ্রস্ত হইয়া সুপ্রতীক বনমধ্যে গজরূপে ও বিভাবসু সলিল মধ্যে কূর্ম্মরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয়ে সেই সরোবর তীরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিযুক্ত থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্রত-ভঙ্গ

(গল্প)

(১)

অধ্যয়ন-শেষের অনতিকাল মধ্যেই হরিনাথ চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়া মাসান্তে যখন একত্র পঞ্চাশটি রজতমুদ্রা প্রাপ্ত হইল, তখন সে এত অর্থ লইয়া কি করিবে ভাবিয়া আনন্দাকুলিত হইল।

চিরদারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া এবং বৃত্তি-লব্ধ যৎ-কিঞ্চিৎ অর্থ দ্বারা ছাত্রজীবনের যাবতীয় ব্যয়-নির্ব্বাহ করিয়া সে তাহার ব্যক্তিগত অভাব একবারে যথেষ্টরূপ সঙ্কোচ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। বাড়ীতে পিসিমা' ললিতা ভিন্ন অপর কেহ তাহার প্রতিপাল্য ছিল না; সুতরাং কুড়ি পঁচিশ টাকা হইলেই ত তাহার অভিভাবিকা ও নিজের ব্যয় সচ্ছলভাবে সঙ্কুলান হইতে পারে—মাসে মাসে এত উদ্বৃত্ত অর্থ লইয়া করিবে কি? সংসারানভিজ্ঞ অপরিণত-বয়স্ক সরলমতি যুবক হরিনাথ, এইরূপ নানাবিধ উদ্ভট কল্পনা করিতে করিতে বেতনের টাকা কয়টি পিসিমা'র চরণ-প্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিল।

ললিতা, বহু কষ্টে অনাথা শিশু হরিনাথকে মানুষ করিয়াছে। আজ এতদিনে, দুঃখের অবসান হইল ভাবিয়া অতুল আনন্দোদ্বেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল—সে কেবল মাত্র তাহার করচালিত হরিনামের মালাটি হরিনাথের নমিত মস্তকে স্পর্শ করিয়া অনুচ্চ-কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিল।

ইহার অল্পদিন পরই ললিতা, হরিনাথের বিবাহ জন্য সমধিক উৎকণ্ঠিতা হইলেন। এই উৎকণ্ঠা, বাক্যে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই, এক প্রাপ্ত-বয়স্কা অনূঢ়া কন্যার পিতা, হরিনাথের সহিত তাহার বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিল। রূপলাবণ্যবতী সুশ্রী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যা, সকল বিষয়েই ললিতার মনোমত হওয়ায় প্রজাপতির এই অনুষ্ঠানটি, লক্ষকথার পরিবর্ত্তে শতকথার মধ্যেই সুসম্পন্ন হইয়া গেল। প্রজাপতির ব্রত-ভঙ্গ দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

ললিতার অর্থকষ্ট দূরীভূত হইয়াছে। এখন আবার নব-বধূ মালতী, তাহার সাংসারিক সর্ব্ববিধ কার্য্যে সহায়তা করিয়া শারীরিক কষ্টেরও অপনোদন করিল। মালতীর গঠন যেরূপ অনিন্দ্যসুন্দর, রূপলাবণ্য যেরূপ অতুলনীয়, গৃহকর্ম্মে নিপুণতাও তদ্রূপ অনন্যসাধারণ। অত্যল্পকাল মধ্যেই

হরিনাথের গৃহখানি, মালতীর রূপে গুণে ও কর্ম্মকুশলতায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সমগ্রদিন কঠোর পরিশ্রমের পর শাকান্ন ভোজনে অমৃতাস্বাদনের ন্যায় যে তৃপ্তি অনুভব হয়, তাহার তুলনা কোথায়? বহুকষ্টের সুদীর্ঘ দিন গুলি একে একে অতিক্রম করিয়া, নিজ পুরুষকারের দ্বারা অর্জ্জিত যথেষ্ট অর্থাগম এবং ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত অনুরূপা গৃহ-লক্ষ্মীর মঙ্গলময় করস্পর্শ দ্বারা উপচীয়মান গৃহস্থিত যাবতীয় দ্রব্যভাণ্ডার দেখিয়া হরিনাথ ললিতা সহ সমভাবেই বিমল স্বর্গীয় শান্তিসুধা পানে যে কিরূপ পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল, তাহা সকলের পক্ষে হয় ত অনুমান করা সম্ভবপর হইবে না। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ভিন্ন সচ্ছলতার মাহাত্ম্য অনুভব করিবে কে?

যথাসময়ে বিধাতার কৃপাশীর্ব্বাদের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ একটি নবজাত সন্তান, মালতীর অঞ্চল সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল। মালতী, বসন্তের নব কচি কিশলয়ের মধ্যে কচিহৃদ্গত-মুকুল তরুণ সহকার তরুর ন্যায় শোভান্বিতা হইল। স্বর্গীয় সুষমার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া ললিতা, আনন্দ-বিহ্বল অন্তরে নিস্তব্ধ গৃহখানি চঞ্চল মুখর করিয়া তুলিল।

হরিনাথ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক বেতন পায়—তথাপি, অর্থবাহুল্যের কথা ভাবিয়া তাহাকে আর কষ্ট পাইতে হয় না। মনের সে ভাব ও জীবনের সে দিন, সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পরই কখন অজ্ঞাতে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

(২)

"বাবুজী—বাবুজী—একঠো তার আছে।"

সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর কর্ম্মশ্রান্ত অবসন্নদেহে হরিনাথ যখন সন্ধ্যায় একাকী বহির্ব্বাটীতে শট্‌কার মৃদুমধুর ধ্বনি শ্রবণ ও সুরভি বাষ্প সেবনে একান্ত মনে রত রহিয়া তন্দ্রালসযুক্ত বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিল, সেই সময়, নিঝুম প্রখর মধ্যাহ্নে দাঁড়কাকের বিকটধ্বনির ন্যায়, ডাক-পিয়নের আধাহিন্দী-আধা বাঙ্গালায় এই কর্কশ আহ্বান তাহার কর্ণগোচর হইল।

অতর্কিতে ক্ষতস্থানে আহত ব্যক্তির ন্যায় হরিনাথ ত্রস্ত ও চমকিত হইয়া উঠিল। তারের চিঠি দুঃসংবাদ বহন করিয়া থাকে,—বাঙ্গালী-সুলভ এই ধারণাজনিত আশঙ্কা, তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মালতী, পিত্রালয়ে আসন্নপ্রসবা; আজ কয়েক দিন অবধি তাহার বা খোকার কোন সংবাদ পায়

নাই। এই পীতাভ মোড়কটির মধ্যে কি তড়িতাক্ষর, জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার জন্য কোন নিদারুণ দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিল! এ ত আফিস-সংক্রান্ত কোন সংবাদ নহে—তবে কি সত্যসত্যই তাহার সর্ব্বনাশ হইল!—ইত্যাদি নানারূপ দুশ্চিন্তা তড়িদ্বার্ত্তার প্রভাবে তড়িদ্বেগে তাহার মনোমধ্যে যুগপৎ উদিত ও বিলীন হইয়া গেল।

বিষণ্ণ মুখে হরিনাথ যখন রসিদ খানি সহি করিয়া কম্পিত হস্তে তার পত্রখানি গ্রহণ করিল, অবস্থাভিজ্ঞ পিয়ন তখন পুরস্কারের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ধীরে সরিয়া পড়িল।

যাহা আশঙ্কা করিতেছিল—তাহাই! সদ্য-প্রসবা মালতী অত্যন্ত পীড়িতা—ক্ষণমাত্র ও বিলম্ব না করিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে। তড়িদ্বার্ত্তার বজ্র-শক্তির প্রচণ্ড আঘাতে হরিনাথ একবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শোকাভিভূত হরিনাথ যখন একাকী দুশ্চিন্তা সাগরে হাবুডুবু খাইতেছিল, সেই সময় তাহার প্রতিবেশী বন্ধু জ্ঞানদা বাবু আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিনাথের বাসায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একটি ক্ষুদ্র সম্মিলনীর অধিবেশন হইত। সমবেত বন্ধুগণ তাস-পাসা খেলিয়া বা বৃথা গল্পগুজবে সময় ক্ষেপন না করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা, সাহিত্যালোচনা, সাময়িক সাহিত্যের গতি পর্য্যবেক্ষণ ইত্যাদি নানারূপ সংপ্রসঙ্গের আলোচনা করিত। এই সান্ধ্য-বৈঠকের নিত্যযাত্রী জ্ঞানদা বাবু, হরিনাথের এই অবস্থা দেখিয়া নিজেই যেন বিপন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়া ভাবিতে থাকিলে ত কোন উপকার হইবে না, জ্ঞানদা বাবু কতরূপে এই কথা বুঝাইয়া হরিনাথকে রাত্রের ট্রেনেই শ্বশুর বাটী পাঠাইয়া দিল।

হরিনাথ চলিয়া গেলেই, ললিতার ক্রন্দনধ্বনি প্রতিবেশীগণ মধ্যে অচিরে তাহার আসন্ন বিপদের কথা প্রচারিত করিল।

(৩)

'তা বাবা, তোমায় ঘর রাখ্‌তেই হবে'

বহির্ব্বাটীর দাওয়ায় তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে আগন্তুক যুবককে দূর হইতে দেখিবামাত্র, বৃদ্ধ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিল—

'বাবা, ঘর তোমায় রাখ্‌তেই হবে—এ অনুরোধ তোমায় রাখ্‌তেই হবে'।

মন শরীরের মধ্যে বাস করিয়াও ইহাকে নির্ম্মম ভাবে অনাত্মীয়ের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া যথাইচ্ছা অগ্রেই চলিয়া যায় কেন?—রেলগাড়ী মনের মত দ্রুতগামী হইলে, এতক্ষণ সে নিশ্চয়ই মালতীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিতে পারিত—রেলগাড়ী তাহাকে পরিহাস করিবার জন্যই কি আজ বিশেষ ভাবে ধীর মন্থরগতিতে গো-যানের ন্যায় অগ্রসর হইতেছে—ইত্যাদি বিশেষ উদ্বেগপূর্ণ দুশ্চিন্তা পরম্পরা দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া সমগ্র রাত্রিজাগরণের পর ষ্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া এই প্রখর গ্রীষ্মের দিনে, বেলা এগারটার সময় হরিনাথ শ্বশুরালয় অভিরামপুর গ্রামের নিকটস্থ হইল। ক্ষুদ্রগ্রাম—কয়েকখানি মাত্র ঘর। ঘোষাল-পরিবার এই গ্রাম মধ্যে অর্থশালী ও বর্দ্ধিষ্ণু।

হরিনাথ বহুদূর হইতে উৎকর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতেছিল—বুঝিবা ঘোষাল-বাড়ী হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি, গ্রাম প্রবেশের পূর্ব্বেই ভগ্ন-দূতের ন্যায় তাহার দারুণ বিপদের-বার্ত্তা বহন করিয়া আনে। ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল পথ ছুটিয়াও রেলগাড়ী হরিনাথের মনস্তুষ্টি করিতে পারে নাই—এখন কিন্তু গ্রামের প্রান্তে পঁহুছিয়া আর কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব প্রায় হইয়া উঠিল। মনের মধ্যে ক্রন্দনের স্পষ্ট ধ্বনি—অথচ কর্ণে তাহার আভাস মাত্র নাই!—তবে কি তাহার শ্রবণ-শক্তির হ্রাস হইয়াছে? মন ও ইন্দ্রিয়ের এই দারুণ বিরোধ সে কখন অনুভব করে নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কম্পিত হৃদয়ে অতর্কিত পদে হরিনাথ যখন আপনার অলক্ষ্যে তাহার শ্বশুর বাড়ীর নিকটস্থ হইয়াছে, সেই সময় শ্বশুর কেদারনাথ ঘোষাল দূর হইতে দেখিতে পাইয়া ঐরূপ সম্ভাষণ করিল।

এ কিরূপ প্রহেলিকাময় সম্ভাষণ। শ্বশুর মহাশয়ের কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই—পরিবার বর্গও নিস্তব্ধ। তবে কি তাহার মালতী বিপন্মুক্ত হইয়াছে—তবে কি সে আবার মালতীকে দেখিতে পাইবে?—তাহার শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া পতি গত প্রাণা ব্যাকুলা পত্নীকে দেখা দিয়া কি সে আবার ধন্য হইতে পারিবে?

বুকে বল বাঁন্ধিয়া, লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া হরিনাথ শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাড়ীর সব এখন ভাল ত?"

'তাই ত বলছি বাবা ঘরে ঘর তোমায় রাখতেই হবে—সুশীলা আমার বড় আদরের মেয়ে—বাবা কুলিনের কুল—

ঘোষাল-বৃদ্ধের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই চারিজন সিক্তবস্ত্র ব্রাহ্মণ যুবক তাহাদের সম্মুখে বহির্দ্বারে আসিয়া সমস্বরে চিৎকার করিল—

'বল হরি—বোল'

(৪)

শুভ্র তড়িতালোকোদ্ভাসিত বিপুলায়ত হাওড়া ষ্টেশনের দূর-প্রসারিত আবৃত-প্রাঙ্গন সচঞ্চল লোক-সমুদ্রের কলকোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সন্ধ্যার গাড়ী ছাড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই। সমগ্র গাড়ীখানি বোঝাই হইয়া গিয়াছে—চতুর ও স্বার্থপর যাত্রীগণ আপনাপন যথেষ্ট সুবিধা করিয়া রাত্রে নিদ্রার জন্য প্রয়োজনতারিক্ত স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং অপর কোন নূতন যাত্রী আসিলে তাহার ন্যায্য প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত করিয়া অত্যন্ত গোলযোগ সহকারে তাহাকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

এমন সময় দুইবৎসরের ক্রন্দনরত বালক ক্রোড়ে লইয়া একটি ভদ্র যুবক মধ্য-শ্রেণীর গাড়ীর সন্ধানে অতিশয় ব্যস্ত ভাবে ছুটাছুটি করিতেছে। দুরে, নবীনচন্দ্র দে নামক একজন প্রৌঢ় বয়স্ক ভদ্রলোক, যুবককের অবস্থা এবং শিশুর ক্রন্দন দেখিয়া তাহাকে, নিজ অধিকৃত কুঠারীতে আহ্বান করিলেন। যুবক আশ্রয় পাইবামাত্র গাড়ী ধীরে ধীরে ষ্টেশন হইতে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে শিশুটিও ক্রন্দনের মাত্রা এমন চড়াইয়া দিল যে তাহাকে ক্রোড়ে আট্‌কাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িল। কোনরূপ খেলনা দ্রব্যাদি দিবার কিম্বা কোনরূপ সান্ত্বনা বা ভয় দেখাইয়া চুপ করাইবার অবকাশ নাই —বালক এতই দিক্ ধরিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। নৈশ-নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় অনেক যাত্রী যুবককে প্রকারান্তরে ভৎর্সনা করিয়া শিশুকে তাহার মাতার নিকট মেয়ে গাড়ীতে দিয়া আসিবার জন্য অযাচিত মর্ম্মান্তিক উপদেশ দিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পর অতিরিক্ত ক্রন্দন ও অঙ্গসঞ্চালনে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া বালক শেষে অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রালসে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া উঠিতে লাগিল। অনভ্যস্ত হস্তে অতি সন্তর্পনে নানা রূপ পরিচর্য্যা করিয়া বালকের গভীর নিদ্রাগমের জন্য আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে, গাড়ীর অপরাপর যাত্রী প্রায় সকলেই নিদ্রাদেবীর শান্তিময়

ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিব্য নাসিকা গর্জ্জনে শ্রান্তি দূর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু নবীনচন্দ্র, প্রথমাবধি বালকটির প্রতি অতি করুণ-দৃষ্টে চাহিয়া একাগ্রচিত্তে মনোমধ্যে কত কথারই আন্দোলন করিতেছিল—কত বেদনাকর বিলুপ্ত স্মৃতির পুনরালোচনায় তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল। যুবক যখন ঘর্ম্ম-সিক্ত জামাগুলি খুলিয়া বিশ্রাম জন্য উপবেশন করিতে যাইবে, সেই সময় নবীনচন্দ্র বলিলেন—

"ছেলেটির বুঝি মা' নেই ?"

এইকথা শুনিবামাত্র হরিনাথ একবারে অস্থির হইয়া পড়িল—নিরুদ্ধ-স্রোত শোকাশ্রুর প্রবল প্রবাহ বাঁধ ভাঙ্গিয়া গণ্ডযুগল প্লবিত করিয়া দিল—হরিনাথ উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল। হরিনাথ শ্বশুর-বাড়ী পঁহুছা অবধি-অনেক দারুণ অপ্রীতিকর অসাময়িক অনুরোধ দ্বারা উত্যক্ত হওয়ায় তথায় আদৌ কাল বিলম্ব না করিয়া শিশু পুত্র সহ চলিয়া আসিয়াছে—তদবধি এখন পর্য্যন্ত সমগ্র দিন ধরিয়া সে শিশু পুত্রটি লইয়া কিরূপ বিব্রত হইয়াছে—পাঠকগণ তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছেন। স্ত্রী-বিয়োগের নিদারুণ শেল তাহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ রহিলেও, সে এতক্ষণ তাহার মর্ম্মান্তিক যাতনানুভব করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। নবীনচন্দ্রের কথায় যেন তাহা নির্ম্মমভাবে সমুৎ-পাটিত হইয়া তাহাকে প্রাণান্তকর বিয়োগ-যন্ত্রণায় একান্ত অভিভূত করিয়া ফেলিল—হরিনাথ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল।

নবীনচন্দ্র কথা কহিয়াই যেন দারুণ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছেন। হরি-নাথের শোকাবেগের প্রথম জোয়ার কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইবার উপক্রম হইলে তিনি নিজের অধিকতর দুরবস্থার কথা বর্ণন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তরুণ জ্বরে ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। সময়ই এ যন্ত্রণার উপশমের একমাত্র প্রকৃত ঔষধ—এ ক্ষত নিবারণের একমাত্র অমৃত-প্রলেপ। অন্যথা সদ্য-ক্ষত হৃদয় আশু সান্ত্বনা প্রয়োগে বিষাক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। এখনও একদিন মাত্র অতিক্রম হয় নাই—এশোক রুদ্ধ হইয়া থাকিলে যে আধারকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া একবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিবে !

বহুক্ষণ পর নবীনচন্দ্র যখন বুঝিলেন, যে হরিনাথের পত্নী গত রাত্রে এই শিশুপুত্র এবং আর একটি সদ্য-প্রসূত দশদিনের কন্যা রাখিয়া সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে—পত্নী-বৎসল স্বামীর আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা

করিতে পারে নাই, তখন তাঁহার নিজেরও এইরূপ দুর্দ্দিনের কথা মনে হইয়া চক্ষু যুগল ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। নব্যযুবকের স্ফূর্ত্তির প্রমত্ত বিকাশ, এরূপ ভাবে অসময়ে বাধাপ্রাপ্ত হইল দেখিয়া তাঁহার সহানুভূতির মাত্রা বাড়িয়া গেল। তিনি যথাসাধ্য, প্রায় সমগ্র রাত্রি হরিনাথকে নানাবিধ উপদেশ দ্বারা অন্যমনস্ক করিবার ও বিবিধ উপাখ্যানাদি বর্ণন করিয়া তাহার মনে এই নিদারুণ শোক সহ্য করিবার মত বল সঞ্চয় জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হরিনাথ অশ্রু-বিগলিত নেত্রযুগল স্থির করিয়া একাগ্র মনে মালতীর রূপ ধ্যান করিতেছে—আর নবীনচন্দ্র কত আগ্রহ সহকারে তাহাকে নানারূপ সান্ত্বনামূলক কথা বলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় ঊষারুণের মৃদু-আভাষ পূর্ব্বাকাশে ফুটিয়া উঠিল। এইবার পরবর্ত্তী ষ্টেসনে হরিনাথকে অবতরণ করিতে হইবে—কিন্তু, কেমন করিয়া একক মাতৃহীন শিশুসহ পিসিমার নিকট গৃহে ফিরিবে—এই চিন্তা এখন প্রবলতর হইয়া তাহাকে একবারে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। এদিকে খোকাও জাগ্রত হইয়া মায়ের নিকট যাইবার জন্য বিষম ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল।

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। নবীনচন্দ্র, বিপন্ন হরিনাথকে ক্রন্দনরত বালকসহ ট্রেণ হইতে অবতরণ কালে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিলেন। হরিনাথ শিশুকে সামলাইয়া নবীনচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা-দৃষ্টি বিনিময়ের পূর্ব্বেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে—নবীনচন্দ্র মুখ বাড়াইয়া ষ্টেসনের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ট্রেণ-সহ মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

(৫)

হরিনাথ, পত্রখানি পাঠ করিয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। বহির্বাটীতে বন্ধু জ্ঞানদা বাবু সহ গল্প করিতে করিতে প্রাতে চা পান করিতেছে এবং খোকা অদূরে অনন্য মনে ঘড়ির বাক্সটি লইয়া খেলা করিতেছে, এমন সময় হরিনাথ তাহার বিবাহ-যোগ্যা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া শ্যালিকা সুশীলার নামাঙ্কিত এই পত্রখানি অপ্রত্যাশিতরূপে প্রাপ্ত হইয়া যুগপৎ স্তম্ভিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সুশীলা তাহার প্রেমে মুগ্ধা—সে তাহাকে মনে মনে স্বামীরূপে বরণ করিয়াছে—তাহার সহিত অপরের বিবাহ হইলে সে দ্বিচারিণী হইবে—তাহার দিদির অধিকার তাহারই ন্যায্য প্রাপ্য—তাহাকে চরণ প্রান্তে স্থান

দিতেই হইবে, নচেৎ সে আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত এবং তাহাকেই এই স্ত্রী হত্যার জন্য ধর্ম্মতঃ দায়ী হইতে হইবে—পত্রখানি এই মর্ম্মে লিখিত হইয়াছে।

পত্রখানি পাঠ করিয়া হরিনাথ ও তাহার বন্ধু জ্ঞানদাবাবু স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিলেন যে ইহা, তাহার শ্বশুর কেদারনাথেরই তাহাকে ফাঁদে ফেলাইবার প্রয়াসান্তর মাত্র। হরিনাথ, হৃদয়হীন কেদারনাথের প্রতি ইতিপূর্ব্বেই একবারে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে—এখন আবার অনূঢ়া কন্যার নামে,তাহার অজ্ঞাতে এরূপ প্রণয়-পত্র প্রেরণ করিয়া যেরূপ নীচতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে চিরজন্মের মত তাহার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়া গেল। কি ঘোর সাংসারিক নির্ম্মম জীব! সহজে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, অপর কন্যার সদ্য-বিয়োগ-যন্ত্রণা তাহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না! হরিনাথ এবম্বিধ চিন্তায় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া অতি ঘৃণার সহিত পত্রখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। এরূপ পত্রের উত্তর দেওয়া ত দূরের কথা—পত্রখানি সে পাঠ করিয়াছে বলিয়া আপনাকে বিশেষরূপ অনুতপ্ত ও অপরাধী মনে করিল।

যখন নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কোনটিতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন কেদার নাথ চরম উপায় স্থির করিয়া নিজেই হরিনাথকে লিখিলেন যে যদি সে সুশীলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়, তবেই সে তাহার শিশুকন্যার প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, নচেৎ নহে—তাহার দেড় মাসের শিশুকন্যা যেমন করিয়া হউক, লইয়া আসিতে হইবে। কেদার নাথ, এই পত্র লিখিয়া ভাবিলেন, যে এইবার ঔষধ নিশ্চয়ই ধরিবে; কেননা, এত শিশু কন্যার ভারগ্রহণ হরিনাথের পক্ষে প্রকৃতই অসম্ভব হইবে।

ক্রোধোদ্দীপ্ত হরিনাথ, পত্র পাইবামাত্রই ভৃত্য প্রেরণ করিয়া ধাত্রীসহ তাহার শিশু কন্যাটি আনাইবার ব্যবস্থা করিল। কেদারনাথ এখনও আশা পরিত্যাগ করে নাই। তাহার ধারণা, কিছুদিন পর উত্যক্ত হইয়া শিশু কন্যাকে তাহার নিকট প্রেরণ করিতেই হইবে—তখন সুশীলার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ অবধারিত। এইরূপ কল্পনা করিয়া, হরিনাথের শিশু কন্যাটি ছাড়িয়া দিতে কেদার নাথ কোন ওজর আপত্তি করিল না।

পাটোয়ারী বুদ্ধির তলস্পর্শ করা সহজ নহে। কেদারনাথ, দুহিতৃ সন্তানগণের প্রতি মমতা প্রদর্শন ছলে হরিনাথকে একবার নাড়িয়া দেখিবার

সঙ্কল্প করিয়া তাহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। হরিনাথ তখন কর্ম্মোপলক্ষে দীর্ঘকালের জন্য মফঃস্বল বাহির হইয়াছে।

কেদার নাথ যে নিজগুণে হরিনাথের বন্ধু সমাজে যথেষ্টরূপ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে তাহা সে অবগত ছিল না। তাহার শুভাগমন হইয়াছে জানিতে পারিয়া হরিনাথের বন্ধুবর্গ সেই 'পুণ্য মুর্ত্তি' দেখিবার জন্য সাগ্রহে সমবেত হইল। তাহারা ইতিমধ্যেই, কেদারনাথের কুশ-পুত্তলি দাহের ব্যবস্থা করিয়া আন্তরিকক্রোধ প্রশমিত করিয়াছে—এখন কিন্তু তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই অজস্র সুতীক্ষ্ণ বাক্য-বাণে জর্জ্জরীভূত করিয়া ফেলিল, তাহার আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিবার অবসর রহিল না।

দুই দিন মাত্র অপেক্ষা করিয়া কেদার নাথ যখন দেখিল যে সত্য সত্যই হরিনাথের শীঘ্র প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই, এবং তাহার দৌহিত্র ভুলিয়াও একবার তাহার নিকটস্থ হইল না—প্রত্যুত, তাহাকে দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে,—তখন আর সেখানে যাইয়া অনর্থক অপরের শাণিত বাক্য-বাণে জর্জ্জরিত ও নানারূপ লাঞ্ছিত হওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিল না। হরিনাথের যদিও কখন মত হয়, তথাপি এতগুলি বন্ধুর অভিমত অতিক্রম করিয়া সে যে কখন তাহাকে কন্যাদায় হইতে দ্বিতীয় বার উদ্ধার করিবে, এআশা এখন নিতান্ত অসম্ভব মনে হইল। সুতরাং ব্যর্থ-মনোরথ কেদারনাথ, কেবলমাত্র তীব্র ভৎসর্না ও বিষম লাঞ্ছনার স্তুপীকৃত বোঝা বহন করিয়া বাটী প্রত্যাগত হইল।

হরিনাথ মফঃস্বল প্রবাসের পর বাটী ফিরিয়া পিসিমা' ললিতার নিকট কেদার নাথের 'শুভাগমন' বার্ত্তা শ্রবণ করিতেছে—এমন সময় জ্ঞানদা বাবু ঈষদ্‌হাস্যমুখে অগ্রসর হইয়া কহিল—

'হরিনাথ, তোমার বিবাহে প্রজাপতি অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি করে যে ব্রতভঙ্গ করেছিলেন, এই দুই দিন তোমার শ্বশুরকে নিকটে পেয়ে, আমরা প্রায়শ্চিত্ত সহ তার পূর্ণ উদ্যাপন করেছি।'

শ্রীশিবরতন মিত্র।

প্রেম, প্রীতি বা পিরিতি।

প্রত্যেক মানবের সুরুচি ও সুনীতি নাম্নী দুই বৃত্তি বা স্ত্রী আছে। মানব যতদিন সুরুচির বশীভূত থাকে, ততদিন সংসারচক্রেই ভ্রমণ করে, তখন সুনীতিকে দূরে পরিত্যাগ করে। সুরুচি, ইনি সুখ, সাংসারিক সুখ, অনিত্য সুখ; আর সুনীতি হইতেছেন জ্ঞানপথ। একজন প্রবৃত্তি পথ, অন্য জন নিবৃত্তি পথ। সুনীতিকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন সুরুচিতে অরুচি হয়, তখন সুনীতির অনুসন্ধান করে। সুনীতি আশ্রয় করিলে ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপ সন্তান উৎপন্ন হয়। সেই বুদ্ধিতেই ঈশ্বররূপদর্শন বা আত্ম জ্ঞান লাভ হয়।

হৃদয়-বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ, আত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণ। সকলেই সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। পারে না কেবল জটিলা এবং তৎকন্যা কুটিলা। জটিলা হইতেছেন জড়তা, আর কুটিলা, শঠতা। জড়তা হইতে শঠতার উৎপত্তি। যে জীবে এই দুইটী বিদ্যমান, সে কখন সংসারবৃত্তি নিরোধ করিয়া ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে না।

জটিলা হইতেছেন আসক্তি; কারণ আসক্তিই বড় জটিলা, নতুবা এত বন্ধন কেন? ইনি আবার বৃদ্ধা ও আয়ানের (সংসারের) জননী; কারণ আসক্তি হইতে সাংসারিকতা উৎপন্ন হয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং অনিত্য বিষয়ে আসক্তি হেতু, নিত্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া, জীব, সংসার-চক্রে পতিত হয়; এ জন্যই ইঁহাকে সংসারের বা আয়ানের জনয়িত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কুটিলা হইতেছেন প্রবৃত্তি। ইনি যুবতী এবং আয়ানের (সংসারের) ভগিনী। প্রবৃত্তি সততই চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল, সংসার বা আয়ানের সহায়তা করিয়া থাকেন। ইনি সর্ব্বদাই রাধার (ভক্তির, ভক্তব্যক্তির) গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে ব্যস্ত, আর ইঁহারা দুজনেই প্রেমভক্তির বিরোধী ও কণ্টক।

এখন দেখা যাউক প্রীতি বা পিরিতি বা প্রেম, কি পদার্থ!

উপনিষৎকার বলিয়াছেন "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" অর্থাৎ ভাগবানকে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করিলেই তাঁহার উপাসনা করা হয়; প্রীতি এত বড় জিনিস। ভক্ত সাধক প্রেম-মুখ স্মরণ করিয়া গাহিয়াছেন:—

"কি দিয়ে তাঁর দিব পরিচয়।

সে যে দয়ার চন্দ্র, প্রেম জলধি, দেখ্‌লে নয়ন শীতল হয়।" ইত্যাদি

আবার, সেই বিরাটপুরুষকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়াছেন :—

"তুমি একজন হৃদয়ের ধন।

সকলে আপনার ব'লে, সঁপে তোমায় প্রাণ মন।

কারু পিতা, কারুর মাতা, কারুর সুহৃদ সখা হও,

প্রেমে গ'লে যে যা বলে, তাতেই তুমি প্রীত রও।" ইত্যাদি

প্রেমের কথা আর কি বলিব। চণ্ডীদাস এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত বুঝিয়াছেন ও চূড়ান্ত বলিয়াছেন। চণ্ডীদাসকে বুঝিলে প্রেম বুঝা যায়, এবং প্রেম কি বস্তু তাহা বুঝিলে, চণ্ডীদাস কি বস্তু তাহা বুঝা যায়। প্রেমের কথা বলিতে গেলে চণ্ডীদাসের কথা (উক্তি) বলিলেই যথেষ্ঠ হইল।

যেমন, চক্ষের অন্তরাল হইলেই প্রিয়বস্তু মনের বাহির (out of sight, out of mind) হয় না, তাই চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন :—

"পাশরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো।"

আবার বাসুদেব ঘোষ ঐ সম্বন্ধে বলেন, :—

"মরমে লেগেছে গোরা, না যায় পাসরা।

জলের ভিতরে ডুবি, সেথা দেখি গোরা॥"

ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন :—

"সকলের মূলভক্তি, মুক্তি তার দাসী।"

প্রেমগুরু অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় বলিয়াছিলেন :—

"মেরেছ আমায় কলসির কাণা।

তা ব'লে কি আর প্রেম দিব না।"

প্রভু যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন :—

"যদি দয়া এবং প্রেম না থাকে, তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃথাই পরিশ্রম।"

বিরহ বিচ্ছেদের ভয়ে, প্রেমিক রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছেন :—

"আমি সাধে কি মুদি না আঁখি।

পাছে তারা হারা হয়ে থাকি।"

সাধক কৃষ্ণানন্দ স্বামী গাহিয়াছেন :—

এই কোরো হরি দীন দয়াময়, তুমি আমি যেন দুটী নাহি রয়।

জলেরি তরঙ্গ জলে কর লয়, চিদ্‌ঘন শ্যাম-সুন্দর।

ঐ পদে পরিব্রাজকের গতি, যেন ভাগীরথীর সাগরে সঙ্গতি,
জীব জীব দোঁহে অভেদ মুরতি, জীব নদী, তুমি সাগর।"

রসিক ভক্ত নীলকণ্ঠ গাহিয়াছেন ঃ—

"আমি মুক্তি চাইনে হরি।
পড়িয়ে বিপদে, তোমারি শ্রীপদে ভক্তি ভিক্ষা করি।
আমি আসিব, যাইব, চরণ সেবিব, হইব প্রেম অধিকারী॥"

সুরসিক প্রেম-পণ্ডিত কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন ঃ—

"পিরিতি পিরিতি সব জন কহে, পিরিতি সহজ কথা?
বিরিখের ফল, নহে তো পিরিতি, নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরিতি অন্তরে, পিরিতি মন্তরে, পিরিতি সাধিল যে।
পিরিতি রতন লভিল যে জন, বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরিতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া, পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে পিরিতি মিলয়ে তারে॥
পিরিতি সাধন, বড়ই কঠিন, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া, এক আত্ম হও, থাকিলে পিরিতি আশ॥"

মুক্তির পরে যে অবস্থা তাহাকে পুরুষার্থ বলে। এই পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ প্রেমভক্তি, স্বয়ং ভগবান ভিন্ন আর কাহারও দান করিবার অধিকার নাই। এই ভক্তি উচ্চতম পদার্থ, শ্রীভগবানই নিজ মুখে বলিয়াছেন—

"মুক্তি দিতে পারি আমি, ভক্তি দিতে কাতর হই।
কিঞ্চিৎ ভক্তি ছিল শ্রীবৃন্দাবনে, তাহারই কারণে, নন্দেরই ভুবনে,
নন্দের বাধা আমি মাথায় কোরে বই।" ইত্যাদি

চণ্ডীদাস আবার গাহিয়াছেন ঃ—

"সই, কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে, হাসিতে, পরিতি করিয়া কাঁদিতে জনম গেল।
পিরিতি সুখের, সাগর দেখিয়া, নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুঃখের বায়।
কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর, নিরমল তার জল।
দুঃখের মকর ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টলমল॥"

আবার গাহিয়াছেন ঃ—

"মৃত্তিকা উপরে জলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পিরিতি বসতি, তাহা কি জানয়ে কেউ॥

পিরিতি মুরতি, পিরিতি রতন, যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক জনমে জনমে, যজ্ঞ করিয়াছিল ॥
সই, পিরিতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে, কি সুখ জানয়ে তারা ॥"

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব, সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন :—

"প্রেম কি কৈতব? অকৈতব ধন ॥
জীবে কি সম্ভবে সনাতন ॥"

প্রেম দুইরূপ, অহেতুক ও হেতুক অর্থাৎ পরকীয় ও স্বকীয়। যে প্রেমের হেতু আছে, অর্থাৎ কারণ বশতঃ বা কার্য্য বশতঃ জন্মে, তাহা স্বকীয় অর্থাৎ স্বার্থপরতাযুক্ত। বিশুদ্ধ প্রেম, পরকীয় ব্যতীত আর কোনরূপ হইতে পারে না। বিশুদ্ধ প্রেম, কি না অকৈতব প্রেম, যাহাতে স্বার্থ শব্দ নাই। কিন্তু স্বকীয় প্রেম মাত্রেই স্বার্থ শব্দ আছে। অতএব অকৈতব প্রেম, পরকীয় প্রেম হইতে উৎপন্ন। এই পরকীয়, অর্থাৎ অহেতুক, অর্থাৎ নিঃস্বার্থ বিমল প্রেম হইতে অখণ্ড আনন্দ-ঘন যে ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহাকে পাওয়া যায়। স্বকীয় প্রেম অর্থাৎ কাণ্ডারে স্বার্থগন্ধ আছে বলিয়া, তাঁহাকে অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না।

প্রেমিকের আক্ষেপ উক্তি, কি সুমিষ্ট ভাষাতেই, চণ্ডীদাস বর্ণন করিয়াছেন, যথাঃ—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয়সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল ॥
সখি! কি আর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি।
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অমনি জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র বেড়ল, মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলাম, মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, অভাগার করম দোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল ॥" ইত্যাদি

মহাত্মা কবির আপনাকে আপনি বলিতেছেন :—

"কবির, সেদিন কেমন হইবে, যেদিন রাম আমার হাত ধরিয়া আপনার করিয়া নিজ চরণ কমলের ছায়াতে আমাকে বসাইবেন।"

এইটী প্রেমিকের উক্তি। শুনা যায় যে কবির জীবন্মুক্ত। তিনি শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করিয়া যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গের অপর সাধনগুলি করিয়াছিলেন; এবং ইহা দ্বারাই তাঁহার প্রেম জন্মিয়াছিল, এবং পরে জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। সুধু প্রেমের কথা লিখিয়া বা পড়িয়া কি হইবে, যদি সেই প্রেমের সাধনা করিয়া সেইরূপ জীবন গঠন না করা যায়?

কবির যোগী ছিলেন। যোগী হইয়াও নাম সাধনা তাঁহার ছিল। নাম সাধনা করিয়া তিনি প্রেমমার্গে পৌঁছিয়াছিলেন, পরে জীবন্মুক্ত হন।

সংসারের সমস্তই অনিত্য, সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, এই আছে, এই নাই। এমন কি, মানুষের দেহ, মানুষের সঙ্কল্প বিকল্পযুক্ত মন, ইহারা পর্য্যন্ত স্থায়ীভাবে থাকে না। আর অস্থায়ীকে স্থায়ী করিবার চেষ্টাই দুঃখের কারণ। সংসারটা দুঃখপূর্ণ। কেবলমাত্র ঈশ্বর প্রীতিই (প্রেমই) স্থায়ী ফল ধরে। চৈতন্য অবিনাশী। জীবের চেতনাই অমর ও অমৃত। যাহা মরে না, তাহাই অমৃত। জীবের মধ্যে চৈতন্য যেটী, তাহাই মরে না। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে প্রেমিক ও জীবন্মুক্ত একই কথা, কারণ তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়; মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা মধ্যে ভগবানের উক্তি আছে,—

> "যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
> শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমত॥"

অর্থাৎ যোগীদিগের মধ্যে যিনি সঙ্গতচিত্ত হইয়া কেবলমাত্র আমাকেই আরাধনা করেন, তিনি সকল অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ।"

যোগ সাধনা করিয়া ভজনা দ্বারা প্রেম-লব্ধ হয়। প্রেমিক ও জীবন্মুক্ত একই কথা। প্রেমেই ভগবানকে পাওয়া যায় ও জানা যায়। শ্রুতিতেও আছে যে ভগবানকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হওয়া। মুক্তির আর অন্য পথ নাই। যথা,—

> "তমেকম্ বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি,
> নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

অর্থাৎ, কেবল তাঁহাকেই জানিতে পারিলে, সংসারের মোচন হয়; তদ্ব্যতীত মুক্তির অন্য উপায়ান্তর নাই। ভগবৎ জ্ঞানই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়। এই জ্ঞান ভক্তিতেই জন্মায়, কারণ 'যতোবাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য" ইত্যাদি।

নানক গাইয়াছেন,—

"জগ্‌মে সব্‌ সারথ্‌ কি ইয়ার।
মাতা তাতা, বেটা বেটি, বহিন্‌ ভাই আর নার্‌॥
যবলাগি দেখে, সারথ্‌ নিকাশো, তবলগ্‌ সব্‌কে পেয়ার।
যব লাগি দেখে, সারথ্‌ নিকাশো, কৈ না পূছে সার॥
ধনবন্ত বেটা যব্‌ আওয়ে, বোলত্‌ জয় জয় কার।
নির্ধন কো কোই আদর নেহিদে. শির্‌মে দারদ্‌ ছার॥
যবলগ্‌ তেরে পাছ রুপেয়া, তবলগ্‌ সবকো তেরা ইয়ার।
নির্ধন কো কোই নিকট নেহি আওয়ে, এ রীত সন্‌সার
তুম যে কর্‌তা মেরা মেরা, তেরা কৌন বিচার।
ইহ্‌দার বাণী, ত্যজ প্রীত জগৎকো, আপ্‌না আপ্‌ সম্‌হার॥"

সুপ্রসিদ্ধ প্রেমতত্ত্বজ্ঞ রামানন্দ রায় গাহিয়াছেন,—

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাড়ল, অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুহুঁ জনে মনোভব পেশল জানি॥
না খোঁজনু দোতী, না খোঁজনু আন্‌।
দুহুঁ জন প্রেমভাব, দুহুঁ জন জান্‌॥"

অস্যার্থঃ—শ্রীরাধিকা বলিতেছেন, "সখী, আমার শ্যামের সহিত কিরূপে প্রীতি হইল, তাহা বলিতেছি। প্রথমে তাঁহার সহিত নয়নে নয়ন মিলন হইল। আমি তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে দেখিলেন। অমনই তদ্দণ্ডে প্রীতির সৃষ্টি হইল। কেবল সৃষ্টি হইল, তাহা নয়, বাড়িতে বাড়িতে চলিল, আর তাহার শেষ পাইলাম না। এই যে প্রীতি হইল, ইহা আমি রমণী ও তিনি রমণ, তাহা বলিয়া নহে, কারণ তিনি যে পুরুষ ও আমি যে নারী, তাহা আমি তখন কিছুই জানিতাম না ও বুঝিতাম না।—এইরূপ প্রীতি মনুষ্যে সম্ভাবনা, তাই শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন যে "প্রেম তো কৈতব নয়, অকৈতব ধন। জীবে কি সম্ভবে, সনাতন" এরূপ প্রীতি কেবল সম্ভব শ্রীরাধারই। ভগবান পুরুষ প্রকৃতি সম্মিলিত। রাধা, তাঁর প্রকৃতি অংশ। এই জন্য ভগবানকে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই ভাগে বিভাগ করিয়া, সাধক তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা রূপে সম্মুখে রাখিলেন, রাখিয়া, এই অকৈতব প্রীতির খেলা খেলাইতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহযুক্ত ভক্তিই প্রেমভক্তি। প্রেম অর্থে অনুরাগ, প্রণয়, প্রীতি।

শ্রীআনন্দগোপাল সেন, কৃষ্ণনগর।

ভাগবত ধর্ম্ম।

নৈমিষারণ্যে বসিয়া শৌণকাদি ঋষিগণ রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূতকে ছয়টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তরে এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র কথিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই প্রশ্ন কয়টি এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

১। পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতুমর্হসি।

২। সর্ব্বশাস্ত্রসারং ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি।

৩। দেবক্যাং কিমর্থং জাতস্তন্ন শুশ্রূষমানানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুম্।

৪। তস্য কর্ম্মাণি ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলা।

৫। অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।

৬। ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ধর্ম্মঃ কংশরণং গতঃ।

ষড়ের প্রশ্নাঃ। এতৎ প্রত্যুত্তরাণ্যেব সপ্রসঙ্গানি শ্রীভাগবতমিতি বিবেচনীয়ম্।

প্রশ্ন কয়টি আমাদিগকে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

প্রথম প্রশ্ন এই যে **পুরুষ সকলের যাহা ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল তাহাই বল।**

এই প্রশ্নের পশ্চাতে একটি খুব বড় রকমের সাহস ও জ্ঞান লুকাইয়া রহিয়াছে। এ কালের হিতবাদীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ (Greatest good to the greatest number) কি করিয়া হইতে পারে, সে জন্য অনেক আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা অনেক চিন্তা করিয়াছেন। একদিন হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মত মনীষিও আশা করিয়াছিলেন যে জড়-বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি দ্রুতবেগে হইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই এই সামরিক যুগের অবসান হইবে এবং পৃথিবীর সমস্ত মানব আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারই তাঁহার জীবনের শেষ অংশে এই আশায় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিলেন যে যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা মানবে মানবে ও জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ্দ বৃদ্ধিলাভ করা তো দূরের কথা, তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ ভাবই আরও বাড়িয়া যাইতেছে। এ কালের মানুষ সে কালের মানুষ অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে অপরের সর্ব্বনাশ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে শিখিয়াছে! ইহার নাম উন্নতি, ইহারই নাম সভ্যতা! এ বিষয়ে

অধিক আলোচনার বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানের সাহায্যে জগৎকে সুখস্থান করিতে যাইয়া তাহাকে আরও দুঃখময় ও ভীষণ করিয়া তুলিয়াছি তাহা এ কালের অনেক ধর্ম্মপ্রাণ মনীষি ব্যক্তিই অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছেন। যে সমস্ত দেশকে আমরা সভ্য ও উন্নত বলিয়া মনে করি, এবং যে সমস্ত দেশকে অনুকরণ করাই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র উপায় বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, সেই সমস্ত দেশের সমগ্র অধিবাসীগণের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব, একজনকে ধনী ও ভোগশীল করিবার জন্য একশত জন মনুষ্যকে নিরন্ন হইয়া হাহাকার করিতে হইতেছে, জীবন সংগ্রামে নিস্পেষিত হইয়া পশু অপেক্ষাও হীনতর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কেবল মাত্র বাহ্যচাকচিক্যেই আমরা মুগ্ধ হইয়া এতদিন ঐ সমস্ত দেশের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এমন কি জীবন যাত্রার পদ্ধতি পর্য্যন্ত অনুকরণ করিতেছিলাম! কিন্তু অনুকরণের বিষময় ফল অল্পদিনের মধ্যেই আমরা ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, ঐ সমস্ত পাশ্চাত্য জাতির বাহ্যচাকচিক্যের অন্তরালে যে বিভীষিকা রহিয়াছে, আমাদের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছে, আবার অপর দিকে পাশ্চাত্য সুধীগণের মধ্যে অনেকের দৃষ্টি, ভারতবর্ষের এই বাহ্য দীনতা ও নগ্নতার পশ্চাতে যে অক্ষয় শান্তি একদিন বিরাজমান ছিল, এত বিপ্লব ও অবস্থাবিপর্য্যয়ের দ্বারাও যাহার এখনও আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, সেই শান্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, আজ একটু নূতন অনুরাগের সহিত, বিশেষরূপে শ্রদ্ধান্বিত ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রথম প্রশ্নটি আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে।

প্রশ্নটি, পুরুষ সকলের একান্ত মঙ্গল। One ultimate good for all. আমরা বহির্মুখ হইয়া কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানের সাহায্যে মানবের জন্য যে মঙ্গল আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা সর্ব্বকালীন, ও সর্ব্বজনীন হয় নাই। যেমন ছোট কাপড় মাথায় দিতে গায়ে কুলায় না, গায়ে দিতে মাথায় কুলায় না, আমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে। একজনের সুখ ও সুবিধা আর দশজনের অসুখ ও অসুবিধার দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে, একদলের সুবিধা অপর দলের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। এক জাতির মঙ্গল অপর জাতিকে দারুণ অমঙ্গলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। আজ যেমন জগতে অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে কৈ, বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন সফল হইল কৈ? সুখ-

সাধনায় বাহির হইয়া আমরা কৃতকার্য্য হইলাম কৈ? আজ যেমন এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, প্রাচীন ভারতবর্ষেও একদিন ঠিক এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। দ্বাপর যুগের প্রকাণ্ড সভ্যতার বিজয়পতাকা কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যখন একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল, সেই সময়ে এই প্রশ্নটি স্বভাবতঃ সুধীগণের চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রারম্ভে ছয়টী প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্নটিই যে সকলের অগ্রে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে তাহার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। আজ আবার এই প্রশ্ন কেবল ভারতে নহে, সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়াই জিজ্ঞাসিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, আমাদিগকে এই উত্তরটি অতিশয় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত মানবীয় সাধনার পুরোদেশে এক নবীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই সাধনাদর্শের মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। শেষে দেখা যাইবে যে পূর্ব্বোক্ত ছয়টি প্রশ্ন অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত বিজড়িত। সমগ্র ভাগবত-গ্রন্থের মীমাংসা আমরা ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধান্বিত ভাবে উপলব্ধি করিব। সম্প্রতি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংক্ষেপে এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহারই উল্লেখ করিতেছি,

"তচ্চ প্রেমৈব, ন তু স্বর্গাপবর্গাদিকং ব্রহ্মপরমাত্মা-ভগবৎসু মুখ্যস্য ভগবৎ-স্বরূপস্যাপি বশীকারকত্বাদিত্যগ্রিম গ্রন্থে ব্যক্তী ভবিষ্যতি॥"

এই যে একান্ত শ্রেয়ঃ ইহা প্রেম, স্বর্গ অপবর্গ প্রভৃতি নহে, কারণ ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান এই ত্রিবিধ প্রকাশের মধ্যে শ্রীভগবান ভাবই মুখ্য। এই প্রেমের দ্বারা সেই শ্রীভগবানকে বশীভূত করা যায়, ইহা এই গ্রন্থে পরে স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে। জগতের জন্য, মানবের জন্য, এই প্রেমের প্রয়োজন। "পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন" মানবজাতিকে এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে, তবেই জগতের কল্যাণ হইবে। ইহা ছাড়া জগতের অন্য পথে কল্যাণ প্রাপ্তির আদৌ সম্ভাবনা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে এই মহাধন প্রেম, যাহা বিশ্ব-কল্যাণের জন্য প্রয়োজন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রেমের সাধন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার একটি অতি সুন্দর উপমা দিয়াছেন, তাহা এইরূপ। একজন লোক অত্যন্ত দরিদ্র, বড়ই কষ্টে তাহার দিনপাত হয়। একদিন একজন সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার বাড়ীতে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন তাহার বড়ই দুঃখ। সর্ব্বজ্ঞ বলিলেন বাপু, তোমার এত দুঃখ কেন? তোমার পিতার অনেক ধন আছে, তাহা

কি তুমি জান না ? তোমার পিতা বিদেশে গিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন, এই জন্য তুমি তোমার পিতৃধনের সন্ধান পাও নাই। সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে লোকটি পিতৃধন খুঁজিতে লাগিল। মনুষ্য যেমন শাস্ত্রবাক্য অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ করে, সেইরূপ! কিন্তু বাপের ধন আছে, শুধু এই টুকু জানিলেই কিছু ধন পাওয়া যায় না, তখন সর্ব্বজ্ঞ তাঁহাকে ধন প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিলেন। বলিলেন "এই স্থানে ধন আছে, যদি দক্ষিণ দিকে খনন কর ভীমরুল ও বোল্‌তা উঠিবে, ধন পাইবে না। যদি পশ্চিম দিকে খনন কর, বিপদ হইবে। সে দিকে এক যক্ষ আছে, সে বিঘ্ন ঘটাইয়া দিবে, ধন পাইবে না। যদি উত্তর দিকে খনন কর, তাহা হইলে এক ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ অজগর সর্প উঠিয়া পড়িবে, সে হয় ত তোমায় গিলিয়া ফেলিবে। পূর্ব্বদিকে অল্পমাত্র খুঁড়িলে ধনের পাত্র হাতে পড়িবে।" সর্ব্বজ্ঞ দুঃখী ব্যক্তিকে এই কথা বলিয়া দিলেন। শাস্ত্রও সেইরূপ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ বা সম্বন্ধ বলিয়া দিলেন, পরে জিজ্ঞাসিত হইয়া অভিধেয় বা প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ যে ভক্তি তাহার কথা বলিয়া দিলেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ ছাড়িয়া* ভক্তিপথে শ্রীভগবানের অন্বেষণ করিতে হইবে। জীবের জন্য এই প্রেমের প্রয়োজন, শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রেম জগতে প্রচার করিতেছেন, জাতি বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এই পথের পথিক হইলে তবেই জগতের কল্যাণ হইবে।

"কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্যদাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসী বিন্দু ॥
শুদ্ধপ্রেম সুখ সিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়
কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় প্রশ্ন—প্রথম প্রশ্নে ঋষিগণ শ্রীসূতকে পুরুষ সকলের ঐকান্তিক মঙ্গল কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাদের

* 'ছাড়িয়া' বলিতে উপেক্ষা বা অনাদর বুঝায় না। আমরা "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরস কদম্ব" নামক যে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি তাহাতে এই সিদ্ধান্ত অতি সুন্দর রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নিকটেও অনেক প্রশ্ন আসে, আমরাও তাহার উত্তর দিয়া থাকি। মানুষ অহঙ্কারী জীব। এই অহঙ্কার যে সব সময়ে মন্দ তাহা নহে। তবে এই অহঙ্কার অনেক সময়ে তমোগুণের অভিমুখী হয়, যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে কালিয় নাগের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। কালিয় খুব বিক্রমশালী, আত্মশক্তিতে তাহার যে নির্ভরতার ভাব তাহা খুবই ভাল, তবে সে বড় মূর্খ, এই জন্য এই আত্মশক্তির সীমা কতদূর তাহা বুঝিতে পারে নাই। তাই সে গরুড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। যাহা হউক শেষ পর্য্যন্ত তাহার অহিত হয় নাই, সে পলাইয়া যে সীমার মধ্যে আসিয়া লুকাইয়াছিল, সেইখানেই শ্রীভগবানের লীলা হইল এবং সেও শ্রীভগবানের একজন চিহ্নিত সেবক হইয়া গেল। মানুষের অবস্থা কালিয় নাগের মত হয়, তাহা ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর নবালোক (Enlightenment) যাঁহারা ধীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। ইউরোপে একটা যুগ 'কালিয়নাগের যুগ' হইয়া গেল। কালিয় যেমন বিষবীর্য্যে বলীয়ান্ হইয়া বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল, তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নব নব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার সাহায্যে প্রকৃতির বিবিধ ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করিয়া মানুষ অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিল। এই সময়ে অতীতের সভ্যতা ও সাধনা মানবের একটা অবজ্ঞার বিষয় হইয়া পড়িল। অতীতের অভিজ্ঞতার সাহায্য লইয়া, অতীতের সহিত পারম্পর্য্যের সূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কেবল ব্যক্তিগত 'ধর্ম্মবুদ্ধি' বা বিচারণা শক্তির বলে নহে, মানবকে কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে-হইবে, ইহাই সনাতন ব্যবস্থা; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতার নেতৃস্থানীয় ফরাসী-দেশ তাহা বুঝিল না। কালিয় যেমন বিষ্ণুর আসন গরুড়ের নিকট মস্তক অবনত করিতে সম্মত না হইয়া তাহার সহিত ফণা তুলিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল—অষ্টাদশ শতাব্দীও তেমনি অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার (The accumulated experience of the past) শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বা শ্রদ্ধান্বিত ভাবে তাহার নির্দেশানুযায়ী বিপুল আত্ম-শক্তিকে সংযত করিতে কেমন লজ্জা বোধ করিল। ইহার ফলেই ফরাসী বিপ্লব! অবশ্য কালিয়ের এই গরুড়ের সহিত যুদ্ধ ও পরাজয় যেমন একেবারে নিস্ফল হয় নাই, প্রথমটা দেখিতে যতই শোচনীয় হউক না কেন, এই ঘটনাই চরমে তাহার পরম কল্যাণ প্রসব করিল, সেইরূপ সমাজ-তত্ত্ববিৎগণ একবাক্যে বলিয়া থাকেন, যে ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা সমরের পরিণতি যতই শোচনীয় হউক না

কেন, এই ঘটনাতেই জগৎ এক নবরাজ্যের মধ্যে, এক নবীন বিশ্বজনীন প্রেম ও সাম্যের আদর্শ-নিয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন কালিয় বিষহ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু এই বিষহ্রদের তীরে একটি কদম্বতরু আছে, যাহার উপর আরোহণ করিয়া একদিন কালিয়-দমনকারী শ্রীহরি এই বিষহ্রদে লাফাইয়া পড়িবেন, ও ফণার উপর নৃত্য করিয়া কালিয়কে আত্মসাৎ করিবেন।

আমাদের দেশে এই অবস্থা কি ভাবে কার্য্য করিয়াছে তাহারও একটা ইতিহাস আছে। একদিন রজোগুণ বা অহঙ্কার আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পূর্ব্বে, সত্য সত্যই আমরা কিছুদিন হইতে একেবারে তমোজালে জড়িত হইয়া নিশ্চেষ্ট ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছিলাম এই জাগরণ যখন আসিল তখন আমরা কালিয়নাগের মত কিছু বেশী রকমের বাহাদুর হইয়া পড়িলাম। শাস্ত্র না পড়িয়াই পণ্ডিত ও ধর্ম্মবেত্তা হইয়া পড়িলাম। সমস্ত অতীতের সাধনা আমাদের নিকট অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম যে না পড়িয়া ও না ভাবিয়া আমরা সবই বুঝিয়াছি। অতীতের সবই ভুল, সবই কুসংস্কার। ইহাই গরুড়ের সহিত কালিয়ের যুদ্ধ! এই সময়ে বিলাতী 'বিবেক-বাদ' ও 'ব্যক্তিগত অনধীনতাবাদ' আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িল। এইগুলি কালিয়নাগের ফণা। এখন কালিয় পরাস্ত হইয়াছে, কালিয়-হ্রদ বিষময় এখন কালিয়-দমন হরি হ্রদমধ্যে উদয় হইলেই কালিয়ের ঐ ফণার উপর তিনি নৃত্য করিবেন। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ ও শ্রীভগবান অভিন্ন। ইহা প্রাচীন মত। ভাগবত-ধর্ম্মের যদ্যপি যথার্থ আলোচনা হয়, তাহা হইলে আমাদের যুগের যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসম্ভ্রমের ভাব তাহা দূর হইবে, 'বিবেক-বাদ', সাধনার দ্বারা অন্তর্যামী চৈত্যগুরু শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শ্রবণে পরিণতি লাভ করিবে, 'অনধীনতা' কৃষ্ণদাসরূপে আত্মপরিচয় লাভ করিয়া, যাহা যথার্থ স্বাধীনতা তাহা অর্জ্জন করিবে। ইহাই আমাদিগের জাতীয় সাধনার পথ, শ্রীমদ্ভাগবত এই পথের গুরু। এই যুগের যে তেজস্বীতা ও অনধীনতার ভাব তাহা এখন যতই মন্দ বলিয়া মনে হউক না কেন, শেষে দেখা যাইবে, এ অবস্থা না আসিলে মঙ্গল হইত না। প্রসঙ্গটি বড়ই জটিল, যাহা হউক পরে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিবার আকাঙ্খা রাখিয়া মূলবিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে।

শৌণকাদি ঋষিগণ সূতকে পুরুষ সকলের একান্ত মঙ্গল সম্বন্ধে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, সূত নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা বলে তাহার তো একটা উত্তর দিতে পারেন। যেমন আমরা দিয়া থাকি। ঋষিগণ বলিতেছেন আমরা এপ্রকারের (কালিয় নাগের মত আর কি!) উত্তর জানিতে চাই না। এই জন্য বলিতেছেন সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম্ম বিচার করিয়া তদনুসারে এই প্রশ্নের উত্তর দাও। ইহার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রও সজ্জনের উপদেশ-নিরপেক্ষ দুর্য্যোধনের আত্মশক্তিতে অতি-বিশ্বাস ও আত্মপুষ্টির অবৈধ প্রয়াসেইএই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পতনও একটা বড় দরের কালিয় দমন। কাজেই ঋষিগণ অতীতের অভিজ্ঞ-তার সাহায্যে অথবা শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে অতীতের সাধনার মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন—এই জন্যই সূতকে বলিলেন তুমি যাবতীয় ব্রহ্মবিৎগুরুগণের চরণমূলে বসিয়া পুরাণ, ইতিহাস ও ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহ তাহাদের ব্যাখ্যাসহ পাঠ করিয়াছ—সেই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনার ফল স্বরূপ তোমার যে উত্তর তাহাই আমরা শুনিতে চাই।

"প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন, যুগেজনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যাহ্যুপদ্রুতাঃ ॥
ভূরীণিভূরি কর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃ সাধোঽত্র যৎসারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
ব্রূহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥"

হে সূত! তুমি দেশকাল পাত্রজ্ঞ তুমি সমস্তই জান। এই কলিতে অধিকাংশ লোকই অল্পায়ুঃ, যদি বা কাহারও আয়ুষ্কাল কিছু দীর্ঘ হয়, তাহা হইলেও মন্দ অর্থাৎ পরমার্থ বিষয়ে বড়ই অলস। যাহা ক্ষণস্থায়ী, যাহা উপ-স্থিত সুখ দিয়া পরে দুঃখ দেয়, সে বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যবসায় আছে, কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে বা শাশ্বত মঙ্গল সাধনের চেষ্টায় একেবারে পরাঙ্মুখ। যদি বা কেহ উদ্যোগী হয় তাহা হইলে সে নির্বুদ্ধি। আর যদি বা দৈবক্রমে সুবুদ্ধিসম্পন্নও হয় তাহা হইলেও মন্দভাগ্য, তেমন সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হয় না। আর যদি সৌভাগ্যক্রমে সুসঙ্গ পাওয়া যায়, তাহা হইলে রোগ শোক অভাব প্রভৃতির তাড়নায় সেই সাধু মুখে পরমার্থ বিষয় শুনিবার এবং শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার সুবিধা ও অবকাশ ঘটিয়া উঠে.না। শাস্ত্রে হয়ত শ্রেয়ঃ সাধনের নানারূপ উপায় কথিত হইয়াছে। আমরা তোমার নিকট এই সমস্ত উপায়ের

মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ এবং কলিকালের মানবের পক্ষে সুশক্য তাহাই শুনিতে চাই তাহাই বল। শাস্ত্র অসংখ্য তৎসমুদায় শ্রবণ করা বহুকাল-সাধ্য ব্যাপার—সুতরাং সেই সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া শ্রেয়ঃ সাধন নিরূপণ করিবার সম্ভাবনা নাই। বহুবিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায় নিশ্চয় করা সুকঠিন, অতএব নিজ বুদ্ধির দ্বারা যে সার উদ্ধার করিয়াছে, লোক সকলের মঙ্গলের জন্য আত্মার প্রসন্নতা বিষয়ক তাহাই বল।

ঋষিগণ যাহা বলিলেন তাহার আর একটু রহস্য আছে। কেবল মাত্র শাস্ত্রের মর্ম্মানুযায়ী একান্ত মঙ্গল নিরূপণ করাও ঠিক তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। "যেনাত্মা সুপ্রসীদতি" যদ্দ্বারা আত্মপ্রসাদ হয়। কারণ শাস্ত্র অন্বেষণ করিয়া তো অধিকার ভেদে কথিত না রূপ কথাই পাওয়া যায়, সে সমস্তকে উচ্চতম সমন্বয়ের মধ্যে উপলব্ধি করা মানবীয় সাধনার একটি আবশ্যকীয় কথা, এই জন্য 'আত্মপ্রসাদের' কথা বিশেষরূপে বলা হইল। বাহিরে শাস্ত্র ও অন্তরে আত্মপ্রসাদ এই উভয়ের পূর্ণ সমন্বয় যেখানে সেই খানেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেম, যাহার নাম পঞ্চম পুরুষার্থ—"আনন্দ চিণ্ময় রস প্রেমের আখ্যান।"

এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে ব্যক্তিগত মণীষা অনাদরের বিষয় নহে। তবে শাস্ত্র ও গুরুর দ্বারা আলোকিত ও উপদিষ্ট মণীষার উপরেই নির্ভর করা যায়। নতুবা অসংযত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির মণীষার উপর নির্ভর করিলে অনর্থ অবশ্যম্ভাবী। কালিয় নাগ প্রথমটা তাহাই করিয়াছিল, শেষে সরল ভাবে সাহসের সহিত চলিয়াছিল বলিয়া শ্রীভগবানের কৃপার দ্বারা তাহার জীবন সফল হইয়াছিল।

তৃতীয় প্রশ্ন

নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা তৃতীয় প্রশ্নটি কথিত হইয়াছে।

"সূত জানাসি ভদ্রংতে ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া ॥
তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুং।
যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায়চ ভবায়চ ॥
আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ং ॥

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃপুনন্ত্যপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোনুসেবয়া॥
কোবা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্য কর্ম্মণঃ।
শুদ্ধিকামোন শৃণুয়াদ্‌যশো কলিমলাপহং॥"

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের যাহা মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে এই প্রশ্নটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতে হইবে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক কয়টির অর্থ এই।

হে সূত তোমার মঙ্গল হউক। সাত্বতপতি শ্রীভগবান্ বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে যে জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা তোমার জানা আছে। তাঁহার অবতার, ভূত সকলের রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য, আমরা শুনিতে ইচ্ছুক, অতএব আমাদের নিকট তাহা বর্ণনা কর। ঘোর সংসারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়া যাঁহার নাম গ্রহণ করিলে, সদ্য বিমুক্তি লাভ করে এবং স্বয়ং ভয় যাঁহাকে ভয় করে, যাঁহার চরণ যুগল মুনিদিগের আশ্রয় এজন্য তাঁহারা শমপথাবলম্বী এবং তাঁহাদের ঈদৃশ মহিমা যে তাঁহাদের নিকটে আসিবামাত্র লোকে পবিত্র হইয়া যায়, আর সুরনদী গঙ্গা তাঁহার চরণ হইতে নিঃসৃতা, কিন্তু তথায় বিরাজমানা নহেন, এজন্য অবগাহনাদি করিলে শুদ্ধ করিয়া থাকেন, এই প্রকারের সেই শ্রীভগবান, পুণ্যশ্লোক মনুষ্যগণ তাঁহার কর্ম্মসকলের সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন, অতএব আমি পবিত্র হইব বলিয়া কোন্ ব্যক্তি কলি-কলুষ-নাশক তাঁহার যশঃ শ্রবণ না করিবে ?

প্রাচীন আচার্য্যেরা সকলেই এই কয়েকটি শ্লোকের বিশেষ মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীপাদ বলিয়াছেন এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিবার সময় ঋষিগণের অত্যধিক ঔৎসুক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে অর্থাৎ তাঁহারা বিশেষ ভাবে এই প্রশ্নটিরই উত্তর শুনিবার জন্য যেন লালায়িত হইলেন। এইজন্য "ভদ্রংতে" তোমার মঙ্গল হউক, এই বলিয়া সূতকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্রীজীবগোস্বামী কৃত ক্রম-সন্দর্ভ টীকায় নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ শ্রবণই শৌণকাদি ঋষিগণের উদ্দেশ্য। শৌণকাদি ঋষিগণ প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন পুরুষ সকলের একান্ত মঙ্গল কি, এই শ্রেয়ঃ সকল শাস্ত্রের সার নিষ্কাসন করিয়া এবং আমাদের যাহাতে আত্মপ্রসাদ হয় এমন ভাবে নির্ণয় কর। (কেবল শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেই যে হইবে তাহা নহে, আত্মপ্রসাদও চাই।) এই দুইটি প্রশ্ন করার পর ঋষিগণ

বলিতেছেন "দেখ সূত, এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি, আমাদের এইরূপ মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনই শাস্ত্র ও আত্মপ্রসাদের দ্বারা স্বীকৃত সেই অব্যভিচারী মঙ্গল।" ইহাও শ্রীজীব গোস্বামী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এইবার প্রশ্নটি বেশ ধীরভাবে আলোচনা করা যাউক। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাত্বত-পতি শ্রীভগবান বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে জগতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন (মূল শ্লোকে 'জাতঃ' এই পদটি আছে, ক্রম সন্দর্ভটীকায় ইহার অর্থ করা হইয়াছে "জগদ্দৃশ্যোবভুব") তোমার অবশ্য তাহা জানা আছে। তুমি পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ, বেদব্যাস ও অন্যান্য পারদর্শী গুরুগণের নিকট পাঠ করিয়াছ ও ব্যাখ্যা করিয়াছ অতএব এত বড় আবশ্যকীয় একটি বিষয় তোমার কেননা জানা থাকিবে? প্রশ্নটির ভাষা হইতে এইটুকু পাওয়া যাইতেছে যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ জগতে প্রচারিত হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীভগবান রূপে সেই পরতত্ত্বের উপাসনা, বিশ্বের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য তাঁহার জগতে আবির্ভাব, বিশেষ করিয়া বসুদেব ও দেবকীর পুত্র রূপে তাঁহার জগতে লীলা, ইহা প্রচারিত ছিল। কিন্তু সকল শাস্ত্রের সার, সর্ব্ব-তত্ত্বের ও সকল সাধনের শিরোমণি এই গূঢ় তত্ত্ব সার্ব্বজনীন ছিল না, অথবা ইহা বুঝিবার ও ইহাতে বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের ছিল না, কিন্তু এই তত্ত্ব চিরকালই জগতে প্রচলিত ছিল। শ্রীভগবানকে এই স্থলে "সাত্বতাং পতিঃ" বলা হইয়াছে, ইহার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। পদটির অর্থ এই "সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান যাঁহাদের উপাস্য তাঁহারা সাত্বত বা ভক্ত।" শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রচার হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে বা সৃষ্টির প্রথম হইতেই এই সাত্বত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গূঢ় তত্ত্ব প্রচলিত ছিল, তাঁহারা এই রহস্য আনুপূর্ব্বিক জানিতেন, তাঁহারা যে ইচ্ছা পূর্ব্বক ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নহে, তবে সাধারণ লোকে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকারী ছিল না। (সাধারণ লোক বলিতে তত্ত্ববিদগণ এই বোঝেন যে যাঁহারা এই কল্পের প্রথমে জীবন পথে পর্য্যটন আরম্ভ করিয়াছেন, এবং ক্রমোন্নতির পথে সাধারণ ভাবে অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত সাধনব্যতিরেকে অগ্রসর হইতেছেন। কারণ সাত্বত-গণ অগ্রবর্ত্তী জীব; আর নারদ প্রভৃতি যাঁহারা এই সম্প্রদায়ের গুরু তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্বে কল্পেই জীবন্মুক্ত হইয়া কেবল এই তত্ত্ব প্রচারের দ্বারা জগতের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য দেহধারণ করিয়াছেন।)

এখানে আমরা এইটুকু পাইতেছি যে শ্রীভগবান রূপে পরতত্ত্বের উপাসনা, তাঁহার বিশ্বমঙ্গলের জন্য আবির্ভাব ও শ্রীকৃষ্ণ রূপে তাঁহার লীলা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই প্রচারিত ছিল। শৌণকাদি ধর্ম্মপিপাসু ঋষিগণ পরম্পরায় একথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানিবার তাঁহাদের পূর্ব্বে সময় হয় নাই। এখন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে দ্বাপরযুগ অবসানপ্রায়, আর তাঁহারাও নানারূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, কত যজ্ঞ তাঁহারা করিয়াছেন, কিন্তু জীবন সায়াহ্নে তাঁহারা অকূল পাথারে ভাসিতেছেন, আবার নিজেদের জন্য যতটা না হউক আসন্ন কলিযুগে জীবগণের কি উপায় হইবে, এই চিন্তায় তাঁহারা নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। এসকল কথা আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। এখন সেই সাত্বত সম্প্রদায়ের মত তাঁহাদের মনে পড়িয়া গেল, মনে হইল ইহাই একমাত্র ঔষধ, যাহার সাহায্যে আমাদের ও কলিসাগরে নিপতিত নিখিল জীবের কল্যাণ হইবে। তৃতীয় প্রশ্নটি বেশ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া ধীরভাবে ইহার অর্থ চিন্তা করিলে, যাহা বলা হইল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই টুকু বুঝিতে পারিলে আর একটি অতি আবশ্যকীয় কথা বুঝিতে পারা যাইবে। একদল একালের সমালোচক আমাদিগকে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছেন যে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত হয় নাই, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে এই সমস্ত বিষয় কাল্পনিক। পরবর্ত্তী গ্রন্থে রহিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তীগ্রন্থে নাই সুতরাং ঐতিহাসিকের সাধারণ ধারণা অনুসারে পরবর্ত্তী গ্রন্থের কথার বিশেষ প্রামাণিকতা নাই। ঠিক এই ভাবের চিন্তাপদ্ধতি আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের যাঁহা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে নাই, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বা শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে আছে, তাহাও এইরূপ কল্পনা-প্রসূতণ এই প্রশ্নটির এস্থলে উত্তর দেওয়া আবশ্যক। হিন্দুর পৌরাণিক বা অন্তর্জ্জাগতিক চিন্তা পদ্ধতির সহিত একেবারে পরিচয় না থাকার জন্য, পুরাণ ও লীলা জিনিসটা কি, কিপ্রকারে তাহা প্রাচীনেরা বুঝিতেন তাহা আদৌ না জানার জন্যই, এই প্রকারের মতবাদ নির্ভয়ে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

প্রথমে একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। সেক্‌স্‌পীয়র যখন জীবিত

ছিলেন সে সময়ে তাঁহার কবি-প্রতিভার অলৌকিকতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই, এমন কি স্বদেশে তাঁহার শক্তির মূল্যও অবধারিত হয় নাই, তাহার পর যত দিন যাইতেছে তাঁহার প্রতিভার অলোক-সামান্যত্ব সম্বন্ধে ততই নব নব মত প্রচারিত হইতেছে। ইহা হইতে কি এইরূপ অনুমান করা যাইবে যে, যে হেতু সমসাময়িক লেখকগণ এই অনন্যসাধারণত্ব উল্লেখ করেন নাই বলিয়া ইহা কাল্পনিক ?

শ্রীকৃষ্ণের যে শ্রীবৃন্দাবন লীলা তাহা মানব হৃদয়ে মাধুর্য্যানুভূতির পরাকাষ্ঠা। শ্রীভগবান লীলা করিয়াছেন যাহা নিত্য ও প্রপঞ্চাতীত, যোগ-মায়া প্রভাবে প্রাকৃত প্রপঞ্চে তাহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অহঙ্কারী মানব আত্মকর্ত্তৃত্বই দর্শন করে, সে লীলা দর্শন করে না, তাহার সম্মুখে লীলা হইলেও তাহার গভীরতার মধ্যে সে প্রবেশ করিতে পারে না।

শ্রীভগবানের শ্রীবৃন্দাবন লীলা সম্বন্ধে আচার্য্যগণ যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বে, ভগবদ্গীতা সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে বিঘোষিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রচার করা অনর্থক। দু একজন ব্যতীত সাধারণের তাহা ধারণার অতীত। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের এই নবধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে একটি অতি আবশ্যকীয় ঘটনা, এ কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহা আমাদিগকে বেশ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা, ভারতের যাবতীয় ক্ষত্রিয় বীর, অষ্টাদশ দিবস রণহুঙ্কারে দিগ্দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া, স্বর্গে দেবগণের ও পাতালে নাগগণের ত্রাস উৎপাদন করিয়া আজ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে! রাজা দুর্য্যোধন সসাগরা বসুন্ধরার আধিপত্য কামনা করিয়াছিলেন "বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও ছাড়িয়া দিবনা, ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিজ্ঞা, আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, জয়দ্রথ, শল্য, অশ্বথামা প্রভৃতি বীরেন্দ্রগণ জীবন পণ করিয়া তাঁহার কামনা পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে কামনা পূর্ণ হইল না। এই চেষ্টায় দ্বাপরের ক্ষাত্রশক্তিপ্রধান" বিরাট সভ্যতা একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। হায় অহঙ্কার, হায় আত্মপুষ্টির চেষ্টা! এই অবস্থায় সকলেরই দৃষ্টি স্বভাবতঃ সেই অর্জ্জুনের রথের সারথী নিরস্ত্র নবীন-জলদশ্যাম "বাঁকা বংশীধারী"র প্রতিই পতিত হইল।

অহঙ্কার চূর্ণ হওয়ার পর, রজঃগুণপ্রধান ক্ষাত্রযুগ শেষ হওয়ার পর,

যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, যেমন ভীষ্মদেব ও কুন্তীদেবী যাঁহারা এই লীলার কিছু কিছু জানিতেন, তাঁহারা নির্ভয়ে সমস্ত কথা বলিলেন। লোকে শুনিল, শুনিয়া বিস্মিত হইল, এক নূতন রহস্য রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল, এতদিন জগৎ-ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহাদের যে সব ধারণা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গেল—লোকে, এই শ্রীকৃষ্ণ-রহস্য সম্বন্ধে আরও জানিবার জন্য আগ্রহ হইতে লাগিল। নারদ সমস্তই জানিতেন, তিনি ব্যাসদেবকে সূত্র বলিয়া দিলেন, নারদের শক্তিতে এক নবচেতনায় জাগ্রত হইয়া ব্যাসদেব সমাধিস্থ হইলেন, যেমন দেখিলেন বর্ণনা করিলেন! তাঁহার পুত্র শুকদেব, এতদিন নির্গুণ ব্রহ্মবাদে তুষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন, এই নূতন তত্ত্ব তাঁহাকে সুধার ন্যায় মিষ্ট লাগিল, তিনি পিতার নিকট এই তত্ত্ব শিক্ষা করিলেন। তাহার পর মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ও প্রায়োপবশন, বিশাল ঋষিসভায় এক সপ্তাহ ধরিয়া শ্রীশুকদেব কর্তৃক গঙ্গাতীরে এই শাস্ত্র কথিত হইল। উগ্রশ্রবা সূত তাহা শুনিলেন, তিনি আসিয়া নৈমিষারণ্যে শৌণকাদি ঋষিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত ছয়টি প্রশ্নের উত্তরে এই গ্রন্থ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন, নৈমিষারণ্য হইতে বেদের সারস্বরূপ কলি-অন্ধকার নাশের সূর্য্য-স্বরূপ এই মহাগ্রন্থ জগতে প্রচার করা হইল। তৃতীয় প্রশ্নটির মর্ম্ম ধীরভাবে আলোচনা করিলে এই একটি জটিল রহস্য আমরা বুঝিতে পারিব।

বুদ্ধের করুণা

একদা শ্রাবস্তিপুরে লোকালয় হ'তে দূরে নির্জ্জন কাননে
বসি বুদ্ধ ভগবান উপদেশ দেন দান নিজ শিষ্যগণে ;
কহেন নির্ব্বাণ কথা দূরে যায় শোক ব্যথা চিত্ত আসে ভ'রে,
প্রশান্ত আননে তাঁর দীপ্তি মাখা করুণার চোখে শান্তি ঝরে।
শুনে তাঁর তত্ত্বকথা স্তব্ধ হ'য়ে তরুলতা উজ্জ্বল আকাশ,
বিপুল পুলক ভরে চরণে প্রণতি করে ঊষার বাতাস ;
বনান্তের ক্ষুদ্র নদী ছুটে আসে নিরবধি তরঙ্গ আকুল,
সূর্য্য উঠে রাঙা হ'য়ে কতই পুলক ব'হে ফুটে কত ফুল।
বুদ্ধ কহিলেন, "শোন রেখনা অন্তরে কোন মান অভিমান,
দূর কর হিংসা দ্বেষ হবে অশান্তির শেষ পাবে নব প্রাণ,"

হেন কালে এক দীনা শোকাতুরা পুত্রহীনা দ্রুত ছুটে আসে,
প্রভু কহিলেন তারে, "কেন মা ফিরিছ দ্বারে" সুধাস্নিগ্ধ ভাষে।
রমণী ভকতি ক'রে বুদ্ধের চরণোপরে করিয়া প্রণতি,
কহিল সন্তাপ ভরে, "পুত্র মোর গেছে মরে ওগো শ্রেষ্ঠ যতি";
বুদ্ধ তবে মৃদুহাসে স্নেহ পরিপূর্ণ ভাষে কহিলেন তারে,
"ওগো শোকাতুরা নারী মুছ তব অশ্রুবারি বাঁচাব কুমারে"।
তখন রমণী উঠে সাধুর চরণে লুঠে ফেলে অশ্রুজল,
বলে, "প্রভু কহ তবে কত রত্ন দিতে হবে ইহার বদল";
বুদ্ধ বলিলেন ডাকি, "মুছ মা সজল আঁখি কিছু নাহি চাই
বাঁচে তোর পুত্রধনী পাঁচটী সরিষা গণি যদি আমি পাই"।
রমণী শোকাশ্রুপ্লুত গৃহ পানে যায় দ্রুত প্রভু কহে তারে,
"হে জননী সুত লাগি আন ইহা ভিক্ষা মাগি ফিরি দ্বারে দ্বারে,
শুধু যাহাদের ঘরে কেহ কভু নাহি মরে তাদেরি কেবল,
সরিষায় পুত্র তব পাইবে জীবন নব নতুবা বিফল"।
রমণী সন্তান লাগি পাঁচটী সরিষা মাগি ঘুরে সর্ব্বদ্বার,
কিন্তু হেন নাই গেহ যেথা মরে নাই কেহ ফিরে পুনর্ব্বার;
অবশেষে ক্লান্ত অতি ব্যথিত আসক্ত গতি ফিরে এল বনে,
তখন দিনের আলো হয়েছে ধূসর কালো সন্ধ্যা আগমনে।
"এনেছ কি ভিক্ষা করে হে মাতঃ সন্তান তরে" সাধু কহে ডাকি,
রমণী ব্যথিত হ'য়ে বিনত হইয়া কহে অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
"ফিরিলাম প্রতি গেহ অমর নহে গো কেহ সব লুপ্ত হয়,
হে প্রভু হে স্বামী মোর ঘুচাও নেশার ঘোর দাও পদাশ্রয়"।
বুদ্ধ তারে মিষ্টভাষে সেই শান্ত বনবাসে দেন উপদেশ,
মুহূর্ত্তে তাহার গর্ব্ব শোক তাপ দুঃখ সর্ব্ব হল অবশেষ;
মুছিয়া নয়ন বারি প্রভু পদস্পর্শে নারী ফিরিবার কালে,
তখন সন্ধ্যার শেষে শশাঙ্ক উঠেছে হেসে দিক্ চক্রবালে।

শ্রীপ্রভাসকুমার সেন

খড়দহ

শ্রীল পূজ্যপাদ নয়নানন্দ ঠাকুর বিরচিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি রস-কদম্ব। (৪)

তৃতীয় প্রকরণ!

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সর্ব্ব কল্যাণের হেতু ভক্তির সাধন।
তাহা ছাড়ি মুক্তি হেতু জ্ঞাননিষ্ঠ হন॥
ধান্য ত্যাগ করি পুন পরম যতনে।
তুষ আগড়া ভাণে তণ্ডুল কারণে॥
ধান্য বিনা তণ্ডুল প্রাপ্তি আগড়ায়
নাহি হন।
অতএব ক্লেশভাগি শ্রম অকারণ॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণ প্রিয় কোন কর্ম্ম নয়
সাংখ্য জ্ঞান আদি করি যেবা শাস্ত্রে
কয়॥

শ্রীদশমে—

শ্রেয়ঃ শ্রুতিং ভক্তিমুদাস্যতে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাং॥
জ্ঞানং যদি অচ্যুতভাববর্জ্জিতং তদা ন
শোভতে তত্র যজ্ঞাদিকর্ম্মণঃ কা কথা।
যথা প্রথমে শ্রীনারদঃ
নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে

ভক্তবশ্যত্বং যথা—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং
গোপীকা সুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তি-
মতামিহ॥
কৃষ্ণপ্রিয় ভক্তিবিনে অন্য কর্ম্ম নন।
দ্বিজধর্ম্ম দৈবকর্ম্ম আদি আচরণ॥
ধনব্যয় তপ শ্রুতি তেজ পৌরুষাদি।
কৃষ্ণপ্রিয় নাহি হয় যোগ বল বুদ্ধি॥
ষষ্ঠে চ
শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি
হরের্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধ্যেন্নাত্মা
ব্রতাদিভিঃ॥
জ্ঞান তপ যজ্ঞ শৌচ ব্রত আচরণ।
ভক্তি বিনে ইথে কৃষ্ণ তৃপ্ত নাহি হন॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রীণন হেতু ভক্তি আরাধনা।
ভক্তি বিনে তপস্যাদি সব বিড়ম্বনা॥
যথা শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদ উক্তিঃ
নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বম্বাহসুরাত্মজাঃ॥
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বিত্তং ন বহুজ্ঞতা॥
ন জ্ঞানং ন তপোনিষ্ঠা ন শৌচং ন
ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়াভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনং।

ভক্তিভাব সম কেহ নহে কৃষ্ণ প্রিয়।
জ্ঞান তপপুণ্যব্রত দান ধর্ম্মাদয়॥
যথা পাদ্মে অর্জ্জুনং প্রতি ভগবদুক্তিঃ
ন চ ভক্তি-সমং জ্ঞানং ন চ ভক্তি-
সমং তপঃ।
ন চ ভক্তি-সমং পুণ্যং ন চ ভক্তি পরং
ফলং॥
ন চ ভক্তি সমং ধ্যানং ন চ ভক্তি
সমং ব্রতং।
ন হি ভক্তি সমং জ্ঞানং নাস্তি ভক্তি
সমাগতিঃ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পুরুষার্থ সাধন।
ভক্তি কাছে এই সব তৃণ তুল্য হন॥
কৃষ্ণকথামৃতসিন্ধুমগ্নভক্তগণ।
তৃণতুল্য চতুর্ব্বর্গফল তারা কন॥
যথা ভাবার্থ দীপিকায়াং
তৎকথা মৃতপাথোধো বিহরন্তো
মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিৎ চতুর্ব্বর্গং
তৃণোপমং॥
ভক্তি সম কেহ নয় চতুর্ব্বর্গ ফল।
ভক্তিবিনে ভক্তগণের অন্য নাহি বল॥
সকল পুরুষার্থ ফল মুক্তি পদ হন।
হেন মুক্তি না বাঞ্ছয়ে কৃষ্ণ ভক্তগণ॥
কৃষ্ণ কহেন যদি মুক্তি দিবে ভক্তগণে।
ভক্তি বিনে মুক্তি তারা না করে
গ্রহণে॥
শ্রীভাগবতে—
সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্যসামীপ্যৈকত্ব-
মপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং

সেবাবিনে মুক্তিপদ ভক্ত না বাঞ্ছয়ে।
ব্রহ্মবিবর্ত্ত গ্রন্থে বিবরিয়া কহে॥
ভক্তি মুক্তি ভেদ তাহে করহ শ্রবণ।
মুক্তি হয় চতুর্বিধ তাহাতে বর্ণন॥
বিষ্ণুলোক বসতি আর তৎস্বরূপ ধারণ
সমীপ বাসী আর ব্রহ্মে লীন হন।
এই মত চতুর্ব্বিধ মুক্তির লক্ষণা।
জন্ম মৃত্যু রহিত হয় মুক্ত যেই জনা॥
জরা ব্যাধি নাহি তাথে দুঃখ শোক
রোগ।
কোন ক্লেশ নাহি তাহে পরানন্দ
ভোগ॥
হেন মুক্তিসুখ বাঞ্ছা না করে ভক্তগণ।
সেব্যসেবক ভাব যাথে নাহি রন॥
মুক্ত হৈলে সেবাসুখ না হয় তাহাতে।
সেবাসুখ ভক্তিফল সতত ভক্তেতে॥
ভক্তি মুক্তি এই ভেদ পুরাণে লক্ষণা।
ভক্তগণ সেবানন্দ করয়ে বাসনা॥
যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—
সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য সামীপ্যাদি পদং
শুভং।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়শোকাদিখণ্ডনং॥
দিব্যরূপধরং নিতং নির্ব্বাণং মোক্ষণং
বিদুঃ।
মুক্তিশ্চ সেবারহিতা ভক্তিসেবা-
বিবর্দ্ধিকাঃ॥
ভক্তিমুক্ত্যোরয়ং ভেদঃ নিষেক বচনং
যথা॥
তত্রৈব।
ভক্তির্ভগবতঃ সেবামুক্তিস্তৎপদলক্ষণং।
কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং

কৈবল্য মুক্তি ভক্ত না করে বাসনা।
কৃষ্ণ দিলেয় নাহি নেন দাস্যভাববিনা॥
একাদশে উদ্ধবং প্রতি ভগবদ্ভক্তিঃ।
ন কিঞ্চিৎ সাধবোধীরা ভক্তাহ্যে-
কান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপিময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবং॥
নারায়ণব্যূহস্তবে।
ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদে-
শ্বর।
প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভি-
কাময়ে॥
নির্ব্বাণ কৈবল্যমুক্তি ভক্তের তুচ্ছ হন।
সেবানিষ্ঠ সালোক্যাদি তুষ্ট অতি নন॥
যথা—
অত্র মোক্ষ তয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ
সর্ব্ববিধাপিচেৎ।
সালোক্যাদি স্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতি
বিরুধ্যতে॥ ইতি
এই ত কহিল ভেদ ভক্তি মুক্তি দুই।
ভক্তিফলে কোন্ গতি তাহা শুন কই॥
ভক্তগণ ভক্তিক্রমে পায় কৃষ্ণগতি।
সেবানিষ্ঠ সামিপ্যরূপে ভাগবতী গতি॥
ইত্যাদি বিধানে করি মনে সম্বোধন।
ভক্তিভাবে কর সেবা শ্রীনন্দ নন্দন॥
ভক্তিহয়ে তাহে জানি দ্বিবিধ প্রকার।
সকামা নিষ্কামা ভক্তি এই ত বিচার॥
দৃঢ় করি ভক্তি ভাবে ভজে ভগবান।
উভয় ভক্তেতে ভক্ত বাঞ্ছারূপে পান॥
জার যে বাসনা তার তৈছে সিদ্ধ হয়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে জন বাঞ্ছয়॥
কামী ভক্তেরকামপূর্ণ ভক্তি হৈতে হন।
নিষ্কাম ভক্তির ফল গোবিন্দ সেবন॥
শ্রীভাগবতে—
অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকামঃ
উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তি যোগেন যজেত পুরুষং
পরং॥
তীব্রেণ ব্যাভিচারাদি দোষ রহিতেন।
যজ্ঞাদি বিধানে যেবা ভজে ভগবান।
স্বর্গাদি অভিলাস করি৽হইঞা সকাম॥
বেদ বিধি আচরিঞা পুণ্য কর্ম্ম করি।
করয়ে বিভোগ সেই অমর নগরি॥
স্বর্গাদি করয়ে ভোগ পুণ্য যাবৎ রয়।
পুণ্যক্ষয়ে পুনঃ আসি সংসারে জন্ম হয়॥
শুভাশুভ কর্ম্মফলে জন্ম মৃত্যু হয়ে।
বারংবার গতাআত নিজ কর্ম্মসয়ে॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে নহে যমের শাসন।
শুভাশুভ কর্ম্মফলে করয়ে ভ্রমণ॥
শ্রীভগবদ্গীতায়াং—
এবং ত্রয়ীভাবমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ইতি
তত্রৈব—
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবিদেব ভোগান্।
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥ ইতি
সকাম ভজনে হয় গতায়াত জানি।
জন্মমৃত্যু গর্ভবাস সুখ দুঃখ সুনি॥
অভিলাস ত্যাগ করি প্রীতে ভজে
হরি।
তার জন্ম নাহি হয় সংসার ভিতরি॥

নিমিত্ত রহিত ভক্তি হয় সর্ব্বোত্তম।
সিদ্ধাদিক পদ তার কেহ নহে সম ॥
নিস্কাম ভক্তির ফলে হয় কৃষ্ণ প্রাপ্তি।
জীবোপাধি নষ্ট করি হয় কৃষ্ণ গতি ॥
ভাগবতি মুক্তি হয় নিস্কাম সাধনে।
সেবা সুখ পায় সেই শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥
ভুক্ত অন্ন জীর্ণ যেন করে জঠরানলে।
সেই রসে করে পুষ্ট ইন্দ্রিয় সকলে ॥
তৈছে ভক্তি জীবোপাধি করি বিনাসনে।
ভাগবতী গতি দেন সেবাপরায়ণে ॥
নিস্কাম ভক্তিতে হয় কৃষ্ণানন্দে স্থিতি।
জন্মমৃত্যু গর্ত্তবাস নাহি গতাগতি।
শ্রীভাগবতে—
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশুযা কোষং নিগীর্ণমনলোযথা ॥
জরয়তি শোষয়ন্তি। কোষং লিঙ্গশরীরং জীবাখ্যং। জরয়তি শোষয়তি।
অতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং প্রলয়াদৌ ন সুখচ্যুতি ন পতনং ॥
কাশীখণ্ডে
ন চ্যবন্তি হি তদ্ভক্তা
মহত্যাং প্রলয়াপদি।
অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে
স এব সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ ॥
আব্রহ্মভুবনের হয় জন্ম মৃত্যু গতি।
কৃষ্ণপদ পাইলে পুন নাহিক আবৃতি ॥
শ্রীভগবদ্গীতায়াং
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাপুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনঃ ॥
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

কোন ভক্ত ভজে হরি বিষয় লাগিঞা।
বিষে যেন যত্ন করে অমৃত ছাড়িঞা ॥
কৃষ্ণানন্দ সুধামৃত না জানে সে জন।
বিষয় বাসনা বিষে করয়ে জতন ॥
দয়ালু স্বভাব কৃষ্ণ করুণ হৃদয়।
সেই সেবকেরে প্রভু সকরুণ হয় ॥
বিষয় না দিঞা দেন নিজ পদদ্বন্দ্ব।
নির্ম্মল হৃদয় করে পরম আনন্দ ॥
কৃষ্ণ কৃপা হৈলে ঘুচে বিষয় বাসনা।
তাহাতে সিদ্ধান্ত শুন প্রাকৃতে উপমা ॥
অন্ধ বালক জেন করিঞা রোদন।
আত্ম স্বেচ্ছায় করে মৃত্তিকা ভক্ষণ।
তাহা দেখি তার পিতা মৃত্তিকা ফেলাঞা।
সর্করা সন্দেশ দেয় তার মুখে লঞা ॥
সর্করার স্বাদু পাঞা মৃত্তিকা ত্যাগকরে।
পিতা স্থানে সেই দ্রব্য চাহে বারে বারে।
তৈছে ভক্তের পিতা হয় ভগবান।
নিজ পাদপদ্ম তারে দিতে যত্নপান ॥
যথা—
সকামমপিভজতামতদ্বিদাং
ভক্তপ্রিয়ঃ কামনিবর্ত্তয়ন্নৃণাং।
দাতুং ঘনানন্দদুঘংপদাম্বুজং।
পিতামৃদাস্বাদি শিশোঃ সিতামিব ॥
ইতি
সর্ব্ব কামনা ছাড়ি সেবে ভগবান।
কৃষ্ণদাস বলি জার মনে অভিমান ॥
কোনই না মাগে বর মুক্তি আদিকরি।
নারায়ণ স্তুহস্তবে দেখহ বিচারি ॥

যথা—

ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা
মোক্ষং বা বরদেশ্বর।
প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে
দাস্যমেবাভিকাময়ে॥ ইতি

কৃষ্ণদাস্যপদ বিনে নাহি কিছু বড়।
সর্ব্বশাস্ত্রে এই কথা কহিলেন দড়॥
যে হয় কৃষ্ণের দাস কায় মন প্রাণে।
সেই হয় পূজনীয় এই ত্রিভুবনে॥
আচার অনাচার আদি স্মৃতি উক্ত যত।
নাহি করে অন্য পূজা বিধি অভিমত॥
দেবগণের হোম ঋষি তর্পণ।
ভূতে বলিদান পিতৃ শ্রাদ্ধাদি করণ॥
স্মৃত্যুক্ত নিত্যক্রিয়া পঞ্চ মহা যজ্ঞ।
দেব যজ্ঞ পিতৃ যজ্ঞ আর ভৌত যজ্ঞ॥
ব্রহ্ম যজ্ঞ নর যজ্ঞ আদি ক্রিয়া যত।
গৃহস্থের প্রতি এই বিধি শাস্ত্র মত॥
কৃষ্ণ-দাস হয় যেবা কৃষ্ণ-পরায়ণ।
সেই যদি এই সব না করে অর্চ্চন॥
দেব ঋষি পিতৃগণের নাহি হয় ঋণী।
প্রত্যবায় কৃষ্ণ তার ঘুচান আপনি॥

শ্রীভাগবতে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং ন কিং—
করোনায়মৃণী চ রাজন্
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ম্ম॥

কৃষ্ণ ভক্ত না পূজে কেনে অন্য দেবগণ।
গীতায় প্রমাণ সুন প্রভুর বচন॥
দেব যাজক লোক দেবতা পূজিঞা।
দেবলোকে বসতি করে তৎপর হইঞা॥
পিতৃলোক যজি হয় পিতৃলোক গতি।
ভূতগণ যজিঞা হয় ভূতলোক প্রাপ্তি॥
কৃষ্ণ কহে যেবা মোরে ভজে দৃঢ় মনে।
শাশ্বত বসতি করে সেই মোর স্থানে॥
মোর ভক্ত আমা বহি কাহু নাহি জায়।
অর্জ্জুনে কহিলা কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায়॥

যথা—

দেবান্ দেবযজো যান্তি
পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা
যান্তি মদ্যাজিনোঽপিমাং॥

শ্রদ্ধা করি অন্য দেব করয়ে যজন।
সেহত সাধন হয় শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চন॥
এই কথা প্রভু কহে গীতা ভাগবতে।
অবিধি ভজন সেই নহে বিধিমতে।
অবিধি শব্দের ব্যাখ্যা স্বামির লিখন।
মুক্তি বিনে অন্য ফল দেবান্তরে হন॥
ত্রিবর্গ ফলদাতা হয় দেবগণে।
মুক্ত-পদ নাহি হয় কৃষ্ণ সেবা বিনে॥
সাক্ষাত সেবাতে আর দৈবতান্তর সেবনে।
বৈসম্য তাহাতে কহি কর অবধানে॥

যথা শ্রীগীতা—

যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তাঃ
যজন্তি শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়
যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকং॥

সাখ্যাত ভজনে হয় কৃষ্ণলোক গতি।
দেবতা যজিঞা হয় দেবলোক প্রাপ্তি॥

সেই সব দেব লোকের হয় বিনাশন।
অতএব ব্রহ্মাদি দেবের আছয়ে পতন ॥
অতএব বিনাশি ফল দেখি দেবগণে।
তবে তা সভার সেবা কিবা প্রয়োজনে॥
কৃষ্ণ সাক্ষাত সেবা অবিনাশি ফল।
পরমানন্দ নিত্য সুখ নিত্যানন্দ স্থল ॥

যথা শ্রীগীতা—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্প মেধসাং।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥

শ্রীধর স্বামীপাদানাং তত্রৈব।

যদ্যপি সর্ব্ব দেবতা মম এব অতস্ত-দারাধনমপি বস্তুত মম আরাধনং তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাং তেষাঞ্চ ফল-বৈষম্যং ভবতীত্যাহ। অন্তঃবত্বিতি অল্পমেধসাং ময়া দত্তমপি তৎফলং অন্তবৎ বিনাশি ভবতি তদেবাহ দেবানিতি দেবযজস্তে দেবান্ যান্তি অস্তমতো যান্তি মদ্ভক্তাণাং অনাদ্যন্ত পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি॥ ইতি

কৃষ্ণ দাসের এই কহিল প্রস্তুতি।
সর্ব্বত্যাগ করি কর গোবিন্দ ভকতি ॥
তাবৎ কর্ম্ম করে কর্ম্ম নাহি করে ত্যাগ।
যদবধি কৃষ্ণ নামে নহে অনুরাগ ॥
কৃষ্ণ কথা শ্রবণাদৌ যবে হয়ে মতি।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ হয় কহিল যুগতি ॥

শ্রীভাগবতে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং যথা—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত
ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা
শ্রদ্ধা যাবৎ ন জায়তে ॥ ইতি

বিধি অবিধি করি শাস্ত্র মত যত।
সেবা নিষ্ঠজন যেবা শ্রীকৃষ্ণ ভকত ॥
সকল করয়ে ত্যাগ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি।
কায়মনে কৃষ্ণ সেবা যার নিরবধি ॥
সেই ত উত্তম ভক্ত কহে ভগবান।
একাদশে ভাগবতে তাহার প্রমাণ ॥

যথা—

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্
ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্
মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥

এবং শ্রীভগবদ্গীতায়াং

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যোঃ
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ইতি

ধর্ম্মত্যাগ করিলে কহ বিকর্ম্মজানি হয়।
বিকর্ম্মেতে হয়ে জানি পাপাদি সঞ্চয় ॥
হেন চিন্তা না করিহ কৃষ্ণ ভক্তগণ।
কায়মনে যেবা করে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তন ॥
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রবেশ করিঞা।
বিকর্ম্ম তাহার খণ্ডে সদয় হইয়া ॥

একাদশে যথা—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ইতি

ভক্তি অঙ্গ অকরণে হয়ে প্রত্যবায়ি।
এই কথা ভক্তি শাস্ত্রে করিলেন স্থায়ী॥
কর্ম্মাঙ্গ না করিলে ভক্ত দুষ্ট নয়।
ভক্তি ফলে ভক্তের সকল সুভ হয়॥
যথা—

অননুষ্ঠানতো দোষো
ভক্ত্যঙ্গানাং প্রজায়তে।
ন কর্ম্মনামকরণা
দেষ ভক্ত্যধিকারীণাং॥ ইতি

শ্রীগোবিন্দপদদ্বন্দ্বং প্রণম্য শিরসা গুরুং।
বৈষ্ণবান্ ভগবৎপ্রেষ্ঠান্ নত্বা চ লিখিতং ময়া॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।
অভিরাম সুন্দরানন্দ মহান্তগণ আর্য্য॥
শ্রীপর্ণিগোপাল প্রভু গোপাল চরণ।
কাতর দেখিয়া দিহ চরণে শরণ॥
কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব শ্রবণ উল্লাস।
কাতরে বন্দিলা শ্রীনয়নানন্দ দাস॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-রসকদম্বে তৃতীয় প্রকরণং॥

চতুর্থ প্রকরণ।

শ্রীকৃষ্ণং শরণং মমাস্তু।

কৈশোরং জলদপ্রভং শশিমুখং শ্যামং জগন্মঙ্গলং।
শ্রীবংশীবদনং সুরারিদলনং গোগোপ বালৈর্বৃতং।
বন্দ্যং নারদ সিদ্ধ কিন্নরগনৈঃ স্তুত্যং মহেন্দ্রাদিভি—
বৃন্দারণ্যবিহারিনং ভজ মনো গোবর্দ্ধনোদ্ধারিণং॥

জয় কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় জয়।
জয় রাম নিত্যানন্দ ভক্তি রসময়॥
সগণ সহিতে জয় শ্রীসুন্দরানন্দ।
শ্রীদাম সুদাম জয় সখাগণ বৃন্দ॥
সকলের সার ভক্তি ভক্তি সর্ব্বোত্তম।
ভাগবতে ভক্তি পরম ধর্ম্ম কন॥
অকৈতব পরম ধর্ম্ম কহে ভাগবতে।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্রপরমো- নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষু- ভিস্তৎক্ষণাৎ। ইতি

অত্র শ্রীভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। ধর্ম্মঃ কিংবিশিষ্টঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ। প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ কিন্তু কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মঃ। অধিকারিতোঽপি ধর্ম্মস্য পরমত্বমাহ নির্ম্মৎসরাণাং। পরোৎকর্ষাসহনং মৎ-সরস্তদ্রহিতানাং সতাং। এবং কর্ম্ম-কাণ্ড বিষয়েভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বং আহ বেদ্য-মিতি। বাস্তবং পরমার্থভূতং নতু বৈশেষিকানামিব দ্রব্যগুণাদিরূপং বেদ্যং অযত্নেনৈব জ্ঞাতুং শক্যং অবরুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে। শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছুভিঃ। তৎক্ষণাৎ সদ্য এব। ইতি যদুক্তং সা ভক্তিরেব।

যথা তত্র ভাগবতে।
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃস্মৃতঃ।
ভক্তিযোগোভগবতি তন্নামশ্রবণাদিভিঃ॥
অপি চ তত্রৈব—
স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো
যতো ভক্তি রধোক্ষজে।
অহৈতুক্যব্যবহিতা
যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ ইতি
জ্ঞান সাংখ্যযোগ কর্ম্ম সন্ন্যাসাদি মত।
কর্ম্ম আদি চতুর্ব্বর্ণ ধর্ম্ম আছে যত॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম সার এই ভক্তিযোগ হন।
পরম ধর্ম্ম ভাগবতে কৈল নিরূপণ॥
তাহে ভক্তি হয়ে জানি ত্রিবিধ লক্ষণা।
সাধন ভক্তি ভাবভক্তি আর ভক্তি প্রেমা॥
ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের বর্ণন।
তাহাতে পরিপাটি গোস্বামীর বচন॥
সেই সিন্ধু লহরী পরশিতে কণা।
সাধু কৃপা অবলেসে হঞাছে বাসনা॥
শতকোটি প্রণতি সহস্র নিবেদন।
ভাষা বর্ণনের দোষ না করা গ্রহণ॥
শ্রীরূপের চরণ স্মরণ করি মনে।
ভাব ভক্তি আদি লেখা ত্রিবিধ লক্ষণ॥
যথা—
স ভক্তি সাধনং ভাব প্রেমাচেতি ত্রিধোদিতা॥ ইতি—
সাধন ভক্তি ভাব ভক্তি প্রেম ভক্তি শ্চ। ইতি—
ত্রিধা উক্তা। তত্র সাধন ভক্তি॥

ভক্তি হয় তাহে সাধন সাধ্য রূপা নাম।
ভঙ্গি ক্রমে গোসাঞি কহেন অভিধান
ইন্দ্রিয় প্রেরণা ক্রমে দেহে সাধি জাকে
সাধ্যভাব সাধনভক্তি বলি কহি তাকে।
সাধনভক্তি কৃতিসাধ্যা কহিলা লক্ষণ।
দেহেন্দ্রিয়ে সাধি যাকে সে কৃতিসাধন।
কৃতিসাধ্যা বলি সবে ভক্তিতে কহিল।
তখন ভক্তের চিত্তে সন্দেহ উপজিল॥
ইন্দ্রিয় সাধন জন্য যদি ভক্তি হন।
ভক্তিতে করায় দেহে ভাবের উদগম॥
ভাবসাধ্য প্রেমবস্তু সেহ কৃতি হয়।
প্রেম নিত্য সিদ্ধ ইথে সন্দেহ উপজয়॥
তাহাতে সিদ্ধান্ত সুন প্রভুর বচন।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য সন্দেহ ভঞ্জন॥
ভাব সাধ্য নহে নিত্য সিদ্ধ ভাব হয়।
অনুভাব দ্বারে জ্ঞান বিক্রিয়াদি ময়॥
যথা—
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥ ইতি।
কৃষ্ণ সম্বন্ধী ক্রিয়া তারে ভক্তিকয়
সামান্য ভক্তি হৈলে হয় মহা ভক্ত্যুদয়॥
যথা পঞ্চরাত্রে
সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
শৈব ভক্তি পরা প্রোক্তা তয়া ভক্তি পরা ভবেৎ॥ ইতি।
পরম ভক্তির সূত্র করহ শ্রবণ।
সর্ব্বোপাধি রহিত হৈঞা কৃষ্ণনিষ্ঠ মন॥
সর্ব্বোপাধি রহিত অন্য অভিলাষ শূন্য
নাহি অভিলাষ মুক্তি স্বর্গাদিক জন্য॥

শ্রীশ্রীকুন্তীদেবীর স্তব। (৫)

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥

বসুদেব দেবকী বা নন্দগোপ সনে।
গণনীয়া নহি আমি, জানি তাহা মনে॥
আমার সাধনা নাই, সত্য এই কথা।
তোমার করুণা কিন্তু তথাপি সর্ব্বথা ॥

আমার এ নেত্রদ্বয়, সুশীতল সুখময়,
করিতে এসেছ তুমি দিব্যমূর্ত্তি ধরি
আর করুণা তব বর্ণিতে না পারি।

তোমার ও নাভি-সর, পদ্ম-সম মনোহর,
কমলের দিব্যমালা গলদেশে দোলে,
পদ্মনেত্র! নমি তব চরণ কমলে।
নাভিতে গলেতে নেত্রে চরণে কমল,
জীবে দেখা দিতে তব করুণা কেবল।

জলমাঝে জনমিয়ে, জলরাশি ছাড়াইয়ে
বিশদ শোভায় পদ্ম শোভয়ে যেমন,
শুদ্ধসত্ত্ব, প্রকৃতিতে বিরাজে তেমন।
প্রকৃতির শুদ্ধসত্ত্বসম রূপ তব
তাই জীবে ঘটে তব দর্শন সম্ভব।
প্রত্যক্ষের অত্যুৎকৃষ্ট শুদ্ধ অংশ যাহা,
আত্ম প্রকাশের তরে লহ তুমি তাহা,

জীব তোমা পেয়ে, যায় ভব উত্তরিয়ে,
এমনি করুণা তব হে আনন্দময়,
তোমারি কৃপায় তব পদ লাভ হয় ॥

যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী
কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা।
বিমোচিতাহহঞ্চ সহাত্মজা বিভো
ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্গণাৎ॥

তুমি হৃষীকেশ হবি ইন্দ্রিযের স্বামী
আমার হৃদয় কথা সবি জান তুমি।
আপনাব পানে চাই, তখন দেখিতে পাই
আমাব নাহিক নাথ, কিছুই সাধন,
দেবকীর সহ মোর না হয় গণন।
কিন্তু তব কৃপা প্রতি, চাহি যবে বিশ্বপতি
সে সময এই সত্য অনুভব করি,
অধিক তোমার কৃপা আমাব উপবি।
দেবকী তো কাবাগারে, ছিলা [illegible]
একবার তুমি তারে করিলা মোচন,
বক্ষা হয় নাই কিন্তু তাঁব পুত্রগণ॥
কিন্তু তুমি বারে বারে, রক্ষা [illegible]
অক্ষত শবীরে আছে মোব পুত্রগণ
আমাতে অধিক দয়া করি নিরীক্ষণ॥
অহেতুকী কৃপা তব, যে যত অধম।
তত বেশী কৃপা তারে কব ববিষণ॥

কালিয়। (২)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিতৃসকাশে বাত্রি যাপন পূর্ব্বক অতি প্রত্যূষে গরুড় পিতৃচরণে পুবঃসব দুই চারিটী লম্ফ প্রদান করিয়া গগনমার্গে উ[illegible] হইলেন। প্রবমান তীরভূমি-সংলগ্ন ক্ষুদ্র তরণী হইতে মনুষ্য, উ[illegible]নে হইলে তবী যেরূপ সঘন কম্পিত হইতে থাকে গরুড় পৃথা[illegible] লম্ফ প্রদান করিলেও বসুমতী তদ্রূপ সঘন কম্পিত [illegible]

বিস্তৃত পক্ষ-তাড়নায় ও নিশ্বাসপবনে ঘূর্ণ্যমান বায়ু প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষাদি উৎপাটিত করিল। প্রলয়কালীন ঝঞ্ঝাবাতশব্দতুল্য তাঁহার পক্ষশব্দ শ্রবণ করিয়া মরামর জীব প্রমাদ গণিল। মুহূর্ত্তমধ্যে গরুড় কশ্যপকথিত সরোবরের উর্দ্ধভাগে উপনীত হইলেন। সঞ্চান যেরূপ গগনোর্দ্ধভাগে উড্ডীন হইয়া শিকারানুসন্ধান করে গরুড়ও তদ্রূপ সেই সরোবরের উপরিভাগে গজকচ্ছপের অন্বেষণে ইতস্ততঃ মণ্ডলাকারে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তাঁহার সুবিস্তীর্ণ পক্ষ সঞ্চালনে দূরশঙ্খধ্বনিবৎ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে আদিত্যদেব পূর্ব্বাকাশে সুবর্ণময় কিরণ বিস্তার করিলে বোধ হইল যেন নীলাকাশে প্রকাণ্ড একখণ্ড মেঘোদয় হইয়াছে। দিনমনির প্রফুল্ল কিরণ প্রথমেই গিরিচূড়াসমূহ কাঞ্চন মণ্ডিতের ন্যায় প্রতিপন্ন করিল, পরে বৃক্ষাগ্রভাগ যেন দ্রবকাঞ্চনে ধৌত করিয়া অখিল জগতে পরিব্যাপ্ত হইল। উষাসমাগমে পক্ষিগণ কুলায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আহার অন্বেষণার্থে বহির্গত হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হইলে প্রকাণ্ড-দেহ গরুড় সকাশে তাহারা গগনমার্গে ভাসমান ধূলিকণা বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা সেই সরোবরের তীরস্থ নিবিড় বনভূমির মধ্য হইতে বৃংহিতধ্বনি করতঃ মদোন্মত্ত প্রকাণ্ডদেহ এক গজবর বহির্গত হইল। তখন বোধ হইল যেন ঊর্দ্ধে প্রসারিত মেঘজাল হইতে গরুড় পক্ষাঘাতে একখণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া ঘোরনাদে ধরাতলে পতিত হইয়াছে। গজবর সপ্তধা মদস্রাব করিতে করিতে মহাবেগে তীরভূমি পরিক্রমণ করিতেছে। তদীয় পদতাড়নায় পৃথিবী ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। সরোবরের সুবিস্তীর্ণ জলরাশি আলোড়িত হইয়া বীচিমালা সহকারে উভয় তীরে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, যেন তাহা গজদন্তে ভীত হইয়া তাহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনাভিলাষে অগ্রসর হইতেছে। সহসা এই আন্দোলনের কারণ বুঝিতে না পারিয়াই যেন মৎস্যগণ জলাশ্রয় পরিত্যাগ কামনায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শূন্যমার্গে উত্থিত হইতেছে, কিন্তু তীরভূমিতে ঘোরাকৃতি গজবরকে লক্ষ্য করিয়াই পুনরায় জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। এমন সময়ে সেই আন্দোলিত জলরাশি স্তম্ভিত ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া—যোজন-ব্যাপী চক্রাকার-দেহ এক কূর্ম্ম সরোবর মধ্যভাগে দর্শন দিল। গজবর দর্শনে ক্রোধান্মত্ত কূর্ম্ম মহাবেগে তদভিমুখে ধাবিত হইল। কূর্ম্ম তীরভূমি প্রাপ্ত হইলে তদ্বেগচালিত জলরাশি সহস্রধা বিভক্ত হইয়া তীরে উৎপতিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন কূর্ম্ম সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে গজবরকে আক্রমণোদ্যত

হইয়াছে। অনন্তর উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কূর্ম্ম, গজবরের পদদংশন পূর্ব্বক মৃত্তিকাক্রমণ করিয়া রহিল। গজবর, শুণ্ডদ্বারা তাহাকে উৎখাত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

পক্ষীন্দ্র তদবস্থ গজকূর্ম্মকে নিরীক্ষণ করিয়া দুই চারিবার গগনমার্গে পরিক্রমণ পূর্ব্বক সবেগে গজকূর্ম্মোপরি নিপতিত হইলেন, মহাবেগে বায়ুস্তর-ভেদ জন্য অশনিপাতশব্দ উত্থিত হইল। বিনামেঘে বজ্রাঘাত অতীব বিস্ময়ের বিষয় ভাবিয়া জীব সমুদায় যে যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। মহাবীর গরুড় একহস্তে গজ ও অপর হস্ত দ্বারা কূর্ম্মকে ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় শূন্য মার্গে উৎপতিত হইলেন। কোথায় স্থাপন করিয়া ভক্ষণ করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া পক্ষিরাজ আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখা সম্পন্ন রৌহিন বৃক্ষ খগরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল মহাত্মন্! আপনি কি নিমিত্ত এতাদৃশ আয়াস পাইতেছেন? দেখুন, মদীয় অভ্রংলিহ শীর্ষদেশ সমুন্নত রহিয়াছে। যোজন-ব্যাপিনী মদীয় শাখাপ্রশাখা অসংখ্য পক্ষিগণের আশ্রয়স্থান। আপনি অনায়াসে মদীয় শাখার উপর উপবেশন পূর্ব্বক গজকূর্ম্ম ভক্ষণ করুন। মহীরুহের বাক্যে আশ্বস্ত গরুড় গজকূর্ম্ম সহ তদীয় শাখায় উপবেশন মাত্র মহাশব্দে উহা ভগ্ন হইয়া গেল। পক্ষিরাজ নিমেষ মধ্যে দেখিতে পাইলেন ষাটি সহস্র অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণদীর্ঘকলেবর বালখিল্য মুনিগণ সেই শাখাগ্রভাগ অবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে তপস্যা নিরত আছেন। শাখাখণ্ড ভূপতিত হইলে ইহাদের অনিষ্ট সম্ভাবনা, এজন্য ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত ভয়ে ভীত গরুড় তৎক্ষণাৎ সেই প্রকাণ্ড ভগ্ন শাখাখণ্ড মুখে ধারণ পূর্ব্বক উড্ডীয়মান হইলেন। মহামুনি কশ্যপ তদবস্থ তনয়কে দর্শন করিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনায় বালখিল্যগণের আরাধনায় সংযতচিত্ত হইলেন! কশ্যপের স্তবে তুষ্ট ঋষিগণ হিমগিরিশিরে অবতরণ কামনা প্রকাশ করিলে কশ্যপাদেশে পক্ষীন্দ্র তাঁহাদিগকে হিমগিরি-শিরে নামাইয়া দিলেন। অনন্তর বাসহীন গিরি প্রাপ্ত হইয়া গরুড় তথায় শাখাখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন ও সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে অধিষ্ঠিত হইয়া মহাহ্লাদে উদর পূর্ণ করিয়া গজকূর্ম্ম ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর মহাবল অমিততেজ পক্ষীন্দ্র গরুড় পক্ষতাড়নায় পর্ব্বত সকলকে উৎক্ষিপ্ত করতঃ উড্ডীয়মান হইলে যোজনব্যাপীপক্ষ বিস্তারে দিনমনি কিরণ রুদ্ধ হওয়ায় ভূতল ঘনান্ধকারাবৃত হইল। তাঁহার অশনিনিনাদবৎ হুহুকার শব্দে ইন্দ্রপুরী

প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। ঘন ঘন উল্কাপাত, ঘূর্ণ্যমান বায়ু হইতে অগ্নিবর্ষণ প্রভৃতি বিবিধ উৎপাত উপলক্ষিত হইতে গাগিল।

ঘোর অমঙ্গল দর্শনে ভয়ব্যাকুলহৃদয় দেবরাজ তখন সুরগুরু বৃহস্পতিকে কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি কহিলেন "দেবেন্দ্র! আপনার বোধ হয় স্মরণ নাই একদা কশ্যপ-যজ্ঞগমনোন্মুখ পলাশ-পত্রধারী বালখিল্যগণ পথিমধ্যে গোক্ষুর চিহ্ন অতিক্রমবিমুখ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, আপনি পর্ব্বত প্রমাণ কাষ্ঠভার যজ্ঞস্থানে ধারণ করতঃ প্রত্যাগমনকালে তদবস্থ মুনিগণকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক পরিহাসব্যঞ্জক হাস্য করিয়াছিলেন। দীর্ঘকায় বলদৃপ্ত ভবাদৃশজনের পরিহাসে ক্ষুব্ধহৃদয় মুনিগণ দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃজন কামনায় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। শরণাগত আপনার রক্ষাসাধনার্থ ভগবান কশ্যপ বালখিল্যগণ সমক্ষে উপনীত হইয়া তাঁহাদের যজ্ঞ প্রভাবে ত্রিভুবনবিজয়ী এক পক্ষীন্দ্রের উৎপত্তি হইবে এইরূপ আশ্বাসদান করিয়া সেই সঙ্কল্পিত মহাযজ্ঞ হইতে তাঁহাদিগকে বিরত করেন। সেই বিপুলকীর্ত্তি ঘোররাবী বিনতানন্দন গরুড় এক্ষণে অমৃত গ্রহণ প্রয়াসে সুরপুরী আগমন করিতেছেন। তাঁহারই ক্ষমতা প্রভাবে তারকারাজি স্বস্থানচ্যুত হইয়া নিপতিত হইতেছে, উল্কাপাত অগ্নিবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি প্রভৃতি ঘোর অমঙ্গল উপলক্ষিত হইতেছে। তিনি অনায়াসে অমৃতগ্রহণ করিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। সেই বালখিল্য প্রভাবোৎপন্ন কশ্যপাত্মজকে রণে পরাজিত করিতে পারে এমন বীরপুরুষ ত্রিভুবনে কেহও নাই।"

সুরগুরু বৃহস্পিতিবাক্যে ভ্রূকুটি কুটিলানন দেবরাজ দেবসৈন্যগণকে সমরে সজ্জিত হইবার আদেশ দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মাতার দাসীত্ব মোচন।

ধূলিপটলে গগনমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়া ও প্রলয়কালে দেবাদিদেবের মুখমারুত-পূর্ণ বিষাণশব্দবৎ ধ্বনি করিতে করিতে বৈনতেয় গরুড় সুরপুরে আগমন করিবামাত্র দেব-অনীকিনী তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নালীক নারাচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ প্রহরণ-সমূহ তৎপ্রতি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কামরূপী ধীরপ্রকৃতি বিনতানন্দন দেবপ্রহরণে অনুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহাদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। "অবোধ

ও উদ্‌ভ্রান্ত দৈবগণ সুরাসুরবিজয়ী মৎপ্রতি অস্ত্রনিক্ষেপনে আয়াসপ্রাপ্ত হইতেছেন; আমি ইচ্ছা করিলে চক্ষুর নিমিষে সকলকে সংজ্ঞাশূন্য করিতে পারি, কিন্তু বিবাদে আমার প্রয়োজন নাই, স্বকার্য্য সাধনাই আমার উদ্দেশ্য।" এই ভাবিয়া বিনতা-তনয় পক্ষপুট সঞ্চালনে প্রবল বাত্যা উত্থাপিত করিলেন। ধূলারাশিতে সুরপুরী সমাচ্ছন্ন হইল। দেবদৃষ্টিরোধকারী ধূলিজাল নিবন্ধন সমর-পরাঙ্মুখ দেবরাজ পবনদেবকে রজঃ নিরাকরণের আদেশ দিলেন। পবন দেব ধূলিপটল নিঃসারিত করিলে পুনরায় অস্ত্রবর্ষণ আরম্ভ হইল। পুনঃ পুনঃ সন্তাড়িত গরুড় ভীষণ নখরাঘাতে ও পক্ষপুটপ্রহারে দেবগণকে জর্জ্জরিত করিয়া পক্ষসঞ্চালনে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তথাপি অক্লান্তদেহ অমর দেবগণকে অবিরত দেখিয়া কামরূপী বিহঙ্গম ক্রোধভরে জ্বলন্ত অনল-সদৃশ হইলেন। যোজনবিস্তার দীপ্যমান প্রচণ্ড অগ্নিজ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া দেবগণ পলায়নপর হইলেন। তখন পক্ষিরাজ অবসর বুঝিয়া সুধান্বেষণ করিতে করিতে নিমেষমধ্যে চন্দ্রলোকে উত্তীর্ণ হইলেন। দেব সুধানিধির সন্নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি অবলোকন করিলেন প্রজ্বলিত হুতাশন তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। দর্শন মাত্রেই প্রত্যুৎপন্নমতি বিহঙ্গমরাজ সুবর্ণদেহ ধারণ করতঃ প্রজ্বলিত হুতাশন উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর ঘূর্ণ্যমান তীক্ষ্ণধার সুদর্শনচক্রনিম্নে পীযূষভাণ্ড অবলোকন করিয়া খগরাজ চিন্তা করিলেন 'ক্ষুরধার এই চক্রসমক্ষে পতিত মক্ষিকাও শতধা খণ্ডিত হয়, কি কৌশলে আমি এই চক্র অতিক্রম করিয়া পীযূষ গ্রহণ করিব?" চক্রমধ্যে সূচিপ্রমাণ ছিদ্র অবলোকন করিয়া কামরূপী গরুড় সূক্ষ্মরূপ ধারণ করতঃ চক্রচ্ছিদ্র পথে গমন করিলেন এবং স্বীয়পক্ষপুটে সুধাভাণ্ড গ্রহণানন্তর চক্রাগ্নি অতিক্রম করিয়া পুনরায় স্বরূপ অবলম্বন করিলেন। এমন সময়ে সুধাহরণ-সঞ্জাতকোপ দেব চক্রপাণি তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর উভয়ে তুমুল সংগ্রাম হইল। বিনতানন্দন খগেশ্বরের অপরিসীম বিক্রমে পরিতুষ্ট দেব নারায়ণ, খগরাজকে বরদানের অভিলাষ প্রকাশ করিলে খগপতি অজর অমর ও সুরাসুরবিজয়ী হইবার এবং ভগবান অপেক্ষাও উচ্চতরআসন প্রাপ্তির বরপ্রার্থনা করিলেন। গদাধর তাঁহাকে অভিলষিত বরদানে সন্তুষ্ট করিলে স্বয়ং গরুড় ভগবানকে বরপ্রদানাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিবার অনুনয় করিলেন। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দেব নারায়ণ গরুড় কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া বরপ্রার্থনা করিলেন "অদ্য হইতে তুমি আমার বাহন হও।" কশ্যপাত্মজ

"তথাস্তু" বলিয়া কহিলেন "আমি ত আপনার বাহন হইলাম, কিন্তু ত্বৎপ্রদত্ত বরের সার্থকতা কোথায় রহিল ?" নারায়ণ কহিলেন "তুমি সর্ব্বদাই আমার রথচূড়ে অবস্থান করিয়া আমাপেক্ষাও উচ্চতরআসনে বিরাজ করিবে।"

অনন্তর গরুড় প্রফুল্লচিত্তে গমনোন্মুখ হইলে দেবরাজ তাঁহাকে পুনঃ আক্রমণ করিলেন। গরুড় পূর্ব্ববৎ চঞ্চুপুট ও নখরাঘাতে তাঁহাদিগকে জর্জ্জরিত করিলেন। তখন অমররাজ অতীব ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া পক্ষীন্দ্রের প্রতি অশনি নিক্ষেপ করিলেন। বৃত্রবিজয়ী অমররাজ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ ব্রাহ্মণাস্থিবিনির্ম্মিত সেই বজ্রাস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া গরুড় ঈষৎ চিন্তান্বিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি দেবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "দেবেন্দ্র! মৎপ্রতি তুমি তোমার তীক্ষ্ণতম প্রহরণ নিক্ষেপ করিয়াছ। এতদতিরিক্ত অমোঘাস্ত্র আর তোমার নাই। তোমার বজ্রকেও আমি নিজশক্তিবলে বিমুখ করিতে পারিতাম। কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্মানার্থে আমি তাহা করিব না।" গরুড় দেবরাজসন্নিধানে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে দম্ভসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেছিলেন ইত্যবসরে বজ্র দিগন্তব্যাপিনী জ্বালা বিস্তারপূর্ব্বক পতনোন্মুখ হইতেছে দেখিয়া গরুড় নিজপক্ষ হইতে চঞ্চুদ্বারা একটী পালক গ্রহণ পূর্ব্বক তৎসম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। বজ্র তাহাকেই ভস্মীভূত করিয়া দেবরাজ সন্নিধানে প্রত্যাবৃত্ত হইল, পক্ষীন্দ্রও দেবরাজকে পরাভূত করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "হে মহাত্মন্! তোমার শৌর্য্যবীর্য্য ও ক্ষমাগুণ অবলোকন করিয়া আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইবার অভিলাষী হইয়াছি।" গরুড় সম্মত হইলে দেবরাজ বলিলেন "মিত্র! তোমার এই গগনস্পর্শী দেহায়তনের পরাক্রম অবগত করাইয়া আমাকে চরিতার্থ কর।" মহাবীর সুপর্ণ তখন হাস্য-প্রকটিতবদনে কহিলেন "স্বীয় পরাক্রম স্বমুখে বর্ণন করিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়, তথাপি সখাবাক্যের উত্তরপ্রদানে উহা তাদৃশ দোষাবহ নহে। সখে! বাসুকীসহ সসাগরা ধরণী একপক্ষে ও তোমার সহিত তোমার অমরপুরী অপর পক্ষে ধারণ করতঃ সহস্র বৎসর গগনমার্গে বিচরণ করিলেও আমি শ্রমানুভব করি না।"

গরুড়বাক্য শ্রবণে স্তম্ভিত দেবরাজ অনন্তর বিনয়মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন "সখে সুপর্ণ! তুমি স্বয়ং নারায়ণবরে অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছ, অতএব সুধায় তোমার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। তুমি

সুধাভাণ্ড দেবগণ জন্য রক্ষা করিয়া যাও।" গরুড় দেবরাজের অনুনয়পূর্ণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন "মাতার দাসীত্ব মোচনার্থে বিমাতা কদ্রুর আদেশে আমি সুধা লইয়া গমন করিতেছি।" তখন দেবরাজ পুনরায় কহিলেন "সখে সুপর্ণ! তুমি বিজ্ঞতম, তোমার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। সর্পগণ অতীব হিংস্রক, তাহাদিগের হলাহলতেজে মরামর জীব প্রপীড়িত হইতেছে, ইহার উপর পীযুষ পানে অমরত্ব লাভ করিলে ধরিত্রী অচিরেই জন শূন্য হইয়া পড়িবে।" সুপর্ণ দেবরাজের বাক্য-শ্রবণে কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিয়া কহিলেন "আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ পাপে লিপ্ত হইতে পারি না। মৎকর্ত্তৃক অর্পিত সুধা তুমি নাগগণের নিকট হইতে হরণ করিও।" দেবরাজ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ সুপর্ণকে বরদানের অভিলাষ প্রকাশ করিলে গরুড় "সর্পগণ আমার ভক্ষ্য হউক," এই বর প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহাপ্রভাবসম্পন্ন গরুড় কদ্রু-সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত অমৃতদানে মাতার দাসীত্ব মোচন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সময় নির্দ্দেশ।

খগোত্তম গরুড় কদ্রুসন্নিধানে অমৃত আনয়ন করিলে অমৃতভাণ্ডস্থাপনার্থে তিনি কুশাসন পাতিয়া দিলেন, তখন গরুড় তদুপরি অমৃতভাণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। মহাহ্লাদে কদ্রু অমৃত পান করাইবার জন্য তনয়গণকে আহ্বান করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবরাজ ব্রাহ্মণ বেশে কদ্রু সমীপে উপনীত হইয়া অস্নাত অমৃতপান নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণবাক্যে কৃতবিশ্বাস কদ্রু অনন্তর নাগগণ সহ স্নানার্থে গমন করিলে দেবরাজ অমৃতভাণ্ড অপহরণ পূর্ব্বক সুরপুরে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর নাগগণ স্নানান্তে গৃহপ্রবিষ্ট হইয়াই পীযুষভাণ্ড অপহৃত দেখিয়াই বহুবিলাপ করত কুশাসন লেহন করিতে লাগিল। তীক্ষ্ণধার কুশাগ্রে তাহাদের জিহ্বা চিরিয়া গেল। তদবধি সর্পগণ চীর্ণজিহ্ব হইল।

এইরূপে মাতার দাসীত্ব মোচন করিয়া গরুড় পরমানন্দে কালাতিপাত করিতেছেন। সর্পগণ পূর্ব্বের আসক্তিবশতঃ কেহ বা তাঁহার অঙ্গবাহিয়া উঠে, কেহ তাঁহার সম্মুখে অকুতোভয়ে ক্রীড়ারত হয়। নাগগণের ঈদৃশ ব্যবহার গরুড়ের এক্ষণে প্রীতিপ্রদ হইল না। তিনি সুবিধামত কাহাকেও উদরস্থ করেন কাহাকেও বা পক্ষতাড়নায় দূরে নিক্ষেপ করেন। এদিকে আবার

গরুড় কর্ত্তৃক স্বপুত্র নিধন কদ্রুর অসহ্য হইয়া উঠিল। গরুড়কে নাগভক্ষণ-তৎপর অবলোকন করিলেই তিনি হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিয়া উঠেন।

একদা পন্নগগণ একস্থানে ক্রীড়া করিতেছে দর্শন করিয়া ক্ষুধার্ত্ত গরুড় তন্মধ্যে নিপতিত হইয়া, কপোতকগণ মধ্যে মুষ্টিপরিমাণ-প্রক্ষিপ্ত ধান্যবৎ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার সহসা কদ্রুর নয়নপথে পতিত হইলে তিনি হাহাকার রবে ক্রন্দন করিতে করিতে গরুড়কে নিবারিত করিলেন।

গরুড় আর এখন দাসীপুত্র নহেন। দেবরাজ প্রসাদে সর্পগণ এক্ষণে তাঁহার ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সর্পভক্ষণে তাঁহাকে আর পাপপঙ্কে অনুলিপ্ত হইতে হইবে না, এজন্য তিনি বিমাতার ক্রন্দন ও নিষেধ বাক্য শ্রবণে কহিলেন "মাতঃ! আমিই একদিবস দাসভাবে উহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলাম, ইহাদিগকে কত যত্নে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া বহন করিয়া বেড়াইয়াছি। ইহাদিগের উপর কি আমার স্নেহ নাই? যেগুলি জীর্ণ শীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হইয়াছে তাহারা অচিরেই কালকবলে কবলিত হইবে, তদপেক্ষা আমি ভক্ষণ করিলে আমারও কিয়ৎপরিমাণে জঠরানল তৃপ্তি হইবে এবং এই অচিরপ্রস্থানোন্মুখ অল্পজীবী সর্পগণও মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে।"

সপত্নীতনয়ের ঈদৃশ স্পর্দ্ধাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া কদ্রু মর্ম্মপীড়িতা হইলেন। গরুড়ের অত্যাচার তাঁহার অসহনীয় হইল, এ জন্য তিনি বাসুকী প্রভৃতি পুণ্যাত্মা তনয়গণকে স্মরণ করিয়া রোদন আরম্ভ করিলেন। মাতার ক্রন্দনে বাসুকী, শেষ প্রভৃতি জিতেন্দ্রিয়, অহিংসক, কর্ত্তব্যনিরত ও পুণ্যবান সর্পগণ জননীসকাশে উপনীত হইলেন। মাতার দুঃখের কারণ অবগত হইয়া তাঁহারা ক্ষুব্ধচিত্তে কহিলেন মাতঃ! আমরা ইহাতে কি করিব এবং কি করিতেই বা পারি? আপনার অভিসম্পাতে অভিশপ্ত হইয়া আমরা রক্ষাপ্রাপ্তি আশায় উহাদিগকে খলপ্রকৃতি দুষ্টমতি হিংস্রস্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয় ও পুণ্যবান হইবার পরামর্শ দিয়াছিলাম, আমাদের সদুপদেশ অবহেলা পূর্ব্বক ক্রূরাত্মা পাপাচারী কালিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার তনয়গণের এই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। সুপর্ণ আমাদিগের ভ্রাতা, বিশেষতঃ তিনি পবিত্রাত্মা ও নির্ম্মলচরিত্র, তিনি কখনই বিনা অপরাধে আমাদিগের অনিষ্ট আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি অমিততেজা হইয়াও বিনয়াবনত; আপনার পাপমতি হিংস্র স্বভাব সন্তানগণ সেই বীরাগ্রগণ্য বিনতানন্দন গরুড়ের

হিংসায় উন্মত্ত। যে ব্যক্তি স্বীয় অসাধারণগুণে অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছে, সামান্য খলপ্রকৃতি নীচাশয় সর্পগণ তাহার কি অনিষ্টসাধন করিতে পারে? কালিয় অতিভীষণ দুষ্টাত্মা, তাহারই পরামর্শে আপনার পুত্রগণের এই দুর্দ্দশা, ইহা হইতে রক্ষা পাইলেও এতাদৃশ পাপজীবন যাপন করিয়া আপনার অভিসম্পাত, হইতে কখনই নিষ্কৃতি পাইবে না।”

অনন্তর সর্পক্ষয়নিবারণমানসে তাঁহারা মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া খগরাজকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সময় নির্দ্ধারণ করিলেন যে নাগগণ প্রতি মাসে নির্দ্দিষ্ট দিনে কোন নিয়মিত বৃক্ষমূলে গরুড়ের তৃপ্তিজনক উদরপূর্ণ নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তৎসহ একটী নাগ অর্পণ করিবেন। তাহা হইলে গরুড় আর সর্পগণের প্রতি অত্যাচার করিবেন না, সর্পগণও গরুড়ভয় নির্ম্মুক্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। এইরূপ সময় নির্দ্ধারিত হইলে বাসুকী, শেষ প্রভৃতি পুণ্যাত্মা সর্পগণ যথাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বলি প্রদান।

নাগগণ যথানিয়মে নির্দ্ধারিত বৃক্ষমূলে প্রতিমাসে নির্দ্দিষ্ট দিবসে গরুড়ের তৃপ্ত্যর্থে বলিপ্রদান করিতে লাগিল। গরুড়ও তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার নিবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বজন্মের দুস্কৃতিবশে কালিয় মদাতিশয্যবশতঃ এই নিয়ম প্রতিপালন বিমুখ হইলেন, অধিকন্তু তিনি বীর্য্যাতিশয় বশতঃ গরুড়ের সেই বলি নিষিদ্ধ হইয়াও ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেন।

একদা নির্দ্দিষ্টদিনে নিরূপিত বৃক্ষমূলে মহাবীর বিশুদ্ধাত্মা গরুড়ের জন্য বিবিধ ভোজ্যবস্তু সজ্জিত আছে, একটী সর্পও তাঁহার তৃপ্তির জন্য প্রেরিত হইয়াছে। এমন সময় দুর্ব্বৃত্ত কালিয় তথায় আগমন করিল। উপাদেয় ভোজন সামগ্রী অবলোকন পূর্ব্বক সে রসনার তৃপ্তিসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল, তদ্দৃষ্টে বলিপ্রদত্ত সর্প কহিল “মহাত্মন্! আত্ম ও সমগ্র সর্পকুলনিসূদন এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আপনার উচিত নহে। পুণ্যব্রত বাসুকী ও শেষ বিদ্যমানে যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার ব্যভিচার করিয়া অকারণে স্বীয় বিনাশপথ পরিস্কৃত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। জরামৃত্যু বিবর্জ্জিত বীরাগ্রগণ্য মহাত্মা গরুড়ের সহিত বিবাদ করিয়া আপনি জগতে অবস্থান

করিতে পারিবেন না, সুতরাং এতাদৃশ অনিষ্টকর বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বজাতীয় মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।" তচ্ছ্রবণে কোপসংরক্তনয়ন কালিয় উত্তর করিলে "যে ব্যক্তি অবিলম্বে গরুড়-জঠরে স্থানপ্রাপ্ত হইবে, তাহার আবার বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি ? গরুড়ের কি অসাধারণ কার্য্য দেখিয়া তাহাকে বীরাগ্রগণ্য নির্দ্দেশ করিতেছ ? আমাদের দংষ্ট্রায় যে বিষ আছে, একবার দংশন করিলে তোমার অগ্রণীর কি দশা হইবে বুঝিতে পারিতেছ না ? সে জ্ঞান যদি তোমার থাকিত তাহা হইলে গরুড়ের উদরপোষণার্থ তুমি কেন আসিবে ? গরুড় একমুখে একবার মাত্র দংশন করিবে, আমি শতমুখে তাহাকে দশেন করিয়া নিরস্ত করিব। গরুড়ের বীরত্ব আমার অবিদিত নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া বীরপুরুষ কি কখন অন্য বীরপুরুষকে ভয় করে ? এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কালিয় সেই সকল উপাদেয় রসনাতৃপ্তিকর আহারীয় দ্রব্যগুলি নির্ভীক হৃদয়ে উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর বজ্রনিনাদবৎ শব্দে পক্ষীন্দ্রের আগমন বুঝিতে পারিয়া সর্প কালিয়কে তখনও নিবৃত্ত হইতে কহিল। কালিয় তাহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, সে একাগ্রচিত্তে অবনত মস্তকে ভোজন করিতে লাগিল। গরুড় তথায় উপস্থিত হইলে কালিয় তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। সে যেমন ভোজন করিতেছিল তেমনি ভোজনে ব্যাপৃত রহিল। গরুড় তাহার ঈদৃশ ধৃষ্টতা অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধস্ফীতদেহে এক স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। কালিয়কে ভীত বা চকিত হইতে না দেখিয়া তিনি ক্রোধসূচক কর্কশ স্বরে কহিলেন 'রে দুরাত্মন্! তোর বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, নতুবা ত্রিভুবনবিজয়ী পক্ষীন্দ্রের ভোজ্যবস্তু আহার করিতে সাহসী হইয়াছিস্। সমগ্র নাগকুল আমার ভক্ষ্য; কেবল পুণ্যাত্মা ধার্ম্মিকপ্রবর শেষ ও বাসুকীর অনুরোধে আমি এই সামান্য ভোজ্যবস্তু প্রদানের অঙ্গীকারে তোদের অব্যাহতি দিয়াছিলাম। তুই এক্ষণে মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ধর্ম্মপথাবলম্বী শেষ ও বাসুকীর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া সময়ানুসারে প্রদত্ত এই সামান্য বস্তু আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্? একটি চঞ্চু আঘাত যাহার সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার এরূপ ধৃষ্টতা কেন ? মণ্ডুকের পদপ্রহার তোর যাদৃশ অপ্রীতিকর, তোর এই ধৃষ্টতা আমার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর অপ্রীতিকর।" তুই যখন স্বয়ং সময় ভঙ্গ করিয়া আমার খাদ্যবস্তু ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্, তখন তাহার প্রতিফল তুই ভোগ কর্', এই বলিয়া ক্রোধান্মত্ত গরুড় তাহার মস্তকে চঞ্চুপুট সজোরে আঘাত করিলেন।

বজ্রাঘাতে ব্যক্তি যেরূপ নিশ্চল হয়, কালিয় তদ্রূপ কিয়ৎক্ষণ দারুণপ্রহারে হত-জ্ঞান ও নিশ্চল থাকিয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন ও প্রহারককে সম্মুখে দেখিয়াই রোষপরতন্ত্র হইয়া জনার্দ্দনবাহন গরুড়কে দংশন করিলেন। শত শত সর্পবিষ যাহার জঠরাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইতেছে সর্পদংশনে তাহার কি হইবে? তিনি ব্যঙ্গ সূচক হাস্য করিয়া কহিলেন "রে কালিয়! তোর মত শত সহস্র সর্প দংশনে আমার একটী পক্ষও উৎপাটিত হইবে না। তোর যাহা ক্ষমতা তুই প্রকাশ করিয়াছিস্, এক্ষণে তুই আমার পক্ষ-বিক্রম একবার সহ্য কর্।" এই বলিয়া গরুড় বাম পক্ষপুট প্রহারে তাহাকে দশ যোজন পথ দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পতন জনিত আঘাতে কালিয় কিয়ৎকাল বিচেষ্টমান হইলেন, এমন সময়ে গরুড়কে অগ্রসর হইতে দর্শন করিয়া তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইল। গরুড়ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। দ্রুতবেগগামী কালিয় প্রাণভয়ে মৃত্তিকা উপরি সরলভাবে দৌড়িতে লাগিল। গরুড় বৈরনির্যাতন হেতু দীর্ঘবর্ত্তুল পদক্ষেপণ পূর্ব্বক তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বৈষ্ণব তত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

ব্রহ্ম—বৈষ্ণব শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলিতে বৃহৎ বস্তুকে বুঝায়। বৃহধাতু অর্থে বৃহৎ, বিস্তার, বিস্তৃত হওয়া। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, ক্রিয়াতে, কোন প্রকারেই যাহার বৃহত্ত্ব পরিমাণ করা যায় না, তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ঐশ্বর্য্য লক্ষণে ভূষিত হইলে তিনি ঈশ্বরবাচ্য। তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান। শ্রুতি, এইজন্য তাঁহাকে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন, সৃষ্ট পদার্থের লক্ষণ তাঁহাতে নাই। ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ শ্রীভগবান। ভগঅর্থে ঐশ্বর্য্য, ভগবান অর্থে ঐশ্বর্য্যযুক্ত। ষড়ৈশ্বর্য্য যথা ১ সমগ্র বা সম্পূর্ণতা, Lordship; ২ বীর্য্য Energy, ৩ যশ Fame, ৪ শ্রী, রূপ সমষ্টি Prosperity, ৫ জ্ঞান knowledge এবং ৬ বৈরাগ্য, নিঃসঙ্গত্ব or renunciation। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, কিছু থাকিতে পারে না। তিনি অনাদি ও অনন্ত। অনন্ত, অনাদি, নিত্য বস্তুর নামই ব্রহ্ম। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু।

এ জগৎ সমুদয়ই ব্রহ্ম, যেহেতু তাঁহা হইতে জন্ম, তাঁহাতে লীন এবং তাঁহাতে স্থিতি করে। তাঁহাতে লীন হয়, এবং আবার তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতে অবস্থিত থাকে। এই অনন্ত বিশ্ব তাঁহারই ব্যক্তাবস্থা মাত্র। আকাশ = অনন্তদেশ ও অনন্ত কাল। বিষ্ণু সেই অনন্তদেশে ও অনন্তকালে সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়রূপে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। যিনি নিজে অনন্ত, তাঁহার রূপও অনন্ত। মায়াবাদের সংক্ষেপতঃ মর্ম্ম এই যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম এক, সুতরাং সেব্য সেবক ভাব নাই, কারণ তিনিও যাহা, আমিও তাহা, মায়াবাদীরা ভগবৎমূর্ত্তিকে মায়িক মূর্ত্তি বলেন। শ্রীভগবান যেমন নিত্য, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিও তেমনই নিত্য। ইহা মায়িক হইতে পারে না, মায়িক বলিলে বিষ্ণু নিন্দা করা হয়, তাঁহাকে খাটো (খর্ব্ব) করা হয়। কিন্তু শ্রুতিতে "অনন্তরূপ, সহস্র মূর্ত্তয়ে" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির প্রমাণ করা হইয়াছে তিনি চলনশীল, গ্রহণশীল, দর্শনশীল ও শ্রবণশীল; তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার বলা যায় না? তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি ভৌতিক বা প্রাকৃতিক চক্ষু প্রভৃতির দৃশ্য নহে। অপ্রাকৃত দিব্য দৃষ্টিতে তিনি দর্শনীয় হন।

"বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরুপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
মূঢ়ে নিরাকার করি করয়ে ব্যাখ্যান॥"

সকলের নেত্র গোচর হয় না বলিয়া পরমতত্ত্ব কেবলমাত্র নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা এবং শ্রীমূর্ত্তির উপাসনা অস্বীকার করা অবিমৃষ্যতা মাত্র। পেচক সূর্য্য দেখিতে পায় না; ঐ মত অভক্তের নিকট আনন্দময় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত না হইলেও ভক্তগণের নিকট সেই শ্রীমূর্ত্তি কখন লুক্কায়িত থাকেন না, তিনি কৃপা করিয়া কখনও এই আনন্দমূর্ত্তি লোক লোচনের বিষয়ীভূত করেন, কখনও বা উহার সংগোপন করেন। যিনি উপাস্য, তিনি নিরাকার নহেন; নিরাকারের উপাসনা অসম্ভব, কেননা নিরাকারের আদৌ ধারণাই হইতে পারে না। শ্রীচরিতামৃতে যথা:—

"ভক্তি যোগে ভক্ত পায়, যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ, দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান যোগ মার্গে তাঁরে, ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মরূপে তারা করে অনুভব॥

উপাসনা ভেদে জানি, ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তার দিয়ে তো উপমা।"

মায়াবাদীরা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানকে বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার আনন্দময়ী শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে অসমর্থ। শ্রীমূর্ত্তি হইতেছে অপ্রাকৃত ও দিব্য; উহা সাধারণ দৃষ্টির অবিষয়ীভূত, সুতরাং সাধারণের পক্ষে নিষ্ফল; কিন্তু তাঁহার অনুগৃহীত ভক্তের পক্ষে সেই আনন্দ মূর্ত্তি শ্রীভগবান নিষ্ফল নহেন। জ্ঞানবাদীগণ ব্রহ্মসাধন করিতে নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া যাঁহার ভজনা করেন, ভক্তগণ ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধনায় তাঁহাকেই হস্তপদাদি সংযুক্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জানিয়া, তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্রীবিগ্রহ বিভু, অর্থাৎ সর্ব্ব-বৈভব যুক্ত। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি শক্তি ও শক্তিমানকে পৃথকভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হন না, কেবল চিন্মাত্র গ্রহণ করেন, মূলতত্ত্বে আর অগ্রসর হইতে পারেন না। জ্ঞানই এই শ্রেণী সাধকের একমাত্র অভিধেয়; জ্ঞানই ইহাদের সাধন। কিন্তু পূর্ণতম পরমতত্ত্বের স্বরূপভূতা ভক্তির সাধনায় যাঁহারা তাঁহার সন্দর্শনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের নিকট সেই পরাশক্তি সমূহের মূলাশ্রয় স্বরূপ সেই আনন্দঘন সেই ভগবন্মূর্ত্তি উদিত হয়েন। ভক্তের মহা সাধনাতেই আনন্দঘন শ্রীভগবানের প্রকাশ সম্ভাবিত হয়।

ব্রহ্মের দুই অবস্থা, সগুণ ও নিগুর্ণ। নিগুর্ণ ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত এবং সগুণ ব্রহ্ম লীলাময়। শক্তি ব্রহ্মেরই একটী অবস্থা। নিগুর্ণ ব্রহ্ম সকল গুণের অতীত এবং সগুণ ব্রহ্ম শক্তিমান। তিনি কখন স্ত্রী কখন পুরুষ বেশে ধরা-ধামে লীলা করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম শক্তিমান না হইলে, তাঁহার লীলা হয় না। সুতরাং তাঁহার শক্তিরই প্রাধান্য অধিক। শক্তি না হইলে ভগবানও কার্য্য করিতে অক্ষম। ব্রহ্ম শক্তি না পাইলে জগৎ রচনা করিতে পারিতেন না। এই জগৎ সংসার সকলই মহাশক্তি দ্বারা আবদ্ধ। অর্থাৎ জগৎ সংসারে ব্রহ্মের সগুণ অবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মের নিগুর্ণ অবস্থা যে কি প্রকার, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আমি, তুমি ও জগৎ যতক্ষণ, ততক্ষণ ব্রহ্ম সগুণ অর্থাৎ পরব্রহ্মই আদ্যাশক্তি। সেই আদ্যাশক্তিই নানা অংশে বিভক্ত হইয়া পরম পুরুষের সাহায্যে জগতে লীলা করিতেছেন। শক্তির অনন্তলীলা। সেই লীলাময়ী আদ্যাশক্তি নানারূপে জগতে খেলা করিতেছেন। খেলা শেষ হইলে আবার মায়া জাল গুড়াইয়া আপন উদরে পুরিবেন। আবার সৃষ্টির সময় হইলে বাহির করিবেন। অতএব ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ; শক্তি ও

শক্তিমান অভেদ। ব্রহ্ম বলিলে ব্রহ্ম ও শক্তি উভয়ই ধরিতে হইবে। অর্থাৎ নির্গুণ ও সগুণ উভয়ই ধরা আবশ্যক, ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থা সকল বিষয়ে পূর্ণ; ঐ পূর্ণত্ব হেতু নির্গুণ ব্রহ্মের কোন কার্য্য হইতে পারে না, কারণ নির্গুণ অবস্থায় কার্য্য হয় না। জগতে আসিয়া কার্য্য করিতে হইলে ব্রহ্মের সগুণ অবস্থাই আদ্যাশক্তি।

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানে সৎ, চিৎ, আনন্দ, এই তিন শক্তি বিরাজ করে। এজন্য তিনি সচ্চিদানন্দময়। এই শক্তিত্রয় বিশিষ্ট ঈশ্বরই শ্রীকৃষ্ণ। ঈশ্বর সত্য স্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ। যে শক্তিযোগে তিনি সমুদয় দেশ কালের সঙ্গে সংযুক্ত হন, তাহাকে সন্ধিনী বলে। যে শক্তি দ্বারা তিনি সমুদয় জানেন, তাহাকে সংবিৎ; এবং যে শক্তিযোগে আনন্দ অনুভব করেন, তাহাকে হ্লাদিনী শক্তি বলে। ভক্তচিত্ত-সুখ-প্রদায়িনী এই হ্লাদিনী শক্তির নাম প্রেম; প্রেমের সার মহাভাব। এই মহাভাবই শ্রীরাধিকার স্বরূপ। মহাভাব প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

চৈতন্য চতুর্ব্বিধ—ব্রহ্মচৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য, কূটস্থ চৈতন্য এবং জীব চৈতন্য। যে বস্তু অনন্ত তাহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; সুতরাং নারায়ণ যদি অনন্ত হয়েন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে এ জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ড সেই নারায়ণের শরীর স্বরূপ। যাহা অনন্ত, তাহা অবশ্য অনাদি। যাহার আদি আছে, তাহার অবশ্য সীমা ও শেষ আছে; কিন্তু অনন্তের সীমা ও শেষ সম্ভবে না, সুতরাং অনন্ত পদার্থ অনাদি। নারায়ণ কেবল অনন্ত ও অনাদি নহেন; যে বিরাট বিশ্ব নারায়ণের রূপ ও দেহ, সেই বিশ্বও অনন্ত ও অনাদি। সংসারস্থ জীবস্রোত সেই অনাদি ও অনন্ত দেহের মূল শরীর মাত্র। এই সংসারের জীবস্রোত অনন্ত পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। উহার আদি অনুমান, কল্পনা মাত্র। অতএব এই স্থূল দেহ আমার সীমা নহে, আমি যে অনন্ত দেশে লীন হইয়া রহিয়াছি। জল, বায়ু, অগ্নি ও ব্যোম এই চতুর্ভূত দ্বারা মানব দেহ অনন্তের সহিত একাকার হইয়া আছে। এই অনন্ত বিশ্ব তাঁহারই ব্যক্তাবস্থা মাত্র।

ভগবানই এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কর্ত্তৃত্ব ও ইচ্ছা মায়ার। এই মায়িক প্রকৃতিকেই ইচ্ছাময়ী মহামায়া ভগবৎশক্তি বলে। সেই প্রকৃতিশক্তিতে পুরুষ শক্তিমান হইয়া ইচ্ছাময় ভগবান বলিয়া উক্ত হন; তিনি ইচ্ছাময় হইয়া ইচ্ছা করিলেন "অহং বহুস্যাম্", আমি বহু হইব।

মায়া কিরূপে অতিক্রম করা যায়? জীবের কামনাসম্ভূত সূক্ষ্ম শরীরের

বিনাশসাধন করাই মায়া কাটাইবার প্রধান উপায়। কামনা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, সে শরীরের ক্ষয় নাই। কর্ম্মফলে অভিলাষী না হইয়া, তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ করিলেই কামনা পরিত্যক্ত হয়।। প্রবৃত্তিকে এইরূপ নিবৃত্তি পথে আনিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধনা করিতে পারিলে, তবে কামনার লয়সাধন করিতে পারা যায়, এবং তাহাও ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পায়। শুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কর্ম্মফলাভিলাষ পরিত্যক্ত হয়। এই কামনাময় শরীরের লয়সাধন করিয়াও যদি অহঙ্কার অর্থাৎ আমিত্ব জ্ঞান, কিয়ৎপরিমাণেও থাকে, তাহাও ঈশ্বরার্পিত চিত্তে সংহার করিবে। অহঙ্কার তিরোহিত হইলেই ঈশ্বরের সারূপ্য লব্ধ হয়। ঈশ্বরের সারূপ্য লব্ধ হইলে, তৎ উপাধি স্বরূপ কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মাত্র থাকে। এই সত্ত্বিক দেহের লয় সাধনার্থে নিস্ত্রৈগুণ্য সাধিত হইলেই বিদেহ হইয়া মুক্ত জীবাত্মা ব্রহ্মপদ লাভ করে।

কৃষ্ণ—কৃষ ধাতু অর্থে উৎপত্তি বা সত্তা; ণ=নিবৃত্তি বা আনন্দ চিদানন্দ পরমানন্দ। যিনি জন্ম জন্মান্তর নিবারণকর্ত্তা; কিম্বা যিনি নিত্যসত্তায় চির-বিরাজমান সেই পরব্রহ্মই কৃষ্ণ নামে অভিহিত। সেই আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই দীপ্তি পাইতেছেন; বৈদ্যুতিক আভাযুক্ত হইয়া যিনি উত্তপ্তমনে শান্তি প্রদান করিতেছেন। ভক্তদুঃখকর্ষিত্বং বা কৃষ্ণ অর্থাৎ ভক্তদুঃখ বিনাশ-কারীই কৃষ্ণ, ভক্তগণের সমস্ত পাপ তাপ নিবারণ করেন, দুর্লভ পুরুষার্থ প্রদান করেন। অথবা ক+ঋ+ষ+ণ=কৃষ্ণ=ক, ব্রহ্ম, ঋ অনন্ত, ষ শিব, ণ ধর্ম্মঃ যিনি ব্রহ্মরূপে পালন করেন, যিনি অপরসীম, যিনি মঙ্গলময়, যিনি ধর্ম্মময়, তিনিই ত্রিভঙ্গ অর্থাৎ সৃষ্টিসর্গ, স্থিতিসর্গ, লয় সর্গ; তাহাতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করিতেছে। ব্রহ্ম কটাহ ভেদ করিয়া মহারাসে নিমগ্ন আছেন। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ সেইখানেই জয়। কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম, যিনি অনাদি অনন্তকাল বিদ্যমান ও পরমানন্দ, যিনি প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ আত্মমধ্যে আকর্ষণ করেন এবং যিনি দুষ্টের দর্পহরণ করেন।

রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি নয়। ঈশ্বর পুরুষও প্রকৃতি, অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকা শক্তি। এই পুরুষ প্রকৃতি পূজাই রাধাকৃষ্ণের উপাসনা। ভগবান সচ্চিদানন্দ। তাঁহার সীমা নাই, তিনি অনন্ত; তিনি সর্ব্বরূপী নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। তিনি অমূর্ত হইয়াও মূর্ত্তিমান। লোকদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছেন।. প্রতিমাকে কেহ পূজা করে না; প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইলে তবে তাঁর পূজা হয়। ভগবান সামান্য জীবের ন্যায়

নারীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন না; ভক্ত হৃদয়ে তাঁর জন্ম। ভক্তের শুদ্ধ অন্তঃকরণ বসুদেব, ভক্তি দেবকী। শুদ্ধ অন্তঃকরণে যখন ভক্তির যোগ হয়, তখনই সেই ভক্ত-হৃদয়ে ভগবানের জন্ম হয়। চিদানন্দময়, মঙ্গলময়, ভগবানের প্রতি যে স্থায়ীভাব, অর্থাৎ অচল, অটল, ঐকান্তিক অনুরাগ, স্বতঃই হৃদয়ে আবির্ভাব হয়, তাহাই ভক্তিনামে অভিহিত।

পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ। তাঁহার সৎভাবের বিকাশ সন্ধিনী শক্তিতে এবং এই শক্তির প্রকাশ হিরণ্ময় কোষে। তাঁহার চিৎভাবের বিকাশ সংবিৎ শক্তিতে, এই শক্তির প্রকাশ বিজ্ঞানময় কোষে। তাঁহার আনন্দ ভাবের বিকাশ হ্লাদিনী শক্তিতে, এই শক্তির প্রকাশ আনন্দময় কোষে।

স্থূল শরীর = অন্নময় কোষ = ভূলোক। সূক্ষ্ম শরীর = প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ, তন্মধ্যে প্রাণময় কোষ হইতেছে ভূলোক, মনোময় কোষ হইতেছে ভূবর্লোক এবং বিজ্ঞানময় কোষ হইতেছে স্বর্লোক, বিজ্ঞানময় কোষ হইতেছে মহঃলোক। কারণ শরীর = আনন্দময় কোষ = জন, তপ ও সত্য লোক। বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের শেষে হিরণ্ময় কোষ। এই সকল সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সংবিৎ শক্তির ক্রিয়া ক্ষেত্র।

সগুণ ব্রহ্ম স্থূলরূপে উপাস্য অর্থাৎ তিনিই সন্তজনীয়। এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারে ভগবানের ত্রিবিধ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রয়োজন, আয়োজন ও নিয়োজন শক্তি। এই শক্তিত্রয় সম্পন্ন হইয়া ভগবান এ বিশ্বের বিধাতা, কর্ত্তা ও সর্ব্বনিয়ন্তা। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। গোপীজনবল্লভ। যাঁহারা রক্ষা করেন, তাঁহারাই পালনীশক্তি—গোপী। সেই পালনী শক্তি রূপা। অবিদ্যা কলার যিনি বল্লভ, তিনিই অবিদ্যার প্রেরক ঈশ্বর এবং অনন্ত জগতের অধিষ্ঠান। দ্বিতীয়তঃ—প্রকৃতি বা মায়া হইতে এই প্রপঞ্চ জগৎ জন্মিয়াছে, এ নিমিত্ত গোপীজন শব্দে জগৎ জানা যায়, এবং জগতের স্বামীই গোপীজন-বল্লভ।

শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী।

শঙ্খ = জয় ঘোষণার চিহ্ন, বিবেক, জ্ঞান।

চক্র = সর্ব্ববিঘ্ন রাশিকে খণ্ড খণ্ড করার জন্য, বৈরাগ্য।

গদা = বলবান শত্রু মাত্রকেই দমন জন্য, বিজ্ঞান। অজ্ঞান নাশ করিয়া জ্ঞানের আবির্ভাব যে শাসনের দ্বারা হয়।

পদ্ম=আনন্দ বিকাশ, আশীর্ব্বাদ, শুভাশীর্ব্বাদ, চৈতন্য।

শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত, যথা :—

ধ্বজ=অস্তিত্বের চিহ্ন।

বজ্র=অবিনাশিত্ব।

অঙ্কুশ=মত্তহস্তী রূপ মনকে দমন জন্য, বিজ্ঞান।

চতুর্ভূজ=পূর্ণশক্তি সম্পন্ন হইয়া রাজসিক করে শঙ্খ (পঞ্চভূত); সাত্বিক করে চক্র (বালস্বরূপ মন); তামসিক করে গদা (আদ্যা মায়া); এবং অহঙ্কার করে পদ্ম (বিশ্ব) ধারী হয়েন। তিনি জগতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্ব পার্থিব বলকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছেন, পৃথিবীর পাপবল ধ্বংস করিতেছেন, অসুর সকলের বিনাশ সাধন করিতেছেন। যাহা মানুষের অদৃষ্ট, তাহা ভগবানের সুদর্শন চক্র। সেই সুদর্শনচক্রবলে সমস্ত আসুরিক বলের ধ্বংস সাধন হয়।

বসুদেব=বিশুদ্ধ সত্বগুণ। নির্ম্মল সত্বগুণে পরমপুরুষ বাসুদেব প্রকাশিত হন। এই সত্বগুণ যখন পরমা ভক্তিরূপিনী দেবকীতে সম্মিলিত হয় তাহার ফল ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কিম্বা ব্রহ্মের আবির্ভাব।

ঈশ্বর=যিনি ঐশ্বর্য্যবান, সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সকলেরই নিয়ন্তা।

গোবিন্দ=গো, বেদ বা তত্বজ্ঞান। সেই বেদ ও তত্বজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ তিনি গোবিন্দ। তিনি গোপবেশে জগতের পালন করিতেছেন; এবং তাহাই তাঁহার মধুর সত্বমূর্ত্তি। অথবা গো ইন্দ্রিয়; বিন্দতি, পালন বা অধিষ্ঠান করা; ইন্দ্রিয়গণের পরিপালক বা অধিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ।

নারায়ণ=যিনি ধর্ম্মের পালন করেন, এবং পাপের বিনাশ সাধন করিয়া জগৎকে রক্ষা করেন।

হরি= হ, র, ই। হ=সংহার কর্ত্তা, মহেশ্বর। র=সৃষ্টিকর্ত্তা, ত্রিপুরা। ই=শক্তি, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যভোগের যোনি। অথবা হরি—হরতি, যিনি পাপ হরণ করেন, দুঃখ হরণ করেন।

রাম=র, আ, ম। র=ত্রিপুরা রূপিণী মহাশক্তি; আ=আনন্দামৃত; ম=সংহার রূপিনী মহাশক্তি বা মহেশ্বরী। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের স্রষ্টা ও পাতা। পরমেশ্বর, যোগীগণ যে সচ্চিদানন্দ ও অনন্তস্বরূপে রত হয়েন, তিনিই রাম।

অধোক্ষজ=অধ=প্রশমিত ; অক্ষ=ইন্দ্রিয় ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রশমিত অবস্থা, জ্ঞানাবস্থা ; তাহা হইতে জন্ম অর্থাৎ প্রকাশ বলিয়া অধোক্ষজ নাম।

সারথী=আত্মারূপী ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বকে, বাসনারূপী রজ্জুদ্বারা আকর্ষিত করিয়া মায়াজাত বিদ্যারূপী কশাসাহায্যে আত্মস্বরূপে আনয়ন করেন।

কেশব=ক, ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্ত্তা ; ঈশ, রুদ্র, সংহর্ত্তা ; এতৎ উভয়কে নিজ কৃপাপাত্র বোধে যিনি জগৎ রক্ষক, স্থিতিকারকরূপে বিদ্যমান থাকেন, তিনিই কেশব।

মুকুন্দ=মুচ্ ধাতু মোচন করা ; মুক্তিদানকর্ত্তা। মায়াবন্ধন হইতে যিনি মুক্ত করেন।

গোপাল=প্রজাপালনকারী, সংসারধাম গোষ্ঠে বিহার করেন।

সুদর্শন=বিষ্ণুশক্তি, ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মশক্তি।

সুগ্রীব=বিবেক, স্থিরবুদ্ধি।

ধুম্রলোচন=মোহাচ্ছন্ন জ্ঞান।

উদ্ধব=নিত্য সাধনার রূপক, সাধক!

অক্রূর=যিনি ক্রূরতা-হীন।

মুক্তি=রাধা কৃষ্ণে লীন হওয়া, তন্ময় হওয়া, জীবশিব হওয়া, জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় রমণ।

রাধা=আরাধনারূপিণী ; ভক্তি। র=অগ্নি, আ=আধিদৈব, ধ=শব্দ আ=আধিদৈব। ইত্যর্থে জগৎপ্রকাশিকা শব্দকেও বুঝায়। ব্রহ্মময় তেজ, ভর্গ, এবং জগৎ পালিকা কাল শক্তি, যিনি জীব মাত্রের (ধী) বুদ্ধি বৃত্তিকে প্রেরণ করেন। যিনি ভগবানের আরাধনা করেন অর্থাৎ জীব। ভগবানের মাধুর্য্যগত হ্লাদিনী শক্তি।

আয়ান=আ+য়া+অনট=আগমন ; ভগবান হইতে আয়ান করা অর্থাৎ প্রস্থান করা, বা আগমন করা=সংসার, কারণ, সংসার=(সং+সৃ+ঘঞ) সম্যক রূপে সরিয়া আসা ; অর্থাৎ ভগবান হইতে দূরে প্রস্থান করাই আয়ান শব্দ বাচ্য।

বংশীধ্বনি=চিত্ত আকর্ষক সুমিষ্ট আহ্বান, চিৎযন্ত্রে প্রণবধ্বনি।

কদম্ব=চিত্তপুলক-রূপ কদম্ববৃক্ষতল।

জটিলা = আসক্তি, কারণ আসক্তিই বড় জটিলা, নতুবা এত বন্ধন কেন? ইনি আবার বৃদ্ধা ও আয়ানের (সংসারের) জননী; কারণ আসক্তি হইতেই সাংসারিকতা জন্মে ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং অনিত্য বিষয়ে আসক্তিহেতু নিত্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া জীব সংসারচক্রে পতিত হয়; এই জন্যই ভক্তগণ ইহাঁকে সংসারের (আয়ানের) জনয়িত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কুটিলা = প্রবৃত্তি; ইনি যুবতী এবং আয়ানের ভগিনী। কারণ প্রবৃত্তি সততই চঞ্চলও উচ্ছৃঙ্খল, সংসার-প্রযুক্ত, নিয়তই সংসার বা আয়ানের সহায়তা করিয়া থাকেন। ইনি সর্ব্বদাই রাধার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে ব্যস্ত।

ব্রজ = জগৎ, ব্রজপুরে = জগতে।

গোপী = গোপ বা ভগবান, তস্যস্ত্রী = জীব, ভক্ত।

রাজকন্যা = রাজতে, বিরাজতে এক এব ইতি রাজা বা ভগবান। তস্য কন্যা = জীবাত্মা! ভগবান হইতে জীবের উৎপত্তি, অথবা পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা।

যশোদা = যশঃ = মোহ; বিজয়াৎ খ্যাতিং দদাতি যা সা ভগবতী শক্তি।

নন্দ = আনন্দ।

নন্দনন্দন = পরমানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ।

বিভু = বিভূতি যোগে পরব্রহ্মের নাম বিভু।

ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি = বাম পদের উপর দক্ষিণ পদ, প্রবৃত্তির উপর নিবৃত্তি। ত্রিভঙ্গ = সৃষ্টি সর্গ, স্থিতি সর্গ, লয় সর্গ অর্থাৎ তাঁহা হইতে সৃষ্টিস্থিতি লয় হইয়াছে।

রুক্মিণী = সাত্ত্বিকী ভক্তি। অপরাপর গোপীগণ তামসিক; তন্মধ্যে রুক্মিণীই পরম ঐশ্বর্য্যরূপিণী।

সত্যভামা = রাজসিক ভক্তি। সতাদ্বারা যিনি সতত শোভিত হইয়া আত্ম গরিমা প্রকাশ করেন; ইনি রাধার কলা স্বরূপা।

মায়া = শক্তিময়ী সুন্দরী কামিনী।

যোগমায়া = ঈশ্বরের চিৎশক্তি, যাহা সর্ব্ব সঙ্কল্পের অধিষ্ঠান।

যোগনিদ্রা = ব্রহ্মের পরমানন্দময়ী শক্তি।

যোগস্নান = যেমন অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি যোগের সময় গঙ্গাস্নান করাকে যোগস্নান বলে, তেমনই পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হওয়াকে যোগস্নান বলে। মনের রজঃ, চিত্তমধ্যে কাম ক্রোধাদি রজোগুণ অর্থাৎ অপবিত্র ভাব সকল এই স্নানে দূর হয়, পরিষ্কৃত হয়।

গঙ্গা=যে দ্রবময়ী অনন্ত প্রেম ধারা, ঈশ্বররূপ মহাগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া ঈশ্বররূপ মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম সনাতনী গঙ্গা। মহাকাল ইহাঁকে শিরে ধারণ করিয়া রাখেন।

কাত্যায়নী=পরব্রহ্মের জ্ঞানরূপা মহাশক্তির নাম কাত্যায়নী এবং মহামোহের নাম মহিষাসুর। ভগবানের জ্ঞানশক্তি অজ্ঞানকে বিনাশ করে বলিয়া উহার অন্য নাম মহিষমর্দ্দিনী। মূর্ত্তিমান অজ্ঞান=মহিষ। ঈশ্বরের জ্ঞান-শক্তির নাম মহিষমর্দ্দিনী কাত্যায়নী।

ক্রমশঃ

শ্রীআনন্দগোপাল সেন।

ভাই-ফোঁটা

(১)

সর্ব্বেশ্বর বাবুর সাধের সংসার পুত্রকন্যার কল-হাস্যে সদাই মুখরিত। বসন্তাগমে বনস্থলীর ন্যায় তাঁহার বাস-ভবন লতাপল্লবশ্রী শোভিত হইয়া চিরমনোহর উদ্যানকুঞ্জের শোভা অনুকরণ করিত। উন্মুক্ত প্রান্তর-মধ্যস্থ তাঁহার এই নবনির্ম্মিত আবাসবাটী দূর হইতে একখানি চিত্রপটের ন্যায় বোধ হইত। কত গোলাপ, কত বেলা, কত গন্ধরাজ, ফুটিয়া থাকিত, কত বিচিত্র প্রজাপতি সেই ফুলের উপর ক্রীড়া করিত। পশ্চিম সূর্য্যের শেষ-রশ্মি সেই ঝড়াফুলের কোমলশয্যার উপর এলাইয়া পড়িত, তারপর যেন রাত্রির মত ঘুমাইয়া পড়িত।

কন্যা বিজনকুমারীকে পাঁচ বৎসরের রাখিয়া তাঁহার পত্নী স্বর্গারোহণ করেন। স্নেহশালিনী পত্নীর অভাব পূরণ করা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়াছিল, কারণ অধিকাংশ সময়ই তিনি পলিটিকাল এজেণ্ট হরন্বি (Hornby) সাহেবের দপ্তর-খানায় কাটাইতেন; পুত্র কন্যার মাতৃশোক অপনোদন করিবার সময় তাঁহার অল্পই থাকিত। তিনি এজন্য মনে মনে অনুতাপ করিতেন, কিন্তু কোন উপায় ছিল না। বিদেশে চাকুরীজীবি বাঙ্গালী সামান্য টাকার জন্য ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পরদাস হইয়া জীবন কাটাইতেছে, ক্রমে তাহারা আত্মীয় বন্ধুর মায়া কাটাইয়া দূরদেশে বসবাস

করিয়া স্বদেশের নিকট বিদায়গ্রহণ করিতেছে! সর্ব্বেশ্বর আজ ২৫ বৎসর যাবৎ আজমীরে বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র সুধীরচন্দ্র আজমীর কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। এখন বিজনকুমারী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। সর্ব্বেশ্বর মনে করিলেন কিছু দিনের ছুটী লইয়া কন্যার বিবাহ-কার্য্য শেষ করিয়া আসিবেন। কিন্তু ছুটী মিলিল না। একটা গুণ বাঙ্গালীর আছে, কষ্ট সহ্য করিয়া চাকুরী করিতে পারে। সর্ব্বেশ্বরেরও তাহাই হইল। একদিন সাহেব আপিসে আসিয়া দেখিলেন, সর্ব্বেশ্বর অপিসের খাতাও লিখিতেছে, মধ্যে মধ্যে চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা খাতার কলেবর সিক্ত করিতেছে। সাহেব জানিতেন "সর্ব্বেশ্বর ভিন্ন একদিনের জন্যও তাঁহার আপিস চলা কঠিন, কারণ সময়ে সময়ে সাহেবকেও সর্ব্বেশ্বরের স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইত। বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সর্ব্বেশ্বর ভিন্ন কেহ জানিত না। সর্ব্বেশ্বর ভাবিল, সাহেবের পেনসিয়ান লইবার সময় হইয়াছে ; এ সময়ে কোন বিষয়ে গোলযোগ হয় এই ভাবিয়া তাহাকে ছুটী দিতে সাহস করিলেন না। তাহার তিন মাস ছুটী পাওনা ছিল, তাহারই আবেদন করিয়াছিলেন, বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহার আবেদন অগ্রাহ্য হইল।

সাহেবকে দেখিয়া সর্ব্বেশ্বর চেয়ার হইতে উঠিয়া সেলাম করিলেন। তাঁহার চক্ষু তখনও অশ্রুসিক্ত, হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত, কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ ; হায় রে দাসত্ব!

সাহেব ডাকিলেন, "সর্ব্বেশ্বর—'

সর্ব্বেশ্বর নিকটে আসিয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

সাহেব পুনরায় বলিলেন, "সর্ব্বেশ্বর! তোমার দুঃখে আমি দুঃখিত, কিন্তু কোন উপায় নাই।"

যে পরের দুঃখে দুঃখিত হয়, কিন্তু দুঃখ বিমোচনে শক্তি থাকিতেও চেষ্টা করে না, তাঁহার দুঃখিত না হওয়াই ভাল। সর্ব্বেশ্বর বিনয়পূর্ণ স্বরে উত্তর দিলেন—"আপনি আমার জন্য দুঃখিত,—

সাহেব যেন কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ সর্ব্বেশ্বর আমি দুঃখিত, এই দেখ তাহার প্রমাণ! এই বলিয়া একখণ্ড নীল কাগজ তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন! সর্ব্বেশ্বর তুমি এ সময়ে ছুটি লইলে তোমার ভাগ্যনদীতে ভাটা পড়িত, তোমার অদৃষ্ট তোমাকে চিরদিনের জন্য উপহাস করিত। তোমার কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে জানি, কিন্তু এক বৎসর অপেক্ষা

করিলে বোধ হয় তুমি জাতিভ্রষ্ট হইবে না। তোমার এক মাত্র কন্যাকে এত শীঘ্র কি করিয়া বিদায় দিবে, আমি বুঝিতে পারি না!"

সর্ব্বেশ্বর বুঝিল, ইংরাজজাতি বাঙ্গালীর অনেক উপরে। সেই জন্য তাহার কর্ম্মফল তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়াছে। পৃথিবীর অর্দ্ধেক রাজত্ব তাহার। সর্ব্বেশ্বর দার্শনিক প্রকৃতির লোক, তিনি মনোমধ্যে দুঃখের সামঞ্জস্য করিয়া লইলেন। যে দুঃখ ভাবী সুখের অনুগামী, সে দুঃখকে মানুষ ফেলিতে চায় না। তখন সুখ ও দুঃখের ব্যবধান কি, তাহা দার্শনিকদিগের ভাবিবার বিষয়।

সাহেব চলিয়া গেলে, সর্ব্বেশ্বর কাগজটী পড়িয়া দেখিলেন, শিমলা ফরেন আপিসে (Foreign office) তলব হইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। কন্যার বিবাহ এক বৎসর স্থগিত রাখিতে হইবে। এই কথাটা একবার ভাবিলেন। চোদ্দ পনর বৎসরের কম মেয়ের বিবাহ হয় না। তাহার কারণ পাত্রাভাব, টাকার অভাব! সরলপ্রকৃতি সর্ব্বেশ্বর অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি উঠিয়া বাড়ী যাইবেন, এমন সময়ে দেখিলেন তাঁহার পুত্র সুধীর একটী সাহেবকে কোলে লইয়া তাঁহার বাটী অভিমুখে গমন করিতেছে। আপিসের একটু দূরেই তাঁহার বাড়ী। তিনি বাড়ী অভিমুখে গমন করিলেন।

আজমীরের প্রাকৃতিক শোভা মনোহারিণী। দূরস্থিত পর্ব্বতশৃঙ্গের স্তর, নিম্নে স্বচ্ছসলিল হ্রদ, মধ্যে উন্মুক্ত প্রান্তর, পার্শে নির্ঝরিণীর নৃত্যলীলা, যেন প্রকৃতির লীলাভূমি! প্রভাতের কোমল বায়ু হ্রদে ক্রীড়া করিত, প্রভাতের অরুণরাগ সেই সঙ্গে যোগ দিত, প্রফুল্ল পুষ্পের মধুর সুরভি ছড়াইয়া থাকিত, পথিক সে চিত্র দেখিয়া মোহিত হইত। আজমীর স্বাস্থ্যকর স্থান।

সুধীরচন্দ্র বয়ঃক্রমে কুড়ির কিঞ্চিন্ন্যূন হইলেও তাহার শরীরে বয়সাধিক বল ও স্ফূর্ত্তি ছিল। বিজনকুমারীর অঙ্গ পরিপুষ্ট, মোটা নহে; হালকার উপর সতেজ, তবে কাদম্বিনী তুল্য চঞ্চল নহে। লাবণ্য-তরঙ্গে উদ্ভাসিত, তবে তাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায় না। আবেণীসম্বদ্ধ কুন্তল এলাইয়া থাকিত, তাহাতে ভুজঙ্গিনীর গতি ছিল, তবে কাহাকেও দংশন করিত না। চক্ষুতে বিদ্যুৎরাগ ছিল, তবে তাহাতে মন্মথের শর ছিল না। নিটোল ললাটে সুবঙ্কিম ভ্রূযুগ স্থান পাইয়াছিল, তবে তাহাতে তুলিচিত্রবৎ গাঢ়কৃষ্ণবর্ণের আধিক্য ছিল না, যেন স্বাভাবিক একটু ফিকে। গণ্ডদেশ রক্তাভ, তবে তাহাতে অলক্তকের গাঢ়তা

ছিল না, সলজ্জ উষার হাসির ন্যায় মিলাইয়া থাকিত। সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী পরমাসুন্দরী ছিলেন। বিজনকুমারীও মাতার ন্যায় সুন্দরী, পিতার ন্যায় গম্ভীর, ভ্রাতার ন্যায় সহৃদয়, যেন সৌভাগ্যের ত্রিমূর্ত্তি।

সাহেবটীর তখনও চৈতন্য হয় নাই। বিজনকুমারী শিয়রে বসিয়া পাখা করিতেছে, সুধীর ষ্টোভে দুগ্ধ চড়াইয়া দিয়া smelling salt এর শিশি আনিতে যাইবে, এমন সময়ে সর্ব্বেশ্বর পঁহুছিলেন। সাহেবকে দেখিয়াই তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং কোন কথা না কহিয়া তিনি দ্রুত-পদে হরনৃবি সাহেবকে সংবাদ দিতে ছুটিলেন। বিজনকুমারী ও সুধীর পিতার এই ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল। সাহেব যেই হউক না কেন, সে বিপদগ্রস্ত, আর্ত্তের সেবা পরমধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম তাহারা বাল্যে শিখিয়াছিল, সেই ধর্ম্ম তাহারা পালন করিতে যত্নবান হইল। সর্ব্বেশ্বর এজেণ্ট সাহেবের বাড়ী পঁহুছিয়া জানিলেন, সাহেব নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। চাপরাশীর প্লীহা ফাটাইবার সাহস না থাকায় সে ঘুম ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিল না, সুতরাং সর্ব্বেশ্বর বিপদে পড়িলেন। সাহেবের মেম বিলাতে, সুতরাং সাহেবের মেজাজ প্রায়ই মিলিটারী কর্ণেলের মত রুক্ষ ভাব ধারণ করিত। তার উপর তিনি এতগুলি রাজপুত রাজার ভাগ্যবিধাতা ছিলেন, ইহাও তাঁহার পক্ষে পত্নীর তরল বিরহ কাটাইবার প্রধান উপায় ছিল। সর্ব্বেশ্বর ভাবিলেন, গৃহে সাহেবের অবস্থা ভাল না হইতে পারে, আর এজেণ্ট সাহেবকে সংবাদ না দেওয়াও রীতিবিরুদ্ধ, তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি সাহসে ভর করিয়া সাহেবের দ্বিতল কক্ষের বহির্দ্দিকের ঘণ্টা ধরিয়া টানিলেন। নীচে চাপরাশী ভয়ে সদ্যস্নাত ছাগ শিশুর ন্যায় কাঁপিতে লাগিল—কাহার ভাগ্যে গুলি ছোটে! সাহেব অকস্মাৎ এই এলার্ম বেলের টিং টাং ঢং ঢং শব্দ শুনিয়া এক লম্ফে ড্রয়ারস্থিত জোড়া পিস্তল হস্তে লইয়া বাহির হইলেন। বাহিরে দেখেন, ডাকাইত নহে—বেচারী সর্ব্বেশ্বর! সে নিরামিষভোজী, সুতরাং বলশূন্য, এই জন্য সাহেব কৃপাপরবশ হইয়া হাতের পিস্তল আর উঠাইলেন না। সাহেব বাঙ্গালীর মত ঘুম হইতে উঠিয়া চক্ষে জল দিয়া বাহিরে আসেন নাই, সুতরাং সাহেবের মূর্ত্তি তখন রৌদ্রতপ্ত কাষ্ঠের ন্যায় নীরস সুতরাং কর্কশ! "সর্ব্বেশ্বর again for leave! ছুটী জন্য পুনরায়!" সাহেব সুধীরের নিকট বাংলা শিখিতেছিল। সাহেব উর্দ্দর ন্যায় পশ্চাদ্দিক হইতে তরজামা করিতে ভাল বাসিতেন।—

সর্ব্বেশ্বর বিনয়নম্র বচনে বলিল, No Sir, the Foriegn Secretary! না মহাশয়, ফরেন সেক্রেটারী!

সাহেবের সত্য সত্যই এবার ঘুম ভাঙ্গিল।

By Jove—the Foreign Secretary, Certainly you are mad! সাহেব বোধ হয় এবার অনুবাদ করিতে ভুলিয়া গেলেন। No sir, he is lying unconscious at my house! সাহেব—তিনি আমার বাড়ীতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন।

সাহেব পুঞ্জীভূত বিস্ময়ে বলিলেন, "Sur-ve-swar I am undone! আমার দফারফা!" সাহেব তখন পিস্তল লইবেন কি টুপী লইবেন, কোট পরিবেন কি প্যাণ্টলুন পরিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া Sleeping Suit পরিয়া নীচে নামিয়া গেলেন, তখন চাপরাশির কাঁপুনি ব্যাধি বৃদ্ধি পাইল, পড়ে আর কি! সর্ব্বেশ্বর তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "যাও, সাহেবের পোষাক লইয়া এস।" চাপরাশী এ যাত্রা রক্ষা পাইল ভাবিয়া রামনামের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে এক লম্ফে অর্দ্ধেক সিঁড়ি অতিক্রম করিল।

সাহেব Sleeping Suit (ঘুমের পোষাক) পড়িয়া নীচে আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া লজ্জাশীলা নারীর মত সঙ্কুচিত হইলেন। এটিকেটের অনুরোধে সর্ব্বেশ্বর অন্য গৃহে আশ্রয় লইলেন। সাহেব আবার চাপরাশীর নিকট অপদস্থ হইবেন ভাবিয়া অন্য গৃহে লুকায়িত হইলেন। চাপরাশী উপর হইতে পোষাক লইয়া আসিয়া বিপদে পড়িল—সাহেব কোথায়? গেল কোথায়! হায় ১০৲ টাকা বেতনের চাপরাশীর আর কত বুদ্ধি হইবে! চাপরাশীর পক্ষে "সাহেব" বলিয়া ডাকা বেয়াদবি; তাহার মুখে সর্ব্বেশ্বর নামটা ভাল করিয়া উচ্চারণ হয় না! বেচারীর উভয় সঙ্কট! এমন সময়ে সুধীর আসিয়া চাপরাশীকে বলিল—"বাবা কোথায়—সাহেব ডাকিতেছেন।" চাপরাশি বিস্ময়সাগরে হাবুডুবু খাইয়া রাম নাম করিতে লাগিল।

(২)

সুধীর ও বিজনকুমারীর যত্নে ও শুশ্রূষায় সাহেব চেতনা লাভ করিলেন। তিনি আজমীর পর্য্যন্ত in Cognito ছদ্মবেশে আসিয়া পথিমধ্যে Cycle দ্বিচক্রযান হইতে পড়িয়া অচৈতন্য হইয়া পড়েন। গিরিপথ স্বভাবতঃ বন্ধুর ও দুরাবরোহ, সুতরাং সাহেবের মৃতপ্রায় দেহ গড়াইতে গড়াইতে হ্রদের তীরে আসিয়া পঁহুছিল। তার পর সুধীরচন্দ্রের কৃপালাভ।

সাহেব খাঁটি গরম দুধ খাইয়া ক্ষণপরে উঠিয়া বসিলেন। তিনি সুধীরকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুধীর আত্মপরিচয় দিয়া সাহেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সে জানে না এই সাহেব Foreign Secretary। সাহেব তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তার নিকট পরিচয় গোপন করিলেন না। সুধীর প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইল। ভারতবর্ষের কর্ণধার এই সাহেব তাহাদের সামান্য গৃহে বসিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। বিজনকুমারী তখন সাহেবের জন্য পাঁওরুটী Toast করিতেছিল। সে একটী রূপার থালিতে কয়েক খণ্ড পাউরুটী, কিঞ্চিৎ মাখন ও এক পেয়ালা চা আনিয়া সাহেবের সম্মুখে ধরিল।

সাহেব পরিতোষ সহকারে আহার করিলেন। তাহাদের বাড়ীতে প্রস্তুত নানাবিধ মিষ্টান্ন সাহেবকে খাইতে দিল, পেলিটীর চিনীর চিপের আস্বাদ ভুলিয়া সুতার ও সুগন্ধি মিষ্টান্ন খাইয়া সাহেব অবাক হইলেন। বিজনকুমারী এখনও জানে না, এ সাহেব কে! জানিলে বোধ হয় তাহার হাতের থালা হাতেই থাকিত!

সাহেব সুধীরকে তাহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া তাহার পিতাকে ডাকিবার জন্য ছুটিল। সাহেব বাংলা কথা কহিতে পারেন। তিনি বিজনকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখনও অবিবাহিত?" বিবাহের নাম শুনিয়া তাহার বদন আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষে দু'ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। সাহেব সে দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি সমবেদনারস্বরে বলিলেন, "মা, তোমরা হিন্দু, তোমাদের অল্প বয়সেই বিবাহ হয় বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।" "মা" কথা শুনিয়া বালিকার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিল। "মা" কথাটা স্নেহের উৎস, নীরস কর্কশ হৃদয়ও সরস হয়। বালিকা বলিল, সাহেব, আমার পিতা ছুটী পান নাই, তার পর আমরা গরীব।

সাহেব বুঝিলেন, হিন্দু বালিকা বয়সে ছোট হইলেও সংসারাভিজ্ঞা।

"কেন মা, তোমরা কিসের গরীব, তোমাদের এমন পবিত্র হৃদয়, তোমার পিতা এমন রত্নের অধিকারী। তোমার পিতাকে আমি লইতে আসিয়াছি।"

সাহেবের কথায় বিজনকুমারী বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান রহিল।

"হাঁ মা,—আমার অধীনে যতগুলি বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছে, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহার কর্ত্তব্য পরায়ণতার আজ পুরস্কার দিব।"

সাহেব এই কথা বলিয়া চুরুট ধরাইয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইলেন। বিজন-কুমারী বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে ভাবিতে লাগিল, এ সাহেবটী কে?

এমন সময়ে সাহেবের এক চাপরাশী আসিয়া সাহেবকে লম্বা সেলাম করিল। চাপরাশীর গাত্রবস্ত্র ও জরীজোব্বা অতি উচ্চদরের, সুতরাং সাহেব একজন যে অতি উচ্চদরের সাহেব সে বিষয়ে বিজনকুমারীর সন্দেহ রহিল না। সাহেব চাপরাশীর নিকট তাঁহার নূতন কোট ইত্যাদি লইয়া সর্ব্বেশ্বরের পোষাক কামরায় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন, এমন সময়ে সবাহন Hornby তথায় উপস্থিত হইলেন। Hornby সাহেব পাঁচ হাত দূর হইতে মস্তকস্থিত টুপি উঠাইয়া সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। সাহেবও সবিনয় নমস্কার করিলেন। বারাণ্ডায় অনেকগুলি চেয়ার ছিল—Hornby সাহেব একটীতে বসিলেন, সর্ব্বেশ্বর ও সুধীর দাঁড়াইয়া রহিল।

সাহেব সর্ব্বপ্রথমেই সর্ব্বেশ্বরের পুত্র কন্যার প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহা-দের যত্নেই যে তাঁহার পুনর্জীবন লাভ হইয়াছে, এ কথা ও বলিতে ভুলিলেন না।

সর্ব্বেশ্বর মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। সুপুত্রের অযাচিত প্রশংসা পিতার নিকট বড় মুখরোচক। সর্ব্বেশ্বর মনে করিলেন, এত দিনে তাঁহার সাধনা সফল হইল। তাহাদের মাতৃ বিয়োগের পর তাহারা যে মনের মত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে ইহাতেই তাঁহার পরম আনন্দ।

সাহেব সর্ব্বেশ্বরকে বলিলেন, "সর্ব্বেশ্বর! তোমার কন্যাকে আমি মা বলিয়াছি। তোমার কন্যার এখনও বিবাহ হয় নাই। সে ভার আমার উপর।"

সর্ব্বেশ্বর আনন্দাশ্রু লোচনে উর্দ্ধকরে ভগবানের নিকট সাহেবের দীর্ঘ-জীবন প্রার্থনা করিলেন। সাহেবও বুঝিতে পারিলেন, সর্ব্বেশ্বরের ভগবদ্ভক্তি অতলস্পর্শ হ্রদের স্বচ্ছবারির ন্যায় নির্ম্মল, দূরপ্রসারিতা নদীর ন্যায় বেগময়ী, আকাশের ন্যায় অনন্ত সুন্দর।

হঠাৎ সাহেবের একটী তৈলচিত্রের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল। সে দৃষ্টি ঘুরিল না, যেন তাহার দৃষ্টি কেহ যাদুমন্ত্রে আকর্ষণ করিল। সেটী সর্ব্বেশ্বরের

পত্নীর প্রতিমূর্ত্তি, সে মূর্ত্তিতে যেন ভগবানের করুণা উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গের ন্যায় পতিত হইয়াছে। আলুলায়িত কুন্তলা ভবানী দেবী সাবিত্রী ব্রতের দিন স্বামীর চরণে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন, এ সেই চিত্র! হস্তে পুষ্প, সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু, হস্তে শাঁখা, পরিধানে লাল বর্ণের সাটী। এই সামান্য সজ্জাতেও ভবানী দেবকন্যার ন্যায় মনোমোহিনী, প্রফুল্ল শতদলের ন্যায় প্রেম-বিসর্পিতা, যুথিকার ন্যায় মাধুরীময়ী।

সাহেব আনন্দের স্বরে বলিলেন, "সর্ব্বেশ্বর, তুমি ভাগ্যবান, তোমার সংসার পুণ্যালোকপ্রতিফলিত মুকুটের ন্যায় কলঙ্কশূন্য। এই একটী চিত্র হইতে তোমাদের অনেক পুরাণের মর্ম্মকথা বুঝিতে পারিলাম।" হরনবি সাহেব একথার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বড় সাহেব উপস্থিত, নচেৎ তাহার চিরাভ্যস্ত সংগীত "Nany my darling" শিশ সংযোগে গাহিয়া বিহঙ্গকুলকে আকুল করিতেন।

"সর্ব্বেশ্বর, তুমি প্রস্তুত হও। আমার special এতক্ষণ প্রস্তুত হইয়াছে। আমি এখান হইতে কাশ্মীর যাইব। কোন গোপনীয় কার্য্যের জন্য তোমাকে দরকার।" এই বলিয়া সাহেব চেয়ার হইতে উঠিলেন।

Hornby সাহেব সাহেবকে dinnerএ আপ্যায়িত করিবার জন্য রাগিনী ভাঁজিতে যাইয়া অপ্রস্তুত হইলেন। বড় সাহেব সর্ব্বেশ্বরের বাড়ীতে পরিতোষ সহকারে আহার করিয়াছেন, হরনবিকে জানাইলেন।

হরনবি যেন আকাশ হইতে ধপ্ করিয়া পড়িলেন। কালা সর্ব্বেশ্বর (সর্ব্বেশ্বর কিন্তু দেখিতে সুন্দর!) আমার সম্মান কাড়িয়া লইল! ব্রাডি নিগার (সর্ব্বেশ্বরের রক্ত অকৃত্রিম লাল, কিছুমাত্র ভেজাল নাই।) আমার উপরে স্থান পাইল!

বড় সাহেব Hornby সাহেবের সহিত আপিষ অভিমুখে গমন করিলেন। পরে শুনা গিয়াছিল বড় সাহেবের আমলে তিনি উপর্য্যুপরি ফারলো Furlough লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সর্ব্বেশ্বরের এই গৃহ হইতে বিদায় লইতে চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। কত পুরাণ স্মৃতি-জড়িত, কত সুখের আলেখ্যচিত্রিত এই গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইবে! কিন্তু কোন উপায় নাই! তিনি সুধীরকে বলিলেন, "কেবল তোমার বই এর বাক্স, আমার হাত বাক্স আর ঐ চিত্রখানি লইয়া প্রস্তুত হও, আমি আপিষ হইতে আসিতেছি" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সুধীরচন্দ্র যুবক, তাহার আশা মায়া-মরীচিকার ন্যায় কুহকিনী নহে; সে ধারণা করিল এই সাহেব হইতেই তাহাদের উন্নতি হইবে।

বিজন কুমারী বালিকা, তাহার এত সাধের বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হইল। তাহার ধূলাখেলা, পুতুল খেলা এই স্থানেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, এই স্থানেই সে জননীর কোল হইতে বিদায় লইয়াছে সেই বাড়ীর নিকট হইতে আজ বিদায় লইতে হইতেছে, হয়তো আর আসা হইবে কি না কে জানে!

বালিকা চিত্ত-দমন করিয়া বলিল, "দাদা, নলিনীর দশা কি হইবে?"

সুধীর যেন কত অন্যমনস্ক; সে তাহাদের কাকাতুয়ার লেজ ধরিয়া টানিয়া দিল। পাখীটা ক্যাঁ ক্যাঁ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কাকাতুয়া ক্ষণপরে বেদনা ভুলিয়া গিয়া বলিল, "সে ডুবিয়া মরুক।" সুধীরচন্দ্র হাসিয়া উঠিল।

বিজন কুমারী আবার বলিল, "একবার দেখা করিয়া যাইবে না। হয় তো তার কষ্ট হবে। সে তোমার কাছে বসে' থাকতে কত ভালবাসে, তার বাবা পছন্দ করে না তবু সে লুকিয়ে লুকিয়ে দিন রাত্তির আমাদের বাড়ী আসে।"

এবার সুধীর কথার জবাব দিল—"আমরা কি চিরকালের মত যাইতেছি? তাহার পিতা বড় লোক, বড় লোকের একমাত্র কন্যা আমাদের মত গরীবের জন্য ভাবিবে কেন!" এই কথা শুনিয়া বিজনকুমারী নিরুত্তর হইল। ভাবিল তাহার দাদা এখনও অক্ষয় বাবুর গর্ব্বিত বাক্য ভুলিতে পারে নাই। এই বলিয়া সে আপনার কক্ষে বাক্স ইত্যাদি গোচগাচ করিবার জন্য চলিয়া গেল।

পরক্ষণেই নলিনী আসিয়া উপস্থিত! সে পিছন দিক হইতে বিজনকুমারীর চক্ষু টিপিয়া ধরিল। সে গর্ব্বিত পিতার গর্ব্বিতা কন্যা নহে, বড় কোমল হৃদয়া, যে একটী ফুল, হিমালয়ের গৃহে সতীরও জন্ম হইয়াছিল।

"নলিনী, আমরা আজমীর হইতে চলিয়া যাইতেছি।"

"সে তো অনেক বার যাও!"

"না নলিনী এবার সত্য, আমরা কাশ্মীর যাইতেছি। বাবাকে বড় সাহেবের সঙ্গে বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য যাইতে হইবে"।

"তা তোমরা যাবে কেন?"

"আমরা আবার কোথায় থাকি!"

"কেন আমাদের ঘরে।"

"বাবা যে কতদিনে ফিরিবেন তার ঠিক নাই।"

"তবে কি তোমরা আর আসিবে না!"

"তাও ঠিক বলিতে পারি না।"

নলিনী এবার চুপ করিল। তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। ফুলের উপর শিশির সম্পাত!

বিজনকুমারী তাহাকে বুকে টানিয়া লইল। যেন দুঃখের উপর করুণা আসিয়া পতিত হইল। দুঃখের ভার লঘু করিতে পারে এক সমবেদনা, আর এক ক্রন্দন। তাহারা উভয়েই কাঁদিল। তাহারা সমবয়স্কা, খেলার সাথী আশৈশব সুখ দুঃখের সমভাগিনী, যেন এক বৃন্তে দুটী ফুল।

নলিনী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "বিজন—তবে কি তোমরা আর আসিবে না।" দ্বারদেশ হইতে কে যেন বলিল, "না নলিনী আমরা আর আসিব না" এ বজ্রসম্পাৎ কে করিল! সুধীরচন্দ্র, তুমি! যাহারা ফুটবলের চাঁই, তাহারা বড় একগুয়ে হয়। তাহারা হারিলেও হারিতে চায় না।

"যদি আর আসিবে না, তবে আমার পিতাকে ক্ষমা কর।"

তিনি আমাদের প্রণম্য গুরুজন, তাঁহার নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যাইব।.. চল নলিনী তোমাদের ঘরে যাই।"

বিজনকুমারী মনে করিল, পাষাণে প্রেম থাকে, সে প্রেম বড় গভীর, অতলস্পর্শ! সে প্রেম রৌদ্রে শুষ্ক হয় না, জলে ধুইয়া যায় না, আগুণ ও নিবিয়া যায়। তাহারা উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া গেল।

বিজনকুমারী দেখিল, একখানি সুসজ্জিত গাড়ীতে বড় সাহেব, এজেণ্ট ও তাহার পিতা আসিতেছেন। এখনও তাহার দাদা অক্ষয় বাবুর বাড়ী হইতে ফেরৎ আসে নাই। তাহার বাবা কি মনে করিবেন!

পরক্ষণেই অক্ষয় বাবু, নলিনী ও সুধীর উপস্থিত হইল। অক্ষয় বাবু কাশ্মীরের একজন প্রধান ব্যাঙ্কার গণ্যমাণ্য ব্যক্তি। তাঁহারই একমাত্র কন্যা নলিনী।

অক্ষয় বাবুকে দেখিয়া সর্ব্বেশ্বর বিস্মিত হইলেন। তিনি বড়লোক ধনমদ ছাড়া তাঁহার হৃদয়ে আর কিছুই নাই, কোনও কারণে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিলেন!

অক্ষয় বাবু তাহাকে বড় সাহেবের গাড়ীতে আসিতে দেখিয়া তাহার মানের গজকাটি অনেকটা নীচু হইয়া গেল।

তিনি সর্ব্বেশ্বরকে আপ্যায়িত করিবার মানসে এবং খুব সম্ভবতঃ কন্যা নলিনীর একান্ত অনুরোধে, বলিলেন, "ভাই, আমরা এক দেশের লোক। আমার বাড়ীতে তোমার পুত্র কন্যার থাকা সম্বন্ধে যদি কোন আপত্তি না থাকে, আমার বাড়ীতে তাহারা তোমার আসা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।" সর্ব্বেশ্বর বাবু সম্ভবতঃ মনে মনে একটু হাসিলেন। তাঁহার নিজের হৃদয় প্রেমপ্রবণ, আর অক্ষয়বাবু অর্থলালসায় নিজের কন্যাটিকে পর্য্যন্ত একবিন্দু ভালবাসা দিতে পারেন না, তাঁহার গৃহে নিজের পুত্র কন্যার স্থিতি! যাহা হউক তিনি মিষ্টবাক্যে অক্ষয় বাবুর এই করুণ অনুরোধ এড়াইলেন।

সর্ব্বেশ্বর পুত্র কন্যা সহ অন্য একটী গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ষ্টেশন অভিমুখে গমন করিলেন। বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য লছমন্ বাড়ীর জেম্মায় রহিল।

যতক্ষণ গাড়ী দেখা গেল, নলিনী অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। তারপর বসিয়া পড়িল। তাহার আজ সকলি শূন্য। কোথায় যাইবে কাহার সহিত হাসিয়া প্রাণ খুলিয়া কথা যাইবে। তাহার বেদনা তাহার পিতা বুঝিল না!

(৩)

যথা সময়ে সর্ব্বেশ্বর বড় সাহেবের সহিত কাশ্মীরে পঁহুছিলেন। পূর্ব্ব হইতে তাহাদের আলাহিদা বাসা ঠিক ছিল। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণী, কাশ্মরী দাসী রূপের ডালি লইয়া বাসা আলো করিয়া বসিল। সে রূপে জাফরাণ মিশান আছে, কঙ্কুমও কোন কোন জায়গায় মিশিয়াছে, টানা চোকের কজ্জলরেখা যেন আর অকটী চিত্রিতভ্রু। গঠনসৌষ্ঠবে যেন সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, কণ্ঠস্বর তেমনই মৃদু, যেন বিনয়ের পরাকাষ্ঠা!

সর্ব্বেশ্বর বড় সাহেবের সহিত রাজার প্রাসাদে গমন করিয়াছেন। সুধীর ও বিজনকুমারী তাহাদের নূতন বাসায় আসিয়াছিলেন। তাহারা পরিচারিকা ও ব্রাহ্মণীর রূপ দেখিয়া তাহাদের কোন কার্য্য করিবার জন্য বলিতে সাহস করিল না। এই রূপ লইয়া বাসন মাজিবে, ভাতের হাঁড়ি চড়াইবে! এর অপেক্ষা না খাওয়াই ভাল! সুধীরচন্দ্র নিজের ষ্টোভে Stoveএ চা প্রস্তত করিয়া পান করিলেন ও নগরের দৃশ্য দেখিতে বহির্গত হইলেন। তখন সবে-মাত্র সূর্য্য কোয়াসা ভেদ করিয়া বীরের মত গগনপথে অবতীর্ণ হইয়াছেন! পর্ব্বতের তুষার কণিকায় সূর্য্যের কিরণ বিন্দু সোণার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, হ্রদের অচঞ্চল বারি সেই কিরণ সম্পাতে চঞ্চল হইয়া উঠিল, ধীর তরঙ্গের

উপর সোণার মেখলা যেন শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। গোলাপ বনে কত গোলাপের কুঁড়ি কার যেন মৃদুস্পর্শে ফুটিয়া উঠিল, পথিপার্শ্বে কত সুন্দর পাখী সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণে জাগিয়া উঠিল, স্বরলহরীতে আকাশ ডুবিয়া গেল। গিরিগাত্রের ক্রমোন্নত স্তর মাথায় বরফ লইয়া পুষ্প স্তবকের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সূত্রাকারা নির্ঝরিণী সূর্য্যের কিরণ গায়ে মাখিয়া পর্ব্বত গাত্র হইতে উল্লাসে যেন ছুটিয়া যাইতে লাগিল। কালিদাসের শকুন্তলার ন্যায় ভারতের কাশ্মীর অনৈসর্গিক শোভাসম্পন্ন। সে দৃশ্য-সম্পদ মেঘদূতে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্ততঃ অনুমান করা যায়।

বিজনকুমারী তাহাদের বাসার জিনিস পত্র সব যথাস্থানে ঠিক করিয়া রাখিল। যেন আজমীরের নিজের ঘর। যে বালিকা কাজ করিতে জানে, সুদূর প্রবাসেও সে শীঘ্রই সকলকে আপনার করিয়া লয়।

বিজনকুমারী স্নানের ঘরে যাইয়া দেখে স্নানের গরম জল, মাখিবার জন্য সুগন্ধি তৈল, আপনার নূতন কোঁচান কাপড়, সমস্ত প্রস্তুত। ঠিক যেন কলে কাজ হইতেছে। সে স্নান করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে, টেবিলের উপর নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফলমূল্য একটী রৌপ্য থালে সাজান আছে, পার্শ্বে পরিচারিকা আজ্ঞাপেক্ষায় দণ্ডায়মানা আছে।

পরিচারিকার বয়স অল্প, পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী, মুখে মৃদু হাসি, অথচ প্রগল্‌ভা নহে।

বিজনকুমারীকে সে বলিল, "মায়িজী, আহার করুন।" ব্রাহ্মণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কি রাঁধিতে হইবে, আজ্ঞা করুণ।" বিজনকুমারী একটু বিব্রত হইল। এরূপ নবাবী কায়দার সে অভ্যস্ত নহে। এইরূপ ভাবে দিন কাটাইতে হইলে তাহার বড়ই কষ্ট হইবে, অনুভব করিল।

সে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের নাম কি?"

ব্রাহ্মণী উত্তর করিল, আমার নাম "মণি"

পরিচারিকা উত্তর করিল, আমার নাম "জোস্‌নি।"

তোমাদের বিবাহ হইয়াছে?

উভয়েই উত্তর করিল—"না।"

বিজনকুমারী বিস্মিত হইল। মনির বয়স কুড়ি একুশের কম নয়, জোসনি দুই এক বৎসরের ছোট হইবে।

মণি উত্তর করিল, "মায়িজী আমাদের দেশে টাকা না থাকিলে কেহ বিবাহ

করে না, সেই জন্য কিছু সঞ্চয় করিবার জন্য আমরা সকলেই ব্যস্ত। এখানে কেহ বসিয়া থাকে না।" জোস্‌নি ভাবিল, এত কথা কেহ তাহাদের জিজ্ঞাসা করে নাই। অন্যান্য বাঙ্গালী বাবুদের ঘরে কেবল হুকুম তামিল করিয়াছে, এমন করিয়া কেহ তাহাদের পরিচয় লয় নাই। তাহার হাল্‌কা প্রাণে একটু সাহস ঢুকিল, সে একটু ইতঃস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মায়িজী আপনার বিবাহ হইয়াছে?"

"না জোস্‌নী। তোমাদের মতন আমাদেরও কিছু সঞ্চয় নাই। আমার বাবা চাকুরী করিয়া আমাদের প্রতিপালন করেন।"

মণি ও জোস্‌নি উভয়ে অবাক হইল। এত মিষ্ট সরল কথা তাহারা কোন বাঙ্গালীর নিকট শুনে নাই। তাহারা বিজনকুমারীতে দেখিল, সরলতা ও নিরভিমান, রৌদ্র ও ছায়ার ন্যায় মিশিয়াছে। সে দেহলতার সংযতভাব চরিত্রের পুষ্টিসাধন করিতেছে, সৌন্দর্য্যের কণিকা ফুলের কুঁড়ির মত উঁকি মারিতেছে, বিনয়ের মাধুর্য্য সমস্ত শরীরটাকে অবনত রাখিয়াছে।"

তাহারা উভয়েই মোহিত হইল। উভয়েই আকৃষ্ট হইল।

বিজনকুমারী তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা খাইয়াছ? জোসনি এবার হাসিল। "চাকরাণি মনিবের আগে কি খায় মায়িজী?"

তবে এস, এক সঙ্গে খাই। এই বলিয়া বিজনকুমারী থালা হইতে খাবার দ্রব্যগুলি তিন জনে ভাগ করিয়া লইল।

এরূপ কার্য্য বাবুদের পক্ষে নূতন বটে, তবে বালিকার পক্ষে নূতন নহে। সে শৈশব হইতে খেলাসাথের ভাত তরকারী সঙ্গিনীদের সহিত ভাগ করিয়া খায়!

এক দিনের মধ্যে মণি ও জোস্‌নি আপনার হইয়া উঠিল। বিজনকুমারী তো তাহাই চায়। নহিলে এ দীর্ঘ প্রবাস কাটিবে কিরূপে?

তাহারা বলিল, মহারাজার আদেশে সর্ব্বেশ্বর ও তাহার পুত্র কন্যার জন্য এই সুন্দর বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বেশ্বর ব্রাহ্মণ, মহারাজা ক্ষত্রিয়। মহারাজা প্রতিদিন একটী সিধা ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। তাহাতেই তাহাদের খরচ বাদে অনেক জিনিস মজুদ থাকিত। সেই সমস্ত বিজনকুমারী গরীব কাঙ্গালদিগের ভিতর বিতরণ করিত। বিজনকুমারী অল্পদিনের মধ্যে সেই অঞ্চলে দানশীলা রমণী বলিয়া পরিচিত হইল। পিতা সর্ব্বেশ্বর সমস্তই শুনিলেন, সুধীরও শুনিল। তাহারা নীরব রহিল। সেই নীরবতায় তাহাদের

দৈনিক মঙ্গল প্রার্থনা নিহিত থাকিত। প্রায় ছয় মাস এইরূপে কাটিল। সর্ব্বেশ্বরের কার্য্যও প্রায় শেষ হইল। মহারাজা সর্ব্বেশ্বরের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, সাধুতা ও ভগবৎ নিষ্ঠা দেখিয়া মোহিত হইলেন। ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণকে তাহার কন্যার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ অনেক মূল্যবান জিনিষ দান করিলেন। সর্ব্বেশ্বর কি কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন, তাহা কেহ জানিল না।

ফরেন আপিসের কার্য্য, তাহা অপ্রকাশ রহিল, এমন কি সুধীর ও বিজন-কুমারীও জানিল না। সুতরাং আমরা জানিব কিরূপে!

একদিন মাধ্যাহ্নিক আহারের পর সর্ব্বেশ্বর অক্ষয় বাবুর নিকট হইতে এক টেলিগ্রাফ পাইয়া বড়ই বিব্রত হইলেন। সুধীর তখন বাড়ীতে ছিল না, বিজনকুমারী ভাত খাইয়া জোস্‌নী ও মনির সহিত গল্প করিতেছিল। সর্ব্বেশ্বর টেলিগ্রাফ হস্তে বিজনকুমারীর কক্ষে উপস্থিত হইলেন—তাঁহার অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়ন দেখিয়া বিজনকুমারী তাড়াতাড়ি পিতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কিসের টেলিগ্রাফ বাবা, কোন অশুভ সংবাদ নহে তো? "বড়ই অশুভ মা, নলিনী মৃত্যু-শয্যায়। সে তোমাদের দেখিতে চাহিয়াছে।" এই বলিয়া সর্ব্বেশ্বর চক্ষু মুছিলেন।

এই কথা শুনিয়া বিজনকুমারী বসিয়া পড়িল! তাহার সুন্দর বদনের উপর অশ্রু ঝরিতে লাগিল। হায় নলিনি, আমার খেলার সাথী, শৈশব সঙ্গিনী, সমদুঃখভাগিনী, আমায় ফাঁকি দিয়া যাইবে—সে বড় আঘাত পাইয়াছে, এই ছয়মাস কাল অজ্ঞাত বাস তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে, সে বুঝি আর সহিতে পারে না! হায় রে পিতার অভিমান! হায় রে ধনগর্ব্বিত পিতা নন্দনেশ্বর ধনরত্ন, তোমার একমাত্র কন্যা মহাপ্রস্থানের পথে দাঁড়াইয়াছে, তোমার অতুল সম্পত্তি বোধ হয় সে পথ রোধ করিতে পারিবে না!

বড় সাহেবের অনুমতি লইয়া সুধীর, বিজনকুমারী ও জোস্‌নী সেইদিনই আজমীর যাত্রা করিল। সর্ব্বেশ্বর কার্য্য সম্পূর্ণ শেষ না হইলে যাইতে পারিবেন না। সুধীরের টেলিগ্রাফের উত্তরের অপেক্ষায় তিনি ব্যথিত হৃদয়ে সেই সুদূর প্রবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সুধীর প্রভৃতি যখন আজমীরে পঁহুছিল, তখন সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। সূর্য্যের শেষ লোহিতরাগ ঊর্দ্ধগগনে বিসর্পিত হইয়া হ্রদের গায়ে পর্ব্বতের শিখরচূড়ায় উন্নতশীর্ষ বৃক্ষের অগ্রভাগে, ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নলিনীর গৃহের উন্মুক্ত বাতায়নে সেই মৃদু রশ্মি প্রবেশ করিয়া তাহার মৃত্যু-কাতরবদনে পড়িয়া

তাহাকে যেন ঘুম পাড়াইতেছিল। এমন সময়ে সুধীর ও বিজনকুমারী সে কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহারা দেখিল, পালঙ্কশায়িতা নলিনী জ্যোৎস্নালতার ন্যায় এলাইয়া পড়িয়াছে, নয়ন মুদ্রিত, হস্তদ্বয় বুকের উপর স্থাপিত। বদন পাণ্ডুর, চক্ষুনিম্নে কালিমার দাগ, শরীর বিশীর্ণ, ওষ্ঠদ্বয় নীলিমাব্যাপ্ত, বক্ষঃস্থল ঈষৎ কম্পিত, নয়নদ্বয় ঈষন্নিমিলিত।

তাহাদিগকে দেখিয়া অক্ষয় বাবু ও তাঁহার পত্নী কাঁদিয়া উঠিলেন। সেই শব্দে নলিনী চক্ষু চাহিয়া দেখিল, তাহার বহুকালের আপনার লোকদুটী তাহার পালঙ্কে বসিয়া তাহার জন্য কাঁদিতেছে। তাহাদের সকলেরই হৃদয়ের শুভ কামনা তাহাকে যেন ঘেরিয়া রাখিতে চাহিতেছে, নলিনী আবার চক্ষু মুদিল।

বিজনকুমারী কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "নলিনি"—নলিনী বেশ পরিষ্কার স্বরে উত্তর দিল, "বিজন, তোমরা এসেছ, তবে কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলে! বাবাকে তোমরা ক্ষমা করিয়াছিলে, তবে কেন আমায় ক্ষমা করিয়া বুকে লইলে না! আমার মৃত্যু কেবল তোমাদের না দেখিতে পাইয়া—ওঃ কত দিন—"

সুধীর তাহার শীর্ণ হস্তদুটী বুকে লইয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "নলিনি, আমাদের ক্ষমা কর।"

নলিনী, ভাঙ্গাগলায় বলিল, "সুধীর! ক্ষমা!—আজ শুভ ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। ঐ দেখ আমার থালিতে ধানদূর্ব্বা, চন্দন, পান মিষ্টান্ন, তোমার জন্য। সে থালি কেহ আসিয়া লয় নাই। ঐ দেখ দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে; এই দেখ আমার ক্ষীণ আকাঙ্খা"—এই বলিয়া সে সুধীরের হস্ত দুটী নিজের মস্তকোপরি স্থাপিত করিল। প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল।

সুধীরের টেলিগ্রাম পাইয়া সর্ব্বেশ্বর আজমীরে আসিলেন। তখন নলিনীর চিতা নির্ব্বাপিত হইয়াছে, সুধু ভস্মরাশি!

শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ।
রাইপুর।

ব্রজের দুলাল

১

কখন্ এসেছ বনভূমে তুমি
সাঙ্গ হল কি খেলা ?
কদম্ব-মূলে বসি নির্জ্জনে,
বাজায়েছ বাঁশী আপনার মনে,
সুন্দর, এবে ফিরিতে ভবনে
করিয়োনা অবহেলা।

২

সারা দিন তুমি পথের ধূলায়
অঙ্গ করেছ কাল,
হারায়েছ দেখি নব আভরণ,
কণ্ঠের হার, কনকরতন,
কানে কুণ্ডল, বিবিধ ভূষণ,
ছিঁড়িয়াছ বনমাল।

৩

তিলক তোমার মুছে গেছে ভালে
আঁকা ছিল চন্দনে,
চোখে মুখে তব পড়ে কুন্তল,
হে চিরন্তন, ওগো চঞ্চল,
ক্ষত করিয়াছ দুটী পদতল
ছুটাছুটী করি বনে।

৪

সঙ্গে তোমার এসেছিল যারা
সকলে গিয়াছে চলে,
চেয়ে দেখ দূরে, নীরব চরণে
সন্ধ্যা নেমেছে ধূম্রবসনে,
পথিকেরা সব ফিরিছে ভবনে
আনন্দ কোলাহলে।

৫

মাঠ পারে আর নাহি কলরব
ধেনুগুলি গোঠে ফিরে,
ছুটে দিকে দিকে দিয়ে আনন্দ,
বিকশিত বন-ফুলের গন্ধ,
উঠে ক্ষণে ক্ষণে গানের ছন্দ
যমুনার কালনীরে।

৬

জান কি শোভন, নয়নানন্দ,
এতক্ষণ তব তরে,
মন্দির দ্বারে, যত ব্রজনারী,
দীপ করে সুখে মঙ্গল থারি,
যশোদার চোখে ঝরিতেছে বারি
চেয়ে চেয়ে পথ'পরে।

৭

ক্ষণেক তোমারে বুকে নেবে সে যে
আদরে অধর চুমি,
লুকায়ে রেখেছে সে অপরিমেয়,
স্বচ্ছ শীতল অকপট স্নেহ,
মুছাবে তোমার ধূলামাখা দেহ,
ঘরে ফিরে গেলে তুমি।

শ্রীপ্রভাসকুমার সেন,—খড়দহ।

স্বামী সচ্চিদানন্দ

কয়েকজন বন্ধুর মুখে স্বামী সচ্চিদানন্দের কথা প্রথম শুনি। সে দিন কলিকাতার এক ধর্ম্মসভায় আমাদিগের বক্তৃতা হইবে, সভাস্থলে অনেক লোক সমাগম হইয়াছে, আমরা কয়েকটি বন্ধুর সহিত সভাস্থলের নিকটে একটি কক্ষে বসিয়াছিলাম। এমন সময়ে কয়েকটি বন্ধু আসিয়া বলিলেন "স্বামী সচ্চিদানন্দ আসিয়াছেন।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "তিনি কে?" একজন বন্ধু উত্তর করিলেন, "তিনি দশ বার বৎসর আমেরিকায় ছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের একজন শিষ্য! তিনি নাস্তিকতা প্রচার করিবার জন্য আমেরিকা হইতে এ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।" আমরা বিস্মিত হইয়া গেলাম, বলিলাম, "স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য নাস্তিক্যবাদ প্রচার করিতেছেন?" বন্ধুটি বলিলেন "ঠিক নাস্তিক্যবাদ নহে, তবে তিনি বলেন যে ইহজীবনে তোমরা এত অভাবগ্রস্ত, পতিত ও অধম, তোমরা কেবল ভগবান, ভগবান বলিয়া মাতামাতি করিয়া আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছ!" আমরা বলিলাম "এ কথা খুব অসঙ্গত নহে, এবং ইহার বীজ স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশের মধ্যে আছে, এবং ইহার অনেক কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই বোধ হয় সকলেই অনুমোদন করিবেন। কেবল মুখের কথায় ভগবান, ভগবান করিলে কি হইবে, তাঁহাকে জীবনে উপলব্ধি করা চাই। এ তো সত্য কথা, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এ কথা কে অস্বীকার করিবে। আমরা গোপীভাব সম্বন্ধে আলোচনাকালে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, বৈষ্ণব ধর্ম্ম দুর্ব্বলের ধর্ম্ম নহে। অনেকে এইরূপ মনে করেন বটে, এবং এরূপ মনে করার কারণও যে নাই তাহা নহে, কিন্তু শাস্ত্র যাহা বলেন তাহা ঠিক গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম, আলস্য বা কর্ম্মবিমুখতার ধর্ম্ম নহে। ইহাতে দেশহিতৈষণা ও সমাজহিতৈষণার বিশিষ্ট স্থান আছে, আমরা এই ভাবেই 'ভাগবত ধর্ম্ম' বুঝি এবং এই ভাবে অপরকে বুঝাইবারও চেষ্টা করি!" অন্য একজন বন্ধু বলিলেন "স্বামী সচ্চিদানন্দ ঐহিকের ভোগকে পরমার্থ বলিয়া মনে করেন।" আমরা বলিলাম "তবে বোধ হয় তিনি "Pragmatism" প্রচার করিতে আসিয়াছেন, জার্ম্মানির বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক অয়কেন্ এ কালের দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহ সমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে আমেরিকার Pragmatism জার্ম্মানদেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। জার্ম্মানদেশে

যথন Pragmatismএর স্থান হয় নাই, তখন ভারতবর্ষে স্থানহইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তবে Pragmatism প্রচার হইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের কিছু লাভ হইতে পারে; সুতরাং যদি কেহ সরলচিত্তে দেশহিতের জন্য Pragmatism প্রচার করেন তাহাতে আমাদের আনন্দ বই নিরানন্দ নাই। আমরা একটা "Safe Thoelogy"র মধ্যে নিদ্রাসুখ অনুভব করার পক্ষপাতী নহি।"

সে দিন স্বামী সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত শুনিলাল। সে দিন লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়, শুনিলাম, স্বামী সচ্চিদানন্দ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। যাহা হউক বহুলোকের জনতার মধ্যে আমরা তাঁহাকে লক্ষ্য করি নাই।

পরদিন সন্ধ্যার সময় একজন বন্ধু আসিয়া বলিলেন "স্বামী সচ্চিদানন্দ আপনার সহিত দেখা করিয়া আলাপ করিতে চাহেন, কখন আপনার সময় হইব?" আমরা বলিলাম "আগামী কল্য বেলা ১২ টার সময় যদি তিনি আমার বাসায় দয়া করিয়া আসেন, তাহা হইলে দুই ঘণ্টাকাল আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারি।"

ঘটনাচক্রে সেই দিন রাত্রিতে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও আমাদের বাল্যবন্ধু জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে স্বামী সচ্চিদানন্দের কথায় বলায় তিনি একেবারে সরাসরি বিচার করিয়া রায় দিলেন যে তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় এ কথাও তিনি বলিয়াছিলেন যে আমেরিকার পার্থিব বৈভব দর্শন করিয়া তাঁহার ভোগাসক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; গুরুদেবের উপদিষ্ট নিবৃত্তি মার্গের মহিমা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্ব হইতে স্বামী সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা শুনিলাম বটে, কিন্তু কোনও মত গঠন করি নাই। পর দিন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় স্বামী সচ্চিদানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাঁহার জীবনের কয়েকটি কথা ও তাঁহার মত বর্ণনা করিতে লাগিলেন, আমরা শ্রদ্ধান্বিত ভাবে তাঁহার কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। আমাদের বেশ ভাল লাগিতে লাগিল, কথাগুলি বলিবার সময় তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল!

তিনি যাহা প্রচার করিতেছেন তাহা যে তাঁহার সরল ও আন্তরিক মত তাহাতে আমাদের অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

স্বামী সচ্চিদানন্দ তাঁহার জীবনের কথা আমাদের কিছুই বলেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য হওয়ার পর হইতে বর্ণনা করেন।

আমরা স্বামীজিকে বলিলাম যে আপনার মতের যাহা সার কথা তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ নাই। তবে Details লইয়া অর্থাৎ এই মতকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার সময়, কিছু মতভেদ হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক আপনার মতের সহিত আমাদের সাহুভূতি আছে, এবং আমরা ইচ্ছা করি আপনার মত প্রচারিত হউক। আমাদের এরূপ কথা বলার কারণ গুলিও স্বামীজিকে বলিলাম। তাঁহাকে বলিলাম "লোকে আপনাকে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না। একজন বলিল আপনি নাস্তিক। কিন্তু আমি দেখিতেছি আপনি নাস্তিক নহেন। আপনি ঈশ্বর মানেন এবং ঈশ্বরের কৃপা অহেতুকী, তাহাও জানেন, সাধনার দ্বারা নহে ভগবানের কৃপা দ্বারা, তাঁহাকে পাওয়া যাইবে ইহাও আপনি জানেন। সাধনা নিরর্থক তাহাও আপনি বলেন না। তাঁহার নাম-গ্রহণ, লীলা শ্রবণ, পূজা, বন্দনা, এ সকলও আপনি আবশ্যক বলিতেছেন, আপনি সাধনগর্ব্ব ছাড়িতে বলিতেছেন, অর্থাৎ সাধনা দ্বারা ভগবানকে লাভ করিব এই অভিমান পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন, আর অপ্রত্যক্ষের জন্য প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করিতে নিষেধ করিতেছেন, পরের সেবা করারও ত্যাগের প্রয়োজনও আপনার মতে আছে, একটু প্রভেদ হয় ত আপনার সঙ্গে হইবে, Stand point লইয়া, আর প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা লইয়া। কিন্তু সে কথার প্রয়োজন কি? আপনার মত প্রচারিত হউক।

আমাদের দেশে মত প্রচারের খুব আবশ্যকতা আছে, আমরা ঈশ্বরবাদ প্রচার করি, কিন্তু দেশে একদল লোক সত্য সত্যই যদি ব্রাডল বা কোঁৎএর বা মিলএর শিষ্য হয় তাহা হইলে আমরা খুব আনন্দিত হইব। কিন্তু সত্য করিয়া হওয়া চাই। আপনি অনেকদিন বিদেশে ছিলেন, আপনার কর্ম্মজীবন আমেরিকায় কাটিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা এই যে আমাদের কর্ত্তব্যসূত্র বড়ই অনির্দ্দিষ্ট, আমরা এখন ঘূর্ণি হওয়ায় বাস করিতেছি। মানুষ যে মত লইবে লউক কিন্তু একটু গম্ভীর চিত্ত ও Consistent (সমঞ্জসীভূত) হউক ইহাই প্রয়োজন। আপনি যদি কতকগুলি লোককে ভাবাইতে পারেন তাহা হইলে অনেক কাজ হইবে। আমাদের সম্মুখে কতকগুলি পথ খোলা আছে, অন্ধভাবে প্রায় সকলেই কোন একটা পথ লইয়া নিরাপদে জীবনের দিন কয়টা খাইয়া পরিয়া ও ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিতে চাই। এ

অবস্থায় যিনি দেশকে ভাবাইবেন, স্বার্থের জন্য নহে প্রাণের ব্যাকুলতায় ভাবাইবার জন্য খাটিবেন, তাঁহারই সহিত সহানুভূতি আছে।

স্বামীজিকে অনুরোধ করিলাম যে আপনি যাহা বলিলেন তাহা আপনি বাঙ্গালায় লিখিয়া যদ্যপি আমায় দিতে পারেন তাহা হইলে আমরা আমাদের কাগজে তাহা প্রকাশ করি। কয়েক দিন পরে স্বামীজি আসিয়া বাঙ্গালা প্রবন্ধটি দিয়া গেলেন।

স্বামিজীর জীবনের প্রথম অংশের কথা তিনি আমাদের বলেন নাই, আমরাও কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই, তবে একদিন তিনি বলিয়া যান যে আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজনের সহিত তাঁহার বাল্যকাল হইতে পরিচয় আছে, তিনি বারাসত স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে দেখিলাম "কুশদহ" পত্রিকায় স্বামী সচ্চিদানন্দের প্রথম জীবনের কথা বাহির হইয়াছে, আমরা ইহা পাঠ করিয়া স্বামীজির প্রতি আরও শ্রদ্ধাযুক্ত হইলাম। তাঁহার প্রথম জীবনের কথা নিম্নে পুনর্মুদ্রিত হইল।

"স্বামী সচ্চিদানন্দের পূর্ব্বনাম শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায়। পিতার নাম স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সাবডিভিসন বনগ্রামের অন্তর্গত চাঁপাবাড়িয়া গ্রাম, মতিলালের জন্মস্থান। বঙ্গাব্দ ১২৭৮, বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জুলাই ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। স্কুল কলেজের শিক্ষায় ইনি একজন ভাল ছেলে ছিলেন। প্রথমে বারাশাত স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় ২০৲ টাকা, এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ফাষ্টআর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে ঐ কলেজ হইতে বি-এ, ও সায়েন্সে ডবল অনারে পাশ হন। ইনি এম-এ ও পড়িয়াছিলেন কিন্তু পাশ হন নাই, এবং ল পড়িয়াও উকীল হন নাই। যাহা হউক ইহাঁর উচ্চ শিক্ষার অবস্থাতেই মনে ধর্ম্মচিন্তার উদয় হয়। তৎপরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে ইনি প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করেন।

ইতিপূর্ব্বে ইনি গোবরডাঙ্গা গ্রামের স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার একটি মাত্র পুত্রের জন্ম হয়। বাহ্যভাবে তিনি স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ও প্রচার-ব্রত গ্রহণ করেন।

প্রথমতঃ ইনি সাড়েপাঁচ বৎসরকাল ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তৎপরে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আমেরিকায় লস্‌এঞ্জিওনিসে গমন করিয়া রামকৃষ্ণ মিসনের অধীনে থাকিয়া তিন বৎসর-কাল ধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে মিসনের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় স্বাধীনভাবে আর ছয় বৎসর কাল ঐ স্থানেই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি ইনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি ইচ্ছা করিতেছেন যে, ভারতবর্ষেই তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিবেন।

ইহার পিতৃ নিবাস যশোহর জেলার দেঁতো কুমুরে গ্রামে। তথা হইতে তিনি বালিয়ানি গ্রামে মাতুলালয়ে আসিয়া বাস করেন। মতিলালের মাতুলালয় গোবরডাঙ্গার নিকট ইছাপুর গ্রামে। তাহার মাতা নিস্তারিণী দেবী ও মাতামহ স্বর্গীয় মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

এমন ধর্ম্মানুরাগী পুরুষ আমাদের কুশদহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়।”

নিম্নে স্বামী সচ্চিদানন্দের স্বলিখিত প্রার্থনা মুদ্রিত হইল।

সানুনয় প্রার্থনা।

মহোদয়গণ,

আমি আপনাদিগকে আমার প্রাণের দুই একটী সত্য কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সত্য কথা বলিবার ইচ্ছা নিশ্চয় সতত শুভ। হয়ত আমার কাছে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, আপনাদের কাছে তাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেও পারে, না হইতেও পারে। কিন্তু আমরা পরস্পরকে নিজ প্রাণপ্রতীত সত্য বলিয়া ও জানাইয়াই চিন্তাজগতে অগ্রসর হই। পাঠক-দিগের মধ্যে যাঁহার এই পত্রে কথিত সত্য ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হইবে, তাঁহার সহানুভূতি আমার একান্ত প্রার্থনীয়। যাঁহার কাছে উহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে, তাঁহার কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা, আমি যেন আমাদের ঐ মতভেদের জন্য তাঁহার অপ্রীতিভাজন না হই। তিনিও যেন আমার অপ্রীতি-ভাজন না হন। অতি সদ্ভাবে পরস্পর প্রীতিসহকারে সত্যানুসন্ধান লক্ষ্য, ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে।

প্রথমে আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আমি প্রায় ১৫ বৎসর হইতে চলিল সন্ন্যাসী হইয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে সন্ন্যাস দেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমি ৬ বৎসর আন্দাজ ভারতবর্ষে থাকিয়া রামকৃষ্ণ মিসনের কাজ করি। তারপর রামকৃষ্ণ মিশন আমাকে কাজ করিতে আমেরিকায় পাঠান। আমেরিকায় আমি ৩ বৎসর যাবৎ—রামকৃষ্ণ মিসনের কাজ করি। তাহার পর মিসনের সহিত মতভেদ হওয়ায় আমি মিসনের কাজ ত্যাগ করিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতে থাকি। ৬ বৎসর যাবৎ ঐ রূপ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করি। এক্ষণে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। ইচ্ছা আপনাদের সকলের সঙ্গে মিশিয়া এ দেশে কাজ করি।

রামকৃষ্ণ মিসনের সহিত আমার মতভেদের কারণ কি, এই প্রশ্নের উত্তর দিলে আমার বক্তব্য কি, তাহা বলা হইবে ও এ দেশে কি কাজ করা আমার উদ্দেশ্য তাহাও ক্রমে জানা যাইবে। রামকৃষ্ণ মিসনের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করার কিছু দিন পূর্ব্বে আমার এই সত্যটী অনুভূত হয় যে ভগবান্ আছেন ইহা ঠিক, ভগবল্লাভ বলিয়া যে একটী ব্যাপার আমাদের দেশে ও হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখ আছে. তাহাও ঠিক, কিন্তু ঐ ভগবল্লাভ ভগবানের কৃপা ছাড়া হয় না। ভগবানের কৃপায় ভগবান্ লাভ হয়। ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে কখনও ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ভগবান্ যেন বলিতেছেন, "হে মানব, আমি তোকে পুরুষকার দিয়াছি। সে পুরুষকার অবলম্বন করে তুই আর সব লাভ করিতে পারিস্; কেবল আমাকে লাভ করিতে পারিস্ না। আমার কৃপায় কেবল আমাকে পাওয়া যায়।" যখন এই সত্যটী অনুভূত হইল, তখন দেখিলাম যে রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি পুরুষকার সম্ভূত যে সমস্ত সাধন-পন্থা আমি এতদিন যাবৎ প্রচার করিয়া আসিয়াছি সে সমস্ত অসত্য। বুঝিলাম যে সাধনের দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ভগবৎলাভের জন্য সাধন একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। রামকৃষ্ণ মিসন ভগবৎলাভের উপায় স্বরূপ নানাবিধ সাধন শিক্ষা দেন। দেখিলাম ভগবৎলাভের জন্য সাধন বৃথা ও ভ্রম। এই মতভেদের জন্য আমি রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র কাজ করিতে থাকি। কেবল রামকৃষ্ণ মিশন কেন, আমাদের দেশের পুরাতন আচার্য্যেরাও ভগবৎলাভের জন্য সাধন উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদ্, গীতা, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি হিন্দুগ্রন্থ কোন না কোন সাধন উপদেশ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বাপর আচার্য্যেরাও ভগবৎলাভের জন্য কোন না কোন সাধন উপদেশ করিতেছেন। আমি ঐ সমস্ত পূজ্যপাদ আচার্য্যদিগের

পদরেণু হইতেও অতি হীন। কিন্তু তথাপি প্রাণের সত্য কথা বলিতে হইলে বলিব যে এই যে তাঁহাদের শিক্ষা যে "সাধন করিয়া ভগবান্ লাভ হয়।" এই শিক্ষা অসত্য ও ভুল।

সাধন করিয়া ভগবান্ লাভ হয় না। ভগবৎকৃপা হি কেবলা। কেবল ভগবানের কৃপায় ভগবান্ লাভ হয়। ভগবান্ লাভের অন্য কোনও পথ নাই।

সে কৃপা অহেতুকা, অমূল্য, অনুপম, নিরপেক্ষ। ভগবান্ স্বেচ্ছাবিলাসে তাঁর যার উপর খুসী তার উপর কৃপা বিতরণ করেন। সে কৃপা বিতরণের হেতু নাই। সে কৃপা অমূল্য। মানব পুরুষকার অবলম্বন করিয়া যতই সাধন করুন না কেন, ভগবৎকৃপা সে সাধনের ফলস্বরূপ কখনও আসিবে না। সাধনমূল্যে ভগবদ্‌কৃপা কেনা যায় না। সে কৃপা অনুপম? যাহার উপর ভগবানের কৃপা হয়, ভগবান্ তাহাকে সরা সরা সুখ রাশি মুখে তুলে খেতে দেন, সে ভাগ্যবানের আর নড়ে চড়ে, খেটে খুটে, কিছু করে টরে কৃপা আন্‌তে হয় না। অযাচিত বারিসিঞ্চন লাভে সে কৃতকৃতার্থ হয়। সে কৃপা নিরপেক্ষ। অর্থাৎ সে কৃপা তোমার আমার সাধনার অপেক্ষা রাখে না। আমি মহাধ্যানীযোগী, সাধন করিয়াছি বলিয়া আমার উপর সে কৃপা হইবে, আর তুমি পামর ভগবানের জন্য কিছুই সাধন কর নাই বলিয়া তোমার উপর সে কৃপা হইবে না, এ কথা ভগবদ্‌কৃপার উপর চলে না।

মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি? পুরুষকারের দ্বারা যে উদ্দেশ্য লব্ধ হয়, তাহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে। মানব যা নিজের চেষ্টায় লাভ করিতে পারে। যে জিনিস মানব নিজের চেষ্টায় লাভ করিতে অক্ষম, সে জিনিস যে কখনও তাহার জীবনোদ্দেশ্য হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মানব কখনও নিজের চেষ্টায় ভগবান্ লাভ করিতে পারে না। মানুষের নিজের চেষ্টায় তাহার কখনও ভগবদ্‌লাভ হয় না। সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে ভগবদ্‌লাভ কখনও মানবজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

মানবজীবনের উদ্দেশ্য তবে কি? মানবজীবনের উদ্দেশ্য তাহাই হইতে পারে, যাহা মানব স্বচেষ্টায় লাভ করিতে সক্ষম। সে উদ্দেশ্য কি? উত্তর—সে উদ্দেশ্য "মনুষ্য জীবন সুখভোগ।" আমরা মানুষ। মনুষ্যজীবন পাইয়াছি। "এই মনুষ্যজীবন সুখে ভোগ কর" ইহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। এ জগতে দুঃখ আছে সত্য। যতদুর সম্ভব দুঃখের হাত হইতে নিজেকে বাঁচান, এবং সুখে মনুষ্যজীবন ভোগ করা ইহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

"মনুষ্যজীবন সুখভোগ" এ কথাটী বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত। এ কথাটার বিশদ অর্থ কি? আমরা মানুষ। সুখভোগের জন্য ভগবান্ আমাদিগকে অষ্ট ইন্দ্রিয় দিয়াছেন। চক্ষুদ্বারা সুন্দর জিনিস দেখি। কর্ণের দ্বারা মিষ্টশব্দ শুনি! নাসিকা দ্বারা সুঘ্রাণ গ্রহণ করি। জিহ্বা দ্বারা উপাদেয় খাদ্য আহার করি। ত্বক্ দ্বারা কোমল স্পর্শ অনুভব করি। কামেন্দ্রিয় দ্বারা সহবাস সুখ লাভ করি। মনের দ্বারা সুচিন্তা করিয়া সুখ পাই। হৃদয়ের দ্বারা আমার মাতা, আমার পিতা, আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ভাই, বন্ধু, প্রভৃতি হৃদয়াশ্রয় প্রীতিসম্পর্কে সুখ অনুভব করি। ভগবান্ আমাদিগকে সুখভোগের জন্য এই চক্ষুকর্ণনাসিকাজিহ্বাত্বক্কামেন্দ্রিয় মনহৃদয় অষ্ট ইন্দ্রিয় দিয়াছেন। দুঃখের হাত হইতে নিজেকে যতদূর সম্ভব বাঁচাইয়া ঐ অষ্ট ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখভোগ করাকে বলিতেছি "মনুষ্যজীবন-সুখভোগ।" জীবনের উদ্দেশ্য এই "মনুষ্যজীবনসুখভোগ"।

এই সুখভোগরূপ জীবনোদ্দেশ্যের ভিতর কর্ণদ্বারা ভগবানের অতি মধুর নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ, মনের উপর প্রীতি রাখা, আসিবে। ইন্দ্রিয়দ্বারা পুরুষকার অবলম্বন করিয়া আমরা যতটুকু ভগবৎভাব জীবনে গঠন করিতে পারি, তাহা নিশ্চয় করিব। সাবধান থাকি যেন পুরুষকার অবলম্বন করিয়া ভগবান্ লাভের চেষ্টা না করি।

ইন্দ্রিয়দ্বারা সুখভোগ মানবজীবনের উদ্দেশ্য। তাই বলিয়া যে স্বেচ্ছাচারে সুখভোগ করিতে হইবে তা কখনই নয়। সৎ ভাবে, ঠিক্ ভাবে, সর্ব্বেন্দ্রিয় সামঞ্জস্যভাবে সুখভোগ করিতে হইবে। এ সৎভাব, ঠিক্ভাব ও সামঞ্জস্য ভাব কি, তা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেক বুদ্ধি সহায়ে সিদ্ধান্ত করিয়া লউন। আমার বক্তব্য এই যে ভগবান্ লাভের জন্য চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করুন। সৎভাবে, ঠিক্ভাবে, সর্ব্বেন্দ্রিয় সামঞ্জস্যভাবে, অষ্টেন্দ্রিয় দ্বারা মনুষ্যজীবনসুখ ভোগ করুন। ত্যাগ জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ভোগই জীবনের উদ্দেশ্য।

নিজে মনুষ্যজীবনসুখ ভোগ করুন। অপরকে মনুষ্যজীবনসুখভোগে সহায়তা করুন। আর যাহাতে এই জগৎ মনুষ্যজীবনসুখভোগের উপযোগী স্থল হয় ও যাহাতে এই জগতে মনুষ্যজীবনসুখভোগের সর্ব্বতোভাবে সুবিধা হয়, তাহা করিতে চেষ্টা করুন। ইহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

* সকলেই সমানভাবে মনুষ্যজীবন সুখভোগের যাহাতে অধিকারী হয় তাহা করিতে গেলেই যে ত্যাগের প্রয়োজন! সম্পাদক।

ভারতবর্ষের দুরবস্থার কারণ কি? কেন এ দেশে দারিদ্র্য, অজ্ঞান, কুসংস্কার? এ পুরাতন হিন্দুজাতির জীবন বিকশিত না হইয়া কেন সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে? কারণ ঐ ভ্রম প্রসূত ভগবল্লাভ চেষ্টা। যদি হিন্দুজাতি বহু বৎসর ধরিয়া "পুরুষকার অবলম্বন করিয়া ভগবান্ লাভ করিব" এই উদ্দেশ্য লক্ষ্যের দিকে না দৌড়াইত, তাহা হইলে আমাদের আজ এ সর্ব্বনাশ হইত না। যদি আমাদের দেশের চিন্তাশীল পূর্ব্বপুরুষগণ ভগবান্ লাভের জন্য বৃথা জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, প্রভৃতি পন্থা উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত না থাকিয়া মনুষ্যজীবনসুখভোগসমৃদ্ধি-সাধনে ব্যস্ত থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের এই সংসারজীবন এতদূর হতশ্রী হইত না।

আচার্য্যেরা শিক্ষা দিতেছেন, নানা যোগ পথ অবলম্বন করিয়া ভগবান-লাভের জন্য সাধন কর। হিন্দু সে শিক্ষা শিরোধার্য্য মানিয়া সাধন তৎপর। তাহার জীবনশক্তি সে দুরন্ত সাধনে ব্যয় হইতেছে। সে আর কি শক্তি লইয়া ইহ সংসার সুখ বৃদ্ধি করিবে? যোগ সাধনে হিন্দুর জীবনশক্তি নষ্ট হওয়াতে, হিন্দু শক্তিহীন হইয়া ইহসংসার সুখবৃদ্ধি করিতে পারিল না।

আমার সানুনয় প্রার্থনা যে যদি আমরা বাঁচিতে চাই, যদি হিন্দুর জাতীয় জীবনবিকাশ আমাদের অভিপ্রেত হয়, তবে ভগবান্‌লাভ চেষ্টা একেবারে সমূলে নাশ করিতে হইবে। আমাদের জীবনশক্তি আর যেন বৃথা ভগবান্‌লাভ সাধনে ব্যয়িত না হয়। বহুবিধ যোগসাধন বিষবোধে পরিত্যাগ করি। আর ইন্দ্রিয়দ্বারা মনুষ্যজীবনসুখভোগে সমস্ত জীবনশক্তি নিয়োগ করি।

বহুশতাব্দী-যাবৎ আমরা ভগবল্লাভরূপ জীবনোদ্দেশ্য লাভ করিতে সাধন-তৎপর আছি ও ভগবান্‌লাভচেষ্টা মানবজীবনের চরম পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করিয়া আসিয়াছি। সে সাধনতৎপরতা ও ধারণা আমাদের শিরায় শিরায়, রক্তে রক্তে, জমাট বসে গেছে। একদিনে সে সাধনতৎপরতা ও ধারণার নাশ অসম্ভব। অচিরে সে নাশ অসম্ভব। কিন্তু, বিলম্বে, চেষ্টা করিলে, আপাততঃ অসম্ভব সম্ভব হইবে। যদি হিন্দুজাতি কালে এ সাধনতৎপরতা ও ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রম ও অসত্য জানিয়া পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন, তবেই তাঁহার মঙ্গল। নতুবা, বৃথা চেষ্টায় জাতীয় জীবনশক্তি ব্যয়িত হইতে থাকিলে, এ জাতির চরমে ধ্বংসপ্রাপ্তি অসম্ভব নয়। যদি ধ্বংস না হয়, জগতে অন্য অন্য জাতি মনুষ্যজীবন সুখভোগে অগ্রসর ও উন্নত হইবে, হিন্দুজাতি সব হারাইয়া অবনতির চরম অবস্থায় দাঁড়াইবে ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

সচ্চিদানন্দ স্বামী।

শিশু।

(১)

অমৃতে অমৃত মাখা শিশুর সুহাস ;
সেই ধূলা অঙ্গে মেখে
ছল ছল দুটি চোখে
তিরস্কার ভয়ে ফেলে ঘন ঘন শ্বাস
আধাস্নেহে আধামানে ক্রোধের প্রকাশ ;
সে এক ভাবের দৃষ্টি
সে এক অমিয় বৃষ্টি
সে এক ভাবের ভাব আনন্দ উচ্ছ্বাস—
সরল শিশুর রূপ মাধুর্য্য আবাস।

(২)

কোমল কমল-বালা সে হাসি হাসেনা—
যে হাসি হাসিলে ফুল
উন্মত্ত ভ্রমর কুল,—
প্রভাতের বালভানু-সোহাগী-ললনা
নির্ম্মল-বাসন্তী-উষা সে হাসি জানেনা ;
ছড়ায়ে আনন্দরাশি
যুবকের উচ্চহাসি
সে মধু হাসির সনে হয়না তুলনা,
সুরসিক শশী-মুখে সে হাসি আসেনা।

(৩)

ভ্রমর ঝঙ্কার রবে সে রব মিশে না ;
সে এক মধুর কণ্ঠ
পরাজিত মধু-কণ্ঠ,
নারদের বিনাযন্ত্রে সে রব উঠে না,
যতনে পালিত পাখী সে বুলি ধরে না ;
শিখিনীর রবে কবি
বিমুগ্ধ কি ভাবে ভাবি ?
ঝরুক নির্ঝর মুখে—সে এক ঝরণা,
মক্ষিকার মধুচক্রে সে মধু ঝরে না।

(৪)

চকিত হরিণী আঁখি কত শোভা ধরে ?
চকিত হরিণী চায়
কি ভাব প্রকাশ তায় ?
উপমার পদ্ম পত্রে কি ভেবে আদরে,
কি আঁখি অঙ্কিত করে কোন কারিকরে
ইন্দ্রের সহস্র অক্ষ
কোন আঁখি এত দক্ষ
প্রকাশিতে মনোগত ভাব অকাতরে—
পলাশ-নিন্দিত আঁখি কি মাধুরী ধরে !

(৫)

শিশুর নয়নকোণে নেত্রবারি কণা ;
নব বরিষার ধারা
ঢালুক সুধার ধারা
পবিত্র যমুনাবারি সে ভাবে বহে না
জোয়ারে গঙ্গার জল অত উথলেনা ;
সুচারু বদন বেয়ে
অশ্রুমালা পড়ে ধেয়ে
শত কোহিনুরে মালা সে ভাবে রচেনা
কি শোভা গোলাপগণে নীহার-বসনা।

(৬)

কোন বীর মহাবলী এত ধৈর্য্যবান ?
কোন রাজা দর্পশালী—
কোন বলী এতবলী—
কোন সাধু সাধনায় এত সাবধান
হেরে অশ্রুবারি পূর্ণ শিশুর নয়ান ?—

কোন্ সাগরের মুখে
স্রোতে এত বল রাখে
কোন তরঙ্গের বুকে এ হেন তুফান
প্রাবৃটে সিন্ধুর জল কত বেগবান।

(৭)

শিশুর সৌন্দর্য্যে বান্ধা সৌন্দর্য্য আধার
মাধুরীর মধুরতা
কোমলের কোমলতা,
মুকুতা ছবিরগণে মাণিকের হার
ফুরায় লিখিতে কবি-কল্পনা-ভাণ্ডার,
মুরতি স্নেহের নিধি
যতনে গড়িল বিধি
বর্ত্তমান ছয় রসে সপ্ত পারাবার—
মাধুর্য্য-সাগরে শিশু অকুল পাথার।

৺আজীজউস্ সোভ্‌হ্ন।

ঈশ্বর দর্শন বিষয়ে

সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত।

ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে শশিপদ বাবু একদিন নিম্নলিখিত স্বাভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সেই উক্তিগুলি যথাযথরূপে লিখিত ও রক্ষিত হওয়া আবশ্যক বোধ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহাতে সত্য সম্পর্ক আছে কিনা সাধকেরা তাহা চিন্তা করিবেন।

বাল্যকালে আমর বিশেষ ধর্ম্মানুরাগ ছিল, উপনয়নের পর হইতে আমি আমাদের কুলগুরু ভট্টপল্লীনিবাসী ঠাকুর কৃষ্ণহরি শিরোমণি মহাশয়ের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতাম। ঠাকুর মহাশয় বৎসরের মধ্যে অনেকবার আমাদের বাটীতে আসিতেন তৎকালে নব্য বয়সের কেহই তাঁহার নিকট বড় একটা ঘেঁসিত না, কেবল আমি তাঁহার নিকট যাইতাম ও তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতাম। ঠাকুর মহাশয় আমার এইরূপ ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া আমাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং আমাদের কুলদেবতার মন্ত্রে (কৃষ্ণ মন্ত্রে) আমাকে দীক্ষিত করিলেন। আমি দীক্ষিত হইলাম কিন্তু মন্ত্রলাভে পরিতৃপ্ত হইলাম না। ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বলিতাম, আপনার মন্ত্রে আমার কিছুই হইতেছে না। গুরুঠাকুর তথন আমার মনের অভিপ্রায় বুঝিয়া আমাকে পুনর্ব্বার মন্ত্র দিতে স্বীকৃত হইলেন। পুনর্দীক্ষার আয়োজন হইল, গুরু এক, কেবল মন্ত্র ভিন্ন। গুরুদেব, আমাকে "আনন্দং ব্রহ্মেতি" এই মন্ত্র প্রদান করিলেন, আমিও ঐ মন্ত্র পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। এই আমার শেষ দীক্ষা, এই আমার ইষ্ট দেবতা, এই আমার ইষ্ট

মন্ত্র। আমি দীর্ঘজীবন ধরিয়া এই দেবতারই আরাধনা করিয়া আসিতেছি ও এই মন্ত্র সাধন করিতেছি। ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার বা ইষ্টদেবতার সহবাস লাভ ধর্ম্ম সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন প্রণালীতে সাধনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মোপাসকদিগের সেই একই উদ্দেশ্য—ঈশ্বর লাভ ও ঈশ্বর দর্শন। আমিও ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলাম। সমাধিকালে ঈশ্বর সহবাস লাভ হয় বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। আমিও অনেক সময়ে সঙ্কীর্ত্তনাদিতে সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছি। সাকার সাধকেরা সাধনপথে অগ্রসর হইবার সময়ে অন্তরে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন এবং তৎকালে তাঁহারা ঐ দর্শনকেই ঈশ্বর দর্শন লাভ বলিয়া সন্তুষ্ট হন। নিরাকার উপাসকেরাও ঐরূপ অগ্রসর কালে ঈশ্বরের জ্যোতিঃরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। হজরত মহম্মদ ও প্রসিদ্ধ অপরাপর নিরাকার উপাসকেরাও পরমেশ্বরের এই জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিলেন। আমিও ভগবৎ কৃপায় আমার সাধনার পথে এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম যে অন্তরে একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিতে লাগিলাম এবং ঐ জ্যোতি দেখিয়া পরম আনন্দলাভ করিতে লাগিলাম। এই অবস্থাই আমার কিছুদিনের সাধনার অবস্থা, কিন্তু আমার প্রাণ আর তাহাতে যেন চরিতার্থ হইতে পারিলনা উহাতে আর আমার পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হইলনা। যিনি অনন্ত, বাক্য মনের অগোচর তাঁহাকে পাইয়াছি বলিয়া আর বিশ্বাস হইল না কিন্তু ঈশ্বরে অবিশ্বাসের ছায়ামাত্রও এই অবস্থাতে আমাকে স্পর্শ করিতে পারিলনা এখন আমি আরও দৃঢ়তর বিশ্বাসের সহিত সাধন করিতে লাগিলাম। এই অবস্থায় ক্রমে ক্রমে আমি, শুভ্র, রক্ত ও সবুজ এই তিন বর্ণের জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলাম এবং ঐ জ্যোতিঃ দেখিয়া আমি আনন্দ লাভ করিয়াছি ও ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছি। ঐ তিন বর্ণের জ্যোতিঃদর্শন সাধন পথের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ফল। সাধনার শেষ নাই। আমি সাধনপথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং জ্যোতিঃ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই আমার হৃদয়-রাজ্যে নূতন নূতন ভাবের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। এই জ্যোতিঃ দর্শন কি বাস্তবিক ঈশ্বর দর্শন? বৈষ্ণব সাধকদিগের মধ্যে যাঁহারা উন্নত সাধক তাঁহারা সময়ে সময়ে ধ্যানে এবং নিদ্রিতাবস্থায়ও হৃদয়ের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। সেইরূপ উন্নত শাক্ত

সাধকেরাও শক্তি মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। নিরাকার উপাসকেরা ঐ সকল মূর্ত্তি দর্শনকে ঈশ্বর দর্শন বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা উহাকে মানসিক কল্পনা বলিয়া থাকেন। আমার এই যে জ্যোতিঃ দর্শন ইহা যে আমার কল্পনার ফল নহে তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমার সাধন পথের এই এক সমস্যার স্থলে আসিয়া পড়িলাম। এই সময়ে আমার চিরজীবনের সহায় প্রার্থনার শরণাগত হইলাম, প্রার্থনা দ্বারা আমার গন্তব্যপথ নির্ণয় করিবার জন্য এবং বর্ত্তমান সমস্যার মীমাংসার জন্য প্রর্থনাকে অবলম্বন করিলাম। ব্যাকুল প্রার্থনা চিরদিনই ভগবান শুনিয়া থাকেন, এই সময়ে আমি দেখিলাম যে যে জ্যোতিঃ দর্শনকে আমি ঈশ্বর দর্শন বলিয়া মনে করিতেছিলাম তাহা আমার ইচ্ছাতে আমি স্থানান্তরিত করিতে পারিলাম অর্থাৎ কখনও বা কিঞ্চিৎ বামপার্শ্বে কখনও বা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পার্শ্বে কখনও বা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে ঐ জ্যোতিকে চালিত হইতে দেখিলাম। এ অবস্থায় এই জ্যোতি দর্শন আর প্রকৃত ঈশ্বর দর্শন বলিয়া ধারণা করিতে পারিলাম না। সাকার সাধকেরা যেমন তাঁহাদের ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার পূজা করেন, আমিও যেন সেইরূপ কল্পনা দ্বারায় সম্মুখে ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছিলাম। পূর্ব্বতন ঋষিবাক্য এই সময়ে আমার মনে আসিয়া উপস্থিত হইল, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত, যেমন তিনি চক্ষুঃগ্রাহ্য নহেন, সেইরূপ তিনি মনেরও গ্রাহ্য নহেন। আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা প্রকৃত ঈশ্বর দর্শন নহে, আমার কল্পনারচিত দেবতা, এখন এইরূপ মনে হইতে লাগিল। এই সময়ে ঈশ্বর আমাকে সাধন পথের এক সঙ্কটাপন্ন স্থানে আনিয়া ফেলিলেন। সেই জ্যোতিঃ দর্শনে আমি আর পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতে পারিলাম না, আমার চেষ্টায় ঐ জ্যোতিঃকে সম্মুখে ও প্রাণের মধ্যে আনিতে পারিতাম কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাহাতে আমার আর আনন্দ সম্ভোগ হইত না। প্রাণের ভিতরে ঈশ্বর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা রহিল প্রার্থনার পথ ও ধরিয়া রহিলাম। কৃপাময় কৃপা করিয়া এখন আমার নিকট কোন্ ভাবে প্রকাশিত হইবেন তাহা আমি জানিনা, তৃষ্ণার্ত্ত চাতক পক্ষীর ন্যায় আমি চাহিয়া রহিলাম। ব্যাকুল প্রার্থনাই আমার অবলম্বন।

"আমার পাওয়া দেখা দূরে থাকুক যেন ঐ শ্রীপদে থাকে মন।"

ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে শশিপদ বাবুর উপরিউক্ত অভিমত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা

করিলাম তবে আপনি ঈশ্বর দর্শন কাহাকে বলেন্ ? তদুত্তরে তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "আমিত বলিয়াছি ব্যাকুল প্রার্থনাই আমার অবলম্বন, সেই প্রার্থনার মন্ত্রও বলিয়াছি "আমার পাওয়া দেখা দূরে থাকুক যেন ঐ শ্রীপদে থাকে মন" ঐ শ্রীপদে থাকে মন ইহার অর্থ আমি তাঁহাতে মনঃস্থির রাখিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করি, তাহাতেই আমার তৃপ্তি তাহাতেই আমার আনন্দ, আমি "আনন্দং ব্রহ্মেতি" মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহার উপাসনায়, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যখন যতটুকু আনন্দ উপভোগ করিয়াছি সেই সময় সেই আনন্দ লাভকেই ঈশ্বর দর্শন বলিয়া বোধ করিয়াছি, "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" তিনি যে আনন্দময়, মানুষ যখনই আনন্দ পায়, তখনই তাঁহাকে ভোগ করে, তিনি ভিন্ন ত জগতে আর কোথাও আনন্দ নাই। যেখানে যতটুকু আকাশ থাকুক সেই অনন্ত মহাকাশেরই অংশ, সেইরূপ যেখানে যে পরিমাণে, আনন্দের বিকাশ হউক তাহা সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দেরই অংশ। আমার যে এই ব্যাকুল প্রার্থনা ইহাতে আনন্দ আছে সেইজন্য প্রার্থনাকেই অবলম্বন করিয়া এখন তাঁহাকে সম্ভোগ করিতেছি।"

শ্রীপঞ্চানন শিরোরত্ন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন শিরোরত্ন মহাশয় সাতক্ষীরার বিখ্যাত চৌধুরী বাবুদিগের গুরুবংশীয়। তিনি অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শী সাধক বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজেও আজীবন শাস্ত্রচর্চ্চাই করিয়াছেন। কর্ম্মসূত্রে প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অতীব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বাস করিয়াছেন। তিনি শশিপদ বাবুর জীবন কথা সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় লিখিয়া রাখিয়াছেন। এই সমস্ত লিখিত বিষয়ের সাহায্যে নব্যবঙ্গের অর্দ্ধ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বের প্রবন্ধটি পণ্ডিত মহাশয়ের খাতা হইতে পণ্ডিত মহাশয়েরই অনুমত্যনুসারে প্রকাশিত হইল।

এই প্রবন্ধটিতে যাহা বলা হইল সে সম্বন্ধে একটি কথা সকলেরই চিন্তা করা উচিত। 'দর্শন করা' এই ক্রিয়াটি আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুপুঞ্জে প্রয়োগ করিয়া থাকি, কোনও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সীমাবদ্ধ প্রাকৃত বস্তু যখন এই ক্রিয়ার 'কর্ম্ম' (object) হয় তখন এ ক্রিয়াটি যে ভাবে বুঝিতে হইবে, ঈশ্বর বা শ্রীভগবানকে 'কর্ম্ম' করিয়া যখন উহা প্রযুক্ত হয় তখন ঐ ক্রিয়াটিকে ঠিক সেই

ভাবে বুঝিলে চলিবে না। শ্রীভগবানকে আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি, অথচ দেখিতেছিনা, এই 'দেখা' একটি অসাম ক্রিয়া (an Infinite Process). To see Him, is to love Him and to love Him is to be free.

ভাগবত ধর্ম্ম।

ঋষিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত চতুর্থ প্রশ্নটি এই।

"তস্য কর্ম্মাণ্যুদারানি পরিগীতানি সুরিভিঃ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ॥"

সাত্বতপতি শ্রীভগবান, যিনি দেবকী ও বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি লীলায় ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার কর্ম্ম সমূহ অত্যন্ত উদার। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এ সমস্ত ও তাঁহার কর্ম্ম আর লীলায় আবির্ভূত হইয়া জন্ম ধারণ আদি যাহা কিছু তাহা ও তাঁহার কর্ম্ম। এই সমস্ত কর্ম্ম অত্যন্ত উদার। প্রথমতঃ মহান্ অর্থাৎ চিন্তা করিয়া আমরা তৎসমুদয়ের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারি না। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। তাহার পর পরমানন্দদায়ী, বা ভক্তজনের অভীষ্টপ্রদ। তাঁহার এই সমস্ত কর্ম্ম অবগত হওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। নারদাদি জ্ঞানীগণ তাহা সর্ব্বদা গান করিয়া থাকেন। আমাদের অন্তঃকরণে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, অতএব হে সূত! তুমি আমাদিগকে সেই কথা শ্রবণ করাও।

তৃতীয় প্রশ্নে ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কি নিমিত্ত আবির্ভূত হইলেন। চতুর্থ প্রশ্নে বিশেষভাবে তাঁহার সমগ্র লীলা বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

চতুর্থ প্রশ্নের বঙ্গানুবাদ আমরা প্রাচীন আচার্য্যগণের টীকা-অনুসারে প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই প্রশ্নটির ও পশ্চাতে তৃতীয় প্রশ্নের ন্যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যজাতির

ইতিহাসের ও গবেষণার অনেক ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে। তৃতীয় প্রশ্নের মর্ম্ম ব্যাখ্যাকালে যে সমস্ত চিন্তাপদ্ধতির আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত চিন্তাপদ্ধতি আরও স্পষ্টরূপে এই প্রশ্নটির ও পশ্চাতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রশ্ন ছয়টির মর্ম্ম উপলব্ধিকালে একটি কথা বিশেষ রূপে ভাবিয়া দেখা উচিত। এই ছয়টি প্রশ্নের মধ্যে সম্বন্ধ কি? সমস্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি অতি সুন্দর যোগসূত্র (Connecting link) লম্বিত রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধ সূত্র টুকু উপলব্ধি করিলে কেবল যে এই ছয়টি প্রশ্নেরই গভীর মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে তাহা নহে প্রাচীন আর্য্যজাতির সাধনার ইতিহাসে এই অমূল্য লীলাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের স্থান কোথায় তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে, এবং সাধকগণ কর্তৃক নানা পথে নানাভাবে তত্ত্বান্বেষণের জটিল ও বিশাল ইতিহাসে পূর্ণব্রহ্ম রূপে যে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা তাহারই বা স্থান কোথায় তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের আলোচনায় বা শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের আলোচনায় ইহাই একমাত্র পথ। প্রাচীন আচার্য্যেরা কি ভাবে এই পথ অনুসরণ করিয়াছেন তাহা আমরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব।

চতুর্থ প্রশ্নটি আমরা প্রথম তিনটি প্রশ্নের সহিত মিল করিয়া এই ভাবে বিবৃত করিতে পারি। অখিল শাস্ত্রের যাহা সার সিদ্ধান্ত তাহার দ্বারা প্রস্তাবিত এবং আত্মপ্রসাদ বা আত্মপ্রত্যয় কর্তৃক সমর্থিত বা স্বীকৃত যে সার্ব্বজনীন অব্যভিচারী শ্রেয়ঃ তাহা সাত্বতপতি শ্রীভগবানের দেবকী ও বসুদেবের পুত্ররূপে যে আবির্ভাব সেই আবির্ভাবের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার উদার কর্ম্ম সমূহ কীর্ত্তন কর।

পরে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা শ্রবণ সর্ব্বপ্রকার সাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধনা। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন, যে এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শুনিবার ইচ্ছা হইলেই ঈশ্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ বা স্থিরীকৃত হয়েন। অন্যান্য শাস্ত্রের দ্বারা বা অন্যান্য সাধনার দ্বারা ঈশ্বর হৃদয়ে স্থিরীকৃত হয়েন বটে কিন্তু বিলম্বে। এই স্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এই শাস্ত্র শ্রবণের যদি এতই মহিমা তাহা হইলে সকলে শ্রবণ করেন না কেন? ইহার উত্তরে পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকায় বলিতেছেন "শ্রবণেচ্ছা

তু পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যতে।" অর্থাৎ এই যে শুনিবার ইচ্ছা ইহা পুণ্য ব্যতীত উৎপাদিত হয় না। শ্রবণের ইচ্ছা পুণ্য ব্যতীত যে কেন উৎপাদিত হয় না, সে সম্বন্ধে দু একটি কথা ভাবিয়া দেখা উচিত। সংসারে যাঁহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী লোক বলিয়া বিবেচনা করেন তাঁহাদিগের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা উল্লেখ করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই অশ্রদ্ধার সহিত নাসিকা কুঞ্চন করিবেন। মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়, কোন্ চিন্তার কিরূপ বর্ণ, অথবা যোগের দ্বারা কিরূপে অতিপ্রাকৃত কার্য্য সাধন করা যায় এ সমস্ত কথা আলোচনা করিতে বলিলে তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিবেন। তাঁহারা সরল চিত্ত লোক। কিন্তু এরূপ কেন হয়? ইহার কারণ এই যে লীলার যে কোন গভীর অর্থ আছে ইহা তাঁহারা জানেন না। সাধারণ উপন্যাস বা গল্পের পুস্তকের সহিত লীলাগ্রন্থকে তাঁহারা এক শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ভাল লোক তাঁহারা মনে করেন যে এ গল্পগুলি ভাল—সাধারণ লোকে এই সমস্ত কৌতূহলোদ্দীপক সুন্দর গল্পাদি শ্রবণ করিলে উপকৃত হইবে। কিন্তু ইহা সাধারণ অশিক্ষিত লোকের জন্য। যাঁহারা অধ্যাত্ম রাজ্যের গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে পারেন তাঁহাদের জন্য এই সমস্ত পৌরাণিক কথার প্রয়োজন কি? আবার আমাদের দেশে যাঁহারা লীলাগ্রন্থের প্রচারক তাঁহাদের ধারণাও যে উচ্চ তাহা নহে। তাঁহারা ও শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে প্রায়শঃই বিশ্বাস করেন না। অথচ তাঁহারা ব্যবসায়ী লোক, নিজে বুঝুন বা না বুঝুন বিশ্বাস করুন বা না করুন জনসমাজে তাহা প্রচার করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে কাজেই, নিজেও বুঝেন না, শ্রোতৃমণ্ডলী ও বুঝেন না এই প্রকারের কাল্পনিক ও উৎকট ব্যাখ্যা বাহির করিয়া অথবা নানারূপ সঙ্গীত, হাস্য, কৌতুক প্রভৃতির দ্বারা সরস করিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়া থাকেন। আবার যাঁহারা শোনেন তাঁহারা যে ঠিক বুঝিয়া শোনেন বা বিশ্বাস করিয়া শোনেন তাহাও নহে। কেহ গান শোনেন, কেহ কৌতুক শোনেন, যাঁহারা ভাল লোক তাঁহারা মনে করেন, কিসে কি হয়, কে জানে? লোকে বলে শুনিলে পুণ্য হয়, আচ্ছা শোনা যাউক। এই প্রকারে "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" অন্ধকর্ত্তৃক অন্ধগণ পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু ইহা বেশ ভাল অবস্থা নহে।

প্রকৃত প্রস্তাবে লীলাগ্রন্থ শ্রবণের ইচ্ছা কখন হইতে পারে? প্রথমতঃ

আমরা ভগবান যে আছেন ইহাতেই বিশ্বাস করি না। যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা এক অতিপ্রাকৃত রকমের বা একটা কিস্তুত কিমাকার রকমের ধারণা তাঁহার সম্বন্ধে পোষণ করেন। তাঁহাদের লীলা শ্রবণে ইচ্ছা হইবে কেন? লীলাশ্রবণের ইচ্ছা মনে জাগ্রত হইবার পূর্ব্বে এই কয়েকটি বিষয় উপলব্ধি করা চাই, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম তিনটি শ্লোকের মধ্যে সংক্ষেপে অথচ অতীব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরমেশ্বর আছেন। তিনি পরমার্থসত্য। জগতে যাহা কিছু সত্য বলিয়া প্রতীত হয় সমস্তই তাঁহার সত্তায় সত্তাবান। এই বিশ্বের সৃজন-পালন-লয় তাঁহা হইতে হইতেছে। তিনি যে বিশ্বের বাহিরে বসিয়া রহিয়াছেন তাহা নহে, অন্তর্যামী রূপে ওতপ্রোত ভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ। তিনি বেদ দিয়াছেন, মানবকে তিনি আনন্দলোকে অমৃতলোকে লইয়া যাইবার জন্য নিয়ত ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতায় তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এই জন্য তিনি জগতে প্রকটিত হইতেছেন।

এই সমস্ত প্রাথমিক বিষয় উত্তমরূপে কেবলমাত্র উপলব্ধি করিয়া নহে, এইভাবে ভাবিত চিত্ত হইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করিতে হইবে। এই সমস্ত প্রাথমিক বিষয় সম্বন্ধে যদ্যপি কাহারও সন্দেহ থাকে, অথবা বিশ্ব-ঘটনায় শ্রীভগবানের মহীয়সী ও আনন্দময়ী লীলাশক্তির বিলাস হইতেছে ইহা ধারণা করিবার মত হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন যদ্যপি কাঁহারও না হইয়া থাকে তাহা হইলে লীলাগ্রন্থ শ্রবণের যাহা প্রকৃত ফল তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন। আমরা পূর্ব্বে কয়েক স্থলে বুদ্ধির ভূমির কথা বলিয়াছি এবং এই বুদ্ধির ভূমিতে দাঁড়াইয়া গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই লীলাগ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় সে কথাও বলা হইয়াছে। প্রথমে বুদ্ধির ভূমিতে আরোহন করিয়াই যে সকলে এই শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন তাহা নহে। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান তাঁহারা আবার শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে শুনিতে এই ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিবেন। সরলচিত্ত ভক্তি-সাধকগণ এই পথেই অগ্রসর হইয়া মানব জীবনের যাহা পরম পুরুষার্থ তাহা লাভ করিয়াছেন। এই দুই দলের মধ্যে যাঁহারা কোন দলেরই নহেন, অর্থাৎ তত্ত্বালোচনাতে ও যাঁহাদের উচ্চাধিকার নাই আবার যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত এবং শাস্ত্রবিশ্বাসী ও নহেন তাঁহাদের অবস্থা চিরকালই বড় কঠিন।

নবীন এবং প্রাচীনকালের তত্ত্বদর্শী ও সাধুভক্তগণ

অধ্যাত্মরাজ্যের রহস্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া এই লীলাবাদেই বিশ্বসমস্যার চরম মীমাংসা উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা যেন সাধারণ নীতি-উপদেশপূর্ণ গল্পের সহিত লীলাতত্ত্বকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া না ফেলি।

ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সাধকগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই লীলাতত্ত্ব বুঝিয়াছেন। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীবৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে শ্রীভগবানের উক্তি বলিয়া বলা হইয়াছে

"পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং।
কালিন্দীয়ং সুষুন্নাখ্যা পরমামৃত বাহিনী॥"

"এই বৃন্দাবন আমার দেহস্বরূপ। ইহা পঞ্চ যোজন বিস্তৃত। কালিন্দী বা যমুনা ইনি সুষুন্না, ইহাতে পরমামৃত ধারা প্রবাহিত হয়।"

তান্ত্রিক-সাধনায় সুষুম্না বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আলোচনা করিলে আমরা শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহারই মর্ম্ম আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের জীবনে ও বিশ্বের এই প্রকাশ লীলায় একটা দ্বৈধ রহিয়াছে। ইংরাজী ভাষায় ইহার নাম "The principle of polarity." S. Laing প্রণীত Modern Zoroastrain নামক গ্রন্থে এই তত্ত্বের অতি সুন্দর আলোচনা আছে। সেই গ্রন্থে তিনি এইটুকু দেখাইয়াছেন যে

"In all cases a positive implies a negative; in all, like repels like and attracts unlike. Conversely, as polarity produces definite structure, so definite structre everywhere implies polarity. The same principle prevails not only throughout the organic or world of life, and especially throughout its highest manifestation in human life and character, and in the highest products of its evolution, in societies, religions, and philosophies."

এই যে বিশ্বজনীন দ্বৈধ ইহা তন্ত্রে ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুই নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইড়া বামে আর পিঙ্গলা দক্ষিণে। ইড়া শক্তিরূপা, পিঙ্গলা পুংরূপা। ইড়া চন্দ্রস্বরূপিনী আর পিঙ্গলা সূর্য্যবিগ্রহা। যেমন রুদ্রযামলে

"বামগা যা ইড়া নাড়া শুক্লা চন্দ্রস্বরূপিনী।
শক্তিরূপা হিসা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা।
দক্ষেতু পিঙ্গলানাম্নী পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা॥"

ইড়া মাতৃশক্তি আর পিঙ্গলা পিতৃশক্তি। সুষুম্না নাড়ী এই উভয়ের মধ্যস্থলে, উভয়ের সমন্বয়রূপা। এই সুষুম্না নাড়ীতে স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তি সমানভাবে মিশিয়া গিয়াছে। সুতরাং উহা না স্ত্রী, না পুরুষ এজন্য ক্লীব নামে অভিহিত। এই নাড়ী বহ্নিরূপা।

ভগবদ্গীতায় ক্ষর ও অক্ষর এই দুই ভাবের সমন্বয় পুরুষোত্তমে হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই চিন্তাটুকুর সূত্র ঠিক মত অবলম্বন করিতে পারিলে অর্থাৎ সুষুম্না যে কালিন্দী ইহা বুঝিতে পারিলে আমরা বৃন্দাবন তত্ত্ব বুঝিতে পারিব।

মোটামুটি এই ভাবেও আমরা কথাটা বুঝিতে পারি। আমরা বাহিরে দেখিতেছি জড় জগৎ, আর অন্তরে মনোজগৎ, এই দুইটি যেন দুইটি সমান্তর সরলরেখা। এই দুটির মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাও অবিসম্বাদিত। কি প্রকারে এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বলীলা সম্ভব হইয়াছে এই প্রশ্ন সাধকগণের মনে চিরকালই জাগ্রত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন লীলার রহস্যের মধ্যে এই প্রশ্নের শেষ মীমাংসা নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং ধীরভাবে ও শ্রদ্ধার সহিত এই তত্ত্বালোচনায় আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

———

বীরভূমি ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা,
পৌষ, ১৩২০।

শ্রীশ্রীকুন্তীদেবীর স্তব। (৬)

বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদদর্শনা-
দসৎসভায়া বনবাস কৃচ্ছ্রতঃ।
মৃধে মৃধেঽনেক মহারথাস্ত্রতো
দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরে ঽভিরক্ষিতাঃ॥

বিপদেতে পূর্ণ মোর সমগ্র জীবন
বিপদেই তব কৃপা করিনু দর্শন।
নাশিতে ভীমের প্রাণ, বিষের মোদক দান
করিল, অরাতিগণ ষড়যন্ত্র করি,
সে বিপদে তুমি রক্ষা করিয়াছ হরি।
জতু-গৃহ সাজাইয়া, দিয়েছিল পাঠাইয়া
দগ্ধ করি বিনাশিবে ছিল অভিপ্রায়,
পরিত্রাণ লভিয়াছি, তোমারি কৃপায়।
হিড়িম্বা প্রভৃতি কত, বন মাঝে অবিরত,
মানব-খাদক শত্রু কৈল আক্রমণ,
সে সব বিপদে তুমি করিলে রক্ষণ।
অধর্ম্মাচারীর দল, দ্রৌপদীরে করি বল,
সভা মাঝে কৈল চেষ্টা বিবস্ত্রা করিতে,
তুমিই রাখিলে লজ্জা সভার মাঝেতে।
বনবাসে যত ক্লেশ, বর্ণিয়া না হয় শেষ,
দুর্ব্বাসা আতিথ্য আদি বিপদে ভীষণ,
তুমিই নিয়ত আসি করিলে রক্ষণ।
মহারথীগণ সনে, কত যুদ্ধ কেবা গণে,
সর্ব্বত্রই তুমি আসি হইলা সহায়,
সকল বিপদে ত্রাণ, তোমারি কৃপায়॥

অশ্বত্থামা দ্রোণসুত, প্রতিশোধ-কামযুত,
এইমাত্র করেছিল ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ,
সমূলে পাণ্ডবকুল বিনাশ কারণ।
বিভীষিকা ছড়াইয়ে, অগ্নিজ্বালা বিস্তারিয়ে,
এল সে ব্রহ্মাস্ত্র, হায় কি মূর্ত্তি ভীষণ
তার হস্তে আমাদের করিলে রক্ষণ।
বিপদঃ সন্তুতাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভবদর্শনং॥
তুমি জগতের গুরু মঙ্গল নিদান।
নানামতে কর সদা সুশিক্ষা বিধান॥
আমার জ্ঞানেতে আমি, শিখিয়াছি বিশ্ব স্বামি!
বিপদ বাঞ্ছিত বস্তু, হউক বিপদ,
বিপদে দর্শন হয় তোমার শ্রীপদ!
দর্শন পাইলে তব, দেখিতে না হয় ভব,
—নিয়ত চাঞ্চল্যময় এ বিশ্ব নশ্বর,
তোমার দর্শনে দূরে পলায় সত্বর।
বিপদ হউক সদা এ মোর প্রার্থন,
বিপদেই হয় হরি, তোমার দর্শন।

কালিয়। (৩)

নবম পরিচ্ছেদ।

বরলাভ।

গরুড়ভয়ভীত কুলপাংশুল কালিয় গরুড়ানুসৃত হইয়া সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন পূর্ব্বক কুত্রাপি আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত হইল না। তখন প্রাণভয়ে একান্ত কাতর হইয়া পুণ্যশ্লোক শেষ ও বাসুকীর শরণাগত হইলে নিষ্কৃতি পাইবে ভাবিয়া পৃথ্বীতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতাল প্রদেশ অভিমুখে গমন করিল, ভাবিল ভুজঙ্গপিহিতদ্বার পাতালপুরী নাগগণের আবাসস্থল, গরুড় তথায় গমন করিতেও সাহসী হইবে না। বাসুকী ও শেষনাগেশ পরিচালিত তথাকার ভুজঙ্গমগণ গরুড়ের বিরুদ্ধাচরণ করিল না। পাতাল পুরীতেও

গরুড়-বিদ্বেষী কালিয়ের স্থান হইল না। তখন কালিয় একান্ত পরিক্লান্ত হইয়া সুরপুরে গমন করিল। ইন্দ্রাদি দেবগণের আশ্রয়প্রার্থী হইয়াও আশ্রয়প্রাপ্ত না হইয়া সে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া অতি বিনীতভাবে কহিল "হে বিরিঞ্চি! আপনিই সৃষ্টিস্থিতি-সংহার-কর্ত্তা জগৎকারণ। আপনা হইতেই সকল দেবগণ সমুদ্ভূত হইয়াছে; নর, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীবই আপনার সৃষ্ট, অতএব আপনিই আদিকারণ। গরুড়সন্তাড়িত আমি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল ভ্রমণ করিয়াও কোন স্থানে আশ্রয় পাইলাম না। আপনি শরণাগত অধীনকে অভয় দান করিয়া আপনার সৃষ্ট জনার্দ্দনবাহন-গরুড়কে প্রতিনিবৃত্ত করুন।"

কালিয়ের করুণ বচন শ্রবণপূর্ব্বক ব্রহ্মা কহিলেন। 'হে কালিয়! আমি তোমাকে আশ্রয়দানে একান্ত অসমর্থ। তুমি দেবদ্বেষী, নরহন্তারক, নৃশংস, পামর, তোমাকে আশ্রয় দান করিলে অপরাপর দেবগণ আমাকে কি বলিবেন? আমি আশ্রয়দাতাও নহি, সংহার-কর্ত্তাও নহি। সৃষ্টিই আমার কার্য্য; পালন ও সংহার কার্য্য অন্য দেবতার হস্তে ন্যস্ত। বিশেষ তোমার বিবাদ নারায়ণবাহন গরুড়ের সঙ্গে। আমি কিরূপে তোমাকে আশ্রয়দান করিয়া আরোহী ও বাহক উভয়েরই সঙ্গে বিবাদ করিব? সুতরাং গরুড় যাঁহার বাহক, তুমি তাঁহারই নিকট গমন কর। তিনিই জগৎপালক, তিনি ইচ্ছা করিলে গরুড়কে প্রবোধ দান করিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন।" বিরিঞ্চির বাক্য শ্রবণে কালিয় হতাশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিল। গরুড় দূর হইতে তাহার দর্শন পাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন "রে সরীসৃপাধম নির্লজ্জ কালিয়! এখন তুই কোন্ লজ্জায় পলায়নপর হইতেছিস্। তোর সে সগর্ব্ব বচন কোথায় রহিল? তুই যে শত সহস্র ফণা বিস্তারপূর্ব্বক দংশন করিয়া আমাকে নিরস্ত করিবি বলিয়াছিলি, এখন তোর সেই শতসহস্র ফণা কোথায় গেল? সমগ্র পৃথিবী মধ্যে তোর স্থান হইল না, তুই আর কোথায় আশ্রয়ান্বেষণে ধাবিত হইতেছিস্? তুই যেখানে যাইবি আমারও গতি সেইখানে। তুই মস্তোজ্য পদার্থ খাইয়া উদরপূর্ণ করিয়াছিস্, আমি তোকে ভক্ষণ করিলে সমস্তই আমার ভক্ষণ করা হইবে। জলধির অতল সলিলে প্রবেশ করিলে আমার নিকট হইতে আজি তোর রক্ষা নাই।" এই বলিতে বলিতে গরুড় তাহার অনুসরণ করিলেন। কালিয় ইত্যবসরে বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুর

পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল “দয়াময় হরি! তোমার নাম গ্রহণমাত্র কত শত প্রাণী দুরন্ত শমনকেও দমন করিয়া ভবতাপ হইতে রক্ষা পায়, আর গরুড়-ভয়ভীত তোমার এ অধম সন্তান তোমার চরণকমলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, তুমি দয়া করিয়া তোমার অভয়পদছায়ায় তাহাকে আশ্রয়দান করিবে না কি? আমি অতীব নীচাশয়তার বশবর্ত্তী হইয়া সুরাসুরবিজয়ী তোমার বাহন গরুড়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি; এক্ষণে গরুড়ানুসৃত প্রাণভয়ার্ত্ত আমাকে রক্ষা কর। তুমি জগৎপ্রতিপালক, পদাশ্রিত এ অধমকে পালন না করিলে তোমার দয়াল নামে কলঙ্ক স্পর্শিবে।” “কালিয়ের এতাদৃশ কাতর বচন শ্রবণে হরি কহিলেন “আমি তোমাকে চিনিয়াছি, তোমার মনে ভক্তির লেশ মাত্রও নাই এজন্য আমি আপাততঃ তোমার রক্ষাসাধনে সমর্থ নই। গরুড় আমার বাহন, সে বাসুকী অপেক্ষাও বীর্য্যবান, সে ইচ্ছা করিলে সুধু ভূভার কেন, ত্রৈলোক্যের ভারও বহন করিতে পারে। আমি এতাদৃশ সেবকের অসন্তোষকর কার্য্য সম্পাদনে অশক্ত। তুমিও আমার বহুবিস্তর স্তব করিয়াছ, এজন্য আমি তোমার উদ্ধার কল্পে এই বর দিতেছি যে, তুমি পূর্ব্ব নিদর্শন দর্শনমাত্র জন্মান্তরীণ কথা স্মরণে উদিত হইলে প্রিয়াসকাশে বর্ণনা করিয়া শ্রোতা ও শ্রাবক উভয়েই মুক্তি পাইবে। সম্প্রতি তুমি দেবাদিদেবের নিকট গমন কর, তিনি সর্পভূষণ, তোমাকে তাঁহার অন্যতম একটী ভূষণরূপে গ্রহণ করিলেই উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে, আমাকেও বৃথা গরুড়ের অসন্তোষভাগী হইতে হইবে না।” বিপদভয়হারী জনার্দ্দন কালিয়কে প্রত্যাখ্যান করিলে কালিয় তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক দেবাদিদেবের নিকট গমন করিল। আদ্যাশক্তি ভগবতীসহ তাঁহাকে একাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া কালিয় বিনয়মধুরভাবে তাঁহাকে বলিলেন “আপনি দেবাদিদেব মহেশ্বর, আপনার আদি অন্ত নাই, আপনি সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার কর্ত্তা; আপনার মহিমা আমি শতসহস্র মুখেও বর্ণন করিতে সমর্থ নই। যুগান্তে যখন আপনি প্রলয়বিষাণধ্বনি করিতে থাকেন তখন সকল চরাচর জীব ও যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ আপনারই অঙ্গে বিলীন হইয়া যায়, তখন পুনরায় আপনি কারণবারি মধ্যে শেষ-শয্যায় শয়ন করেন ও আপনার নাভিকমলে কমলযোনি ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত হইয়া পুনঃ সৃষ্টিকল্পে অভিনিবিষ্ট থাকেন! আপনার অঙ্গ ভুজঙ্গালঙ্কারে ভূষিত, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকেও উহাদের মধ্যে স্থানদান পূর্ব্বক গরুড়-ভয় হইতে আমাকে

রক্ষা করুন। হে ত্রিপুরবিনাশন! সমুদ্রমন্থনকালে গরল উদ্ভূত হইলে আপনি তাহা পান করিয়া মহাভয়ার্ত্ত সুরাসুর সকলের পরিত্রাণ সাধন করিয়াছিলেন। অসুরবিধ্বংসিনী নৃমুণ্ডহস্তা নৃমুণ্ডমালিনী করালী কালিকাদেবীর পদভর কম্পিতা ও আর্ত্তা ধরিত্রীর উদ্ধার সাধনে আপনি প্রলয়পদাম্বুজ বক্ষে ধারণ করিয়া জগৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র জীব আপনার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে আপনি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া তাহাকে ভয়-নির্ম্মুক্ত করুন।" দেবাদিদেব কালিয়ের কাতরোক্তি শ্রবণে কহিলেন "হে ধীমান্! তোমার আশা বৃথা। সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যাহাকে আশ্রয়দান করেন নাই, আমার নিকট তাহার আশ্রয়প্রাপ্তির আশা একান্ত অসম্ভব। যে অহিকুল অলঙ্কার-স্বরূপ মদীয় অঙ্গবেষ্টন করিয়া আছে তাহারাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোমার খলপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত না হইলে কেহই তোমাকে আশ্রয়দান করিতে পারে না। তুমি স্থানান্তরে গমন কর। গরুড় এখানে উপস্থিত হইলে মদীয় অঙ্গভূষণ অহিকুল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে।" চন্দ্রচূড়ের বাক্য শেষ হইতে না হইতে গরুড় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অমনি তদীয় অঙ্গবেষ্টিত অহিকুল ভীষণ গর্জ্জন ও সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া ভুজঙ্গভক্ষক গরুড়ের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেব বৃষভ-কেতনের অঙ্গাশ্রয়ে তাহাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার মাত্রও হইল না। গরুড় তাহাদিগের সেই সগর্ব্ব দৃষ্টি ও উন্নমিত মস্তকাস্ফালন দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন "ভয়তাপহারী শান্তিনিকেতন দেবাদিদেবের অঙ্গে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া বড়ই স্পর্দ্ধা দেখাইতেছে, একবার ঐ স্থান হইতে অবতরণ করিলে বীরপণা দেখিতে পাই।" গরুড় অহিআস্ফালনে এইরূপ ভাবিতেছেন ইত্যবসরে কালিয় কৈলাসনিকেতনদ্বাররোধী গরুড়ের পদমধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া বেগে পলায়ন করিল। তদ্দৃষ্টে গরুড় পুনরায় তাহার অনুসরণ করিলেন। কালিয়ের সহসা স্মরণ হইল যমুনাসংশ্লিষ্ট হ্রদ গরুড়ের অস্পৃশ্য। সৌভরী নামক মুনি হ্রদজল স্তম্ভন পূর্ব্বক তন্মধ্যে বাস করিতেন। জলচর যাবতীয় জীব তাঁহারই শরণাগত। একদা পতিবিয়োগ-বিধুরা কোন শকুলী মৎস্য পিতৃহীন বৎসগণ পরিচালনে প্রবৃত্ত হইলে গরুড় সেই বৃদ্ধা শকুলীটিকে রসনা-তৃপ্ত্যর্থে ধরিবার উপক্রম করিতেছিলেন। শকুলী তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া মুনি-সকাশে নিবেদন করিলে মুনি গরুড়কে ডাকিয়া এবংবিধ কার্য্য হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইবার আদেশ দিলেন। গরুড় তাহাতেই প্রতিশ্রুত হইয়া মুনিসন্নিধান

হইতে প্রস্থান করিলে শকুলী নিঃশঙ্কচিত্তে বৎস চরাইতে আরম্ভ করিল। অনন্তর গরুড় শকুলীকে নির্ভীক হৃদয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া লোভপরায়ণ হেতু মুনির আদেশ বিস্মৃত হইলেন। আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সহসা শকুলির উপর নিপতিত হইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করতঃ প্রস্থান করিলেন। বৎসগণ মাতৃবিয়োগ শোকে অধীর হইয়া গরুড়ের ধৃষ্টতা মুনিসন্নিধানে জ্ঞাপন করিলে তিনি শাপ দিয়াছিলেন এই হ্রদের জল অতঃপর গরুড় স্পর্শ করিলে অথবা এই হ্রদের উপর দিয়া আকাশমার্গে গমন করিলে মৃত্যুঞ্জয় হইলেও গরুড় তাঁহার শাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন। গরুড় সেই অবধি আর যমুনা-হ্রদের সন্নিকটেও গমন করিতেন না। এই অভিসম্পাত কালিয়ের স্মরণ হইবামাত্র তাহার বল ও সাহস বৃদ্ধি হইল। তীরবেগে ধাবিত কালিয়কে সেই হ্রদ অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া গরুড় সগর্ব্বে কহিলেন "রে ভীরু। মহাভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া তুই যমুনাহ্রদে পলাইতেছিস্। কিন্তু তাহাতেও তোর নিষ্কৃতি নাই। আমি যাঁহার বাহন সেই শমনদমন জনার্দ্দনের হস্ত হইতে কোন মতে রক্ষা পাইবি না। তিনি সহস্র ফণা মর্দ্দিত করিয়া তোকে এক ফণাবিশিষ্ট করিবেন। তুই আপাততঃ রক্ষা পাইলি বটে, কিন্তু অচিরেই তুই বিনাশ প্রাপ্ত হইবি।" গরুড় বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে মহাভয়ে অভিভূত কালিয় যমুনাহ্রদে প্রবিষ্ট হইল, গরুড়ও তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভোগ-বেষ্টনে।

যমুনাসংশ্লিষ্ট কালিন্দী-হ্রদমধ্যে পরিবার ও স্বজনবর্গ সহ কালিয় বহুকাল বাস করিতে লাগিল। তাহার তীব্র বিষপ্রভাবে সেই রমণীয় ও সুখসেব্য হ্রদজল বিষাক্ত হইয়া উঠিল। মেঘপূর্ণ অম্বরবৎ অগাধ নিষ্কম্প জলপূর্ণ এই হ্রদ জলজন্তু, জলচরবিহঙ্গম ও শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল। বিষপ্রভাবে যমুনার জলও অসেবনীয় হইয়া উঠিল। ইহার প্রভূত বারিরাশি যেন অনবরত ফুটিতেছে। পুলিন ও তীরবর্ত্তী বৃক্ষলতাদি যেন তেজোহীন হইয়া বিশুষ্কপ্রায় হইল। তটভূমি পূর্ব্বে দূর্ব্বাদলশ্যামমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নয়নাভিরাম হইয়াছিল, এক্ষণে তৃণশূন্য বালুকামণ্ডিত মরুপ্রদেশতুল্য

শোভাহীন হইয়াছে। পূর্ব্বে যে নীলজলপ্রবাহিনী কমল কুমুদকহ্লারমণ্ডিতা যমুনা তারকারাজি শোভিত নবীননীরদবর্ণ আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইত এক্ষণে তাহা বিরলপুষ্প ও কলুষোদক হইয়া উঠিল। অধিক কি যে যমুনা-পুলিন সতত গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের বিহারভূমি ছিল এক্ষণে বিষাক্ত বায়ু-সংস্পর্শে তাহা রাধিকা ও গোপীগণের অগম্য হইয়া উঠিল।

একদা গোপবালকগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ যমুনা তীর ভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত কয়েকটী গোপবালক একান্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সেই জল পান করিবামাত্র ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। তাহাদিগের অবস্থাবলোকনে করুণার্দ্রহৃদয় মনুষ্যোচিত ক্রিয়াসক্ত ভগবান্ হরি অমানুষীশক্তিদ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তখন তাঁহার স্মরণ হইল যে, স্বীয় বাহন উরগভোজী খগরাজ গরুড়-ভীত খলমতি উরগ-রাজ কালিয় সাগরবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই বিষধর সর্পরাজ কর্ত্তৃক এই সাগরসদৃশী পবিত্রসলিলা যমুনা দূষিত হইয়াছে এবং সেই উরগরাজের ভয়েই সকলে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। মৎকর্ত্তৃক এই উরগরাজ দমিত হইলে এই যমুনাতীরবর্ত্তী শাদ্বল ক্ষেত্র সকল ব্রজপুরীর গাভীবৃন্দের সুখসেব্য হয় এবং সেই সুখপ্রদস্থান ব্রজবাসীগণের উপভোগ্য হইবে। এই দুর্ব্বৃত্ত নিগৃহীত, হইলে এই বরতরঙ্গিনী যমুনার জল মঙ্গলজনক হইবে ও তীর্থ সকল, সুখসঞ্চরণীয় হইবে, অতএব আর উহাকে প্রশ্রয় দেওয়া উপযুক্ত নয়।" এই ভাবিয়া বদ্ধপরিকর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরবর্ত্তী বৃহৎ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক ঝম্পপ্রদানে বিষাগ্নি-বশতঃ তপ্ত ও উদ্বেলিত সেই হ্রদজলমধ্যে নিপতিত হইলেন। বিশ্বম্ভরের পতন-বেগে যমুনার জল আলোড়িত হইয়া তীরভূমিতে উৎক্ষিপ্ত হইল। সেই মহা-পতন শব্দে হ্রদমধ্যস্থিত কালিয়ভবন সংক্ষুব্ধ হইল। সর্পগণ ক্রোধান্ধ হইয়া আরক্ত লোচনে আততায়ীর সমুচিত শাস্তিদানার্থ ভবনবহির্গত হইল। শ্রীকৃষ্ণকে জলমধ্যবর্ত্তী দর্শন করিয়াই রোষস্ফুরিত তেজঃপ্রজ্জলিত উরগরাজ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। তদীয় বিসৃষ্ট হলাহলে যমুনাজল অগ্নিপঙ্কের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, এবং তীর ভূমিস্থিত মহীরুহগণ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। অনন্তর অগ্নিশিখাবৎ দ্বিশিখ জিহ্বা বহির্গত করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর শ্রীকৃষ্ণকে ভীষণ বেষ্টনে বেষ্টিত করিল। শ্রীকৃষ্ণ সর্পরাজকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া নিশ্চল নিশ্চেষ্ট পতিত রহিলেন।

এই ভীষণ ব্যাপার দর্শনে বালকগণ নন্দ ও যশোমতীর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল,"হায়! হায়! আমাদিগের কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আমাদিগের প্রিয়বয়স্য কৃষ্ণ বোধ হয় এতক্ষণে গতজীবন হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। কদম্ব বৃক্ষ হইতে পতিত হইলে যমুনাহ্রদে ভীষণ সর্পবেষ্টনে তাঁহাকে বেষ্টিত দেখিয়া আসিয়াছি। তিনি নিশ্চল নিশ্চেষ্ট পতিত আছেন দেখিলাম। যশোদে! তুমি মা হইয়া স্নেহের পুত্তলী কৃষ্ণ বিহনে কিরূপে জীবনধারণ করিবে? আমরা বয়স্যশোকে যখন এতাদৃশ অভিভূত হইয়াছি তখন বোধ হয় তোমার প্রাণবায়ু বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইবে। হায়! হায়! নন্দঘোষই বা কি করিবে? কৃষ্ণময়জীবন নন্দও বোধ হয় যমুনায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। তাঁহার সাধের পুত্তলী যেখানে গিয়াছে তিনিও বোধ হয় সেই খানেই যাইবেন।" কৃষ্ণের বয়স্যগণ প্রমুখাৎ এই সকল দুঃখপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দ, যশোদা, গোপ, গোপীগণ দুঃখে আকুল হইয়া উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে করিতে হ্রদতীরে আসিয়া উপনীত হইল। স্বয়ং অনন্ত দেবও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবগত হইয়াও সকলের এই মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে ব্যথিত হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে মাতা যশোমতী শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়ের ভোগবন্ধনে আবদ্ধ দেখিয়া কপালে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া কহিলেন "ঐ আমার প্রাণের গোপাল সর্পজড়িত নিশ্চেষ্ট অবস্থিত রহিয়াছে। কে তাহাকে আনিয়া আমার ক্রোড়ে অর্পণ করিবে? কেমন করিয়াই বা তাহাকে উদ্ধার করিব? তিনি বার বার বার বলভদ্রের দিকে অবলোকন করিয়া স্বীয় দুঃখভার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। আলুলায়িত কেশপাশ দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ পূর্ব্বক উৎপাটিত করিতে লাগিলেন। বলভদ্রকে গোপালের উদ্ধারার্থে যত্নবান হইতে কহিলেন কিন্তু ভীষণ সর্পসদনে কোন্ প্রাণে তাঁহাকে পাঠাইবেন? সে কথা মায়ের মুখ দিয়া ফুটিল না। তখন হতাশ্বাসে তিনি আছাড়ি বিছাড়ি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নন্দও তদ্দৃষ্টে বিষাদে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া যমুনাজলে ঝম্পপ্রদানে উদ্যোগী হইলেন। গোপ গোপীকুল সকলে বিষাদপাথারে নিমগ্ন হইয়া কৃষ্ণের অনুবর্ত্তী হইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই নিদারুণ সর্ব্বনাশকর ব্যাপার খণ্ডনার্থে স্বয়ং বলরাম সকলকে সান্ত্বনা দিয়া কৃষ্ণানয়নে যত্নবান হইলেন। তিনি হ্রদতীরে উপনীত হইয়া ভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন "কৃষ্ণ! তোমার প্রাণ কি এতই নিষ্ঠুর! পিতা নন্দ ও মাতা

যশোমতী তোমাকে ভোগবন্ধনে নিবদ্ধ দেখিয়া প্রাণত্যাগের উদ্যোগী হইয়াছেন। গোপ গোপীকুল হাহাকাররবে অশ্রুসেচনে হ্রদতীরভূমি ভাসাইয়া দিতেছে। বয়স্যনিকর দুঃখাভিভূত হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ক্রন্দন ও হাস্য করিতেছে। তুমি অবিলম্বে কালিয় মর্দ্দন করিয়া তাহাদের সন্নিকটে আগমন কর। নতুবা তাহাদের কাতরতা আমার অসহ্য হইয়াছে, আমিও তোমার সাহায্যার্থে গমন করিব।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মর্দ্দন।

বলরামের ভৎসনাসূচক ব্যাক্যাবলী শ্রবণগোচর করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আত্মদেহ স্ফীত করতঃ কালিয়ের ভোগবেষ্টন হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। তদ্দর্শনে বলরাম প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জনক জননী ও গোপগোপীগণ সকাশে আগমন করিলেন। মাতা যশোদা বলভদ্রকে একাকী আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন "বাবা! তুইও কি কৃষ্ণকে জন্মের মত বিদায় দিলি? এ প্রাণ লইয়া কেনই বা আমরা পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিব?" বলভদ্র তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন ইতিমধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের মস্তকারোহণ পূর্ব্বক বংশীধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন বংশীবাদন শব্দে সকলের হৃদয়জ্বালা নির্ব্বাপিত হইল। সকলে শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেই দিকেই দৃষ্টি করিয়া রহিলেন।

অনন্তর বিক্রমশালী ভগবান কালিয়ের মস্তকোপরি নৃত্যচ্ছলে তাহার ফণাসকল ভঙ্গ করিতে লাগিলেন। তাহার মুখ দিয়া রক্তবমন হইতে লাগিল। সর্পরাজ একান্ত হীনতেজ ও অবশাঙ্গ হইল দেখিয়া তাহার ভার্য্যাগণ আলুলায়িতকেশা, বিগলিতবসনা ও কাতরা হইয়া ভগবান সন্নিধানে উপনীত হইল ও তাঁহার মঙ্গলময় চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সাধ্বীগণ অনন্তর করযোড়ে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন:—

নরক-নিসূদন কালিয়-মর্দ্দন
বনমালা-ভূষণ মঙ্গল-কারণ
কংসমদার্ণব মন্থন-কারি
ভবভয়-সংহর কাল-নিবারি।

শিখিপুচ্ছশোভিত চিকণ চিকুর
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ মনোহর
ক্ষত্র কুলান্তক সুচক্রধারি
ভবভয়-সংহর কাল-নিবারি।
সমুদ্র মন্থনে গরল উঠিল
দেবাসুর সবে বিবাদে মাতিল
মোহিনী রূপ ধরি তারিলে সমস্তে
ত্রাণ করহ তুমি দেব নমস্তে।
পুনরপি মন্থনে গরল উঠিলে
বিরূপাক্ষ রূপ ধরি তাহারে গ্রাসিলে
কেতু-মুণ্ডচ্ছেদন দেব নারায়ণ
ত্রাণ করহ তুমি আশ্রিত রক্ষণ।
ত্বংহি বিরূপাক্ষ ত্বংহি মুরারি
তুমিই কেশব সৃজন-লয়কারী
ত্রিভুবন-তারণ গদাপদ্ম হস্তে
ত্রাণ করহ তুমি, দেব নমস্তে।
হে যদুনন্দন রাধিকারঞ্জন
গোপজনমোহন পূতনা-ঘাতন
দশরথ-আত্মজ রাম রঘুবর
ধরি রূপমোহন রাবণ সংহর।
প্রলয় জলধিজলে মীন-বেশ-ধর
উদ্ধার করিলে তুমি বেদ চত্বার
ভৈরব বিকট নৃসিংহ রূপধারি
প্রহ্লাদতারণ প্রণাম তোমারি।
ভবভয় বন্ধন মোচনকারী
ত্রিপথগা মন্দাকিনী যার পদবারি
আশ্রিত জনার প্রভু বিপদ নিবারি
ত্রাণ করহ তুমি দেব মুরারি।
বলি বৈরোচন ছলনা কারণ
বামনরূপধর তুমি নারায়ণ

সুররাজ বাসবে স্বরগ উদ্ধারি
রক্ষিলে সবার মান দেব মুরারি।
হে হরি ভবভয়-তারণ-কারণ
কালিয়-মস্তকে অর্পিলে চরণ
পদরজ তব প্রভু মাখিয়া সকলে
সেবিব আমরা তব শ্রীপদকমলে।

প্রভো! দুষ্টমতি খলের দণ্ডবিধানর্থই আপনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি আমাদিগের স্বামীর যথার্থ দণ্ডবিধান করিয়াছেন। আপনি সর্ব্ব-ভূতে সমদৃষ্টি। আপনি মঙ্গলের নিমিত্তই অসতের দণ্ডবিধান করেন, নতুবা দন্দ্বচ্ছলে আপনার দুর্লভ পদরেণু কেন ইহাঁর মস্তকে অর্পণ করিবেন? আপনার শ্রীচরণস্পর্শে উনি সত্বরই উদ্ধারপ্রাপ্ত হইবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। হে ভগবন্! যে পদধূলি ইচ্ছা করিলে সংসারী জীবের সর্ব্ব সম্পৎলাভ হয় ও যাহা অন্য উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব; এই সর্পরাজ তমোগুণান্বিত এবং ক্রোধপরবশ হইয়াও সেই পদরজঃ প্রাপ্ত হইলেন, ইহা আপনার অনুগ্রহ ব্যতিরেক আর কি হইতে পারে?

নাগপত্নীগণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে স্তুত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত ও ভগ্নশীর্ষ উরগরাজকে আর মর্দ্দন করিলেন না। লব্ধপ্রাণ কালিয় ক্রমশঃ সতেজ হইয়া সকরুণস্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে হরিকে নিবেদন করিলেন "আমরা খলপ্রকৃতি ও সহ-সমুদ্ভূত হইয়াছি; এক্ষণে সেই খলস্বভাব পরিত্যাগ করা বড়ই সুকঠিন, আপনার করুণা ব্যতিরেকে তাহা কখনই হইতে পারে না। এক্ষণে নিবেদন অনুগ্রহ বা নিগ্রহ, যাহা আপনার অভি-প্রেত হয়, তাহাই করুন।" তখন মধুসূদন হরি কহিলেন "সর্প! তুমি আর এস্থলে বাস করিতে পারিবে না। তুমি সপরিবারে সমুদ্রমধ্যে গিয়া বাস কর। এই কালিন্দী-হ্রদ আমার ক্রীড়াহ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে এবং যে ব্যক্তি উপবাস করতঃ এই স্থানে স্নান তর্পণাদি করিবেন, তিনি সকল পাপ নির্ম্মুক্ত হইবেন। আর তোমার উদ্ধারের উপায় আমি বৈকুণ্ঠভবনে তোমাকে জানাইয়াছি; পূর্ব্বনিদর্শন দৃষ্টে তোমার জন্মান্তরীণ ক্রিয়া-কলাপ স্মরণপথে পতিত হইবে, তখন তুমি প্রিয়াসকাশে তাহা বর্ণনা করিলে শ্রোতা ও শ্রাবক উভয়েই মুক্তিলাভ করিবে। আর মদীয় বাহন গরুড় তোমার প্রতি অত্যাচার করিবে না। মদীয় পদচিহ্ন তোমার মস্তকে দর্শন করিলেই

তখন স্বয়ং কালিয় ও নাগপত্নীগণ বিবিধ মহামূল্য রত্ন, উপকরণাদি ও পুষ্পচন্দন, মাল্যদ্বারা তাঁহার পূজা করিলে তিনি সেই সকল মাল্য, গন্ধপুষ্প ও বসনভূষণে মণ্ডিত হইয়া হ্রদতীরে আগমন করিতেছেন দেখিয়া নন্দ, যশোদা, গোপ, গোপী রাখালবালকগণ প্রভৃতি সকলেই মহাহ্লাদে উন্মত্ত হইল। বলভদ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও গোপগোপীকুল তাঁহার পূজা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সমুদ্র নিকেতনে।

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে কালিয় কালিন্দীহ্রদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপরিবারে সমুদ্রমধ্যে গিয়া বাস করিলেন। কালিন্দীহ্রদ হইতে উত্থান পূর্ব্বক সমুদ্রে-গমন কালে গরুড় তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গরুড়কে দর্শন মাত্র মহাভয়েভীত কালিয় ফনা বিস্তার করিলে, গরুড় তাহার শীর্ষদেশে শ্রীকৃষ্ণ পদচিহ্ন দর্শন করিয়া অনুসরণে বিরত হইলেন। কালিয় ধীরে সুখে সমুদ্রবাস আশ্রয় করিলেন।

বহুদিবস কালিয় সমুদ্রমধ্যে অবস্থান করিলেন। সমুদ্রের অগাধ জলে মৎস্য, জলচরজন্তু প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া অতীব কঠিন। সুতরাং আহারীয়-সংস্থান জন্য কালিয়কে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইত। সমুদ্রভবন হইতে বহির্গত হইয়া বহুদূর ভ্রমণ করিয়াও কালিয় স্বীয় উদর সম্যকরূপে পরিপূর্ণ করিতে অসমর্থ, তাহার উপর ভার্য্যা পুত্রগণের জন্য কি সংগ্রহ করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। আহারাভাবে জীর্ণ শীর্ণ কালিয় একদিবস অনন্যোপায় হইয়া সমুদ্রবক্ষে ভাসমান হইলেন। দেখিতে পাইলেন নানাবিধ পদার্থ স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। অর্ণবযান মধ্যবর্ত্তী মনুষ্যপরিত্যক্ত নানা-বিধ, আহারীয় দর্শনে কালিয় উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিলেন এবং পুত্র ও ভার্য্যাগণের জন্য যথেষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই অবধি কালিয় প্রতিদিন সমুদ্রবক্ষে ভাসমান দ্রব্যাদি ভোজন ও সংগ্রহপূর্ব্বক নিজের ও পরিবারগণের জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে একদিবস কালিয় পুতিগন্ধবিশিষ্ট মৃত মনুষ্যদেহ দেখিতে পাইলেন। তন্মধ্যে মৎস্যাদি বিবিধ জলচরজন্তু মিলিত হইয়া সেই মাংস ভক্ষণে রত হইয়াছে।

কালিয় তাহা দর্শনমাত্র মহাহ্লাদে সেই সকল জলজন্তু আহার করিতে লাগিলেন। স্রোতে নীয়মান শবদেহের সঙ্গে সঙ্গেই কালিয় গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই জীবভক্ষণতৎপর কালিয় কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটী হংস ও হংসীকে দেখিতে পাইলেন। তাহারা কালিয়কে দর্শন করিয়া কিছুমাত্রও ভীত হইল না। পুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে মহাহ্লাদে রব করিতে করিতে, পদরূপ বহিত্র বাহিয়া কালিয়ের নিকট দিয়া গমনাগমন করিতে লাগিল। কালিয় তদ্দর্শনে সৃক্কণীলেহন করিতে করিতে সেই হংসদম্পতীকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। তখন হংস রোষপরতন্ত্র হইয়া কহিল "কালিয়! হিংস্রস্বভাববিশিষ্ট হইয়া কি তুমি দয়া, লজ্জা প্রভৃতি ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়াছ? তুমি একবার আমাদিগের প্রাণবধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলে, তখন ভগবানের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিলাম। এক্ষণে পুনরায় আমাদিগের দর্শনপ্রাপ্তিমাত্রই দংশন জন্য শীর্ষ উন্নত করিয়াছ! তুমি পূতিগন্ধ সহ্য করিতে পার না, এক্ষণে কি প্রকারে এই শবদেহ মধ্যবর্ত্তী জীবসমূহ ভোজনে উদরপুর্ত্তি করিতেছ?" হংসের সেই বজ্রকঠিন বাক্যে কালিয় মর্ম্মাহত হইয়া কিয়ৎকাল তাহাকে নিরীক্ষণ করিল। সহসা হংস হংসীকে চিনিতে পারিলে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায় তাহার স্মরণপথে উদিত হইল। তখন কালিয় বাষ্পপূর্ণনয়নে বিনীতভাবে তাহাদিগকে কহিল "হংসরাজ! আমি তোমাদিগকে চিনিয়াছি, তোমরা আমার উদ্ধারহেতু যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলে, কিন্তু খলপ্রকৃতিবশতঃ তোমাদিগের সদুপদেশ অবহেলা করিয়া আমি এই সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়া অশেষ ক্লেশসহকারে জীবনযাপন করিতেছি। তোমরাই আমার সৌভাগ্যের সেতু। পূর্ব্বজন্মে এতাদৃশ সেতু অবহেলা করিয়া যে কষ্ট পাইলাম তাহা কখন ভুলিব না। এ জন্মেও তোমরা আমার সৌভাগ্যবলে পুনর্দর্শন দিয়াছ! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলিয়া দিয়াছেন পূর্ব্ব নিদর্শন দর্শনে তোমার জন্মান্তরীণ কথা সকল স্মরণ হইবে। এক্ষণে আমি মদীয় পূর্ব্বজন্ম যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। ভগবানের বরে আমি সেই সকল বৃত্তান্ত প্রিয়াসকাশে বর্ণনা করিলে মুক্তিলাভ করিব। তোমাদিগকে আর কি বলিয়া অভিবাদন করিব? আমার এক্ষণে সম্যক্ প্রতীতি হইতেছে তোমরাই সেই ভগবান্ হংসমূর্ত্তি ধারণ করতঃ আমার উদ্ধারকল্পে আমাকে দর্শন দিয়াছ। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া শ্রীপদকমল আমার মস্তকে ধারণপূর্ব্বক প্রিয়াসকাশে এই বিষয় বর্ণন করিবার আদেশ দাও। আমি

আর গৌণ করিতে পারিতেছি না, আমার হৃদয়মধ্যে প্রাণপুরুষ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আশীর্ব্বাদ কর সর্পযোনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া সেই জনার্দ্দনের চরণকমলে আশ্রয়প্রাপ্ত হই।"

হংস তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দান করিলে কালিয় রিক্তহস্তে স্বভবনে গমনপূর্ব্বক প্রিয়াকে আহ্বান করিতে করিতে গৃহপ্রবিষ্ট হইতেছেন, কালিয়ভার্য্যা 'অদ্য কি দ্রব্য পাইয়াছ, পুত্রগণ ক্ষুধাকাতর হইয়া নিরতিশয় কষ্টভোগ করিতেছে" বলিতে বলিতে স্বামীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে রিক্তহস্ত নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ণবদনে কহিলেন "হা নাথ! অদ্য উপায় কি! কেমন করিয়া পুত্রগণের জীবন রক্ষা হইবে? তুমি রিক্তহস্তে বাটী আগমন করিয়াছ শুনিতে পাইলে ক্রন্দন করিয়া সকলকে আকুল করিয়া তুলিবে।" কালিয় কহিলেন 'প্রিয়ে! অদ্য যে দ্রব্য আনিয়াছি তাহা পাইলে আর কখন পুত্রকন্যার জন্য এরূপ উদ্বিগ্ন হইবে না। এক অপূর্ব্ব কাহিনী তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর ইহা শ্রবণে তনয়াদি আত্মীয়গণের জন্য উৎকণ্ঠা দূরীভূত হয়।" পতির আগ্রহাতিশয্যে সতী সাধ্বী কালিয়-ভার্য্যা তাহা শ্রবণ করিতে সমুৎসুকা হইলেন, তখন কালিয় তৎসন্নিধানে সেই অপূর্ব্ব কাহিনী বর্ণনা করিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীভুধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বৈষ্ণব তত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। (২)

'দুর্গা'। ভগবানের সর্ব্বময়ী সৰ্ব্বশক্তির নাম দুর্গা অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্বস্বরূপিণী শক্তি। দৈত্য=মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, পাপ, শোক, নরক, যম, দণ্ড, জন্ম, দুঃখ মহাভয়, মহাব্যাধি, এ সকলকে দুর্গ বলে, শঙ্কট বলে। যে নারায়ণী শক্তি ঐ সকল দুর্গ অর্থাৎ শঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন, শঙ্কটকে বিনাশ করেন তিনি শঙ্কট্যাদেবী, দুর্গা। ইনি হিমালয়ে পার্ব্বতী, কৈলাসে সতী, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, গোলোকে রাধিকা। ইনি সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা। পশুবল রূপ মহিষাসুরকে বিনাশ করেন; আদি-ভূতা নারায়ণী শক্তি।

ছিন্নমস্তা=ব্রহ্মশক্তি ভগবতী প্রকৃতি দেবী আপনার রসেই আপনাকে পোষণ করেন; ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি ইহারই রূপক মাত্র। ছিন্নমস্তা নিজদেহ নিঃসৃত তিনটী শোণিত ধারা, নিজ মুণ্ডকেই পান করাইতেছেন। ঐ তিনটী

শোণিত ধারা দেহের তিনটি নাড়ী হইতে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ তিনটি নাড়ীর নাম ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। সুষুম্না সর্ব্বপ্রধান। ইহা চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি স্বরূপা। ইড়া নাড়ীর মধ্যে চন্দ্রের সঞ্চার, পিঙ্গলার মধ্যে সূর্য্যের সঞ্চার এবং সুষুম্নায় চন্দ্রও সূর্য্য উভযের সঞ্চার। অর্থাৎ এই তিন নাড়ী চন্দ্র সূর্য্য হইতে রস আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য নাড়ী চক্রকে পোষণ পূর্ব্বক জীবদেহ রক্ষা করিতেছে। অর্থাৎ ত্রিগুণা প্রকৃতি দেবী চন্দ্র সূর্য্যাদিরূপ নিজ নাড়ী হইতে নিঃসৃত শোণিতাদি রূপ রসধাতু দ্বারা সৃষ্টি প্রবাহ পোষণ করিতেছেন।

হরগৌরী মূর্ত্তি=অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির চিত্রখানি দেখিলে স্থুল ভাবে এই জ্ঞান হয় যে আধখা। প্রকৃতি ও আধখানা পুরুষ। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে সে ভেদ ঘুচিয়া যায়। স্থূলদর্শীরা যে আধখানায় শুধু শক্তিমূর্ত্তি দেখেন, সূক্ষ্মদর্শীরা তাহার প্রত্যেক পরমাণুতেই শিবমূর্ত্তি দেখেন। আবার স্থূলদর্শীরা যে আধখানায় শুধু শিবমূর্ত্তি দেখেন, সূক্ষ্মদর্শীরা তাহার প্রতি পরমাণুতেই শক্তিমূর্ত্তি দেখেন। এইরূপে শিবে শক্তি ও শক্তিতে শিব, দুয়ে এক, ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি।

তারা=সুখ-মোক্ষ প্রদায়িনী ও তারণকর্ত্রী এবং উগ্র ঘোর বিপদ হইতে ত্রাণ করায় উগ্রতারা নামে অভিহিত।

জগদ্ধাত্রী=যে শক্তি পশুবলকে শাসন করেন।

কালী=যিনি পাপের রক্তবীজের ধ্বংস করেন। সমগ্র বিশ্ব কলিত বা সংগ্রসিত হয় বলিয়া কালী নাম, ইনি মূল প্রকৃতি রূপে বিকশিত।

লক্ষ্মী=ঐশ্বর্য্য রূপিণী নারায়ণী শক্তি।

সরস্বতী=জ্ঞান, বিদ্যা, বেদ, গায়িত্রী-রূপা নারায়ণী শক্তি।

কার্ত্তিক=পুরুষকার বা কুমারদেব, বীর।

গণেশ=জ্ঞান, বিদ্যা।

মহাকাল=অনন্তকাল। প্রকৃতি নিত্য অন্নপূর্ণারূপে কালকে নিত্য অন্ন যোগাইতেছেন।

শিব=শঙ্কর, শম্ভু; নিরাকার, নির্ব্বিকার, আনন্দস্বরূপ আত্মা। শক্তি-যুক্ত হইলে শিব, তিনি কর্ম্মশীল ও সগুণ, তিনিই মাতাপিতা আদিরূপে উপাস্য। ই=শক্তি; ই বিনা শিব হয়েন শব, নির্ব্বিকার। শিবলিঙ্গ=অনন্ত ঈশ্বর, সৎচিৎ আনন্দরূপ, শালগ্রামশিলা অনন্ত ঈশ্বরের রূপক। তমোগুণ personifiedl তমঃ-নিয়ামক controller of তমঃ, তমঃ ভিন্ন নাশ হয় না।

আদ্যাশক্তি=মহাশক্তি। মহাশক্তিতে ক্ষুদ্র শক্তি সমুদয় লীন থাকে। জগদম্বার ধনু জ্ঞানের রূপক এবং বাণ, বিজ্ঞানের রূপক।

সিংহ=চৈতন্য, ধর্ম্ম, ইহা মহাশক্তির বাহন।

মহিষ=মোহ। মহিষাসুর=পশুবল, পাপ, ইন্দ্রিয়।

অসুরদল=কাম, ক্রোধ ইত্যাদি। অসুর=রিপু।

দেবদল=শম, দম, তিতিক্ষা, ধৃতি, উপরতি আদি।

অজ্ঞানভূমি—ভোগবিলাসের দৃঢ়তা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফল—সংসার-বন্ধন হেতু দুঃখ প্রাপ্তি।

জ্ঞান, অজ্ঞান—জ্ঞানই স্বর্গ, অজ্ঞানই নরক। জ্ঞানের ফল সুখ এবং অজ্ঞানের ফল দুঃখ। এই জ্ঞানাজ্ঞানের বা সুখ দুঃখের আধার বা আশ্রয় এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ। সুতরাং এই পাঞ্চভৌতিক দেহই স্বর্গ ও নরক-ভোগের প্রশস্ত আয়তন। শরীরে সত্বগুণের আধিক্যের নাম স্বর্গ এবং তমোগুণের আধিক্যের নাম নরক। জীবিতাবস্থাতেই স্বর্গ ও নরক ভোগ হয়।

ষোড়শকলা—প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য্য, তপ, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোক এবং নাম। এই ষোল-কলা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ=দৃশ্য পদার্থের অদৃশ্যভাব ঘটাইবার কর্ত্তা তম অর্থাৎ অন্ধকার। ব্যক্তের কর্ত্তা সত্ব অর্থাৎ আলোক। এই আলোক ও অন্ধ-কারের মধ্যবর্ত্তীকে রঞ্জন, রং, রজঃ বলে। আলো ও অন্ধকারের ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়া হইতেই রজঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অধ্যাস=পূর্ব্বজন্ম অর্থাৎ জন্মান্তর দৃষ্ট পদার্থাদির প্রকাশ; পরলোকে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহে স্মৃতিরূপে অধিভাসিত হইয়া বর্ত্তমান জন্মে যে অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম অধ্যাস। এই অধ্যাসই জীবের পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর হেতু। মৃত্তিকা সুবর্ণাদিতে ঘট কবচাদি কল্পনাবৎ অধিষ্ঠান বলিয়া, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ এবং মায়াবী-বৎ জগতের নিয়ন্তৃত্বহেতু নিমিত্ত কারণ। সুবর্ণই বলয়ত্ব, অথচ বলয়ত্ব সুবর্ণে নাই; জলই তরঙ্গত্ব, অথচ তরঙ্গত্ব জলে নাই। সেইরূপ ব্রহ্মই জগদ্রূপত্ব অথচ জগদ্রূপ ব্রহ্মে নাই।

মোক্ষ=অমরণকে অমৃত বা অপবর্গ বলে অথবা মোক্ষ। ব্রহ্মের একটী নাম অমৃত। মোক্ষলাভ হইলে আর জীবের পুনরাবর্ত্তন হয় না।

বাসনাই জন্মমৃত্যুর হেতু, মরণধর্ম্মী, মৃত্যু। নির্ব্বাসনাই অমরণধর্ম্মী, অমৃত।

আয়ু—গর্ভবাসকাল হইতেই শাস্ত্রে আয়ুগণনার ব্যবস্থা। জীব-শরীরের অবস্থা চারিটি। প্রথম জন্ম হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বর্দ্ধন অবস্থা। ৩২—যৌবনাবস্থা ৪০——পূর্ণ বীর্য্যাবস্থা; পরিশেষে ক্ষয়ান্বিতাবস্থা।

প্রতিবন্ধক—ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধক,—বিষয়াসক্তি, মন্দবুদ্ধি, কুতর্ক এবং বিপর্য্যয় অর্থাৎ মিথ্যা বিষয়ে দৃঢ় অভিনিবেশ।

মৃত্যু—স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহে পরলোকে গমন। তথায় সুখদুঃখাদি ভোগান্তে জীব পূর্ব্বজন্মের বাসনা, ভাবনা ও কর্ম্মদ্বারা নূতন দেহ রচনা করে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। কাহাকেও বেদনা না দিলে, দিব্য দেহ লাভ হয়। জীবমাত্রে অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

পাপপুণ্য—যাহাতে জগতের শ্রেয় হয়, যে কর্ম্মের দ্বারা তাহার সহায়তা করে, তাহা পুণ্য। যাহাতে তাহার ব্যাঘাত হয় তাহাই পাপ।

অনুতাপ—অনুতাপই পাপের সাক্ষাৎ প্রায়শ্চিত্ত।

প্রায়শ্চিত্ত—যাহার দ্বারা পাপীর পাপক্ষয় ও সমাজে ব্যবহার্য্যতা লাভ হয়, তাহাই প্রায়শ্চিত্ত। পাপ-নিবৃত্তির যত কিছু প্রায়শ্চিত্ত আছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণানুসরণই শ্রেষ্ঠ। স্নানাদি কালে নারায়ণের ধ্যান দুস্কৃতি হইতে মুক্তির প্রায়শ্চিত্ত। পরের অনিষ্ট দ্বারা যে পাপোৎপত্তি হয়, রাজশাসন দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্তি হয় এবং স্বানিষ্ট-জনন পাপ প্রায়শ্চিত্ত বা সমাধিদ্বারা নিরাকৃত হয়। সুবুদ্ধি রায়কে সৈয়দ হুসেন খাঁ বলপূর্ব্বক তদীয় স্পৃষ্ট জল পান করাইলে, তার প্রায়শ্চিত্ত হেতু চৈতন্যদেব বলেন ঃ—

“নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম সদা লবে, কৃষ্ণনামে স্থিতি।
মহাপাতকের হয়, এই প্রায়শ্চিতি ॥”

মানবগণ যদি একবার পাপ করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তাহারা তপস্যা, যজ্ঞ, দান দ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। মানব যে কোন পাপে আসক্ত হউক না কেন, সেই পরব্রহ্ম, অচ্যুত পুরুষের ক্ষণকাল স্মরণেই তাহার সমুদায় পাপ বিধৌত হইয়া যায়। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ, পথমাত্র, কিন্তু ভক্তিই সর্ব্বোপরি।

পাপ তিনপ্রকার ঃ—কায়িক পাপ,—প্রাণিহত্যা, চৌর্য্য, পরদারগমনাদি। পরদ্রব্য হরণ, প্রহারকরণ ইত্যাদি।

বাচিক পাপ—অসৎপ্রলাপ, পারুষ্য, (যেমন অন্ধকে পদ্মলোচন বলা) এবং মিথ্যা কথনাদি। কটূক্তি ইত্যাদি অসদালাপ।

মানস পাপ—পরধনে চিন্তা, সর্ব্বজীবে দয়াশূন্যতা এবং নিজকৃত কর্ম্মের ফল চিন্তা। ভগবানে কর্ম্মফলার্পণ না করিয়া তৎফললাভ চিন্তা করা। পরের অনিষ্ট চিন্তা।

জলাদি দ্বারা বাহ্য মল এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা মনের মল নাশ হয়। নরক-যন্ত্রণা নাশের মুখ্য উপায় অন্তর-সাধন, মনের নিগ্রহ। নরক-যন্ত্রণাদির মূল বীজ চিত্তমলরূপ মূল অজ্ঞান বা অধ্যাস, মনোনিগ্রহ-যুক্ত ব্রহ্মধ্যানরূপ অন্তর-সাধন ব্যতীত কিছুতেই বিদূরিত হইবার নহে। কর্ম্ম হইতে দেহ এবং পুনঃ দেহ হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। স্বর্গ ও নরকাদি ভোগ দেহেই হইয়া থাকে। দেহের মূল—কর্ম্ম, সেই কর্ম্মদ্বারা চিত্ত মলিন হয় এবং সেই চিত্তমল হইতে ভোগাদির বৃদ্ধি হয়। অতএব সমল চিত্তকে অমল করিতে পারিলেই নরক-যন্ত্রণাদি অন্তর্হিত হইয়া যায় ও স্বর্গসুখ উপভুক্ত হয়। প্রধান ঔষধ—যোগ; এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য উহার অনুপান। কর্ম্মই পিতৃলোক প্রাপ্তির বা পুনঃ দেহাদি উৎপত্তির কারণ, জনক বা পিতা। দেহ আছে বলিয়াই কর্ম্মাদি সম্পাদিত হইয়া থাকে, অতএব দেহই কর্ম্মের জনক এবং কর্ম্মই দেহের জনক। কর্ম্ম হইতে দেহ এবং দেহ হইতে কর্ম্ম। প্রথমতঃ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে পর নিষ্কামভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। জীব জীবিতকালে যে সকল চিৎ শক্তি প্রবর্ত্তিত করে, দৈহিক প্রবলতার তারতম্য অনুসারে দেহান্তের পূর্ব্বেই তাহাদের অনেকাংশই অপরিতৃপ্ত থাকায়, ঐ বাসনার আবেগ বশতঃ আকর্ষণ হেতু সূক্ষ্ম দেহাচ্ছিন্ন জীবের পুনর্দেহ ধারণ অবশ্যম্ভাবী। মুক্ত পুরুষের আপ্তকাম হেতু বহিরাকর্ষণ না থাকায়, দেহান্তকালে তাহার প্রাণ ছিদ্রপথে উৎক্রমণ-করে এবং হয় কোন উর্দ্ধলোকে, চন্দ্র বা নক্ষত্র লোকে, বা মধ্যস্থ বা অধস্থ লোকে মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে; মৃত্যুকালে যে ভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, সেই ভাব প্রবল হইয়া মুমুর্ষুকে তদনুরূপ গতি প্রদান করে। অর্থাৎ মুমুর্ষুর ভাবনাময় শরীর বা অতিবাহিক দেহ তদাকারে আকারিত হয়, এজন্যই তাহাকে ভগবৎ নামাদি শুনান হয়। কিন্তু মুমুর্ষু জীবের পূর্ব্বের

অভিনিবেশ, পূর্ব্বের ধ্যান ও পূর্ব্বের অভ্যাসবশতঃ তৎকালে ঈশ্বর-বিষয়ক ভাব-শরীর ও তদনুরূপ প্রাণ-বিনির্গমন হওয়ার সম্ভাবনা। মনুষ্য শারীরিক কর্ম্মদোষে বৃক্ষাদিরূপে, বাচনিক কর্ম্মদোষে পশু-পক্ষ্যাদিরূপে এবং মানসিক কর্ম্মদোষে নীচজাতিরূপে উৎপন্ন হয়। বৃক্ষলতাদিতেও জীব সংস্থান আছে; বৃক্ষাদি জড় নহে, চেতন।

ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক

আধ্যাত্মিক—রোগ, শোক, ক্ষুধা তৃষ্ণাদি।

আধিভৌতিক—শত্রুভয়াদি, ব্যাঘ্র সর্পাদি হিংস্রজন্তু এবং অগ্নি জল ইত্যাদি হইতে যে ক্লেশ তাহা আধিভৌতিক।

আধিদৈবিক = গ্রহ অদৃষ্টপীড়াদি, বজ্রপাত, অভিশাপ ইত্যাদি। এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে উদ্ধারই পরম পুরুষার্থ। পরমাত্মাতে মন সমাহিত হইলে ইহা লাভ হয়, অর্থাৎ ইহা ভক্তিলভ্য। সকাম বা নিষ্কাম যে কোন কর্ম্মই হউক না কেন, ভক্তি ভিন্ন কিছুতেই সুফল লাভ হইতে পারে না।

নিবেদন—ব্রহ্মার্পণ। নিবেদন অর্থাৎ ব্রহ্মার্পণ করিয়াই পানভোজন বিধি। যে কোন কর্ম্মই কর তাঁহাতে নির্ভর কর। utter resignation.

ধর্ম্ম = যদ্দ্বারা নিঃশ্রেয়স সাধন হয়, তাহাই ধর্ম্ম। অপবর্গই নিঃশ্রেয়স। আধ্যাত্মিক দুঃখ-নিবৃত্তির নাম অপবর্গ। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়; মিথ্যাজ্ঞান নাশে দোষ নষ্ট হয়; দোষের সঙ্গে প্রবৃত্তি নষ্ট হয় এবং প্রবৃত্তির সঙ্গে জন্ম নষ্ট হয়। জন্মের নাশে দুঃখের নাশ হয় এবং দুঃখের নাশেই অপবর্গ-লাভ। চিত্তবৃত্তির নিরোধ সাধনই যোগ। এই নিরোধসাধন হইলে যে-জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, সেই জ্ঞানোদয়ে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। অতএব যোগসিদ্ধ হইতে পারিলে আত্মজ্ঞানলাভ হয় এবং মুক্তিলাভ করিয়া আত্মাকে শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত করিয়া তাঁহার স্বরূপ পূর্ণতা দর্শন হয়।

নিত্যবুদ্ধ—যিনি বাহেন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ যাঁহাকে চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। ভক্তি দ্বারাই দেখা যায়। যিনি সদাই জাগ্রত অর্থাৎ অনন্তদেশ ও অনন্তকাল ব্যাপিয়া চৈতন্যরূপে অবস্থিত।

ভাবনা—চিত্তপ্রসাদকারিণী চারিটী ভাবনা সাধন করিতে করিতে অন্তরাত্মার মধ্যে শোকবিরহিত জ্যোতির্ম্ময় স্থায়ী সাত্বিকভাবের উদয় হয়। ভাবনা চারিপ্রকার,—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

মৈত্রী—সর্ব্বভূতে মিত্রতা; সমভাবে সকলেরই হিতকামনা এবং সকলেরই সুখে আনন্দ অনুভব করা।

করুণা—দুঃখিত প্রাণী মাত্রেরই দুঃখমোচনের জন্য ঐকান্তিক যত্ন।

মুদিতা—পুণ্যশীলগণের পুণ্যকর্ম্মে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন।

উপেক্ষা—পাপকর্ম্মে অনুমোদন না করা এবং পাপীর প্রতি ঘৃণা না করা। এই চারিটি ভাবনা চিত্ত প্রসাদিনী; অর্থাৎ মনের সমস্ত মালিন্য দূর করিয়া মনকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল করে।

সনাতনধর্ম্ম—চিরস্থায়ী ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম সমস্ত সারসতা শিক্ষা দেয়; যাহার ক্ষয় নাই। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। যে ধর্ম্ম হইতে নিঃশ্রেয়স বা স্থিরকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে; যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানবগণ কৃতকৃত্য হয়; ঈপ্সিততমের দর্শনলাভ করিয়া ত্রিতাপ-সন্তপ্ত প্রাণকে শীতল করিতে পারক হয়, তাহাই পরমধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম। সদনুষ্ঠানই সনাতন ধর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্বদা দান ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান, বেদ অভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন; ইন্দ্রিয় দমন, সর্ব্বভূতে সমদর্শীতা, সর্ব্বভূতে দয়া প্রদর্শন, সরলতা অবলম্বন, পরদ্রব্যে লোভ-বিসর্জ্জন; জীবমাত্রের অনিষ্টচিন্তা পরিহার, পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা ইত্যাদি। পরের দুঃখ দেখিয়া কাতর হওয়াই প্রকৃত সাধুতা, সেই দুঃখ কোনরূপে দূর করাই প্রকৃত সদনুষ্ঠান।

প্রাণায়াম—প্রণায়াম দ্বারা বায়ু পিত্ত কফদোষ নাশ করিবে, ধারণা দ্বারা পাপ নাশ করিবে এবং প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় সকলকে ও ধ্যান দ্বারা গুণ সকলকে বিনাশ করিবে।

"ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি, তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥

পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে, হৃদয় গ্রন্থি নষ্ট হয়, সংশয়সকল দূর হয় এবং কর্ম্মফল ক্ষয় হয়।

দ্ব্যর্থ-বোধক কতকগুলি শব্দ, যাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা:—

মধুসূদন=(১) শ্রীকৃষ্ণ, (২) ভ্রমর।
অধিকারী=(১) অধিকারযুক্ত, (২) অধিক অরি।
ফলভোগ=(১) অপরাধের দণ্ড, (২) রাধাশূন্যের দণ্ড।
করগ্রহণ=(১) রাজস্বগ্রহণ, (২) পাণিগ্রহণ।
মহাকাল=(১) শ্রীকৃষ্ণ, (২) কৃষ্ণবর্ণ

মাধব = (১) শ্রীকৃষ্ণ, (২) বৈশাখ মাস।
জনার্দ্দন = (১) শ্রীকৃষ্ণ, (২) ক্লেশদায়ী।
বৃষঘাতিন্ = (১) গোহত্যাকারী, (২) গাভীগণের হিংসাকারক।
চন্দ্রশেখর = (১) মহাদেব, (২) ময়ূরপুচ্ছযুক্ত মস্তক শ্রীকৃষ্ণ—
গৌরীপতি = (১) শিব, (২) শ্রীকৃষ্ণ, সকলের শাসনকর্ত্তা।
পশুপতি = (১) শিব, (২) কুমারীপতি শ্রীকৃষ্ণ।
অপরাধ = (১) দোষ, (২) রাধাশূন্যই অপরাধ।
সরাধ = (১) রাধাযুক্ত, (২) অপরাধী নয়, দোষী নয়।

ব্যঙ্গোক্তি যথা ঃ—কাঞ্চন কমল = মুখপদ্ম।
নীলকমলদ্বয় = নেত্রদ্বয়।
মুক্তাশ্রেণী = দন্তসকল।
কাঞ্চন কুম্ভদ্বয় = স্তনযুগল ॥

দেবতা—অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। পৃথক পৃথক দেবতা—ভগবানের পৃথক পৃথক শক্তি।

কমলবন—ষটচক্রভেদ। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রার কমল।

গরুড়—কর্ম্ম ও জ্ঞানময় পক্ষধারী বেদরূপী পক্ষী।

রক্তবীজ—অভিমান। অভিমান যখন বাহ্য বিষয় পরিহার করিয়া কেবল আত্মাতে অনন্তর্বিলীন হয়, তখনই অভিমানের বিনাশ হয়। অভিমান রক্তবীজের ন্যায় কাটিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

চণ্ডমুণ্ড—অভিমান সূচক জ্ঞান ও বুদ্ধি।

শুম্ভ নিশুম্ভ—মন ও অহঙ্কার। যদিও সকল বাসনা (বৃত্তি) থাকে, তথাপি অহংজ্ঞান ও মন বীজরূপে স্থিতি করিয়া থাকে। শুম্ভ যুদ্ধের প্রথমে শক্তিকে বহুধা দেখিলেন; অর্থাৎ যখন বিচার করিবার শক্তি হয়, তখন সকলই ব্রহ্মময় জ্ঞান হয়।

চণ্ডী—শক্তি। ইনি শুম্ভকে শেষে ভুবন হইতে অর্থাৎ মূলাধার হইতে কেশাকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া প্রথমত আকাশে অর্থাৎ বিশুদ্ধ কমলে বা পঞ্চভূতের শেষাবস্থায়, ভৌতিক শেষাবস্থায়, এবং তৎপরে তথা হইতে আরও উচ্চ স্থানে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র, সহস্র বৎসর যুদ্ধের অর্থাৎ সাধনার পর তাহাকে সংহার অর্থাৎ তাহার পৃথক অস্তিত্ব আপনাতে বিলীন করিলেন।

এই যুদ্ধে নিশুম্ভ অর্থাৎ মনের পতন হয় অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মুক্তি হয়। যুদ্ধে পরাভব—বশীভূত করা।

মানব—জীব+শরীর। জীব ঈশ্বরের অংশ, জীবের মৃত্যু নাই, শরীর বিনষ্ট হয়।

গন্ধর্ব্ব—গান বাজনায় নিপুণ লোক।

পিশাচ—(১) ভুত। (২) অসভ্য জাতি; যাহারা পিশিত অর্থাৎ আম মাংস ভোজন করে।

প্রেত—মৃত্যু বা এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ। একবার মরিয়া পুনর্ব্বার দেহধারণের বা পুনর্জন্ম লাভের নাম প্রেত্যভাব। মৃতের জীবদ্দশায় কৃত কর্ম্মাদিই তাহার ভাবী দেহোৎপত্তির হেতু ও প্রধান সহায়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—শেষ সংস্কার বা শেষ যজ্ঞ, দেহান্ত যজ্ঞ নরমেধ যজ্ঞ।

চতুর্দ্দশ ভুবন—ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দ্দশ ভুবনে বিভক্ত। সপ্ত সর্গকে সপ্ত লোক বলে যথা ঃ—ভূঃ, ভুবঃ, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত্য। আর সপ্ত পাতালকে নীচলোক বলে যথাঃ—পাতাল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। ইহারা চতুর্দ্দশ ভুবন কোষ নামে অভিহিত।

অবস্থাত্রয়—মুমুক্ষুর তিন অবস্থা। (১) শুভেচ্ছা, (২) সুবিচারণা, (৩) তনুমানসা। মুমুক্ষুর জন্মগ্রহণ করিতে হয়, ইহা পুরাণাদিতে উক্ত।

সপ্ত জ্ঞানভূমি—শুভদা, সুবিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংশক্তি, পদার্থ ভাবিনী ও তুষ্টগা।

পঞ্চ অবস্থা—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, গাঢ় সুষুপ্তি এবং তুরীয়।

চারি প্রকার জীব—মূঢ়, বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক। কিম্বা অসুর ও দেবতা এই।

জ্ঞান ভূমি=পুরুষের মোক্ষাভিলাষের দৃঢ়তা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফল—মোক্ষ লাভ হেতু পরমানন্দ প্রাপ্তি।

শ্রীআনন্দগোপাল সেন।

বীরভুমের গ্রাম্য ক্রীড়া

একটি অতি বড় প্রাচীন ও সভ্য জাতি, বহু বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়া, এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। যে কারণেই হউক এক নব্য জ্ঞান-দৃপ্ত বৈদেশিক সভ্যতা তাহার অনুষ্ঠান ও সাধনা লইয়া যখন এই প্রাচীন দেশে উপস্থিত হইল, তখন আমরা এক দারুণ মোহ ও বিস্মৃতিতে অভিভূত হইলাম। আমাদের কি আছে অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম না, প্রত্যহ যাহা দেখিতেছি তাহার অর্থ কি তাহা ভাবিবার অবসর পাইলাম না। একেবারে নিজত্ব বর্জ্জন করিয়া—আত্ম প্রকৃতি হইতে সর্ব্বতোভাবে বিচ্যুত হইয়া অন্ধ অনুকরণের স্বপ্নে আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। একেবারেই মৃত্যুর দিকে ছুটিয়াছিলাম, মৃত্যকেই জীবন বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম। ইহাই গত এক শতাব্দীর নব্য ভারতবর্ষেব যথার্থ ইতিহাস।

বিধাতার কৃপায় চক্র ঘুরিয়াছে, চিন্তার স্রোত বিপরীত দিকে বহিতেছে, আজ আমাদের স্বদেশ ও স্বজাতির সভ্যতা ও ধর্ম্ম, আমাদের গৌরব ও প্রেমের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আজ এই মহা জাতির বিশাল সাধনা রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত মহৎ রহস্য লুক্কায়িত রধিয়াছে তৎসমুদয় শ্রদ্ধান্বিতভাবে উপলব্ধি করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন ও কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথির উদ্ধার, প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ, কোন স্মরণাতীত কাল হইতে যে সমস্ত আচার নিয়ম অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সে সমস্তের মর্ম্ম নিরূপণ-চেষ্টা এই চিত্ত-চঞ্চলতার পরিচায়ক মাত্র। নবীন সভ্যতার নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় প্রাপ্ত নগর-সমূহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমাদিগের সর্ব্বস্ব প্রাচীন ও তপস্যা-নিরত ভারতবর্ষ তথা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। জ্ঞান ও শিক্ষার নামে যে আলোক নগর হইতে বহির্গত হইয়া বিহগকলকণ্ঠ-মুখরিত, ছায়া-শীতল শান্ত পল্লীগুলিকে ক্রমে ক্রমে অধিকার করিতেছে; সেই ইন্দ্রজালময় শিক্ষালোক—আমাদের নিভৃত নির্জ্জন পল্লীকুটীরেও ভারতবর্ষকে থাকিতে দিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ়।

যাঁহারা যথার্থ স্বদেশ-প্রেমিক—তাহাদিগকে—আজ এই ভয়াবহ সমস্যার পুরোদেশে বীরের মত দাঁড়াইতে হইবে। পল্লীগ্রামে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গ্রাম্য বালকদিগের ক্রীড়া দেখিতেছিলেন। ইস্কুল কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত

সভ্যবেশধারী নব্য যুবক-সম্প্রদায় অবকাশকালে নগর হইতে গ্রামে আসিয়াছে, তাঁহারা সঙ্গে আনিয়াছেন 'ফুটবল', 'টেনিস' খেলিবার জাল, 'ক্রীকেট ও 'পিংপঙ্গ' প্রভৃতি আরো কত প্রকার নূতন নূতন খেলার উপকরণ ও ব্যবস্থা-পত্র লইয়া তাঁহারা উপস্থিত। পল্লী বালকেরা নূতন খেলায় মুগ্ধ হইতেছে, প্রাচীন খেলা উঠিয়া যাইতেছে, তবুও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীন ক্রীড়ার শেষ অবশেষ চাহিয়া দেখিতেছিলাম। প্রত্যেক ক্রীড়ার অন্তরালে প্রাচীন ভারতবর্ষ সমাধিমগ্ন হইয়া উপবিষ্ট। ভারতবর্ষীয় সাধনার যাহা বিশিষ্টতা, ভারতবর্ষ তাহার প্রাচীন দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, গৃহস্থালির মধ্য দিয়া যে সমস্ত সত্য যুগ যুগান্ত ধরিয়া প্রচার করিতেছেন, এই অতি প্রাচীন গ্রাম্য ক্রীড়াগুলির মধ্যেও সেই সমস্ত মহাসত্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ। শৈশবের মোহ-স্মৃতি-বিজড়িত, কৈশোর-স্বপ্নের নন্দন-মন্দার-সুরভিত, কোটী কোটী কোমল কণ্ঠের কৌতুক-হাস্যরোল-মুখরিত, হে আমার শান্ত পল্লীর ক্রীড়াক্ষেত্রগুলি! আজ তোমাদিগকে তীর্থ বলিয়া মন হইতেছে। তাই আপনাকে ধন্য করিবার জন্য এই সামান্য পুষ্পাঞ্জলির আয়োজন।

১। সিঁদুর টোপাটুপি

বীরভূমের পল্লী সমূহে যে সমস্ত খেলা প্রচলিত আছে, সিন্দুর টোপাটোপি তাহার মধ্যে একটি অতি প্রধান খেলা। বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলাতেও ইহার প্রচলন আছে। বালক বালিকারা বৎসরের সকল ঋতুতেই এই খেলা খেলিয়া থাকে। সাধারণতঃ বালক বালিকারা একত্রেই এই খেলায় যোগদান করে। তবে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ বালকদের দলে বালিকা প্রায়ই থাকে না। কারণ তাহারা বালকদের সমান লাফ দিতে পারে না। লাফ দেওয়া এই খেলার প্রধান অঙ্গ। এই কার্য্যে যাহাদের খ্যাতি আছে, পরস্পর প্রতি-যোগী এইরূপ দুইটি বালক দুই জন (নেতা) 'বুড়ি' হইয়া দুইটি দল পছন্দ করিয়া লয়। এই দল নির্ব্বাচনের সময় পাছে কোনোরূপ মত-বৈষম্য বা গোলযোগ উপস্থিত হয় তজ্জন্য দুই দুইটি সমতুল্য বালক বা বালিকা লইয়া এক একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়, প্রত্যেক শ্রেণীর বালক দুইজনের একজন 'খোলা কুচী' ও অপর জন ঘাস বা এই রকমের যাহা হয় একটা কিছু লইয়া সমস্বরে সুর করিয়া আপন আপন নিদর্শন দ্রব্যের নামে 'কে নিবিরে খোলা কুচি' 'কে নিবিরে ঘাস' ইত্যাদি বলিতে বলিতে হাত ধরাধরি করিয়া হেলিতে

তুলিতে যেখানে 'বুড়ি' দুইজন বসিয়া আছে সেই স্থানে উপস্থিত হয়। বুড়ি দুই জনে 'আয়রে ঘাস' কি 'আয়রে খোলাকুচি' এইরূপ একটা নাম ধরিয়া একজন অগ্রে ডাক দেয়, পরে অপরে ডাকিবে, প্রথমে যে অগ্রে ডাকিবে দ্বিতীয় বারে তাহাকে শেষে ডাকিতে হইবে। এইরূপে দল বিভাগ অর্থাৎ 'খেলোয়ার' নির্ব্বাচন শেষ হইলে আপন আপন দলবলসহ দুইজন 'বুড়ি' দুইটী গোপনীয় স্থানে গিয়া প্রত্যেকে আপন আপন 'খেলিদের' নাম-করণ করে। কাহারো নাম 'চাঁপা, কাহারো নাম 'তমাল', কাহারো নাম 'থালা' ইত্যাদি। এই সময় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয় যে 'কলা গাছটা পড়লো' বলিলে ও দলের নরেন যে 'বিত্তা' বা 'টক্কর' দিয়া গিয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে, এইরূপ 'গোপাল কুণ্ড শুকালো' বলিলে সুধীর ইত্যাদি। কিন্তু স্মৃতি শক্তির অল্পতা বশতঃ বালকবালিকা মণ্ডলে এ সঙ্কেত তত কার্য্যকরী হয় না। আবার অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠের দল এরূপ সঙ্কেত ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া থাকে; এইরূপে নিজ নিজ দলে আইনকানুন শিখানো শেষ হইলে 'বুড়ি' 'আমাদের চিড়া ভিজলো' বলিয়া আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে উপনীত হয়। নামগুলিও সঙ্কেতগুলি যত্নের সহিত গোপন করিয়া রাখা হয়। ৫০ হাত কি ৭০ হাত কি ৮০ হাত অন্তর দুইটী 'কোঠ' স্থাপিত হয়। দুই 'কোঠে' সারি দিয়া দুইটী দল বসিলে পর এক বুড়ি অপর দলে গিয়া একটী (ছেলের) 'খেলির' চো'খ বুজাইয়া ধরিয়া 'আয়রে চাঁপা' কি 'আয়রে তমাল' বলিয়া নিজের দলের একজনকে ডাকিল সঙ্কেত অনুযায়ী একজন 'খেলি' আস্তে আস্তে পা'টী পা'টী করিয়া গিয়া অপর দলের বদ্ধ-দৃষ্টি ছেলেটীর কপালে আঙ্গুলের একটী টক্কর দিয়া। পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে নিজের কোঠে গিয়া বসিল। অমনি তাহার দলের সকলেই 'খেলি খেলি ন'ড়েই বো'স' বলিয়া গাঝাড়া দিয়া উঠিয়া আবার বসিল। উদ্দেশ্য এই যে বিপক্ষ দলের সেই 'টক্কর' খাওয়া ছেলেটীকে না জানিতে দেওয়া, কে উঠিয়া 'টক্কর' দিতে গিয়াছিল। এইবার 'বুড়ি' সেই ছেলেটীর চো'খ খুলিয়া দিল। কে 'টক্কর' দিয়া গেল, ছেলেটীকে তাহার নাম বলিতে হইবে, যদি প্রকৃত নাম বলিতে পারে, তবে সে দ্বিতীয় কোঠের অভিমুখে মধ্যের ব্যবধান পথে একটী লম্ফ দিয়া গিয়া বসিবে। সে নিজে লাফ্ দিতে না পারিলে, 'বুড়ি' তাহার হইয়া লাফ দিয়া বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে। তৎপরে আবার হয় অহার বা তাহাদের মধ্যে অপর একজনের 'চোখ বোজান' হইল, সে

'টক্কর দাতার' নাম করিতে পারিলে পূর্ব্বমত লাফ্ দিয়া আগাইয়া বসিবে। অসমর্থ স্থলে 'বুড়ি' প্রতিনিধিত্ব করিবে। এইরূপে যতক্ষণ মুদ্রিত-চক্ষু বালকের উত্তর প্রকৃত হইবে, অর্থাৎ যাহার 'চোখ বোজান' হইবে সে যতক্ষণ কে টোপা দিল তাহার নাম করিতে পারিবে, ততক্ষণ তাহাদেরই দলের ছেলেদের চোখ বোজাইতে হইবে, এবং তাহাদের উল্লম্ফনের গতি অব্যাহত থাকিবে। বলা বাহুল্য যে নাম ঠিক বলা না হইলে অপর দলের বুড়ি আসিয়া এ দলে একজনের 'চোখ ঢাকিয়া দিবে এবং নিজের দলের ছেলেদের মধ্যে এক জনকে 'টোপা' দিতে ডাকিবে, নাম বলিতে পারিলে 'লাফ' দিবে, না পারিলে বসিয়া থাকিবে ইত্যাদি নিয়ম পূর্ব্বমত, এইরূপে যে দলের সমগ্র বালক বা বালিকা অপর কোঠে অগ্রে উপনীত হইবে তাহাদেরই জিত্, পরাজিত দলের পরাস্ত হওয়ার অবমাননা ভিন্ন অপর কোনো লাঞ্ছনা নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

ভাগবত ধর্ম্ম।

শৌণকাদি ঋষিগণ তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নে যথাক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার লীলা বিশেষভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শ্রীসূতকে অনুরোধ করিলেন। এইবার পঞ্চম প্রশ্নে শ্রীভগবানের অন্যান্য অবতারের কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

পঞ্চম প্রশ্ন।

অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতার কথাঃ শুভাঃ।
লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া॥

ঈশ্বর আত্মমায়ায় স্বেচ্ছানুসারে অবতার-লীলা করিয়াছিলেন ভগবানের সেই শুভ অবতার লীলা সকলও বর্ণনা কর। শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করার পর তাঁহার অন্যান্য অবতার সমূহের কথাও বর্ণনা করিতে বলিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথাই মুখ্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণ-কথা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্যান্য অবতারের কথা জানা চাই। অন্যান্য অবতার কথা আলোচনা না করিলে কৃষ্ণলীলা উপলব্ধি করা অসম্ভব। ভগবানের অবতার অসংখ্য। গণনা

করিয়া শেষ করা যায় না। পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার প্রভৃতি বিভাগে তাঁহাদের বিভক্ত করিয়া আচার্য্যগণ তাঁহাদের সহিত আমাদের পরিচয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের লীলা, সৃষ্টাদি-কর্ম্মরূপী ও ভূভার-হরণাদি রূপা। শ্রীভগবানের ইচ্ছারূপা যে শক্তি তদ্দ্বারা এই সমস্ত সাধিত হইতেছে। তৎসমুদায় সম্বন্ধে আমাদিগের একটা স্পষ্টরূপ ধারণা থাকা চাই। তাহা ছাড়া আমরা শ্রীকৃষ্ণ লীলার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে অবতার লীলা অনুসঙ্গি ক-ক্রমে বা গৌণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ অবতার-লীলা বর্ণনা করিবার জন্য এই অনুরোধটি করার পরেই ঋষিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিবার জন্য পুনশ্চ অনুরোধ করিতেছেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে শৌণকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছেন তবে কৃষ্ণ-কথা বুঝিতে হইলে অন্যান্য অবতার কথার প্রয়োজন বলিয়াই সে সম্বন্ধে জানিতে চাহিতেছেন। পুর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটির ব্যাখ্যা কালে ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী এ কথা বলিয়া দিয়াছেন। যথা—"শ্রীকৃষ্ণস্য তাবন্মুখ্যত্বেন কথয়। অথ তদনন্তরং আনুষঙ্গিকতয়ৈবেত্যর্থঃ॥ ১১

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ইহাই সিদ্ধান্ত।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ১।৩।২৮

প্রধান প্রধান অবতারগণের নামোল্লেখ করার পর বলা হইল যে ক্ষয়হীন জলাশয় হইতে যেমন সহস্র সহস্র জলধারা নির্গত হয় তেমনি স্বপ্রাদুর্ভাব শক্তির সেবধি-(আশ্রয়স্থান) স্বরূপ হরির অবতার অসংখ্য। এই সমস্ত অবতারিগণের মধ্যে বিংশতিতমরূপে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ অন্যান্য যে সকল অবতারের কথা বলা হইল তাঁহাদের মধ্যে কেহ অংশ—হয় স্বয়ং অংশ, অথবা অংশের অংশ—আবার কেহ অংশ কর্ত্তৃক আবিষ্ট বলিয়া অংশ পদবাচ্য। কেহ কলা অর্থাৎ বিভূতি। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্থাৎ এই সমুদয় অংশ কলার অবতারী যে পুরুষ সেই পুরুষেরও অবতারী ভগবান।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত শ্রীকৃষ্ণ-তত্ব আলোচনা কালে একান্ত ভাবে আবশ্যক একটি গূঢ় কথা এই স্থলে নিহিত আছে। কৃষ্ণই ভগবান, ভগবান কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা যেন কেহ

বিবেচনা না করেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী এই স্থলে এইরূপ মত প্রদান করিয়াছেন।

"কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণোধর্ম্মঃ সাধ্যতে নতু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতং। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণধর্ম্মত্বে সিদ্ধে মূলত্বমেব সিদ্ধ্যতি নতু ততঃ প্রাদুর্ভূতত্বং এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি। তত্র চ স্বয়মেব ভগবান্ নতু ভগবতঃ প্রাদুর্ভূততয়া নতুবা ভগবত্ত্বাধ্যাসেনেত্যর্থঃ।"

শ্রীজীবগোস্বামীর এই সিদ্ধান্তানুসারেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার নিম্নরূপ মত প্রদান করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মতের বিশিষ্টতা উপলব্ধি করিতে হইলে এই বিষয়টি বিশেষরূপেই অনুধাবন করিতে হইবে।

"সর্ব্ব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন।
তবে শুকদেব মনে পাঞা বড় ভয়
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অবতংশ॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভাল ত ব্যাখান
পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান॥
তিঁহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার॥
তারে কহে কেনে কর কুতর্কানুমান
শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ॥
তথাহি—
অনুবাদ মনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥*
অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পাছেত বিধেয়॥
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত
অনুবাদ কহি তারে যেই হয়ে জ্ঞাত॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।

* এই শ্লোকটি শ্রীজীবগোস্বামীও তাঁহার টীকায় উদ্ধার করিয়াছেন।

বিপ্র অনুবাদ ইঁহা বিধেয় পাণ্ডিত্য॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত॥
তৈছে ইঁহা অবতার সব হৈলা জ্ঞাত।
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সম্বাদ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈলা জ্ঞাত
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত॥
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে বিধেয় সম্বাদ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইঁহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য॥"

এইবার বিচারণার পদ্ধতিটুকু আলোচনা করা যাউক। মানব জ্ঞানরাজ্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, বিশ্বের রহস্যের সহিত মানব ক্রমে ক্রমে পরিচিত হইতেছে। এই যে জ্ঞানের ক্রমবিকাশ, ইহাতে যাহা জ্ঞাত তাঁহার উপর দাড়াইয়া যাহা এখন অজ্ঞাত তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহারই নাম আগে অনুবাদ পরে বিধেয়। From the known to the unknown.

মানবজাতি তাহার ইতিহাসে সর্ব্বাগ্রে অবতারগণের সহিত পরিচয় লাভ করে। যাঁহারা অবতার তাঁহারা জগতে আসেন, মানবের মত বা জগতের জীবের মত কার্য্য করেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ মানব নহেন। স্থূলভাবে দেখিলে সাধারণ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু একটু গভীর ও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা এখানকার হইয়াও এখানকার নহেন। তাঁহাদের যেন কিছু বিচিত্র রকমের ইতিহাস আমাদের অগোচরে বিশ্বরহস্যের কোনও নিভৃত কক্ষে লুক্কায়িত আছে। ইহাদের ইংরাজীতে Superman in Human History বলা যায়। ইহারা আমাদের জ্ঞাত। আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই; কিন্তু অতীতের মানবগণের সাক্ষ্যের দ্বারা আমরা তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাঁহাদের সহিত পরিচয় হওয়ার পর হইতেই মানবের চিন্তা প্রবাহ এক নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। এই দৃশ্য ও জ্ঞাত জগতই জগতের সমস্তটা নহে, আরও অনেক রহস্য

আছে, There are more things in Heaven and earth এই ভাবনায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই চিন্তার পথে অগ্রসর হইয়া আমরা "পুরুষ" এর সাক্ষাৎকার লাভ করি। একটি নদীর ধারা অনুসরণ করিয়া সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হইলে যেমন এই নদীর ন্যায় আরও অসংখ্য নদীর উদ্ভবস্থল যে হ্রদ সেই হ্রদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তেমনি এই সমস্ত অবতারের লীলা বেশ সাহসের সহিত ও সবলচিত্তে (with an unbiassed and unprejudiced mind) আলোচনা করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইলে আদ্য পুরুষের তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। সেই আদ্য পুরুষের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥" ১-৩-১

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ লোক সকলের সৃষ্টির জন্য প্রথমতঃ মহত্তত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব, এবং পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা ষোড়শ কলান্বিত পৌরুষরূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ-মহাভূত এই ষোড়শ অংশ বিশিষ্ট বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি

"পশ্যন্ত্যদোরূপমদভ্রচক্ষুষা
সহস্র পাদোরুভুজাননাদ্ভুতং।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং
সহস্রমৌল্যম্বর কুণ্ডলোল্লসৎ ॥"
এতান্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্ নরাদয়ঃ ॥" ১-৩-৪।৫

এই বিরাটমূর্ত্তি সহস্র সহস্র অর্থাৎ অপরিমিত চরণ, অপরিমিত উরু ও অপরিমিত বদনে অতিশয় অদ্ভুত এবং অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য শ্রবণ, অসংখ্য লোচন, অসংখ্য নাসিকা, তথা অসংখ্য শিরোভূষণ, অসংখ্য বসন ও অসংখ্য কুণ্ডলে শোভমান। ইহা যোগীগণের প্রত্যক্ষ। এই বিরাট মূর্ত্তি নানা অবতারের অব্যয় বীজ স্বরূপ। সমস্ত অবতার এই স্থান হইতে উদ্ভূত হয়েন' অথচ এই বীজ অক্ষয়। আবার ইনি অবতারগণের নিধান অর্থৎ কার্য্যা-বসানে প্রবেশ স্থান। কেবল অবতারের বীজ নহেন, সৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই বীজ। তাঁহার অংশে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার অংশে মরীচি অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, আর প্রজাপতিগণের অংশে দেব তির্য্যক, মানব প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে মানব সর্ব্ব প্রথম

অবতারগণকে প্রত্যক্ষ করে। অবতারগণকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার চিন্তা-প্রবাহ নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত হয়। পূর্ব্বে সে প্রত্যক্ষকে একমাত্র সত্য বলিয়া চিন্তা করিতেছিল, কিন্তু এখন আর সে সেরূপ মনে করে না। এই সময়ে সে যোগ পথ আশ্রয় করে, সত্য নিরূপণের জন্য বা নিজের বিকাশের জন্য সে অন্য পথ আশ্রয় করে। যোগ পথে অগ্রসর হইলে, এই মহাপুরুষ বা অবতারগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ও প্রদর্শিত পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া মানব পুরুষের তত্ত্ব বুঝিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে অবতার গুলির উদ্ভব স্থানে দেখিতে পাওয়ায় বিশ্ব তত্ত্ব (The Scheme of the universe) বুঝিতে সক্ষম হয়। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে বিশ্ব রহস্যের প্রকৃত মীমাংসা করিতে পারি না কি কি শক্তির সাহায্যে বিশ্বের ও মানবের ইতিহাস গড়িয়া উঠিতেছে সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত অল্প, যোগী যখন এই পুরুষের তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেন তখন তাঁহার এই জ্ঞান বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন আর তিনি আমাদের ন্যায় ঘটনাস্রোতে অন্ধকারময় পথে বিতাড়িত একটি তৃণমাত্র নহেন, তখন তিনি বিশ্ব রহস্যের সহিত পরিচিত হইয়া সচেতন ভাবে এই বিশ্বলীলার একজন সহায়ক (A self-conscious helper in the evolutionary Scheme of the universe) শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—

"এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ"

এই সমস্ত অবতার পুরুষের অংশ ও কলা। এ স্থলে অবতারগুলি জ্ঞাত এবং অনুবাদ (subject) আর পুরুষের অংশ কলা ইহা আমাদের অজ্ঞাত ছিল। এক্ষণে জ্ঞাত হইল, ইহা বিধেয় (predicate.) পূর্ব্বে যে সমস্ত অবতারের নাম বলা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নামও রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের কথা সকলেই জানিতেন। পূর্ব্বে সাধারণের এইরূপ ধারণা ছিল যে এই সমস্ত পুরুষের অবতারগণের মধ্যে কৃষ্ণ অন্যতম। অবতার শ্রীকৃষ্ণ, ইহা লোকে জানে বলিয়া অবতারগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে গণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার নহেন তাহাও নহে তিনি অবতার সত্য কিন্তু তাহা অপেক্ষাও আরও কিছু অধিক। যেমন তাহার লীলা ঐতিহাসিক, কিন্তু কেবলমাত্র ঐতিহাসিক নহে তদপেক্ষা কিছু অধিক সেইরূপ। এ সম্বন্ধেও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে সুন্দর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

"অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোন মতে কহে যেমন যার মতি॥

কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর নারায়ণ।
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন।
কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে—সত্য বচন সবার॥
কেহ কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি
সকল সম্ভবে কৃষ্ণ যাতে অবতারী।"

যে কোন বস্তুই হউক না কেন তৎসম্বন্ধে সকলের ধারণা একরূপ নহে, এবং না হওয়াই সম্ভব। মহামতি কার্লাইল্ বলেন "There is an infinite meaning in every thing, the eye sees in it what the mind brings means of seeing." অর্থাৎ জগতের সকল বস্তুরই অর্থ অসংখ্য, মন তাহার যতখানি দেখিবার শক্তি লইয়া আইসে চক্ষু তাহার ততখানিই দেখিতে পায়। আমাদের দেশে একটি চলিত কথা আছে "কৃষ্ণ কেমন? যার মন যেমন।" ইহা সর্ব্বৈব সত্য। যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ একজন অবতার, পূর্ব্বে লোকের এইরূপ ধারণা ছিল, ইহার অধিক তত্ত্বসাধারণের জানা ছিল না। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এইটুকু প্রতিপাদন করাই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের লক্ষ্য। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্থলে লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারা যায়।

যেমন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে এই গ্রন্থে যে দশটি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিতেছেন।

"অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থান পোষণ মূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥"

অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে নিম্নলিখিত দশটি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, মুক্তি আশ্রয়।

১। সর্গ—"ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ। ব্রহ্মণো গুণ বৈষম্যাৎ" (ভূতানি আকাশাদীনি মাত্রাণি শব্দাদীনি ইন্দ্রিয়ানি চ ধীশব্দেন মহদহঙ্কারৌ গুণানাং বৈষম্যাৎ পরিণামাৎ ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাৎ কর্ত্তুভূতাদীনাং যদ্বিরাড়্রূপেণ স্বরূপতশ্চ জন্ম স সর্গঃ। শ্রীধরঃ) উপাদান সৃষ্টি বা তত্ত্বসৃষ্টি। পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) পঞ্চ তন্মাত্রা (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু জিহ্বা,) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) মন, অহঙ্কার ও মহৎ। মূল প্রকৃতির সহিত

এই সমগ্র তত্ত্বের (সাংখ্য দর্শনের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের) আবির্ভাবের নাম সর্গ।

২। বিসর্গ—"বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ" (পুরুষো বিরাজঃ তৎকৃতঃ পৌরুষঃ চরাচর সর্গো বিসর্গ ইত্যর্থঃ) ব্রহ্মা হইতে চরাচর জীব সমূহের দেহ সংগঠন।

৩। স্থান—"স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ" (বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো বিজয়ঃ সৃষ্টানাং তত্তন্মর্য্যাদা পালনেনোৎকর্ষঃ স্থিতিঃ স্থানং শ্রীধরঃ) সৃষ্ট জীবগণের নিজ নিজ মর্য্যাদা (ধর্ম্ম) পালন দ্বারা যে উৎকর্ষ তাহার নাম স্থিতি বা স্থান। Evolution.

৪। পোষণ—"পোষণং তদনুগ্রহঃ" নিজ নিজ মর্য্যাদায় অবস্থিত ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ।

৫। ঊতি—"ঊতয়ঃ কর্ম্ম বাসনা (ঊয়ন্তে কর্ম্মভিঃ সংতন্যন্তে—শ্রীধরঃ) সকাম কর্ম্মের দ্বারা বাসনা জন্মে, এই বাসনার দ্বারা পুনঃ পুনঃ ত্রিলোকীতে গতাগতি ঘটে, ইহার নাম ঊতি।

৬। মন্বন্তর—"মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্মঃ" (তদনুগৃহীতানাং সতাং মন্বন্তরাধিপতীনাং ধর্ম্মঃ সদ্ধর্ম্মঃ) ভগবানের অনুগৃহীত মন্বন্তরাধিপতি সাধুদিগের ধর্ম্ম।

৭। ঈশানুকথা—

"অবতানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাং।
পুংসামীশকথা প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ॥"

(হরেরবতারানুচরিতং তস্যানুবর্ত্তিনাঞ্চ সৎকথা ঈশানুকথা প্রোক্তা—শ্রীধরঃ) ভগবান হরির অবতার চরিত্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তী মহাপুরুষগণের যে সৎকথা তাহার নাম ঈশানুকথা। ঐ কথা নানা আখ্যানে প্রচারিত হইয়াছে।

৮। নিরোধ—"নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহশক্তিভিঃ।" ভগবান হরি যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে পর জীবের আত্ম উপাধির সহিত যে লয় তাহার নাম নিরোধ।

৯। মুক্তি—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" (অন্যথারূপং অবিদ্যয়াধ্যস্তং কর্তৃত্বাদি—শ্রীধরঃ) অন্যথারূপ অর্থাৎ অবিদ্যাকর্ত্তৃক আরোপিত কর্তৃত্বাদি অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি)

১০। আশ্রয়—এই আশ্রয় তত্ত্বই শ্রীভগবান। তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

"দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহলক্ষণং।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥"

এই আশ্রয়তত্ত্বের বিশুদ্ধি অর্থাৎ এই আশ্রয়তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্যই মহাত্মাগণ কোন কোন স্থলে শ্রুতির দ্বারা, কোন কোন স্থানে সাক্ষাৎ কিম্বা তাৎপর্য্য দ্বারা অপর নয়টির লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে সমস্তই সেই দশমতত্ত্ব বা আশ্রয়তত্ত্বের সহিত মানবের যথার্থ পরিচয় সাধন করাইবার জন্য। যেমন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার বলিতেছেন—

"আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ॥

* * * * *

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের প্রথমে শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন—

"দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥"

শ্রীকৃষ্ণনামক দশম পদার্থই এই দশম স্কন্ধের লক্ষ্য। তিনি আশ্রিতবর্গের আশ্রয়বিগ্রহরূপী পরমধাম ও জগতের নিবাস স্থান স্বরূপ।

এইবার আমরা পঞ্চম প্রশ্নে যে অন্যান্য অবতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে কেন, তাহার হেতু অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য অবতারের মধ্য যে অন্যতম তাহা নহে। পূর্ব্বে সাধারণ লোকে তাহাই মনে করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারী। কিন্তু এই অবতারীকে বুঝিতে হইলে অবতারগণকে জানা দরকার। এই অবতারগণের মধ্যে এমন একটি ভাবধারা প্রচ্ছন্নভাবে আছে যাহার আদিতে ও অন্তে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার লীলা। অবতার চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে আমাদের মনে স্বতঃই এমন কতকগুলি ভাবের ও চিন্তার উদ্রেক হইবে যে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা পাওয়া যাইবে না। এ কথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

শৌণকাদি ঋষিগণ সূতকে পঞ্চম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া যেন মনে করিলেন

যে এই সমস্ত অবতার লীলা অতীব বৃহৎ ব্যাপার। এই সমস্ত বর্ণনা করিতে করিতে সূত হয়ত আমাদের যাহা প্রধান আবশ্যক তাহা ভুলিয়া যাইতে পারেন। আবার যে জন্য আমরা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যাকুল হইয়া পড়ি সে বিষয়টি বার বার মনে পাড়াইয়া দিই। এই জন্য ঋষিগণ অবতারলীলা বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কৃষ্ণলীলা শুনাইবার জন্য পূর্ব্বে যে অনুরোধ করিয়াছেন সেই অনুরোধ পুনরায় করিতেছেন।

"বয়স্তু ন বিতৃপ্যামউত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাংরসজ্ঞানাংস্বাদু স্বাদুপদে পদে
কৃতবান্ কিল কর্ম্মাণি সহ রামেন কেশবঃ
অতিমর্ত্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ।
কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ং।
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণাঃ হরেঃ॥
ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাং
কলিং সত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবং॥"

শ্রীধরস্বামীর টীকানুসারে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির অর্থ এই। যদিও আমরা তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ অবতারের প্রয়োজন বর্ণনা করিবার জন্য পূর্ব্বে প্রশ্ন করিয়াছি এবং সেই অনুরোধেই তাঁহার চরিত্র বর্ণনার অনুরোধও রহিয়াছে, তথাপি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে উৎসুক হওয়ায় পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র শ্রবণের জন্য ইচ্ছুক হইয়া আমাদের তৃপ্তির অভাব তোমাকে জানাইতেছি। (ইহার অর্থ এই যে আমরা অন্যান্য অবতারের চরিত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রও শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তাহা শুনিয়া আমাদের ঠিক তৃপ্তি হয় নাই। আমাদের মনে হয় যে অন্যান্য স্থানে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকথা ঠিকভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। সে সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য আছে। ইহাতে এটুকুও বুঝিতে হইবে যে অন্যান্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ কথা যাহা আছে তাহা আংশিকমাত্র। এই শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করাই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের উদ্দেশ্য।) দেখ সূত! আমরা যাগযোগ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, অর্থাৎ তৎসমুদায় অনুষ্ঠানের দ্বারা যাহা কিছু লভ্য তাহা আমরা পাইয়াছি। কিন্তু শ্রীভগবান উত্তমশ্লোক। উদ্গচ্ছতি তমো যস্মাৎ উত্তমঃ—তথাভূতঃ শ্লোকো যশো যস্য—অর্থাৎ শ্রীভগবানের যশঃ শ্রবণের দ্বারা তমো বা অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। তাঁহার লীলাবিক্রম আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু তৃপ্ত হয় নাই অর্থাৎ আর শুনিব না এরূপ

মনে হয় নাই। অন্য লোকে যাহা শুনিয়াছে তাহাতেই হয়ত তৃপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের সেরূপ হয় নাই। যাহারা মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ কথা যথেষ্ট শোনা হইয়াছে আর কেন? তাহারা রসজ্ঞ নহে। রসজ্ঞদিগের হরি কথা শ্রবণ করিতে স্বাদু হইতে আরও অধিক স্বাদু বোধ হইয়া থাকে। যতই শ্রবণ করা যায় ততই অধিক মিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তিনটি কারণে তৃপ্তির উদয় হয়। উদর পূর্ণ হইলে আর ভাল লাগে না, রস বোধ না থাকিলে ভাল বস্তুকেও ভাল লাগে না, আর বস্তু স্বাদু না হইলে ভাল লাগে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কথা সম্বন্ধে ইহার কোনটীই প্রযোজ্য নহে। কারণ কর্ণ আকাশ আর কৃষ্ণ কথা অমূর্ত্ত সুতরাং পূর্ত্তি অসম্ভব।

অতএব শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের যাবতীয় কথা বর্ণনা কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গূঢ় ও কপট মনুষ্য হইয়া মানব সমূহের অসাধ্য কার্য্য সকল করিয়াছিলেন। তৎসমুদয়ও বর্ণনা কর। তুমি বলিতে পার যে আমরা যজন অধ্যয়ন প্রভৃতি ব্যপার লইয়া ব্যস্ত আমাদের হরি-কথা শ্রবণের অবকাশ কোথায়? সত্য, পূর্ব্বে আমাদের সময় হয় নাই। কিন্তু এখন আমরা কলিযুগ আসিতেছে জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, ও বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকাল-সাধ্য যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছি, এখন আমাদের হরি কথা শ্রবণের যথেষ্ট অবসর আছে। দেখ সূত! কলিযুগ বড় ভয়ঙ্কর, ইহা পুরুষ সকলের সত্ত্ব-নাশক অর্থাৎ মালিন্য আনয়ন করিয়া থাকে। আমরা সমুদ্রে নিপতিত মানবের মত কলি-ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তুমি কর্ণধারের মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ প্রশ্ন।

"ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মনি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণংগতঃ॥"

ব্রহ্মণ্য ও যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার লীলাকালে কবচের মত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন। অনেক অধর্ম্মাচারী ব্যক্তি সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গে নানারূপ অস্ত্র ক্ষেপণ করিয়াছে, কিন্তু শরীর বর্ম্মের দ্বারা আবৃত হইলে অস্ত্র-সমূহ যেরূপ তাহা বিদীর্ণ করিতে পারে না সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলার সময়ে ধর্ম্মের উপর যে সকল আক্রমণ হইয়াছিল সমস্তই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। এখন শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম এক্ষণে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন?

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ে শৌণকাদি ঋষিগণ সূতকে ছয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র কথিত হইয়াছে। এই ছয়টি প্রশ্ন পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। এই সম্বন্ধটুকু বুঝিতে পারিলে আমরা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের অনেক তত্ত্বই বুঝিতে পারিব।

এই প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভাগত গ্রন্থে বর্ণিত যে দশটি তত্ত্ব সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল্, বাহাদুর তাঁহার 'পৌরাণিক কথা' গ্রন্থে এই দশটি তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার একটী মন্তব্য লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে সেই মন্তব্যটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা পাঠে আমরা উপকৃত হইব।

"এই দশটী বিষয় অনুশীলন করিলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি জানা যায়।

১। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের, এই পরিণামী লোক সমূহের অবিকারী অপরিণামী আশ্রয় (Substratum) আছে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ব্যাপক। ঐ আশ্রয় ব্যাপক আত্মা চৈতন্যরূপ। ঐ আশ্রয় পরম আত্মা অর্থাৎ সকল পদার্থেরই আত্মা এবং সমগ্র সমষ্টি পদার্থের আত্মা। এইজন্য সকল পদার্থেই চৈতন্য আছে।

২। ঐ আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়াই নানারূপ লীলা খেলা হয়, তাহাই কল্পের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সকলই নিয়মের অধীন। সেই সকল নিয়ম পরে দেখা যাইবে।

৩। সৃষ্টি বলিলে আদি সৃষ্টি বুঝিতে হইবে না। যেমন নানা জাতীয় তৃণপূর্ণ বসুন্ধরা সূর্য্যের খরতর কিরণে দগ্ধ তৃর্ণ হইয়া ক্ষেত্রমাত্রে পরিণত হয়, কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে বিনষ্ট তৃণ সকলের বীজ সকল নিহিত থাকে এবং বর্ষার পুনরাগমে পূর্ব্ব জাতীয় তৃণ সকলের উদ্ভব হয়, সেইরূপ প্রলয়কালে মূল প্রকৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব্ব-সৃষ্ট পদার্থের বীজ সকল নিহিত থাকে এবং সৃষ্টির পুনরারম্ভে পূর্ব্ব সৃষ্টির পুনরুদ্ভব হয়। যেমন বর্ষার জলে প্রথমে ভূমির বিকার হয় এবং তৃণাদি আহারোপযোগী নানারূপ রসের সৃষ্টি হয় এবং তাহার পর তৃণাদির অঙ্কুরোদ্গম হয়, সেইরূপ কল্প মধ্যে প্রথমে "সর্গ" তাহার পর "বিসর্গ" হয়।

৪। প্রলয় বলিলেও সেইরূপ অত্যন্ত নাশ বুঝিতে হইবে না। প্রলয়

অপেক্ষা নিরোধ কথা সত্যের অধিকতর ব্যঞ্জক। কিন্তু নিরোধ কথার একটী নিগূঢ় ভাব আছে, যাহা সাধারণে ধারণা করে না। চেতন জীব কিংবা চেতন ঈশ্বরের শয়নকে নিরোধ বলে। "নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহশক্তিভিঃ।" আমরা প্রতিদিন শয়ন করি। সেই সময় আমাদের দেহরূপ উপাধি নিশ্চেষ্ট থাকে। আমাদের শক্তি সকল কতক নিশ্চেষ্ট থাকে কতক কার্য্য করে।

প্রতিদিনের শয়ন অল্পকাল মাত্র স্থায়ী। শরীর নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্তু নষ্ট হয় না। মৃত্যু দীর্ঘকালব্যাপী। এই শয়নে দেহ-রূপ প্রকৃতির নাশ হয়। এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম প্রকৃতি (মন ইত্যাদি) জীবের সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ঐ ক্ষেত্রকে কারণ শরীর বলে। যেমন ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্র মূল প্রকৃতি সেইরূপ জীবদেহের ক্ষেত্র কারণ শরীর। মনুষ্য প্রতিদিন শয়ন করিলে শরীর কেবলমাত্র নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্তু শরীরের সঙ্গে একেবারে বিচ্ছেদ হয় না, কারণ অল্পকাল পরেই আবার শরীরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মৃত্যুর সুদীর্ঘ শয়নে শরীরের সহিত বিচ্ছেদ হয়। শরীরের সহিত বিচ্ছেদ হইলেই শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া বিচ্ছিন্ন হয় ও শরীরের নাশ হয়।

শরীরস্থ ধাতু সমূহের একত্র অবস্থান এবং শরীরের জীবনী শক্তি চেতন জীবের সংযোগ-সাপেক্ষ। শরীরের লয় কিছু স্বতন্ত্র নহে। জীবের শয়ন জনিত শরীরের সহিত যে বিচ্ছেদ তাহাই শরীরের লয়।

শরীরকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলে। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব-শব্দে অভিহিত হয়। এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানীকে ঈশ্বর বলা যায়। জীব মৃত্যুরূপ শয়নে শয়ান হইলে যেরূপ দেহের নাশ হয়, ঈশ্বর প্রলয়কালে শয়ন করিলে সেইরূপ তাঁহার ত্রিলোকী দেহের নাশ হয়।

দেহ পরিবর্ত্তনের সহিত আমার নাম কখনও রাম কখনও শ্যাম। সেই-রূপ প্রতি ত্রিলোকীর ব্রহ্মা ভিন্ন। কল্পের নাম ভেদে ব্রহ্মার নাম নির্দ্দেশ করা যায়। যেমন বরাহকল্পের ব্রহ্মা, পাদ্মকল্পের ব্রহ্মা। আমরা কখনও রাম কখনও শ্যাম দেহ হইলেও যেমন আমি একই পুরুষ, সেইরূপ নানা ত্রিলোকীময় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একই পুরুষ।

"পুরুষ" শব্দের অর্থ যে পুরমধ্যে শয়ন করে। যে আমার দেহ পুরে শয়ন করে সে আমার দেহের পুরুষ। যে ব্রহ্মাণ্ড পুরের মধ্যে শয়ন করে সে ব্রহ্মাণ্ডের পুরুষ। সেই ব্রহ্মাণ্ডের পুরুষ শয়ন করিলেই, ত্রিলোকীর প্রলয় হয় ; বাস্তবিক সে প্রলয়, পুরুষের শক্তি নিরোধ। পুরুষের শক্তি ত্রিলোকী

হইতে সমাহৃত হইলেই, ত্রিলোকী খণ্ড খণ্ড হইয়া বিচ্ছিন্ন হয় ও নাশ প্রাপ্ত হয়।

এই পুরুষের জ্ঞানই পুরাণের মূল শিক্ষা। পুরুষের জাগরণই সৃষ্টি, পুরুষের শয়নই লয়।

৫। পশুর পশুত্ব, বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, দেবের দেবত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব—ইহাকেই মর্য্যাদা বলে। প্রথমত এই মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে, জীব এক অবস্থায় অবস্থিত না হইলে, জীব দৃঢ় সংস্কার লাভ করিতে পারে না। দৃঢ় সংস্কার লাভ না করিলে জীব অবস্থার উন্নতি লাভ করিতে পারে না। অতএব এইরূপ ভাবে জীবের পালন করিতে হয়, যে সে আপন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে।

এই জন্য শ্রীধর স্বামী বলেন যে সৃষ্ট পদার্থের তত্তৎ মর্য্যাদা পালন দ্বারা উৎকর্ষ বিধানের নাম "স্থান"। প্রথম অবস্থায় রজোগুণ দ্বারা ও পরে সত্ত্বগুণ দ্বারা এই উৎকর্ষ বিধান হয়। ইহা আমরা পরে জানিতে পারিব।

৬। সকল জীব সত্ত্বগুণ দ্বারা আপনার উৎকর্ষ সাধন করেন এবং ভগবানের সেবায় আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহারা ভক্ত। ভগবান বিশ্বের পালক। অতএব ভক্তমাত্রেই বিশ্বপালনে ভগবানের সহকারী হয়েন। ভগবান সেই ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন, ইহারই নাম পোষণ।

৭। কালভেদে কল্পের তিনরূপ ধর্ম্মবিভাগ। যেমন শিশু যতদিন পূর্ণবয়স্ক না হয় ততদিন নিত্য নূতন বোধের সংগ্রহ করে, তাহার পর পূর্ণবয়স্ক হইলে অজ্ঞানময় বোধ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানময় বোধ অবলম্বন করে, পরে জরার আক্রমণে শিথিলেন্দ্রিয় ও শিথিলচেষ্ট হইয়া কালের কবলে পতিত হয়, সেইরূপ কল্পের আরম্ভে জীব ভাব ও বোধের নানাত্ব গ্রহণ করে, পরে উত্তম ভাবে ও উত্তম বোধে অবস্থিত হয় এবং অবশেষে প্রলয়াগমে নিরুদ্ধশক্তি ও নিরুদ্ধচেষ্ট হয়। এই তিন ভাগকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বলে। এই তিন মূলধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মন্বন্তরের ধর্ম্মভেদ হয়। কল্পের প্রথমভাগ সৃষ্টি ধর্ম্ম প্রবল, মধ্যমভাগ স্থিতি ধর্ম্ম প্রবল ও শেষভাগ লয় ধর্ম্মপ্রবল।

৮। কর্ম্মবাসনা দ্বারা পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া জীব সংসারের স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। এই কর্ম্মবাসনাই সংসারের মূল।

৯। জীবগণের উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য, ভগবান্ অবতার গ্রহণ

করেন এবং ভক্তগণ তাঁহার অনুসরণ করেন। অবতার ও ভক্তগণের চরিত্র বর্ণনা পুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য। অবতারের বিচার পরে করা হইবে।

১০। জীবের আমিত্ব সংস্কারই বন্ধ। এত দেহ ধারণ করিতেছি, তথাপি প্রতি দেহেই আমি, আমি-জ্ঞান নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক। দেহে আমিত্ব জ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন সেই মন "আমিত্ব" অর্থাৎ অহঙ্কারের সীমা অতিক্রমণ করিয়া মহৎ তত্ত্বের অবলম্বন করে। তখন বিশ্বজ্ঞান স্বতঃ প্রাদুর্ভূত হয় এবং জীব বন্ধ হইতে মুক্ত হয়। পরে ত্রিগুণময়ী মায়ার সীমা অতিক্রম করিয়া, জীব ঈশ্বরের সমকক্ষতা লাভ করে। ইহাকে মুক্তি বলে।

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। দেহ, ইন্দ্রিয় মনকে অন্যথারূপ এবং আত্মাকে স্বরূপ বলা যায়। যাহার এই জ্ঞান হয়, সেই মুক্তির চেষ্টা করে। যে সে জ্ঞানে দৃঢ় স্বরূপ হয়, সে মুক্তিলাভ করে।

পুরাণের এই সকল বিষয়। আর্য্যদিগের এই ইতিহাস। যাঁহারা এই ইতিহাস লিখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন ক্ষুদ্র রাজাদিগের বৃত্তান্ত লিখিতে এবং অত্যল্পমাত্র কাল হইতে শিক্ষা গ্রহন করিতে তাঁহারা ঘৃণা করিতেন।

দর্প-হরণ।

১

সে দিন শ্রাবস্তিপুর মাঝে,
ক্ষান্ত দিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম কাজে,
নর নারী সুখরত সুশোভিত গৃহ যত
পুষ্পমাল্য আম্রের পল্লবে ;
গিরিবল্ল সঙ্গম উৎসবে।

২

পথে যায় ধনী, নিঃস্ব কত,
বিদেশী পথিক শত শত,
সমারোহে সব শেষে, বসিয়াছে মৃদু হেসে
নর্ত্তকী-প্রধানা কুবলয়া,
সুশোভনা ভুবন-বিজয়া।

৩

বিস্ময়-চকিত সব লোকে,
চেয়ে দেখে অনিমেষ চোখে,
তন্বী তবে গর্ব্বভরে সবারে জিজ্ঞাসা করে,
"নগরে রয়েছে হেন কেবা
রূপে মোর মুগ্ধ নহে যেবা।"

৪

কাছে আসি কহে একজন,
"কেন নারী দর্প অকারণ,
দয়াময় জ্যোতিষ্মান প্রভু বুদ্ধ ভগবান
বিরাজেন জেতবন মাঝে,
রূপ তব তুচ্ছ তাঁর কাছে।"

৫

দীপ্তরোষে চলিল রূপসী,
বুদ্ধ যেথা রয়েছেন বসি,
শিষ্য আনন্দের সনে সস্নেহ প্রশান্ত মনে
উজ্জ্বল করিয়া বনবাস;
চারিদিকে কি শান্তি বিকাশ!

৬

গর্ব্বিতা তুলিল লীলাভরে,
অবগুণ্ঠ সীমন্তের 'পরে,
কি সৌন্দর্য্য, ভঙ্গী কিবা; অঙ্গে জ্বলে রত্ন-বিভা
নেত্র কোণে দৃষ্টি সমুজ্জ্বল,
বুদ্ধদেব মৌন অবিকল।

৭

ব্যর্থ নারী কাছে সরে আসে,
তাঁহারে বাঁধিতে বাহু পাশে,
দেখিতে দেখিতে তার, সেরূপ নাহিক আর
দেহখানি জীর্ণ বৃদ্ধা পারা,
মুহূর্ত্তে হয়েছে দৃষ্টি-হারা।

৮

তখন লুঠিয়া ক্ষোভ ভরে,
বুদ্ধের চরণ পদ্ম'পরে,
কাঁদি কহে কুবলয়া, "প্রভু মোরে কর দয়া
জ্ঞান-হীনা মূঢ় তনয়ারে,
তত্ত্ব কথা শুনাও আমারে।"

৯

মেলিয়া প্রসন্ন দুটী আঁখি,
বুদ্ধ তবে কন তারে ডাকি,
"হে জননি নিরুপমা তোমারে করিনু ক্ষমা
রূপ, দৃষ্টি লভ পুনর্ব্বার,
গর্ব্ব নিয়ে দূর হ'ক মার।

১০

নর্ত্তকী কহিছে জোড় করে,
অশ্রুপ্লুত ব্যথিত অন্তরে,
"সুরূপ' চাহিনা আমি ওগো জগতের স্বামী
শুধু তব চরণের ধূলি,
আমার মস্তকে দাও তুলি।"

শ্রীপ্রভাসকুমার সেন।

অভিমানে।

(গল্প)

সে বৎসর বসন্তরোগ এদেশটাকে সম্পূর্ণরূপ নিজ অধিকারে লইয়া তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল—বিশেষতঃ, কলিকাতাই তাহার প্রধান রঙ্গভূমি—ঠিক সেই সময় বসন্তকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে কলিকাতা গেল। তার মা-বাপ বাড়ীশুদ্ধ সকলেই ভাবিয়া অস্থির। ছেলে'ত গেলেন পরীক্ষা দিতে,—কলিকাতায় যে বসন্ত হইতেছে—কি আছে কপালে কে জানে!

বসন্তকুমার পরীক্ষান্তে বসন্ত রোগের হাত এড়াইয়া যথা সময়ে বাড়ী পৌঁছিল। ছেলে নিরাপদে পরীক্ষা শেষ করিয়া বাড়ী আসিয়াছে—মা বাপ আহ্লাদে আটখানা। বসন্ত মনে মনে স্থির করিল,—অনেক দিন পরে দীর্ঘ অবকাশ পাওয়া গিয়াছে, এই অবসরে একবার পশ্চিম ভ্রমণে যাইতে হইবে। কিন্তু বসন্তের সে আশা মনেই জমা থাকিল। একদিন প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া বসন্ত শয্যা লইল। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত রোগ দেখা দিল। বাড়ীতে একটা অশান্তি ও চিন্তা আসিয়া সকলকে ঘেরিয়া বসিল। বসন্তের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বাড়ীর সকলে নীরবে অশ্রু মুছিতে লাগিল। একদিন এক আত্মীয়া বসন্তকে দেখিতে আসিয়া, তাহার মাতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—"তা মা, ও মা-শেতলার দয়া হ'য়েছে তিনিই আবার পদ্মহস্ত বুলিয়ে দেবেন, সব জুড়িয়ে যাবে।" তিনি বিদায় লইবার কালীন উপসংহার করিলেন—"দেখ দেখি, সোণার চাঁদ ছেলে,—আজ বাদে কাল একটা পাশ দেবে, তার কপালে এত কষ্ট!" বসন্তের মাতা অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"মা! পাশ এখন মাথায় থাক, ছেলের প্রা

পেলে বাঁচি।” বসন্ত, রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে, যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক চাহনিতে একবার মায়ের প্রতি চাহিল ও মনে মনে একবার ভাবিল—মা বল্লে কি না,—পাশ এখন মাথায় থাক,—ছেলের প্রাণ পেলে বাঁচি। ঈশ্বরের কি ইচ্ছা কে জানে! বসন্তকুমার এ যাত্রা রক্ষা পাইল।

তখনও বসন্তের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই, একাকী বাহির বাটীতে বসিয়া ভাবিতেছে—কোন্ কলেজে (College) পড়িব। এমন সময় একটী প্রতিবাসী বালক আসিয়া আনন্দবিজড়িত কণ্ঠে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—“বসন’দা! আপনাদের পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে।” বসন্ত ব্যস্ততা সহকারে উঠিয়া দাঁড়াইল কম্পিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—“কে বল্লে?” বালক জানাইল—“বেঙ্গলি (Bengalee) তে বাহির হইয়াছে, সকলে আপনার নাম খুঁজিতেছে।” বসন্তের দুর্ব্বল শরীর কাঁপিয়া উঠিল। চলিবার শক্তি নাই। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কি হইয়াছে কে জানে!—হয়তো কেহ খপর লইয়া আসিতেছে—এই আশায় পথ চাহিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল তবুও কেহ কোন সংবাদ আনিল না। বসন্ত স্থির জানিল যে—সে ফেল্ (Fail) হইয়াছে, তথাপি মানবপ্রকৃতির বশে আশা ছাড়িয়াও আশাকে অন্তর হইতে অন্তর করিতে পারিল না। ঘোর সন্ধ্যার গা-ঢাকা অন্ধকারে যখন তাহার কনিষ্ঠ শরৎ তাহার নীরব চিন্তার গভীরতা ভগ্ন করিয়া বাহির বাটীর প্রাঙ্গন দিয়া অন্তঃপুর অভিমুখে যাইতেছিল, তখন বসন্ত ভীত কম্পিত-স্বরে ডাকিল—“শরৎ!”—অপহৃত দ্রব্যসহ হাতে নাতে ধরা পড়িলে চোরের যেরূপ অবস্থা হয়, শরতের অবস্থাও ঠিক যেন তদ্রূপ হইল। সে ভাবিয়াছিল, সে রাত্রিকার মত দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না; কিন্তু অন্ধের পা খালেই পড়ার মত দাদার সহিতই তার প্রথম সাক্ষাৎ হইল! সে কি বলিবে কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া, যাহা সে দাদার নিকট প্রকাশ করিবে না বলিয়া এতক্ষণ মনে মনে স্থির করিয়া আসিতেছে,—সেই কথাই বলিয়া ফেলিল—“দাদা! আমাদের স্কুল হইতে মোট তিনজন পাশ হইয়াছে।” বসন্ত উৎসাহিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল— “কে কে!”—এইবার শরৎ বড়ই বিপদে পড়িল, চিন্তার সময় নাই, বলিতেই হইবে—হয় আজ,—নয় কাল। শরৎ নতমুখে বলিল—“অনিল অমূল্য” আর একটী মাত্র নাম অবশিষ্ট, এখনও বসন্ত আশা ছাড়িতে পারে নাই তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল,—শরৎ বলিল—“আর ননীগোপাল।” তারপর—যেন একটা দমকা হওয়ায় প্রদীপ নিভিয়া গেল। বসন্ত চোকে আঁধার দেখিতে

লাগিল, হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। উভয়েই নীরব। শরৎ অন্ধকারে দাদার আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কিছুই দেখিতে পাইল না। সে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। তারপর—বসন্ত ভাবিল—এ কি হইল! এত দিনের উদ্যম, চেষ্টা এক কথায় মিটিয়া গেল! আমার অসুখ হইলে মা একদিন বলিয়াছিলেন—"পাশ এখন মাথায় থাক, ছেলের প্রাণ পেলে বাঁচি,—" শেষে ঠিক তাই হইল! কিন্তু এ বড় লজ্জা। মা শুনিতে পাইলে বিশেষ দুঃখিত হইবেন, আর বাবা বোধ হয় আমাকে ঘৃণা করিবেন।

ক্রমে, পরীক্ষায় অকৃত-কার্য্যতার সংবাদ পরিবারবর্গের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া এ কথাটী না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না—যে,—"আমাদের তেমনি অদৃষ্ট কিনা, যে ছেলে লেখা পড়া শিখে আমাদের সুখী করিবে!" পিতাও বলিতে ছাড়িলেন না—"আমি জানি ওটা কোনও দিন পাশ কোর্ত্তে পারবে না" কথাগুলি বসন্তের কাণে পৌঁছিল। লজ্জায়, ঘৃণায়, অভিমানে বসন্ত মৃতপ্রায় হইল। পিতামাতা পুনরায় পড়িতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু, বসন্ত নীরব রহিল। পিতামাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসন্ত চাকুরির চেষ্টায় বিদেশ যাত্রা করিল। যাত্রা-কালীন মাতার পদধূলি লইতে গিয়া বসন্ত মাতার চক্ষে জল দেখিয়া,—কি যেন বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিল না,—পাছে রুদ্ধ বেদনার দারুণ আঘাতে তাহারও চক্ষে জল আসে। সে তাড়াতাড়ী ব্যাগটী লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল। মাতা বুঝিলেন- ছেলের অভিমান হইয়াছে, পুত্র জানিল মাতার দুঃখ হইয়াছে।

প্ল্যাটফর্ম্মে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। বসন্ত গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ধীরে ধীরে ষ্টেসন পরিত্যাগ করিল। বসন্তের ছলছল চোখের উদাস চাহনির প্রতি কেহই লক্ষ্য করিল না। বাল্যজীবনের সমস্ত কথাগুলি বসন্তের মনে আসিয়া উদয় হইতে লাগিল। মায়ের আদর, পিতার স্নেহ, ভ্রাতাভগ্নীর ও বাল্যবন্ধুগণের অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন কি বাড়ীর পালিত কুকুরটীর কথা পর্য্যন্ত তাহার মনে আসিয়া উদয় হইল। তারপর মনে পড়িল—পাঠগৃহের দেওয়ালগাত্রের বীণাপাণির প্রতিচ্ছবির কথা। সে একবার মনে মনে বলিল—"মা সরস্বতি! ক'রলি কি? তোকে না আমি বাল্যকাল হইতে প্রতি প্রাতে পাঠারম্ভের পূর্ব্বে যুক্ত-করে বলিয়া আসিতেছিলাম, "মা আমায় বিদ্যা দে মা!" তার বুঝি এই আশীর্ব্বাদ?"—এইরূপ বাল্যজীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি

বসন্ত মনের মধ্যে একবার আঁকিয়া লইলা চোখের জলে সমস্ত মুছিয়া ফেলিল। তারপর বাল্যজীবনের অস্পষ্ট স্মৃতি বুকে করিয়া পঞ্চদশ বৎসরের বালক বসন্ত, জীবনের প্রথম, বিদেশে-কোথায়-কোন্ অজানিত-পথে চলিয়া গেল।

সূর্য্যের উদয় অস্ত দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু বসন্ত ইহার মধ্যে এক দিনের জন্যও বাড়ী আসিল না। মাতা একদিন অশ্রু মুছিতে মুছিতে স্বামীকে বলিলেন—"ছেলের আমার একি ভাব হ'ল? লোকের ছেলে কি ফেল্ হয় না? সবাই কি পাশ হয়?"

একদিন বৈশাখের দ্বিপ্রহরে প্রাঙ্গনে আসিয়া কে যেন ডাকিল,—"মা!" মাতা চমকিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর বসন্ত আসিয়া মাতার চরণ বন্দনা করিল। ঠিক সেই সময় বসন্তের নত-মস্তক হইতে দুই বিন্দু জল জননীর চরণ স্পর্শ করিল। মাতার মনে সন্দেহ জন্মিল—"একি পরিশ্রমজনিত স্বেদবিন্দু! না,—অভিমানের অশ্রুবিন্দু!" পুত্রের অকস্মাৎ আগমনে মাতা যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। সংবাদ না দিয়া হঠাৎ বাড়ী আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বসন্ত বলিল—"বিশেষ কোন কারণ বশতঃ কলিকাতা আসিয়াছিলাম, অ'মনি একবার বাড়ীও এলাম"। এক বৎসর পরে বসন্ত বাড়ী আসিয়াছে, সকলেই তাহাকে নূতন একটী আদরের জিনিস বলিয়া মনে করিতে লাগিল। প্রবাসীপুত্র ঘরে আসিলে মায়ের মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা পুত্রের মা ভিন্ন অন্যে অনুভব করিতে অক্ষম। কিন্তু বসন্তের মনে—কি জানি—কোন স্ফূর্ত্তি নাই। সর্ব্বদাই বিষণ্ণভাব। ইহার কারণ কেহই সন্ধানে পাইল না। পুত্রের মুখ মলিন দেখিলে কোন্ মায়ের প্রাণে ব্যথা না লাগে! একদিন বসন্তের এক ভগ্নী আসিয়া বলিল,—"দাদা, মা কাঁদ্‌ছে"। বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

ভগ্নী—"মা সেদিন ব'লছিলেন, আপনি মোটে হাসেন না, সব সময় মুখ ভার ক'রে থাকেন, বোধ হয় তাইতে!"

খুব সম্ভব বসন্তের অভিমানের মাত্রাটা আরও কিছু বাড়িয়া গেল।

দিন একভাবে না একভাবে কাটিয়া যাইতেছে। একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে বসন্ত জ্বরাক্রান্ত হইল। গত বৎসর ঠিক এই সময়েই বসন্তের বসন্ত হইয়াছিল ভাবিয়া, পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া মাতা একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আরও ভাবিলেন—ঈশ্বর জানিয়া-শুনিয়াই বুঝি আমার কোলের জিনিস কোলে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন!—তিন দিন বসন্তের অবস্থা

একভাবে কাটিয়া গেল ;—পিতা ডাক্তারের নিকট পুত্রের অবস্থা জানিয়া ভীত হইলেন।

আজ অবস্থা বড়ই মন্দ। বিকারঘোরে রোগী প্রলাপ বকিতেছে। মাতার চক্ষে অবিশ্রান্ত জল ঝরিতেছে।—চোখের জলে যে কি মন-গলান, প্রাণ-কান্দান শক্তি আছে, তাহা ধারণা করিতে অক্ষম। একজনের চোখের জলে অন্যকে কান্দায়,—আর একজন অপরের চোখে জল দেখিলে পাগল হয়। মাতার চক্ষে জল দেখিয়া বসন্তের ভ্রাতাভগ্নিগণ—কারণ না জানিয়াও —কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। বসন্ত বিকার অবস্থায় বলিল—"মা, তুমি কাঁদ কেন? এবার আমি ঠিক পাশ হব।" পুত্রের অর্থ-শূন্য-বাক্য শ্রবণে মাতা চমকিত হইয়া বলিলেন,—"ছি বাবা, চুপ কর"!

বসন্ত—"না মা, একবার আমি প্রাণ পেয়েছি, এবার আমি ঠিক পাশ হ'ব"। মাতা বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে পুত্রের মুখের উপর মুখ লইয়া বলিলেন—"ছি বাপ্ আমার, ওসব ব'লতে নেই"। বসন্ত নিস্তব্ধ রহিল।

আর শরৎ,—সে এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে, তাহার ফলও বাহির হইয়াছে, কিন্তু শরতের সেদিকে লক্ষ্য নাই, —দাদার অসুখে ভাই পাগল।

ক্রমশঃ বসন্তের অবস্থা মন্দতর হইতে লাগিল। মায়ের হাতখানি টানিয়া বুকের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"মা আমি তোমার কুপুত্র, তোমাকে শুধু কাদাতেই এসেছিলাম, তবুও মা আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন এবার পাশ হই"। মায়ের মুখে কোন কথা সরিল না, কেবল চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। বসন্ত আরও বলিল—"মা, তুমি কি জান না?—গত বৎসর ওপাড়ার 'হারাণ' ফেল্ হওয়ায় তার মা তাকে কিরূপ ভাবে গালাগালি দিয়া বলিয়াছিল—'মূর্খ পুত্র যমের সমান'—! কথাটা হারাণের প্রাণে বড়ই লেগেছিল, তাই সে অভিমানে আত্মহত্যা করে"—বসন্ত আর বলিতে পারিল না, নিস্তেজ হইয়া পড়িল। মাতা পুত্রের প্রলাপ বাক্য শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। পিতা নূতন নূতন ডাক্তার আনাইলেন, কিন্তু হায় কিছুতেই কিছু হইল না। ডাক্তার বলিলেন—"রাত্রি কাটান কঠিন"। হায় ঈশ্বর! শুনি তুমি মঙ্গলময়, কিন্তু জানি না,—পুত্রটীকে অকালে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লওয়ায় তোমার কোন্ মঙ্গল সাধিত হয়!—বসন্ত যখন মাতাপিতা, ভাইভগ্নীকে কাঁদাইয়া, চিরদিনের মত ইহসংসারের সকল সম্বন্ধ লুপ্ত করিল, ঠিক সেই সময় অদূরে

রাজবাটীতে ডং ডং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু শোকার্ত্ত পরিবারের উচ্চ ক্রন্দনে কাটিয়া গেল।

পরদিন বৈকালে বসন্তের পিতা শোকার্ত্ত হৃদয়ে বাহির বাটীতে বসিয়া পুত্রের অকালমৃত্যুর কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি সংবাদপত্র হস্তে একটী বালক আসিয়া বলিল—"শরৎ দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইয়াছে"। কিন্তু শরতের পিতা নিরুত্তর। তাঁর এই সুখের সংবাদ পুত্র-শোকের উপর—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে হইল। তাঁর চক্ষে দুই বিন্দু জল আসিল। বালক সংবাদ-পত্রখানি তাঁর সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া প্রস্থান করিল। শরতের পিতা ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া সংবাদ-পত্রখানি আরও সম্মুখে টানিয়া লইলেন। বরিশালের ডাকাতি, ঢাকার মামলা, কলিকাতায় গুণ্ডার অত্যাচার সংবাদাদির প্রতি লক্ষ্য না পড়িয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের নামের তালিকার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। তিনি দেখিলেন—একটা নাম নির্দ্দিষ্ট রাখিবার জন্য কে যেন তাহার নিম্নে একটী লাল-রেখা দিয়াছে। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন নামটী—বন্দোপাধ্যায় বসন্তকুমার,—তারপর রহিয়াছে—প্রাইভেট্। নামটী দেখিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন—'বসন্ত মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছে—"মা, আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন পাশ হই"! তবে কি সত্যই সে পরীক্ষা দিয়াছিল? তাহা হইলে অবশ্য কোন সংবাদ পাইতাম। ওহয়ত অন্য কেহ হইবে। এইরূপ —পিতা কত কি ভাবিতেছেন—এমন সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র দিল। তিনি পত্র পাঠ করিতে করিতে আর পাঠ করিতে পারিলেন না, সমাপ্তির পুর্ব্বেই হস্ত হইতে পত্র খসিয়া পড়িল। সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। চক্ষে আঁধার দেখিতে লাগিলেন। একি? একাধারে সুখ ও দুঃখ। কিন্তু দুঃখের ভাগটা বড় অধিক। সুখ চাপা পড়িল, দুঃখের কঠোর আঘাতে বুকটা ভাঙ্গিয়া চুর হইয়া গেল। পত্রের প্রতি অক্ষরে তাঁকে বসন্তের প্রতি আকৃষ্ট করিল। দুই হাত প্রসারিত করিয়া বসন্তকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া টেবিলের উপর লুটাইয়া পড়িলেন'—হায়! বসন্ত তখন পিতার স্নেহালিঙ্গন ভুলিয়া, কোথায় কোন্ অজ্ঞাত, অসীম ব্যবধানে গিয়া পৌঁছাইয়াছে।

পত্রখানি আসিতেছে হজারিবাগ হইতে। পত্রে ছিল:—

"মহাশয়ের সহিত আমি পরিচিত নই। তবে আজ পরিচিত না হইয়া

থাকিতে পারিলাম না। আপনার পুত্র বসন্তকুমার গত এক বৎসর-কাল আমার বাসাতেই থাকিত। তার সচ্চরিত্রে তুষ্ট হইয়া, তাহাকে নিজ পুত্রাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি। সে আমার এখানে থাকিয়া প্রাইভেট্ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল তাহা বোধ হয় জানেন। এ সংবাদও আশা করি শুনিয়াছেন, যে, সে প্রথম-বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। মহাশয়ের একখানি পত্র পাইলে বড়ই সুখী হইব। ইতি

অত্র পত্রে বসন্ত বাবাজীবন আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তুমি পাশ হইয়াছ জানিয়া যে কতদূর সুখী হইলাম তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। তারপর, তুমি আজ একবৎসর-কাল দেসো ও নীহারকে পড়াইয়া অসিতেছ; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তুমিও লজ্জায় কিছু চাও নাই,—আমিও কিছু বলি নাই, ঘরের ছেলের মতই ছিলে। উপস্থিত, তুমি কোন্ কলেজে পড়িবে স্থির করিয়া আমায় জানাইবে। নীহার প্রায় সব সময়েই তোমার কথা পাড়ে। বাড়ীতে নীহারের বিবাহ সম্বন্ধে একটী আব্দার ধরিয়াছে,—যাহা হউক, তোমাদের কুশলে সুখী করিবে। ইতি।

পত্রখানি বক্ষে চাপিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বসন্তের পিতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ঘরে ঘরে সাঁজের বাতি জ্বালিয়া সকলে শাঁখ বাজাইল। কেবল শোকার্ত্তপরিবারে তখনও অন্তর বাহির ঘোর অন্ধকারে ঢাকা ছিল।

বসন্ত যখন নিদ্রিতা মাতার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, মুখখানি ভার করিয়া ডাকিল —"মা!" মাতার স্বপ্ন ভাঙ্গিল। গভীর রাত্রের্ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন—"বাপ বসনরে, তুই কি 'অভিমানে' আমাদের ছেড়ে চ'লে গেলি"!—ঠিক্ সেই সময় একটী পেচক উচ্চরব করিতে করিতে আম্র-শাখা হইতে ছাদের আলিসায় গিয়া বসিল। খিরকির পুকুরের পাহাড়ে যেন প্রতিধ্বনি হইল—"মা"। দূরে নদী বক্ষে কে যেন প্রাণ ঢালিয়া গাহিতেছিল—

"কোলের ছেলে, ধূলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে,
ফেলিস্ নে মা, ধূলো কাদা, মেখেছি ব'লে—"

দারুণ শোকোচ্ছ্বাসে অবিশ্রান্ত অশ্রু-প্রবাহে, মাতার উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঝরিয়া।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসকদম্ব। (৫)

গত সংখ্যায় এই গ্রন্থের যে অংশ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে একটি ভূল হইয়া গিয়াছে। ৪৬০ পৃষ্ঠার শেষ কলমে "অনুভব দ্বারে জ্ঞান। বিক্রিয়াদি ময়" এই লাইনের পর নিম্নের অংশটুকু পড়িবে। যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন তাঁহারা এই ভাবে মিলাইয়া লইবেন। ইহা ছাড়া শেষাংশে অত্যন্ত ছাপা ভূল হইয়াছে—পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

ভাবের লক্ষণ চিহ্ন অশ্রু আদি করি।
তাহার আখ্যান হয় শাস্ত্রে ভক্তি বলি॥
সেই ভাব হৃদয়ে প্রকট রূপ হয়।
সাধন ভক্তি বলি তখন নাম কয়॥
কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা
সাধনাভিধা
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি
সাধ্যতা ইতি॥
ভক্তি কারে কহি তাহা করহ শ্রবণ॥
যে প্রকারে কৃষ্ণে মতি হয় নিবেষণ।
দেবানাং গুণ লিঙ্গানাং ইত্যাদি
কৃষ্ণে মতি প্রবেশন অনেক প্রকারে
কামদ্বেষ ভয় আদি আছয়ে বিচারে।
তবে বৈরানুবন্ধের আবেশ ভক্তি হৈত
আনুকূল্য রহিতে নহিল ভক্তি যত॥
আনুকূল্যে কোন ক্রিয়া কৃষ্ণোদ্দেশে
হয়।
সামান্যত ভক্তি বলি তাহা কারে কয়॥
ভঙ্গি ক্রমে ঋষিগণ এই কথা কন।
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন ইত্যাদি বচন॥
যথা তত্র শ্রীমতঃ
সা ভক্তি সপ্তম স্কন্ধে ভঙ্গ্যা দেবর্ষি-
নোদিতা॥

কৃষ্ণে নির্ম্মল মতি জ্ঞান কর্ম্মাদি রহিত
জ্ঞান শব্দে ব্রহ্মজ্ঞান তাহে অনাবৃত॥
ভজনীয় সন্ধান জ্ঞান ভক্তি অভিমত।
সে জ্ঞান সাধনে মতি রাখিবে সতত॥
কর্ম্মশব্দে স্মৃতি উক্ত নিত্যক্রিয়া কর্ম্ম।
তাহে অনাবৃত হয় উত্তম ভক্তি ধর্ম্ম॥
কৃষ্ণ পরিচর্য্যা কর্ম্ম না কৈব তেজন।
কৃষ্ণ কর্ম্ম হয়ে জানি ভক্ত্যঙ্গ নিরূপণ॥
কর্ম্মাদির আদি পদে বৈরাগ্য সাংখ্যযোগ
ইহাতেহ অনাবৃত ভক্তির প্রয়োগ।
আনুকূল্যে প্রীতি স্নেহে সেবে ভগবান।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা পরমভক্তি নাম॥
নারদ পঞ্চরাত্রে যথা
সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন
নির্ম্মলং
হৃষিকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তি-
রুচ্যতে
মূলগ্রন্থে শ্রীমতো যথা
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তি-
রুত্তমা ইতি
সর্ব্বেন্দ্রিয় যার কৃষ্ণকর্ম্মে নিয়োজিত।
অন্য শুভাশুভ কর্ম্মে সঙ্গত রহিত॥

বাক্যেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ নাম গুণাদি বর্ণন ॥
শ্রবণেত করে নাম গুণাদি শ্রবণ ॥
হস্তে পরিচর্য্যা সেবার আয়োজন।
মনেতে করয়ে সদা শ্রীমূর্ত্তি ভাবন ॥
মস্তকের কার্য্যপাদপদ্ম যুগে নতি।
দেহে আলিঙ্গন ভক্তজনের সঙ্গতি ॥
চক্ষুর সাফল্য কৃষ্ণ-মূর্ত্তি আলোকনে।
তথা ভক্ত গুরু সাধু তীর্থ সন্দর্শনে ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় যার কৃষ্ণকর্ম্মে নিয়োজিল।
তার দেহে পরম ভক্তি বলিঞা কহিল

যথা দশমে।

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং ॥
হস্তৌ চ কর্ম্মসুমনস্তব পাদয়োর্ণঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেহস্তু ভবত্তনূনাং ॥ ইতি

সেই ত সাধন ভক্তি হয়ে দুই নাম।
বিধি ভক্তি রাগ ভক্তি কর অবধান ॥

যথা ॥

বৈধীরাগানুগাচেতি সাদ্বিধা সাধনা-
ভিধা ॥ ইতি

তত্র বৈধী যথা ঃ

রাগহীন ভজন যেবা শাস্ত্রের শাসনে ॥
প্রীতি শূন্য কৃষ্ণ ভজে দেবতার জ্ঞানে ॥
কৃষ্ণ না ভজিলে হয় নরক গমন।
ভজিলে অভীষ্ট পূর্ণ নিত্য সুখ হন ॥
পাপ পুণ্য ভয়ে ভজে শাস্ত্রের আদেশে।
পরমাত্মা ভগবান অশেষ বিশেষে ॥
অনুকূল স্নেহহীন ভজন বিষ্ণু জ্ঞানে।
সেই বৈধী ভক্তি হয় পূজ্য পূজকের
ক্রমে ॥

যথা তত্র।

যত্ররাগারনবাপ্তাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তি-
রুচ্যতে ॥ ইতি

রাগহীন ভক্তির শাসন গ্রন্থে কন।
পদ্মপুরাণাদি গ্রন্থে মুনির বচন ॥
অভয় বাঞ্ছিবে যে আপন কল্যাণ।
ইহকাল পরকাল সুখের বিধান ॥
যম ভবরোগ ক্ষয় শ্রীকৃষ্ণ সাধনে।
অতএব ভজ হরি সদা সাবধনে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন কর স্মরণ মনন।
গোবিন্দ ভজনে সর্ব্ব আপদ খণ্ডন ॥

শ্রীভাগবতে

তস্মাৎ ভারত সর্ব্বাত্মা
ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্য কীর্ত্তিতব্যশ্চ
স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতা ভয়ং ॥

পাদ্মে চ

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু-
বিস্মর্ত্তব্যোন জাতু চেৎ।

ইত্যাদি শুনিঞা শাস্ত্রে বিধি ভয়ে
ভজে।
বৈধী ভক্তি লক্ষণা কহিল বিজ্ঞ মাঝে ॥
সর্ব্ব বর্ণাশ্রম প্রতি ঐছে বাক্য কয়।
গোবিন্দ সাধন বিনু নরক নিশ্চয় ॥

একাদশে

মুখ বাহূরুপাদেভ্যঃ
পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা
গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।

য এষাং পুরুষং সাক্ষা-
দাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি
স্থানভ্রষ্টা পতন্ত্যধঃ॥ ইতি
বিধি মার্গে বৈদিক তান্ত্রিক পূজা রীতে।
ভজিলে কৃতার্থ জীব উভয় কালেতে॥
তাহার প্রমাণ শুন শ্রীযুতের শাসন।
শুণ ক্রমে ভক্তির হয় ছয়টি লক্ষণ॥
সাধন ভক্তির ফল দুই তাতে কয়।
ভাব ভক্তি দুই আর প্রেমে দুই হয়॥
ক্লেশঘ্নী শুভদা এই বৈধী ভক্তি ফল।
মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা ভাব ভক্তি বল॥
সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী।
প্রেম ভক্তি ফল এই শাস্ত্রে মত সুনি॥
যথা তত্র
ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীচসা
অত্র ক্লেশঘ্নী যথা।
ক্লেশাস্ত ত্রিবিধং।
পাপং তদ্বীজং অবিদ্যা চ ইতি ত্রিধা।
তত্র পাপং দ্বিবিধং
অপ্রারব্ধং প্রারব্ধঞ্চ। অপ্রারব্ধং ঐহিকং পাপং। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া ভক্তিঃ
এধাংসি পাপানি ভস্মসাৎ করোতি
যথা শুষ্ককাষ্ঠানি অগ্নিনা তথা—
একাদশে শ্রীকৃষ্ণঃ
যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ
করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তি—
রুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥
প্রারব্ধং পৌর্ব্বিকালিকং পূর্ব্বাপরাধেন চণ্ডালাদি কুলে জন্ম তদপি কৃষ্ণনাম গ্রহণাদিনা পূয়তে যজ্ঞ কর্ম্মাধিকারী সমো ভবতি। যথা
যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বনাদ্যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন্ দর্শনাৎ॥ ইতি
পাদ্মে
অপ্রারব্ধ ফলং পাপং
কূটং বীজং ফলোন্মুখং।
ক্রমেনৈব প্রলীয়ন্তে
বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাং॥ ইতি
বীজহরত্বং যথা ষষ্ঠে
বীজং অজ্ঞানরূপং চিত্তস্থং। পাপং তপসাদিনা পুণাতি। কিন্তু চিত্তং ন শুধ্যতি কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সেবয়া বিনা॥
যথা
তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে
তপোদান ব্রতাদিভিঃ।
না ধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং
তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া॥ ইতি
অবিদ্যাহরত্বং চতুর্থে।
অবিদ্যা কর্ম্মাশয় রূপ বন্ধনং তৎকৃষ্ণ ভক্ত্যা উৎগ্রন্থনং ভবতি যথা তথা
যতয়ঃ জিতেন্দ্রিয় গণাঃ ন ইতি। তথাহি
যৎপাদ-পঙ্কজ-পলাশ-বিলাস-ভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিত-মুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।

তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবং॥
ইতি ক্লেশঘ্নী।
অথ শুভদা। সা ত্রিধা ভবতি।
সর্ব্ব জগৎ প্রীণত্বং সর্ব্বসদ্‌গুণপ্রদত্বং সুখদত্বং চ।
তত্রাদ্যো যথা পাদ্মে।
যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি॥
অথ সদ্‌গুণ প্রদত্বং পঞ্চমে।
যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
সুখদত্বং যথা তন্ত্রে।
সুখং ত্রিবিধং বৈষয়িকং ভোগাদিকং। ব্রাহ্মং মোক্ষং। ঐশ্বরং নিত্যপরমানন্দং সুখং। ভক্ত্যা ত্রিবিধং ভবতি॥
যথা—
সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তির্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্গোবিন্দ-ভক্তিত:॥
ইতি সাধন ভক্তি ফল কথনে ক্লেশঘ্নী শুভদা ইতি॥
অথ ভাবভক্তি ফল কথনে মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা চ।
মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ যথা নারদপঞ্চরাত্রে।
হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতা স্তস্যাশ্চেটিকা বদনুব্রতাঃ॥
অথ তত্র সুদুর্ল্লভা যথা তন্ত্রে
জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি ভুক্তি যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সাহস্রৈ হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥ ইতি পঞ্চমে
রাজন্ পতিগুরুরলং ভবতাং যদুনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ক চ কিঙ্করো বঃ
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তি-যোগং॥
এইত কহিল মাত্র ভাব ভক্তি ফলে।
মোক্ষ লঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা দুই বলে॥
অথপ্রেমভক্তি ফলকথনে যথা সান্দ্রানন্দ
বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা ভক্তি।
আদ্যো যথা হরিভক্তি সুধোদয়ে।
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধি স্থিতস্য মে।
সুখানি গোস্পাদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥ ইতি
অথ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী।
শ্রীকৃষ্ণং প্রেমভাজং করোতি অতঃ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী ভক্তিঃ।
যথা একাদশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং উদ্ধবং প্রতি
না সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্ম-
মোর্জ্জিতা ইতি ॥

এইত কহিল ভাই ভক্তির ছয় গুণ।
গোসাঞীর সূত্র তাহে করহ শ্রবণ ॥
সাধন ভক্তিতে দুই গুণ আগে কহে
ক্লেশঘ্নী শুভদা এই দুই গুণ হয়ে ॥
ভাবভক্তিতে চারিগুণ পূর্ব্ব দুই লঞা।
নিজগুণ সহ চারি অনুগত হৈঞা ॥
প্রেমভক্তিতে ষড়্গুণ নিজগুণ সহ।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুগত ষড়্গুণ হয় ॥

যথা তত্র শ্রীমতঃ

অগ্রতো বক্ষ্যমাণায়াস্ত্রিধাভক্তেরনু
ক্রমাৎ।
দ্বিশঃ ষড়্ভিঃ পদৈরেতন্মাহাত্ম্যং পরি-
কীর্ত্তিতং ॥ ইতি

এবে কহি সেই ভক্তি সাধে কোন জন।
ভক্তি শাস্ত্রে কহে তার অধিকারী
নিয়ম ॥
সংসার ভ্রমিতে কেহ নিজ পুণ্য ফলে।
কোনরূপে কৃষ্ণভক্ত সাধু সঙ্গ মিলে ॥
সেই সঙ্গ হয় তার সদ্গতি কারণ।
শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে রতি আসি হন।

যথা

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্যতর্হ্যচ্যুত সৎ সমাগমঃ।
সৎ সঙ্গমো জাত তদেব সদ্গতি
পরাবরেশেস্ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥

অথ বৈধী ভক্ত্যধিকারী।

কোন জন অতিভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণ সাধনে
শ্রদ্ধা জন্মায়ে যার সেবা হেতু মনে
গৃহে থাকিয়া বিষয়ে অতি সক্ত নয়।
অতিশয় বৈরাগ্যও তাহে নাহি হয় ॥
সেই হয় অধিকারী বৈধীর সাধনে।
একাদশে উদ্ধবেরে কহেন আপনে ॥

যথা শ্রীমতঃ

যঃ কেনাপ্যতি ভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য
সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকা-
র্য্যসৌ।

একাদশে চ

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ
পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগস্য
সিদ্ধিদঃ।
ইতি।

সেই ভক্ত হয় ত্রিবিধ লক্ষণ।
উত্তম মধ্যম আর কনিষ্ঠ কথন ॥

তত্র উত্তম ভক্ত

শাস্ত্রযুক্তিতে নিপুণ দৃঢ় নিশ্চয় সদা।
শাস্ত্রে বিশ্বাস অতি কহিল সর্ব্বদা ॥
দৃঢ় নিশ্চয় শব্দে কহি বস্তু বিচারাদি।
পুরুষার্থ সাধন বিচারে দৃঢ় যদি ॥
প্রৌঢ় শ্রদ্ধা ভক্তিশাস্ত্রে বিশ্বাসাতি
যার।
উত্তম বলিঞা হয় আখ্যান তাহার ॥

যথা শ্রীমতঃ

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়-
নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ় শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তা-
বুত্তমো মতঃ ॥

অথ মধ্যমঃ
শাস্ত্রে তরতমবুদ্ধি নহেত নিপুণ।
ভক্তি শাস্ত্রে কহে সেই মধ্যম লক্ষণ॥
শ্রদ্ধা অতিশয় যার বিশ্বাস সমান।
মধ্যম ভক্ত বলি তাহার আখ্যান॥
যথা
যঃ শাস্ত্রাদিম্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ॥
অথ কনিষ্ঠঃ
শাস্ত্রাদিতে যেবা নিপুণ অতি নয়।
সাধনে কোমল শ্রদ্ধা কনিষ্ঠ তারে কয়॥
বিচারাদি ক্রমে অন্তরের ভেদ হন।
কোমল-শ্রদ্ধ বলি তাহা শাস্ত্রকারে কন॥
যথা
যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে।
শ্রীভাগবতমতে শুন ভক্তির লক্ষণ।
উত্তম মধ্যম আর কনিষ্ঠ বর্ণন।
উত্তমঃ
সর্ব্বভূতে সমভাব নিজপর সম।
জীবে আত্মাতে যার ভগবদ্ভাবন॥
সম শত্রু মিত্র যার মান অপমান।
নিন্দাস্তুতি সুখ দুঃখ নাহি ভিন্ন জ্ঞান।
স্থিরমতি ভক্তিমান হয়ে ভক্তোত্তম।
গীতা ভাগবতে কহে প্রভু সনাতন।
যথা
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
শ্রীগীতাযু
সমঃ শত্রৌচ মিত্রৌচ তথা মানাপমানয়োঃ।
তুল্য নিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ।
একাদশে কহে হরি উদ্ধবের প্রতি।
গোবিন্দে সদত যার রহে নিষ্ঠা মতি॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-পদ্ম সদা যার ধ্যান।
দেবগণ যেবাপদ ধ্যানে নাহি পান॥
সেই পদে সদা মতি হয় ভক্ত জনে।
নিমেষার্দ্ধ চিত্ত তার না যায় অন্য স্থানে॥
যথা
ত্রিভুবন বিভবহেতবেহপ্যকুণ্ঠ স্মৃতি-
রজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎ পদারবিন্দা
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥
উত্তমের গৃহে নাহি বসতি বাসনা।
শ্যামসুন্দর সদা করয়ে ভাবনা॥
ক্রোধহীন বিরক্ততা ইন্দ্রিয় দমন।
ক্ষমাচিত্ত জীবে দয়া পরদুঃখাসহন॥
সর্ব্বজন প্রিয় সদা বিষয় লোভহীন।
দান যুক্ত ভয় শোক রহিত প্রবীণ॥
ভক্তি যুক্ত জনের এ দশ লক্ষণ।
পুরাণান্তরের শুন কহিয়ে বচন॥
যথা
অক্রোধ বৈরাগ্য জিতেন্দ্রিয়ত্বং
ক্ষমা দয়া সর্ব্বজন-প্রিয়ত্বং।
নির্লোভ দানং ভয় শোকহীনং
ভক্তস্য চিহ্নং দশ লক্ষণং তৎ॥
তত্র মধ্যমঃ

ঈশ্বরে করয়ে প্রেম ভক্তি আচরণ।
বৈষ্ণবে করয়ে মৈত্র ভাব প্রকাশন॥
অনুগত কিম্বা মুর্খে কৃপা করে অতি।
দ্বেষীকে উপেক্ষা করে মধ্যম খেয়াতি॥

যথা

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসুচ।
প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

অথ কনিষ্ঠঃ

শ্রীকৃষ্ণ সেবন করে হইঞা তৎপর।
ত্বদীয় বৈষ্ণবাদিক না পূজে অপর॥
প্রাকৃত ভক্তের এই কহিল লক্ষণ।
শ্রীল ভাগবত মতে ত্রিবিধ বর্ণন।
অর্চ্চায়ামের হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ইতি

এই ত কহিল তিন ভক্তের লক্ষণ।
সগুণ নির্গুণ ভক্তি করহ শ্রবণ॥
সত্ব রজ তম এই প্রকৃতি জাত হয়।
এই তিন যুক্ত ভক্তি সগুণ ভক্তি কয়॥
নির্গুণ হরির ভক্তি সকলে উত্তম।
গুণাগুণ ভেদ তাহে করহ শ্রবণ॥
সাত্বিক শ্রদ্ধা সুখ জন্য কর্ম্মজন্য রাজস।
অধর্ম্ম জন্য যে শ্রদ্ধা সে হয় তামস।
কৃষ্ণাশ্রয় যেইশ্রদ্ধা গুণাতীত হন।
অতএব নির্গুণ বলি তাহা কারে কন॥
একাদশে শ্রীকৃষ্ণঃ।

সাত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থঞ্চ রাজসং।
তামসং মোহজন্যোত্থং নির্গুণং স্যাদ্ মদাশ্রয়ং॥
সাত্বিকাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্ম রাজস উদ্ভবঃ।
তামস্যহধর্ম্ম যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা॥ ইতি

তিনগুণে ত্রিজগৎ করিছে মোহন।
গুণাতীত হৈঞা সেব গোবিন্দ চরণ॥
কৃষ্ণ কহেন বিমল ভক্তিতে আমা সেবে।
ত্রিগুণ লঙ্ঘিয়া সে আমার ভাব লভে॥

শ্রীগীতায়াং

মাঞ্চযোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ মদ্ভাবায়োপজায়তে॥

নির্গুণ ভগবান কৃষ্ণ প্রকৃতির পর।
তিঁহো সকালের দ্রষ্টা সর্ব্বপরাৎপর॥
তাঁরে যেবা ভজে সেহ হয়েত নির্গুণ।
ভাগবতে শুকদেব কহিলা বচন।
হরির্হিনির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণোভবেৎ॥ ইতি

চতুর্ব্বিধ ভাবে কৃষ্ণ কিম্বা কৃষ্ণদাস।
জারে কৃপা করে তার ভক্তি অভিলাস॥
চতুর্বিধ প্রবর্ত্তক গীতায় বর্ণিল।

আর্ত্ত জিজ্ঞাসুরথার্থী জ্ঞানী যে কহিল ॥
শ্রীভগবদ্গীতায়াং।
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাংজনাঃ সুকৃতি-
নোঽর্জ্জুনঃ।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ
ভরতর্ষভ ॥
অপিচ। যথেভঃ শৌণকাদিশ্চ ধ্রুব স
চ চতুঃসনঃ
গজেন্দ্র ভজিল কৃষ্ণ গ্রাহে আর্ত্তি হৈঞা।
জিজ্ঞাসু শৌণিক আদি মহিমা শুনিঞা
অর্থাকাঙ্খী হৈঞা ধ্রুব ভজে ভগবান।
জ্ঞানী ভক্ত সনকাদি সকলে প্রধান।
এই মত চতুর্ব্বিধ প্রবর্ত্ত কহিল।
যারে ভক্ত কৃপা হৈল সে ভক্তি পাইল
কৃষ্ণভক্তি হয় বহু তপস্যাদি বলে॥
কোটি কোটি মধ্যে কেহ বহু ভাগ্য ফলে
স্বধর্ম্মেতে শত শত জন্ম আরাধিঞা।
কোন জন মুক্ত হয় জ্ঞানযোগ পাঞা ॥
প্রাকৃত শরীরে থাকি মুক্ত অভিমানী।
কিম্বা সিদ্ধগণ যত সালোক্যাদিগামী ॥
মুক্তসিদ্ধ কোটি কোটি মধ্যে কোনজন
সুদুর্ল্লভ হরিভক্ত ভক্তিযুক্ত হন।
যথা শ্রীভাগবতে ষষ্ঠে।
মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্ নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি
মহামুনে
কৃষ্ণ কহেন মোর ভক্ত একান্তিক মন।
ধীর সাধুজন সব আমা পরায়ণ ॥
যদি আমি কৈবল্যাদি দিতে চাহি মুক্তি
নাহিলয় মুক্তিবর বিনা দাস্য ভক্তি ॥

একদাদশে শ্রীকৃষ্ণঃ,
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তাশ্চে
কান্তিনোমন।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়াদত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবং ॥
অপিচ চ
ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
মর্য্যর্পিতাত্মেচ্ছতিমদ্বিনান্যৎ ॥ ইতি
অতএব ধ্রুব উক্তি করহ শ্রবণ।
আপনাকে দেখ ধ্রুব করিয়াছে নিন্দন ॥
উচ্চপদ সর্ব্বোৎকর্ষ পাইল কৃষ্ণস্থানে।
সেই পাদ তুচ্ছ করে ভক্তি ভাব বিনে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় যে আনন্দ হয়।
ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ কথায় সেবা সুখোদয় ॥
তার কাছে ব্রহ্ম সুখ তুচ্ছ করি মানি।
সেবা সুখ নাহি তাথে তেঞি হেয় জানি
অতএব স্বর্গাদি পদ অতি তুচ্ছ হয়।
তাহা দিঞা অহ প্রভু ভুলাইলে
নিশ্চয় ॥
যথা চতুর্থে।
যা নির্বৃতি স্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জন কথা শ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপিনাথমাভূৎ
কিম্বন্তকাসি লুলিতাৎ পততাং
বিমানাৎ ॥ ইতি
মুক্তিস্তু পঞ্চবিধা যথা সালোক্যং সাষ্টি
সারূপ্যং সামীপ্যং শ্রীকৃষ্ণ দীয়মনোপি
পঞ্চবিধা মুক্তিঃ সেবাভিরতা ভক্তা
ন গৃহ্নন্তি। ঐক্যঞ্চ চতুর্ব্বিধা তু ভক্ত্যা।
নাঽতি বিরুদ্ধা। যথা

অত্র তয়েবোক্তা মুক্তিঃ সর্ব্ববিধাপি যে
সালোক্যাদি স্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতি
বিরুধ্যতে ॥ ইতি

সা সালোক্যাদি মুক্তির্দ্বিধাভবতি।
সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা নিজসুখতাৎপর্য্যা।
তথা প্রেমসেবোত্তরা চ ইতি দ্বিধা।
প্রেম্না প্রেম স্বাভাব্যেন সেবৈব উত্তরা
যস্যাঃ সা প্রেমসেবোত্তরা। সেবাজুষাং
ভক্তানাং অতি বিরুদ্ধা ন। আত্ম-
সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা ন সম্মতাঃ। যথা
শ্রীমতঃ।

সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরে-
ত্যপি।
সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং
মতা॥

কিঞ্চ প্রেমমাধুর্য্যকাঙ্খিণঃ একান্তিনো
ভক্তা পঞ্চবিধামপি মুক্তিং নাঙ্গীকারং
কুর্ব্বন্তীতি পরামর্শঃ।

শ্রীকৃষ্ণে একান্ত ভক্তি যার উপজয়ে।
ভোগাদি অভিলাষ তার হয় তুচ্ছ প্রায়ে
শ্রীনন্দ নন্দন মাধুর্য্য যার আস্বাদন।
বিচলিতে নারে কেহ তাহা কার মন॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত হয়ে।
ব্রজভক্তগণের সেহ সুখ নাহি ভায়ে॥
গোবিন্দ হরিল যার নিরবধি মন।
মন বিচলিতে তার না পারে নারায়ণ॥
অন্য সুখ তার কাছে অতি তুচ্ছ প্রা"।
ত্রিবর্গাদি ফল যত যেহো কোন দায়॥
জিহোঁ কৃষ্ণতিহোঁ পরব্যোম-নারায়ণ।
তথাপি প্রেম-রসোৎকর্ষ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

যথা শ্রীমতঃ

তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ-
হৃতমানসাঃ।
যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনো হর্ত্তুং ন
শক্নুয়াৎ॥

সিদ্ধান্ততস্তভেদোঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ
রসেনোৎকৃষ্যতেকৃষ্ণরূপমেষারসস্থিতি ॥

ভক্তির সাধনে নরমাত্র অধিকারী।
নীচ অনীচ আদি নাহিক বিচারি॥
দেব অসুর আদি মনুষ্য যক্ষগণ।
গন্ধর্ব্বাদি যেবা ভজে সেই ভাগ্যবান॥

যথা পাদ্মে।

সর্ব্বেঽধিকারিণোঽত্রহরি ভক্তৌ যথা
নৃপঃ।
প্রহ্লাদোক্তিঃ॥ দেবোঽসুরো মনুষ্যো
বাযক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা ভজন্মুকুন্দচরণং
স্বস্তিমান্ স্যাদ্যথারয়॥

কৃষ্ণভক্তি পথে কেহ প্রবর্ত্ত হইঞা।
মুদ্রা তিলক ধরে বিষ্ণু দীক্ষা পাইঞা॥
সুনীচ হইঞা সেই মহা ভাগ্যবান।
যজ্ঞের দীক্ষিত তুল্য আর অভিমান॥

যথা কাশীখণ্ডে---

অন্ত্যজা অপিতদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব
সংবভুঃ॥ ইতি

ভক্তি অধিকারীর ভক্ত্যঙ্গ সাধন।
নিত্য রূপ ভক্তি অঙ্গ হয়েত লিখন॥
ভক্ত্যঙ্গ সাধে আর কর্ম্মাঙ্গ না করে।
প্রত্যবায়ী নাহি হয় জানি ভক্ত নরে॥
কর্ম্মাঙ্গ অকরণে না হয়ে প্রত্যবায়ী।

ভক্তি অধিকারী জনের এই কথা স্থায়ী
অননুষ্ঠানতো দোষো ভক্ত্যঙ্গানাং
প্রজায়তে।
ন কর্ম্মণামকরণাদেষভক্ত্যধিকারিণাং।
স্বকীয় স্বকীয় অধিকারে নিষ্ঠা হৈলে।
সেই হয় সদ্গুণ সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
স্বস্ব ধর্ম্ম বিপর্য্যয়ে হয়ে দোষ জানি।
নিশ্চয়ে কহিলা এই ভক্তি শাস্ত্রে মুনি॥
যথা।
স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ
পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তদোষঃ স্যাদুভয়োরেষনিশ্চয়ঃ।
বিষ্ণুভক্তানাং কদাচিৎ দৈবাৎ বিকর্ম্মং
ভবেৎ তথাপি প্রায়শ্চিত্তং তুন উচিতং
ইতি বৈষ্ণব শাস্ত্রানাং রহস্যং।
যথা একদিশে।
শ্রীকৃষ্ণপাদমূলং ভজতঃ পুরুষস্য কৃষ্ণৈ-
কনিষ্ঠস্য দৈবাৎ যদি বিকর্ম্মস্যাৎ তদা
হরিস্তস্য ভক্তস্য হৃদি প্রবিষ্টঃ বিকর্ম্ম
সর্ব্বং ধুনোতি নাশয়তি॥
যথা
স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্য ভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চি
দ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সংনিবিষ্টঃ॥
এবং
ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরেরিত্যাদি
প্রথমে॥
এবং যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য কিঞ্চন
ইত্যাদয়শ্চ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ।
জয় কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র প্রভু শ্রীসুন্দরানন্দ॥
শ্রীপর্ণিগোপাল জয় কৃষ্ণভক্তগণ।
এ নয়নানন্দে দেহ চরণে শরণ॥
গোপাল চরণারবিন্দ করি অভিলাষ।
কৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব করিলা প্রকাশ॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্বে চতুর্থ
প্রকরণং॥
হরিঃ পুণাতু॥

পঞ্চম প্রকরণ।

শ্রীদামা দ্যাশ্চ সুহৃদো
রাধিকা যস্য বল্লভা।
প্রসূ র্যশোদা জনকঃ
শ্রীনন্দ ব্রজবল্লবঃ॥
সঙ্কর্ষণোঽগ্রজো যস্য
যস্য বৃন্দাবনং পুরী।
মুরলী-বাদনং যস্য
তস্য বন্দে পদাম্বুজং॥
জয় শচীতনয় পরম অবতার।
বেদ পুরাণ,নিগম শ্রুতি স্মৃতিসার॥
আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ রায়।
কলি ভব তারণ কারণ যাহার কৃপায়॥
জয় জয় পার্ষদ সখাগণ-বৃন্দ।
জয় জয় শ্রীঅভিরাম সুন্দরানন্দ॥
আবশ্যক হয় ভক্তের ভক্ত্যঙ্গ সাধন।
অকরণে প্রত্যবায়ী তেঞি নিত্য কন॥
করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি না করিলে ক্ষতি।
এই কথা কহিলেন সর্ব্ববর্ণ প্রতি॥
যথা

ইত্যসৌ স্যাদ্বিধির্নিত্যং সর্ব্ববর্ণা-
শ্রমাদিষু।
সাধন ভক্তির অঙ্গ আছে বহু মত।
হরিভক্তি বিলাসাদি গ্রন্থে সুবিদিত॥
শ্রীরূপ গোস্বামী তাহা বর্ণিলেন পুন।
রসামৃত সিন্ধুগ্রন্থে চতুঃষষ্টি ক্রম॥
যথা অঙ্গানি॥
গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-
শিক্ষণং।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানু-
বর্ত্তনং॥
সদ্ধর্ম্ম-পৃচ্ছা ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্য
হেতবে।
নিবাসো দ্বারকাদৌ চগঙ্গাদেরপি
সন্নিধৌ॥
ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।
হরিবাসর সম্মানো ধাত্র্যশ্বত্থাদি গৌরবং॥
এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভ-
রূপতা।
এইত কহিল অঙ্গ প্রারম্ভরূপ দশে।
ব্যতিরেকে কহি শুন পুন দশ শেষে॥
যথা
সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ
শিষ্যাদ্যননুবন্ধিতং মহারম্ভাদ্যনুদ্যমঃ॥
বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যাবাদবিবর্জ্জনং।
ব্যবহারেহপ্যকার্পণ্যং শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা।
অন্যদেবানবজ্ঞাচ ভূতানুদ্বেগদায়িতা।
সেবানামাপরাধানামুদ্ভবাভাব কারিতা॥
ব্যতিরেকতস্নামীষাং দশানাং
স্যাদনুষ্ঠিতিঃ॥

একত্রে বিংশতি।
ধৃতিবৈষ্ণবচিহ্নানাং হরের্ণামাক্ষরস্যচ।
নির্ম্মাল্যাদেশ্চ তস্যাগ্রে তাণ্ডবং
দণ্ডবন্নতিঃ॥
অভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা গতিঃ স্থানে
পরিক্রমাঃ।
অর্চ্চনং পরিচর্য্যাচ গীতং সঙ্কীর্ত্তনং জপঃ।
বিজ্ঞপ্তিঃ স্তবপাঠশ্চ স্বাদো নৈবেদ্য
পাদ্যয়োঃ।
ধূপ মাল্যাদি সৌরভ্যং শ্রীমূর্ত্তেঃ স্পৃষ্টি
রীক্ষণং।
আরাত্রিকোৎসবাদেশ্চ শ্রবণং
তৎকৃপেক্ষণং।
স্মৃতির্ধ্যানং তথা দাস্যং সখ্যমাত্ম
নিবেদনং।
নিজ প্রিয়োপহরণং তদর্থেঽখিল চেষ্টিতং॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি স্তদীয়ানাঞ্চ সেবনং।
তদীয়াস্তুলসী শাস্ত্র মথুরা বৈষ্ণবাদয়ঃ॥
যথা বৈভবসামগ্রী সগোষ্ঠী ভির্মহোৎ-
সবঃ উর্জ্জাদরো বিশেষেণ যাত্রাজন্ম
দিনাদিষু শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ
শ্রীমূর্ত্তের জ্বি সেবনে শ্রীমদ্ভাগবতার্থা
নামা স্বাদো রসিকৈঃ সহ সজাতীয়া-
শয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে
নাম সঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥
অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ব্বংবিলিখিত
স্য চ।
নিখিল শ্রৈষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র শংসনং॥
শংসনং কথনং।
অথ তত্র গুরুপাদাশ্রয়ঃ

গুরু পাদাশ্রয় আগে করিবে যতনে।
শাব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম নিষ্ণাত শান্ত স্থানে॥
একাদশে শ্রীকৃষ্ণঃ
তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং॥

কৃষ্ণ-দীক্ষাদি-শিক্ষণং একাদশে,
কৃষ্ণ দীক্ষা করি পুন ভজন লক্ষণ।
ভাগবত ধর্ম্মশিক্ষা অবশ্য করণ॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ। ইত্যাদি

বিশ্বাসেন গুরুসেবা।
বিশ্বাস করিঞা গুরুর করিবে সেবন।
গুরু সর্ব্বদেবময় কৃষ্ণ তুল্য হন॥
মনুষ্য বুদ্ধি না করিহ না করিহ অন্য জ্ঞান।
আচার্য্যরূপ আমি হই কহে ভগবান॥
একাদশে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণঃ।
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
নমর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়োগুরুঃ॥
অথ সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনং যথা।
পূর্ব্বমহান্তসব যে ধর্ম্ম আচরিল।
সাধুর বর্ত্ম বলি তাহারে কহিল॥
সে পথে চলিলে আর আপদ না হন।
অতএব সাধুপথ কর অন্বেষণ॥
স্কান্দে
সমৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ। ইত্যাদি।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির পঞ্চরাত্রি বিধি।
সাধুপথ দেখাইতে এ সব প্রসিদ্ধি॥
তাহাতে যে ভক্তিভাব কৈলা নিরূপণ।
তদনুসারে আচরিলে আপদ খণ্ডন॥
ইহা ছাড়ি আত্যন্তিক করে আচরণ।
ভক্তি নহে সেই হয় উৎপাত কারণ॥
যথা ব্রহ্ম যামলে।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রিবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥
শাস্ত্র রহিত ভক্তি করে আচরণ।
বিধিপ্রাপ্ত নহে সেই উৎপাত জন্য হন॥ ৪

অথ সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা।
সৎ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসাতে যার নিষ্ঠামতি।
অচিরাৎ তাহার সর্ব্বসিদ্ধি শীঘ্রগতি॥ ৫
অথ কৃষ্ণার্থে ভোগাদি ত্যাগ।
কৃষ্ণোদ্দেশে ভোগ্য প্রিয় করয়ে ভেজনে
আপনে না খায় দেয় কৃষ্ণ ভক্তগণে॥
কৃষ্ণলোকে বসতি হয় অতুল সম্পদ।
নাহি হয় সেই জনের কখন আপদ॥
অথ দ্বারকাদি নিবাসঃ।
দ্বারাবতীপুরে বাস সর্ব্বসুলক্ষণ।
চতুর্ভুজ তুল্য হয় সেই সবজন।
বৎসর ষণ্মাস কিবা মাসার্দ্ধপক্ষ জানি।
দ্বারাবতীপুরে বাস বহুভাগ্য মানি॥
আদি পদে পুরুষোত্তমক্ষেত্র গঙ্গাবাস।
এই সব জানিহ ভক্ত্যঙ্গ প্রকাশ॥

অথ যাবদর্থানুবর্ত্তিতা ॥
স্বকীয় নির্ব্বাহ হেতু করিবে গ্রহণ।
যাহাতে সে হয়ে জানি আত্মীয় ভরণ॥
ন্যূনাধিক ভিক্ষা না করিহ সঞ্চয়।
পরমার্থেচ্যুত হন সংগ্রহে নিশ্চয়॥
যথা নারদীয়ে—
যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাব-
দর্থবিৎ।
আধিক্যোন্যূনতায়াঞ্চ্যবতে পরমার্থতঃ
অথ হরিবাসরসম্মানঃ।
সর্ব্বপাপ প্রশমন সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়।
কৃষ্ণভক্তিকরী একাদশী ব্রত হয়॥ ৯
অথ ধাত্র্যশ্বথাদিগৌরবং—
অশ্বথ তুলসী ধাত্রী তুলসী বৈষ্ণব।
তদীয় সেবন হয় ভক্ত্যঙ্গ অনুভব॥ ১০
এই ত কহিল দশাঙ্গ প্রবৃত্তিরূপে
নিরূপণ।
নিষেধরূপে পুন দশ করহ শ্রবণ॥
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ সঙ্গত্যাগ হয় যেন।
অভক্তের সঙ্গ হয় ধর্ম্মবিনাশন॥
অগ্নিতাপে দেহ যায় পঞ্জরে বসতি
সেহ শ্রেষ্ঠ তভু নহে অভক্ত সঙ্গতি॥
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ সঙ্গ নাহি হয় যেন।
অগ্নিজ্বালা হৈতে দুস্থ পাষণ্ড সঙ্গম॥
কাত্যায়ন সংহিতায়াং—
বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরি চিন্তাবিমুখ-জন-সম্বাস-
বৈশসং॥ ইতি ১১
অথ শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বাদিত্রয়ং।
বহু শিষ্য না করিবে শ্রদ্ধাহীন দেখি।
হেতুবাদি যেবাগণ শাস্ত্রমত লেখি॥
বহুগ্রন্থ না পড়িবে ভক্তিগ্রন্থ বিনে।
মন বিচলিত হয় আগমাদি দর্শনে॥ ১৩
এককালে বহুকর্ম্ম নাহি আরম্ভিবে।
ব্যাখ্যাবাদার্থ আদি গ্রন্থে তেয়াগিবে॥
লাভালাভ অপচয়ে শোক তেয়াগিবে।
শোক রোষ ক্রোধমোহে আবিষ্ট না হবে
শোকাদিতে অবশ যাহার চিত্ত হয়।
আর দেহে গোবিন্দ স্মরণ কৈছে রয়॥
গোবিন্দ স্মরণ বিনে নিষ্ফল জীবন।
অতএব শোকাদি সদা করিবে তেজন॥
পাদ্মে।
শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য
মানসং।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিঃ সংভাবনা
ভবেৎ॥ ১৬
অন্য দেবতার কভু না করি নিন্দন।
নিন্দা হয় জানি অপরাধ কারণ॥ ১৭
ভূতানুদ্বেগদায়িতা হবে ভক্তগণ।
প্রাণিমাত্র হিংসা না করিহ কখন॥
সর্ব্বজীবে পুত্র প্রায় স্নেহ দেখি যার।
অচিরে গোবিন্দ হয় সুপ্রসন্ন তার॥
যথা মহাভারতে।
পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি
যোজনং।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশ স্তূর্ণং তস্য
প্রসীদতি॥ ১৮
সেবা নাম অপরাধ বর্জ্জিবে যতনে।
পশ্চাতে লিখিব তাহা করি বিবরণে॥১৯
কৃষ্ণনিন্দা অসহিষ্ণুতা হবে ভক্তগণে।

কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত নিন্দা না কৈব শ্রবণে॥
যে করে নিন্দন সেই অসংখ্য পাতকী।
সেহ পাতকী যেবা শুনে তাহা থাকি॥
বিষ্ণু নিন্দকজনের মুখ না দেখিবে।
কর্ণে হস্ত দিঞা স্থানান্তরে পালাইবে॥
শ্রীদশমে।
নিন্দাং ভগবতঃ শৃন্বংস্তৎ পরস্য জনস্য
বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোপিযাত্যধঃ
সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥২০
প্রবর্ত্তরূপ দশ নিষেধরূপ আর।
বিংশতি অঙ্গ এই করিল প্রচার॥
বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ ভক্তি অঙ্গ হন।
তুলসী মালা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র মুদ্রা ধারণ॥
পাদ্মে।
যে কণ্ঠ-লগ্ন তুলসী নলিনাক্ষমালা
যে বাহুমূল পরিচিহ্নিত শঙ্খচক্রাঃ।
যে বা ললাট ফলকে লসদূর্দ্ধ পুণ্ড্র
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥২১
নামাক্ষর ধৃতি হয় ভক্ত্যঙ্গ লক্ষণ।
কৃষ্ণনামাঙ্কিত মুদ্রা শ্রীগোপীচন্দন॥
তুলসীর মালা বক্ষে ধারণ যে করে।
কদাচিত যম তারে পরশিতে নারে॥
স্কান্দে।
হরিনামাক্ষরযুতং ভালে গোপীমৃদঙ্কিতং
তুলসী মালিকোরস্কংস্পৃশেয়ুর্ন-
যমোস্তটাঃ॥২২
নির্ম্মাল্য ধৃতি প্রসাদ পুষ্পচন্দন।
সে লোক কৃতার্থ হয় যে করে ধারণ॥২৩
অগ্রে তাণ্ডব কৃষ্ণের করয়ে নর্ত্তন।
কক্ষবাদ্য করতালি নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
ভক্তিভাবে নৃত্যকরে হৃষ্ট আত্মা হৈঞা।
শরীরের পাতক পক্ষ যায় পলাইঞা॥
সাধারণ বৃক্ষে যেন রহে পক্ষীগণ।
করতালি শব্দ হৈতে করে পলায়ন॥
কৃষ্ণাগ্র নর্ত্তনে তৈছে পাতক পক্ষি যত
দূরে পলাইঞা যায় হৈঞা অতিভীত॥
যথা পাদ্মে।
নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈ
ভৃশং।
উড্ডীয়ন্তে শরীরস্থা সর্ব্বে পাতকি-
পক্ষিণঃ॥২৪
দণ্ডবৎ নতি করে শ্রীকৃষ্ণ চরণে।
দশ অশ্বমেধযাজী নহে তার সমে॥
যথা নারদীয়ে।
একোপি কৃষ্ণায় কৃত প্রণামো
দশাশ্বমেধাবভৃথৈ র্নতুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম
কৃষ্ণ-প্রণামী ন পুনর্ভবায়॥ ২৫
অভ্যুত্থান কৃষ্ণ দেখি যে করে সংভ্রমে।
সর্ব্ব পাতকতার খণ্ডয়ে তৎক্ষণে॥ ২৬
কৃষ্ণপশ্চাৎ গমন অনুব্রজ্যা নাম।
রথ দোল যাত্রা কালে পশ্চাতে পয়ান।
কৃষ্ণ স্থান গতি হয় ভক্ত্যঙ্গ লক্ষণ।
তীর্থক্ষেত্র কৃষ্ণালয় করিতে দর্শন॥২৮
অথ পরিক্রমা।
চতুর্ব্বার প্রদক্ষিণ কৃষ্ণালয়ে করে।
সেই আবর্ত্তন পুন না ভ্রমে সংসারে।
যথা ভক্তিসুধোদয়ে।
বিষ্ণুং প্রদক্ষিণী কুর্ব্বন্।

যস্তত্রাবর্ত্ততে পুনঃ।
তদেবাবর্ত্তনং তস্য
পুনর্ণাবর্ত্ততে ভবে ॥ ২৯
অথ অর্চ্চনং। যথা শ্রীমতঃ
শুদ্ধি-ন্যাসাদি পূর্ব্বাঙ্গং
কর্ম্মনির্ব্বাহ পূর্ব্বকং।
অর্চ্চনং তূপচারাণাং
স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনং ॥
ভক্তি করি কৃষ্ণার্চ্চন করে যেবা জন।
শাশ্বত গোবিন্দ পদ সে করে গমন ॥৩০
কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা হয় ভক্ত্যঙ্গ প্রধান।
সেই পরিচর্য্যা হয় অনেক বিধান ॥
মন্দির মার্জ্জন সেবা পাদপীঠ সমর্পণ।
ছত্র পাদুকা পুষ্পমাল্যাদি রচন ॥
কৃষ্ণ পরিচর্য্যা খণ্ডে বহুজন্মের মল।
ত্রিলোক পবিত্র যৈছে করে গঙ্গাজল ॥
ভাগবত চতুর্থে।
যৎপাদ সেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষ জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃতা সরিৎ ॥৩১
অথ সংকীর্ত্তনং। তৎ সংকীর্ত্তনং ত্রিবিধং
নামকীর্ত্তনং লীলাকীর্ত্তনং গুণাদি-
কীর্ত্তনং ॥
তত্র নামকীর্ত্তনং বিষ্ণুধর্ম্মে।
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি
প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতক-
কোটয়ঃ ॥
অথলীলাকীর্ত্তনং সপ্তমে
সো ঽহং পরস্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চি গীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন গুণ বিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয় হংস সঙ্গঃ ॥
অথ গুণ কীর্ত্তনং প্রথমে
জন্মে জন্মে যেবা করে তপস্যাদি ধর্ম্ম।
বেদপাঠ জ্ঞান যজ্ঞ দান বেদ কর্ম্ম ॥
সকল ধর্ম্মের ফল ইহকালে জানি
যার মুখে গুণানুকীর্ত্তন কৃষ্ণের শুনি ॥
পণ্ডিত সব নিরূপিল ধর্ম্ম সনাতন।
পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণগুণানুবর্ণন ॥
যথা শ্রীভাগবতে প্রথমে।
ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধ দত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতো ঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তম-শ্লোকগুণানুবর্ণনং ॥ ৩৩
অথ জপঃ।
জপ কৃষ্ণ নাম মন্ত্র সুলভ উচ্চারণ।
শ্রীযুতের কারিকা তাহে করহ শ্রবণ ॥
মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যাভিধীয়তে।
কৃষ্ণায় নম এই মন্ত্রের যাজ্ঞা কয়।
চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত জপ মাত্র হয় ॥
পাদ্মে।
কৃষ্ণায় নম ইত্যেষ মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
ভক্তানাং জপতাং ভূপ স্বর্গ মোক্ষফল-
প্রদঃ ॥ ৩৪
অথ বিজ্ঞপ্তি।
বিজ্ঞাপন হয় কৃষ্ণে তিন রূপ জানি।
প্রার্থনাত্মিকা তথা বিজ্ঞাপন বাণি ॥
দৈন্য-বোধিকা আর লালসাময়ী কহে।

প্রেমের বন্ধন কখনই ছিন্ন বা শিথিল হইবে না। এই বন্ধন আগমাপায়ী নহে, ইহা নিত্য। সেইজন্য যে স্মৃতিপটে এই প্রকারের সহস্র সহস্র ঘটনা উজ্জ্বলভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, নিত্যানন্দ দাসের সহিত পরিচয়ের দিন ও উপলক্ষ্য তথা হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে।

কে জানিত নিত্যানন্দ দাস এত শীঘ্র নিত্যধামে প্রবেশ করিবেন! অনাথ ও অসহায় বালকবৃন্দ যাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নবদ্বীপধামে বসিয়া রহিয়াছে, সদ্যজাত ও পরিত্যক্ত শিশুগণ যাঁহার ব্যয়ে দুর্লভ মানব জন্মের প্রারম্ভকালেই সমাগত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইতেছে, যাঁহার সেবাশ্রমে কত রোগী দুর্ল্লভ শুশ্রূষায় আপ্যায়িত, যেখানে আর্ত্ত ও অসহায় নরনারী সেই খানেই যিনি সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উদ্গ্রীব, যাঁহার শক্তিতে ও ত্যাগে শত শত সাধুভক্ত নিশ্চিন্তচিত্তে দেশে দেশে শ্রীভগবানের নাম গান করিয়া এই রাজসিকতার যুগেও তৃষিত নরনারীর শ্রবণ-মন নিত্য পরিতৃপ্ত করিতেছেন, সেই নিত্যানন্দ দাসকে আজ আর এই প্রপঞ্চের মধ্যে দেখিতে পাইব না! তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন; ইহা যে বিশ্বাসই হইতেছে না! শ্রীভগবানের লীলা কে বুঝিতে পারে? তিনি যাহা করিয়াছেন ঠিকই করিয়াছেন, তাঁহার কালচক্রের গতি অভ্রান্ত ইহা জানি, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও আজ অশান্ত চিত্তে তাহা ধারণা করিতে পারিতেছি না। মৃত্যু-শয্যা নহে—আনন্দ-শয্যায় শুইয়াও, বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াও তিনি বলিতেছিলেন,—"আমার যাবার সময় হয় নাই, আমার এখনও অনেক কাজ আছে!" গাড়ী বোঝাই করিয়া সৎকারের জন্য মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া সহচরগণকে কেবল বলিতেছিলেন,—"দেখরে, আগামী বৎসর এই গঙ্গাতীরে ঘর করিয়া এই স্থানে রোগী রাখিতে হইবে।" এত আকাঙ্ক্ষা! এত সঙ্কল্প! জীবনে নিজের জন্য তিনি কিছুই চাহেন নাই, আর্ত্ত ও অনশন-ক্লিষ্ট অসহায় নরনারীর জন্য, বঙ্গের এই বিপুল বৈষ্ণব-সমাজের জন্য, জগতকে ও দেশবাসীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই প্রেম ও সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য—কোনও দলের অগ্রণী হইয়া নহে—সকলের পশ্চাতে সম্মার্জ্জনী হস্তে বিনীতভাবে সকলের চরণধূলি মাথায় করিয়া জীবনের পথে ছুটিবার যাঁহার এত আগ্রহ, হা গৌরাঙ্গ! হা নিতাই! হা কৃষ্ণ! আজ তোমাদের সেই চিহ্নিত দাস কোথায়? আজ বঙ্গদেশ কাঁদিতেছে, আমরা যে অসহায় হইলাম! আজ হঠাৎ তাঁহাকে লইয়া গেলে! এখনও নবদ্বীপে মেলা শেষ হয়

নাই, এখনও দূর দূরান্তর হইতে সমাগত শত শত নরনারী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া পথিপার্শ্বে অসহায়ভাবে গড়াগড়ি দিতেছে; দারুণ অসহ্য পিপাসায় কাতর, ভয়ে ভীত মানব সে পথে চলে না, কে আজ দেব-দুতের মত তাহাদের নিকট যাইবে! কে তাহাদের মুখে জল দিয়া, তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া আনিয়া সেবাশ্রমে শয়ন করাইবে! স্বহস্তে তাহাদের বিষ্ঠা পরিষ্কার করিয়া নিজে ও নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবক স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা অতিযত্নে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিবে! এখনও মেলা শেষ হয় নাই, এখনও রোগ-যাতনার আর্ত্তনাদে ভূতল-আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, মৃত-দেহ পথে পড়িয়া শৃগাল কুকুর ও শকুনির ভোজ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে, এখনও যে তোমার প্রয়োজন!

বঙ্গের বৈষ্ণব সমাজের হস্তে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে প্রেমভক্তির পতাকা অর্পণ করিয়াছিলেন, যে বৈষ্ণব সমাজ মধ্যে নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এখন আবার এক নব চেতনার লক্ষণ চারিদিকে পরিলক্ষিত হইতেছে, সেই বৈষ্ণব সমাজে সাধু নিত্যানন্দ দাস যে একটি নূতন জীবন দিয়াছেন, তাহা অবিসম্বাদিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনার এই পুনঃ প্রচারের দিনে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার এক একজন সেবকের উপর এক একটী বিশেষ কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, সাধু বিজয়কৃষ্ণ, সাধু শিশিরকুমার তাহার এক এক দিকের ভার লইয়াছিলেন, নিজ নিজ বিভাগে প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠ। সাধু নিত্যানন্দ দাসের উপর একটি বিশেষ কার্য্যের ভার পড়িয়াছিল, সেই কার্য্যটী কি আজ তাহা বিশেষভাবে দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের চিন্তনীয়।

আজ এই পবিত্র ভারতভূমে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বী লোক সমবেত হইয়াছেন। ইহার মূলে বিশ্বনাথের একটি অভিপ্রায় নিহিত আছে। সকল ধর্ম্মের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ সত্য বা ধর্ম্মের বিশ্বজনীন আদর্শ বীজরূপে বিরাজ করিতেছে। কোনও ধর্ম্মে কোনও ভাব সুবিকশিত, কোনটি অবিকশিত। এখন সমুদয় ধর্ম্মগুলি একত্র হইয়াছে, যাহার যেটি অবিকশিত,—অপরের প্রতি চাহিয়া, অপরের অনুবর্ত্তন করিয়া তাহাকে তাহা সুবিকশিত করিতে হইবে। ইহাই নবযুগের সাধনা। ধর্ম্মের এই অভ্যুত্থানে যাঁহারা কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে।

জন-সেবা ধর্ম্ম সাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ইহার আদর্শ বৈষ্ণব ধর্ম্মে

প্রেমের বন্ধন কখনই ছিন্ন বা শিথিল হইবে না। এই বন্ধন আগমাপায়ী নহে, ইহা নিত্য। সেইজন্য যে স্মৃতিপটে এই প্রকারের সহস্র সহস্র ঘটনা উজ্জ্বলভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, নিত্যানন্দ দাসের সহিত পরিচয়ের দিন ও উপলক্ষ্য তথা হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে।

কে জানিত নিত্যানন্দ দাস এত শীঘ্র নিত্যধামে প্রবেশ করিবেন! অনাথ ও অসহায় বালকবৃন্দ যাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নবদ্বীপধামে বসিয়া রহিয়াছে, সদ্যজাত ও পরিত্যক্ত শিশুগণ যাঁহার ব্যয়ে দুর্লভ মানব জন্মের প্রারম্ভকালেই সমাগত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইতেছে, যাঁহার সেবাশ্রমে কত রোগী দুর্লভ শুশ্রূষায় আপ্যায়িত, যেখানে আর্ত্ত ও অসহায় নরনারী সেই খানেই যিনি সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, যাঁহার শক্তিতে ও ত্যাগে শত শত সাধুভক্ত নিশ্চিন্তচিত্তে দেশে দেশে শ্রীভগবানের নাম গান করিয়া এই রাজসিকতার যুগেও তৃষিত নরনারীর শ্রবণ-মন নিত্য পরিতৃপ্ত করিতেছেন, সেই নিত্যানন্দ দাসকে আজ আর এই প্রপঞ্চের মধ্যে দেখিতে পাইব না! তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন; ইহা যে বিশ্বাসই হইতেছে না! শ্রীভগবানের লীলা কে বুঝিতে পারে? তিনি যাহা করিয়াছেন ঠিকই করিয়াছেন, তাঁহার কালচক্রের গতি অভ্রান্ত ইহা জানি, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও আজ অশান্ত চিত্তে তাহা ধারণা করিতে পারিতেছি না। মৃত্যু-শয্যা নহে—আনন্দ-শয্যায় শুইয়াও, বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াও তিনি বলিতেছিলেন,—"আমার যাবার সময় হয় নাই, আমার এখনও অনেক কাজ আছে!" গাড়ী বোঝাই করিয়া সৎকারের জন্য মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া সহচরগণকে কেবল বলিতেছিলেন,—"দেখরে, আগামী বৎসর এই গঙ্গাতীরে ঘর করিয়া এই স্থানে রোগী রাখিতে হইবে।" এত আকাঙ্ক্ষা! এত সঙ্কল্প! জীবনে নিজের জন্য তিনি কিছুই চাহেন নাই, আর্ত্ত ও অনশন-ক্লিষ্ট অসহায় নরনারীর জন্য, বঙ্গের এই বিপুল বৈষ্ণব-সমাজের জন্য, জগতকে ও দেশবাসীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই প্রেম ও সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য—কোনও দলের অগ্রণী হইয়া নহে—সকলের পশ্চাতে সম্মার্জ্জনী হস্তে বিনীতভাবে সকলের চরণধূলি মাথায় করিয়া জীবনের পথে ছুটিবার যাঁহার এত আগ্রহ, হা গৌরাঙ্গ! হা নিতাই! হা কৃষ্ণ! আজ তোমাদের সেই চিহ্নিত দাস কোথায়? আজ বঙ্গদেশ কাঁদিতেছে, আমরা যে অসহায় হইলাম! আজ হঠাৎ তাঁহাকে লইয়া গেলে! এখনও নবদ্বীপে মেলা শেষ হয়

নাই, এখনও দূর দূরান্তর হইতে সমাগত শত শত নরনারী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া পথিপার্শ্বে অসহায়ভাবে গড়াগড়ি দিতেছে ; দারুণ অসহ্য পিপাসায় কাতর, ভয়ে ভীত মানব সে পথে চলে না, কে আজ দেব-দূতের মত তাহাদের নিকট যাইবে ! কে তাহাদের মুখে জল দিয়া, তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া আনিয়া সেবাশ্রমে শয়ন করাইবে ! স্বহস্তে তাহাদের বিষ্ঠা পরিষ্কার করিয়া নিজে ও নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবক স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা অতিযত্নে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিবে ! এখনও মেলা শেষ হয় নাই, এখনও রোগ-যাতনার আর্ত্তনাদে ভূতল-আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, মৃত-দেহ পথে পড়িয়া শৃগাল কুকুর ও শকুনির ভোজ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে, এখনও যে তোমার প্রয়োজন !

বঙ্গের বৈষ্ণব সমাজের হস্তে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে প্রেমভক্তির পতাকা অর্পণ করিয়াছিলেন, যে বৈষ্ণব সমাজ মধ্যে নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এখন আবার এক নব চেতনার লক্ষণ চারিদিকে পরিলক্ষিত হইতেছে, সেই বৈষ্ণব সমাজে সাধু নিত্যানন্দ দাস যে একটি নূতন জীবন দিয়াছেন, তাহা অবিসম্বাদিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনার এই পুনঃ প্রচারের দিনে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার এক একজন সেবকের উপর এক একটী বিশেষ কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, সাধু বিজয়কৃষ্ণ, সাধু শিশিরকুমার তাহার এক এক দিকের ভার লইয়াছিলেন, নিজ নিজ বিভাগে প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠ। সাধু নিত্যানন্দ দাসের উপর একটি বিশেষ কার্য্যের ভার পড়িয়াছিল, সেই কার্য্যটী কি আজ তাহা বিশেষভাবে দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের চিন্তনীয়।

আজ এই পবিত্র ভারতভূমে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বী লোক সমবেত হইয়াছেন। ইহার মূলে বিশ্বনাথের একটি অভিপ্রায় নিহিত আছে। সকল ধর্ম্মের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ সত্য বা ধর্ম্মের বিশ্বজনীন আদর্শ বীজরূপে বিরাজ করিতেছে। কোনও ধর্ম্মে কোনও ভাব সুবিকশিত, কোনটি অবিকশিত। এখন সমুদয় ধর্ম্মগুলি একত্র হইয়াছে, যাহার যেটি অবিকশিত,—অপরের প্রতি চাহিয়া, অপরের অনুবর্ত্তন করিয়া তাহাকে তাহা সুবিকশিত করিতে হইবে। ইহাই নবযুগের সাধনা। ধর্ম্মের এই অভ্যুত্থানে যাঁহারা কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে।

জন-সেবা ধর্ম্ম সাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ইহার আদর্শ বৈষ্ণব ধর্ম্মে

অত্যন্ত উচ্চ ও উদার। উপদেশ ও শিক্ষার জন্য বৈষ্ণবদিগকে অপরের নিকট যাইতে হইবে না, বরং সে বিষয় তাঁহারাই জগতের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীকে সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু অনুষ্ঠাম বিষয়ে তাঁহাদিগকে অন্যান্য বৈদেশিক জাতির নিকট শিক্ষা লইতে হইবে। কেবল গ্রন্থ-ব্যাখ্যা করিয়া ও গ্রন্থ প্রচার করিয়াই বৈষ্ণব-সাধনাকে বিশ্বজনীন ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠ করিতে পারা যাইবে না। বৈষ্ণবের আদর্শ প্রেম—এই প্রেম সেবায় মূর্ত্তিমান হইয়া জগতে কার্য্য করেন! আজ জন-সেবার দিকে এই সমাজের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে হইবে। সাধু নিত্যানন্দ দাস তাঁহার গুরু সিদ্ধ মহাত্মা চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট এই সাধন লাভ করিয়াছিলেন এবং জীবন দিয়া এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

নিত্যানন্দ দাসের কর্ম্মস্থান শ্রীনবদ্বীপ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেন্দ্র হইতে যে ভাব প্রচারিত হইবে, তাহাই বৈষ্ণব-সমাজে গৃহীত হইবে। নিত্যানন্দ দাস এই নবদ্বীপে রাধারমণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই সেবাশ্রম যাহাতে রক্ষিত হয় সমগ্র দেশকে আজ তাহাই করিতে হইবে।

গত ২৭শে মাঘ ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সাধু নিত্যানন্দ দাস কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ যাত্রা করেন। এই সময়ে নবদ্বীপে গানের ধূম. নানাদেশ হইতে অসংখ্য যাত্রী সমবেত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক বৎসরই এই সময়ে বিসূচিকা রোগ হইয়া থাকে, এবারে এই বিসূচিকা রোগের প্রকোপ কিছু অধিক মাত্রায় হয়। রোগীর সেবার সময় নিত্যানন্দ দাস একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, তিনি বিসূচিকা-রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এই কলিকাতার শত শত লোক স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখিয়াছেন, অবাক্ হইয়াছেন, মানুষ কত বড় হইতে পারে তাহা তাঁহারা দেখিয়া বিস্ময়ে ডুবিয়া গিয়াছেন। এই ভাবে রোগীর সেবার ভার স্কন্ধে করিয়া স্বয়ং তাহাদিগকে আনিয়া আশ্রমে রাখিয়াছেন, স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়াছেন! এইভাবে কার্য্য করিতে করিতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২রা ফাল্গুন শনিবার ভোরের সময় তিনি স্বয়ং রোগে আক্রান্ত হইলেন। প্রথমে মনে করিয়াছিলেন সারিয়া যাইবে, তদনুসারে সেবাশ্রম হইতে বাগানে আসিয়া অধ্যাত্ম-সাধনে মনোনিবেশ করেন। বেলা হইতে হইতে বুঝিলেন যে, তাঁহাকে এবার যাইতে হইবে। কলিকাতায় সংবাদ আসিল।

বন্ধুবান্ধবেরা নবদ্বীপে গেলেন—সন্ধ্যার পর সম্মুখে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি রাখিয়া ও চারিদিকে সহস্র সহস্র বৈষ্ণবের কণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীনবদ্বীপধামে গঙ্গাতীরে একেবারে অবিকৃত দেহে ও চিত্তে তিনি স্বধামে গমন করিলেন। মহাপ্রয়াণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বলিতেছিলেন, "আমার জন্য কেন ঔষধ দিচ্চ আমার জন্য কেন পয়সা খরচ করচ, আশ্রমে রোগী আছে তাহাদের সেবা কর।"

এইভাবে তিনি গিয়াছেন। তিনি যান নাই, একটি দেহের সীমার মধ্যে তিনি ছিলেন, সে সীমা ভাঙ্গিয়া আজ তিনি সকলের হইয়াছেন! আজ দেশ মিলিত হইয়া তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্বোধন করিবে, এই কথা বলিতে বলিতে নব বসন্তের মলয়-সমীরণ ভাগীরথীর কল-নিনাদের সহিত মিশিয়া অনন্তের পথে ছুটিয়াছে! চতুর্থীর চন্দ্র পূর্ব্ব দিক আলোকিত করিয়া এই কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য দেখা দিয়াছিল!

দীনবন্ধু।

পাক দিয়া বেড়ে যাব চৌবেড়িয়া গ্রাম।
বিনত দীনের যথা অতি দীন ধাম॥

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের সান্নিধ্যে চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৬ সালে শুভ মুহূর্ত্তে বঙ্গের দীন-হীনের বন্ধু দীনবন্ধু ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। দীনবন্ধুর পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্ব্বনারায়ণ, তাঁহার এ নাম বড় ভাল লাগিত না। ভিতরে ভগবান যে নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন, আত্মদর্শী কর্ম্মবীর সে নামের সঙ্গে এই বাহিরের নামের সৌসাদৃশ্য দেখিতেন না; তাই কলিকাতায় আসিয়া যখন তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন তখন এই দীনবন্ধু নাম স্ব-ইচ্ছায় গ্রহণ করেন। তিনি দীনের বন্ধু হইয়াই জগতে আসিয়াছিলেন, তাই এত দিনে তাঁহার প্রকৃত নামকরণ হইল।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যখনই কোন মহজ্জীবনের পরিচয় প্রয়োজন হয় তখনই তাঁহার বাল্য জীবনের অতি সামান্য ঘটনাগুলিকেও টানিয়া আনিয়া তাহাতে ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের কীটাণুর অস্তিত্ব দেখান হয়। দেওয়া হয়। দীনবন্ধুর চরিত্র-চিত্রণে আমরা সে প্রয়াস করিব না, আমাদের এ আলেখ্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মন-প্রাণ বিমুগ্ধ হয়, ইহাতে চিত্রকরের কল্পনার কোন প্রয়োজন

নাই। দীনবন্ধুর বাল্য জীবনের কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই। অল্প বয়সে তিনি সামান্য লেখা-পড়া শিখিয়া পিতার আদেশে জমিদারী কার্য্যে সামান্য বেতনে নিযুক্ত হন, কিন্তু এ কার্য্যে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি কলিকাতায় আসিয়া নূতন নাম গ্রহণ করিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হন। দীনবন্ধু হেয়ার স্কুলের ছাত্র। পরে তিনি হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

দীনবন্ধুর কর্ম্মজীবন অনেকেরই নিকট পরিচিত। পোষ্টাল বিভাগে বাঙালীর যতদূর উচ্চপদ লাভ সম্ভব তাহা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় এই বিভাগের এত উন্নতি হইয়াছিল যে বাঙালী না হইলে তিনি সর্ব্বোচ্চ আসনে বসিতে পারিতেন।

দীনবন্ধুর এই কর্ম্মজীবনের সঙ্গে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বাস্তবিকই তিনি যে-প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। নাটক বলুন, নভেল বলুন, কাব্য বলুন সমস্তই জীবন্ত সমাজের প্রতিমূর্ত্তি। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিপুণ চিত্রকর কল্পনা-তুলিকায় মনমোহন চিত্র ফুটাইয়া তুলেন। যিনি যতই উচ্চ চিত্রকর হউন, তাঁহার মূল আদর্শ বাস্তব জগতের। ভাস্কর অস্ত্র-সাহায্যে গোপী-মনমোহন-মূর্ত্তি খোদিত করিল, কিন্তু তাহার মূল উপাদান প্রস্তর-খণ্ড এই জগতের। মহামায়ার দশ-প্রহরণ-ধারিণী মূর্ত্তিতে ত্রিদিব-সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল, সে সৌন্দর্য্য এ জগতের নয়, কিন্তু তাহার কাঠামখানি এ জগতের; তাহার অঙ্কিত মুখ চোখ নাক সকলই এ জগতের আদর্শে। সে চক্ষু আঁকিবার সময় হরিণীর অক্ষির দিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়াছে। মুখখানি আঁকিবার সময় আধ-প্রস্ফুটিত কমলের সৌন্দর্য্যটুকু একবার দেখিয়া আসিয়াছে। তাহার অঙ্কিত বস্তু সমস্তই এ জগতের। প্রকৃতির অনন্ত ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করিলে খণ্ডাকারে তাহার প্রতি অংশ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহার কৃতিত্ব এই,—সে একাধারে সন্নিবেশিত করিল। যাহা জগৎময় ছড়াইয়াছিল, তাহা সে একত্র করিল। আর কৃতিত্ব কি? যেখানে যেটি সাজে তাই দিয়ে সাজাইল। তাহা হইলে দেখা গেল যে, বাস্তব জগৎ ও কল্পনা এই উভয়ের সমবায়ে জগতের সমস্ত চিত্র অঙ্কিত। ইহার মধ্যে কাহারও কল্পনার প্রাধান্য, কাহারও বাস্তবের প্রাধান্য। কালিদাসের শকুন্তলার সমস্ত সৌন্দর্য্যই বিভিন্ন আধারে মুনির আশ্রমে বর্ত্তমান ছিল।

কালিদাস কল্পনার সাহায্যে যে ছবি অঙ্কিত করিলেন বাস্তব জগতের কুত্রাপি একাধারে এ অপূর্ব্ব সমাবেশ মিলিবে না।

কোন কবির কাব্যে বাস্তবের প্রাধান্য, কাহারও কাব্যে কল্পনার আধিক্য। কিন্তু কাব্য মাত্রই এতদুভয়ের সংমিশ্রণ। দীনবন্ধু এই প্রথম শ্রেণীর কবি। তাঁহার কাব্যে বাস্তবেরই সম্পূর্ণ সমাদর, কল্পনা সেখানে ম্রিয়মাণ। যেখানেই সত্যের সমাবেশ সেইখানেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ; যেখানেই কল্পনার সমাবেশ সেইখানেই চিত্র বিমলিন।

কর্ম্ম-জীবনে দীনবন্ধু বঙ্গের বহুপ্রদেশবাসীর সঙ্গে মিশিয়াছিলেন। তৎকালে দীনবন্ধুর সঙ্গে মিত্রতা ছিলনা উল্লেখযোগ্য এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা অতি বিরল ছিল। আসাম হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত দীনবন্ধু সর্ব্ব জাতির রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার অতি সাবধানতার সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাই সামান্য কৃষিজীবিগণেরও দীর্ঘশ্বাস তাঁহার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল। দীনবন্ধু বাস্তবিকই দীনের বন্ধু ছিলেন। দীনের ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছিল বলিয়াই অত্যাচার-পীড়িত প্রজাগণের উদ্ধারের জন্য দীনবন্ধুর লেখনী প্রথমেই "নীলদর্পণ" প্রসব করিল। 'নীলদর্পণে'র প্রতি বাক্যই দীনবন্ধুর মর্ম্মের কথা। এ চিত্র সম্পূর্ণ সত্য, দীনবন্ধু ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাই 'নীলদর্পণ'ই 'গ্রে'র 'এলিজি'র ন্যায় তাঁহার সাহিত্য-জীবনের জয়পতাকা উড্ডীন করিল। দীনবন্ধুর সার্ব্বজনীন সহানুভূতি ও মিত্রতার পরিণাম 'আদুরী' ও 'তোরাপ'। এই বিষয়ে বঙ্গের অন্য কোন লেখকই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। অন্যে হয়ত আদুরী আঁকিতে হইলে আদুরীর আদর থাকিত, কিন্তু তাহার সেই খাঁটী ভাষাটুকু থাকিত না। তোরাপের সেই বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন মধুর বাণী থাকিত না। দীনবন্ধুর লেখনী যেরূপ অশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ছুটিয়াছে, অন্যের লেখনী তৎপরিবর্ত্তে মৃদুমন্দগতিতে রাজপথে চলিত। "নীলদর্পণ" যদিও "কস্যচিৎ পথিকস্য" নামে প্রকাশিত হয়, তথাপি ইহার গ্রন্থকারের পরিচয় জানিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। বহু ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া নীলদর্পণ জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল ; তাহার ফলে দেশের এ ভীষণ অত্যাচার প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু এই পুস্তকের সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ কেহই লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই!

নীলদর্পণ একদিকে যেরূপ সার্ব্বজনীন সহানুভূতির পরিচয়, অন্যদিকে সেইরূপ নাট্য-সাহিত্যের অজ্ঞতার পরিচয়। বঙ্গভাষায় তখন নাট্য-সাহিত্যের

প্রথমাবস্থা। তখনকার উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে মাইকেলের "কৃষ্ণকুমারী" ও "শর্ম্মিষ্ঠা"। এই দুইখানি নাটকও উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য নহে, সুতরাং দীনবন্ধুর যুগে নাটকের এ অবস্থা দর্শনে বিস্ময়ের কিছুই নাই। নাটক প্রকৃতির খাস ভাণ্ডারের ছবিখানি সম্মুখে ধারণ করে। যেখানেই স্বভাবের সহিত চিত্রের অসামঞ্জস্য, সেইখানেই নাটকের অপকর্ষ। স্বামী-স্ত্রীতে নির্জ্জনে কথোপকথন-ফলে কোন স্ত্রীই স্বামীকে "নাথ! আপনি কি চিন্তা করিতে-ছেন" বলিয়া সম্ভাষণ করেন না। সেখানে ভাষার কোন বাঁধন নাই, ব্যবহারের কোন বিধি নাই, নাটকে সে চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলেও সেই বাঁধন শূন্য ভাষা চাই, বিধি শূন্য ব্যবহার চাই।

নীলদর্পণে তোরাপের ভাষা তোরাপেরই উপযুক্ত, আদুরীর ভাষা আদুরীতেই সম্ভব; কিন্তু নবীনমাধবের ভাষা, সৈরিন্ধ্রির ভাষা ও ভাব সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ একটু উদ্ধৃত করি—সৈরিন্ধ্রি স্বামীর মৃতপ্রায় দেহ দর্শনে শ্বশ্রূর সম্মুখেই আক্ষেপ করিতেছেন—"আহা হা! বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী......কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর"। ৩পৃষ্ঠা। হিন্দুর কুল-ললনার পক্ষে এরূপ বাক্য যে কতদূর অসম্ভব তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। নীলদর্পণে নিম্নস্তরের চরিত্রই ফুটিয়াছে ভাল,—আর ফুটিবারও কথা। কারণ যে সহানুভূতির জন্য দীনবন্ধুর প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাহা তোরাপ ও আদুরীর দিকেই অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। ফল কথা নাট্য-সাহিত্যে নীলদর্পণ তখনকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহ, কিন্তু আদর্শের তুলনায় বহু নিম্নে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দীনবন্ধু বাস্তবের কবি, কল্পনার নহে। দীনবন্ধুর অধিকাংশ পুস্তক সত্য ঘটনা লইয়া লিখিত। অধিকাংশ চরিত্র জীবিত ব্যক্তির চরিত্রাবলম্বনে চিত্রিত। যেখানে ঘটনা সত্য, দীনবন্ধুর লেখনী তথায় অমৃত প্রসব করিয়াছে। কিন্তু যেখানে কল্পনার রাজ্য, দীনবন্ধু সেখানে নির্ব্বাক।

নীলদর্পণের পর "নবীনতপস্বিনী" প্রকাশিত হয়। "নবীন তপস্বিনী"র সমস্তই কল্পনাপ্রসূত। তাহার কোন ঘটনাই বাঙালীর বাস্তব-জীবনে ঘটে না। এখানে কোন মেয়েই পরিণত বয়সে স্বামী-অপেক্ষায় থাকে না। তাই দীনবন্ধু তাঁহার কর্ম্ম-জীবনে কোথাও ইহার আদর্শ খুঁজিয়া পান নাই। অথচ ইংরাজী জানার খাতিরে না লিখিলেও নয়। কিন্তু 'মল্লিকা' 'জলধর' ও 'জগদম্বা' আমাদের সমাজে সহস্র সহস্র রহিয়াছে। তাই সে চিত্র নিখুঁত আঁকিয়াছেন। কিন্তু 'বিজয়কামিনী'র সেই বড় বড় পত্র অতি বিসদৃশ অতি

অস্বাভাবিক। লীলাবতীও একই ছাঁচে ঢালা। সেখানেও নদের চাঁদ হেমচাঁদের চিত্র খাঁটী, কেন না বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সে নরপশুর অবস্থান। কিন্তু ললিত লীলাবতীর চিত্র অতি বিসদৃশ। নাটকে এ চিত্র স্থান পাইতে পারে না। কারণ নাটক যে জাতীয় জীবনের দর্পণসদৃশ, তাহা এ দেশে কখনও হয় নাই হইবে না. তাহা এদেশবাসীর প্রীতিপ্রদ হইবে কেন? কিন্তু কাব্যের কথা স্বতন্ত্র, সেখানে কবির কল্পনা অপ্রতিহতগতি, তাই, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ভারতে স্থান পাইয়াছে।

দীনবন্ধুর যাহা খাস সম্পত্তি তাহার কথা এখনও বলি নাই বা বলিবার অবসর সম্পূর্ণ আসে নাই।

হাস্যরসের অবতারণায় দীনবন্ধু অদ্বিতীয়। নিজ জীবনেও দীনবন্ধু হাসিয়াছেন ও হাসাইয়াছেন। বঙ্কিম বাবু বলেন, "দীনবন্ধুর হাস্য তাঁহার লেখার শতাংশের একাংশেও ফুটিয়া উঠে নাই।" কিন্তু একাংশেও যাহা ফুটিয়াছে তাহা অতুলনীয়। হাস্য রসে দীনবন্ধু বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। কিন্তু এ বিষয়ে গুরুও শিষ্যের নিকটে পরাভূত। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় অনুপ্রাসের প্রাধান্য। দীনবন্ধুতেও তাহা কতকাংশে বর্ত্তমান। ঈশ্বরগুপ্তও হাসাইয়াছেন, কিন্তু সে হাসির অন্তরালে বিদ্রূপের শাণিত অস্ত্র লুক্কায়িত। কিন্তু দীনবন্ধুর হাসি নির্দ্দোষ, আমোদের জন্য এখানে তীব্র কষাঘাতের আশঙ্কা নাই, দীনবন্ধুর সহিত নিশ্চিন্ত হাসা যাইতে পারে। এই হাসির উদ্বোধন নবীন তপস্বিনীর জলধরে, নদের চাঁদে ইহার ক্রম বিকাশ, সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, জামাই বারিকে ইহার পূর্ণতা।

মাইকেলের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ" এই পথের পথিক, কিন্তু দীনবন্ধু সে পথের মালিক তাহার নিকট কাহারো ঘেঁসিবার সাধ্য নাই। মাইকেল কল্পনার কবি, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে নরকের ভীষণ দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতেছে' তাঁহার দ্রৌপদীর পত্র পাইয়া ব্রাহ্মণ সন্তান স্বর্গ উদ্দেশে ছুটিয়াছে কিন্তু দীনবন্ধু সেদিকে নাই। তাঁহার কাল্পনিক চরিত্র লীলাবতী, ললিত, বিজয় ও কামিনী, সৈরিন্ধ্রী সরলা নিকৃষ্ট চরিত্র। হেমচন্দ্রও কল্পনার কবি, কিন্তু সে কল্পনা সংসারের দাবদাহ প্রসূত, সেই জন্য তিনি সংসার বিরক্ত। জগতে তাঁহার সহানুভূতি নাই। তাঁহার সম্মুখে জগত দুঃখের আধার তিনি আগে জানিলে সংসারে আসিতেন না। কিন্তু তাঁহার ক্রন্দন বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। যদিও নিজের জন্য কাঁদেন পরের জন্য সহানুভূতি নাই তবু তাঁর সঙ্গে স্বতঃই

কাঁদিতে ইচ্ছা করে। যখন বলেন "তকরে, আমার মন তাপ দগ্ধ অনুক্ষণ, কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা" তখন যেন হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কবির দুঃখে কাঁদিয়া উঠে। বড় মর্ম্মস্পর্শী ক্রন্দন। দীনবন্ধু নীলদর্পণে পরের জন্য কাঁদিয়াছেন, কিন্তু তথাপি সে ক্রন্দনও এত মর্ম্মস্পর্শী নহে, সে ক্রন্দন যেন "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে পারে না।"

দীনবন্ধু কাঁদিতে আসেন নাই, হাসিতে আসিয়াছিলেন জগৎকে হাসাইয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে হাসি সমভাবে বর্ত্তমান ছিল। (শুনিতে পাই নবীন বাবু খুব সুরসিক লোক ছিলেন। তাঁহার লেখার মধ্যে কোথাও সে রসের নামগন্ধ দেখি না। এক আত্মজীবনীতে ও প্রবাসপত্রে তার কণিকা বর্ত্তমান।) অধিক হাসিতে হইবে এই ভয়ে অনেকে দীনবন্ধুর নিকটে যাইত না। সধবার একাদশীতে বাঙ্গাল ও ভোলানাথ, জামাই বারিকের দুই সতীনের ঝগড়া সে অপূর্ব্ব ক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। সমাজের অন্তস্তল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া চিত্রগুলি বাহির করিতে দীনবন্ধু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার নিমচাঁদ সমাজের অধঃপতনের এক জ্বলন্ত আদর্শ। বড় ঘরের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া মদ খাইয়া কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, নিমচাঁদ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর অটল,—অটলের মত জন্তু আজ বড় বড় ঘরে অসংখ্য। জামাই বারিক ও সধবার একাদশী সমাজের উপরে কশাঘাত। কিন্তু এ আঘাত অতি মৃদু, ইহাতে চৈতন্য হয় না, আমোদ হয়।

দীনবন্ধুর অবশিষ্ট লেখা সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা ইত্যাদি। ইহার সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব, পৌরাণিক যুগ হইলে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতাম।

দীনবন্ধু হাস্যের কবি, দীনবন্ধু দরিদ্রের কবি, দীনবন্ধু সমাজের হৃদয়ের কবি। সে হাসির ফোয়ারা আজও উঠিতেছে, চিরদিন উঠিবে। সমাজের প্রাণের কথা গুলি দীনবন্ধু অতি দীন ভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন, কাহাকেও কটু বলেন নাই, কাহারও প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করেন নাই, আমোদপ্রসঙ্গে দোষগুলি দেখাইয়া গিয়াছেন। দীনবন্ধুর প্রাণ পরের জন্য বড় কাঁদিত. অন্যের যন্ত্রণা দেখিলে তিনি মূর্চ্ছা যাইতেন। তাই নীলকরের অত্যাচারে তাঁহার প্রাণ বড় কাঁদিয়াছিল। বাস্তবের কবি বাস্তব ঘটনা চক্ষে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই, তাই শত বিঘ্ন সত্ত্বেও, আশঙ্কা সত্ত্বেও সে লেখনী ছুটিয়াছিল। দীনবন্ধুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; নীলকর আর বাঙ্গালায় নাই,

নদের চাঁদের সংখ্যাও ক্রমশঃ কমিতেছে, নিমচাঁদও আর বড় পথে ঘাটে দেখা যায় না। দীনবন্ধুর বিষাদের কাহিনী চলিয়া গিয়াছে, শুধু হাসিটুকু সমভাবে ফুটিয়া আছে।

কঠোর কর্ম্মভারে দীনবন্ধুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, অল্পবয়সে বহুমূত্র রোগের সূচনা হয়। এই রোগেই অবশেষে ১৮৭৩ সালে ১লা নভেম্বর শনিবার তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু শয্যায় তাঁহার হাসি সমভাবে ছিল। দীনবন্ধু চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে হাস্যময়ী মূর্ত্তি এখনও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজমান। যাহা সামান্য আধারে আবদ্ধ ছিল, তাহা আজ অনন্তে মিশিয়া বিশ্বময় বিরাজিত।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

শব্দ ব্রহ্ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওঁকার তত্ব।

উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গে তুষার রাশি হইতে ধীর-বিগলিত ক্ষীণ জলরেখা দেখিয়া কেহ কি মনে করিতে পারেন, এই নগণ্য জল ধারার গতির চরমস্থল দিগন্ত-বিসারী অপার মহাসাগর! অথবা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ তলে বসিয়া কেহ কি কল্পনায়ও আনিতে পারেন, এই মহাতরুর উপাদান সর্ষপাধিক ক্ষুদ্র বীজের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম অঙ্কুর। ইহা যেমন এক দেশ হইতে দর্শন করিলে আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু যদি মূল অনুসরণ করিতে করিতে ক্রমশ অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে যেমন কোনও না কোনও কালে তাহার প্রকৃত তথ্যে উপনীত হইতে পারা যায়, সেইরূপ যখন আমরা বেদে দেখিতে পাই ;

(১) "ওমিত্যেতদক্ষরং সর্ব্বং
ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব
যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব" মাণ্ডুক্য শ্রুতিঃ

(২) সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বানি চ যদ্‌গৃণন্তি
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্ম চর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষে ওঁইত্যেতৎ। কাঠ শ্রুতিঃ

অর্থাৎ (১) "সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই এই ওঁকারাত্মক! যাহা কিছু হইয়াছে! যাহা

হইতেছে! এবং যাহা হইবে! তাহাও এই একমাত্র ওঁকার আর যদি ত্রিকালাতীত কোনও কিছু থাকে তাহাও এই ওঁকার। (২) "সমস্ত বেদ যে পদের ঘোষণা করিতেছে, সমস্ত তপস্যাই যাহার কীর্ত্তন করিতেছে, যাহার লাভের জন্য ঋষিগণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেইটী সংক্ষেপে এক কথায় বলিতে গেলে বলিব তাহা এই ওঁকার।"

এখন এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব!! এই একটী মাত্র বর্ণ-বিশেষ প্রণব, কদাচ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ হইতে পারে না। এই অনায়াসোচ্চারিত ওঁকার কদাচ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এবং ত্রিকালাতীত বিষয়ের স্বরূপ হইতে পারে না, আর এই একটী মাত্র অক্ষরের জন্য বেদের তপস্যার এত আদর হইতে পারে না, আর ইহার জন্য কাহারও ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয় না, এইরূপ মনে হয় সত্য; কিন্তু যদি ইহার মূল অনুসরণ করিতে করিতে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে চেষ্টা পাই তবে বোধহয় ইহার তথ্য নির্ণয়ে কতকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া—

মহর্ষি যোগিশ্রেষ্ঠ সূত্রকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। যোগসূত্রম্"

ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, কর্ম্মবাসনা যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না সেই অদ্বিতীয় পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর। ইনি সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্ব নিয়ন্তা, এমন কি ক্লেশাদির ও ইনি কর্ত্তা ও নিয়ন্তা, (বস্তুতঃ ক্লেশাদি প্রকৃতির কার্য্য হইলেও পুরুষ বিরহিতা প্রকৃতির কার্য্যকারীতা নাই।) প্রত্যেক অণু পরমাণু হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সর্ব্বতোব্যাপী বিরাট পুরুষই ঈশ্বর। যেমন "ভারতেশ্বর" বলিলে ভারতের সর্ব্বত্র অনুস্যূত এক বিশাল রাজশক্তি সম্পন্ন কোনও এক পুরুষ বিশেষকে বুঝায় তদ্রূপ বিশেষণ-শূন্য কেবল "ঈশ্বর" এই পদের দ্বারা যেখানে যা কিছু আছে সর্ব্বত্র অনুস্যূত সর্ব্ববিধ-শক্তি সম্পন্ন একমাত্র বিরাট পুরুষকেই বুঝায়, ইনিই—

সভূমিং সর্ব্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাংশে আবর্ত্তন পূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া অনন্ত স্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন।

পাদো হস্য বিশ্বা ভূতানি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইহার একাংশে বিরাজমান রহিয়াছে, ইনি স্বয়ংই বলিয়াছেন—

বিষ্টভ্যাহমিদংকৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

আমি আমার একাংশদ্বারা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছি। ইনিই বেদান্তের সগুণব্রহ্ম। সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের যে অংশ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ায় প্রতি বিম্বিত হইয়া বিশ্বজগৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে সেই মায়োপাধি পরব্রহ্মই ঈশ্বর শব্দ বাচ্য।

ঈশ্বর যে একজন আছেন তাহার প্রমাণ কি ?

। উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।"

র্থাৎ ওঁকারই সেই জগদাত্মা সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরের বাচক। ইহা ।" "ভীম" আদির ন্যায় কল্পিত বাচক সংজ্ঞা সূত্রানুসারে প্রদত্ত হয় র সহিত প্রণবের বাচ্য বাচক সম্বন্ধ নিত্য, যেমন পিতা পুত্রের তদ্রূপ,—যেমন "পুত্র" বলিলে "পিতা" লইয়া বুঝিতে হয়, কিম্বা া পুত্র দিয়া বুঝিতে হয় সেইরূপ সগুণ ব্রহ্ম বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে, আর ওঁ কার বুঝিতে হইলে সগুণ ব্রহ্ম লইয়া ব। যতদিন পিতৃত্ব থাকে ততদিন অপরের পুত্রত্ব আর যতদিন পুত্রত্ব থাকে ততদিন অন্যের যেমন পিতৃত্ব, সেইরূপ যতদিন ব্রহ্মের সগুণত্ব থাকিবে ততদিন ওঁ কার থাকিবে আর যতদিনে ওঁ কার শান্ত হইবে ততদিনে ব্রহ্মেরও সগুণত্ব প্রশমিত হইবে। অতএব বিশ্বপ্রপঞ্চাত্মক সগুণ পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সহিত প্রণবের এই প্রকার স্বতঃসিদ্ধ বাচ্য বাচক সম্বন্ধ নিত্য! ইহা কল্পিত "সংজ্ঞা" মাত্র নহে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ও কারে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলেই যে ইহা পরমেশ্বরের বাচক রূপে নিত্য সম্বন্ধ হইবে তাহারই বা প্রমাণ কি ? ইহার উত্তর শ্রুতিই স্বয়ং দিতেছেন

"স্বনবত্যেষা তনূ র্যোমিতি"

"যা ওঁ ইতি তনুঃ এষা স্বনবতী।" এই যে ওঁকারর , ইহা শব্দাত্মিকা, ইহা বর্ণমাত্র নহে, শব্দই ইহার আত্মা, শাস্ত্রকারেরা ারের একটা নাম "নাদ", বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন আর অনেক উহাকে অনাহত ধ্বনিও বলিয়াছেন। অনাহত ধ্বনি অর্থে কোন আহত না হইয়া যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়। বাদ্যাদি কৃত্রিম উপায়ে যে উৎপন্ন হয়, তাহা আহত ধ্বনি। কিন্তু যাহা এই কার্য্য প্রপঞ্চ বিশ্বব্রহ্মা ত অবিচ্ছিন্নরূপে স্বতঃই সমুত্থিত হইতেছে, যে শব্দ রাজ্যের কথা একব ল্পনায়ও আনিতে

গেলে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহাই অনাহত ধ্বনি! তাহাই ওঁকার, প্রপঞ্চাত্মক মায়োপাধিক সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সহিত সেই ওঁকারের বাচ্য বাচক সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান, তাহা কদাচ বিচ্ছিন্ন হয় নাই হইবেও না।

কথাটী একটি উদাহরণ দিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিতে চেষ্টা পাইতেছি—প্রথমতঃ আমাদের এই আশ্রয়ভূতা বসুন্ধরা হইতে নিরন্তর যে কি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতেছে, তাহাই আমরা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি না। পৃথিবীতে মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত গণনায় প্রায় ১৫৮০ কোটী লোকের বাস, পৃথিবীর লোকাবাস হইতে কোথাও যুদ্ধবিগ্রহের প্রচণ্ড নিনাদ, কোথাও করুণ রোদন ধ্বনি কোথাও বা উৎসবের আনন্দ কোলাহল। যে কোনও প্রকারেই হউক এতগুলি নরকণ্ঠের স্ফুটধ্বনি; আর সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রকগণের ভীষণ গর্জ্জন; তদ্ব্যতীত অন্যান্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ভূচর খেচর জলচর জীবনিবহের স্ব স্ব জাতীয় নানাবিধ অস্ফুট ধ্বনি নিরন্তর সমুত্থিত হইতেছে। সর্ব্বতেজোনিধান তপনদেবের প্রদক্ষিণ কালে জীবময়ী ধরণী যখন আপনার যে অংশ তদভিমুখে পাতিত করে তখনই সেই সেই স্থানের জীবসমূহ কল্ কল্ করিয়া উঠে। যেমন অন্ধকারময়ী রজনীতে প্রদীপ হস্তে গমন করিতে করিতে দীপালোকে গন্তব্য পথের পুরোভাগ ক্রমে আলোকিত হইতে থাকে, আবার অতিক্রান্ত পশ্চাৎভাগ যেমন পুনরায় ক্রমে ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ সৌরকরোদ্ভাসিতা ধরণীর সঙ্গে সঙ্গে যেন একটী মহাশব্দস্রোত ক্রমে পুরোভাগে প্রধাবিত হইতে থাকে, আবার আলোক-বিরহিত নৈশান্ধকারাচ্ছন্ন অপরভাগ তেমনই ক্রমে নীরব হইয়া আইসে, এইরূপে অহোরাত্র মধ্যে এই জৈবধ্বনি সূর্য্যালোকবতী পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। যেন একটী অশরীরী শব্দাত্মক উপগ্রহ অনবরত মহাবেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এদিকে প্রকৃতি হইতেও যে কত প্রকার শব্দ পৃথিবীতে নিরন্তর সমুদ্ভূত হইতেছে তাহারও ইয়ত্তা নাই। চরিদিকে উত্তাল তরঙ্গমালা সমাকুল মহাসাগরের ভীষণ গর্জ্জন! ভূগর্ভরূপ বাষ্পীয় যন্ত্রের ধূমবাহী মার্গস্বরূপ আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড নিনাদ! অন্তরীক্ষে আবার মেঘ বৃষ্টি বজ্র প্রভৃতির তুমুলধ্বনি! কয়টীর কথাই বা বলি, কয়টীই বা মানবের জ্ঞানগম্য? এইরূপ কতস্থানে কতই প্রকার প্রাকৃতিক শব্দ সংঘটিত হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপে জৈব ও প্রাকৃতিক শব্দজগৎ পরিবৃতা পৃথিবী যে কি ভীষণ শব্দময়ী, তাহা

একবার মনে মনে কল্পনা করিতে গেলেও হৃদয় ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। পৃথিবীর এবম্বিধ মহাশব্দও আবার সৌরজগতের শব্দের তুলনায় অতীব অকিঞ্চিৎকর মাত্র। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমাদের এই মহাশব্দময়ী পৃথিবীর ভ্রমণকক্ষের পরিমাণফল ৫৮ কোটী ১২ লক্ষ মাইল। ৩৬৫ দিনে তাহাকে এত পথ পরিভ্রমণ করিতে হইলে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮॥০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। "প্রতি সেকেণ্ডে এত মাইল, কথাটী বলা সহজ বটে কিন্তু এই বাক্যের বিষয়ীভূত পদার্থটী যে কিমাকার তাহা মানব বুদ্ধির অগোচর। ঈদৃশ মহাবেগে এই অপরিমেয়াকৃতি ধরণীর পরিভ্রমণে গগনমণ্ডলে যে কি ভীষণ মহাশব্দের অভিনয় হইতেছে তাহা কে বলিবে? আবার এই পৃথিবীর অপেক্ষাও শত সহস্র গুণে বৃহৎ এবং ইহার ন্যায় পর্ব্বত সমুদ্র নদ নদী জীব জন্তু পরিপূর্ণ আরও কত অগণিত গ্রহ উপগ্রহ, কত নক্ষত্র, কত ধূমকেতু, কত উল্কাপিণ্ড নিরন্তর আকাশ পথে স্ব স্ব কক্ষে ইহা অপেক্ষা আরও অধিকতর বেগে মহাশব্দে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার—যেমন চন্দ্র প্রভৃতি উপগ্রহ, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, যেমন গ্রহগণও স্ব স্ব উপগ্রহগণের সহিত সমস্ত জ্যোতির একমাত্র আধার সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করে সেইরূপ গ্রহরাজ সবিতাও এই সকল গ্রহ উপগ্রহগণ কর্ত্তৃক প্রদক্ষিণীকৃত হইয়া কোন্ অজ্ঞেয় প্রদেশে প্রদক্ষিণীকৃত হইয়া কোন্ অজ্ঞেয় প্রদেশে কাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে বা কি উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতেছেন তাহা কে বলিতে পারে? এই যে নিশাকালে বিধাতার অন্তরীক্ষ-উদ্যানে কুসুমস্তবকের ন্যায় তারকারাজি থরে থরে সুসজ্জিত থাকে ইহাদের প্রায় অনেকেই আমাদের আধারভূতা পৃথিবী অপেক্ষা এমন কি গ্রহরাজ সবিতা অপেক্ষাও অনেক গুণ বৃহৎ, প্রায় প্রত্যেকেই গতিশীল, জীবপূর্ণ ও শব্দময়। আর ইহাদের প্রত্যেকেরই ভ্রমণকক্ষে পৃথিবীর ন্যায় অভাবনীয় ভীষণ মহাশব্দ নিরন্তর সমুদ্ভূত হইতেছে। সমুদয় সৌরজগতের একীভূত এই মহাশব্দের সহিত তুলনায় আমাদের পৃথিবীর এবম্বিধ কল্পনাতীত মহাশব্দও মহাসাগরে তুচ্ছ জলবিন্দুর ন্যায় অতীব অকিঞ্চিৎকর মাত্র! শিক্ষাভিমানী মানব! অসাধ্য সাধনকারী বিজ্ঞান! তোমরা ত সূর্য্যেরও ব্যাস পরিধি দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছ! পৃথিবীরও বিষুবরেখা অক্ষরেখাদি কল্পনা করিয়া পরিমাণ ফল স্থির করিয়াছ! অপর গ্রহগণেরও দূরত্ব আকার গতিবিধি নির্ণয় করিয়াছ!

কিন্তু পার কি এই নভোমণ্ডলোত্থিত, সৌরজগতের সম্মিলিত মহাশব্দকে একবার কল্পনায় আনিতে, পার কি তোমাদের আধারভূতা ধরণীর সম্মিলিত শব্দের স্বরূপকে কেবল মানসে একবার অবধারণ করিতে? পার কি কেবল তোমার স্বজাতি বিশ্বমানবের যুগপদুচ্চারিত কণ্ঠধ্বনির স্বরূপ গ্রহণ করিতে? কিন্তু বেদ এই ব্রহ্মাণ্ড সমুত্থিত মহাশব্দের স্বরূপ সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন—

"তত্তেপদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ওঁ ইত্যেতৎ"।

"স্বনবত্যেষা তনূর্যোমিতি"

অর্থাৎ এই বিশ্বশব্দ যদি কেহ একত্র শুনিতে পারে তবে সে শুনিবে ওঁকার। এই সমষ্টীভূত শব্দপ্রপঞ্চই নিরন্তর সমুত্থিত হইয়া বিশ্ব প্রপঞ্চাত্মক সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন আসিতে পারে এবম্বিধ মহাশব্দও আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে কেন? যেমন হাটে নগরে বা উৎসবাদি স্থলে যথায় বহুলোক সমাগত হয় সেই জন সংঘের মধ্যে থাকিলে তত্রত্য ব্যক্তিবর্গের পরস্পর স্বাভাবিক কথোপকথন ব্যতীত অপর কিছুই অনুভূত হয় না কিন্তু তথা হইতে দূরে আসিলে সেই পরস্পরোচ্চারিত স্পষ্ট শব্দও দূরবর্ত্তী শ্রোতার নিকট মহা কোলাহলময় ভীষণ শব্দ মাত্রই প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ আমরা এই অনন্ত শব্দ সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি। তাই আমরা দেখিতেছি বিশ্ব সংসার নীরব, নিস্তব্ধ; তাই আমরা পৃথক পৃথক স্থান হইতে পৃথক পৃথক শব্দ গ্রহণ করিতেছি। বিশ্ব কোলাহলের মধ্যে থাকাতে এই সমষ্টীভূত ব্রহ্মাণ্ডের মহা শব্দের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতেছি না।

যদি এমন কোনও স্থান থাকে যথায় জীবময়ী মহাবেগবতী পৃথিবী নাই, যথায় সদাগতি সমীরণের গতিশক্তি নাই। যথায় মেঘবৃষ্টি বিদ্যুতের লীলা নাই; যথায় গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডিত সর্ব্বতোব্যাপী নীল চন্দ্রাতপ নাই যথায় দিবাকরের প্রখর প্রভা বা সুধাংশুর সুখসেব্য জ্যোৎস্নালোক নাই, এক কথায় বলিতে গেলে যে স্থান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও অতীত।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং

নে মা বিদ্যুতো ভান্তি কুতো হয়মগ্নিঃ।

যথায় সূর্য্য কিরণ বিতরণ করে না, চন্দ্র তারকা প্রদীপ্ত হয় না। বিদ্যুৎ বিলসিত হয় না, অগ্নির ত কথাই নাই সেই দূরতম প্রদেশে সেই এক নিত্য

শুদ্ধ নির্গুণ পরব্রহ্মরাজ্যে যদি উপস্থিত হইতে পারিতাম, তবে এই সগুণ ব্রহ্ম হইতে, এই বিশ্ব প্রপঞ্চ হইতে, এই ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমাত্মক মহাভূত সমষ্টি হইতে নিরন্তর যে কি মহাশব্দের লীলা হইতেছে তাহা অনুভব করিতে পারিতাম। তথায় উপস্থিত হইতে না পারিলে এই বিশ্ব-শব্দাত্মক বিরাট শব্দরাজ্যের অস্তিত্ব আমরা সহস্র উপদেশেও স্বীকার করিতে পারিব না, সহস্র চিন্তায়ও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না।

"বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া দূরতম প্রদেশে উপস্থিত হইলে আমরা এই বিরাট শব্দের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব" একথাটী নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়! কারণ ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া জীব কোথায় যাইবে? বিশেষতঃ যথায় ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম পঞ্চ মহাভূতের অধিকার নাই, সেই শাশ্বত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ রাজ্যে কোন শ্রবণশক্তিমান জীবের গতি থাকিতে পারে? সত্য বটে মুক্ত পুরুষগণই সেই শাশ্বত রাজ্যের অধিকারী, কিন্তু সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে লীন মুক্তাত্মা জলে সৈন্ধব খণ্ডের ন্যায় মিশিয়া যান। তিনি কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়বান্ হইয়া তথায় এই বিশ্ব প্রপঞ্চাত্মক সগুণ ব্রহ্মের লীলা সমুত্থিত মহাশব্দের স্বরূপ গ্রহণ করেন না কিম্বা সেইটী যে ওঁকার, সে সমাচার আমাদের নিকট প্রেরণ করেন না। তবে এ বিশ্ব শব্দের স্বরূপ যে ওঁকার তাহা কিরূপে প্রতীত হইতে পারে?

এ প্রশ্ন অবশ্যই স্বীকার্য্য কিন্তু ঋষির চিন্তালব্ধ ধনে কোনও প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। যথার্থত যদি আমরা এই গম্ভীর তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইতাম তাহা হইলে এ প্রশ্ন আমাদের স্বতঃই মীমাংসিত হইয়া যাইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই বিশ্বশব্দ জগৎ বা ওঁকারের নামান্তর অনাহত ধ্বনি। যোগীর মন যখন আসনাদিতে সিদ্ধিলাভ করে, যখন জ্ঞাতা যোগীর প্রশান্ত নির্ম্মল মানস পরমেশ্বরে সমাহিত হইতে যায়, সেই অবস্থায় তাঁহার বিষয়ান্তর-বিরহিত মন বিশ্বব্যাপী মনস্তত্ত্বের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশ্বজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত এক হইয়া যায়। ফলতঃ সেই সমাহিত যোগীর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আসিয়া পড়ে। সেই সময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সমুত্থিত বিশ্ব মহাশব্দও যোগীর সেই সর্ব্বতোব্যাপী শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হইতে আরম্ভ হয়। আবার যখন সবিকল্প হইতে নির্ব্বিকল্পের দিকে ক্রমে অগ্রসর হন তখনই এই ওঁকার ধ্বনিতে বিভোর হইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলেন।

আবার যখন সমাধি হইতে নামিয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হন তখন যোগী সেই প্রত্যক্ষীভূত বিশ্বশব্দতত্ত্বকে মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন

"তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ওমিত্যেতৎ।

"তস্য বাচকঃ প্রণব ইত্যাদি।

সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরের বাচক বিশ্ব মহাশব্দকে একটী মাত্র বর্ণ ওঁকার দিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব, ইহা বলা যায় না, কারণ যদি সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞান একটী সামান্য গোলক দ্বারা সাধিত হইতে পারে, যদি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ছায়াচিত্র (ফটোগ্রাফ) চারি অঙ্গুল কাচ ফলকে অঙ্কিত হইতে পারে তবে ইহা না হইবে কেন? অধিক কি, এই যে আমাদের সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত মানব-দেহ ইহাও যে এক একটী ক্ষুদ্রতম ব্রহ্মাণ্ড! বিজ্ঞান! একথায় হাসিতে পার! প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পার! সাধ্য থাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখ; দেখিতে পাইবে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহতত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ মহাভূত এবং জীবনিবহের সমষ্টি ইহাও ঠিক তাহাই ইহা হইতে যে শব্দ অনাহত সমুত্থিত হইতেছে তাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে বিশ্বশব্দের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তবে ইহা ব্যষ্টি সে সমষ্টি, এ ক্ষুদ্র সে মহান্। এ বিন্দু সে মহাসাগর এই মাত্র বিশেষ, আর্য্য ঋষি এতদুভয়ের এই সামঞ্জস্য অনুভব করিয়াই বলিতেছেন

"তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ওমিত্যেতৎ"

শ্রীদক্ষিণাচরণ কাব্যতীর্থ। ক্রমশঃ।

দীক্ষা দান।

তৃতীয় প্রহর হল অবসান
ফাল্গুনের বেলা যায়,
রাজা একমনে করিছেন কাজ
কোন দিকে নাহি চায়।
এখনো তাহার হয়নি আহার,
ভৃত্যেরা ফিরি গেছে বারবার,
গৌরী তখন কুমারী রাজার
আসিয়া ডাকিল তায়:—

"উঠে এস বাবা, চেয়ে দেখ দেখি
বেলা যেগো চলে যায়।"
রাজা চমকিয়া শুনিল সে কথা
যেন সে দৈববাণী।
চাহিল ক্ষণেক তনয়ার পানে
বহু বিস্ময় মানি।
হৃদয় তন্ত্রী বাজিল কি সুরে
কি রাগিণী আজি ধ্বনিল সে পুরে
ভাসিয়া উঠিল কোন সে সুদূরে
কাহার মূর্ত্তিখানি।
বেলা চলে যায় এতক্ষণে কেবা
এ বারতা দিল আনি।
মুখে কথা নাই স্থির আঁখিতারা
বসিয়া রহিল স্বামী।
বসন্ত বায়ু কয়ে গেল কাণে
এখনি ফুরাব আমি।
বাগানের ফুল ঝরে পড়ে যায়,
বিহগেরা সব ফিরিছে কুলায়
ক্লান্ত তপন ঊর্দ্ধ হইতে
পশ্চিমে আসে নামি
সবাই বলিছে বেলা চলে যায়
এখনি আসিবে যামী।
মনে পল সেই সাগরের পারে
মায়ের কুটীর হতে
কোন সে প্রভাতে বাহিরিয়াছিল
সুদূর প্রবাস পথে।
ভুলেছিল কাজ, করেছিল হেলা,
এবে ফিরিবার হয়ে এল বেলা,
মা দাঁড়িয়ে সেথা রয়েছে একেলা
নির্জ্জন বনপথে।

বেলা চলে গেল—আসে আহ্বান
সাগরের কূল হতে।
উঠিলেন রাজা ছাড়িয়া আসন
কহিলেন—"যাব আজ
ত্যজি সংসার বাহিরিব আজি
বিপুল বিশ্বমাঝ।"
মন্ত্রী অমাত্যে কহিলেন ডাকি
"রাজ্য পুত্র প্রজাদের রাখি
তোমাদের করে, চলিলাম বাকী
সাধিতে আপন কাজ।"
শুনি সে বারতা অমাত্য সুত
মুছিল নেত্রনীর ;
সভা ত্যজি রাজা রাজবেশ ফেলি
পরিলা জীর্ণ চীর।
চরণে লুঠিয়া রাণা কাঁদি বলে—
"জীবন বন্ধু কোথা যাও ফেলে
কোন অপরাধে আজ ভুলে গেলে
সেই প্রেম সুগভীর।"
ক্ষণেকের তরে রাজার চক্ষে
ভরিয়া আসিল নীর।
তুলিয়া রাণীর সুকোমল তনু
লুণ্ঠিত ভূমিতলে
কহিলেন রাজা "আর রাণি মোরে
বেঁধ না আঁখির জলে।
সময় হয়েছে নিকট আমার
বেলা গেল ওই ডাকে বারবার।"
এত বলি রাজা ত্যজিয়া প্রাসাদ
ত্বরিত চরণে চলে।
লুঠায়ে পড়িল রাজ্ঞী তখন
কঠিন হর্ম্ম্যতলে।

প্রেমের তীর্থ দেববাঞ্ছিত
মধুর বৃন্দাবন।
আজিও যেথায় লতায় পাতায়
হরিনাম আলাপন।
যমুনা আজিও বহিছে উজান
কুঞ্জে কুঞ্জে বাঁশরীর গান
গোপ বালিকার তৃষিত পরাণ
করিতেছে উচাটন;
আজিও রাধার বিরহের গাথা
গুঞ্জরে সারাবন।
আসিয়া শ্রীধামে প্রবেশিলা রাজা
নিজ মন্দির বাসে
ফল মূলাশন, ভূতলে শয়ন,
হরিনামে আঁখি ভাসে।
সাধু কবিরাজ প্রেম অবতার
দেখিবার সাধ উপজে রাজার,
ভক্তি বিহ্বল নিবেদিল পদে
দীক্ষা দাও গো দাসে।
শৃঙ্খল ত্যজি আসিয়াছি প্রভু,
চরণাশ্রয় আশে।"
প্রসন্ন আঁখি, স্নিগ্ধ বয়ান
ভূমিতলে সমাসীন
কহিলেন প্রভু "এখনো হয়নি
এখনো আসেনি দিন।
রাজা ফিরে আসে বিস্ময় গণি,
এখনো আমার সময় হয়নি
রাজ্য নারী সুত ত্যজিনু অমনি
বৃথায় পুণ্যহীন!
এ কেমন কথা কহিলেন প্রভু
—"এখনো আসেনি দিন!"

পথে যেতে যেতে চমকিত রাজা
সহসা আসিল মনে
রাজ্য যে মোর ছায়ার মতন
ফিরিছে আমারি সনে !
আপনার দেয়া সেবাশ্রমেতে
রয়েছি তো আমি পরম সুখেতে
গৃহ হীন যারা ফেরে চারিভিতে
তাদের পড়ে না মনে !
এত বলি রাজা মন্দির ত্যজি
পশিল গহন বনে।
বনের মাঝারে বাস করে রাজা
কুটীর রচনা করি
সবার দুয়ারে পাত্র হস্তে
করে যান মাধুকরী।
শেষে একদিন প্রভুর সকাশে
আসিলেন পুনঃ দীক্ষার আশে।
প্রভু কহিলেন "এখনো হয়নি"
করুণায় আঁখি ভরি ;
"যে দিন হইবে আপনি তোমারে
আদরে লইব বরি।"
ম্লান মুখে পুনঃ ফিরিলেন রাজা
ব্যথায় কাতর হিয়া।
ভবে মনে মনে বিহরে আর এ
ব্যর্থ জীবন দিয়া !
সহসা রাজার জাগিল স্মরণে
আমিত্ব আজো রহিয়াছে মনে
কভু যাইনাত শেঠের ভবনে
ভিক্ষাপাত্র নিয়া
শেঠ যে শত্রু এ ভাবেতে মোর
এখনো পূর্ণ হিয়া !

পরদিন রাজা স্নান সমাপনে
ভিক্ষা পাত্র করে,
সর্ব্বপ্রথমে দেখা দিল আসি
শেঠের ভবন দ্বারে।
শত্রুর রাজারে হেরিয়া ভিখারী
স্তম্ভিত যত শেঠ নরনারী,
সাজায়ে আনিল কাঞ্চন থালী
মাণিক্য থরে থরে।
"একমুঠি মোরে তণ্ডুল দেহ"
কহে রাজা যোড়করে।
তণ্ডুল লয়ে ফিরে আসে রাজা
অশ্রু পড়িছে ঝরি
বলে "এত দিনে মনে কি পড়েছে,
দয়া কি হয়েছে হরি।"
আজ ঘর মোর হেরি সব ঠাঁই,
সবাই আমার আপনার ভাই,
শত্রু মিত্র আর ভেদ নাই
দিয়েছ মুক্ত করি।
ভিখারীর পরে করুণা করিয়া
ভাণ্ড দিয়েছ ভরি।
দুয়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া গুরু
তমাল তরুর তলে,
রাজা আসিতেই দুবাহু পসারি
জড়াইল তার গলে।
ভাবে ভোর সাধু কথা নাহি ফুরে,
আর বলে কার বাঁশী বাজে দূর,
না জানি দীক্ষা কি মোহন সুরে
পশিল মর্ম্মতলে।
কেবল দুখানি বিশাল বক্ষঃ
সিক্ত নয়ন জলে।

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কালিয়। (৪)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্বকাহিনী।

প্রথম স্তবক।

অতি পুরাকালে মহাপ্রবলপ্রতাপান্বিত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, বহুগুণযুক্ত ঔদাস নামে নরপতি ছিলেন। ইনি বিধি অনুসারে যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ করিতেন, যাচকগণের অভিলাষানুসারে অর্থ দান করিতেন ও অপরাধ অনুসারে অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতেন। বিষয় ভোগে অনাসক্ত রাজা ঔদাস পরম জ্ঞানী ও ক্ষমাগুণান্বিত ছিলেন। তিনি প্রজাপুঞ্জের পিতা ছিলেন. কারণ তাহাদিগের শিক্ষাদান, রক্ষণ ও ভরণপোষণ ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। অন্যান্য রাজবর্গের রক্ষাসাধন হেতু তিনি ভূমণ্ডলে প্রভূত যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভুজবলে সসাগরা ধরণীতে একাধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক একটী নগরীর ন্যায় শাসন করিতেন।

এতাদৃশ দানশীল বিচক্ষণ, মহানুভব নৃপতি সুধীগণাগ্রগণ্য পারিষদবর্গ মণ্ডিত হইয়াও সুখী হইতে পারিলেন না। যৌবন অতীত হইতে না হইতেই নৃপতি ঔদাস দুশ্চিকিৎস্য গলিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইলেন। এরূপ ঘৃণার্হ ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া রাজা কার্য্য বিষয়ে শিথিল প্রযত্ন হইলেন। তিনি সর্ব্ব কার্য্যে উৎসাহশূন্য ও ব্যাধিযন্ত্রণা কাতর হইয়া মনোদুঃখে সর্ব্বদাই অন্তঃপুর মধ্যে থাকিতেন। পুত্রগণ এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হয় নাই এজন্য রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনার ভার সচিবশ্রেষ্ঠের হস্তে নিহিত হইল।

কোন বিষয়ে দেবগণ প্রতিকূল হইলে মানবশক্তিতে তাহার কোন প্রতিকার হয় কি না দেখিবার জন্য তিনি ঘোষণা করিলেন "যে কেহ তাঁহাকে এই দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তিদান করিতে পারিবেন, তাহাকে তিনি তৌল করিয়া স্বর্ণদান করিবেন ও অভিলাষিত মত বস্তুদানে তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিবেন।" এই ঘোষণা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইলে দেশ দেশান্তর হইতে সুবিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসকগণ ঔদাস রাজপুরীতে আগমন করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে তাঁহাদিগকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। রাজ ভাণ্ডার হইতে তাঁহাদের আহারীয় প্রদত্ত হইতে লাগিল। বৈদ্যরাজগণ প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া

নিদান সঙ্গত ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ঔষধাদি প্রস্তুত হইলে বৈদ্যরাজদিগের কথিত মত কাহারও নিকট এক সপ্তাহ, কাহারও নিকট দুই সপ্তাহ, কাহারও নিকট তিন সপ্তাহ, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে চিকিৎসিত হইয়াও কোন ফলোদয় হইল না। তখন অকূলে পতিত নর যেরূপ প্রাণের মায়ায় প্লবমান অজগরকে ধারণ করে তিনিও তদ্রূপ ফকির, সন্ন্যাসী ও ইতরলোকগণ কথিতমত ঔষধাদি প্রয়োগ করিলেন। তাহাতেও ব্যাধির কোনরূপ উপশম হইল না দেখিয়া নারায়ণে দত্তচিত্ত হইয়া রাজা ধর্ম্মানুষ্ঠান-রত হইলেন। হস্ত ও পদাদির অঙ্গুলির অগ্রভাগে ক্ষত নিবন্ধন তাঁহার চলৎ-শক্তি রোধ হইল।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। নৃপতি ঔদাস জীবনের মায়া একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া নিরানন্দে অন্তঃপুর মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। আত্ম-সুখভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক নরপতি কেবল হরিনামই জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়াছেন। এক দিবস প্রভাতে তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধানান্তে একান্ত মনে হরিনাম জপ করিতেছেন এমন সময়ে প্রহরীনিযুক্ত তোরণদ্বার অলক্ষিত-ভাবে অতিক্রম করিয়া জনৈক সামান্য বেশধারী পুরুষ সভা মণ্ডলের সম্মুখীন হইয়া "মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক" রব করিতে লাগিলেন। তাঁহার উচ্চরবে গিরি কন্দর হইলেও কম্পিত হইত, রাজবাটীর ত কথাই নাই। প্রহরী চমকিত হইয়া সত্বর সেই পুরুষের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসিল "আপনি কে? কি প্রকারেই বা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া এখানে উপস্থিত হইলেন? এবং কি নিমিত্তই বা মহারাজের জয় কামনা করিয়া চীৎকার করিতেছেন?"

পুরুষ কহিল "আমি বৈদ্যরাজ, তোমাদের পার্শ্ব দিয়া আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি, বোধ হয় তোমরা অন্যমনস্ক ছিলে, তজ্জন্য আমাকে দেখিতে পাও নাই। মহারাজের পীড়া হইয়াছে শ্রবণ করিয়া তাঁহারই চিকিৎসার্থে আমি এখানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে মহারাজের সাক্ষাৎ পাইলে তাঁহাকেই সমস্ত নিবেদন করিব।"

বৈদ্যরাজ ও প্রহরীর এবংবিধ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে কোন রাজপরিষদ তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিলেন "আপনি কি হেতু আগমন করিয়াছেন?"

বৈদ্য। আজ্ঞে, আমি বৈদ্য, রাজা মহাশয়ের পীড়া হইয়াছে শ্রবণ করিয়া তাঁহার শান্তির জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

পরি। অনেকানেক বৈদ্যরাজ আসিয়া চিকিৎসায় বিফল প্রযত্ন হইয়া গিয়াছেন, এজন্য ঔষধে আর মহারাজের বিশ্বাস নাই। এক্ষণে তিনি হরিনাম-রূপ ঔষধ-পানে সন্নিবিষ্ট আছেন।

বৈদ্য। মহারাজ যখন অনেকানেক বৈদ্যরাজ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছেন তখন আমার ঔষধ একবার পরীক্ষা করেন, এই আমার অনুরোধ।

পরি। আপনার ঔষধ কি পরীক্ষিত? ইহাতে কি কোন বিশেষ ফল পাইবার সম্ভাবনা?

বৈদ্য। আজ্ঞা হা, আমার ঔষধ পরীক্ষিত। ইহাতে এক দিবসেই উপকার অনুভূত হইবে। কিন্তু রাজা মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ করা আবশ্যক। পীড়া কত দুর প্রবল হইয়াছে চাক্ষুষ দর্শন না করিলে উপায়-বিধান করা দুরূহ।

এক দিবসে এতাদৃশ দুরূহরোগের ফলপ্রাপ্তির কথা কেহই বলেন নাই! এজন্য বৈদ্যরাজের বাক্যে রাজপারিষদের মনে স্বতই ভক্তির উদয় হইল। তিনি বৈদ্যরাজকে যথাযোগ্য সমাদরসহকারে উপবেশন করাইয়া রাজ-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! সামান্যবেশধারী জনৈক বৈদ্যরাজ প্রহরিগণের অলক্ষিত ভাবে তোরণদ্বার অতিক্রমপূর্ব্বক সভা মণ্ডপের সম্মুখীন হইয়াছেন। তাঁহার বাক্যে অবগত হইলাম যে তাঁহার ঔষধ পরীক্ষিত এক দিবসেই উপকারানুপকার অবগত হইবেন। এক্ষণে কর্ত্তব্যতা আপনকার আদেশ সাপেক্ষ।"

মহারাজ আপাততঃ বৈদ্যরাজের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলে পরিষদ কহিলেন, "তিনি আপনকার সাক্ষাৎকার লাভে একান্ত ইচ্ছুক। ব্যাধি নিরূপণপূর্ব্বক তিনি আহারাদি করিবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।"

রাজা পরিষদবাক্যে অতি কষ্টে সভামণ্ডপে আগমন করিলেন। বৈদ্য-রাজ ব্যাধি পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনার কোন ভয় নাই। আমি দুই তিন দিবসের মধ্যেই আপনাকে নীরোগী করিব। আপনি অনুগ্রপূর্ব্বক আমাকে একটি হংস আনয়ন করিয়া দিন, আমি তদ্দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিব। সেই ঔষধ ব্যবহার করিলে অচিরেই আপনি রোগ-মুক্ত হইবেন।"

রাজা অনুচরবর্গকে একটী হংস আনয়ন জন্য ও পরিষদকে বৈদ্যরাজের বাসস্থান নিরূপন ও আহারের বন্দোবস্ত করিবার আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় স্তবক।

পরিষদ-নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করতঃ বৈদ্যরাজ আহারাদি সমাপনান্তে পুনরায় সভাগৃহে অগমনপূর্ব্বক উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে হংসানুসন্ধানে প্রস্থিত অনুচরবর্গ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংবাদ দিল "মহারাজ! আপনার আদেশ-মত আমরা নগর ও গ্রামের সর্ব্বত্র অনুসন্ধানপূর্ব্বক দেখিলাম কোনও হংস পাওয়া গেল না। তখন গ্রামান্তরে যাইয়াও অনুসন্ধান লইলাম কিন্তু বিফল-প্রযত্ন হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।"

রাজা। দেশে হংস অপ্রাপ্য হইল, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। আমার গ্রহবৈগুণ্যবশতঃই এরূপ সংঘটিত হইল, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তোমরা পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহুদূর দেশান্তর পর্য্যটনপূর্ব্বক যত মূল্যেই হউক একটি হংস আনয়ন করিবে।

রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া অনুচরবর্গ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া কেহ উত্তর, কেহ পূর্ব্ব, কেহ পশ্চিম ও কেহবা দক্ষিণদিকে হংসান্বেষণে গমন করিল। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণদিক প্রস্থিত অনুচরবর্গ প্রতি গ্রাম প্রতি বাটী অনুসন্ধান করিয়াও একটী হংস প্রাপ্ত হইল না। তাহারা এই অশুভ লক্ষণে ম্রিয়মাণ হইয়া রাজসমীপে আগমনপূর্ব্বক বার্ত্তা নিবেদন করিল। রাজা উৎকণ্ঠিতচিত্তে উত্তরদিকপ্রস্থিত অনুচরবর্গের অপেক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যাহারা উত্তরদিক্‌ভাগে গমন করিয়াছিল, তাহাদেরই দুই জন বহু গ্রাম নগর ও উপবন পর্য্যটন করিয়া অবশেষে এক নিবিড় বন মধ্যে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ ফলভারনত বৃক্ষ পাদপশোভিতা প্রকাণ্ড এক দীর্ঘিকা অবলোকন করিল। স্বচ্ছনীর সেই সুপ্রশস্ত সরোবর মধ্যস্থলে একটী হংস ও হংসী সুখে সন্তরণ করিতেছে দেখিতে পাইল। অনুচরদ্বয় অনেকক্ষণ তথায় বৃক্ষান্তরালে অবস্থানপূর্ব্বক দেখিতে লাগিল। হংসদ্বয় সেই সুবিস্তৃত জলাশয়ের তীরাভিমুখে গমন করিতেছে না। মধ্যস্থলেই উভয়ে কেলীকরতঃ সুখে অবস্থান করিতেছে। তখন অনুচরদ্বয় পরামর্শ করিল বহু দূর আমরা অতি-

ক্রম করিয়া আসিলাম, কোথাও ত একটী হংস দেখিতে পাইলাম না। ভাগ্যক্রমে যদিও দুইটী হংস দেখিলাম, তাহাদিগকে ধরিবার উপায় নাই। এতাদৃশ প্রকাণ্ড জলাশয়ের মধ্যস্থলে সন্তরণপূর্ব্বক গমন করিলেও উহারা অন্যত্র পলায়ন করিবে। এক্ষণে উপায় কি? হায়, হায়! আমাদিগের রাজা বাহাদুরের অদৃষ্ট কি অশুভ! তাঁহার অদৃষ্টক্রমেই দেশে হংসাভাব সংঘটিত হইল। দেশ মধ্যে হংসের অভাব কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

উভয়ে এইরূপ জল্পনা করিতেছে এমন সময়ে তাহারা দেখিল দীর্ঘিকার তীরবর্ত্তী লতামণ্ডপ হইতে চীরবস্ত্র পরিধায়ী জটাধারী এক সন্ন্যাসী বহির্গত হইল। মধ্যাহ্ন-দিবাকর-প্রভা তুল্য সেই সন্ন্যাসীর তেজঃপ্রভা দর্শন করিয়া অনুচরদ্বয় বিস্মিত হইল। তাঁহার হস্তে একখণ্ড কদলীপত্র মধ্যে কিঞ্চিৎ অন্ন। তীর্থাবতরণ-পূর্ব্বক সেই সন্ন্যাসী কদলীপত্র মধ্যবর্ত্তী সেই অন্ন দর্শন করাইয়া কহিল "হে হংস-হংসী! তোমরা নির্ভীকচিত্তে আগমন করতঃ মদ্দত্ত এই নারায়ণ-প্রসাদ ভক্ষণ কর।" সন্ন্যাসীর মুখ হইতে এবংবিধ অমৃতায়মান বাক্য নির্গত হইবামাত্রই হংসদম্পতি পুচ্ছ আন্দোলনপূর্ব্বক উচ্চরবে ডাকিতে ডাকিতে পদরূপ বহিত্র বাহিয়া বেগে অগ্রসর হইল। নিমেষ মধ্যে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণপূর্ব্বক পুনরায় পুচ্ছ আন্দোলন করিতে করিতে দীর্ঘিকার মধ্যস্থলে উপনীত হইল।

হংস ও হংসীর এই ব্যাপার অবলোকনপূর্ব্বক রাজানুচরদ্বয় কহিল, হংস ধরিবার উপায়ও অবগত হওয়া গেল। নারায়ণের নাম গ্রহণপূর্ব্বক অন্নদান করিলে উহারা ভক্ষণ করে, নতুবা স্পর্শও করে না। এরূপ হংস ত কোথাও দেখি নাই। যাহা হউক, হংস লইয়াই যখন আমাদিগের প্রয়োজন, তখন যে উপায়েই হউক উহাদিগকে ধরিতে হইবে। এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া উভয়ে অরণ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নগরে প্রবিষ্ট হইল, এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় অরণ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর সেই দীর্ঘিকা সন্নিকটস্থ বৃক্ষমূলে অন্নপাক করিল। পাক সমাপ্ত হইলে একব্যক্তি কদলীপত্রে সেই অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক হংস হংসীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "হে হংস-হংসী! তোমরা নির্ভীকচিত্তে আগমন করতঃ নারায়ণপ্রসাদ ভক্ষণ কর।"

মধুর নারায়ণ-নাম শ্রবণ ও নবাগন্তুকদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া হংস হংসীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পরের আবোধগম্য বাক্যে কহিল "দেখ হংসী! নবাগত ব্যক্তিদ্বয় আমাদিগকে ধৃতকরণাভিলাষেই এই সন্ন্যাসীর অনুকরণে পরম

পবিত্র হরিনাম গ্রহণপূর্ব্বক ডাকিতেছে। উহাদিগের দ্বারা আমাদিগের জীবনান্ত হইলেও নারায়ণ নাম শ্রবণপূর্ব্বক কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। অতএব তুমি এই স্থানেই থাক, আমি নারায়ণ-নাম জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। তুমি জীবিত থাকিলে ডিম্ব ফুটাইয়া বহু হংস হংসী উৎপাদন করিতে পারিবে। তাহা হইলে সন্ন্যাসীর সরোবরও শূন্য হইবে না। আমরা বহুকাল এই পুষ্করিণীতে একত্র বাস করিতেছিলাম। সন্ন্যাসীও আমাদিগকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। অন্নরন্ধনপূর্ব্বক নারায়ণকে উৎসর্গ করিয়াই একাংশ আমাদিগকে দান করিতেন। আমাদের পরিতোষ সম্পাদিত হইলে অপরার্দ্ধাংশ তিনি নিজে আহার করিতেন। এমন সুখের জীবন অতীত হইয়া আমাদের দুঃখের সময় উপস্থিত হইল। জগতের কোন দ্রব্যই সম্পূর্ণ ভাল নহে, দেখ পদ্ম কি গোলাপ মনোহারী পুষ্প হইলেও তাহাদের মৃণাল ও ডাঁটা কণ্টকাকীর্ণ। এই যে সন্ন্যাসী আমাদিগকে প্রতিদিন আহার দান করিয়া থাকেন ইনি নিঃস্বার্থ-জীবপালনে রত, আর এই যে কণ্টকস্বরূপ আগন্তুকদ্বয় আহার দানার্থ আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, ইহারা স্বার্থান্ধ। এই নরাধমদ্বয় প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণার্থ গমন করিলেই উহারা আমাদিগকে হস্তকরণান্তর অভীষ্টকার্য্যসিদ্ধার্থ আমাদিগের জীবননাশ করিবে।”

হংসী শুনিয়া কহিল, “তাহাও কি কখনও হয়? তুমি চলিয়া গেলে আমি একাকী এই সরোবরে থাকিয়া কি করিব? যাহার সহিত একত্র জন্মপরিগ্রহ করিয়া একত্র স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইয়াছি এক্ষণে তাহাকে ছাড়িয়া এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে প্রয়োজন কি? বরং চল, আমিও তোমার সঙ্গে গমন করি, তোমারও যে দশা আমারও সেই দশা ঘটিবে। বিশেষতঃ আগন্তুকদ্বয় কেবল তোমাকেই আহ্বান করে নাই। যাহার নামানুরোধে তুমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছ তদনুরোধে আমার প্রাণও কি বিসর্জ্জন করা বিধেয় নয়? জীবজন্তু মাত্রই কালের বশ। সময় প্রাপ্ত হইলে কাল কাহারও প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে না। অতএব আর চিন্তার প্রয়োজন কি? প্রজ্বলিত দীপ-শিখায় পতঙ্গ যেমন পতিত হয়, চল আমরাও তদ্রূপ বিপদভয়হারী হরিনাম করিতে করিতে তাঁহারই নামে প্রদত্ত প্রসাদোপরি পতিত হই।” এই বলিয়া হংসী অগ্রগামিনী হইলে হংস তদনুসরণে চলিতে আরম্ভ করিল। তীরে উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীবাদেশ সম্প্রসারিত করিয়া অবনতমস্তকে নারায়ণের প্রসাদ-ভক্ষণে নিযুক্ত হইলেই রাজানুচর উভয়েরই গলদেশ ধারণ

পূর্ব্বক তীরভূমিতে আনয়ন ও উভয়েরই পদদ্বয় বন্ধন করিল। বিপদে পতিত হইয়া হংসদ্বয় উচ্চরবে শব্দ করিতে লাগিল। সেই শব্দে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল, কিন্তু কেহই তাহাদিগের উদ্ধারসাধনে অগ্রসর হইল না। সন্ন্যাসী আশ্রমে থাকিলে নিশ্চয়ই রাজানুচরদ্বয়কে এবংবিধ নিষ্ঠুরাচরণ জন্য ভৎর্সনা করিতেন অথবা ক্ষমতা থাকিলে হংসও কাড়িয়া লইতেন। অনুচদ্বয় সন্ন্যাসীর অবর্ত্তমানেই হংসদ্বয়কে লইয়া প্রস্থান করিল।

তৃতীয় স্তবক।

'যথাসময়ে অনুচরদ্বয় হংসদম্পতী লইয়া রাজসমীপে ভেট দিল। বন্ধন-মোচনপূর্ব্বক হংসদম্পতীকে সভাস্থলে ছাড়িয়া দিলেই উভয়ে উন্নতগ্রীব হইয়া সভাগৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাজা সানন্দ হৃদয়ে উৎফুল্লনেত্রে বৈদ্যরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৈদ্যরাজ! হংস ত উপস্থিত, এক্ষণে অনতিবিলম্বে ঔষধ প্রস্তুত আরম্ভ করুন। নারায়ণের কৃপায় আপনি নিমিত্তস্বরূপ হইয়া আমাকে নীরোগ করিলে আপনি ঘোষণামত স্বর্ণ ও অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবেন।"

তখন হংস দক্ষিণপদ উত্তোলনপূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মনুষ্য-বাক্যে কহিল, "মহারাজের জয় হউক! মহারাজ, কি জন্য আমাদিগকে অবন্তীপ্রদেশস্থ অরণ্যমধ্যগত আমাদিগের ক্রীড়া-সরোবর হইতে ধরিয়া আনিয়াছেন তাহা ত জানি না, তবে বৈদ্যরাজের সহিত আপনকার কথা বার্ত্তায় অনুমানে জানিলাম, আমাদিগের বিনাশসাধনপূর্ব্বক ভবদীয় কোন মহৎরোগের ঔষধ প্রস্তুত হইবে! এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইল। আমাদের এই তুচ্ছ নশ্বর জীবনদানে আপন-কার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির উপকার সাধিত হইবে ইহা অপেক্ষা আর শ্লাঘার বিষয় কি আছে? কিন্তু একথা সত্য হইলেও আপনার নিকট আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে!"

হংসকে মনুষ্যবাক্যে কথা কহিতে শ্রবণ করিয়া রাজা ঔদাস বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। অতঃপর হংসের আরও কি বক্তব্য আছে শুনিবার জন্য একান্ত সমুৎসুক হইয়া কহিলেন, "হংস, তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ। আমি বহুদিবস হইতে দুশ্চিকিৎস্য কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অতিশয় কষ্টে দিনাতি-পাত করিতেছি। নানা দেশ-দেশান্তর হইতে খ্যাতনামা বৈদ্যরাজগণ

আসিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শে নাই। তখন অনন্যোপায় আমি দীনজনভরসা নারায়ণে দত্তচিত্ত হইয়া অনুক্ষণ তাঁহারই নামজপে নিযুক্ত ছিলাম। সম্প্রতি এই বৈদ্যরাজ স্বেচ্ছায় আগমনপূর্ব্বক আমাকে নীরোগ করিবেন এইরূপ আশাদান করিয়া একটী হংসানয়ন করিতে বলিয়াছিলেন। উহাঁরই প্রার্থনানুসারে মদীয় অনুচরগণ তোমাদিগকে আনয়ন করিয়াছে।"

হংস।—মহারাজ! আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে তজ্জন্য আমি অনুমাত্র দুঃখিত নই। আমাদিগের এই অকিঞ্চিৎকর দেহদানে যদি আপনার এই মহৎ দুরারোগ্য পীড়া আরোগ্য হয় তাহা হইলে আমাদিগের জন্ম সফল জ্ঞান করিব। কিন্তু মহাশয়! দুঃখের বিষয় এই যে আপনি নারায়ণার্পিত-চিত্ত হইয়া কেমন করিয়া তাঁহারই সৃষ্ট জীবনাশে জীবন রক্ষার উপায় বিধান করিয়াছেন? ইহাতে বোধ হইতেছে আপনার সভায় ধার্ম্মিক, বিজ্ঞ পারিষদ কিম্বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেহ নাই।

হংসের ঈদৃশ বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণে রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন, "হংসরাজ! তুমি বিজ্ঞের মত কথা বলিতেছ। কিন্তু মহারাজ ঔদাসের সভায় বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক পারিষদ বা শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাই, একথা কি প্রকারে কহিলে? এবং তুমি বলিলেই বা কে বিশ্বাস করিবে।"

হংস।—মহারাজ! ইহা অবিশ্বাস্য কথাই বটে, কিন্তু মহারাজ! আপনার আচরণ দর্শনে একথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। দেখুন, আমরা পক্ষি-জাতি, আমরাই শুনিয়াছি যে অসাধ্য ব্যাধি হইলে বৈদ্য তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারে না। ব্রাহ্মণের পদরজই তাহার একমাত্র ঔষধ। আপনার বিজ্ঞ পারিষদমণ্ডলী কিম্বা সভাপণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই কি আপনাকে সে পরামর্শদান করে নাই? মহারাজ! পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের প্রতি-ফলে এই অসাধ্য ব্যাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার এই জন্মে সেই ব্যাধি নাশের বিশদ উপায় থাকিতেও জীবহিংসারত হইয়া পরজন্মকেও অসুখী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। মহারাজ! আমার পরামর্শ, আপনি এইদণ্ডে ব্রাহ্মণের পাদোদক সেবন করুন। আপনি জীবনে হতাশ্বাস হইয়া যে নারায়ণ আরাধনায় লিপ্ত ছিলেন সেই বৈকুণ্ঠনিবাসী স্বয়ং মাধবই ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আছেন। আপনি ব্রাহ্মণকে সামান্য জ্ঞান করিবেন না! ব্রাহ্মণ-পাদোদক সেবনান্তে দেখিবেন আপনি ব্যাধিমুক্ত হইয়া দিব্য-

কান্তিবিশিষ্ট শরীরধারণ করিয়াছেন। আপনি আমাদের বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণপাদোদক পান করিয়া দেখুন। আপনি তদ্দ্বারা ব্যাধিমুক্ত না হইলে আমাদিগের বিনাশসাধনপূর্ব্বক সংকল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। আমরা আপনার এই সভাগৃহেই প্রতীক্ষা করিতেছি। আমরা আপনার রোগমুক্তি না দেখিয়া অন্যত্র গমন করিব না।"

হংসবাক্যে কৃতবিশ্বাস নরপতি ঔদাস দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে অনুচরবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "এই বিজ্ঞ হংস আমাকে ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিবার পরামর্শ দিতেছেন, অতএব তোমরা অবিলম্বে গমনপূর্ব্বক জনৈক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সভায় আনয়ন কর।"

অনুচরগণ রাজাদেশ প্রাপ্তিমাত্র ব্রাহ্মণনিমন্ত্রণে গমন করিল। কিন্তু কি বিস্ময়কর ব্যাপার, কোথাও ব্রাহ্মণসাক্ষাৎ হইল না। নগরের সর্ব্বত্র, প্রতি ব্রাহ্মণগৃহে গমন করিয়া অনুচরবর্গ উত্তর পাইল "কেহ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবেন না, কেহ বা কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছেন রজনী সমাগমে গৃহে আগমন করিবেন, কেহ বা কুটুম্বগৃহে গমন করিয়াছেন, তিন চারি দিবসান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইবেন ইত্যাদি প্রকারে কোন না কোন কার্য্যোদ্দেশে সকলেই বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন। রাজভাগ্য ঈদৃশ অসাধু হইতে পারে, ইহাই অনুধ্যান করিয়া অনুচরবর্গ দুঃখতপ্ত হৃদয়ে রাজসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক সংবাদ জানাইল।

রাজা শ্রবণ করিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমার এই সুবিশাল রাজ্যমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ নাই, একথা কি কখন বিশ্বাসযোগ্য? আমি এতাদৃশ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া নিদারুণ কষ্টভোগ করিতেছি, ইহা দেখিয়াও কি তোমরা সামান্য কষ্ট স্বীকারে অস্বীকৃত হইলে? বিলক্ষণ অনুসন্ধানপূর্ব্বক যেখানে যে অবস্থায় একজন ব্রাহ্মণ দেখিবে তাহাকেই আনয়ন করিবে।"

চতুর্থ স্তবক।

রাজাদেশে অনুচরগণ পুনরায় বহির্গত হইল। রাজার ভাগ্য বড়ই অশুভ এইরূপ বিবেচনা করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। কয়েকজন রাজবাটীর অনতিদূরে পথিপার্শ্বে শায়িত মক্ষিকাগণ পরিব্যাপ্ত জীর্ণ ও মলিন

হে? এবং কি নিমিত্তই বা এতাধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পথিপার্শ্বে শয়ন করিয়া আছ?"

লোক কহিল, "আমি গরীব ব্রাহ্মণ তাহার উপর রোগগ্রস্ত সুতরাং চলৎশক্তিরহিত হইয়া রাজবর্ত্ম পাশে শয়ন করিয়া আছি।

রাজানুচরগণ "ব্রাহ্মণ পাইলাম" ভাবিয়া আনন্দিত হইল। ভাবিল যে রূপই পীড়িত হউক না কেন সাহায্য পাইলে একবার মাত্র রাজবাটীতে গমনপূর্ব্বক একটু পাদোদক দিতে পারিবে। এজন্য তাহাদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কি রোগ? তোমাকে সাহায্য করিলে বাটী গমন করিতে পারিবে?"

ব্রাহ্মণ। না বাবা! আমার উত্থানশক্তি কি গমনশক্তি নাই। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আবরণ বস্ত্রোন্মোচনপূর্ব্বক দেখাইল। অনুচরগণ দেখিল, ব্রাহ্মণের হস্ত ও পদের অঙ্গুলী স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। যে অংশ অবশিষ্ট আছে তাহাও ক্ষতপূর্ণ ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট, এতদ্ভিন্ন নাসিকাগ্রভাগে ও কর্ণপ্রান্তে ক্ষত হইয়া ব্রাহ্মণ কদাকার ধারণ করিয়াছে। অনুচরগণ ঘৃণায় নাসিকা বস্ত্রাবৃত করিয়া ব্রাহ্মণ সন্নিধান হইতে দূরে দণ্ডায়মান হইল। অনাবৃত ক্ষতস্থানে মক্ষিকাদংশন কষ্ট অতীব পীড়াদায়ক, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ আপাদমস্তক পুনরায় আবৃত করিল দেখিয়া অনুচরবর্গ ব্রাহ্মণসন্ধানে বহুস্থান ভ্রমণ করিল। কোন ব্রাহ্মণ না পাইয়া তাহারা রাজদণ্ডভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে ভূপতি সমক্ষে নিবেদন করিল, "মহারাজ! সংবাদদানেও আমাদের হৃৎকম্প হইতেছে, আমরা নগরের সর্ব্বত্র ও নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়াও ব্রাহ্মণ পাইলাম না। যদি রাজনিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি জনৈক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা উপযুক্ত দণ্ডগ্রহণ করিব। তবে রাজবাটীর পশ্চাদ্ভাগে একটী ব্রাহ্মণ শায়িত আছে, কিন্তু আমরা তাহাকে আনয়ন করিতে সাহসী হইলাম না।"

রাজা। কেন সাহসী হইলে না? যখন কোন স্থানে ব্রাহ্মণ পাইলে না তখন তাহাকেই ত আনয়ন করা উচিত ছিল।

অনু। আজ্ঞে, সে পীড়িত।

রাজা। এমন কি পীড়িত যে একবার মাত্র রাজসভায় আগমন করিতে অসমর্থ?

অনু। আজ্ঞে, সে বড় পীড়িত, তাহার চলিবার শক্তি নাই।

হংস। মহারাজ। কোনক্রমে তাহাকেই আনয়ন করুন। একবার মাত্র পাদোদক লইয়াই তাহাকে বিদায় দিবেন।

রাজা। তবে তাঁহাকেই তোমরা আনয়ন কর। তাঁহার চলৎশক্তি না থাকিলে তোমরা পরস্পর বাহুর উপর স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে অবলীলাক্রমে আনয়ন করিতে পারিবে।

অনুচরগণ মহা সমস্যায় পতিত হইল। গলন্ত কুষ্ঠব্যাধিকে কি প্রকারে তাহারা বাহুর উপর স্থাপন করিবে? এজন্য কহিল, মহারাজ! সামান্য ব্যাধি হইলে বা অনায়াসে আনয়নক্ষম হইলে আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাকে আনয়ন করিতাম।"

রাজা এবার ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তোমাদের এরূপ অন্যায় আপত্তি আমি শুনিতে চাই না। কি এমন পীড়া তাহা প্রকাশ করিতেও কি তোমরা অসমর্থ?"

অনু। মহারাজ! আপনি যে পীড়াগ্রস্ত হইয়া মরণ যাতনাধিক কষ্ট অনুভব করিতেছেন, তিনিও সেই পীড়াক্রান্ত হইয়া হস্তপদাদির অঙ্গুলীশূন্য হইয়াছেন, এজন্যই তিনি চলৎশক্তি বিহীন। মক্ষিকা দংশনে একান্ত কাতর হইয়া সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করতঃ তিনি পথিপার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন।

হংস। মহারাজ! দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে তাঁহাকেই আনয়ন করতঃ তদীয় পাদোদক অমৃতজ্ঞানে পান করুন, তাহা হইলে আপনি সর্ব্বব্যাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া রুচিরতর কলেবর প্রাপ্ত হইবেন।

হংসবাক্যে উত্তেজিত নরপতি সেই কুষ্ঠগ্রস্ত ব্রাহ্মণকেই যে কোন প্রকারে সাধ্য আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন, অনুচরগণ ক্ষুব্ধহৃদয়ে রাজাজ্ঞা পালনার্থে গমন করিল। অতিদুর্গন্ধ বিশিষ্ট, গলিত হস্তপদমুখনাসিক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সেই ব্রাহ্মণদেহ স্পর্শ করিতে হইবে এই ঘৃণায় সঙ্কুচিতচিত্ত অনুচরগণ একখানি নরযান সংগ্রহ পূর্ব্বক অতি কষ্টে তাহাকে তন্মধ্যে শায়িত করিলেন। অনন্তর সেই যান সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলে অনুচরবর্গ পুনরায় তাঁহাকে যান হইতে সভাকুট্টিমে অবতারণ পূর্ব্বক শায়িত করিলেন। অবতরণকালে মক্ষিকাগণ তাড়িত হইয়া তাঁহারই চতুর্দ্দিকে গুণ গুণ রবে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ শায়িত হইলে পূর্ব্ববৎ সর্ব্বদেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া রহিল। মক্ষিকাগণ স্থান প্রাপ্ত হইয়া সেই বস্ত্রোপরি উপবিষ্ট হইল। ব্রাহ্মণের গাত্র হইতে পুতিগন্ধ চতুর্দ্দিকে বায়ুভরে সঞ্চালিত হইলে সভাস্থ সকলে অলক্ষিত

ও অপ্রকাশ্যভাবে ঘৃণাজনিত মুখবিকৃতি প্রকাশ করিতে লাগিলে এতাদৃশ গলিতপদ ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিতে হইবে এই ভয়ে রাজার অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল। যিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ঘৃণাজনিত বিকারে স্বয়ং অন্নপানাদি গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়াছেন অদ্য কেমন করিয়া তিনি এই নরকার জনক পূতিগন্ধ বিশিষ্ট ক্ষত ধৌত জল অম্লান বদনে ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিবেন! পাত্র মিত্র সভাসদ সকলেই অবনতমস্তকে উপবিষ্ট আছেন। স্বয়ং নরপতি যাঁহার পাদোদক পানে কৃত সঙ্কল্প, পাছে তাহাদের ঘৃণাসূচক বাঙ্নিষ্পত্তিহেতু সেই ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার অভক্তির উদয় হয়, এই ভয়ে সকলেই নীরব। সভাস্থ সকলকেই নিস্তব্ধ উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া হংস রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! কি কারণে সকলে নিস্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট আছেন? রাণীকে আহ্বান পূর্ব্বক সস্ত্রীক ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করুন, তাহা হইলে সর্ব্বব্যাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া দিব্য লাবণ্য সমন্বিত দেহ প্রাপ্ত হইবেন। আপনি যেরূপ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছেন ঐ ব্রাহ্মণও তদ্রূপ পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্ন হইয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। ইহাতে উঁহার ব্রাহ্মণত্বের অণুমাত্রও লাঘব হয় নাই। আপনি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে উঁহারই পাদোদক অমৃতজ্ঞানে পান করিলে অবশ্যই সর্ব্বব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবেন।"

বৈদ্য। মহারাজ! হংস মনুষ্যের ন্যায় কথা কহে ইহা কখনও শুনি নাই। এই হংসরাজ যখন মনুষ্য বাক্যে কথা কহিতেছেন তখন অবশ্যই ইঁহার অসাধারণ শক্তি আছে স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং ইহার বাক্য অবহেলা করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। দৈবশক্তি সম্পন্ন হংসরাজ যাহা অনুমতি করিতেছেন তাহা আপনি যথাযথ পালন করুন। মহারাণীকে আহ্বানপূর্ব্বক সস্ত্রীক এই ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করুন, ইহাতে আপনার মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই।

রাজপারিষদবর্গ বৈদ্যরাজের বাক্য অনুমোদন করিলে মহারাজ ঔদাস পাদোদক পানার্থে অন্তঃপুর মধ্যে সংবাদ পাঠাইলেন। উপযুক্ত বসনভূষণে সজ্জীভূতা হইয়া মহারাণী সভাস্থা হইলে, তিনি ও মহারাজ ঔদাস অঞ্জলিপূর্ণ উদক গ্রহণান্তর ব্রাহ্মণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "হে ব্রাহ্মণ! নিরতিশয় পীড়াদায়ক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লইয়া মরণাধিক যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছি। আমি অতি মূঢ়মতি, ব্রাহ্মণের পাদোদক যে অসাধ্য ব্যাধি নিবারণের

একমাত্র উপায় তাহা জানিতাম না। এক্ষণে হংসবাক্যে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। এজন্য আপনার নিকট সবিনয়ে আমার এই মিনতি যে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাদোদক দান করুন। আমরা উহাই বিষ্ণুপাদোদক জ্ঞানে পান করতঃ যেন সর্ব্বব্যাধিবিনিম্মুক্ত হইয়া দিব্য লাবণ্যযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হই।"

স্বয়ং মহারাজের সবিনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়, আপনাকে পাদোদক দান করিতে আমার কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু মহারাজ! আমিও কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্ত হইয়া পদাদি সঞ্চালনে একান্ত অসমর্থ। যদি ব্রাহ্মণের পাদোদকে আপনার ভক্তি হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বাম হস্ত দ্বারা আমার পদধারণ করিয়া বারিপূর্ণাঞ্জলি আপনার দক্ষিণ হস্ত আমার পদস্পর্শ করাইয়া পান করুন।"

আবরণ মুক্ত হইলে ব্রাহ্মণের অঙ্গুলীশূন্য পদদর্শনে মহারাজকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া হংস উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "মহারাজ! দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে উহারই পাদোদক গ্রহণ করুন। ঘৃণা করিয়া আত্মাকে আর কলুষিত করিবেন না। ঐ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত পদই আপনার কুষ্ঠব্যাধি নিবারণে সমর্থ। কথায় বলে 'বিষস্য বিষমৌষধং' ঐ বিষপানে যদি আপনি দুরারোগ্য যন্ত্রণা দায়ক ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন তখন উহাকে আর বিষজ্ঞান না করিয়া অমৃত বিবেচনায় গ্রহণ করুন! দেখুন বৈদ্যরাজ আপনার অপেক্ষায় রহিয়াছেন, আমরাও আপনাকে নির্ব্যাধি দেখিলে সন্তুষ্ট হই। সুতরাং অগৌণে আপনি ঐ পাদোদক পানে হৃন্মনোদেহতাপন ব্যাধি বিনিম্মুক্ত হউন।"

বৈদ্য। মহারাজ! এই ঘৃণাজনক গলিত কুষ্ঠধৌত পাদোদক আপনাকে পান করাইয়া হংসের কোন গুপ্ত অভীষ্টসিদ্ধির বাসনা নাই! একান্ত বিশ্বস্তচিত্তে তিনি যখন আপনাকে পুনঃ পুনঃ উহাই পান করিবার আদেশ দিতেছেন তখন আপনার আর ঘৃণা করিবার কোন কারণ নাই। আমার বোধ হইতেছে বাস্তবিকই উহা অমৃত, নিঃসন্দেহ মনে পান করিলে, আপনার সর্ব্বব্যাধি প্রশমিত হইবে।

হংস ও বৈদ্যরাজ কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া মহারাজ বাম হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের উত্তোলিত ক্ষত পদাগ্রভাগ রাণীর বদ্ধাঞ্জলিপূর্ণ বারিস্পর্শ করাইলেন। তদান্তর স্বীয় হস্তস্থিত বারিও ব্রাহ্মণের ক্ষতপদাগ্রভাগ সংস্পৃষ্ট করাইলেন।

মক্ষিকাদষ্ট রুধিরস্রাবিক্ষতধৌতবারি রক্তবর্ণ ধারণ করিল। দুই একখণ্ড গলিত মাংসও তন্মধ্যে নিপতিত হইল। হস্তস্থিত রক্তরঞ্জিত বারি হইতে অসহনীয় পূতিগন্ধ সমুত্থিত হইয়া রাজা ও রাণীর নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে উভয়েই হস্তপ্রসারিত করিলেন। রাজা ও রাণীকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া হংসরাজ কহিলেন, "মহারাজ! বৃথা কালবিলম্বে কোন ফলোদয় হইবেক না। হস্তস্থিত পাদোদক ভক্তিপূর্ণান্তকরণে স্বয়ং হৃষিকেশের পবিত্র পদধৌতবারি জ্ঞানে পান করিয়া ব্যাধিশূন্য কলেবর হউন।"

রাজা প্রসারিত হস্তাঞ্জলীপূর্ণ রক্তবর্ণ পাদোদক প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমার এই বিশাল রাজ্য মধ্যে যখন ব্রাহ্মণ দুষ্প্রাপ্য হইল, এবং অনেক অনুসন্ধানের পর যখন এই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণের রাজবাটীর সন্নিকটেই রাজবর্ত্ম পাশে পতিত প্রাপ্ত হইলাম, তখনই বোধ হইতেছে ইনি স্বয়ং নারায়ণ, আমাকে ছলনা করিবার জন্যই ঈদৃশ অবস্থাগত হইয়া আমাকে দর্শন দিয়াছেন। আর এই পাদোদক স্বয়ং নারায়ণের পাদোদক পান করিলে আমি নিশ্চয়ই ব্যাধিনির্ম্মুক্ত হইব।"

ইতিমধ্যে হস্তস্থিত রক্ত পাদোদকগন্ধ রাণীর এতাদৃশ অসহনীয় হইয়া উঠিল যে তিনি উহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "রাজা নীরোগ হউন, আমি এতাদৃশ পূতিগন্ধ বিশিষ্ট পচামাংশ সম্বলিত পাদোদক পানে একান্ত অসমর্থা।" এই বলিয়া পাদোদক দূরে নিক্ষেপ করিয়া বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তদ্দর্শনে হংসরাজ, অধিকতর আগ্রহের সহিত কহিলেন, "মহারাজ! সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত অমৃত যেমন দেবতারই পানীয় হইয়াছিল, তদ্রূপ এই ধর্ম্মভক্তি-মন্থনোদ্ভূত ব্রাহ্মণ পাদোদক আপনারই পানীয় হউক। রাণী ইহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এক পুণ্যবানের আশ্রয়ে থাকিয়া যেমন বহু পাপী উদ্ধার হয়, রাণীও আপনার আশ্রয়ে উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন। মহারাজ! আপনি প্রকৃতই নারায়ণের পাদোদক হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। অজ্ঞান লোকগণেরই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। আপনি পরমজ্ঞানী ও ভক্ত হইয়া কি নিমিত্ত দ্বিধাচিত্ত হইতেছেন? ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়। যে পাদোদককে আপনি মলমূত্র পুরীষাপেক্ষাও ঘৃণিতবস্তু বোধে দূরে ধারণ করিয়া আছেন, বক্ত্রাভ্যন্তরে গ্রহণ করিলে দেখিবেন উহাই চন্দনাপেক্ষাও সুগন্ধ বিশিষ্ট ও অমৃতাপেক্ষাও সুমধুর।"

অনন্তর মহারাজ ওদাস হংসের তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে লজ্জিত হইয়া যেই অঞ্জলী-গৃহীত রক্তপাদোদক মুখাগ্রে আনয়ন করিলেন অমনি তদুত্থিত তীব্র পূতিগন্ধ তাঁহার নাসিকা বিবরে প্রবিষ্ট হইল। অতিকষ্টে নক্কার সংবরণ পূর্ব্বক পুনঃ প্রসারিত হস্তে কহিলেন, "নারায়ণের পাদোদক যেমন উত্তম বস্তু, ইহা তাদৃশ উত্তম স্থানেই ধারণ করিলাম।" এই বলিয়াই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজা চক্ষুরগ্রভাগে তড়িতালোকের ন্যায় জ্যোতি নিরীক্ষণ করিলেন। সেই প্রচণ্ড আলোকে তাঁহার চক্ষু স্বতই নিমীলিত হইল। পরক্ষণেই নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন বৈদ্যরাজ, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণ বা হংস কেহই আর রাজসভায় নাই। এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়-জনক ব্যাপারে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন এমন সময়ে আকাশবাণী হইল, "হে নরনাথ! তুমি দুশ্চিকিৎস্য দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলে। অর্থসাধ্য সকলপ্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক যখন দেখিলে অর্থে পাপমুক্ত হওয়া যায় না, তখন অনন্যোপায়ে ভক্তি-পূর্ণহৃদয়ে কাতরাহ্বানে দিনযামিনী আমাকে ডাকিতে লাগিলে। আমি ভক্তের অধীন। আমার নিকট রাজা ও ভিখারী উভয়েই সমান। যেই আমাকে একান্তমনে করুণহৃদয়ে বিপদপরিত্রাণার্থ আহ্বান করে, আমি তাহারই দুঃখ বিমোচনে যত্নবান হই। তোমার ভক্তিপরীক্ষার্থ আমি ত্রিধা বিভক্ত হইয়া বৈদ্য, হংস ও ব্রাহ্মণরূপধারণ করতঃ তোমার সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। দেখিলাম তোমার ভক্তি সমস্তই মৌখিক, তোমার হৃদয় কালকূটে পূর্ণ। সুতরাং তুমি কালকূটপূর্ণ মহাকালরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কালিয় নামে অভিহিত হইবে। আর ব্রাহ্মণের পাদোদক উত্তমবস্তু বলিয়া যেমন তুমি শ্রেষ্ঠাঙ্গ মস্তকে ধারণ করিয়াছ, জন্মান্তরে তুমি আমার পদচিহ্ন সেই শ্রেষ্ঠ অঙ্গে ধারণ করিবে।"

পূর্ব্বজন্মকথা প্রিয়া সকাশে বর্ণন করিয়া কালিয় কহিলেন, "দেখ প্রিয়ে! শ্রীকৃষ্ণ পদচিহ্ন আমার মস্তকে রহিয়াছে।" তখন কালিয়ভার্য্যা কহিলেন, "নাথ! পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত সকলই আমার স্মরণপথে উদিত হইয়াছে। নাথ! আমার হৃদয় যেন মহোল্লাসে নৃত্য করিতেছে, যেন আত্মা আর দেহ মধ্যে অবস্থান করিতে পারিতেছে না।" তচ্ছ্রবনে কালিয় কহিলেন, "গরুড়ভয়ভীত আমি শ্রীকৃষ্ণে আশ্রয়প্রার্থী হইলে তিনি আমাকে আশ্রয়দান না করিয়া কহিয়াছিলেন "পূর্ব্বনিদর্শনদর্শনে তোমার জন্মান্তরীণ কথা তোমার স্মরণপথে উদিত

হইবে। সেই কথা প্রিয়াসকাশে বর্ণন করিলে শ্রোতা ও শ্রাবক উভয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে।" "প্রিয়ে, অতএব চল, আমরা এজন্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ ভবনে শ্রীকৃষ্ণপদপ্রান্তে আশ্রয়গ্রহণ করিব।" এই বলিতে, বলিতে উভয়ে সর্পদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রভবন হইতে বহির্গত হইলেন।

সম্ভোগ।

নিভৃত হৃদয়-পুষ্প-বাসরে,
মঞ্জু বসন্তের দীপ্ত ছায়াখানি!
লজ্জার চারু সৌরভ নিঝরে,
লোলুপ আজিরে মরমের বাণী।
ভাব-ব্রততীতে ফুটে উঠে গান,
ঝোরে প্রাণে আর ডুবে ব'য়ে যায়।
নিদ্রাহীন আঁখি তাহে করে ভাণ,
কত কি বুঝা'তে—শিখা'তে চায়!
লুপ্ত সব গুরু-চাঞ্চল্যের বাধা,
সর্ব্বদিকে ঘেরা স্বপনের বেড়া;
স্বর্গীয় স্মৃতির প্রেম-ডোরে বাঁধা,
অসীম অনন্ত আনন্দের সাড়া।
জীবনের সব ঘটনা-শৃঙ্খলে,
ধ্বনিত অম্লান বাল্য খেলা-ধূলি।
মৃদু অঞ্চলের ভালোবাসা-গলে,
জেগেছে ভরা যৌবন-মাল্যগুলি!
ভকতি-হীনের গত শ্বাস-স্রোতে,
নব প্রেম সুধা-সাগর-সঙ্গম!
বড় অভিলাষ ডুবে মোহ-পথে,
নীরদ-নির্ম্মুক্ত ইন্দু-কর সম।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

ভাগবত ধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রশ্ন ছয়টি সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এইবার প্রশ্নগুলির উত্তর কি ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই আলোচ্য। প্রাচীন আচার্য্যগণের মতানুসারে প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারিটি প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রথম দুইটি শ্লোকে শ্রীসূত তাঁহার গুরুদেবের বন্দনা করিয়াছিলেন। আমরা দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় এই দুইটি শ্লোক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের মতানুসারে গুরুবাদের ভিত্তি কি তাহা আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে চারিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। উগ্রশ্রবা সূত ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলং।
যৎ-কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥"

হে মুনিগণ! আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা অতীব সাধু। কারন আপনারা লোকমঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত যে যুগধর্ম্মের আদর্শ তাহার গতি কোন্ দিকে এই স্থান হইতেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। লোকমঙ্গলের প্রশ্নই সাধু প্রশ্ন, অতএব শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের মতে যে প্রশ্ন বা যে চেষ্টা কেবল মাত্র নিজের মঙ্গল চিন্তাতেই বিব্রত তাহা সাধু নহে। পূর্ব্বে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে মোক্ষের অভিসন্ধি-লক্ষণ যে ধর্ম্ম অর্থাৎ যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মানুষ কেবল ভাবে ও চেষ্টা করে আমার নিজের হিত কি করিয়া হইবে সে ধর্ম্ম কৈতব ধর্ম্ম এবং তাহা নিম্নস্তরের ধর্ম্ম। সুধু তাই নহে, যদি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের মান্য করা যায় তাহা হইলে তাহা যুগধর্ম্ম নহে। এখন মানবকে লোকমঙ্গলের চিন্তায় বিভোর হইতে হইবে। প্রকৃত কথা এই যে আমার নিজের বলিতে একটি পৃথক মঙ্গল নাই। মানুষ, জগতের সহিত, নিখিলের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধনটুকু মানুষ যখন বুঝিতে না পারে তখন সে অহঙ্কারের ভূমিতে দাঁড়াইয়া, কামনাযুক্ত হইয়া মঙ্গলের দুঃস্বপ্নমাত্র দর্শন করিতেছে। নিজের জন্য মানুষ যখন কিছু চায় তখনই বুঝিতে হইবে যে সে এখনও অবিদ্যাচ্ছন্ন, যে ধর্ম্ম মানুষকে এই নিজের জন্য কিছু চাহিতে শিক্ষা দেয়, সে ধর্ম্ম হয়ত মন্দের ভাল হইতে পারে, কিন্তু

তাহা ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ নহে। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের এই উপদেশই সার উপদেশ। এই জন্য উগ্রশ্রবা সূত মুনিগণকে বলিলেন আপনাদিগের প্রশ্ন সাধু কারণ ইহা লোকমঙ্গলমূলক। পুরুষসকলের যাহা একান্ত ও অত্যন্ত শ্রেয়ঃ তাহাই মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মুনিগণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকায় বলিতেছেন "সর্ব্বশাস্ত্রার্থ সারোদ্ধারপ্রশ্নস্যাপি কৃষ্ণে পর্য্যবসতাদেবমুক্তং" সকল শাস্ত্রের যাহা সার তাহা উদ্ধার করিলে দেখা যাইবে যে কৃষ্ণকথাতেই তাহা পর্য্যবসিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে হিন্দুসাধনার সমগ্র ইতিহাস এই শ্রীকৃষ্ণ লীলাতেই তাহার শেষ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এই কৃষ্ণকথাতেই যথার্থ লোকমঙ্গল নিহিত আছে ইহাই ভাগবতশাস্ত্রের অভিপ্রায়। শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য মানবসমাজে যতই প্রচারিত হইবে, মানব হৃদয় এই লীলারস আস্বাদন করিয়া যতই সরস হইয়া উঠিবে, হিন্দুশাস্ত্রের যাহা অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, প্রাচীন সাধু ও ঋষিগণ যে তত্ত্ব প্রচারের জন্য সাধনা করিয়াছেন, তাহার আধিপত্য ততই বাড়িয়া যাইবে। মানুষ নূতন মানুষ হইয়া পড়িবে, নিজের হিতের জন্য ভাবিয়া আর কেহ ব্যাকুল হইবে না, সকলেই পরের চিন্তা করিবে। লোকহিতই যে আত্মহিত ইহা জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝাইয়া দিতে হইলে, এই ভাবে বিশ্ববাসীগণকে দীক্ষিত করিতে হইলে, কৃষ্ণলীলারস পান করা ও অপরকে পান করান দরকার। এই যে লোকমঙ্গলকর শ্রীকৃষ্ণকথা, সূত বলিতেছেন, ইহার দ্বারাই আত্মার প্রসাদ হইবে। আত্মার প্রসাদ বলিতে অহং-অভিমানী বা স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন যে জীব তাহাকে বুঝায় না। সাধারণ ভাবে প্রকৃত আমি বা আমার যাহা স্বরূপ তাহাকে বুঝায়। পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে The real self, the noumenal self অথবা the spiritual self বলে। বৈষ্ণব শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব। এখন দাসের একটা নিজের স্বতন্ত্র আনন্দ নাই, প্রভুর আনন্দেই তাঁহার আনন্দ পর্য্যবসিত। এই কারণে আচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন "যেন প্রশ্নেনৈব আত্মা প্রসীদতীতি শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সদ্য আত্মপ্রসাদকত্বমস্মদনুভবসিদ্ধমিতি ভাবঃ" অর্থাৎ আত্মপ্রসাদ প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রসাদ। জীবের প্রসাদ এই শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদের অনুভবের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দই জীবের পরম পুরুষার্থ। ব্রজদেবীগণের ভাব যাহা বৈষ্ণব সাধকগণ জগতের নিকট প্রচার করিয়াছেন তাহাতে

এই ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতকার বলিতেছেন

"গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ় ভাব নাম।
পরম নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যমাত্র প্রেম ত প্রবল॥
লোক ধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে কৃষ্ণের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

* * *

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহ ত কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈঁনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগ সাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥

আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব॥
বুদ্ধির গোচর নহে যাঁহার প্রভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটি গুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটি গুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ;
তথাপি বাড়য়ে সুখ; পড়িল বিরোধ।
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥"

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে এই গোপী ভাবকে আদর্শ করিয়া তদনুযায়ী জীবন গঠন করিতে হইবে—কৃষ্ণ সুখে আমাদের সুখ যাহাতে পর্য্যবসতি হয়, বিশ্বকল্যাণ ব্যতীত আমার নিজের বলিতে যে অন্য কোনরূপ কল্যাণ থাকিতেই পারে না ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় ইহাই যুগধর্ম্ম।

এইবার আমাদের সাধারণ ধার্ম্মিকতার আদর্শ এই আদর্শের কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে তাহা চিন্তা করা দরকার। আমি ধার্ম্মিক লোক, আমরা কেবল অন্ন রক্ষার জন্যই ব্যাকুল। আত্মদানই যে প্রকৃত আত্ম রক্ষা এ তত্ত্ব আমরা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। ভাগবত ধর্ম্মের সাধন গ্রহণ করিলে মানব দুঃখের মধ্যেই সুখের, শোকের মধ্যেই অশোকের, মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতের, দানের মধ্যেই লাভের, বিরহের মধ্যেই মিলনের আস্বাদ পাইব। ইহাই সত্য, ইহাই কল্যাণ। ইহা ছাড়া আর অন্য পথ নাই। আমরা কেবল ব্যাকুল হইয়া দুর্ব্বল চিত্তে বলিয়া থাকি "ভগবান্ আমার দুঃখ দূর কর, ভগবান আমার রোগ সারাইয়া দাও তোমাকে পঁচিশ টাকা ঘুষ দিব" ইহা ভাগবত ধর্ম্ম নহে, ইহা মোহের ধর্ম্ম, ইহা কপটের ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম মন্দের ভাল হইতে পারে, কিন্তু যুগধর্ম্মের আদর্শ, যাহা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার শিক্ষা ও উপদেশ অন্যরূপ। রোগ হইলে কখনও ভগবানকে ডাকিয়া বলিতে নাই, "হরি আমার রোগ সারাইয়া দাও"। এ কথা যখন বলি তখন প্রকৃত প্রস্তাবে

আমি বলিয়া থাকি, "হে ভগবান, তোমার বুঝিবার ভুল হইয়াছে, তোমার ব্যবস্থা ঠিক হয় নাই, তুমি আমার পরামর্শ লইয়া তোমার এই ভুল ব্যবস্থা সংশোধন করিয়া লও।" এ কত বড় অজ্ঞানের ও অহঙ্কারের কথা। রোগ হইলে ভগবানকে বলিতে হয়, "প্রভো! তুমি যাহা করিয়াছ ঠিকই করিয়াছ, ব্যাধি দূর করিবার যে সমস্ত লৌকিক উপায় তুমি দিয়াছ আমি সে সমুদয় অবলম্বন করিব। তবে তোমার নিকট এই প্রার্থনা যেন এই রোগে কাতর হইয়া তোমার চরণ ভুলিয়া না যাই, অবিশ্বাস আসিয়া যেন আমায় আশ্রয় না করে।

শ্রীশ্রীকুন্তী দেবী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "আমার সর্ব্বদা বিপদই হউক।" শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে রন্তিদেবের উপাখ্যান আছে, ভাগবত ধর্ম্মের যাহা আদর্শ তাহা এই রন্তিদেবের চরিত্রে অতি সুন্দর রূপে পরিদৃষ্ট হয়। রন্তিদেব স্বয়ং ক্ষুধায় কাতর হইয়াও অপরকে খাওয়াইতেন। তিনি সমুদয় দান করিয়া সপরিবারে ক্ষুধায় অবসন্ন হইতেন, জলমাত্রও পান না করিয়া তাঁহার আটচল্লিশ দিবস অতীত হইত। পরিবার সকল অনাহারে কষ্ট পাইতেছেন, নিজে ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাঁপিতেছেন, এমন সময়ে খাদ্য দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত। রন্তিদেব সর্ব্বত্র হরিকে দর্শন করিতেন, অতিথিকে সেই অন্ন তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। তাহার পর নিজেরা আহার করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন শূদ্র অতিথি আসিয়া উপস্থিত, অবশিষ্ট অন্ন তাহাকে প্রদান করিলেন। তাহার পরও কিছু অন্ন ছিল, একজন লোক কতকগুলি কুক্কুর লইয়া উপস্থিত, রন্তিদেব তাহাকে সেই অন্ন প্রদান করিলেন। খাদ্য দ্রব্য সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে এক চণ্ডাল আসিয়া উপস্থিত, রন্তিদেব স্বয়ং পিপাসায় কাতর হইয়াও চণ্ডালকে সেই জলটুকু পান করিতে দিলেন। এই সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন

'ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥

আমি পরমেশ্বরের নিকট অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি সমন্বিত গতি অথবা

মুক্তি কামনা করি না, আমি যেন ভোক্তারূপে অন্তঃস্থিত হইয়া সমস্ত দেহীর দুঃখ প্রাপ্ত হই, যাহাতে আমা হইতে সকল দেহীর দুঃখ দূরীভূত হয়'।

ধর্ম্ম জীবনের এই আদর্শ শ্রবণ করিয়া অনেক লোকের চিত্ত নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠাই সম্ভব কারণ আমরা সহজে লাভবান হইবার জন্যই প্রায়শঃ ধর্ম্মাচরণ করি। ধর্ম্মাচরণ করিয়া যে মানুষ লাভবান হয় না তাহা নহে, ধর্ম্মাচরণের দ্বারা মানবের সকল দিকেই শক্তি বৃদ্ধি হয় সত্য। কিন্তু এই প্রকারের অস্থায়ী স্বার্থসাধনের সুগম উপায় রূপে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করিলে শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তির বা জাতির মঙ্গল হয় না। আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটি আলোচনা করিয়া ভাগবত ধর্ম্মের আদর্শ সম্বন্ধে যাহা পাইলাম পরবর্ত্তী শ্লোক ও তাহার পরের শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে সেই ভাবটিই দৃঢ়ীকৃত হইবে। ক্রমশঃ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আলোচনা করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যলীলার সহিত পরিচয় হইলে হৃদয় আপনা হইতেই নৃত্য করিয়া উঠিবে এবং সেই নিত্যলীলার সেবক হইয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।

ঋষিগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন সকল শাস্ত্রের সার যে ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ তাহা বর্ণনা কর ; সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন।

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতোভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥"

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকটির এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ধর্ম্ম দ্বিবিধ প্রবৃত্তি-লক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। ইহার মধ্যে যে ধর্ম্ম স্বর্গাদির জন্য অনুষ্ঠিত তাহা প্রবৃত্তিলক্ষণ, তাহা অপর। আর 'যে ধর্ম্মে শ্রীভগবানের লীলা কথা শ্রবণাদিতে আদর-লক্ষণা যে ভক্তি তাহাই জন্মে তাহা পর ধর্ম্ম। তাহাই ঐকান্তিক মঙ্গল। এই ভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ কোনরূপ ফলের অভিসন্ধান নাই আর অপ্রতিহতা অর্থাৎ কোনরূপ বিঘ্নের দ্বারা অনভিভূতা।

ভগবান অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত। তাঁহাতে ভক্তি অর্থাৎ পরানুরক্তি হওয়া চাই। শ্রীজীবগোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে যাহা প্রবৃত্তিলক্ষণ অর্থাৎ যে ধর্ম্ম আমাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে ভোগাদির প্রলোভন দেখায় সে ধর্ম্মের তো কথাই নাই, কেবল মাত্র নিবৃত্তি মাত্র লক্ষণ যে ধর্ম্ম তাহাতেও ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ হয় না, সে তো কেবল

বৈমুখ মাত্র (a negative virtue)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ, এই উভয় মার্গের ঊর্দ্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের সাধনার যে আদর্শ তাহার স্থান। বাস্তবিক ইহা নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা। "অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি" এই উপদেশ শ্রবণ করিলে আমরা বলিয়া উঠিব অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব। যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতে হইবে, এমন কি তাঁহাকেই একমাত্র ভালবাসার বস্তু করিতে হইবে। এই যে ভালবাসা ইহা "স্বত এব সুখরূপত্বাদহৈতুকী ফলানুসন্ধানরহিতা অপ্রতিহতা তদুপরি সুখঃদুঃখদপদার্থান্তরাভবাৎ কেনাপ্যবোধয়িতুমশক্যা চ" (ক্রমসন্দর্ভঃ) অর্থাৎ ইহা নিজেই সুখরূপী সুতরাং ইহাতে আর অন্য কিছুর আকাঙ্খা আর এই প্রেমে বা যে অবস্থায় এই প্রেম প্রকাশিত হয়েন সে অবস্থায় সুখকর বা দুঃখকর অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব না থাকায় ইহার অবরোধ হয় না। ইহাই ভক্তির স্বরূপ গুণ।

এই যে পরাভক্তি বা প্রেমভক্তির কথা বলা হইল ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শ, শ্রীবৃন্দাবনলীলায় ইহার ফলিত অবস্থা বা প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজবাসীগণের রাগাত্মিক এই নিষ্ঠার কথা সাধুমুখে শ্রদ্ধান্বিত ভাবে শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদিগের সেই ভাব পাইবার জন্য অন্তরে লোভের উদয় হয়। লোভের উদয় হইলেই মানব তাহা পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়।

অজ বিলাপ

(নারদের পারিজাত মালা স্পর্শে ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর—রঘুবংশ)

১

অয়ি প্রিয়ে সুকোমল পুষ্প পরশনে,
বিমুক্ত পরাণ তব বিগত চেতনা ;
নলিনী বিশীর্ণ হায় তুষার বর্ষণে,
কমনীয় অঙ্গে তব বেজেছে বেদনা।

২

কুসুমে কাঠিন্য, সুধা হলাহলে ভরা,
অথবা এ বজ্র সৃষ্ট দিতে মোরে ব্যথা ;

পরশি ইহাঁরে মোর নাহি মৃত্যু জরা,
মরেছে পাদপাশ্রিতা ক্ষীণপ্রাণা লতা।

৩

আননে ম্লানিমা তব, চক্ষে অবসাদ,
ক'রেছ কি অভিমান অয়ি শুচিস্মিতে ;
ক্ষমিয়াছ তুমি মোর কত অপরাধ,
আজি তবে কেন মম ব্যথা দাও চিতে।

৪

তোমার ও অনাবিল মুখচন্দ্র'পরে,
এখনো প্রমোদশ্রমে বহে ঘর্ম্মজল ;
ঈষৎ স্ফুরণ রেখা আরক্ত অধরে,
এখনো উজলে হাসি নয়ন যুগল।

৫

বায়ু ভরে উড়ে চূর্ণ অলকের দাম,
কিন্তু তব তনুলতা জীবন বিহীন ;
নিষ্কম্প অধরে ভাষা লয়েছে বিশ্রাম,
নৈশ সুপ্ত পদ্মসম ভৃঙ্গধ্বনি লীন।

৬

চিরতরে মোরে তুমি ত্যজিলে সুন্দরী,
মূর্ত্তিমতী হয়ে সতী আসিবে না আর ;
চক্রবাক নিশা অন্তে পায় সহচরী,
রজনী হাসায়ে শশী আসে পুনর্ব্বার।

৭

সত্যবটে ভাষা তব শুনি কোকিলায়,
মরালের দলে দেখি মদালস গতি ;
বিলাস বিভ্রম বাত্যা চঞ্চল লতায়,
কটাক্ষ হরিণীগণে প্রেমাকুল অতি।

৮

তবুও শোকাশ্রু আজি বহে দুনয়নে,
মথিত সান্ত্বনা মন্ত্র, চিত্ত ভারাতুর ;

স্বর্গলোকে হে সুন্দরি গিয়াছ কেমনে,
চিরতরে করি,মোরে বিরহ বিধুর।

৯

তোমার রোপিত এই অশোক কিংশুক,
পুষ্পরূপে বিষাদাশ্রু বর্ষে নিরন্তর ;
হেরি তব অচেতন মৃত্যুম্লান মুখ,
চরণে মঞ্জরী ধ্বনি না হয় মুখর।

১০

অধীর হৃদয় আজি তোমার বিহনে,
সঙ্গীতে বিরতি মম, নিবৃত্তি প্রণয়ে ;
বসন্ত উৎসব হীন নৈরাস্য ভুবনে,
শূন্য এ কুসুম শয্যা হায় অসময়ে।

১১

গৃহিণী, সচিব তুমি নিভৃত সঙ্গিনী,
প্রিয় শিষ্যা গীতিবাদ্য ললিত কলায় ;
হরিয়া নির্দ্দয় মৃত্যু তোমারে রঙ্গিণী,
কিনা মোর হরিয়াছে বিপুল ধরায়।

১২

তুমি গেছ প্রেময়ী দিব্য পরলোকে,
গীতি গন্ধ মুখরিত নন্দন কাননে ;
অসহায় আমি বিশ্বে মর্ম্মভেদী শোকে,
প্রেমাতুর চিত্তখানি কাঁদিছে গোপনে।

শ্রীপ্রভাসকুমার সেন।

যথা পাদ্মে।

নৈবেদ্যমন্নং তুলসীবিমিশ্রং ইত্যাদি ।৩৭

অথ চরণোদক পানং।

নাহি করে দান যজ্ঞ অন্য শুভ ক্রিয়া।
পাদোদক পান করে আনন্দিতহৈঞা ॥
বিষ্ণু লোক'বগতি হয় শাশ্বত তাহার।
পদ্ম পুরাণে শুন তাহার বিচার ॥

যথা—

ন দানং ন হবির্যেষাং স্বাধ্যায়োন সুবাচ্চনং
তে হপি পাদোদকং পীত্বা প্রয়ান্তি পরমাং গতিং ॥ ৩৮

অথ ধূপ সৌরভ্যং।

কৃষ্ণ দত্ত ধূপ শেষ আঘ্রাণ যে লয়ে।
গন্ধ পুষ্প নির্ম্মাল্যাদি ধারণ করয়ে ॥
সর্ব্বপাপ নাশ হয় তৎক্ষণে তাহার।
হরিভক্তি সুধোদয়ে তাহার বিচার ॥৩৯

শ্রীমূর্ত্তিস্পর্শনং যথা—

শুচি হৈঞা পসবিত্র সশ্রদ্ধিত মনে।
শ্রীমূর্ত্তি করয়ে স্পর্শ ভক্তি তার জনে ॥
অশেষ বিধান পাপ তৎক্ষণে খণ্ডয়ে।
সর্ব্ব অভিলাষ পূর্ণ তৎক্ষণে সে হয়ে ॥

শ্রীমূর্ত্তি দর্শনং।

শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ফল বরাহ পুরাণে।
পৃথিবীর প্রতি কন বরাহ আপনে ॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দরূপ যে করয়ে দর্শন।
স্বপ্নেহ না হয় তার যমালয় গমন

বরাহে—

বৃন্দাবনে তু গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে।
নতে যমপুরং য্যান্তি যান্তি পূন্য কৃতাং গতে ॥৪০

আরাত্রিক দর্শনং।

আরতির কালে কৃষ্ণ মুখ সন্দর্শন।
ব্রহ্মহত্যাদি পাপ তার খণ্ডয়ে তৎক্ষণ

স্কান্দে।

কোটয়ো ব্রহ্ম হত্যানাম গম্যাগম কোটয়ঃ।
দহত্যা লোক মাত্রেন বিষ্ণোঃ সারাত্রিকং মুখং ॥৪১

উৎসব দর্শনং যথা—

দোল যাত্রা রথ যাত্রা রাস মহোৎসব।
যে করে দর্শন কৃষ্ণের বিহার বৈভব ॥
চণ্ডালাদি দর্শন মাত্রে মহাপূত হন।
ভক্তিভাবে তারা হয় দেবতার সম ॥৪২

শ্রবনং যথা।

সেইত শ্রবণ হয়ে ত্রিবিধ লক্ষণ।
নাম শ্রবণ আর লীলাদি শ্রবণ ॥
গুণ শ্রবণ এই ত্রিবিধ কহেন।
তাহাতে সোদাহরণ গোসাঞি বর্ণেন ॥

যথা—

শ্রবণং নাম চরিত গুণাদিনাং শ্রুতির্ভবেৎ

তত্রনাম শ্রবণং।

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র এ যে করে শ্রবণ।
সর্ব্ব পাপ রোগ শোক খণ্ডয়ে তখন ॥
সংসার সর্পেতে দংশএ নষ্ট জত জন।
কৃষ্ণনাম হয়ে তাহে বিষাপহরণ ॥
যথা—
সংসার সর্প সংদষ্টনষ্ট চেষ্টৈকভেষজং।
কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং মন্ত্রং শ্রুত্বা মুক্তো-
ভবেন্নরঃ ॥
চরিত্রে শ্রবণং—
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রলীলা বাল্যাদি আচরণ।
আনন্দিত মন হৈঞা যে করে শ্রবণ ॥
সাধুমুখে বিগলিত কৃষ্ণ লীলামৃত।
কর্ণ পথে করে পান তাহা পরীক্ষিত ॥
সে অমৃত পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় দূরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা বিষয় বাধিতে নারে তারে ॥
যথা—
নৈষাতি দুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি-
বাধতে।
ইত্যাদি।
অথ গুণশ্রবণং—
কৃষ্ণ গুণানুবাদ বিপদ বিনাশ।
তাহার শ্রবণে যার সদা অভিলাষ ॥
সর্ব্ব অমঙ্গল তার খণ্ডয়ে তৎক্ষণে।
বিমল ভক্তি হয় শ্রীকৃষ্ণ চরণে ॥
যথা দ্বাদশে—
যস্তুত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ
সংগীয়তে হ,ভীক্ষমমঙ্গলঘ্নঃ।
ইত্যাদি ॥৪৩
অথ তৎকৃপেক্ষণং—
কৃষ্ণ অনুকম্পা কৃপা দৃষ্টি হয়ে জানি।
আপনাতে কৃপার ভাজন করে মানি ॥
ঘরে থাকি কায়মন বাক্যে করি নতি।
দায় ভাগি মুক্তি পদের কৃপাবলে তথি ॥
শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তুতিঃ।
তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমান ইত্যাদি ॥৪৪
অথ স্মিতঃ।
যথাকথাঞ্চন্মনসা সম্বন্ধঃ স্মৃতিরুচ্যতে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ যদি মনে স্মৃতি করে।
সর্ব্ব কল্যানযুক্ত হয় সেই নরে ॥
বিষ্ণু পুরাণে ॥
স্মৃতে সকল কল্যান ভাজনং যত্র
জায়তে ইত্যাদি ৪৫ ॥
অথ ধ্যানং ॥
রূপধ্যানং গুণধ্যানং ক্রীড়াধ্যানং
সেবাধ্যানং চ ॥
যথা ॥
ধ্যানংরূপগুণক্রীড়া সেবাদেঃ
সুষ্ঠুচিন্তনং ॥
রূপধ্যানং যথা।
অশেষ পাপের পাপি যদি সেহ হয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম হৃদয়ে ভাবয় ॥
সর্ব্বপাপ নাস হয় কৃষ্ণপদ ধ্যানে।
এই কথা কহিলেন নৃসিংহপুরাণে ॥
যথা ॥
ভগবচ্চরণদ্বন্দ্বধ্যানং নির্দ্বন্দ্বমীরিতং
ইত্যাদিঃ ॥
তত্র গুণ ধ্যানং ॥
যে করে স্মরণ সদা শ্রীকৃষ্ণের গুণ।
বৈকুণ্ঠ বসতি হয় সর্ব্ব পাপ হীন ॥
অথ ক্রীড়া ধ্যানং ॥

কৃষ্ণ লীলা চরিত্র সর্ব্ব মাধুর্য্যের সার।
অদ্ভুত সর্ব্ব লীলা ব্রজের বিহার ॥
সেই সব চরিত্র চিত্তে করয়ে ধেয়ান।
সপ্ন দুস্থ হৈতে পার তাহা সভা পান ॥
তত্র সেবা ধ্যানং ॥
সেবা ধ্যান তাহে কহি করহ শ্রবণ।
মানসিক উপচার কৃষ্ণে সমর্পন ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা কর অবধান।
প্রতিষ্ঠান পুরে পূর্ব্বে সুমন্ত আখ্যান ॥
সেই পুরে বিপ্র রহে অতি অকিঞ্চন।
কোনই সামগ্রী নাঞি বিতরনে ধন ॥
এক দিন সেই বিপ্র গেলা পর্য্যোটনে।
মুনির সভাকে গেলা আনান্দিত মনে ॥
সেইত সভায় শুনে বৈষ্ণব ধর্ম্মাচার।
মানস সেবাতে হয় সিদ্ধি শুভাকার ॥
এত শুনি সেই পুন দারিদ্র ব্রাহ্মণ।
গোদাবরি তিরে আসি করিলা স্বপন ॥
স্নানক তিলক মুদ্রা আসন শুদ্ধ করি।
অঙ্গ ন্যাস প্রানায়াম ইত্যাদি আচরি ॥
মুদ্রা বান্ধি দৃঢ়াসনে সমাধি করিল।
সর্ব্বেন্দ্রিয় বস করি দৃঢ় চিত্ত হৈল ॥
মনেত নিম্মান কৈল রত্ন সিংহাসন।
মণি মুক্তা প্রবালাদি বিবধ গঠন ॥
পট্টাম্বর জাদশোপ বিচিত্র চামর।
চন্দ্রাতপ ঝলমল শোভিত উপর ॥
রত্নাসনে বসাইলা মধ্যেত গোবিন্দ।
চতুর্দ্দিগে সেবা করে পার্শ্বদ বৃন্দ ॥
মনের মানসে বিপ্র করে আরাধন।
রত্ন পাদ্য পাত্রে করায় পাদ প্রক্ষালন।
জবদুর্ব্বাক্ষত অর্ঘ্য করে সমর্পণ ॥
আচমনীয় স্নিগ্ধ জল মলয়জ গন্ধ।
শুভ্র পুষ্প ধুপ দীপ করিয়া প্রবন্ধ ॥
দিব্য মিষ্ট ভোজ্য দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছেনা।
পক্কাম্র রম্ভা ফল সিতা মিশ্রির পানা ॥
পুন পাদ্য পাত্রে দেয় আচমনীয় বারি।
পুন পাদ প্রক্ষালন করে নঞা ঝারি ॥
পুনশ্চ পালঙ্কে করে অপূর্ব্ব আসন।
তাহে বসাইঞা করে তাম্বুল অর্পণ ॥
চামর লইঞা বায়ু করে শ্যাম অঙ্গে।
কৃষ্ণ পার্শ্বদ দাস অনুগত সঙ্গে ॥
অগুরু কুঙ্কুম গন্ধ কর্পুর মিশাল।
শ্রীঅঙ্গে বিলেপন দেয় কণ্ঠমাল ॥
শ্বেত ছত্র বিভূষণ চরণাদি ক্রমে।
নানা আভরণ দেয় জি সাজে যেখানে ॥
চরণে নুপুর বঙ্ক করে সমর্পণ।
কটিতে কিঙ্কিণী আদি পীত বসন ॥
বক্ষে হার কৌস্তভ মণি কর্ণেত কুণ্ডল।
তাড়বলয়া হাতে অঙ্গুরি ঝলমল ॥
অলক তিলক ভালে চন্দনের বিন্দু।
ময়ুর শিখণ্ড চুড়া শরত কালের চন্দ্র ॥
সেবা করি মানসিক করয়ে দর্শন।
নব জলধর তনু চিক্কণ বরণ ॥
দর্পণ অর্পণ পুন করে লঞা দেয়।
পাদুকা যুগল নিজ হাতে করি নেয় ॥
তৎপরে করয়ে প্রভুর পাদ সম্বাহন।
বিচিত্র মন্দির মধ্যে চিন্তয়ে শয়ন ॥
এই রূপে করে সেবা সেই দ্বিজবর।
সেবা সমাধিঞা পুন চলে নিজ ঘর ॥
এইরূপ মানস সেবা করে দিনে দিনে।
মহাসুখে থাকে বিপ্র দুস্থ নাহি জানে ॥

এক দিনের তাহে শুন অপূর্ব্ব কথন।
সমাধিস্থ হৈঞা করে মানসসেবন ॥
সঘৃত পরমান্ন মনে করিলা রন্ধন।
সুবর্ণনির্ম্মিত পাত্রে করিল বেশন ॥
কৃষ্ণে সমর্পণ কৈল আনন্দিত হৈঞা।
হস্তে ধরি স্বর্ণ পাত্র ঊর্দ্ধ করিঞা ॥
উষ্ম হয় পাছে তাঁরি অঙ্গুল তাহে দিল।
মানসে পরমান্ন সেই উষ্ম লাগিল ॥
উষ্মান্ন প্রভূকে দিল আধ ক্ষেপ ক'রে।
সমাধি হইল ভঙ্গ ভাবিত অন্তরে ॥
বাহিরেহ অঙ্গুষ্ঠ দগ্ধ হৈঞাছে তাহার।
মানস সেবাতে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট অপার ॥
সেই বিপ্র স্বদেহে পাইল কৃষ্ণ ধাম।
বাক্য মন অগোচর হয় যেই স্থান ॥
যথা ॥
মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিংমুদা।
পরে বাঙ্মনসাগম্যং তংসাক্ষাৎ প্রতি-
পোদিরে ॥ ৪৬ ॥

অথ দাস্যং ॥
দাস্য ভাব হয় তাহে দ্বিবিধ লক্ষণ।
কিংকর দাস্য আর দাস্যে কর্ম্মার্পণ ॥
তত্র কিঙ্কর দাস্যং ॥
যার চেষ্টা কায়মন বাক্যেন্দ্রিয় গণে।
নিরবধি চেষ্টা হয় কৃষ্ণ দাস্য কম্মে ॥
তত্র কর্ম্মাপন দাস্যং ॥
স্বাভাবিক কর্ম্ম জপ ধ্যান পূজা আদি
কৃষ্ণে সমর্পণ হয় সেহ দাস্য বিধি ॥
যথা ॥
দাস্যং কর্ম্মাপনং তস্য কৈঙ্কর্য্যমপি
সর্ব্বথা ॥৪৭॥

অথ সখ্যং ॥
সখ্যং দ্বিবিধং বিশ্বাস সখ্যং মিত্র
সখ্যঞ্চ ॥
বিশ্বাসং যথা ॥
দ্রৌপদীর সখ্যতা কৃষ্ণে বিশ্বাসরূপে
অতি।
কৃষ্ণভক্ত না হয় নষ্ট এই কথা শ্রুতি ॥
ইতি চিন্তি দ্রৌপদী প্রাণ করিলা
ধারণা।
দুর্যোধনের সহিলেন অশেষ গঞ্জনা ॥
মহাভারতে ॥
প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ
প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্
সংধারয়াম্যহং ॥
মিত্র সখ্যং যথা ॥
পরিচারক রূপে নিকটে করে স্থিতি।
কৃষ্ণ মোর বন্ধু হবে হেন যার মতি ॥
নিকটে শয়ন করে শংকা নাহি চিতে।
ব্যবহার করিতে চায় বন্ধুর পিরিতে ॥
মিত্র সখ্য হয় ইথি সিদ্ধ দুই পথে।
অতএব লেখিলে বিধি রাগ মতে ॥
যথা ॥
পরিচর্য্যা রতা কেচিৎ প্রাসাদেষু চ
সেবতে।
মনুষ্যমিব তদ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুং চ বন্ধুবৎ ॥
ইতি ॥—
যথা রাগ রাগানুগাঙ্গতাস্যস্যাদ্বিধি
মার্গানপেক্ষণাৎ।
মার্গদ্বয়েন চৈতেন সাধ্যা সখ্যরতির্ম্মতা
॥৪৮॥

অথ আত্মনিবেদনং ॥

আত্ম নিবেদনং দ্বিবিধং দেহীসমর্পনং দেহসমর্পনঞ্চ ॥

তত্র দেহী যথা ॥

বাক্য মন দেহাদিতে যে কর্ম্ম করিবে।
সব কৃষ্ণ পাদপদ্মে অর্পন করিবে ॥

তত্র দেহ সমর্পনং যথা ॥

নিজ দেহ সমর্পন করয়ে যে জন।
তার দেহ রক্ষা করে প্রভু সনাতন ॥
প্রাণ আরো সুখ দুঃখ দারা ধন গৃহ।
গুরু পাদাশ্রয় কালে সমর্পিল দেহ ॥
কৃষ্ণের হইল দেহ ভার লাগে তাঁরে।
রক্ষা করেন কৃষ্ণ সর্ব্বত্র ভক্তেরে ॥
নিজ দেহের রক্ষা হেতু ভক্তের চিন্তা নাঞি।
আপনার বলি কৃষ্ণ রাখেন সর্ব্ব ঠাঞি ॥
তার সাক্ষি প্রহ্লাদ অম্বুরাশ বিভীষণ।
সর্ব্বত্রে করিলা রক্ষা শাস্ত্রে বিবরণ ॥
বিক্রয় করিঞা পশুর তত্ত্ব নাহি লয়।
যে লয়ে কিনিঞা পশু তাহার ভার হয় ॥
তৈছে দেহ কৃষ্ণার্পন করে যেবা জন।
তারে রক্ষা করে কৃষ্ণ বলিঞা আপন ॥

যথা ভক্তি বিবেকে ॥

চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথাপয়নহরৌ দেহং বিরমেদস্যরক্ষণাৎ ॥ ৪৯ ॥

অথ নিজ প্রিয়োপহরণং ॥

আত্ম প্রিয় মিষ্ট যেবা সকল হইতে।
সেই দ্রব্য ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতে ॥
কৃষ্ণার্পন করি করে ভক্তগণে দান।
কৃষ্ণ প্রীতে সেই দ্রব্য অগণিত পান ॥

যথা একাদশে শ্রীকৃষ্ণঃ ॥

যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ তত্তদিত্যাদি ॥

এবং গীতায়াং ॥

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ॥
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥ ৫০ ইতি কর্ম্মার্পণং ॥

অথ কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টিতং।

লৌকিক বৈদিক ক্রিয়া শাস্ত্র মত যত।
ভক্তি অনুকূলে ক্রিয়া করিবে বিধি মত ৫১॥

অথ শরণাপত্তিঃ ॥

শরণাপত্তি লইবে শ্রীকৃষ্ণ চরণে।
কৃষ্ণদাস হই আমি কায় বাক্য মনে ॥

যথা ॥

তবাস্মীতি বদন্বাচা তথৈব মনসা বদন্।
তৎ স্থানমাশ্রিত স্তন্বামোদতে শরণাগতঃ ॥৫২॥

অথ তুলসী সেবনং ॥ তত্র তন্মাহাত্ম্যং স্কান্দে।

তুলসী দর্শন মাত্রে অশেষ পাপ নাশে।
দেহ পবিত্র হয় তুলসীর পরসে ॥
তুলসী বন্দনা কৈলে রোগের বিনাশ।
সিঞ্চিত তুলসী দেখি যম পায় ত্রাস ॥
তুলসীর বৃক্ষ আনি যে করে রোপন।
বিষ্ণুপদ গতি হয় করিলে সেঁচন ॥

তুলসীর পত্রে পূজা করে জনার্দ্দন।
তাহার বিমুক্ত হয় ফল না যায় কথন॥
স্কান্দে॥
যা দৃষ্টা নিখিলাঘ সংঘ সমনী স্পৃষ্টা
বপুঃ পাবনী।
রোগানামপি বন্দিতানিবসনা সিক্তা-
স্তক প্রাসনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়নী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য,
সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তি ফলদাতস্যৈ
তুলসৈ নমঃ॥
নবধা ভক্তি ক্রমে সেবা তুলসীর করিবে
তুলসীর নাম কথা শ্রবণে শুনিবে॥
তুলসী তুলসী নাম করিবে কীর্ত্তন।
তুলসী দেবীর মূর্ত্তি করিবে স্মরণ॥
বৃক্ষ সেবা পূজন করিবে শাস্ত্র মতে।
প্রদক্ষিণ বন্দনা স্তুতি ভক্তিভাব-
রিতে॥৫৩॥
অথ শাস্ত্রস্য॥
শাস্ত্র শব্দে ইথি কহি ভক্তি গ্রন্থ প্রীত।
বৈষ্ণব শাস্ত্রে সদা করিবে পিরিতি॥
যথা শ্রীমতঃ॥
শাস্ত্রমত্র সমাখ্যাতং সদ্ভক্তি প্রতি-
বোধকং॥
বৈষ্ণব শাস্ত্র পড়ে শুনে করায় শ্রবণ॥
কৃষ্ণ প্রসন্ন তাকে সফল জীবন॥
স্কান্দে॥
বৈষ্ণবাণি তু শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ
ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণ
প্রসীদতি॥

তত্র সর্ব্ব শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীভাগবত
গ্রন্থ॥
যথা
সর্ব্ব বেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে
তৎ কথামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ
ক্বচিৎ॥৫৪॥
অথ মথুরায়া॥
ত্রৈলোক্যের তীর্থ রহে মথুরা মণ্ডলে।
পরানন্দক্ষম হয় মথুরা বাস কৈলে॥
ব্রহ্মাণ্ডে॥
ত্রৈলোক্যবর্ত্তি তীর্থানাং সেবনাদ্দু-
র্লভাহি যা।
পরমানন্দ ময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শ
মাত্রতঃ॥৫৫॥
অথ বৈষ্ণবানাং॥
সর্ব্ব আরাধনা পর কৃষ্ণ আরাধন।
তাহা হৈতে বড় হয় ভক্তের সেবন॥
কৃষ্ণ পূজে আর না পূজয়ে ভক্তগণ।
দেবীয় না পূজে সেই মূঢ় অচেতন॥
যথা পাদ্মে॥
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং
পরং।
ততঃ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চনং॥
অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়ন্তি
যে ইত্যাদিঃ॥
প্রথমে॥
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ
শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শন স্পর্শ পাদ শৌচাসনা
দিভিঃ॥৫৬॥

যথা বৈভব মহোৎসবঃ ॥
যেমত বিভব নিজ সামর্থ্যানুসারে।
কৃষ্ণ যাত্রা মহোৎসব কৃষ্ণ নিয়ে করে॥
কৃষ্ণ লোকে মহোৎসব তার নিত্য হয়।
পাদ্মায় উত্তর খণ্ডে এই কথা কয় ॥৫৭॥
অথ উর্জ্জাদরঃ ॥
ভক্তবৎসল কৃষ্ণ অভীষ্ট ফল দেন।
ভক্তবৎসল তৈছে কার্ত্তিকী ব্রত হন ॥
যথা পাদ্মে ॥
যথা দামোদরো ভক্তবৎসলোবিদিতো জনৈঃ।
তস্যায়ং তাদৃশোমাস স্বল্পমপ্যুরু কারকঃ ॥৫৮॥
অথ জন্ম যাত্রা ॥
ভাদ্রে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি রোহিনি সহিতে।
ব্রত বিধি উপবাস করিবে যত্নতে॥৫৯॥
শ্রীমূর্ত্তিপাদ সেবনে প্রীতিঃ ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণসেবা পরায়ন জনা।
তারে কৃষ্ণ মুক্তি ছাড়ি দেন ভক্তি প্রেমা ॥
যথাদিপুরাণে কৃষ্ণবাক্যং ॥
মম নাম সদা গ্রাহী মম সেবা প্রিয়ঃ সদা।
ভক্তি স্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন চ মুক্তিঃ কদাচ নঃ ॥
শ্রীভাগবতাস্বাদঃ ॥
এই ত জগতে যত রসিক ভক্তগণ।
ভাগবত রসামৃত সদা কর পান ॥
বেদ কল্পতরুর ফল ত্রাণ ভাগবত।
শুকদেব মুখ হৈতে সে ফল গণিত ॥
অমৃত দ্রব সংযুক্ত রসময় ফল।
তাহা পানে হয় জানি কৃষ্ণ প্রেম বল ॥
আজন্ম প্রভৃতি পান কর পুনঃ পুনঃ।
ত্যগষ্টি রহিত ফল অমৃত দ্রব যেন ॥
যথা প্রথমে ॥
নিগমকল্পতরোর্গলিতং শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতং।
পিবত ভাগবত রসমান যং মুহুরহো রসিকাস্থ বিভাবুকাঃ ॥৬১ ॥
অথ সজাতীয় ভক্তসঙ্গঃ ॥
কৃষ্ণাসক্ত চিত্ত যেবা প্রেমী ভক্তগণ।
তাঁর সঙ্গে সঙ্গ এক নব মাত্র হন ॥
তার কাছে স্বর্গ আদি কিম্বা মুক্তি গতি।
তুলনা না করি তার এই ত যুকতি ॥
নিমিষের ত্রিভাগকাল তারে নব কন।
'তুলয়ামি নবেনাপি' ইত্যাদি বচন ॥
চতুর্থে ॥
তুলয়াম নবেনাপি ন স্বগং ন পুনর্ভবং।
ভগবৎ সঙ্গি সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥৬২॥
অথ নাম সংকীর্ত্তনং ॥
সর্ব্বত্রে অভয় বাঞ্ছা লাগি যার মন।
সে করুক সর্ব্বদা হরি নাম সংকীর্ত্তন ॥
দ্বিতীয়ে এতন্নির্বিণ্যমানানামিচ্ছতা মকুতোভয়ং।
যোগিনাং নৃপনির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনং ॥
পাদ্মে চ।

যেন জন্মসহস্রেন বাসুদেব নিসেবিতঃ।
তন্মুখে হরি নামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥
আদি পুরাণে।
'গীত্বা তু মম নামানি বিচরেন্মম
সন্নিধৌ।
ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রিতোহং তস্য
চার্জুনঃ॥ ৬৩॥
অথ মথুরামণ্ডলে স্থিতি॥
মথুরা মণ্ডলে করে এক দিন বসতি।
অবশ্য তাহার হয় গোবিন্দে ভকতি॥
যথা পাদ্মে।
অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেক নিবাসেন হরৌভক্তিঃ
প্রজায়তে॥৬৪॥
চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ শাস্ত্র নিরূপণ।
মহিমা ধিক্য শ্রদ্ধা দ্বার দেখি যে পঞ্চম॥
তে কারণে পুনরুক্তি আধিক্যে বর্ণনা।
শ্রীমূর্ত্তি দর্শন শ্রীভাগবত মহিমা॥
দ্বাদশ স্কন্ধ মধ্যে দশম প্রস্তুতি।
শস্কলীতাঃ সপদি দশম স্কন্ধপত্যা ইতি॥
কৃষ্ণ ভক্ত প্রস্তুতি নাম মাহাত্ম্য।
মথুরা মণ্ডলে বাস পঞ্চ পূনরুক্তি॥
যথা॥
অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ব্বং বিলিখিতস্য চ
নিখিল-শ্রৈষ্ঠ বোধাম পুনরপ্য এসং
কথনং শনং॥' ইতি॥
চতুঃষষ্ঠী ভক্তি অঙ্গ সাধন প্রকরণে
শ্রীযুতের অনুসারে করিল বর্ণনে॥
কোন অঙ্গের কোন্ স্থলে ফলশ্রুতি
দেখি।
সাধারণ জনের প্রবৃত্তি হেতু লিখি॥
চতুর্ব্বর্গ ফল শুনি সাধারণ জন।
ভক্তি অঙ্গ সাধনে প্রবর্ত্ত আসি হন॥
কৃষ্ণ কথা লীলাগুণ শ্রবণ স্মরণে।
রতি উপজয়ে আসি শ্রীকৃষ্ণ সাধনে॥
সেই সব ফল তার হয় জানি দূরে।
কৃষ্ণ কর্ম্মে রতি আসি হয় জানি পরে॥
মুক্ষ ফল কৃষ্ণে রতি জানিহ কারণ।
ফল শ্রুতি বহির্মুখের প্রবৃত্তি লক্ষণ॥
তত্ত্ব গুণ শ্রবণে আগে শ্রদ্ধা আসি
হয়।
শ্রদ্ধা হৈলে রতি তাহে উপজয়॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ি শ্রদ্ধা রতি ভক্তি হন।
অতএব মুক্ষ ফল কৃষ্ণে রতি কন॥
যথা—
কেষাঞ্চিৎ ক্কচিদঙ্গানাং যৎক্ষুদ্রং
শ্রুয়তে ফলং।
বহির্মুখ প্রবৃত্ত্যৈ তৎ কিন্তু মুখ্য
ফলং রতিঃ॥
শ্রীভাগবতে—
সত্যং প্রসঙ্গান্মম বীর্জ সম্বিদো ভবন্তি
হৃতকর্ণবংসায়ন্যাঃ কথাঃ।
তজ্জো সনাদাশ্ব পবর্গ বর্ত্তানি শ্রদ্ধারংতি
ভক্তিরংনুক্রমিষ্যতে॥
জ্ঞান আরং বৈরাগ্যায়াঙ্গ ভক্ত্যঙ্গনাহি
হি হন।
প্রথমে স্বল্প মাত্র উপযুক্ত কেহু কন॥
জ্ঞান ইত্তিক হে ঐক্য ব্রহ্ম বিষয় জ্ঞান।
ব্রহ্ম জ্ঞানোপযুক্ত বৈরাগ্য আখ্যান॥
ক্রমশঃ—

শ্রীশ্রীকুন্তীদেবীর স্তব। (৭)

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃপুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরং ॥

উচ্চবংশে জন্মলাভ করে যেই জন।
অথবা ঐশ্বর্য্য যার আছে অতুলন ॥
কিম্বা বিদ্যাখ্যাতি যার আছে সমুজ্জল,
অহঙ্কার তার শুধু বর্দ্ধিত কেবল
তোমার মধুর নাম, উচ্চারণে শক্তিমান,
হে কৃষ্ণ তাহারা নাহি হয় কদাচন,
অকিঞ্চন যারা, তুমি তাহাদেরি ধন ॥

নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্ত গুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥

প্রাকৃত বস্তুর লেশবিহীন যাহারা,
পূর্ণ চিদানন্দ বস্তু লভয়ে তাহারা,
তাহারা একান্ত ভক্ত, তব পদ-অনুরক্ত
অতি প্রেমাস্পদ ধন তাহারা তোমার
গোপনে তাদের রক্ষা কর অনিবার।
ভক্ত-অনুরক্ত চিত, নহে গুণবৃত্তি যুত
স্বরূপেতে তুমি শান্ত, তুমি আত্মারাম,
কৈবল্যের পতি তুমি তোমারে প্রনাম!

মন্যে ত্বাং কালমীশানমনাদিনিধনং বিভুং।
সমং চরন্তং সর্ব্বত্র ভূতানাং যন্মিথঃ কলিঃ ॥

দেবকীর পুত্র তুমি নহ কদাচন।
কাল তুমি অন্তর্যামীরূপে অনুক্ষণ ॥
তুমিই ঈশান বাহিরেতে অধিষ্ঠান।
নিয়মিত করিতেছ সর্ব্বভূত গ্রাম ॥
নানাভাবে ভূতচয়, কলহেতে রত হয়,
বৈচিত্র্যের অন্তরালে সর্ব্বভূতে তুমি
সাম্যরূপে অধিষ্ঠিত আছ বিশ্বস্বামী ॥

অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী।

১। রস-ভক্তি-লহরী।

এই নাতিবৃহৎ ভক্তিগ্রন্থখানি আশানুরূপ প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। আজিও মুদ্রাযন্ত্র, ইহাকে কাষ্ঠচাপের নিভৃত নিকেতন হইতে নিষ্কাসিত করিয়া পিপাসু ও ভক্ত পাঠকগণের তৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ হইল না।

শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে ৩৮৬ পৃষ্ঠায় (৩য় সং) এইরূপ লিখিত আছে—"পূর্ব্বে উল্লিখিত পুস্তক গুলি ছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ "রসভক্তিলহরী" নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক বাঙ্গালায় রচনা করেন; ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নায়িকার লক্ষণ বর্ণিত আছে। (টীকা—এই পুস্তকের হস্তলিখিত একখানি প্রাচীন পুঁথি আমার নিকট আছে; অন্য কোথাও আছে বলিয়া জানি না।)"

আমরা সম্প্রতি "রসভক্তিলহরী" নামক যে গ্রন্থ খানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আনুমাণিক দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রাচীন পুঁথির আকারে লিখিত এবং ১৬ পত্র বা ৩১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; শ্লোক সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ২৫০। ইহার রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নহেন—কবিরাজ গোস্বামীর পরবর্ত্তী কালের লেখক, নাম—রাধাকৃষ্ণ দাস। গ্রন্থারম্ভে বন্দনা প্রসঙ্গে, ইনি কবিরাজ গোস্বামীর এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন—

জয় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাঞী।
মো দীনেরে উদ্ধারিতে আর কেহ নাই ॥

এতদ্ব্যতীত, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় যে নিরবচ্ছিন্নভাবে নায়ক নায়িকার লক্ষণ বর্ণন নহে, তাহাও আমরা এই মাত্র দেখিতে পাইব। সুতরাং, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থোক্ত "রসভক্তি লহরী" এবং আমাদের আবিষ্কৃত গ্রন্থ অভিন্ন কিনা, তাহা নিসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের শীর্ষোক্ত গ্রন্থ যে এ যাবৎকাল অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিতেছে না।

গ্রন্থকার :—গ্রন্থের সর্ব্বত্রই এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়—

শ্রীপদ্ম মঞ্জরী পাদ পদ্ম করি আশ।
চরণে শরণ মাগে রাধাকৃষ্ণ দাস ॥

এই ভণিতা ব্যতীত গ্রন্থ মধ্যে কুত্রাপি গ্রন্থকারের বিস্তৃতভাবে আত্মপরিচয় নাই। তবে গ্রন্থারম্ভে গুরুবন্দনা প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

শ্রীপাট অম্বিকা বন্দো হঞা প্রণিপাত।
যেখানে বিরাজে প্রভু অখিলের নাথ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত গোসাঞী।
যাঁর বস হঞাছিল চৈতন্য নিতাই ॥
শ্রীনিমাঞীচাঁদ ঠাকুর প্রভু যে আমার।
জন্মে জন্মে বিকাইল চরণে তোমার ॥
কৃপাকরি মোরে প্রভু মন্ত্রদান কৈল।
সেই মন্ত্রে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ দেখাইল ॥

ইহা হইতে এই মাত্র জানা যাইতেছে যে যথায়, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনুচর গৌরীদাস পণ্ডিত, চৈতন্য বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই অম্বিকা গ্রাম নিবাসী নিমাইচাঁদ ঠাকুর, গ্রন্থকারের কর্ণধার গুরু ছিলেন। এবং তাহার শিক্ষাগুরু ছিলেন—পীতাম্বর দাস বৈরাগী গোসাঞী। তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

শিক্ষাগুরু বন্দো মোর আলম্বন কর্ত্তা,
যাঁহার কৃপাতে হৈনু কৃষ্ণ তত্ত্ব জ্ঞাতা ॥
হৃদয়ে যতেক অন্ধকার ছিল মোর।
তাহা নাশি দীপ্তিমান করিল উজ্জোর ॥
হৃদি মধ্যে তিহোঁ মোর বসাই দর্পণ।
যে দর্পণে করে কৃষ্ণ প্রেম আকর্ষণ ॥
শিক্ষা গুরু শ্রীপীতাম্বর বৈরাগী গোসাঞী।
যাঁর কৃপালেশে মোর এতেক বড়াই ॥
তাঁর পাদ পদ্ম বন্দো মস্তক উপরি।
তেঁহো মোরে শিক্ষা দিল বৈরাগ্য মাধুরী ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলারস প্রেম তত্ত্ব আর।
ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিল করিয়া বিস্তার ॥

গ্রন্থকার এইরূপ ভাবে ভক্তি তত্ত্বে রীতিমত ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও গ্রন্থমধ্যে প্রায়ই এইরূপ ভাবে বৈষ্ণবী-বিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন—

(১) সাধু মহন্তের মুখে যে কৈনু শ্রবণ।
সূত্রে করি এই তত্ত্ব করিয়ে রচন॥
(২) আমি ক্ষুদ্র জীব তাহা কি কহিতে জানি।
সাধু মহান্তের মুখে যেই কথা শুনি॥
সংক্ষেপে কহিল ব্রজের মহিমা কথন। ইত্যাদি

"রসভক্তি লহরী।" গ্রন্থে, 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু', 'উজ্জ্বল নীলমণি', 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রামৃত নাটক', 'চম্পক-কলিকা', 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত', 'চৈতন্য-চরিতামৃত', প্রভৃতি গোস্বামী গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমরা আপাততঃ, গ্রন্থকারের অন্য কোনরূপ পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আলোচ্য গ্রন্থে, রচনা বা প্রতিলিপির কাল-নির্দ্দেশ নাই।

গ্রন্থ পরিচয়—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "রসভক্তি-লহরী" গ্রন্থের আকার বৃহৎ নহে; পরন্ত, সমপ্রতিপাদ্য মূলক গোস্বামী গ্রন্থ "ভক্তি রসামৃত সিন্ধু"র তুলনায়, বিরাট 'সিন্ধুর' একটি ক্ষুদ্রায়ত 'লহরী' মাত্র। সুতরাং গ্রন্থ খানিতে 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল-নীলমণি' প্রভৃতি ভক্তিরস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত কয়েকটি মাত্র প্রসঙ্গের ভাষা-কথায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতীত অপর কিছু আশা করা সম্ভবপর নহে।

গ্রন্থখানি, সর্ব্বসমেত ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ের বিষয়-নির্দ্দেশ এইরূপ—

প্রথম অধ্যায়—গুরু, বৈষ্ণব, গোস্বামী প্রভৃতির বন্দনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রবর্ত্ত, সাধক ও সিদ্ধ দশায় ভক্তগণের আশ্রয় ও রাগ (আশ্রয়, আলম্বন ও উদ্দীপন) নির্ণয় এবং দেশ কাল ও পাত্র বিচার। শান্ত দাস্য সখ্যাদি পঞ্চ ভাবের পাত্র ও গুণ বর্ণন। সমর্থা সমঞ্জসাদি রতি নির্দ্দেশ ও তৎসমুদয়ের গুণ বিচার।

তৃতীয় অধ্যায়—রাগ, ভক্তি ও প্রেম। রাগাত্মিকা মুখ্য ও গৌণ এবং কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা পরিচয়।

চতুর্থ অধ্যায়—শব্দ গন্ধাদি পঞ্চ গুণ এবং মাদন স্তম্ভনাদি পঞ্চবাণ।

গৌর-লীলা মাহাত্ম্য—রাধাভাব। প্রকট ও অপ্রকট লীলা। গৌর লীলার কাল নির্দ্দেশ।

পঞ্চম অধ্যায়—নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের একত্ব নিরূপণ; নরলীলা—গৌর-লীলার কারণ—বৃন্দাবন মহিমা।

অভিসারিকা, বাসকসজ্জা ইত্যাদি অষ্টরস; অষ্টরস দ্বিবিধ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ প্রত্যেকে চতুর্বিধ। অষ্ট রসের লক্ষণ। অষ্ট রসের অষ্ট সখী নির্দ্দেশ।

ষষ্ঠ অধ্যায় —মন্ত্রের মহত্ত্ব; কামগায়ত্রী তত্ত্ব। ২৪॥ অক্ষর চন্দ্রের নির্ণয়; কাম বীজের বিচার। ২৫॥ অক্ষরচন্দ্রের নির্ণয়, অষ্ট পদ্ম লক্ষণ ও সংস্থান নির্দ্দেশ। অনুরাগের মহত্ত্ব; বর্ণ বস্ত্র ও বয়ঃসন্ধি তত্ত্ব। সমাপ্তি।

গ্রন্থকারের স্বাধীন মত—গ্রন্থকার, পঞ্চম অধ্যায়ে নরলীলার কারণ-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে এইরূপ ভাবে স্বীয় মত পরিব্যক্ত করিয়াছেন—

নরলীলা কৈল প্রভু কিসের কারণ।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুনহ বচন।।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষীং দেহমাশ্রিত ইত্যাদি।

ভক্তে অনুগ্রহ করি নর দেহ ধরি।
নরক্রীড়া নররস আস্বাদন করি।।
ভজহ তাদৃশী ক্রীড়া মানুষ যেমন।
যাহা শুনি সর্ব্বজন ভজয়ে চরণ।।
এইত কহিল শ্লোকের অর্থের বিচার।
ইহাতে সন্দেহ কিছু হইল আমার॥
গোসাঞী সকলে কহে রসের কারণ।
নরদেহ হৈল প্রভু শুন সর্ব্ব জন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—শৃঙ্গার রস সর্ব্বস্ব ইত্যাদি।

সর্ব্বরস শ্রেষ্ঠ কহি শৃঙ্গার-রস সার।
যাহা আস্বাদিতে কৃষ্ণ নরের আকার॥
শিখি-পিঞ্ছ-বিভূষণ মস্তক উপরে।
রস আস্বাদিতে কৃষ্ণ নরদেহ ধরে॥
ভুবনাশ্রয় অর্থ কহি ভূবি বৃন্দাবন
যাহাতে করিল নর লীলা আস্বাদন।।
নর তত্ত্ব ভক্তে দিল আস্বাদ করিতে।
আপনে আস্বাদে আর ভক্তগণ সাথে॥
অনুগ্রহ করি দিল সর্ব্বভক্তগণে।
অনুগ্রহ শব্দের এই কহিল কারণে।।

অনুগ্রহ তত্ত্ব লিখন শ্রীভাগবতে।
ব্যক্ত করি ব্যাস গোসাঞী না কহিল তত্ত্বে
নরদেহ ধরি কৈল রস আস্বাদন।
ব্যক্ত করি না কহিলা মহিমা কারণ ॥
যদি কহে রসলাগি নরদেহ ধরে।
গোপনীয় রস কৃষ্ণের হয়েত বিস্তারে ॥
ভক্তে অনুগ্রহ শব্দ করিল বাখান।
এই হেতু নিত্য-লীলা রহিল গোপন ॥
নর নহিলে নহে পরকীয়া রস।
পর নহিলে নহে রসের উল্লাস ॥
এই হেতু কৃষ্ণচন্দ্র নর দেহ ধরি।
নরক্রিয়া নররস আস্বাদন করি ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় রস না কহে প্রকাশ।
অতএব অনুগ্রহ শ্লোকের আভাষ ॥
এই ত কহিল নরলীলার কারণ।

আবার, গৌরাঙ্গ-লীলা প্রসঙ্গে কবি, লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মত এইরূপ সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
নবদ্বীপে শচী গৃহ শুদ্ধ দুগ্ধ-সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥
উন্নত উজ্জ্বলরস করিল প্রচার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ লীলার মাধুরী।
রাধিকার স্বমাধুর্য্য নিরূপণ করি ॥
ভক্তিতত্ত্ব ভাবতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব আর।
লীলাতত্ত্ব রসতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥
পরম করুণা করি দিল ভক্তগণে।
পরম করুণ কৃষ্ণ বলি এ কারণে ॥

গ্রন্থশেষে, কবি 'কৃষ্ণপ্রেমরসতত্ত্ব' ও 'অনুরাগের মহত্ত্ব' সম্বন্ধে যে কয়টি

শ্লোক রচনা করিয়াছেন, সহৃদয় পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন বলিয়া এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। ব্রজনারীগণের ব্যাকুলতা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন।

এই ত কহিল কৃষ্ণ সৌরভ মাধুরী।
যার গন্ধে মাতোয়ান হৈলা ব্রজনারী।
ব্রজনারী কৃষ্ণগন্ধে অস্থির হইয়া।
রহিতে না পারে প্রেমে আকুল হইয়া॥
হা কৃষ্ণ পরাণ পতি দর্শন না পাঞা।
মাতোয়ান হৈল নাশা গন্ধের লাগিয়া॥
কৃষ্ণ কথামৃত সুধা শ্রবণের আশে।
সদাই ফিরয়ে কর্ণ তাহার উদ্দেশে॥
শ্রীনন্দ নন্দন রূপ দর্শন না পাঞা।
সদাই ফিরয়ে আঁখি চাতকিনী হঞা॥
শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত পান করণের আশে।
অধর ব্যাকুল হৈল যাহার লালসে॥
শ্রীকৃষ্ণের দাস্য সেবা করিবার লাগি।
সেবার কারণে হস্ত অতি অনুরাগী॥
শ্রীনন্দ নন্দন অঙ্গ পরশ লাগিয়া।
গুমরি গুমরি উঠে অনুরাগী হিয়া॥
চরণ চঞ্চল সদা কৃষ্ণ দিকে ধায়।
কোথা গেলে পাব প্রাণনাথ শ্যামরায়॥
এই ত কহিল কৃষ্ণ প্রেমরস তত্ত্ব।
যার লোভে ব্রজনারী অনুরাগে মত্ত॥

ব্রজনারীগণের এইরূপ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়া কবি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

শ্রীরাধার অঙ্গ গন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অস্থিরে।
দরশন লাগি সদা অনুরাগে ফিরে॥
গাভীর রাখাল হঞা আসি নন্দ ঘরে।
শ্রীরাধার সঙ্গে রস ক্রীড়া করিবারে॥

রাধা আলিঙ্গন লাগি হস্ত অনুরাগী।
অধর তৃষিত যেন মধুপান লাগি ॥
চরণ চঞ্চল সদা ফিরে স্থানে স্থানে।
কোথা গেলে পাব সেই রাধিকা দর্শনে ॥
এইত কহিল অনুরাগের মহত্ত্ব।

ভক্ত ভগবানের পরস্পরের প্রতি এই বিচিত্র আকর্ষণের মহনীয় সমুজ্জ্বল চিত্র দর্শন করিয়া কোন ভগবদ্ভক্তের হৃদয় আশায় উৎফুল্ল হইয়া না উঠিবে?

এই গ্রন্থখানি এবং অপরাপর অনেকগুলি প্রাচীন অপ্রকাশিতনামা গ্রন্থ, শ্রীমান বহুবল্লভ দাসের যত্ন ও চেষ্টায় সম্প্রতি প্রাপ্ত হইয়াছি। যথা সময়ে, এই সকল এবং অপরাপর অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থের পরিচয় পাঠক-বর্গের সমীপে উপস্থিত করিতে যত্নপর হইব।

শ্রীশিবরতন মিত্র।
বীরভূম।

বেদনার মাঝে সান্ত্বনা তুমি
শান্তি দুখের মাঝারে,
নিশার আঁধারে বালারুণ তুমি,
তবুত চিনিনা তোমারে!
তুমি প্রাণ গলা নয়নের জল
বড় দুখে, বড় সুখে সম্বল,
বালকের মুখে হাসির অমিয়া,
জুড়াতে তাপিত জনারে;
তবু, অন্ধ নয়ন দেখেনা ত তোমা,
তবু ঘিরে আছ আমারে!
আমি, "সুখ". "সুখ" বলে' মরিচিকা লাগি
ওগো নিতি সুখ-সলিল তেয়াগি
জুড়াতে জীবন জ্বালা কিনে আনি;
আঁখি মুদে 'ঘুরি' আঁধারে!

জগত ঘুরিয়া হতাশেতে মরি,
না জানি খুঁজিয়া তাহারে।
পতঙ্গ সম রূপের কাঙালী,
এ জীবন মম অনলেতে ঢালি',
আজ অভাগারে ওগো চিররূপ,
ডুবাও ওরূপ পাথারে,
তব, রূপ কণা হেরি, আঁখি যা'ক ভরি
আমি, ডুবে থাকি তারি মাঝারে!

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

শব্দব্রহ্ম

(ওঁকারের ক্রমবিকাশ)

২য় পরিচ্ছেদ।

দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ

দুইটী বিদ্যাই জ্ঞাতব্য প্রথম শব্দব্রহ্মবিদ্যা, অপর পরব্রহ্মবিদ্যা, প্রথমে শব্দব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে পর পরব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে স্থুলতঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডোত্থিত শব্দপ্রপঞ্চেরই সংক্ষিপ্ত ভাষা ওঁকার, এবং যাহা কিছু ভূত, যাহা বর্ত্তমান, এবং যাহা ভবিষ্যৎ, এমন কি যাহা এই ত্রিকালেরও অতীত, তৎসমস্তই এই ওঁকারের লীলা মাত্র, সুতরাং ইহা শাশ্বত।

ইহাতে আর একটী প্রশ্ন আমাদের মনে আসিতে পারে যে "যাহার উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশ আছে, যাহার উৎপত্তি নাই তাহার বিনাশ নাই, ইহাই জগতের সাধারণ নিয়ম। যদি তাহাই হয় তবে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও যখন এককালে উৎপত্তি হইয়াছে, আর কোনও না কোনও কালে যখন ইহার অবশ্যই লয় হইবে তখন ইহাও ত নশ্বর; সুতরাং এই সৃষ্ট অনিত্য বিশ্বপ্রপঞ্চ সমুদ্ভূত মহাশব্দ বা প্রণবই যে শাশ্বত হইবে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ অনিত্য হইতে কখনও নিত্য পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব কথাটী নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য।"

সৃষ্টবস্তু মাত্রেই অনিত্য ইহা ধ্রুব, সত্য, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত উৎপত্তিটী কার? সৃষ্ট পদার্থ কোনটা? নশ্বরই বা কে?

এতদ্বিষয়ে সাংখ্যকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"নাসতোরুৎপত্তি র্নচসতাং বিনাশঃ"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এই বাক্যের পুনরুল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবোনাভাবো বিদ্যতে সতঃ"।

যাহা নাই, তাহা কখনও হইতে পারে না, আর, যাহা আছে তাহার কখনও বিনাশ হয় না। ওই যে অনন্ত কোটী জীব-নিবহের আধারভূতা পর্ব্বত অরণ্য নদীনদ সমাকীর্ণা বসুন্ধরা, ওই যে উহার চারিদিকে বলয়াকারে পরিবেষ্টিত অপার মহাসাগর ওই যে চন্দ্র সূর্য্যগ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিত নীল আকাশ! ইহাদের সমস্তই ছিল, সমস্তই আছে, সমস্তই থাকিবে। ইহাদের একটীও আজ নূতন করিয়া সৃষ্টি হয় নাই, এই সমস্তই বিধাতা "যথা-পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" যেমন পূর্ব্বে ছিল ঠিক তেমনই করিয়া সৃজন করিয়াছেন; আর পরিণামেও ইহারা ঠিক তেমনই থাকিবে।

কথাটী শ্রুতি একটী সুন্দর উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতেছেন।

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ
বৃক্ষইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং।

যাহা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। যাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম আর নাই আর যাহা অপেক্ষা বৃহত্তমও নাই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অংশই সেই পরম পুরুষের দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। তিনি নিশ্চলভাবে অদ্বিতীয়রূপে বৃক্ষের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন।"

উপমাটী অতি সুন্দর দেওয়া হইয়াছে, "বৃক্ষইব" যেন একটী বৃক্ষের ন্যায়, এই যে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ চারিদিকে অগণ্য শাখা বিস্তার করিয়া বহুদূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অগণ্য পত্রে পুষ্পে ফলে পল্লবে সুশোভিত হইয়া কত শ্রান্ত মানব; কত পশু পক্ষীর আশ্রয়ণীয় হইয়াছে, এইটী অন্য কিছু নয়, বিকাশের পূর্ণতা প্রাপ্ত একটী সূক্ষ্ম অঙ্কুর মাত্র। ইহার বর্ত্তমান অবয়বটী সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কুররূপে কালে একটী ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, তাহাই কাল সহকারে ক্রমে বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আজ ঈদৃশ আকারে পরিণত হইয়াছে। ঈদৃশ মহাতরু অঙ্কুরাবস্থায় বীজের মধ্যে এরূপ সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত ছিল যে যাহা বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যক্ষ করা মানবের

সাধ্যাতীত ছিল। এবং যাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে এত দীর্ঘকালের আবশ্যক হইয়াছে। আবার বৃক্ষের অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত কর একটী ফলের মধ্যে আবার সেই বীজটী লুকাইয়া রহিয়াছে। যেটী বৃক্ষের মূলদেশে ছিল, বৃক্ষের উৎপত্তির পর যেটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া ছিলাম, সেটী আবার উহার অগ্রভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা ছিল শেষে, ঠিক তাহাই রহিয়া গেল, তাহার ত কোনও ক্ষতি হইল না! তবে এখন দেখ উৎপত্তি কার, বৃদ্ধি কার, বিনাশ কার, অঙ্কুরের না তার বিকাশের? প্রথম যাহা সূক্ষ্ম অব্যক্ত ছিল, শেষে তাহাই থাকিল এতদুভয়ের মধ্যভাগটীই কিয়ৎকালের জন্য ব্যক্ত হইয়া গেল মাত্র, যেন বৃক্ষটী বলিয়া গেল এই আমিই সেই অঙ্কুরের মধ্যে অবস্থিত ছিলাম।

তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

> "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
> অব্যক্তনিধনান্যেব।"

যাহা কিছু হইয়াছে তাহার আদি অব্যক্ত অন্তও অব্যক্ত, কেবল মধ্যভাগটীই ব্যক্ত।

এখন উৎপত্তি, বৃদ্ধি বা নাশ বলিলে দেখা যাইতেছে যাহা আদি বা অন্তাংশ, যাহা অব্যক্ত, যাহা কারণ, তাহার কিছুই বিকৃতি নাই, যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল; কেবল উৎপত্তি বা লয় হইল বিকাশের, মধ্যাংশের, ব্যক্তের বা কার্য্যের। এই যে বীজের মধ্যে অঙ্কুরের অবস্থান উহা অনন্ত কাল অবধি চলিয়া আসিতেছে। এই সামান্য বৃক্ষসম্বন্ধে বিধাতার যে নিয়ম বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধে ও ঠিক তাহাই। এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বা লয় বলিলে উহার বিকাশের উৎপত্তি বা লয় বুঝিতে হইবে, কিন্তু ইহার একমাত্র কারণ যে ত্রিগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতি, এবং তদধিষ্ঠিত পুরুষ বা সগুণব্রহ্ম তাহা চির-কাল অবিকৃত। আর এই বিশ্ব শব্দপ্রপঞ্চের সূক্ষ্ম স্বরূপ যে ওঁকার তাহাও সেই সগুণ ব্রহ্মের বাচকরূপে নিত্য বিদ্যমান। পুরাণ কর্ত্তা ঋষিগণও এই সূক্ষ্ম কারণ তত্ত্বটী অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহারা সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতিই বৃক্ষের বীজের ন্যায় সমগ্র কার্য্য-প্রপঞ্চের কারণ এবং সমুদ্রের ন্যায় অপরিচ্ছেদ্য বলিয়া তাহাকে "কারণ বারি" "কারণাব্ধি" বা "ক্ষীর সমুদ্র" প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। আর

নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ সেই কারণাব্ধি বা মূল প্রকৃতির একপ্রান্তে ব্রহ্মাণ্ডবৃক্ষের অঙ্কুরস্বরূপ নারায়ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রসুপ্ত রহিয়াছেন। অনন্ত-কাল অবধি বীজ ও অঙ্কুরের যে সম্বন্ধ প্রকৃতি বা কারণাব্ধির সহিত প্রসুপ্ত নারায়ণের ও সেই সম্বন্ধ। তাই অনন্ত নাগরূপী কাল, সমুদ্র ও নারায়ণের মধ্যে তাঁহার শয্যারূপে অবস্থিত থাকিয়া সেই সম্বন্ধটী বুঝাইয়া দিতেছে। অঙ্কুর যেমন আতপ জলাদি সংযোগে বীজের সহিত বৃক্ষরূপে পরিণত হয় তদ্রূপ অঙ্কুরস্বরূপ নারায়ণ নিজমায়া সহকারে বীজভূতা প্রকৃতি বা সেই কারণসমুদ্রের সহিত, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডাকারে পরিণত হইয়া থাকেন। ইহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—"প্রকৃতিং স্বাং অধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।" আবার সুপ্ত ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় হইলেও, তাহার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও, তাহার নিশ্বাস যেমন তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায় না, বরং সেই নিদ্রিত পুরুষকে চেতন বলিয়া বুঝাইয়া দেয় তদ্রূপ এই বিরাট শব্দপ্রপঞ্চের সূক্ষ্মস্বরূপ, কেবল অকার উকার ও মকার, বিশ্বের অঙ্কুর কারণাব্ধিশায়ী নারায়ণের নিশ্বাসের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন-ভাবে তাঁহার বাচকরূপে নিত্যবিদ্যমান থাকে। পরে যখন তিনি নিজ মায়ায় এই বিরাটব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হন, তৎসঙ্গে তাঁহার নিশ্বাস ও ক্রমে প্রকাশ-মান হইয়া নানা আকারে প্রপঞ্চিত হইতে থাকে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন।

এবং বা অরেঽস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিত মেতদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সাম-বেদোঽথর্ব্ববেদাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যুপ-ব্যাখ্যানানি ইত্যাদি।

এই ঋগ, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, আঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র ব্যাখ্যা প্রভৃতি যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই সেই মহাপুরুষের নিশ্বাস স্বরূপ।

নিশ্বাস যেমন সুপ্তজীবের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে এবং অবলীলা-ক্রমে প্রকাশিত হয় সেইরূপ পুরুষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিশ্বাস-স্বরূপ সূক্ষ্ম ওঁকারেরও অবলীলাক্রমে এই বিরাটরূপে প্রপঞ্চ হইয়াছে। পরি-শেষে আবার তাহাতেই পর্য্যবসিত হইবে। অতএব ওঁকারের ঈদৃশ বিকাশই মাত্র অনিত্য, কিন্তু ইহার যাহা বীজভূত, যাহা সূক্ষ্ম, তাহা অক্ষর শুদ্ধ, শাশ্বত!!! এখন এই নিত্য শব্দব্রহ্মের কিরূপে বিকাশ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

(ভাষা)

সমগ্র সৃষ্টিতত্বটীর স্থূলতঃ দুইভাগে বিশ্লেষ করা যায়। একটী জড়সৃষ্টি অপরটী জীবসৃষ্টি, প্রথম জড়সৃষ্টি পশ্চাৎ জীবসৃষ্টি, প্রথম আধারের সৃষ্টি পশ্চাৎ আধেয়ের সৃষ্টি। যখন একটী বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে তখন তাহা যেমন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, প্রথমে তাহার মূলভাগ উৎপন্ন হইয়া মৃত্তিকার মধ্যে আধাররূপে অস্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকে, পশ্চাৎ অন্য একভাগ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শাখা পল্লবাদি নানাপ্রকারে বিকশিত হইয়া লোকলোচনের বিষয়ীভূত হয়, সেইরূপ জড় ও জীব উভয়বিধ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সেই সূক্ষ্ম শব্দাত্মক ওঁকার হইতেও জড় সমুত্থিত অস্ফুট এবং জীবসমুত্থিত স্ফুট এই উভয়বিধ শব্দের সৃষ্টি হইতে থাকে। আমরা কেবল মানবীয় শব্দকেই স্ফোট শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বস্তুত তাহা নহে মানবেতর প্রাণীরও একটা জাতীয় ভাষা আছে তদ্দ্বারা তাহারা স্ব স্ব শোক দুঃখ হর্ষ বিষাদ স্নেহ কাম ক্রোধ ভয়সম্বলিত মনোভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকে, একটা শৃগাল শব্দ করিলে অপর একটী শৃগাল তাহার মনোভাব বুঝিতে পারে, গাভী হাম্বা রব করিলে বৎসই তাহার সে ভাষার অর্থ বুঝিতে সমর্থ। কিন্তু এই মনুষ্যেতর প্রাণীর ভাষা প্রকৃতিদত্ত সুতরাং অপরিবর্ত্তনীয়। উহা জড়সমুত্থিত অস্ফুট শব্দের এত নিকটবর্ত্তী যে উহাকে অস্ফুট শব্দের অন্তর্গত বলিলে তেমন অত্যুক্তি হয় না। পরে যখন জীবসৃষ্টি, বিকাশের চরমসীমায় আসিয়া মানব সৃষ্টিতে পরিণত হইল, তদবধি শব্দবৃক্ষের ও ক্রমে পত্রের আবির্ভাব হইল, তদবধি অস্ফুট শব্দ প্রকৃতস্ফুট রূপে পরিণত হইল তদবধি তাহার নাম হইল ভাষা।

এখন প্রথমতঃ আমাদের মনে একটী গুরুতর সন্দেহ আসিতেছে যে যখন মনুষ্যের প্রথম আবির্ভাব হয়, তখন কি উহারা আপনাদের ব্যবহারোপযোগী ভাষা স্বয়ং গঠন করিয়া লইয়াছিল কি অন্যান্য জীবের ন্যায় জাতীয়ভাষা প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল? স্বয়ং ভাষা প্রস্তুত করিয়া লওয়া অসম্ভব, কারণ মানব যে দেশে যে ভাষায় প্রতিনিয়ত স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করে তাহার একটিও ত নূতন করিয়া কেহ কিছু বলে নাই সবই ত পুরাতন, সবই ত আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। ক্রমান্বয়ে ইহার মূল অনুসন্ধান

করিয়া ইহার প্রথম সৃষ্টি কর্ত্তা কে, তাহা নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য। এস্থলে কতকগুলি মানব একত্র সমবেত হইয়া যে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বলা যায় না, কারণ একত্র সমবেত হইয়া ভাষা সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেও ত ভাষার আবশ্যক সুতরাং স্বয়ং ভাষা গঠন করা অসম্ভব। আর যদি বলা যায় উহা অন্যান্য জীবের ন্যায় মানবের জাতীয় শব্দমাত্র, তাহাও সম্ভব নহে কারণ জাতীয় শব্দ দেশভেদে বা কালভেদে বিভিন্ন বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। সুদূর আমেরিকাখণ্ডের একটী কোকিল যে পঞ্চমস্বরে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তথাকার মানবমণ্ডলীর মনোহরণ করে ভারতের মুকুলিত আম্রকাননে বসিয়া তাহার সেই অমৃতবর্ষী কুহুধ্বনির বোধ হয় কোনওরূপ পরিবর্ত্তন করেনা। উৎপত্তির প্রথমকালে তাহার যেই মধুর স্বর ছিল এতাবৎকাল তাহাই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ও থাকিবে। কাকের কুলায়ে বাল্যজীবন অতিবাহিত করিলেও সে, কাকশব্দের অনুকরণ করেনা। যদিও শুক প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী মনুষ্যের নিকট তদীয় ভাষায় শিক্ষিত হয় তথাপি তাহারা কদাচ তাহাদের জাতীয় শব্দের পরিবর্ত্তন করে না, কিন্তু দেশভেদে ও কালভেদে মানবীয় ভাষার প্রভূত পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে ; এক ভারতেই বঙ্গ, উৎকল, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বহুবিধ ভাষার পরস্পরের অনেক বিভিন্নতা। এমন কি এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই বঙ্গভাষার যাদৃশ আকার ছিল বর্ত্তমানে তাহার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। যদি মানবীয় ভাবা তাহাদের প্রকৃতিদত্ত জাতীয় ভাষা হইত তবে কদাচ তাহার, এরূপ রূপান্তর বা বিভিন্নতা হইত না। অতএব এস্থলে কি মীমাংসা হইতে পারে ? এ বিষয়ে আমাদের হিন্দু শাস্ত্রানুসারে মীমাংসা অতি সহজ, হিন্দুর শাস্ত্রকার একদিকে যেমন ক্রমবিকাশ স্বীকার করেন, অন্যদিকে, তেমন ক্রমহ্রাস ও স্বীকার করেন, যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের ক্রমে অভিব্যক্তি স্বীকার করেন, তেমন তাহার কাণ্ড অপেক্ষা শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্পাদির শক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, ইহাও স্বীকার করেন। হিন্দুর দর্শনকার বলেন।

"জন্ম সংস্কার বিদ্যাদেঃ শক্তিস্বাধ্যায় কর্ম্মণাং
হ্রাস দর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাং" কুসুমাঞ্জলিঃ।

জন্ম, সংস্কার, বিদ্যা, সামর্থ্য, বেদাধ্যয়ন ও কর্ম্মাদির ক্রমে হ্রাস দেখা যাইতেছে ইহা দেখিয়া সমগ্র সম্প্রদায়েরও যে ক্রমে হ্রাস হইতেছে

তাহা বেশ অনুমান করা যায়। একটী দৃষ্টান্ত দেখিলে এ বিষয়ের সত্যতা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। বেদব্যাস প্রভৃতি সূত্রকার যখন সূত্রাকারে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তখন অবশ্য সকলে না হউন অনেকেই কেবল সেই সূত্রমাত্র অধ্যয়ন করিয়াই কৃতকৃত্য হইতেন। তৎকালীন অধ্যয়নকারী-গণের এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও এতাদৃশ চিন্তাশীলতা ছিল যে সূত্রকারগণ স্ব স্ব গ্রন্থের ভাষ্য রচনার আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই, যদি তাহা হইত তাহা হইলে তাঁহারা স্বয়ংই বিশদ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেন তাহার বহু-শত বৎসর পরে যখন ক্রমশঃ মানবের ধীশক্তির হ্রাস হইয়া আসিল; যখন কেবল সূত্রপাঠে মানব মর্ম্মার্থ গ্রহণে অসমর্থ হইল। তখন শঙ্করাবতার শঙ্করা-চার্য্য প্রভৃতি মনীষাগণ তাহার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া সুগম করিয়া দিলেন। পরে সেই ভাষ্যকেও সুগম করিবার জন্য কত টীকা ও টীকার টীকা প্রণয়নের প্রয়োজন হইল। শক্তি সামর্থ্যের পক্ষেও তাই। শুনা যায় রাজপুতনার মহারাজগণের পূর্ব্বপুরুষ বাপ্পারাও যে খড়্গ লইয়া অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করি-তেন এখনও তাহাদের গৃহে সে খড়্গ রক্ষিত আছে প্রতিবৎসর খড়্গের পূজা হইয়া থাকে। পূজার সময় বহুলোকে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া অতি কষ্টে বহিয়া আনে। অধিক কি আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের সামর্থ্যের কথা শুনিলে আমরা অসম্ভব গল্প বলিয়া মনে করি। কোনও কৃষিক্ষেত্রে প্রথম বৎসর যে উর্ব্বরতাশক্তি থাকে দশবৎসর পরে তথায় সে শক্তির অর্দ্ধেক হ্রাস দেখা যায়। এইরূপ প্রত্যেক জাতীয় শক্তির মধ্যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে এমন কি প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের মধ্য দিয়া এই ক্রমহ্রাস ভাব অলক্ষ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। যেমন সামুদ্রিক বহিঃস্রোতের নিম্নে একটী অন্তঃস্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় যেমন ভূবায়ু প্রবাহের উর্দ্ধদেশে অপর একটী বায়ুপ্রবাহ তাহার বিপরীত দিকে বহমান হয়, তদ্রূপ যেমন একটি ক্রমবিকা-শের স্রোত একদিকে প্রবাহিত হইতেছে তেমন একটি ক্রমহ্রাসের ও স্রোত ঠিক তাহার বিপরীত দিকে ছুটিতেছে। তাই আর্য্যশাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন মনুষ্য সৃষ্টির প্রারম্ভে মানবজাতির আদিপুরুষগণ বৃক্ষের কাণ্ডদেশের ন্যায় পূর্ণ মনুষ্য ছিলেন। তাহাদের জীবনীশক্তি, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি, তাঁহাদের জ্ঞানপিপাসা অপরিমেয় ছিল। সেই সনক, সনাতন, কশ্যপ, নারদ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি এবং মনু প্রভৃতি রাজর্ষিই বর্ত্তমান মানব জাতির আদিপুরুষ। সেই আদর্শ মানবগণের যত্নেই ভাষার প্রথম আবির্ভাব হয়। তাঁহারাই সর্ব্ব-

প্রথম মনুষ্যলোকে অনন্তজ্ঞানের যে ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া যান, অদ্যাপিও পৃথিবীর সর্ব্বদেশের মানব সমাজ সে ভাষার সে জ্ঞানের কোনও না কোন অংশের অধিকারী রহিয়াছে।

আর যদি বলা যায় যে মানবজাতি প্রথমে অসভ্য ছিল অর্থাৎ মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষ বানর ছিল, পরে প্রকৃতির ক্রমবিকাশ বশে ক্রমে উন্নত হইয়া বর্ত্তমান সুসভ্য অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে সেই অসভ্যের মধ্যে সেই আদিম পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা প্রথমে মনুষ্যলোকে ভাষার প্রতিষ্ঠা করেন, যাঁহারা জ্ঞানের বিমল জ্যোতি প্রথম লাভ করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান সুসভ্য মানবসমাজ অপেক্ষা সহস্রগুণে উন্নত ও পূর্ণ মনুষ্য ছিলেন, তাঁহাদের উপার্জ্জিত সম্পত্তির আংশিক অধিকারী হইতে পারিয়া আজ সমগ্র জগতে সর্ব্বজাতীয় মানব কৃতার্থ হইতেছে। মনে করুন যখন পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম মানব জাতির আবির্ভাব হইল যখন তাহাদের কোনও জ্ঞান নাই, কোনও শিক্ষা নাই, যখন তাহারা ক্ষুধায় অপক্ক উদ্ভিজ্জ ভোজন করিত, কিরূপে ধান্য হইতে তণ্ডুল বাহির করিয়া তদ্দ্বারা মনুষ্যো-পযোগী খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারা যায় কিরূপে বস্ত্রাদির উদ্‌ভাবন দ্বারা আত্মরক্ষা ও লজ্জা নিবারণ করিতে পারা যায়, কিরূপে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া শীততাপবৃষ্টিতে নিঃশঙ্কে সুখে অবস্থান করিতে পারা যায়, কিরূপে গো হইতে দুগ্ধ দোহন করিয়া তদ্দ্বারা অশেষবিধ সুখাদ্য করিতে পারা যায়, এ সকল যখন মানববুদ্ধির অগোচরে ছিল, মানবজাতির সে কি ভীষণ কাল! তখন সেই নবোৎপন্ন জীবের অভাবময় নবরাজ্যে অবস্থান যে কি দুষ্কর তাহা কল্পনা করিতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন তাহাদের কেহ শিক্ষক নাই, কোনও বিদ্যালয় নাই, মনোভাব আছে প্রকাশের ভাষা নাই, কাব্য নাই, নাটক নাই, ছন্দঃ নাই, দর্শন নাই, স্মৃতি নাই, পুরাণ নাই, রোগে ঔষধ নাই, চিকিৎসক নাই, চিকিৎসা শাস্ত্র নাই। তখন তাহাদের থাকিবার মধ্যে সহায় সম্বলের মধ্যে আছে, কেবল চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ, আছে কেবল মেঘ বৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্র, আছে কেবল উষা প্রদোষ দিবা রাত্রি, আর আছে কেবল বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত নদী হ্রদ সাগর পরিবৃতা এই বসুন্ধরা। তৎকালে সেই প্রকৃতির অনুগামী ভাষাহীন মানবসমাজের যে সকল ব্যক্তি প্রকৃতির ক্রম-বিকাশের গুণেই হউক বা স্বভাবত বৈষম্য বশতই হউক, আর পশুর ন্যায় থাকিতে পারেন নাই ইতর প্রাণীর ন্যায় থাকিতে যাহাদের প্রাণে ব্যাকুলতা

আসিয়াছিল; সম্মুখে অনন্ত সৌন্দর্য্যময় বৈচিত্র্য পূর্ণ বিরাট বিশ্ব! অথচ তাহার নাম গুণ জানা নাই, তাহার প্রকাশের ভাষা নাই; মানবের অভাব নিবারণের জন্য অনন্ত সমগ্র জগৎ উপকরণ উদ্‌গ্রীব রহিয়াছে, অথচ তাঁহারা কিছুই পাইতে পারিতেছেন না এই ভীষণ অভাব প্রেরিত হইয়া যাঁহারা ইহার রহস্যবোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া একাগ্র চিত্তে কেবল প্রকৃতিরই অনুশীলন করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রকৃতিই যাঁহাদের শিক্ষয়িত্রী, এই দৃশ্যমান জগতই যাহাদের বিদ্যালয় চন্দ্র সূর্য্য বায়ু জল আকাশ মেঘ বৃষ্টি প্রভৃতি জাগতিক পদার্থই যাঁহাদের অধ্যয়ন গ্রন্থ। যাহারা সেই হিংস্র সমাকুল অরণ্যমধ্যে অসহায় অবস্থায় থাকিয়াও, বৃষ্টি করকা বজ্রাদির বিঘ্ন মস্তকে ধারণ করিয়াও মূল সত্যের অনুসন্ধান্ করিতে করিতে সমাহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহারা কি বানরের বংশধর! তাঁহারা কি আমাদের অপেক্ষা উন্নততম নন! তাঁহারা কি পূর্ণ মনুষ্য নন! বর্ত্তমান মানবের তুলনায় তাঁহারা কি দেবতা নন। বোধ হয় যিনি ঢেঁকি প্রস্তত করিয়া অসহায় মানব সমাজকে দিয়াছিলেন তাহার আসন গ্রামোফনের আবিষ্কর্ত্তারও অনেক উপায়।

তৎকালে সেই সমাহিত অবস্থায় তাহাদের মুখ হইতে কি জানি কোন অজ্ঞাত দেশ হইতে এক অভূতপূর্ব্ব শব্দে অভ্রান্ত সত্যের আবির্ভাব হইতে লাগিল তাঁহাদের কঠোর সাধনায় বাঙ্ময়ের অভিনব মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইল। শাখা পল্লবাদি বিশিষ্ট বৃক্ষটী তাহার অঙ্কুর মধ্যে গুপ্তভাবে ছিল এখন কারণ পাইয়া প্রকাশিত হইল। মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ছিল সংঘর্ষ পাইয়া ঝলসিয়া উঠিল। দুগ্ধের মধ্যে নবনীত সর্ব্বত্র অলক্ষ্যে বিদ্যমান ছিল মন্থন পাইয়া ব্যক্ত হইয়া পড়িল। কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি অদৃশ্য ভাবে বিদ্যমান ছিল, এখন সংঘর্ষণে জ্বলিয়া উঠিল মাত্র। শ্রুতি বলিতেছেন

বহ্নের্যথা যোনি গতস্য মূর্ত্তি র্ন দৃশ্যতে নৈবচ লিঙ্গনাশঃ।
সভূয় এবেন্ধন যোনিগৃহ্যঃ তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে।

অগ্নি যখন তাহার উৎপত্তি কারণ কাষ্ঠাদির মধ্যে বিলীন থাকে তখন তাহার আকৃতি দৃষ্ট হয় না কিন্তু তাই বলিয়া তাহার সত্তার নাশ হয় না, সেই আবার ঘর্ষণাদি দ্বারা উদ্ভূত হইয়া সেই উৎপত্তি কারণ ইন্ধন দ্বারাই গৃহীত হয় তদ্রূপ মানবদেহে প্রণবের বিকাশ হইয়া মানবের

দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছে দেশালাইর মধ্যে অগ্নি আছে সত্য, কিন্তু তাহার প্রকাশ নাই ঘর্ষণাদি সহকারে তাহা উদ্ভূত হইয়া যেমন ইন্ধন দ্বারা রক্ষিত হয় সেইরূপ এই বাঙ্ময় শব্দ প্রপঞ্চ প্রণবাত্মক কারণে নিহিত ছিল এ পর্য্যন্ত তাহার প্রকাশ ছিল না; এখন মানবের গভীর চিন্তায় কঠোর সাধনায় তাহা আলোড়িত হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইল, ইন্ধন স্বরূপ মানবগণই তাহা ধরিয়া রাখিলেন।

যে সকল জ্ঞান পিপাসু সমাধিমগ্ন মানবের কণ্ঠযন্ত্র দিয়া অপূর্ব্ব ভাষায় পূর্ণ জ্ঞানের প্রথম বা শেষ আবির্ভাব হয়। যাঁহাদের যত্নে অজ্ঞেয় প্রদেশ প্রদেশ হইতে জ্ঞান সূর্য্যের প্রথম রশ্মি বা পূর্ণরশ্মি মনুষ্য লোকে আনীত হয়। যাঁহারা ভাষাহীন মনুষ্য সমাজে থাকিয়া সর্ব্বপ্রথম বাক্‌শক্তি লাভ করেন, তাঁহারাই বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ সমাজের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণ। এইজন্যই তাহাদিগকে অগ্রজন্মা বা প্রথমজ বলে। আর তাহাদের প্রাণপাত পরিশ্রমে কঠোর সাধনায় প্রকৃতি তত্ত্ব এবং অধ্যাত্ম তত্ত্বের অনুশীলনে যে অভ্রান্ত সত্য পূর্ণ জ্ঞানের স্বয়ং প্রকাশ হইয়াছিল, যে জ্ঞান বিশ্বজনীন সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাহাদের যত্নে কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রকাশমান রহিয়াছে তাহাই **বেদ বা পূর্ণ সত্যজ্ঞান**॥ আর যে অপূর্ব্ব ভাষায় সে বেদের প্রকাশ হয় তাহাই বৈদিক ভাষা॥ ইহাই সমগ্র স্ফুট শব্দাত্মক মহাবৃক্ষের কাণ্ডস্বরূপ, প্রায় পৃথিবীর সমস্ত মানবীয় ভাষা এই মহাবিটপীর শাখাপ্রশাখাদির ন্যায় প্রপঞ্চ মাত্র।

প্রখর প্রতিভাশালী দার্শনিকগণ এই বেদকে, অপৌরুষেয় অর্থাৎ ভগবানের বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেশলাইর শলাকা স্বয়ং অগ্নির প্রকাশক নহে। অগ্নির আবির্ভাব অন্যের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, শলাকা তাহার সহকারী কারণ হইয়া ধারণ করিয়া থাকে মাত্র। সেইরূপ ঋষিগণ কেহই বেদের রচয়িতা নহেন তাঁহারা কঠোর সাধনার ফলে লাভ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র। যাহা স্বতঃ সিদ্ধ যাহা নিত্য তাহার কেহ উৎপাদক নাই। একথায় শ্রদ্ধার কোনও কারণ নাই। এই যে জগদ্বিখ্যাত মহা বৈজ্ঞানিক মহাত্মা এডিসন বিজ্ঞানের প্রভাবে মানব সমাজকে বিস্ময় স্তম্ভিত করিতেছেন, যাঁহার আবিষ্কার ফলে মানবসমাজে উন্নতির যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। সেই সকল আবিষ্কৃত বস্তুর তিনি একটীরও সৃষ্টি করেন নাই। ইনি স্বীয় কঠোর সাধনায়

প্রখর প্রতিভায় প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত শক্তি সমূহের প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন মাত্র। যেন ইহাঁর কঠোর সাধনায় প্রীত হইয়া প্রকৃতি আপনাকে ইহাঁর সমক্ষে কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছে মাত্র, ইনি নূতন কিছুই করেন নাই।

অনেকে হয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অনেক প্রসিদ্ধ বক্তা সভাস্থলে, বক্তার আসনে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতে করিতে যখন বক্তব্য বিষয়ের ভাবে বিভোর হইয়া যান তখন যাহা তিনি পূর্ব্বে কখনও চিন্তা করেন নাই কিম্বা হয়ত যাহা তাঁহার প্রাণের কথা নহে এমন অনেক বিষয় তাহার মুখ হইতে অনর্গল বহির্গত হইয়াছে। সে আসন হইতে অবতরণ করিলে পর তিনি সে ভাষায় সে ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম। অতএব ভাষা যে নিত্য অপৌরুষেয়, উহার যে কেহ স্রষ্টা নাই, ইহা যে বিশ্বকারণ নারায়ণের ইচ্ছায় কোনও অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মানবের কঠোর তপোলব্ধ তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই।

শাস্ত্রকারেরা ভাষার উৎপত্তির মূলকারণকে স্ফোট নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্ফোট শব্দটী বিকাশার্থক স্ফুট ধাতু হইতে নিষ্পন্ন সুতরাং স্ফোট অর্থে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণতি। কেন যে গো অর্থে পশুবিশেষকে বুঝায় কেন যে পাক অর্থে ক্রিয়া বিশেষকে বুঝায় ইহার অন্য উত্তর নাই এই স্ফোটই তাহার কারণ, বৈজ্ঞানিকেরাও এ "কেন„এর উত্তর দিতে অক্ষম। 'কেন যে বাষ্পদ্বয়ের সংমিশ্রণে জলের উৎপত্তি হয় তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না।' এস্থলে আর্য্য ঋষি নিরুত্তর না থাকিয়া তাহাকেই স্ফোট আখ্যা দিয়াছেন। "ইহা হইতে ইহা হয়„ "অস্মাৎ শব্দাৎ অয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ"॥ এইরূপ একটা ঈশ্বরের ইচ্ছারই স্ফোট অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ এই বলিয়া তাঁহারা এপ্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। এই স্ফোট বশতই সেই ধ্যাননিষ্ঠ ঋষিগণের কণ্ঠযন্ত্র হইতে শব্দব্রহ্মের স্বয়ং প্রকাশ হইয়া বেদাকারে প্রথম ভাষার আবির্ভাব হইয়াছিল।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন কাব্যতীর্থ।

চিত্ত-নদী

নিশিদিন
কল্লোলিয়া ছুটে চলে বিশ্রাম বিহীন
কার পানে বিহ্বলা এ চিত তরঙ্গিণী!
নাহি মানে কোন বাধা নাহি শোনে বাণী।
অন্ধ বেগে ছুটে চলে উন্মাদিনী প্রায়।
কোথায় যাবিরে তুই কোথা পাবি হায়
নীলশান্ত মহাসিন্ধু? চারিদিকে হেরি
সংখ্যাহীন দগ্ধমরু রয়েছে প্রসারি!
কে আছ কে আছ সিন্ধু লহ আজি ডাকি
তোমার প্রাণের মাঝে আমার এ হিয়া;
নহিলে যে মরুমাঝে যাবে শুখাইয়া
ধূলি স্তুপে আপনারে ফেলিবে যে ঢাকি
অনাদরে অভিমানে। তাই ডাকি হায়
যে মোরে ধরিবে বুকে সে সিন্ধু কোথায়!

শ্রীঅনিলোর্ম্মি সান্যাল।

বংশের-ধন।

(গল্প)

কালীচরণের বৃদ্ধা মাতা যখন গো-শালার সম্মুখস্থ কাঁটালবৃক্ষের ছায়ায় গো-দোহনে রত ছিল, এবং চারি বৎসরের বালক গোপাল বা গোপা, শাখা-চ্যুত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অর্দ্ধশুষ্ক কাঁটাল-পত্র সংগ্রহ করিয়া গাভীর সম্মুখে ধরিতেছিল। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতাপে চতুর্দ্দিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। সকলি নিঝুম। কেবল গয়লা-ডোবার পানা-পচা-জলের মধ্যে মধ্যে হংসশ্রেণী জাতীয়-রব করিতেছিল। সেই সময় খড় বোঝাই একখানি গো-শকট মেটে রাস্তা ধরিয়া কালীচরনের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। গো-যানখানি এইরূপভাবে বোঝাই ছিল, যে দেখিলে একখানি খোড়ো-ঘর চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ভ্রম হইবে। গাড়ী আসিয়া যথাস্থানে দাঁড়াইল। এগাড়ীর গাড়োয়ান স্বয়ং কালীচরণ। বলদদ্বয়ের স্কন্ধের বোঝা নামাইয়া তাহাদের রসি ধরিয়া

টানিতে টানিতে গো-শালায় প্রবেশ করিল। পথশ্রান্ত জীবদুটীকে আহার দিতে গিয়া ক্রোধে ও বিরক্তিতে কালীচরনের সর্ব্বশরীর কাপিয়া উঠিল তাড়াতাড়ি খড়-কাটা-বঁটী খানা টানিয়া খড় কাটিতে বসিল। কালীচরণের মনে চিন্তা আসিল—"আমি এত খাটি কেন? কার জন্য! আমার কি, এ কার সংসার? এই সাত ক্রোশ ঠেঙ্গিয়ে খড় নিয়ে এলাম—কেথায় একটু জিরুবো না আবার খড় কাট্‌তে ব'সলাম! না, আর পারি না, কালীচরণের মনে হইতেছিল—যে খড়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংসারের সকল সম্বন্ধ ও কাটিয়া ফেলে, কিন্তু আবার ভাবিল—"আমি যদি হাল ছাড়িয়া দিই তা'হলে যে নিমাই গয়লার সংসারটা ছারখার হয়! আমার অপরাধ আমি বড়! কালীচরণ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ মা নেতাই ক'মনে?" মাতা দুধের কেঁড়ে হস্তে পাক-শালর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—"কি জানি বাবা তার কথা আর ব'লনা"!

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শিজনা গ্রামে কালীচরনে বাস। তাহারা তিন ভাই। কালীচরণ জেষ্ঠ, নিতাই মধ্যম এবং উমেশ কনিষ্ঠ। সংসারে কালীচরণের বন্ধ্যা স্ত্রী ও বৃদ্ধামাতা এবং নিতাইয়ের স্ত্রী তরঙ্গিনী ও পুত্র গোপাল ভিন্ন আর কেহই ছিল না। উমেশ অবিবাহিত, কয়েক মাস ম্যালেরিয়া রেগে অক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মন্য। কালীচরনের মৃত পিতার নাম—"নিতাই গয়লা"।

কালীচরণের সংসারে কিছুরই অভাব নাই, অভাব কেবল শান্তির। যে কারণে কত সংসারী সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছে, ছোট বড় কত সংসার ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। একের অজ্ঞানতায় সংসারে আগুন জ্বলে, যে যার স্বার্থ টানিয়া সরিয়া পড়ে, পরিনামে ভাই ভাইকে জানে না, পুত্র পিতাকে চেনে না। আজ নিমাই গয়লার সেই অগুন জ্বলিয়াছে। নিতাইয়ের কুব্যবহারে সংসারে একটা অসহনীয় অশান্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি হইয়াছে। কালীচরণ সযত্নে একটী সুখের সংসার পুতিতে চায় নিতাই তাহার অন্তরায়। কালীচরণ মাথার ঘামে, যত্নের তুলিতে সংসারে একখানি শান্তিময়ী চিত্র আঁকিতে প্রয়াস পায়, নিতাই তাহা অবজ্ঞার হস্তে মুছিয়া ফেলে থাকে শুধু বৃদ্ধামাতার বুকে একটা চিরস্থায়ী বিষম কাল দাগ।

কালীচরণ মাতার উত্তর শুনিয়া বলিল—"না বল্লে তো আর চলে না! আমি তো আর পারি না, সকালে তাকে ব'লে গেলাম যে, নেতাই, ছেনি ফুরিয়াছে, ছেনি কেটে রাখিস্,—এখন এসে দেখি এক মুটো ছেনি নেই গরু

দুটোকে দিই কি?" এমন সময় ঈষৎ মলিন, লাল-ফিতাপেড়ে বস্ত্র পরিধানে, বুকে ফুল দেওয়া লাল গেঞ্জিধারী নিতাই, শীসে কোন অনির্দ্দিষ্ট সঙ্গিত চর্চ্চা করিতে করিতে আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল।

মাতা বলিল—"হাঁরে নেতাই! ছেনি কাটিস্ নি?

নিতাই চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল—"তোর মাথা ব্যথা পড়ে থাকে তুই কাট্‌গে যা, আমি তো কারও মাইনে খেগো চাকর নই যে হুকুম কর্ত্তে না কর্ত্তে তামিল হবে!"

মাতা পুত্রের বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া অগত্যা চুপ করিল। কালীচরণ একটু মৃদুস্বরে বলিল—"ভাই আমার চাকরি ক'রে এলেন"। নিতাই উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিল—না, তুমি চাকরি ক'রে এলে?"

মাতা বেগতিক বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"নে ঠিক দুক্কুর বেলা দুভেয়ে একটা কুরুক্ষ্যাত্তোর বাধা, তোরা চুপ কর বাপু, আমি ছেনি কাটছি।"

নিতাই নিজের মনে বকিতে লাগিল—"দেখ দেখি, যা না তাই! আমায় যেন কি পেয়ে ব'সেছে।

মাতা—"তোরও তো বোঝা উচিত, একা কালী কোন দিক সামলায়!"

নিতাইয়ের ক্রোধের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। মাতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল—"বুঝবো কি? অসহ্য হয়, বল্লেই তো হয়—বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যা! এত ভয় কিসের? পরের দুয়োরে গতর খাটালে চাট্টে ভাত মিলবে না?"

কালী—"পরের দুয়োরে না খাটিয়ে সেই গতরটা নিজের দুয়োরে খাটা না! আর না হয় পরের দুয়োরে কেমন সুখ একবার পরখ ক'রেই দেখ না!"

কালীচরণের শেষোক্ত বাক্য শ্রবনে এবং মাতা কার্য্যতঃ দাদার পক্ষ্য সমর্থণ করিতেছে দেখিয়া, নিতাই নিজেকে সে সংসারের সুখের পথে কণ্টক স্থির করিয়া আর বেশী কিছু বলিল না। কেবল—"বেশ তাই দেখবো" বলিয়া বলিয়া নিজকুটিরে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে একখানি চাদর স্কন্ধে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দোষ কাহার? কালীচরণের না—নিতাইয়ের? সূর্য্যোদয়ের পর হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে সংসারিক নানাকার্য্য শেষ করিয়া, শুষ্ক

তালু হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কালীচরণ যখন তাহার চির-প্রিয় দরিদ্র কুটীরের দিকে ছুটিয়া আইসে,——কানাই মণ্ডলের খামার বাড়ীর আম্রবৃক্ষের নিম্নে জীর্ণ মাতুরে বহু-হস্ত বিমর্দ্দিত ময়লাযুক্ত তাস ফেলিয়া নিতাই তখন স্বগৃহে প্রবেশ করে। সহরে ছানা বিক্রয় করিয়া বাঁক স্কন্ধে কালীচরণ যখন নিজগৃহে আসিয়া পৌছায়, স'তে ময়রার দোকানে সারা বৈকালটা, বহু পুরাতন, প্রকৃত শব্দহীন তবলায় কাওয়ালীর বোল সাধিয়া নিতাই তখন বাটীর প্রাঙ্গনে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। কে বিচার করিবে—দোষ কাহার!

মাতা যখন দেখিল—নিতাই প্রকৃতই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়,—তখন ব্যাকুলচিত্তে দুইপদ অগ্রসর হইয়া বলিল—"ওরে ফের, ফের! দুকুরবেলা, না খেয়ে কোথাও যাস্‌নে"!

কালী—"ওরে হতভাগা মায়ের কথা শোন,—খেয়ে যা!" নিতাই কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। মাতা, ভ্রাতার অনুরোধ তাহার তখনই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছাকে প্রবল করিল। সে মুহূর্ত্তে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল।

পাকশালা হইতে তরঙ্গিনী যে এই সমস্ত ভ্রাতৃ-কলহ শ্রবণ করিতেছিল, তাহা বেশ বুঝা গেল,—কারণ তাহার মসলা পেষণ-রত হস্তদ্বয় মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ কার্য্যবিরত হইতেছিল। গোপাল যখন "ওমা আমার ক্ষিদে পেয়েছে" বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল টানিতে টানিতে চিৎকার করিতেছিল, তখন সে—"চুপকর্" বলিয়া তাহাকে ধমকাইতেছিল। তারপর নিতাই যে মুহূর্ত্তে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল,—পরক্ষণেই তরঙ্গিনীর হস্ত হইতে দুধের কেঁড়েটী পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। অপ্রস্তুত হইয়া তরঙ্গিনী গোপালের পৃষ্ঠে কিছু ঝাল ঝাড়িয়া লইল, ক্রন্দনস্বরে বলিল—"পোড়া বিষের জ্বালায় ম'লাম! বিষ যাবে কবে?"

সমস্ত দিন গেল। সন্ধ্যা হইল, কিন্তু নিতাই গৃহে ফিরিল না। কালীচরণ মনকে বুঝাইল—"কোথায় যাবে! ছেলেমানুষ'ত নয়! এল বলে!" কিন্তু মায়ের প্রাণ সে বুঝ মানিল না। বৃদ্ধা ভীত হইয়া পুত্রকে বলিল—"ও কালী একি হ'ল? রাত হল, কৈ নিতাইতো এল না? সে তো এমন রাগ কখনও ক'রে না!" কালীচরণ একবার ও পাড়া অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া বলিল—"ও মা শুনেছ,—নিতাই নাকি চাকুরি খুঁজতে বর্দ্ধমান গিয়াছে"।

সারা রাত্র বৃদ্ধামাতার ভাল নিদ্রা হইল না। নিতাইয়ের গৃহপার্শ্বস্থ প্রতি ক্ষুদ্র শব্দটী নিতাইয়ের পদশব্দ বলিয়া তাহার মনে দারুণ সন্দেহ জাগিতে

লাগিল। রাত্রি শেষে নিতাইয়ের গৃহে কি একটা শব্দ হওয়ায় বৃদ্ধা চমকিত হইয়া, তৈলসিক্ত উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল—"কে, নিতাই এলি কি ?"—কোন উত্তর না পাইয়া, বৃদ্ধা শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল—পূর্ব্বাকাশে ঈষৎ দিবালোক ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিতাইয়ের গৃহদ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত দেখিয়া স্থির করিল,—নিতাই নিশ্চয়ই আসিয়াছে। মাত্র একদিন নিতাইকে না দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধার মনে হইতেছিল—"আহা, নিতাইকে আজ কতকাল দেখিনি"—তাই মায়ের প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দ্রুতপদে নিতাইয়ের গৃহে প্রবেশ করিল;—কিন্তু গৃহশূন্য। নিতাই, তরঙ্গিনী বা গোপাল কেহই নাই। বৃদ্ধার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। পাতি পাতি করিয়া সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান করিল,—কিন্তু বৃথা অবশেষে কালীচরণের গৃহের-দাওয়ায় লুটাইয়া পড়িয়া ক্রন্দন বিজড়িত-কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল—"ও কালী শীঘ্র ওট্‌ দেখ মেজেবৌও বুঝি রাগ করে আমার গোপালকে নিয়ে কোথায় চলে গেল"!

পর দিবস গ্রামে ভয়ানক একটা আন্দোলন পড়িয়া গেল। সন্দেহজনক স্থান সমূহে লোক পাঠান হইল, কিন্তু তরঙ্গিনী ও গোপালের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

বৃদ্ধা নিতাই ও তরঙ্গিনীকে ভুলিয়া গোপাল বলিয়া পাগলিনীর মত হইল! যে গোপাল সারা দিবস তার অঞ্চল ধরিয়া পায়ে পায়ে ফিরিত, সংসারের এক মাত্র সোহাগ ও স্নেহের জিনিস, একই শত হইয়া বৃদ্ধার সম্মুখে নৃত্য করিয়া বেড়াইত, হাসি-কান্না ও কলরবে নিতাই গয়লার ক্ষুদ্র সংসারটীকে অষ্টপ্রহর মুখরিত করিয়া রাখিত,—সে গোপাল আজ কোথায়!

একরূপই করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। গোপালের অপরিহার্য্য স্মৃতি অসহ্য যন্ত্রনায় বৃদ্ধার জীর্ণদেহ দিন দিন আরও ক্ষীণ হইতে লাগিল। একদিন পাক-শালার দাওয়ায় বসিয়া চক্ষে বস্ত্র চাপিয়া, বৃদ্ধা যখন গোপালের নাম করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া অনুচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিল,—কালীচরণ তখন নির্জ্জন গৃহে বসিয়া সংসারের বিষয় চিন্তা করিতেছিল। মাতার ক্রন্দনের সুর তাহার বক্ষে গিয়া অঘাত করিল। তাহারও গণ্ড বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে গোপনে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া, স্বর্গীয় পিতাকে স্মরণ করিয়া বলিল—"বাবা, আজ তুমি কোথায়! একবার দেখে যাও—তোমার সংসারে আজ কত সুখ!"

তার পর প্রায় দেড় বৎসর চলিয়াগিয়াছে, কিন্তু—নিতাই, তরঙ্গিনী বা গোপাল, কাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

গাড়ী আসিবার সময় হওয়ায়, গেট্‌ম্যান্‌,—গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক—রোডের ফটক্‌ বন্ধ করিয়া, সবুজ রঙ্গের ঝাণ্ডি হস্তে তাহার রেলকোম্পানি দত্ত ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। কুটীরাভ্যন্তর হইতে—"বাবা অমি নিশেন ধরবো!" বাবাউত্তর করিল —"না"। হাওড়া ষ্টেসন্‌ লক্ষ্য করিয়া ট্রেনখামি ছুটিতেছিল, সর্ব্ব-পশ্চাতে দুইখানি ছানার-গাড়ী (curd-van) সংযুক্ত ছিল। ছানার গাড়ীর আরোহিগণের মধ্যে, ছানার বাজার-দর সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। কেহ বা অঞ্জলি মধ্যে কলিকা আবদ্ধ করিয়া এক-মনে ধূমপান করিতেছিল। যে মুহূর্ত্তে ট্রেন্‌খানি ফটক্‌ অতিক্রম করিল,—ঠিক সেই সময় গেট্‌-ম্যান্‌ পার্শ্বস্থ বালকটী দুইহস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে উচ্চঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"ও গয়লা ছ্যানা দেনা!"—ছানার গাড়ীর আরোহীগণ কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না। কেবল একব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কালীচরণ গাড়ীর পার্শ্বে ঝুঁকিয়া আর একবার বালকটীকে দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু আর দেখিতে পাইল না,—গাড়ী তখন দূরে চলিয়া গিয়াছে। কালীচরণের মনে একটা দারুন সন্দেহ জাগিল—

"আহা ছেলেটী ঠিক গোপালের মত"!

গাড়ী চলিয়া গেল গেট্‌-ম্যান্‌ ফটক খুলিয়া দিয়া, দড়ির খাটিয়ায় আসিয়া উপবেশন করিল।

রেল-কোম্পানি প্রদত্ত ইষ্টক নির্ম্মিত সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠটীতে গেট্‌-ম্যান তাহার ক্ষুদ্র সংসারটী বেশ গুছাইয়া পাতিয়া লইয়াছে। কোন কিছুরই ক্রটি নাই। এমন কি কুটীর পার্শ্বে মাচাঙ্গে লাউ কুমড়া পর্য্যন্ত ফলিয়াছে। কিন্তু সংসারটী নূতন হইলেও বহু পুরাতন। ইহা নিমাইগয়লার সংসারের স্থানচ্যুত এক টুক্‌রা। এ সংসারের গৃহিনী তরঙ্গিনী স্বামী নিতাই। নিতাই গেটম্যান সাজিয়া নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যস্থ রেল্‌কোম্পানির অল্পায়তন কক্ষে স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার পাতিয়া নিজেকে বড়ই সুখী জ্ঞান করিতেছে, কিন্তু—দশের চক্ষে নিতাই বড়ই দুঃখী।

রাত্র আন্দাজ দশটা। আকাশে বেশ মেঘ জমিয়াছে। যদিও সন্ধ্যার পর সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; তথাপি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ল্যাল ধূলা সম্পূর্ণ মরে নাই। মাঝে মাঝে একটা একটা দম্‌কা হাওয়া বহিয়া যাইতেছে।

নিতাই স্ত্রীপুত্রসহ তাহার ক্ষুদ্র কুটীরটীতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল। অকস্মাৎ গোপালের নিদ্রা ভগ্ন হইল এবং পশ্চিমে বহু দূরে সোঁ সোঁ শব্দ শুনিতে পাইল। বালকের মনে যুবকের সাহস সঞ্চারিত হইল। গোপাল পিতা-মাতার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে গি। ইঞ্জিন সম্মুখস্থ আলোক তিনটী দেখিয়া বেশ বুঝিল—গাড়ী আসিতেছে। পিতার-ন্যায় ঝাণ্ডি হস্তে বেগবান-গাড়ীর পার্শ্বে দাড়াইবার প্রবল ইচ্ছা গোপালের তরল মনে সজোরে আঘাত করিল। সে গৃহ-কোণ হইতে সবুজ নিশানটী বাছিয়া লইয়া উন্মুক্ত আঁধারে মিশিয়া গেল।

গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে, নিতাইয়ের কুটীর কাঁপাইয়া ঝড়বেগে এক-খানা মালগাড়ী সে স্থান অতিক্রম চলিয়া গেল। সেই শব্দে নিতাইয়ের ও তরঙ্গিনীর নিদ্রা ভাঙ্গিল। গৃহে গোপাল নাই দেখিয়া উভয়েই চমকিত হইয়া, শয্যাত্যাগ করিয়া—"গোপাল, গেপাল" করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল—আকাশ মেঘাছন্ন। অন্ধকারে নিজকেই দেখা যাইতেছে না। নিতাইয়ের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে ভীত-কম্পিত-স্বরে চিৎকার করিয়া গোপালকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। কেবল—রেল-রাস্তা পার্শ্বস্থ জলাশয়ে ভেকের অবিশ্রান্ত রব ও জলমধ্যে প্রোথিত টেলিগ্রাফের তারের স্তম্ভোত্থিত এক-রূপ অবিরাম শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। গোপালের কোন সারা না পাইয়া নিতাই অগত্যা রেল-কোম্পানির এক-মুখো লণ্ঠন লইয়া, তাহাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে বাহির হইল। তরঙ্গিনী কম্পিত হৃদয়ে কুটীরদ্বারে বসিয়া গোপালের জন্য মা কালীর নিকট মানত করিতে লাগিল।

শেষ রাত্রে আকাশ অনেকটা মেঘমুক্ত হইয়াছে। খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি চন্দ্রের উপর দিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। অস্পষ্ট চন্দ্র-কিরণ বৃক্ষ-শাখার ফাঁক দিয়া আসিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কেবল—মধ্যে মধ্যে দামোদর পাড়ের, কেন গ্রামের বারোয়ারি পূজার যাত্রা—গানের সুর বহন করিয়া, ঝাউ-বৃক্ষের মস্তক কাঁপাইয়া, আম্রের মুকুল দোলাইয়া একটা একটা মৃদু হাওয়া বহিয়া যাইতেছে;—এমন সময় এক যুবক, স্কন্ধে বস্ত্রাচ্ছাদিত কোন গুরুভার বহন করিয়া, শিজ্না গ্রামের রাস্তা ধরিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছিল। একটী স্ত্রীলোকও মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে প্রাণপণে তাহার অনুসরণ করিতেছিল।

ক্রমে যুবক কালীচরণের বাটীর সন্নিকটস্থ হইল। কিন্তু, বাটীতে প্রবেশ করিতে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। যে স্থানে যুবক তাহার মধুর বাল্য-জীবন অতিবাহিত করিয়াছে। সংসারে যদি কিছু আপনার থাকে তো সেই স্থানে। যে স্থান কত আপনার,—সেই স্থানে যুবক চোরের ন্যায় প্রবেশ করিয়া কম্পিত স্বরে ডাকিল—"দাদা।"—কালীচরণ জাগ্রত ছিল। চমকিত হইয়া উত্তর দিল—"কে!"

যুবক—"আমি দাদা"

কালীচরণ—"এঁ্যা, কে, নিতাই নাকিরে ?"

যুবক—"হ্যাঁ দাদা, সেই হতভাগা"!

কালীচরণ আলোকহস্তে দৌড়াইয়া বাহির হইল। অপরগৃহ হইতে বৃদ্ধা মাতা ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইল। কালীচরণ বাহির হইয়া মাত্র নিতাই তাহার পদতলে পড়িয়া উন্মাদের ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল—"ক্ষমা কর দাদা! তোমার মনে কষ্ট দিয়ে, হাতে হাতে তার সাজা পেইছি"—কালীচরণ ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া রহিল। বৃদ্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া বলিল—"ও নেতাই—তোর মনে এই ছিল!"—তরঙ্গিনীকে দেখিয়া বিস্মত হইয়া বলিল—"এঁ্যা,এই যে মেজ-বৌমাও! কই আমার গোপাল কই ?"

নিতাই ক্রন্দন স্বরে বলিল—"আর কেন মা, এজনমের মত গোপাকে ভুলে যাও—গেপাল আমাদের ছেড়েছে!"—নিতাই আঙ্গিনার যেস্থানে তাহার স্কন্ধের বস্ত্রাচ্ছাদিত বোঝা নামাইয়াছিল,—সেই স্থানে দৌড়িয়া গিয়া তাহার আবরণ উন্মুক্ত করিয়া বলিল—"এই দেখ মা তোমার সাধের গোপাল"! বৃদ্ধা উচ্চঃস্বরে—"একি দৈখালি নেতাই!" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তাইতো, একি ? গোপালের মস্তক দেহচ্যুত, হস্তপদ ছিন্ন ভিন্ন। কলী-চরণ তদ্দর্শনে হতজ্ঞান হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"এ কে কল্লে নিতাই ?"—

নিতাই বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"রেল গাড়িই আমার এই সর্ব্বনাশ ক'রেছে। তেমাদের উপর টেক্কা মেরে চাকুরি কর্ত্তে গিয়েছিলাম; পরের প্রাণ বাঁচাবার ভার নিয়ে, নিজের প্রাণ খুইয়ে, আজ আমার এই চাকুরির-ধন নিয়ে ফিরে এইছি। মুখ ফিরিও না দাদা, হাত পেতে তুলে নাও। কালীচরণ অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিল—"এ কি

কল্লি নিতাই! গোপাল যে আমাদের এক মাত্র 'বংশের ধন' ভাই!"—কালীচরণ বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

আকাঙ্খিত মিলন সুখের পরিবর্ত্তে,—নিমাই গয়লার সংসারে দারুণ শোকোচ্ছাসিত একটা প্রবল-বন্যা বহিয়া, কয়েকটী সংসারীকে অগাধ দুঃখ-সলিলে নিমজ্জিত করিল।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফুলারিবাদ, ঝরিয়া।

ভাগবত ধর্ম্ম।

ভাগবত ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই এইটুকু বুঝিতে হইবে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা জগতের ও আমাদের জীবনের যতটুকু জানিতেছি, এইটুকুই সমস্তটা নহে। যাহা প্রকৃত সত্য তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা অধোক্ষজ। এই অধোক্ষজ পরমার্থ তত্ত্বকেই সত্য বলিয়া জানিতে হইবে এবং হৃদয়ের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসা তাহা সেই অধোক্ষজ তত্ত্বে অর্পণ করিতে হইবে। এই যে একটা কার্য্য ইহা একটা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। আমাদের সত্ত্বার মূলে অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি নিহিত আছে, ইহাই আমাদের স্বভাব, ইহাই আমাদের স্বরূপ।

আমাদের জীবনের সম্বন্ধে এটুকু আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে আমরা অভাবগ্রস্ত, ও অশান্ত। আরও বুঝিতে পারি যে আমরা একা একা বা দল বাঁধিয়া যাহা কিছু করিতেছি সকলেরই লক্ষ্য এই অভাব দূর করিয়া একটা শান্ত অবস্থায় উপস্থিত হওয়া। এই যে স্বরূপ, ইহা আমাদের মধ্যে রহিয়াছে; এই যে স্বরূপ ইহাই আমাদিগকে চঞ্চল করিয়া জীবনের পথে ঘুরাইতেছে। এখন কি প্রকারে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারি, ইহাই প্রশ্ন। সংসারী মানব বলিলেন ভোগের বস্তু উপার্জ্জন কর, ভোগ কর, ইন্দ্রিয়ের কামনা সমূহের তৃপ্তি সাধনা কর। তত্ত্বদর্শী বলিলেন "দেখ ইন্দ্রিয়গণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিওনা।" তিনি নিজের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে ও অতীতকালের অন্যান্য মনীষিগণের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস হইতে বলিলেন, "স্থির হও, ইন্দ্রিয়গণের

গতি রুদ্ধ কর, ইন্দ্রিয়গণ যাহা বলিতেছে তাহা প্রতিভাসিক সত্য, তাহার অনুসরণ করিলে ভ্রমের রাজ্যে অবিদ্যার মধ্যে ভ্রমণ করিবে, অভাব দূর হইবে না। তাহার পর ইন্দ্রিয়গণের গতি কিয়ৎপরিমাণে রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়গণের রাজা যে মন তাহার সাহায্যে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা যে একেবারে সত্য নহে, তাহা নয়, তবে ইহাও ব্যবহারিক সত্য। কিন্তু হে মানব তোমার ইহাতেও চলিবে না, তোমাকে আরও স্থির হইতে হইবে তবে পারমার্থিক সত্য লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।”

এই পারমার্থিক সত্যের কথা যিনি জীবকে বলেন তাঁহার নাম ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র যে শ্রীধর স্বামীর মতে ব্রহ্মবিদ্যা, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহা হইলেই দেখা গেল যে এই ভাগবতধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই এইটুকু বুঝিতে হইবে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ও মনের দ্বারা (মনের দ্বারা বলিলে বুঝিতে হইবে, ইন্দ্রিয়জ্ঞান সমূহকে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, বা তুলনা করিয়া যে সমুদয় সিদ্ধান্ত অবধারিত হয়, তৎসমুদয়) আমরা জগতের ও আমাদের জীবনের যতটুকু জানিতেছি, এইটুকুই সমস্তটা নহে।

কথাটা খুব সহজে এই ভাবে ভাবিতে পারা যায়। সত্য করিয়া হওয়া আর মনে হওয়া এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। আমাদের মনে হয় পৃথিবী স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, আর চন্দ্র ও সূর্য্য, দুই বড় বড় আলোকের মত, আর নক্ষত্রগুলি যেন প্রদীপ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বুঝাইয়া দিলেন, ইহার একটা কথাও সত্য নহে। মনে হওয়া ও সত্য করিয়া হওয়া এই দুইটির মধ্যে প্রভেদ আছে এই কথাটা মানুষ যখন সত্য সত্য হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারে, এবং বুঝিতে পারিয়া নিজের দর্প ও যথেচ্ছাচার এই দুটিকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করে সেই সময়েই আমরা যাহাকে বলি ধর্ম্মজীবন তাহা আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে মানব ইন্দ্রিয়গণকেই একমাত্র সত্য বলিয়া জানিত, এখন হয় সমাজ কর্ত্তৃক ও গুরুজন কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সংযমাদি ধর্ম্ম পালন করিয়াই হউক, আর জড়বিজ্ঞানের আলোচিত ব্যবহারিক সত্য লইয়া আলোচনা করিতে করিতে, ইহা ছাড়া আরও কিছু আছে কোনও কারণে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াই হউক মানুষের চিন্তার ও কর্ম্মের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অতীন্দ্রিয় যে পরমার্থ সত্য তৎপ্রতি তাহার অনুরাগ জাগিয়া উঠিল।

ইহার নাম শ্রীজীব গোস্বামীর মতে 'রুচিলক্ষণা ভক্তি'। ইহাই সর্ব্বপ্রথমে মানবচিত্তে আবিভূর্ত হইয়া থাকে। এই সময়ে শ্রবণাদি লক্ষণ যে সাধন ভক্তিযোগ তাহা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাই শ্রীজীব গোস্বমীর উপদেশ। ক্রমসন্দর্ভ টীকায় তিনি বলিতেছেন "জাতায়াঞ্চ তস্যাং রুচিলক্ষণায়াং ভক্ত্যাং তয়ৈব শ্রবণাদিলক্ষণ সাধন ভক্তিযোগঃ প্রবর্ত্তিতঃ স্যাৎ"

পূর্ব্বোক্ত অংশের সরল তাৎপর্য্য এই। রুচিলক্ষণা ভক্তি প্রবর্ত্তিত হইলে বা বিকশিত হইলে ভগবানের কথা শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি হয় তাহার পূর্ব্বে হয় না। যেমন আত্মতত্ত্বের অনুশীলন, ইহাও যে কোন অবস্থায় যে কোন লোকের হয় না, সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের একটা অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া মানবের চিত্ত যে সময়ে নিত্য ও অনন্তের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, অর্থাৎ বলে "ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" সেই সময়েই মানব ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হয় তাহার পূর্ব্বে, ব্রহ্মবিদ্যার কথা সে শুনিয়া ঠিক বুঝিতে পারে না, স্মৃতিশক্তির দ্বারা আয়ত্ত করিলেও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের যে সাধনা তাহার পথে অগ্রসর হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই রুচিলক্ষণা ভক্তির প্রয়োজন। এই রুচি কি কি উপায়ে লাভ করা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদরূপে আলোচনা করিব। এখানে এইটুকুমাত্র বলিয়া রাখা দরকার যে সকল মানুষের যে ঠিক একই উপায়ের মধ্য দিয়া এই রুচির উদ্ভব হয় তাহা নহে। তবে মোটামুটি কতকগুলি বিষয়ে মিল আছে আচার্য্যগণ সেইগুলিই বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রথম শ্রদ্ধা পরে সাধুসঙ্গ, ইত্যাদি পূর্ব্বে এ বিষয়ে কিছু কিছু বলা হইয়াছে।

এই রুচি-লক্ষণা ভক্তি উৎপাদিত হওয়ার পর শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিতে ও ভগবানের নাম, গুণ ও লীলাদি কীর্ত্তন করিতে প্রকৃত অনুরাগ জন্মে ও মানব শনৈঃ শনৈঃ শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সময়ে প্রকৃত জীবন আরম্ভ হইল।

গত সংখ্যায় যে শ্লোকটি আলোচনা করা গিয়াছে তাহার পরের শ্লোকটি এই।

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিলেন যে আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে এই বেদবাক্য প্রচলিত আছে যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারায় জ্ঞান হয়, ইহাই ধর্ম্ম সাধনার পথ। ভাগবতে বলা হইল যে যাহা হইতে অধোক্ষজ অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি উৎপাদিত হয় তাহাই পরধর্ম্ম। তাহা হইলে ভাগবত শাস্ত্র কি প্রাচীন মত উড়াইয়া দিয়া একটি অভিনব মতের প্রতিষ্ঠা করিলেন? শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন না ভাগবত তাহা করেন নাই। ভাগবত বলিতেছেন যে "ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে আশু বৈরাগ্য জন্মায় ও সেই বৈরাগ্যের ফলে জ্ঞানেরও আবির্ভাব হয়। অবশ্য এই যে জ্ঞান ইহার একটু বিশিষ্টতা এবং শ্রেষ্ঠতা আছে। এই জ্ঞান অহৈতুক অর্থাৎ শুষ্কতর্কাদির অগোচর। এই জ্ঞানকে ঔপনিষদ জ্ঞান কহে।"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ভাগবত ধর্ম্মে অগ্রে ভক্তি তাহার পর বৈরাগ্য। বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সমূহ পরিত্যাগ করিবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই উপদেশ পাইয়া থাকি এবং তদনুযায়ী চেষ্টাও করিয়া থাকি কিন্তু প্রায়শঃই কৃতকার্য্য হই না। আসল কথা একটা বড় অনুরাগ চিত্ত মধ্যে জাগাইতে পারিলে, সেই নিত্য ও পরমার্থ বস্তুকে একবার আভাসকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার জন্য একটু ব্যাকুল হইতে পারিলে আর বৈরাগ্য সাধনার জন্য বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না আপনিই তাহা হইয়া যাইবে। বৈরাগ্য হইলে জ্ঞানও সুলভ।

শ্রীজীবগোস্বামী এই শ্লোকের মর্ম্ম যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমরা পূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি। তিনি এই উপদেশ দিলেন যে কুটিলক্ষণা ভক্তির উদয় হইলেই মানবের জীবন শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা অত্যন্ত দ্রুতবেগে উন্নত ও পবিত্র হইয়া উঠিবে। এতদিন হিসাব নিকাশ করিয়া, বাহির হইতে নানরূপ চেষ্টা করিয়াও যে পবিত্রতা অর্জ্জনের জন্য অগ্রসর হইয়া পদে পদে পদস্খলিত হইতেছিলাম; এখন তাহা আপনিই অনায়াসে সাধিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবত নিম্নের শ্লোকে এই ভাবেরই দ্যোতনা করিয়াছেন—

"যস্যাস্তি ভক্তি-র্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে অর্থাৎ যিনি হৃদয়ের মধ্যে এক প্রকাণ্ড শূন্যতা অনুভব করিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন আমার আর কিছুই নাই, ধন, জন, মান, সম্ভ্রম, এ সমস্ত আমার নহে এই জ্ঞানের উদয়ে যিনি শূন্য হৃদয়ের পূর্ণতাবিধানের প্রয়াসী হইয়া শ্রীভগচ্চরণারবিন্দের জন্য লোলুপ হইয়াছেন; সমস্ত দেবগণ যাবতীয় সদ্‌গুণ লইয়া সেই ব্যক্তির চরিত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার নৈতিক জীবন তৎক্ষণাৎ উচ্চতম পবিত্রতার ক্ষেত্রে আরোহণ করে। যাঁহার এই ভক্তি নাই, তাঁহার মহদ্‌গুণ কোথায়? অর্থাৎ তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রের ও অন্যান্য সদ্‌গুণেরও একটা স্থায়ী ও দৃঢ়ভিত্তি নাই. সে ব্যক্তি মনোরথে আরোহণ করিয়া কেবল বাহিরে অর্থাৎ সুখশান্তির অন্বেষণে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে দেশে ভক্তিশাস্ত্র যথার্থভাবে প্রচার করার ও আস্তিক্যবুদ্ধি জাগরিত করিয়া মানবকে শ্রীভগবানে অনুরাগ-যুক্ত করিবার চেষ্টার আবশ্যকতা কি ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। মানুষকে বলা যায় দেশের জন্য পরিশ্রম কর, দরিদ্রের অন্নব্যবস্থা কর, অশিক্ষিতকে জ্ঞানালোক প্রদান কর। সে তাহা করিতে যায়। ক্রমে ক্রমে তাহার খ্যাতি হয় সম্ভ্রম হয়, ধনী সন্তানেরা পৃষ্ঠপোষক হইয়া দরিদ্র ও শক্তিশালী ব্যক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার হৃদয় মধ্যে যে বিষয়বাসনা এতদিন নিদ্রাগত ছিল তাহাকে জাগাইয়া তুলেন, তখন সে বেচারা বিষয়পঙ্কে পড়িয়া নিজের ও দেশের সর্ব্বনাশ করে। এইরূপ ঘটনা দেশে শত শত ঘটিতেছে, ইহা হইতে দেশ পরিত্রাণ পাইতে পারে না, যদি সর্ব্বাগ্রে সাধকের চিত্তে, কর্ম্মীর চিত্তে এই অকিঞ্চনা ভক্তি উৎপাদন করিয়া তাহাতে নিয়মিতভাবে শ্রবণকীর্ত্তনময় বারি সিঞ্চন করা না যায়। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের প্রতিপাদ্য যুগধর্ম্মের এই বিশিষ্ঠতাটুকু চিন্তাশীল ও দেশহিতৈষী মহাত্মগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন। একদিকে সুবিধাবাদ আর একদিকে ভাগবতধর্ম্ম ইহা কখনই হইতে পারে না।

এই পথ আশ্রয় করিলে (শ্রীজীবগোস্বামীর মতে) যে জ্ঞান হয় তাহা শ্রীভগবানের স্বরূপাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞান। শ্রীভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানের উদ্রেক হইলে অন্য বিষয়ে বৈরাগ্য আপনা হইতে সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। আলোক জ্বালিলে অন্ধকার যেমন দূরগত হয় সেইরূপ। মূলে আছে আশু

জ্ঞান উৎপাদিত হয়। আশু শব্দের অর্থ শ্রবণমাত্রেই। আমরা শাস্ত্র শ্রবণ করি কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় হওয়ার পর যে বৈরাগ্য হয়, সেই বৈরাগ্য উৎপাদিত হইলে ভগবৎ কথা শ্রবণমাত্রেই তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়।

আজকাল অনেকেই ভক্তিশাস্ত্র ও লীলাগ্রন্থের আলোচনা করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা এইটুকু সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন যে হৃদয় ও মন একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত না হইলে ভক্তিশাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অবগত হওয়া অসম্ভব। প্রথমে কিছু সাধনা চাই, নতুবা যেরূপ ভাবে স্কুল কলেজের গ্রন্থ পড়িয়া আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সে ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের আলোচনা করিলে কোনই ফল হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে আমরা যাহা পাইলাম তাহা সংক্ষেপে এই। শ্রীভগবানের রূপ ও গুণের মাধুর্য্য অপরিসীম। এই রূপগুণমাধুর্য্য যদি একবার শ্রীভগবানের কৃপায় মানব অনুভব করিতে পারে তাহা হইলে যাবতীয় দুর্ব্বিষয়ে স্বভাবতঃ বৈমুখ্য জন্মিয়া থাকে। এই যে ভক্তিযোগ ইহা ভগবানে প্রযোজিত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যোজিত হওয়া চাই। প্রকৃষ্টরূপে যোজিত বলিলে সম্বন্ধানুগা ভক্তি বুঝিতে হইবে, আমি ভগবানের দাস বা সখা এই প্রকারের একটা অভিমান আসিয়া মানবকে আশ্রয় করে। এই অবস্থা আসিলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য আপনা হইতেই উৎপাদিত হয়। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন "জ্ঞানবৈরাগ্যার্থং পৃথক্ যত্নো ভক্তৈনকর্ত্তব্যঃ" যেমন আহারের দ্বারা তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানাশ হয় সেইরূপ ভক্তি, পরেশানুভব ও অন্যত্র বিরক্তি এই তিনটি এককালে সাধিত হয়।

এইবার আমরা চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিব শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যে ভক্তি তাহার স্বরূপ কি। ভক্তি দুর্ব্বলের নহে, ভক্তি আরামপ্রিয় ব্যক্তির নহে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক জনসমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের জন্য যে সমস্ত ভাবুকতা করে তাহাও ভক্তি নহে; ভক্তি বড় উচ্চ জিনিস। আজ দেশে ভক্তির এই স্বরূপ বিশেষভাবে প্রচার করা একান্তভাবে প্রয়োজন। নতুবা এই পুনরুত্থানের দিনে যে সুবিধা আছে, সেই সুবিধা দ্বারা অনর্থ হইতে পারে।

ভারতে নারীর সম্মান।

ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আমরা আজকাল সমস্তই স্বচক্ষে না দেখিয়া ধার করা চশমার সাহায্যে দেখিয়া থাকি। কোন বিষয় তলাইয়া বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের এখন খুব অল্পই আছে। সাহেবেরা যে মত প্রকাশ করেন আমরা তাহাই বিনা বিচারে বেদবাক্যবৎ গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহার জন্য আমাদের কুসংস্কার-ত্যাগরূপ কুসংস্কার দায়ী। আমাদের একটী ধারণা কুসংস্কার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইছে যে বিজ্ঞানালোক আলোকিত কুসংস্কারবর্জ্জিত পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ যাহা বলিবেন তাহাই পরম সত্য, আর রেল-ষ্টীমার-ব্যোমযান প্রভৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ সুতরাং অর্দ্ধসভ্যমাত্র আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সমস্ত ধারণা ও কার্য্যাবলী কুসংস্কার মূলক ও ভ্রান্ত। এইরূপ নব্যধারণাবশতঃ আমরা আমাদের দেশের ও জাতির অনেক বিষয়ের যাথর্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে নানাপ্রকার অন্যায় ও অবিচার করিয়া থাকি। সেই সকলের মধ্যে আদের প্রবন্ধের আলোচ্যবিষয় একটী।

পাশ্চাত্যসভ্যতালোক পাইবার পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ স্ত্রীজাতির সম্মান করিতে জানিত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে সাহেবীবুলির অনুকরণকারী নব্যশিক্ষিত "হরবোলা"র দল একবাক্যে বলিয়া উঠেন "কখনই নহে, কখনই নহে"। তাঁহাদের ধার-করা মতের সমর্থনার্থে তাঁহারা চশমা-দিয়ে দেখা বেশ কতকগুলি প্রমাণও উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে যেদেশে মেয়েদের অন্ধকূপবৎ অন্দরমহলের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া গায়ে রোদ্‌বাতাস লাগাইবার যো নাই, এবং যেখানে তাঁহাদের চিরজীবন পরমুখাপেক্ষিণী অসহায়া অবলা হইয়া থাকিতে হয়,—সেদেশ যে কখনও নারীর মর্য্যাদা বুঝিত বা নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিত তাহা কবি-কল্পনাবৎ নিতান্ত অলীক। আধুনিকদিগের মতে "নারীজাতির সম্মান" বিলাত হইতে আমদানী হইয়াছে। সাহেবী কেতাব পড়িয়া, সাহেবী চাল্‌ চলন দেখিয়া আমাদের "শিভ্যালরী" অর্থাৎ কিরূপে স্ত্রীজাতির সম্মান্‌ করিতে হয় তাহা শিখিতে হইবে। বাস্তবিকই, আমাদের ইংরাজীশিক্ষিতের একদল যাঁহারা "সংস্কৃত সম্প্রদায়" (reformed Society)

তাঁহারা শিভ্যালরী বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশবাসিগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্যের অনুকরণবশতঃ আমাদের অন্দরমহলের পুরাতন প্রাচীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। দলে দলে কুল-ললনাগণ বৈঠকখানার মুক্ত বাতাসে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতেছেন, এবং গুণগ্রাহী পুরুষসমাজে ঘৃণিত "স্ত্রীজাতি" নামের পরিবর্ত্তে শ্রুতিমধুর মোলায়েম "মহিলাকুল" নামে সমাদৃত হইতেছেন। আজকাল আমাদের চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী ও ষোড়শীবৃন্দ ধপ্ ধপে গাউন ও জ্যাকেটজামায় মেমসাহেব সাজিয়া অবগুণ্ঠনবিহীন প্রস্ফুটিত বদন-কমলের দশদিকআলোকরা শোভায় যুবকবৃন্দের হৃদয়ে কবিত্ব ও মাধুর্য্যরসের তরঙ্গ বহাইয়া স্কুল কলেজে যাতায়াত করেন; এবং অনেকে বি, এ, এম, এ, উপাধিভূষণে সম্মানিতা হইয়া বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়ত্রী বা ইনস্পেকট্রেসের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমরণ চিরকুমারীরূপে জীবন যাপন করেন। আবার কখনও কখনও মহিলাদিগের সভা হইতে দেখা যায় এবং তাহাতে অনেকে চোখে চশমা পরিয়া রাজনৈতিক আলোচনা দ্বারা দূরভবিষ্যতে দ্বিতীয় সফ্রাগেট্ অভিনয়ের ক্ষীণ আভাস প্রদান করিয়া থাকেন। কোন কোন বিদুষী পুরুষ মানুষের সভায় বক্তৃতা দিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তি সমূহের করতালি দানে সভাগৃহ শব্দায়মান হইয়া উঠে। আর আমাদের কংগ্রেশ কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি তো বিদুষীললনাগণের উপস্থিতি দ্বারা সর্ব্বদা সৌষ্ঠবান্বিত হইয়া থাকে এবং বক্তা ভগিনীদিগকে সম্বোধন করিবার সময় তাঁহাদের শিক্ষালোক সমুদ্ভাসিত স্বাধীনতা ও উৎসাহব্যঞ্জক সুষমাময় আনন নিরীক্ষণ করিয়া উষ্ণীভূত হৃদয়ে নব উদ্দীপনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

আমরা সাহেবদিগের নিকট হইতে এইরূপে স্ত্রীজাতিকে ভগিনীভাবে দেখিতে ও সম্মান করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু ঐরূপে প্রকৃত সম্মান দেখান হইতেছে কিনা তৎসম্বন্ধে মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের অনুকরণ করিবার পূর্ব্বে আমাদের ধীরভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, সাহেবদের বাহ্যিক আদবকায়দার ভিতরে যাথার্থ্য আছে কিনা, তাহা সত্য অনুকরণীয় কিনা এবং আমাদের দেশীয় ভাবে নারীর প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শনের কোন উৎকৃষ্ট প্রণালী ছিল বা সম্ভবপর কিনা।

পাশ্চাত্যদেশে শিভ্যালরীর বাহিরের ঠাট্ বজায় থাকিলেও তাহার ভিতরে সার নাই। তথাকার অনেক লেডীদিগের পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য, নৃত্যকলাকৌশল, পিয়ানোবাদনপটুতা এবং সামাজিকতার ভিতর দিয়া হাজ্ব্যাণ্ড্হাণ্টিং বা স্বামীশিকার অর্থাৎ পতি-লাভ প্রয়াস দৃষ্ট হয়। নিজের মোহনমন্ত্রে, নিজের চেষ্টায় স্বামী সংগ্রহ করিতে না পারিলে তথায় অনেক রমণীকেই চিরকন্যা থাকিতে হয় এবং তাঁহাদের ভাগ্যে কখনও কন্যাস্থানীয়া বধূ হওয়া ঘটে না। ইউরোপ ও আমেরিকায় মেয়েরা স্বাধীন এবং তাঁহাদিগকে সংসারী করিবার জন্য পিতামাতা বা অন্যকোন আত্মীয়ের কোনরূপ দায়িত্ব না থাকায় অনেক রমণী দাম্পত্য গার্হস্থ্যজীবনের সুখশান্তির স্বাদ হইতে একেবারে বঞ্চিত থাকেন। হায়! যাঁহারা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সংসারচক্রের স্থির-দণ্ড স্বরূপ, যাঁহারা সংসারীর জীবনযাত্রার ধ্রুবতারা—তাঁহাদিগকেই কিনা আমরণ লক্ষ্যহীনভাবে ছুটাছুটি করিয়া ইহ-লীলা সাঙ্গ করিতে হয়! সুতরাং যেখানে নারীর নারীজন্ম বৃথা যায় এবং তাহার সার্থকতাসাধন জন্য কোন চেষ্টা করা হয় না, সে দেশবাসীগণ কি কখনও নারীর প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝে বা প্রকৃত সম্মান করিতে জানে? সাহেব-দের বাহিরের আদবকায়দাও সর্ব্বথা সুষ্ঠু বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে অবাধে পরস্পরের সহিত মিশিয়া থাকেন; এবং সুন্দরী যুবতীসহ শিষ্টাচারের করমর্দ্দন সময়ে অনেকেই যে ভ্রাতৃভাবের সাত্ত্বিকতাহেতু সর্ব্বাঙ্গে তাড়িৎকম্পন অনুভব করিয়া থাকেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিলে বলিতে হইবে হয় শারীর ও মনোবিজ্ঞান (ফিজিয়োলজি ও সাইকোলজি) শাস্ত্রদ্বয় ভ্রম ও মিথ্যাপূর্ণ নচেৎ প্রত্যেকটি সাহেব রামকৃষ্ণ পরমহংস। ইহা অতি খাঁটি কথা যে পাশ্চাত্যজাতি সমূহের শিভ্যাল্রীর মধ্যে কামতৃষ্ণা উঁকি ঝুঁকি মারে। সুতরাং নারীর প্রতি পাশ্চাত্যের শিষ্টাচার ও সম্মানপ্রদর্শন প্রণালী আমাদের বিনা বিচারে কিঞ্চিন্মাত্রও অনুকরণ করা উচিত নহে।

আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে কাহারও প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখাইতে হইলে তাহার প্রকৃতিতে যেটুকু ভাল, যেটুকু বিশেষত্ব এবং তাহার জীবনের যাহাতে সার্থকতা, তাহা হৃদয়ের সহিত বুঝিয়া তদুপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদ-র্শন করিতে হইবে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নারীকে স্নেহময়ী "মাতা" রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং নারীর হৃদয়খানি দয়া, মায়া, স্নেহ, সান্ত্বনা, ভালবাসা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কোমলতার প্রস্রবণরূপে গঠন করিয়াছেন। নারী জগতের

পালিকাধাত্রী এবং শুশ্রূষাকারিণী মূর্ত্তিমতী সেবা। পরম কারুণিক যেন জগৎপালনের জন্য স্বীয় অপার করুণা নারীদেহাভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া ধরায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। রমণী রোগশোক দরিদ্রতাজর্জ্জরিত বিপদসঙ্কুল সংসার-মরুমধ্যে রমণীয় মরূদ্যানবৎ অবস্থান করিয়া সতত আমাদের গার্হস্থ্যজীবনে শান্তিদান করিয়া থাকেন। রমণী এইরূপ স্নেহসেবাকরুণাময়ী মূর্ত্তিতে ভারতের প্রতি গৃহ আলো করিয়া ত্রিতাপে তাপিত সংসারীর হৃদয় শান্তির স্নিগ্ধকিরণে শীতল করিতেছেন। নারীর এই প্রকৃতি' বা স্বরূপ' হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে নারীর প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। কিন্তু রমণীর এই মধুর ছবি ভারতব্যতীত পৃথিবীর আর কোথায় এমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং হিন্দুব্যতীত আর কে নারীর প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ের সহিত বুঝিয়াছে?

নারীর নারীত্ব হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, নারীর মর্য্যাদা হিন্দুরা যেমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তেমনটী সভ্যতাগর্ব্বিত আধুনিক জাতিসমূহের মধ্যে অতি বিরল নারীর নারীত্ব যে মাতৃত্বে, নারী যে ধরায় দেবীরূপিণী তাহা হিন্দুরাই বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই, হিন্দু বধূকে "গৃহলক্ষ্মী" "মা লক্ষ্মী" ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করেন। গৃহস্থের পরম পূজনীয়া শ্রী ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামে সম্বোধন কি কম সম্মানের চিহ্ন? শুধু ইহাই নহে, এখনও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু নারীকে জগজ্জননী ভগবতীর অংশ-জ্ঞানে কুমারী ও সধবার পূজা করিয়া থাকেন; এবং নির্ব্বিঘ্নে দিন যাপন করিবার জন্য প্রাতরুত্থানের সময় অহল্যাদি পঞ্চ সতীর নাম স্মরণ করিয়া থাকেন। মনু বলিয়া গিয়াছেন "যত্রনার্যস্তপূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা"। নারীদিগকে যথায় পূজা অর্থাৎ বিশেষ আদর যত্ন করা হয় তথায় দেবগণ আনন্দের সহিত অবস্থান করেন।

বাস্তবিকই হিন্দুগণ নারীর প্রতি যতটা মনোযোগ দেন তাহাকে যতটুকু যত্ন করেন আর কোন শ্রেণীর লোকই ততটা করে না বা করিতে পারে না। হিন্দু পিতা শৈশব ও বাল্যাবস্থায় কন্যাকে অতি যত্নে লালন পালন করেন,—পিতার কাছে কন্যা পুত্রাপেক্ষা অধিক আদর পাইয়া থাকে। পরে কন্যা অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে পিতা সৎপাত্রের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য পিতা ঋণজালে জড়িত এবং এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন। কন্যাদায়গ্রস্ত হিন্দুর চিন্তাজ্বরে নিদ্রাহানি হইয়া

থাকে। কন্যার জন্য অতটা চিন্তা অতটা কষ্ট অন্য কোন জাতীয় লোকের কখনও হইয়া থাকে কি? উপযুক্তবয়সে কন্যার বিবাহ না দিলে আমাদের ধর্ম্মমতে পাতকগ্রস্ত হইতে হয় বলিয়া আমাদের দেশে বাড়ীঘর বিক্রয় করিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় করিতে হইলেও কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে। এইজন্য জাতির প্রত্যেক নারী দাম্পত্যজীবনযাপন, পুত্রমুখদর্শন, এবং সন্তানের লালন পালন দ্বারা নারীত্বের সার্থকতা করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। প্রত্যেক সুধীব্যক্তিই স্পষ্ট বাক্যে বলিবেন যে নারীর ভরণপোষণ প্রভৃতি সমস্ত ভার লইয়া তাহাকে নারীজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবার অবসর বা সুযোগসুবিধা দেওয়াই নারীর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন। সুতরাং ভারতবাসী বিশেষতঃ হিন্দুর নিকট রমণী যে বিশেষ মর্য্যাদা বা সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহা সর্ব্বপ্রকার সন্দেহের অতীত।

অনেকে বলিতে পারেন ভারতবাসিগণ স্ত্রীশিক্ষার প্রতি উদাসীন কিন্তু আজকালকার নভেল-নাটক পড়া কয়জন শিক্ষিতা সেকেলে গিন্নির মত গৃহস্থালীও সন্তান পালন করিতে জানে? কয়জনের সেরূপ কার্য্যকুশলতা কষ্টসহিষ্ণুতা ও গার্হস্থ্যজীবনের অতি প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সমূহ আছে? সেকালে ধন-কুবেরের স্ত্রীকেও রন্ধনাদি অনেক গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে করিতে হইত। কিন্তু আজকাল আমরা দাম্পত্য জীবনের কবিত্বে বিভোর থাকিতে চাই; এবং আমাদের বিদূষী অর্দ্ধাঙ্গিনীগণ নভেল নাটক পাঠে ও মাসিকের লেখিকা নাম পাইবার জন্য পদ্যরচনায় সময় ক্ষেপন করেন। আর, বর্ত্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে দুর্ম্মূল্যের সময় পাচক পাচিকা দাসদাসী প্রভৃতি রাখিতে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে ঋণজালে বিজড়িত হইতে হয়। সে বিদ্যা কাজে আইসে না তাহা বৃথা এবং কেবলমাত্র অহঙ্কারের প্রশ্রয়দায়ক। পুরুষোচিত শিক্ষা দিয়া স্ত্রীকে পুংভাবাপন্না করা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযোগী নহে এবং সমাজের পক্ষেও মঙ্গলজনক নহে। পুরুষের মত শিক্ষা দেওয়ায় লাভের মধ্যে নারী-হৃদয় ক্রমশঃ কোমলত্ব হারাইয়া কঠিন পুরুষ-হৃদয়ে পরিণত হইতেছে; এবং স্ত্রীস্বভাবে লজ্জা, নম্রতা, সংযম প্রভৃতির স্থলে ক্রমে ক্রমে নির্লজ্জতা, ঔদ্ধত্য ও চাঞ্চল্য প্রবেশ করিতেছে। যে শিক্ষায় নারীর নারীত্বের বিকাশ হয় তাহাই উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা এবং সে শিক্ষায় যে হিন্দুরমণীগণ বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন তাহা আমাদের পিতামহী ও মাতামহীর জীবনালোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেকালে পল্লীতে পল্লীতে

৺বিদ্যাসাগরের মায়ের ন্যায় ও ৺পরমহংসদেবের পত্নীর ন্যায় স্বভাববিশিষ্টা রমণী দৃষ্ট হইতেন কিন্তু আজকাল সারাদেশ খুঁজিলে তেমন একটীও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

আমাদের আর একটা অপবাদ যে আমরা স্ত্রীদিগকে গাঁয়ে রোদ্ বাতাস লাগাইতে দেই না ও জেলখানার কয়েদীর ন্যায় অন্দরমহলে আবদ্ধ করিয়া রাখি। এই অপবাদের অনেকটাই ভিত্তিহীণ। বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি অনেক প্রদেশে হিন্দুনারীর অবরোধপ্রথা নাই। বঙ্গবিহার প্রভৃতি প্রদেশে মুসলমান প্রভাববশতঃ অবরোধ প্রথা আছে বটে কিন্তু তাহাতে কোন দোষ বা ক্ষতি লক্ষিত হয় না। স্ত্রীলোকেরা পরস্পরের সহিত অবাধে বেশ অমায়িক ভাবে মিলামিশা করিয়া থাকেন, এবং আত্মীয় ও কুটুম্ব ও সম্বন্ধে ছোট এমন অনেক পুরুষের সহিতও বাক্যালাপ করিয়া থাকেন। আর প্রৌঢ়া হইলে অবরোধ উঠিয়া যায় বলিলেই চলে। স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা কেবল তাহার যৌবনকালের জন্য ;—তাহা দোষের নহে, বরং মঙ্গলকর। সাহেবিয়ানার ভক্তগণ যুবতী রমণীদিগকে পুরুষের সহিত অবাধে মিশিতে দেওয়ার নানাপ্রকার কুফল বুঝিতে পারিয়া আজকাল সতর্ক হইতেছেন এবং আবার পর্দা তাহার যথাস্থানে পুনরধিষ্ঠিত হইতেছে। যথার্থতঃ আমাদের অন্দরমহল কয়েদখানা নহে কিন্তু পরম পবিত্র দেবমন্দির স্বরূপ। পাপীর অপবিত্র দৃষ্টি যাহাতে দেবীরূপিণী কুললক্ষ্মীগণের পবিত্র দেহোপরে পতিত না হয় তজ্জন্যই আমাদের অন্দরমহল ও পর্দার সৃষ্টি। হিন্দুর নিকট রমণীর এতদুর উচ্চ সম্মান যে যাহাতে নারীর প্রতি মনে কিছুমাত্র অপবিত্র ভাবের সঞ্চার না হইতে পারে সেজন্য হিন্দু অতি সতর্ক ও যত্নশীল। হিন্দুর শিষ্টাচার অনুসারে রমণীর চরণদ্বয় ব্যতীত তদুর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। মাতার প্রতি সন্তানের যেমন, প্রত্যেক নারীর সম্বন্ধে আমাদের মনেও তেমি নির্ব্বিকার পবিত্রভাব রক্ষা করিতে হইবে। তাই, আমাদের হিন্দুশাস্ত্র গম্ভীরভাবে অনুশাসন করিতেছেন "মাতৃবৎ পরদারেষু"। পতিতা বারবণিতাও হিন্দুসাধুর নিকট "মা ঠাকরুন"। মাতৃরূপী রমণীর সম্মান যাহাতে পরপুরুষের স্পর্শ বা দৃষ্টিমাত্রদ্বারাও তিলমাত্র ন্যূন না হয় সেজন্য হিন্দু আত্মপ্রাণ বিনিময়েও নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। রাজপুতজাতির ইতিহাসে ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

অতএব বিনীত জিজ্ঞাস্য যে নারীর প্রতি ভারতবাসী—হিন্দু অপেক্ষা কে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিতে পারে ?

ভাগ্যহীন।

এই শান্ত সুদূর নীল গগনে উজলে আলোক-ধারা,
আমায় কি যেন ভাবা'য়ে কি যেন ভুলা'য়ে করিছে পাগল-পারা!

নাহি জানি ওরা কোথা হ'তে আসে,
কেন বা আসে,—কোথা যায় ভেসে;
আমি শুধু জানি, ওরা যেতেছে চলিয়া
আপনার পথ বাহিয়া।

নিম্নে বহিছে নদী বেগবতী,
খরস্রোত তার—অবিরাম গতি,
বহে সমবেগে—উর্দ্ধে যেমতি
চলে আকাশের তারা।

কেন মম হৃদে আসে অবসাদ,
কেন বা উথলি উঠে বিষাদ!
কেন নাহি রত আপন কর্ম্মে
তারকা নদীর পারা।

চিরদিন মম গেল কল্পনায়,
চিরদিন মোর গেল নিরাশায়,
জীবনের ক্ষয় করিনু বৃথায়
চিরকাল পথ-হারা।

শৈশব হইতে করেছি ক্রন্দন,
কাঁদিতে কাঁদিতে কাটিল জীবন,
সব লীলাখেলা ভাবি গো এখন
কখন হইবে সারা!

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসকদম্ব।(৭)

ভক্তিপ্রবেশে এ দুই এর অকিঞ্চিত করণ।
তাহার ভাবনায় ভক্তির বিচ্ছেদ সে হন॥
তাহার কারণ কহি শুন সাবধানে।
সেই দুই কাঠিন্য হেতু লিখিলা প্রমাণে॥
তর্ক বিচারাদি দুঃখ করিঞা সহন।
কাঠিন্য হেতু জ্ঞান বৈরাগ্য যোগ ক'ন॥
সুকুমার স্বভাব ভক্তি তদ্ধেতু কৈছে হ'বে॥
অতএব জ্ঞান বৈরাগ্য অঙ্গ না জানিবে॥
শ্রীকৃষ্ণ মধুর লীলা ভাবনাদি ময়।
অতএব ভক্তিযোগ শুদ্ধ মার হয়॥
যথা॥
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োর্ভক্তি প্রবেশায়োপ-যোগিতা।
ঈষৎ প্রথম মেবেতিনাঙ্গ ত্ব মুচিতং তয়োঃ॥
যদুভে চিত্ত কাঠিন্য হেতুপ্রায়ঃ সতাংমতে।
সুকুমার স্বভাবেয়ং ভক্তি স্তদ্ধে ভূ রিরিতা॥
অতএব দেখ কহেন প্রভু ভগবান।
মোর ভক্ত যোগযুক্ত মন্নিবিষ্ট প্রাণ॥
প্রায় তার জ্ঞান বৈরাগ্য দূরে করি।
তার শ্রেয় হয় সেহ হয়ে অধিকারী॥
যথা—॥
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ইতি॥
শ্রেয়ো ভক্তিরিতি॥
জ্ঞান বৈরাগ্যাদি যেবা সাধনের ফল।
চতুর্ব্বর্গ ফলাদি সে জানিহ সকল॥
কৃষ্ণভক্তি হইলে সে আপনি আসে হয়ে।
কোন ভক্ত স্বর্গাদি যদি বা বাঞ্ছয়ে॥
কর্ম্ম তপ জ্ঞান বৈরাগ্যে যে বা হয় ফল।
ভক্তি বলে অনায়াসে পায় সে সকল॥
সকাম ভক্তির বলে সালোক্যাদি গতি।
সেবা নিষ্ঠ রূপে হয় তাহা সভার মুক্তি॥
যথা শ্রীভাগবতে॥
যৎ কর্ম্ম ভির্যত্তপসা জ্ঞান বৈরাগ্যতশ্চ যৎ
যোগেন দান ধর্ম্মেন শ্রেয়োভি রিতরৈরপি
ইতরৈঃ সালোক্যাদি কমসাময়' ভক্তাদিভিঃ।
সর্ব্বং মদ্ভক্তি যোগেন মদ্ভক্ত লভতেহঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গ মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতে॥

অপিচ ॥

কচিমুহূর্ত্ত.স্তত্র জন্ম ভজনে হরেঃ।
বিষয়েষু গরিষ্ঠোপি রাগঃপ্রায়ো বিনীয়তে ॥

অথ তত্র বৈরাগ্য লক্ষণং ॥ তচ্চ দ্বিবিধং
যুক্ত বৈরাগ্যং ফল্গু বৈরাগ্যঞ্চ তদ্ যথা ॥

নিজ সুখ বিষয়াদি করিঞা তেজন।
ইন্দ্রিয় বিষয় নিজ করয়ে দমন ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যাদি।
কৃষ্ণ সম্বন্ধে করে কর্ম্ম অন্য বিষয় ত্যজি ॥
সেবোপযুক্ত করে কর্ম্ম যেই সব জন।
যুক্ত বৈরাগ্য ধর্ম্ম তা সভার কন ॥

যথা ॥

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্ত বৈরাগ্যমুচ্চতে ॥

তত্র ফল্গু বৈরাগং যথা ॥

সেবোপযুক্ত দ্রব্যে প্রপঞ্চ জ্ঞান করি।
সেবাধর্ম্ম ত্যাগ করে যোগে ভজে হরি ॥
সেবাদ্রব্য সংগ্রহে বিষয় বলি জ্ঞান।
সর্ব্ব বিষয় ছাড়ি ভজে ভগবান।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করে বিষয়ে বিরাগ।
কোন সুখ নাহি বাঞ্ছা সর্ব্ব ভোগত্যাগ ॥
বিষয় জ্ঞান করি সেবা ত্যাগ করে।
মুমুক্ষু সকল জ্ঞান বৈরাগ্য আচরে ॥
ফল্গু বৈরাগ্য নাম তাহা কারে কন।
ভক্ত্যঙ্গত্বে নিরূপন তারা নাহি হন ॥

যথা ॥

প্রাপঞ্চিক ভয়াবুদ্ধ্যা হরি সম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্য ফল্গু কথ্যতে ॥

কৃষ্ণ মহা প্রসাদাদি নাকরে গ্রহণ।
ভোগ বলিঞা নির্ম্মাল্য করয়ে তেজন ॥
এই হেতু ফল্গু বৈরাগ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান।
যেই জ্ঞানে করে ব্রাহ্মানুভব সন্ধান ॥
ভক্ত্যঙ্গত্বে অনুপযোগী এই সব হন।
পুনঃ পুনঃ করিলেন অঙ্গত্বে বারণ ॥

যথা। প্রোক্তেন লক্ষণেনৈব ইত্যাদি ॥

ধন ব্যাপারে কিম্বা শিষ্যাদি দ্বারাতে।
শ্রীমূর্ত্ত্যাদির সেবা করয়ে তাহাতে ॥
উত্তম ভক্তির অঙ্গ সেহ নাহি কন।
জ্ঞান কর্ম্মার্থনাবৃতাদি শৌথিল্য হন।
পরিচর্য্যাদিরূপ তুলস্যাদি অর্পণ।
ধন ব্যাপারাদ্যে উত্তম তাহা নিহন ॥
অতএব বিবেকাদি ভক্ত্যাঙ্গ নাহি হয়।
সবৈমনঃ কৃষ্ণ ইত্যাদি যাহে নয় ॥

যথা ॥

ধন শিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যাভক্তিরূপ পাদ্যতে।
বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যাতস্যাশ্চনাঙ্গতা ॥

সেই ভক্তি হয় জানি সুদৃঢ় সাধনে।
একাঙ্গ সাধয়ে কেহু কেহু বহু ক্রমে ॥
সব বাসনা অনুসারে নিষ্ঠা চিত্তে যজে।
কৃষ্ণ নিষ্ঠ হইয়া মাত্র কোন অঙ্গে ভজে ॥
এক অঙ্গ সাধি কেহু সুকৃতার্থ হন।
কেহু বহু অঙ্গ সাধি হয়েত পাবন ॥

যথা ॥

সাভক্তিরেকমুখ্যাঙ্গাশ্রিতানেকাঙ্গিকা-
থবা।
স বাসনানুসারেন সিদ্ধিকৃৎ ভবেৎ ॥

তত্র একাঙ্গা যথা ॥

পরীক্ষিত কৃতার্থ-নাম লীলাদি শ্রবণে।
শুকদেব নিত্য মুক্ত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে ॥
স্মরণে কৃতার্থ হইলা প্রহ্লাদ দৈত্যপতি।
ভজনে পাইলা লক্ষ্মী শ্রীগোবিন্দপতি ॥
পূজনে কৃতার্থ পৃথুরাজা নরনাথ।
বন্দনাতে পাইলা অক্রুর জগন্নাথ ॥
দাস্যভাবে হনুমান পাইলা রামচন্দ্র।
সখ্যে অর্জ্জুন বস কৈল কৃষ্ণ চন্দ্র ॥
আত্মা আত্মিয় দেহ করি সমর্পন।
বলি রাজা কৃতার্থ হইল খ্যাত ত্রিভুবন ॥

যথা পুরাণান্তরে ॥—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভর-
দ্বৈয়াসকীঃ
প্রহ্লাদ স্মরণে তদাঙ্ঘ্রি ভজনে
লক্ষ্মী পৃথু পূজনে।
অক্রুর স্বভিবন্দনে কবিপতির্দাস্যেচ
সখ্যের্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্যাত্ম নিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তি বেধাং পরং ॥ ॥

এইত কহিল মাত্র একাঙ্গ লক্ষণ।
এক অঙ্গ মুখ্য পূর্ণ অন্য অঙ্গ হীন ॥
অনেকাঙ্গ ভক্তি শুভ্র ভাগবত নবমে।
অম্বুরীশ কহিলেন প্রভুর চরণে ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ কর্ম্ম সদা আচরণ।
বহু অঙ্গ ভক্তি হয় তাহাতে দর্শন ॥
কৃষ্ণ পদযুগে মতি সদা অনুগত।
বাক্যে কৃষ্ণলীলা গুণ বর্ণে অবিরত ॥
হস্তে পরিচর্য্যা শ্রীমন্দিরাদি সংস্কার।
কর্ণে কৃষ্ণ কথা বিনু নাহি শুনে আর ॥
কৃষ্ণ মূর্ত্তি কৃষ্ণালয় শ্রীগুরু দর্শনে।
নিরবধি ছার নিষ্ঠ হয় দুনয়নে ॥
কৃষ্ণভক্তগণ সহ দেহে আলিঙ্গন।
অষ্টাঙ্গ প্রাণপাত দেহের করণ ॥
কৃষ্ণ দত্ত গন্ধ পুষ্প নাসায় গ্রহণ।
রসনায় তুলস্যাদি নির্ম্মাল্য ভক্ষণ ॥
চরণের কার্য্যক্ষেত্রে তীর্থ স্থানে গতি।
মস্তকের কার্য্য-সদা পাদ পদ্মে নতি ॥
সর্ব্ব কাম্য কামনা করিয়া পরিত্যাগ।
কৃষ্ণদাস্যে কামনা সদত অনুরাগ ॥
বহু অঙ্গ লক্ষণ এই অম্বুরীষের বচন।
নবম স্কন্ধে ভাগবতে ব্যাসের লিখন ॥

সবৈ মনঃ কৃষ্ণপদার বিন্দয়োর্ব্বচাংসি
বৈকণ্ঠ গুনানু বর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির মার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত সংকথোদয়ে।
মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দিশৌ—
তদ্ভৃত্য গাত্র স্পর্শেঙ্গ সঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপদে সরোজ সৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে।
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র পদানুসর্পনে
শিরো হৃষিকেশ পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্য নতুকাম কাম্যয়া
যথোত্তম শ্লোক জনাশ্রয়ারতি ॥

এবং দশমে ॥

বাণী গুণানু কথনে শ্রবণৌ কথায়া-
মিত্যাদিঃ ॥০

সাধন ভক্তির অঙ্গ চতুঃষষ্ঠিকম্।
একাঙ্গ বস্তু অঙ্গ কৈল নিরূপন॥
শ্রীমতো.যথা॥
'শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্য্যাদয়ান্বিতা।
বৈধি ভক্তি রিয়ং কৌশ্চিণ্মর্য্যাদা
মার্গ উচ্যতে॥
শ্রীগোবিন্দ পদদ্বন্দং তাপত্রয় বিনাসনং।
প্রণম্য লিখিতা গ্রন্থে
বৈধি ভক্তি ক্রিয়া ময়া॥
শ্রীগুরুগোবিন্দ কৃষ্ণভক্তবৃন্দগণ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করিঞা স্মরণ।
অভিরাম সুন্দরানন্দ পাযুয়া গোপাল।
কৃপাদৃষ্টি কর প্রভু পরম দয়াল।
শ্রীগোপাল চরণ শরণ অভিলাষ।
সাধনাঙ্গ ভক্তি কহে নয়নানন্দ দাস॥
ইতি কৃষ্ণভক্তি রসকল্পে পঞ্চম
প্রকরণং॥৫।*॥
কলিন্দতনয়া তীর নীপ মূলাধিদৈবতং।
ধ্বমন্তং মুরলী নাদমজস্রাং তমহংভজে॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার।
জয় রাম নিত্যানন্দ অনন্ত প্রচার॥
জয় জয়াদ্বৈত চন্দ্র গৌর ভক্তবৃন্দ।
জয় অভিরাম সহ শ্রীসুন্দরানন্দ॥
চতুঃষষ্ঠি ভক্ত অঙ্গ কৈল নিরূপন।
সেবানাম অপরাধ তাহাতে বর্জ্জন॥
সেবা নাম অপরাধ শাস্ত্রে যেবা কহে।
করিবে সে সব ত্যাগ কহি শুন আগে॥
তত্র সেবাপরাধাঃ যথা॥
অশ্ব দোলায় চাপিঞা পাদুকা দিয়া পায়
কৃষ্ণ তীর্থক্ষেত্র গৃহ যে বাজন যায়॥

কৃষ্ণোৎসব কৃষ্ণমূর্ত্তি পথেতে
দেখিঞা।
দণ্ডে পথে চলি যায় নতি না করিঞা।
অশুচি উচ্ছিষ্ট মুখে প্রণাম করন।
এক হস্তে প্রণাব সর্ব্ব ধর্ম্ম বিনাশন॥
অগ্রে প্রদক্ষিণ অগ্রে পাদ প্রসারণ।
সাক্ষাতে পর্য্যঙ্ক বন্ধ অকালে দর্শন॥
শয়ন ভোজন মিথ্যা কথা আলাপন।
উচ্চভাষা গ্রাম্য কথা বিরোধ রোদন॥
মনুষ্যেত ক্রুর ভাষা নিগ্রহ করণ।
শ্রীকৃষ্ণ সমীপে নহে এ সব আচরণ॥
পরনিন্দা পরস্তুতি উগ্রভাষা আদি।
পূজা কালে নাহি দিবে আবরণ
কম্বলাদি॥
অধো বায়ু পরিত্যাগ শ্রীবিষ্ণু মন্দিরে।
জন্মে জন্মে বিষ্টাভোজী হয় সেই নরে॥
সামর্থ্যে গৌনরূপে করয়ে অর্চ্চন।
অনিবেদিত দ্রব্য যেবা করয়ে ভক্ষণ॥
কালে প্রাপ্ত মিষ্ট ফল না করে অর্পণ।
অনিযুক্ত অন্নাদি করে নিবেদন॥
উচ্চাসনে থাকি করে শ্রীকৃষ্ণ পূজন।
পূজাকালে করে অন্যের অভিবাদন॥
'আত্ম পৌরষ করে আপন সৈর্য্যতা।
গুরুর মহিমা গুণ করায় গোপতা॥
দেবতার নিন্দা করে যেবা সব জন।
সেবা অপরাধি হয় সেই সব গণ॥
আগমানুসারে এই সেবাপরাধ বর্ণিল।
বরাহ পুরাণে শুন যে সব কহিল॥
রাজগৃহে সিদ্ধান্ন ভক্ষণ যেবা করে।
শ্রীমর্ত্তি করয়ে স্পর্শ গৃহ অন্ধকারে॥

পাদ প্রক্ষালনাদি বিধি না করিঞা।
শ্রীমূর্ত্তি করয়ে স্পর্শ হঠাৎকার যাঞা॥
শব্দ না করিয়া দ্বারে কবাট ঘুচায়।
কুক্কুরাদি উচ্ছিষ্ট দেন দেবতায়॥
পূজাকালে মৌন ভঙ্গ অন্য আলাপন।
মলমুত্র ত্যাগার্থে বা করয়ে গমন॥
মলমুত্র উপরোধে পূজা না করিবে।
অতএব পূজাকালে সাবধান হবে॥
গন্ধ পুষ্প না দিঞা ধুপ দীপ সমর্পণ।
নিন্দিত পুষ্পে কিবা কর এ পূজন॥
নিন্দিত কোন্ পুষ্প কর অবধান।
আগম তন্ত্রাদি মন্ত্রে শুনহ প্রমাণ॥
রক্ত পুষ্প কৃষ্ণ পুষ্প নির্গন্ধ দুর্গন্ধ।
কৃমি বিদ্ধ ভূমে পতিত অতি নিন্দ॥
ভূমে পতিত দিবে শেফালি বকুল।
কোঁরা মধ্যে দিবে পদ্ম চম্পকের ফুল॥
কণ্টকী নিন্দিত পুষ্প ঝিণ্টি আদি করি।
কণ্টকীর মধ্যে সে কেতকী দিতে পারি॥
ভাদ্র মাসে কেতকীর করিবে বর্জ্জন।
পূর্ব্বে রক্ত পুষ্প জানি হইঞাছে দূষণ॥
পদ্ম করবীর বক রক্ত দুষ্ট নয়।
ইহা বহি অন্য পুষ্প না দিবে নিশ্চয়॥
পরিধেয় বস্ত্রে আনিত পুষ্প যত।
ত্রিদলের ন্যূন পুষ্প নহে অভিমত॥
বাম হস্তে স্পর্শ আর শূদ্রে বা আনিত।
স্নান করি তোলা পুষ্প বড়ই নিন্দিত॥
উর্ণাতন্তু কেশস্পর্শে ছিন্ন ভিন্ন দল।
বাসি পুষ্প হয় জানি নিন্দিত সকল॥

তুলসীর পত্র বিল্ব পঙ্গা জল সদা।
বাসি দুষ্ট কভু নয় পবিত্র সর্ব্বদা॥
আকন্দ ধুস্তরওড় শাল্মলী না দিবে।
শিরীষ কুড়চি কৃষ্ণা কুটজ বর্জ্জিবে॥
ভেরণ্ডার পাত্রে পুষ্প না কর স্থাপন।
চুরি করি ফল পুষ্প না কর গ্রহণ॥
ইত্যাদি কহিল সে নিন্দিত পুষ্পনাম।
সেবা অপরাধ পুন কর অবধান॥
দন্তধাবন প্রাতঃক্রিয়াদি নাহি করি।
শ্রীবিষ্ণু পূজন কর্ম্মে নহে অধিকারী॥
স্ত্রীসঙ্গ করি পুন না করিঞা স্নান।
কৃষ্ণ পরিচর্য্যা করি অধঃপাতে যান॥
রজবতী নারী সঙ্গ কিম্বা স্পর্শ করি।
শ্রীকৃষ্ণ পূজনে সেই নহে অধিকারী॥
দীপ স্পর্শ করি হস্ত ধৌত না করিঞা
মহত পাতকী হয় পরিচর্য্যা করিঞা॥
মৃত দেহ স্পর্শ কিম্বা তদ্বাহক ছুঞা।
শব দেখি পুন স্নান যে বা না করিঞা
বিষ্ণু সেবা করে কিম্বা শ্রীমুর্ত্তি স্পর্শন।
পিত্ত সহ শব মাংস সে করে ভক্ষণ॥
রক্ত বস্ত্র নীল বস্ত্র দগ্ধ বস্ত্র পরি।
অশুচি মলিনে নহে পূজা অধিকারী॥
অধৌত বস্ত্র কিম্বা পরিঞা দশাহীন।
সূচি বিদ্ধ বস্ত্র কিম্বা গৃহস্থে কৌপীন॥
চিত্র বস্ত্র বহু বাস না করি ধারণ।
এক বস্ত্রে নহে কভু শ্রীমূর্ত্তি পূজন॥
এই সব দোষ নাস্তি আবিক বসনে
উর্ণাতন্তু বস্ত্র হএ পবিত্র সর্ব্বক্ষণে॥
সেবা কালে সদা হবে ক্রোধাদিরহিত
চলাচল চিত্তে সেবা না হয় উচিত॥

ঘর্ম্মাক্ত শরীরে আর্দ্র বসন পরিঞা।
সেবা কর্ম্ম না করিবে শ্মশানে যাইঞা॥
ভোজনের পর অন্ন জীর্ণ নাহি হৈতে।
তৈলাভ্যঙ্গ কৃষ্ণ সেবা না হয় উচিতে॥
কুসুম্বা ধুস্তুর আদি মাদক ভক্ষিঞা।
অধঃপতন হয় শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শিঞা॥
ভাগবত নিন্দা করে অন্যে করে স্তুতি।
সেই অপরাধে হয় তার অধোগতি॥
শ্রীকৃষ্ণ সমীপে করে আহার ভোজন।
সম্মুখে থাকিঞা করে তাম্বুল চর্ব্বন॥
আসুরী কালে কৃষ্ণ পূজা কিম্বা পীঠাসনে।
ভূমিতে বসিঞা কিম্বা করয়ে পূজনে॥
স্নান কালে বাম হস্তে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন।
অভক্ত জনের অন্ন না কর অর্পন॥
জবন পুককস খস পুলিন্দ্র কাপালী।
পূজা কালে না দেখিবে চণ্ডাল পুংশ্চলী॥
কুক্কুর শূকর খর নীচ দরশনে।
কৃষ্ণ পূজা না করিবে অভক্তের সনে॥
পূজা কালে নিষ্ঠীবন তির্য্যক পণ্ড্রধারা।
নখাম্বুতে বিষ্ণু স্নান অপরাধ ভারি॥
পাদ প্রক্ষালন বিনা মন্দির প্রবেশ।
নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন আদি অশেষ বিশেষ॥
ইত্যাদি প্রকার হয় অপরাধ লক্ষণ।
একেক পাপের দুঃখ বড়ই বিষম॥
সম্যক না লিখি তাহা বাহুল্যের ভয়ে॥
বরাহ ধবলী সংবাদ পুরাণেত কহে।
যথা বারাহে শ্রীবরাহঃ।
যস্ত ক্রোধ সমাযুক্ত মম কর্ম্ম পরায়ণঃ।
স্পৃশেত্তু মম গাত্রানি চিত্তং কৃত্বা চলাচলম্।
মুষিক্রোদ্ধ শতং যাবৎ সর্পো ভবতি শতং পুনঃ।
ত্রিংশৎ বর্ষাণি মণ্ডুকঃ শৃগালো যায়তে ভুবি ইতি॥
সেবা অপরাধ ভাই হবে সাবধান।
সেবাতে হইলে পাপ নাহিঁ পরিত্রাণ॥
সর্ব্ব অপরাধ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ সেবনে।
সেবা অপরাধ হইলে না দেখি পরিত্রাণে॥
বারাহে যথা॥
মমার্চ্চনাপরাধা যে কীর্ত্তিন্ত বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তেতু বর্জ্জনীয়া প্রযত্নতঃ॥
অজ্ঞানেতে যদি এই অপরাধ হয়ে।
গীতা ভাগবত পাঠে সে পাপ খণ্ডয়ে॥
স্কান্দে॥
অহন্যহনি যোমর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেৎ শুচিঃ।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥
নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করয়ে গ্রহণ।
সশ্রদ্ধিত চিত্ত হৈঞা কৃষ্ণ গত মন॥
সর্ব্ব অপরাধ তার অবশ্য খণ্ডয়ে।
বৃহন্নারসিংহ পুরাণের শ্লোক কহে॥
যথা॥
মম নামানি লোকেস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধ কোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ নামের ফল অগণিত হয়।
পাপ তাপ বিমোচন কীর্ত্তনে নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ নামে সর্ব্ব পাপ হয়েত খণ্ডন।
নাম অপরাধ হৈলে নাহি বিমোচন॥
তাহে আগে কহি শুন নাম মাহাত্ম্য।
পুরাণের শ্লোক শুন পদ্যাবলি উক্ত॥
যথা—॥
কল্যানানাং নিধানং কলিমলমথনং
পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ স পদি পরপদঃ
প্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানং।
বিশ্রাম স্থান মেকং কবিবর বচসাং
জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্ম্ম দ্রুমস্য প্রভবতুভবতাং
ভূতয়ে কৃষ্ণ নাম॥
তত্রৈব॥
বেপন্তে দুরিতানি মোহ মহিমা
সম্মোহ মালম্বতে
সাতঙ্কং নখরঞ্জনীং কলয়তে শ্রীচিত্র
গুপ্তঃ কৃতী।
সানন্দং মধুপর্ক সম্ভৃত বিধৌ বেধাঃ
স্বয়ং যত্নবান্
বক্তুং নাম্নিতবেশ্বরাভিলষিতে
ক্রমঃ কিমন্যৎ পরং ইতি॥
কৃষ্ণ নাম পাতকীর যত পাপ হরে।
তত পাপ পাতকী লোক করিতে
না পারে॥
যথা বৃহৎ বিষ্ণু পুরাণে॥
নাম্নোস্য যাবতী শক্তিঃ পাপ নির্হরণে
হরেঃ।
তাবং কর্ত্তুংনশক্নোতি পাতকং পাতকী
নরঃ॥
ইত্যাদি কহিল কৃষ্ণ নামের মহিমা।
ইহা শুনি হর্ষ হয় পাপ লুব্ধ জনা॥
কৃষ্ণ নামে হয় সর্ব্ব পাপ বিমোচন।
পাপ করি শেষে নামে করিব খণ্ডন॥
এইরূপে নাম বলে পাপ আচরয়ে।
কৃষ্ণ নামে তার পাপ খণ্ডন না হয়ে॥
দ্বিগুণ সে পাপ বাড়ে না হয় খণ্ডন।
তার দণ্ড করে যম জনমে জনম॥
ইত্যাদি কহয়ে অপরাধ বহুতর।
নাম অপরাধ কহি শুনহ অপর॥
গুরুতে অবজ্ঞা যার বিশ্বাস না করে।
কৃষ্ণ নাম অপরাধি বলি যে তাহারে॥
বেদ নিন্দা করে ভক্তি শাস্ত্র নাহি
মানে।
নাম অপরাধী বলি সেই সব জনে॥
অর্থবাদ হরি নামে যে করে ঘটনা।
অর্থান্তর করে ব্যাখ্যা মূঢ় যেই জনা॥
নাম বলে পাপে প্রবর্ত্ত যেবা হয়।
সেই অপরাধির উদ্ধার কভু নয়॥
সতের নিন্দন করে বৈষ্ণবে অনাদর।
শিবনাম স্বাতন্ত্র মানে শ্রীবিষ্ণু
গোচর॥
অন্য পুণ্য কর্ম্ম সম কৃষ্ণ নামে মানে।
কৃষ্ণ দীক্ষা উপদেশ অশ্রদ্ধিত জনে॥
কৃষ্ণ মহিমা শুনি ফল শ্রুতি মানে।
অপরাধী হয় ভাই সেই সব জনে॥
কৃষ্ণ নাম লীলা শুনি না হয় আবেশ।
কৃষ্ণ নামে অপ্রীত কিম্বা করে কৃষ্ণ
দ্বেষ॥

ইত্যাদি কহিল নাম অপরাধ লক্ষণ।
পুনরপি কহি শুন বিশেষ বর্ণন ॥
কৃষ্ণ পুণ্য কথা মধ্যে কহে অন্য কথা।
সেই লোক শূকর তুল্য জানিহ সর্ব্বথা॥
কৃষ্ণ সাক্ষাতে অন্য দেবের স্তবন।
ইত্যাদি জানিহ অপরাধ নিরূপন ॥
যথা সনৎকুমার তন্ত্রে ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতি শাস্ত্র নিন্দনং
তথার্থ বাদো হরি নাম্নি কল্পনং।
নাম্নোবলাদস্য হি পাপ বুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ ইতি ॥
সর্ব্ব অপরাধ ক্ষয় হয় কৃষ্ণাশ্রয়ে।
কৃষ্ণাপরাধ হৈলে ত্রাণ কভু নাহি হয়ে॥
নামাশ্রিত জনার হয় কৃষ্ণ গতি।
নামাপরাধীর সদা নরক বসতি ॥
পাদ্মে যথা ॥
নামাশ্রয় কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব সনামতঃ।
নাম্নোপি সর্ব্ব সুহৃদো অপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥ ইতি ॥
কাত্যায়ন সংহিতায় শুন যমের বচন।
কৃষ্ণ নাম অপরাধ শুন বৈধায়ন ॥
নাম সংকীর্ত্তন ফল বিবিধ শুনিয়া।
শ্রদ্ধা নাহি হয় যার আনন্দিত হৈঞা॥
কৃষ্ণ নামে অর্থ বাদ করে মূঢ় নরে।
মহা অন্ধতম কূপ ফেলি যে তাহারে ॥
যথা ॥
যন্নাম কীর্ত্তন ফলং বিবিধং নিশম্য
নশ্রদ্ধধাতি মনুতে যদুতার্থ বাদং।
যো মানুষ স্তমিহ দুঃখ চয়ে ক্ষিপামি
সংসার ঘোর বিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গং ॥ শ্রী ॥
কৃষ্ণ প্রতি মাতে যার হয় শিলা জ্ঞান।
সেই জন নারকী হয় অযুত প্রমান ॥
গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি সাধারণ জ্ঞানে।
তাহা সম নারকী নাহিক ত্রিভুবনে ॥
বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি নরক কারণ।
গঙ্গা জলে জল বুদ্ধি নরক গমন ॥
সামান্য অক্ষর বুদ্ধি করে নাম মন্ত্রে।
সেই সব নারকী লোক কহে সর্ব্বতন্ত্রে ॥
বিষ্ণুর সমান করি অন্য দেব মানে।
সেই সব নারকী লোক জানি ত্রিভুবনে ॥
সেবা নাম অপরাধ করিঞা তেজন।
নিরন্তর কর মন নাম সংকীর্ত্তন ॥
হরি নাম বিনে গতি নাহি কলি কালে।
এই সত্য জানি ভাই সব্ব শাস্ত্রে বলে ॥
আদি পুরাণে ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
অথ নাম মাহাত্ম্যং ॥
কৃষ্ণ নাম মাহাত্ম্য ভাই করহ শ্রবণ।
স্মরণ করিতে সর্ব্ব পাপ বিমোচন ॥
মহাপুণ্য উপচার হয় শুদ্ধ মতি।
ব্রহ্মাদি স্থান ভোগ করায়ে বিরতি ॥

ক্রমশঃ।

বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনার্থ নবদ্বীপ নিদাঘ বিদ্যালয়।

আগামী ২৫শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩২১, (ইংরাজী ৮ই মে, ১৯১৪) এই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে। চারিমাস পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতা ও মফঃস্বলের কলেজের ছাত্রগণকে আহ্বান করা হয়। আহ্বান পত্র খানি নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

আহ্বান পত্র

আগামী গ্রীষ্মকালে কলেজ সমূহের গ্রীষ্মাবকাশে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে এক মাসের জন্য এই বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ ও বৈষ্ণবদর্শনের প্রচারার্থ নিয়মিত শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদা-প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ, মহাশয় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ২৮টি বক্তৃতা করিবেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের ও বৈষ্ণবদর্শনের প্রাথমিক বিষয়গুলি এই বক্তৃতায় আলোচিত হইবে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল্, বেদান্তরত্ন, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার ও অন্যান্য প্রখ্যাত বক্তাগণ এই সময়ে তথায় গমন করিবেন ও উপদেশ প্রদান করিবেন।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যাপনা হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের অধ্যাপনা আপাততঃ স্থিরীকৃত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র কাব্য-ন্যায়-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা-তীর্থ মহোদয় দ্বয় অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিবেন।

পঞ্চাশজন ছাত্রকে বিনামূল্যে থাকিবার স্থান ও আহারীয় দেওয়া হইবে। সুবিধা হইলে আরও অধিক ছাত্রেরও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী আচার্য্যগণের দার্শনিক নিবন্ধ সমূহ হিন্দুজাতির বিশেষ গৌরবের সম্পত্তি। কেবল ভারতবর্ষে নহে, কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নহে, সমগ্র জগতের জন্য তাহার আলোচনা ও প্রচার আবশ্যক। বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে পৃথিবীর সকল দেশের উদারচিত্ত মনীষিগণ মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্বজনীন প্রেম-ধর্ম্মের আদর্শ জগতে প্রচার করার অতি সুসময় উপস্থিত

হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে এই প্রেমধর্ম্মের যাহা বিশ্বজনীনতার দিক তাহাই আলোচিত হইবে। সুতরাং সকল জাতির ও সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহাতে যোগদান করিতে পারেন।

যাঁহারা ছাত্ররূপে অবস্থান করিতে চাহেন তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিবেন। যাঁহারা এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাদি করিতে ইচ্ছুক তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন। এই বিদ্যালয় সর্ব্বসাধারণের, কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের নহে, সুতরাং ইহার কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে কেহ কোনও উপদেশ প্রদান ইচ্ছা করিলে অসঙ্কোচে তাহা জানাইবেন।

এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে প্রসিদ্ধ সুগায়কগণ কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তন হইবে। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ভক্ত শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার সম্প্রদায় সহ উপস্থিত থাকিয়া কীর্ত্তনানন্দ বিতরণ করিবেন। নবদ্বীপনিবাসী স্থানীয় হরিসভার অধ্যক্ষ ভক্তগায়ক শ্রীযুক্ত সতিকণ্ঠ গোস্বামী মহাশয়ও কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিবেন। নানাস্থানের ভক্তগণকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে, ভক্ত-সম্মিলন হইবে ও মধ্যে মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করা হইবে।

এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বৎসরই গ্রীষ্মকালে অধিবেশন হইবে। যদি বৎসরে পঞ্চাশটি যুবক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মহাসহিষ্ণুতা প্রেম, সেবা ও শান্তির বার্ত্তা হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃতকল্যাণ অচিরেই সংসাধিত হইবে! এইরূপ ভরসাতেই এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যালয়ের সমস্ত বক্তৃতা, উপদেশ ও কার্য্যবিবরণী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে।

এই আহ্বানে আমরা ৬০ জন কলেজের ছাত্র পাইয়াছি, এখনও আবেদন পত্র আসিতেছে। কলেজের ছাত্র ব্যতীত অনেক ভদ্রলোকও তথায় থাকিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এ পর্য্যন্ত সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছি।

নিম্নরূপ পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিবে।

প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঘণ্টা বাজাইয়া ও শ্রীভগবানের নাম গান করিয়া আশ্রমবাসী সকলকে জাগাইয়া দেওয়া হইবে।

(ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ মাত্র করা হইবে। কাহাকেও বাধ্য করা হইবে না। যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে তাঁহারাই গাত্রোত্থান করিবেন। কোনও রূপ বাধ্য না করার হেতু এই যে যাঁহারা ছাত্ররূপে যাইবার

জন্য আবেদন করিয়াছেন ও যাঁহাদের আবেদন পত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী সুতরাং তাঁহারা যে ছাত্র হইয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন সে জন্য আমরাই তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহারা কৃতবিদ্য সুতরাং নিজ নিজ কর্ত্তব্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন। তবে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরণ ও অন্যান্য হিন্দুসদাচার বিশেষ ভাবে রক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য)।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগের পর সকলে গঙ্গাতীরে যাইবেন ও স্নানান্তে নিজ নিজ সন্ধ্যা পূজা সমাধা করিবেন। তাহার পর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে। গঙ্গাতীর হইতে কিছুক্ষণ নগর সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকলে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

৭টার সময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অধ্যাপনা হইবে। দুই ঘণ্টা এই অধ্যাপনা চলিবে। অধ্যাপনার পর জলযোগ করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অধীত বিষয়ের আলোচনা হইবে। বারোটার সময় মধ্যাহ্নভোজন হইয়া যাইবে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অপরাহ্ন চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত ছাত্রগণ নিজেদের ব্যবস্থামত কার্য্য করিবেন। কোনও ছাত্র কোনও বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিতে চাহেন অথবা আলোচনা করিতে চাহেন এই সময়ে তাহা করিবেন। যাঁহারা নিজেদের কলেজের পড়াশুনা করিতে চাহেন এ সময়ে তাহাও করিতে পারিবেন। কয়েকজন অধ্যাপক এই সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিতে সম্মত হইয়াছেন। ছাত্রগণ নিজ নিজ পাঠ্য বিষয়েরও সাহায্য প্রয়োজনমত তাঁহাদের নিকটে পাইতে পারিবেন। ধর্ম্ম-বিষয়ক কতকগুলি পুস্তক তথায় রক্ষিত হইবে। ছাত্রগণ তাহা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

অপরাহ্ন চারিটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত বক্তৃতা হইবে। এই বক্তৃতাটি কলেজের বক্তৃতার ন্যায় হইবে। এই বক্তৃতাগুলিতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ও তাঁহার শিক্ষার বিশিষ্টতা কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। ছাত্রগণ এই বক্তৃতার উপদিষ্ট বিষয়গুলির যাহাতে স্মারকলিপি (Notes) লইতে পারেন, এইরূপ ভাবে বক্তৃতা হইবে। এই সমস্ত বক্তৃতার যাহা আলোচিত হইবে সে সম্বন্ধে ছাত্রগণকে প্রবন্ধরচনার জন্য আহ্বান করা হইবে, এই প্রবন্ধ পরীক্ষা করিয়া কৃতাত্ব অনুসারে কয়েকটি পারিতোষিক দেওয়া হইবে।*

---

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে স্বনামধন্য মহাত্মা সেবাব্রত

সূর্য্যাস্তের সময় আর একবার গঙ্গাতীরে সকলের সম্মিলন হইবে। সন্ধ্যা ৭টার সময় শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে। প্রাতঃকালের ও সন্ধ্যার পাঠ ও ব্যাখ্যা সর্ব্বসাধারণের জন্য। বিকালের বক্তৃতায় সকলেই উপস্থিত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা বিশেষ ভাবে ছাত্রগণের। তাহার পর সঙ্কীর্ত্তন করিয়া দিবসের কার্য্য শেষ হইবে।

শনিবার ও রবিবার পূর্ব্বোক্ত কার্য্যপদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব, কারণ ঐ দুইদিন নানাস্থান হইতে বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইবে। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বক্তা ও পণ্ডিতগণ আসিবেন।

আলোচনার বিষয়।

মনীষি ও প্রসিদ্ধ বক্তা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করিয়া যাইবেন। তিনি "রসতত্ত্ব ও বৈষ্ণবমহাজনগণের পদাবলী" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন।

বিখ্যাত সুধী স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় "যুগধর্ম্মের আদর্শ ও বেদান্ত" প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন।

অশেষতত্ত্ববিৎ প্রবীণ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার মহোদয় "জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্ম" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম, এ, বি, এল্, মহাশয় "বৈষ্ণব, কবিতা ও নব্য ইংরাজী সাহিত্যে বৈষ্ণব ভাবের পরিচয়" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন।

শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এম, এ, মহাশয় "সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী" সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকজন স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ও দার্শনিক উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। দেশের যাবতীয় ধর্ম্মবক্তা

শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি মূল্যবান পারিতোষিক দিতে সম্মত হইয়াছেন। আরও অনেকগুলি পারিতোষিক আমরা আশা করিতেছি।

ও আচার্য্যগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তাঁহারা যাহাতে অন্ততঃ-পক্ষে দু একদিনের জন্যও আগমন করেন সে জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। আশা করা যায় আরও অনেকেই আসিবেন। পুণ্যস্থান নবদ্বীপে এই ভাবে ছাত্রগণকে একমাস কাল সংযত ভাবে ও সদালোচনার মধ্যে রক্ষা করার কি ফল হইবে তাহা ভগবানই জানেন। আমরা কয়েক বৎসর দেশের নানাস্থানে সর্ব্বদাই ধর্ম্মালোচনার জন্য পর্য্যটন করিয়া একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। তাহা এই—

ভগবানের ইচ্ছায় দেশে সুবাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের একটা বিশেষ রকমের অনুরাগ সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইতেছে। ফলে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মালোচনার জন্য প্রত্যহই নূতন নূতন সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গত ত্রিশ বৎসর কাল হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য ও ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সদ্ভাব ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে উদ্যোগ চলিতেছিল, তাহা যেন অনেকটা সফল হইয়াছে।

স্রোত আসিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদেরও নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এই স্রোত যে জীবন লইয়া আসিয়াছে তাঁহাকে ধরিতে হইবে এবং তাহার সাহায্যে আমাদের নীরস কর্ম্মক্ষেত্রগুলিকে সরস ও শস্যময় করিয়া তুলিতে হইবে। সুধু তাহাই নহে, এই পুনরুত্থানের দিনে আমাদের সমগ্র শক্তি ঠিক সুপথে পরিচালিত হইতেছে কি না, এই পুনরুত্থানে সুবিধা পাইয়া অনেক চতুর ব্যক্তি স্বার্থসাধন করিবার জন্য অসত্যকে সত্যের আসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে কিনা, তাহাও বিশেষ ভাবে চিন্তা করা দরকার। দেশের লোকের ক্ষুধা পাইয়াছে, খাদ্য দ্রব্য পাইলেই ভোজন করিবে, দেখিতে হইবে যেন যথার্থ পুষ্টিকর ও হিতকর খাদ্যই বিতরিত হয়, যেন সুখাদ্যের নামে ক্ষুধিতকে অখাদ্য দেওয়া না হয়।

আমাদিগের ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া আলোচনা নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের মধ্যে যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। গত তিন বৎসরের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট বন্ধু এই প্রকারের অনুরোধ করিয়াছেন।

অধ্যাত্মশাস্ত্র আলোচনা করিতে হইলে কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন, একটু পরিশ্রম না করিলে এই প্রাথমিক বিষয়গুলি আয়ত্ত করা সম্ভব নহে। এই প্রাথমিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে

একটা সাধারণ জ্ঞান না থাকার জন্য অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচনা বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে হইতে পারিতেছে না। এই প্রাথমিক বিষয়গুলি বুঝিলে আলোচনা বেশ সুগম হইয়া পড়ে।

ধর্ম্ম জিনিসটা কেবলমাত্র একটা অবোধ্য বিষয়, না বুঝিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এই পুনরুত্থানের দিনেও এইভাবে ধর্ম্মপ্রচার হইতেছে। ইহা দ্বারা দেশের কল্যাণ হওয়া সম্ভব নহে।

এই প্রাথমিক বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তৎসমুদয় আয়ত্ত করিতে সাহায্য করা এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামের প্রতিও আমাদের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। ভক্তি শাস্ত্র, ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্র হিন্দু সাধনার এই চারিটি শাখাতেই নবদ্বীপ বাঙ্গালাদেশের তীর্থ। এখনও সেখানে অনেক পণ্ডিত ও সাধু ব্যক্তি আছেন। ইহা ছাড়া অনেক চতুষ্পাঠীর ছাত্র তথায় অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। কলেজের ছাত্রগণের সহিত এই সমস্ত সাধু, ভক্ত, পণ্ডিত ও চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের একটা সম্মিলন সাধন করাও এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই অনুষ্ঠানের দ্বারা কি হইবে তাহা আমরা জানি না, প্রয়োজনের অনুরোধেই আমরা নিজেদের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার প্রতি না চাহিয়া এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। অনেকের পক্ষে ইহা অতি সামান্য ব্যাপার কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা নহে।

যে সমস্ত মনীষি আমাদের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির অনুরোধে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে নবদ্বীপে আসিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি কি ভাষায় যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা জানিনা। তাঁহারা নিজেদের মহত্ত্ব ও উদারতার দ্বারা আমাদিগকে চিরদিন কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন। ভক্ত ও ভগবানের কৃপায় আমাদের এই সামান্য পূজা পরমদেবতা গ্রহণ করুন।

শেষ কথা।

এই প্রকারের একটি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন অনেক দিন হইতেই অনুভব করা যাইতেছে। নবদ্বীপ রাধারমণ সেবাশ্রমের ও মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যধামগত মহাত্মা শ্রীমৎ নিত্যানন্দ দাস বাবাজী মহাশয় গত ডিসেম্বর

মাসের শেষে এই কার্য্যটির ভার গ্রহণ করেন। জানুয়ারী মাসে যে আহ্বান পত্র বিতরিত হয়, তাহা তাঁহারই নামে বিতরিত হইয়াছিল। তিনি জনসেবায় নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তিনি থাকিলে এই কার্য্যের ব্যবস্থার জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল না। গত মাঘ মাসের মেলার সময় শ্রীধাম নবদ্বীপে ভীষণ বিসূচিকা রোগ হয়। শ্রীমৎ নিত্যানন্দ দাস মহাশয় রোগীর সেবার জন্য নবদ্বীপে গমন করেন। কয়েকদিন অক্লান্ত ভাবে রোগীর সেবা করার পর ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি স্বয়ং রোগাক্রান্ত হইয়া লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার সমুদয় কার্য্যের ভার আমাদের দুর্ব্বল মস্তকের উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দিরের কার্য্যে পূর্ব্ব হইতেই তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই ঋণ ও আশ্রম চালনার জন্য মাসিক দুইশত টাকা ব্যয় সংগ্রহের ভার আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত কার্য্য ছাড়াও এই নিদাঘ বিদ্যালয় প্রয়োজন। কেবল এক বৎসরের জন্য নহে প্রত্যেক বৎসরেই এই বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইবে এইরূপ সঙ্কল্প আছে।

এইবার বিদ্যালয়ের প্রথম অধিবেশন, অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের প্রতি ও নিত্যধামগত মহাত্মার প্রতি চাহিয়া এই কার্য্য আরম্ভ করা গেল। এই কার্য্যের ব্যয়ভার কি প্রকারে নির্ব্বাহিত হইবে এ জন্য আমরা বিশেষ চিন্তা করি নাই, তবে দু একজন বন্ধু উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কথা বলিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সরলভাবে বিবৃত করাই প্রয়োজন।

গত কয়েক বৎসর সাহিত্য ও ধর্ম্মবিষয়ক কতকগুলি ব্যয়সাধ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া দেখা গিয়াছে, কার্য্য আটকায় না। সাধারণের কার্য্য বলিয়া চাঁদা সংগ্রহেরও আবশ্যকতা নাই। কারণ চাঁদা সংগ্রহ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বেশ ভাল কার্য্য নহে।

আমাদের কেবল একটি নিবেদন আছে। এই নিবেদন সকলের নিকট নহে। আমাদের যাঁহারা বন্ধু কেবলমাত্র তাঁহাদের নিকট। যাঁহারা আমাদের চেনেন ও আমাদের কার্য্যে সত্য সত্য সহানুভূতি-সম্পন্ন আমাদের উপর যাঁহাদের বিশ্বাস আছে এবং যাঁহারা একদল ছাত্রকে শাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য আমাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন, আমাদের কার্য্যের দ্বারা দেশে কোন কল্যাণ হইতেছে ইহা যাঁহারা সত্য সত্য সরলচিত্তে বিশ্বাস করেন, অনেক সৎ লোক যাঁহারা সময়ে সময়ে আমাকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ আমরা প্রয়োজন নাই বলিয়া যাঁহাদের অযাচিত সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাঁহাদের সকলের নিকট আমরা আজ এই প্রার্থনা করিতে প্রণোদিত হইয়াছি যে

তাঁহারা সাহায্য করুন, নিজের যাহা সাধ্য, এবং আপনা হইতে যাহা দিতে ইচ্ছা হয় তাহা যতই সামান্য হউক তাহা প্রদান করুন তাঁহা ছাড়া নিজের বন্ধুগণ, কার্য্যের উদ্দেশ্য জানিয়া ও আমাদের প্রতি বিশ্বাস থাকার জন্য যাঁহারা সরলভাবে অর্থাৎ নিজের নাম হইবে খ্যাতি হইবে: এ প্রকারের কোনও প্রেরণায় নহে যাঁহারা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের নিকট সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। এই প্রকার কিছু সংগ্রহ করা প্রয়োজন কারণ এই প্রায় চারি বৎসর বাঙ্গালাদেশের বহু স্থানে ভ্রমণ করা গিয়াছে, বহু আগ্রহের কথা শুনা গিয়াছে, এই আগ্রহের সত্যতা পরীক্ষা করা ও ভবিষ্যতে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণের জন্য একান্ত আবশ্যক কারণ একেবারে বিশ্রামহীন অবস্থায় এ ভাবে পর্য্যটন করার সঙ্গতি ও বিচার্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং এতদিন কোনও মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরিয়াছি কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার। এইজন্য প্রার্থনা করিতেছি, যাঁহারা আমাদের চেনেন ও বিশ্বাস করেন তাঁহারা আপাততঃ এই নিদাঘ বিদ্যালয়ের জন্য কিছু প্রদান করিলে আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিব।

এক মাস কাল এক শত জন ভদ্র লোকের আহারের ব্যয় ছাড়াও কিছু অধিক ব্যয় হইবে। আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই। বিদ্যালয় শেষ হইলে হিসাবে বুঝিতে পারা যাইবে ব্যয় কত হইল। এখন তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। বিদ্যালয়ের আলোচ্য বিষয়গুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হইবে। আগামী বৎসর হইতে এই পুস্তকের আয়ের দ্বারাই বিদ্যালয় চালনা করা হইবে এইরূপ অভিপ্রায়। একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত। কোনও ব্যক্তির কোনরূপ আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া বা কোনও বিশেষ সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অনুষ্ঠান পত্রে অর্থের কথা প্রচার করায় কিছু অপরাধ হইল। এইজন্য সকলে মার্জ্জনা করিবেন। পূর্ব্ব হইতে কিছু সময় পাইলে ইহার উল্লেখ করিতে হইত না বলিয়াই মনে হয়, এবং আশা হয় এইবার প্রথমবর্ষ বলিয়াই প্রার্থনা করা গেল আগামী বৎসর হইতে আর প্রার্থনা করার প্রয়োজন হইবে না।

নিবেদক

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

বীরভূমি, ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা
চৈত্র, ১৩২০।

শ্রীশ্রীকুন্তীদেবীর স্তব। (৮)

ন দেব কশ্চিদ্ভগবংশ্চিকীর্ষিতং তবেহমানস্য নৃণাং বিড়ম্বনং।
ন যস্য কশ্চিদ্দয়িতোঽস্তি কর্হিচিদ্দেষ্যশ্চ যস্মিন্ বিষমা মতির্নৃণাং ॥

মানব সাজিয়া তুমি মানবের মত
লীলায় আসিয়া যবে হও আবির্ভূত,
ভগবন্, সে সময় তোমার করম-চয়
বুঝিতে করিয়া চেষ্টা শাস্ত্রবিৎগণ
বিফল সকল যুক্তি করে দরশন।
জ্ঞান গর্ব্ব চূর্ণ হয়, ভাবি তব লীলাচয়,
অচিন্ত্য রহস্যে ঘেরা সকলি তোমার
সাধ্য নাই, সাধ্য নাই কারো বুঝিবার।
সম তুমি সর্ব্বভূতে, এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডেতে,
প্রিয় বা অপ্রিয় হরি, কেহ তব নাই,
নিগ্রহানুগ্রহ কেন দেখি, ভাবি তাই।
সূর্য্যদেব সমুদিলে, সূর্য্যকান্ত-শিলাতলে,
প্রকাশিত হয় সূর্য্যসম দিব্য ভাতি,
সূর্য্য কিন্তু উদাসীন অন্ধজন প্রতি।
চক্রবাক চক্রবাকী, মিলনেতে হয় সুখী,
সূর্য্যদেবে ভাবে তারা বড় হিতকারী,
শত্রুভাব তপনের তস্কর উপরি।
তুমি হরি, সূর্য্যসম তুল্য সর্ব্বভূতে,
ফললাভ করে সবে নিজ কর্ম্মমতে।

জন্ম কর্ম্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্ত্তুরাত্মনঃ।
তির্য্যঙ্‌নৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্তবিড়ম্বনং॥

বিশ্বের তুমিই আত্মা হরি দয়াময়,
জন্ম বিরহিত তুমি, তবু জন্ম হয়।
অকর্ত্তা ও উদাসীন, তবু কর্ম্ম অনুদিন,
বরাহাদিরূপে এলে তির্য্যক্ যোনিতে,
রামাদিরূপেতে এলে মানব কুলেতে ;
জলজন্তু মাঝে এলে মৎস্যাদি রূপেতে
তোমার অপার লীলা কে পারে বুঝিতে॥

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাব-
দ্‌যা তে দশাশ্রু কলিলাঞ্জন সম্ভ্রমাক্ষং।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি॥

হে কৃষ্ণ ভাঙ্গিয়া ভাণ্ড, নষ্ট করি দধি,
একদিন হয়েছিলে তুমি অপরাধী।
যশোদা ক্রোধের ভরে, তোমার বন্ধন তরে
রজ্জু-হস্তে ধরিলেন ও দুটি শ্রীকর,
স্মরিয়া সে দৃশ্য আজো মোহিত অন্তর।
তোমার যুগল আঁখি, যশোদা মায়েরে দেখি,
ভয়েতে ব্যাকুল হ'য়ে হইল চঞ্চল,
ধারা দিয়ে বাহিরিল নয়নেতে জল।
নয়নে অঞ্জন ছিল, অশ্রুধারে ভেসে গেল,
আজিও সে দৃশ্য জাগে আমার অন্তরে
ভাবি তাহা ভেসে যাই মোহের সাগরে।
যতরূপ ভয় আছে, সব ভীত তব কাছে,
স্বয়ং ভয়ের হ'য়ে ভয়ের কারণ
ভয়ে অধোমুখ ভাবি মায়ের তাড়ন।
লীলাময়! তব লীলা বোঝে কোন্ জন?

কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্য কীর্ত্তয়ে।
যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনং॥

মানবের জ্ঞান গর্ব্ব চূর্ণ করিবারে,
ভাসাইতে মানবেরে বিস্ময়সাগরে,
বিশ্বধামে আবির্ভূত, হও তুমি অবিরত,
বুঝিতে পারে না কেহ তাহার কারণ,
নিজ বুদ্ধিমত সবে করয়ে বর্ণন।
কেহ এইরূপ বলে, যদুর পুণ্যের ফলে,
তাহার বংশের কীর্ত্তি করিতে বিস্তার,
জন্মহীন হরি কিন্তু জন্ম হৈল তাঁর।
কেহ বলে যুধিষ্ঠির, অতীব ধার্ম্মিক ধীর,
তাঁহার বিমল কীর্ত্তি বিস্তার করিতে,
জন্মিলেন জন্মহীন, যদুর বংশেতে।
অপরে বসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোঽভ্যগাৎ।
অজস্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায় চ সুরদ্বিষাং॥
পূর্ব্বজন্মে বসুদেব ছিলেন সুতপা
দেবকী তাঁহার পত্নী ছিলা পৃশ্নিরূপা।
কঠোর তপস্যা করে তাহারা দুজন,
তপে তুষ্ট নারায়ণ দেন দরশন।
তাহারা প্রার্থনা করে, পুত্ররূপে লভিবারে,
সর্ব্ব সাধনার ধন পরম কারণে;
এই হেতু তুমি আবির্ভূত এ ভুবনে।
তাহাদের সাধ যাহা, পরিপূর্ণ করি তাহা,
জগতের সুমঙ্গল করিতে সাধন।
দেবদ্বেষী দৈত্যকুলে করিলে নিধন।
কেহ কেহ এইরূপ করয়ে বর্ণন॥

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী।

পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পলতিকা, পদচিন্তামণিমালা, গীতচন্দ্রোদয় প্রভৃতি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থনিচয়ে বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা-বিরচিত পদাবলী সংগৃহীত রহিলেও প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিমধ্যে এমন সুন্দর সুন্দর অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পদাবলী আবিস্কৃত হইতেছে যাহা সাধারণ মধ্যে প্রচলিত পদাবলী অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ মধ্যে, সংগ্রহকার রসপর্য্যায়ানুসারে এক এক বিভাগের কতকগুলি করিয়া সমভাবাপন্ন পদ চয়ন করিয়া পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন—সুতরাং সেই সকল পুস্তকে যাবতীয় পদকর্ত্তাগণের সমগ্র রচনা একত্র সংগৃহীত হওয়া সম্ভবপর নহে।

শুনিয়াছি, পদ-সমুদ্র নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে পঞ্চদশসহস্র পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সে গ্রন্থ কখন লোকলোচনের গোচরীভূত হইবে কি না তাহা জানি না—আবার, অনেকেই এরূপ গ্রন্থের অস্তিত্বেই সন্দিহান! এরূপ গ্রন্থ, প্রকৃতপক্ষে কাহারও নিকট থাকিলে তাহা অগৌণে সাধারণের নিকট প্রকাশিত করিয়া ঋণমুক্ত হওয়া উচিত। এতগুলি পদকর্ত্তা ও তাঁহাদের রচনা বিলুপ্ত করিবার, কাহারও ন্যায়তঃ অধিকার আছে বলিয়া মনে হয় না।

এদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, পদকর্ত্তা বা গ্রন্থকারগণের রচনা তত শীঘ্র প্রচারলাভ করিতে পারিত না। তাহার ফলে হইয়াছে এই যে, এই সমস্ত পদ-সংগ্রহগ্রন্থধৃত পদাবলী ব্যতীত, অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পদাবলী লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। যে সকল প্রাচীন পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে * তৎসমুদয়ে আমরা তিন সহস্রের অধিক পদাবলীর পরিচয় প্রাপ্ত হই না। এখন প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার সাধন হইতেছে—আমরাও প্রাচীন পুঁথির উদ্ধারকালে প্রায়ই নব নব গ্রন্থকার ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ বা পদাবলী প্রাপ্ত হইতেছি।

অপ্রকাশিত নামা পদকর্ত্তা ব্যতীত অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাজনগণের যাবতীয় পদাবলী পদসংগ্রহ গ্রন্থনিচয়ে স্থানলাভ করে নাই। সঙ্কলয়িতার

* আমরা কতকগুলি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। তৎসমুদয়ের বিস্তৃত পরিচয় পৃথক্ প্রবন্ধে প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।—লেখক

ধৈর্য্য, সুবিধা ও প্রবৃত্তি অনুসারে পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস, জগদানন্দ প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে পারি। আমরা, এই সকল মহাজনগণ রচিত পদাবলীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি।

বর্ত্তমান সংগ্রহ-গ্রন্থনিচয়ে, পরবর্ত্তীকালের মহাজন পদাবলীর কথা দূরে থাকু—সমকালে বা পূর্ব্ববর্ত্তীকালের অনেক প্রসিদ্ধপদ এই সমস্ত সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থানলাভ করে নাই, এখন এই অপ্রকাশিত প্রাচীন মহাজনগণের পদাবলী যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রস-পর্য্যায়ানুমত একখানি অভিনব বৃহৎ পদাবলীসংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কোন ভক্ত ধনী-সন্তান এইরূপ পদসংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলে আমাদের জীবনব্যাপী পরিশ্রমের আংশিক সফলতা লাভ করিতে পারি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা অপ্রকাশিত নামা বা প্রসিদ্ধ প্রাচীন পদরচয়িতাগণের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পদাবলী যথাপ্রাপ্তরূপে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১। রোহিণীনন্দন দাস।

[আমাদের সংগৃহীত একখানি প্রাচীন পদাবলী-সংগ্রহ ক্ষুদ্র পুঁথিতে ৩৫ টি পদ লিখিত আছে। এই পুঁথি খানির প্রথম পদটি প্রাপ্ত হই নাই। এই ৩৫টি পদের মধ্যে, এক রোহিণীনন্দন দাস বিরচিত ১৫টি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার পূর্ব্বে কোন পদসংগ্রহ পুস্তকে আমরা রোহিণীনন্দন কৃত পদাবলী দেখিতে পাই নাই। আমাদের আলোচ্য পুঁথিখানি শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের লেখা—এই পুঁথি হইতে রোহিণীনন্দন কৃত পদাবলী প্রকাশিত করিলাম।

এই পদকর্ত্তার কোনরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই। কেহ এ বিষয়ে সহায়তা করিলে উপকৃত হইব]।

(১)

পাপী মহাপাপী পাতক মোর দে ॥
বিমথিঞা পাপের সার বিধি গড়িয়াছে।

জনম হইতে পাপ করিঞাছি যত।
শতঠিঞেঁ গুপ্ত তাহা লিখিবেক কত ॥
সকল পাপেতে মোর নাহি পুণ্যলেশ।
পাপাপর নাহি পাপ করিনু অশেষ ॥
রোহিণীনন্দন ডুবে পাপের সায়রে।
এইবার তরাবার ভার রহিল তোমারে ॥ ৯)

(২)

ও নব পীরিতের বলিহারি জাই। ধ্রু ॥
নব নব নাগর বর ধনি রাই ॥
ব নব অনুরাগ পীরিতে বলে যাই।
নব নব দরশন কিশোরী কি গোরা ॥
নব নব মকরন্দ নবীন ভ্রমরা ॥
নব অনুরাগ তরে নাগর ত্রিভঙ্গ।
নব অনুরাগে ভেল ধনি গৌর শ্যাম অঙ্গ ॥
নব অনুরাগ দুহে নাহি ধরে।
নব অঙ্গে নব প্রেম চুঞাইঞা পড়ে ॥
নব অনুরাগে উঠে তরঙ্গ পাথার !
রোহিণীনন্দন তবে গড়ি দেয় তার ॥ (১০)

(৩) (গৌরী)

ভজ মন রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ।
যাকো নাম হি মোচিত ভববন্ধন হোতহি প্রেম আনন্দ ॥ ধ্রু ॥
এ শুক শঙ্কর সনক সনাতন অন্ত নাহি পাওরে অনন্ত ॥
যাকো নামহি ত্রিভুবন মঙ্গল অহর্নিশি জপতহি সন্ত ॥
যাকো নামহি সুরাসুর নরবর মুনিগণ করত ধেয়ান ॥
যাকো নাম রউত সদা নারদ ভুবন ফিরত কর গান ॥
বেদহি যাকো যশগুণ গাওত করতহি নামকি আশ।
তাকো নামহি পাপীজন বঞ্চিত রোহিণীনন্দন দাস ॥ (১১)

(৪) (তুড়ি)

মৈল ভাই এভব সায়রে পড়ি।
বিষম সংসারের নিগূঢ় বন্ধন হাতে গলে মায়া ডোরি ॥ ধ্রু ॥

হরি ভজিব বলি　　খত লিখিয়া দিলুঁ　　না হৈল তাহার লেশ।
এবার নাগালি　　পাইলে যমদূতে　　না জানি দিত কত ক্লেশ॥
যখন ধরিয়া　　প্রহার করিবে　　তখন রাখিবে কে।
বন্ধু বান্ধব যত　　কোথা বা রহিবে কে যখন বান্ধিয়া লঞা যাবে সে॥
আন আন জনে　　আপনা বলিয়া　　আপনি করিনু নাশ।
এখনি যম দণ্ডে　　দণ্ডি বহি লবে　　রোহিণীনন্দন দাস॥ (১২)

(৫)

রাধামাধব সার।
মো দীনে　　করুণা করি　　রাখহ এই বার॥ ধ্রু॥
সুখলাগি　　কামার্থ হাতি-　　পরেতে চড়িল,
মাতা হাতী　　মোরে আসি　　সায়েরে ফেলিল॥
লোভ মোহ　　আদি তাহে　　জলজন্তুগণ
মোরে পাই　　দেখি সভে　　করয়ে দংশন॥
মোরে পাই　　বড়ই কঠিন তনু　　না হয়ে পতনে।
নিজগুণে রাখ নাথ　　যোড় বাহু করি ডাকে রোহিণী নন্দনে॥ (১৭)

(৬)

মরি সবে নদীয়ার চাঁদ এমন কেনে হৈল।
রমণীমোহন বেশ কোথা বা রহিল॥ ধ্রু॥
নিন্দিতকাঞ্চন গলিত দশবাণ গৌর দেহ অতি সুন্দর।
সে হেন কলেবর ধুলাএ ধূসর তাহে বিলসিত ভাব রে॥
নয়নযুগল কুবলয়দল নিন্দিয়া অতি শোভা রে।
তাহে ঝর ঝর সেই প্রেমধার যেন সুরধনী বেগ সে॥
কতসুধা জানি নিন্দিতবাণী লহু লহু হাসরে।
তাহে হরি হরি বলএ উচ্চকরি ঘন রোদন হায় হায় রে॥
কেশ শেষ যাহে ধ্যানে সহি পাএ শ্রুতিগণে অতি দুর রে।
দেখি অকিঞ্চনে করয়ে রোদনে ধাইয়া ধরে নিজ ক্রোড়ে রে॥
যো প্রেমকনর নাহি পাএয়ে ভব উদ্দেশে সদা শঙ্করে।
আনি প্রেম ধনে দীনহিজনে যাচি দেই সব ঘরে ঘরে॥
এমন করুণানিধি কভু নাহি আর।
রোহিণী কুমার বলে দয়া করহ এই বার॥ ১৮

(৭) (বিভাষ রাগেণ গীয়তে)

আজুক নিশির কথা শুন গো মাই।
ঘরেতে আসিঞাছিল তোমার নিমাই ॥
আসিয়া কহেন ওগো কোথা বিষ্ণু প্রিয়া।
শুনিঞা বচন তাঁর উঠিল ধাইঞা ॥
উঠিয়া দেখিল ওগো তোমার গোরাচাঁদে।
সে হৈতে পরাণ মোর নিরবধি কান্দে ॥
নানা ছান্দ করি তার বনাইতে বেশ।
তাহা রহ গোরাচাঁদ মুড়াইঞাছে কেশ ॥
সিংহ জিনিঞা কটি তাহে পীতবসন।
তাহা ছাড়ি গোরা পরেই ডোর কৌপীন ॥
চন্দনে ভূষিত সব হেম কলেবর।
হেন অঙ্গ দেখি সব ধূলাএ ধূসর ॥
সেরূপ লাবণ্যবেশ কিছু না দেখিল।
রোহিণী তনয় বুকে এশেল বাজিল ॥

(৮) (যথারাগ)

শুনিয়া বধূর কথা জগত জননী।
হা নিমাই বলি শচী লোটাএ ধরণী ॥
ওমোর সোণার সুত কোথা রৈল গিয়া।
শচী বিষ্ণু প্রিয়া দুঃখ সাগরে ফেলিয়া ॥
কোন দেশে গেলি ওরে কিবা জানি হৈল।
এত দুখে শচীর প্রাণ কি সুখে রহিল ॥
কি কারণে পাপ তনু নিমাই বিহনে।
উচ্চবোল করি শচী করয়ে রোদনে ॥
রোহিণী কুমার কহে কান্দিতে কান্দিতে।
নিকটে তোমার নিমাঞী ক্ষেমা দেহ চিতে ॥ (১৯)

(৯)

ধনিহে, কিক্ষণে তোমার সঙ্গে হৈল দরশন।
না জানি কপালে মোর কি আছে লিখন ॥

সেই হৈতে মোর কিছু আন নাহি ভায়।
না জানিএ কিবা মোর আছয়ে দশায়॥
তুয়ারূপ ঝুরি ঝুরি সদা প্রাণ কান্দে।
নয়ান লাগিয়া রয় অই মুখ চান্দে॥
করিএ বিনাশ তোহার সঙ্গে স্বপনে।
ইহার প্রমাণ নেহ রোহিণীনন্দনে॥ (২০)

(১০)

ধনি হে শপতি করিঞা কহি।
ও রাঙ্গা চরণ সবে গতি মোর জগত কাহা বোলহি॥ ধ্রু॥
হিয়ার মাঝারে আছে...বরে কহ তহি হাতে ধরি।
যদি বা বচনে পতিত না হয়ে অমাত শপথি করি॥
পুন যদি কহ মতি লিখি নহ করিঞা আপন দাস।
যত যত মোর ছাড়িঞা সকল রহিব এহার পাশ॥
তখন সুন্দরী করিয়া চাতুরী ঈষত বচনে কয়।
জনমের মত চরণে রহিবে লিখি দেহ শ্যামরায়॥
নিশি দিশি কিবা ছাড়িঞা সকল রহিবে হামার পাশ।
উভয় চরণ লিখিঞা ইসাদ রোহিণী তনয় দাস॥ (২১)

(১১)

এ ধনি এক বচন তুয়া পাশ।
কহিতে তোহারে করিএ তরাস।
বহুধনে যোঁই হোয়ত ধনান।
সোজন কাহে বড়ই কৃপণ॥
যো জন জনম কহো রে দাক্ষী।
তাক বিতরণে বড় হও চীত॥ (?)
উচিত কহবি এহ কপটহি ছোড়।
কাহে অতি সুন্দর হোয়ত মূঢ়॥
ইতিন বচন বুঝাইবি মোয়।
রোহিণীনন্দন কহে উচিত হোয়॥ (২২)

(১২)

শুন বর নাগর চতুরহি বচন
তোমারি বচন হাম বুঝাই না জান॥

পরধন দেখি মোহ অত লোভী।
তাক বচন তুহু মুঝে কহবি ॥
যা কর সম্বল পাহি বট দ্বয়।
ত্রিভুবন দান করন পরশোয় ॥ (?)
নিশ্চয়ে বুঝায়বি এহি বচন।
রসীক জন কাহে কাকবরণ ॥
রোহিণনন্দন শুনহ মুরারী।
ছন্দবন্ধে তুহু ধনিক না পারি ॥ (২৩)

(১৩)

এ ধনি কর অবধান।
এক বচন মোর দেহ অনুমান ॥
এক কমলবন বিকশিত হঞা।
তাহার সকল রহে মধুতে পুরিঞা ॥
মধুকর কেনে তাহা না পায় ভূমিতে।
বিচার করিঞা তুহু কহবি উচিতে ॥
রোহিণীনন্দন কহে শুন বিনোদিনী।
এহি বচন তুহু কহ অনুমানি ॥ (২৪)

(১৪)

আর এক কথা শুন ভানুসুতা নিবেদন করি তোয়।
এক দরিদ্র পথেতে যাইতে রতন পড়িয়া পায় ॥
রতন পাইঞা হরিষ হইয়া চলিলা আপন বাস।
যতন করি রাখিলা ধরি করিঞা অনেক আশ ॥
সেই রতন দেখিতেই পুন কিছুই নাহিক পায়।
কহ দেখি মোরে কিবা দিঞা তারে প্রবোধ করণ চায় ॥
তুহু বর নারী বভ্যারবোহারি (?) বিচারে পণ্ডিত দড়।
রোহিণীকুমার কহিলেক সার এবে সে ঠেকিলা গাঢ় ॥ (২৫)

(১৫)

শুত শুন এ ধনি বিনোদিনী রাই।
এক বচন হাম তোহারে শুধাই ॥

যাকর লাগি সদা ঝুরএ যোই।
তাক হৃদয়ে কিছুই না বুঝাই॥
যাকর নাম সদা যোই জগই॥
তাকর দাস বলিঞা দয়াল হই॥
কাহুক কাহুদাস যদি হোই।
রোহিণীনন্দন কহে কে তাহা ছড়ই॥ ২৫।

শ্রীশিবরতন মিত্র
বীরভূম।

শব্দব্রহ্ম (৩)

(বেদ)

এইরূপে বেদতরু ভাষাকারে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে তিনটী মহাশাখায় বিভক্ত হইল। প্রথম ঋক্ অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ, ২য় যজুঃ অর্থাৎ ছন্দোহীন গদ্য ৩য় সাম অর্থাৎ গেয়। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বভাষার মধ্যেই এই ঋক্, যজুঃ, সাম বিদ্যমান রহিয়াছে অর্থাৎ প্রায় সকল ভাষাই পদ্য, গদ্য ও গানাকারে প্রকাশিত। এই ত্রিবিধ আকারে পরিণত বলিয়া বেদের অপর এক নাম ত্রয়ী। তবে ভাষার পরিপুষ্টি লইয়া পর্য্যালোচনা করিলে অনুমান করা যায় প্রথমে ঋগ্বেদের পরিপুষ্টি হইয়াছিল, তৎপরে যজুর্ব্বেদ ওসর্ব্বশেষে সামবেদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কারণ সংস্কৃত বা বঙ্গ ভাষার মধ্যেও আমরা এইরূপ পরিপুষ্টি দেখিতেছি। সংস্কৃত ভাষায় যে কিছু পুরাণ ইতিহাস কাব্য, তৎসমস্তই প্রায় পদ্যে লিখিত, যখন পদ্যের প্রতিষ্ঠা শেষ হইল তখন বাণ, দণ্ডী প্রভৃতি কবিগণ গদ্যের রচনায় হস্তার্পণ করিয়া, গদ্য সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার সমাপন করেন। সর্ব্বশেষে পদ্য ও গদ্যের পরিপুষ্টির শেষ হইয়াছে দেখিয়া জয়দেব গান ধরিলেন। তিনি প্রায় একাকীই এই গানের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করিয়া গেলেন। বঙ্গভাষার মধ্যেও আমরা তাই দেখিতে পাই, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রথম পদ্য সাহিত্যের মহাকবি। তৎপশ্চে ভূদেব, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি গদ্য সাহিত্যের মহা কবি। সর্ব্বশেষে দাশরথি প্রভৃতি গেয় সাহিত্যের মহাকবি। তবে পদ্য সাহিত্যের কালে গদ্য বা গান ছিল না আমরা এমন বলিতেছি না।

ঋক্ যজুঃ সাম যুগপৎ প্রসূত হইয়াছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা বা পরিপুষ্টি পর পর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।' এই পরিপুষ্টি বা প্রতিষ্ঠা লইয়া উৎপত্তি ধরিতে গেলে ছন্দোবদ্ধ ঋগ্বেদই সেই বেদমহাবৃক্ষের প্রথম শাখা। তৎপরে যজুঃ সামরূপ অপর শাখাদ্বয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই বৈদিক যুগকে ভাষা জগতের আদিযুগ বলা যায়।

তবে এক্ষণে একটী প্রশ্ন আসিতে পারে, যে বেদ কি কেবল ভারতবর্ষেরই সামগ্রী, না সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী? যদি ভারতবর্ষেরই বেদ নিজস্ব হয় তবে ইহা সনাতন অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরের বাক্য হইতে পারে না। অর্থাৎ ইহা স্বয়ং প্রকাশিত শাশ্বতীভাষা হইতে পারে না; আর যদি সমস্ত পৃথিবীর জন্যই হয় তবে, ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র ইহার প্রচার নাই কেন? ভারতবর্ষ ব্যতীত কুত্রাপি ইহার প্রকাশক ব্রাহ্মণের বাস নাই কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে একপক্ষে বলা যাইতে পারে, আমাদের ভারতবর্ষই একটী সংক্ষিপ্ত পৃথিবী, সর্ব্ববিধ প্রাকৃতিক পদার্থে সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভারত সুসজ্জিত। সর্ব্ববিধ ধনরত্নে ভারত সমৃদ্ধিশালী। এক কথায় যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তাহা এই ভারতে আছে, তাই তৎকালীন আর্য্যগণের চিন্তাশীলতা জ্ঞান-গরিমা প্রথম এই ভারতে উন্মেষিত হইয়াছিল, ভারতের সর্ব্ববিধ সুখই তাঁহা-দের চিন্তাশক্তিকে শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই তৎকালে তাঁহারা এই ভারতেই প্রথমে বেদলাভ করিয়াছিলেন। সূর্য্যকিরণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলেও যেমন এক প্রকার কাচ খণ্ডের দ্বারা তাহা কেন্দ্রীভূত হইয়া অগ্নি উৎপাদন করে, তদ্রূপ বেদ অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান, সর্ব্বব্যাপী হইলেও, সমস্ত জগতের সম্পত্তি হইলেও, শাশ্বত হইলেও, ভারতীয় আর্য্যগণের চেষ্টায় কেন্দ্রীভূত হইয়া সাম ঋক্ যজুরূপে সর্ব্বপ্রথম এই স্থানেই আভিভূত হয়, তাহার ফলে অধ্যাত্মবিদ্যা প্রাকৃতিক বিদ্যা দর্শন গণিত জ্যোতিষ চিকিৎসা কৃষি শিল্প বাণিজ্য যুদ্ধ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিদ্যাতে ভারতই সর্ব্বপ্রথম পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেমন গ্রহ নক্ষত্রাদির পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে আবর্ত্তন একটী প্রাকৃতিক নিয়ম। বোধ হয় ভারতে সমুদ্ভূত সে জ্ঞান রাশি সে নিয়ম অতিক্রম করে নাই। যেন বেদসূর্য্য ভারতীয় আকাশে উদিত হইয়া ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে। তাহার বিমল আলোকে ক্রমশঃই যেন পারস্য আরব গ্রীস রোম ফ্রান্স বৃটন আলোকিত হইয়া গিয়াছে। পরে আটলাণ্টিক অতিক্রম করিয়া আমেরিকার আকাশে যখন দেখা দিল, তখন উত্তর আমেরিকা তাহার আলোকে

আলোকিত হইল, এখন তাহার ক্রমশঃ আবর্ত্তনে জাপান সে বিমল রশ্মি লাভ করিয়াছে, আবার কিছুদিন পরে আমাদের ভারতের জিনিষ ভারতেই আসিবে: বৈদিক ভাষা স্থানান্তরে না যাউক কিন্তু যাহা বেদ অর্থাৎ জ্ঞান তাহাত সকল দেশে পাইতেছে, সকল দেশেই তো চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ আছে, সমস্ত দেশেই ত একদল লোক জ্ঞানচর্চ্চা ধর্ম্মযাজন বা পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। একশ্রেণীর লোকে যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্য পালন লইয়া ব্যস্ত থাকেন। অপর দল কৃষি শিল্প বাণিজ্য কার্য্যে নিরত থাকেন, আর এক শ্রেণীর লোক স্বীয় শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অপর শ্রেণীত্রয়ের সহায়তা করিতে থাকেন। এই শ্রেণী সমূহের ব্রাহ্মণাদির নাম না থাকুক। কার্য্যতঃ ত তাহাই হইতেছে। ভারতই ত এই বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ভারতই ত এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিধাতা, এতদ্বারা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে এই ভারতে হইতেই প্রথম বেদের আবির্ভাব। পরে সমগ্রজগত তাহার আলোকে আলোকিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গেই বৈদিক ভাষাও নানা আকারে আকারিত হইয়া সমস্ত সভ্যজগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে অনেকে এ প্রশ্নের উত্তর আর এক প্রকারে সমাধান করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমানে অনেকে এ বিষয়ের এইরূপ মীমাংসা করিয়া থাকেন যে—পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বহু পর্য্যালোচনা করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন যে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির যাবৎ ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার কোনও না কোনও অংশে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, অনেক সভ্যজাতির প্রাচীন দেবদেবীর মূর্ত্তির সহিত বৈদিকদেরদেবীর মূর্ত্তির অনেক সাদৃশ্য আছে, আর সমুদয় সভ্য-জাতির মধ্যে এই বৈদিক চাতুর্ব্বর্ণ্যের লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। এই সকল দ্বারা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় সমুদয় সভ্যজাতির মূল পুরুষগণ কোনও না কোনও স্থানে একত্র অবস্থিত ছিলেন, তথায় তাঁহাদের কঠোর সাধনার ফলস্বরূপ অপূর্ব্বভাষায় বেদের আবির্ভাব হইয়াছিল, পরে প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে সে স্থান কালে বাসের অযোগ্য হওয়ায় কিম্বা তাঁহারা জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া, বিভিন্ন দেশ অধিকার করতঃ তথায় উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য হন। বিভিন্নদেশের আবহাওয়ার বিভিন্নতা বশতঃ বৈদিক ভাষারও নানাপ্রকারে রূপান্তর ঘটিয়াছে। এইরূপ সমাধান নিতান্ত অসম্ভব নহে। বেদের লীলা-ভূমি ভারতবর্ষেই যখন অত্রত্য আর্য্যগণের ভাষার অনন্ত বিভিন্নতা, সমস্ত

ভাষা, বৈদিক ভাষার অপভ্রংশ হইয়াও যখন তাহা হইতে রূপান্তরিত হইয়া বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছে, তখন পারসীক লাটীন প্রভৃতিও যে সেই মূল ভাষার অপভ্রংশ হইতেই, আজ এইরূপে পরিণত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ কি? আর্য্যগণের অন্যত্র বাস সম্বন্ধে মহাভারতের মধ্যেও আমরা একস্থলে দেখিতে পাই। শুকদেব, পিতা ব্যাসদেবের আজ্ঞায় রাজর্ষি জনকের নিকট আত্মজ্ঞান লাভের জন্য পদব্রজে ইলাবৃত বর্ষ হইতে যখন ভারতবর্ষে আইসেন তখন তিনি

মেরোর্হরেশ্চ দ্বেবর্ষে বর্ষং হেমবতস্তথা
ক্রমেণৈব ব্যতিক্রম্য ভারতংবর্ষমভ্যগাৎ।
সদেশান্ বিবিধান্ পশ্যন্ চীন হুন নিষেবিতান্
আর্য্যাবর্ত্তমিমং দেশমাজগাম মহামুনিঃ।

অর্থাৎ মহামুনি শুকদেব ইলাবৃত বর্ষ হরিবর্ষ এবং হেমকুটাধিষ্ঠিত কিম্পুরুষ-বর্ষ ক্রমে অতিক্রম করিয়া শেষে ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন, তিনি চীন হুন নিষেবিত বিবিধ দেশ দর্শন করিতে করিতে এই আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। মহাভারতের এই উক্তি দ্বারা আর্য্যগণের সুমেরুপর্ব্বতে আদিম বাস ছিল বলিয়া সূচিত হইতেছে। অধিকন্তু চীন প্রভৃতিও ভারতের অন্তর্গত ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে।

আবার শুক্ল যজুর্ব্বেদের দ্রষ্টা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সম্বন্ধে একটী গল্প আছে, যাজ্ঞবল্ক্য গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিতেন তখন মেরু প্রদেশে ঋষিগণের একটী সভা হইত তাহাতে তাঁহারা নিয়ম করিয়াছিলেন।

ঋষি র্যোঽদ্য মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি
সপ্তাহাভ্যন্তরে তস্য ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি।।"

দৈবাৎ এক দিন যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু বৈশম্পায়ণ সে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সত্য সত্যই সপ্তাহ মধ্যে একটী ব্রহ্ম হত্যা তাঁহার অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হয়; তখন ঋষি তাঁহার শিষ্যগণকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে তপস্যা করিতে বলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, গুরো এই অল্পতপা বটুগণের আবশ্যক কি, আমি একাকাই তপস্যা দ্বারা আপনার সমস্ত পাপ দূর করিব। তাহার বাক্যে ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন তোমার ন্যায় অহঙ্কারী ব্রহ্মনিন্দক কখনও আমার শিষ্য হইয়া বেদের অধিকারী হইতে পারে না, তুমি যাহা শিক্ষা করিয়াছ তৎসমস্তই ফিরাইয়া দেও, এই অভিশাপে অভিমানী যাজ্ঞবল্ক্য, তৎক্ষণাৎ তাহা ফিরাইয়া দিলেন তাহার নাম হইল

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ, শেষে সূর্য্যের উপাসনা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য পুনর্ব্বার যে বেদ লাভ করেন তাহা শুক্ল যজুর্ব্বেদনামে খ্যাত। এই উপাখ্যানের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই ঋষিগণের পুর্ব্বে সুমেরু প্রদেশে নিয়মিত রূপে সভা হইত। অতএব আর্য্যগণের আদিম বাস যে সুমেরু প্রদেশে ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সেই সুমেরু প্রদেশ হইতে তাঁহারা স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাও অসঙ্গত নহে। তবে পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারতবর্ষেই যে সেই মূল বৈদিক ভাষা ও মূল গ্রন্থ অদ্যাপি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ঐ ভাষায় ও গ্রন্থে বঞ্চিত তাহার অপর কারণ কল্পনা করা যাইতে পারে।

আর্য্যগণ স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন বটে, চাতুর্বর্ণ্যে সমাজ বিভক্ত করিয়া উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই প্রথম সাধনলব্ধ বেদকে সম্প্রদায় ক্রমে শিক্ষা প্রদান করিয়া রক্ষা করিতে পারিলেন না, কেবল বেদলব্ধ উপদেশটী তাঁহাদের সংস্কার রূপে থাকিয়া গেল. সে ভাবাও ক্রমে বিকৃত হইয়া আসিল, বেদ হারাইয়া তাঁহারা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন।

ভারতাগত আর্য্যগণের ভাগ্যে যে এরূপ না ঘটিয়াছিল, এমন নহে, কারণ পূর্ব্বে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা প্রচলিত ছিল না। গুরু মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া তাহা স্মরণ পথে রাখিতে হইত, এজন্য বেদের অপর এক নাম শ্রুতি; এ স্থলে সম্প্রদায় ক্রমে শিক্ষা দানের বিচ্ছেদ ঘটিলে যে বেদের বিচ্ছেদ ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইরূপে যে অনেকবার বেদের বিলোপ ঘটিয়াছিল পুরাণে অনেক স্থলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে যে ভারতে বেদ অদ্যাপি পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজমান আছে, সে কেবল ভারতবর্ষেরই গুণে। ভারত নাকি প্রকৃতির লীলাভূমি, পৃথিবীর সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যে ভারত ভূমি নাকি সুষমাময়ী, সর্ব্ববিধ সুখের একমাত্র আধারভূতা, তাই ভারতে পুনঃ পুনঃ বেদের লোপ হইয়াও হয় নাই। ভারতে আসিয়া আর্য্যগণের চিন্তাস্রোত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হয়; সেই জন্যই তাঁহারা পুনঃ পুনঃ লুপ্ত প্রায় বেদরত্নের পুনরুদ্ধার সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে অসুরবিপ্লবে বেদ বিলুপ্ত হইলে ভগবান স্বয়ং মৎস্যাবতারে, তাহার উদ্ধার সাধন করেন। আর একবার সম্প্রদায়বিচ্ছেদে বিলুপ্ত হইলে ভগবান, অত্রিবংশীয় দত্ত নামা মুনিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বকীয় অপ্রতিহত স্মৃতি শক্তি

প্রভাবে সেই লুপ্ত বেদের স্মরণ করিয়া তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, মাঘ কবি তাঁহার শিশুপাল বধ মহাকাব্যের ১৪শ সর্গে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

সম্প্রদায় বিগমাদুপেয়ুষী-
রেষ নাশমবিনাশি বিগ্রহঃ।
স্মর্তুমপ্রতিহত স্মৃতি শ্রুতি-
র্দত্ত ইত্যভবদত্রি গোত্রজঃ॥

তৎপরে আবার সেই বেদের এইরূপে সম্প্রাদায়াদি বিচ্ছেদ বশতঃ বিশৃঙ্খলা ঘটায় ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে সেই বেদের স্মরণ পূর্ব্বক শাখাকারে তাহা যথাযথ বিভাগ করিয়া, এক এক শাখা শিষ্যগণকে সমর্পণ করেন, সেই জন্য তিনি বেদব্যাস বলিয়া কীর্ত্তিত, আবার সেই শাখা-বিভক্ত বেদও বৌদ্ধ-বিপ্লবে লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিল, সে সময় শঙ্করা-বতার শঙ্করাচার্য্য যদি আবির্ভূত হইয়া ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উচ্ছেদ না করিতেন, তবে আজ বেদের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিত কি না সন্দেহ। আবার যখন বিপ্লবে উহা নষ্ট প্রায় হয় প্রসিদ্ধি আছে পেশওয়া বাজীরাওয়ের যত্নে উহা সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছিল, পরে অধ্যাপক মোক্ষমূলরের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে তাহা সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়া আজ ভারতে তাহা পূর্ণ মূর্ত্তিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন একাল পর্য্যন্তও বেদের উপর এত বিপত্তি, তখন আর্য্যগণের ভারতাগমন সময়ে যে উহা অন্যান্য দেশের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে ভারতাগত আর্য্যগণ বেদই উন্নতি লাভের এক মাত্র উপায়, বেদ না হইলে কি জ্ঞানচর্চ্চা, কি রাজ্যশাসন, কি কৃষি কর্ম্ম কিছুই সুচারু সম্পন্ন হইতে পারে না, বেদ ব্যতীত সদসৎ কর্য্যাকার্য্য কিছুই নির্ব্বাচনের উপায় নাই, জানিয়া তাহার উদ্ধারের জন্য বারংবার কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতের সুখ ভারতের সৌন্দর্য্য তাহাদের সে চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিল। তাহার ফলে তাঁহারা অজ্ঞেয় কাল হইতে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অধিকন্তু যাহা জ্ঞানের চরম সীমা, সেই উপনিষদ্ বা ব্রহ্মবিদ্যালাভে তাঁহারা সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য দেশীয় অর্য্যগণের মধ্যে যখন বেদের বিচ্ছেদ ঘটিল, তখন তাঁহারা পুনরুদ্ধারের সুযোগ পান নাই, আর তৎ দেশের প্রকৃতিও তাঁহাদের অনুকূল হয় নাই, তাই তাঁহারা

বেদ হারাইয়া ভারতের ন্যায় তৎকালে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। বৈদিকজ্ঞানের সংস্কারের উপর পুরুষকার করিতে করিতে তাঁহারা সুদীর্ঘ কালের পর বর্ত্তমানে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভাষা বৈদিকভাষার অপভ্রংশ হইতে হইতে সম্প্রতি এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে যে উহা একই বৃক্ষের অংশ বলিয়া নির্ব্বাচন করা দুরূহ, অতএব সুমেরুপ্রদেশে আর্য্যঋষিগণ হইতে বেদের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল তৎপরে ভারতে তাহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে ইহাও মীমাংসা করা যায়, কিন্তু উপনিষদ বা ব্রহ্মবিদ্যা যে কেবল ভারতীয় আর্য্যগণেরই নিজস্ব, কেবল ভারতের গুণেই তাঁহারা ইহা লাভ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ, বেদভ্রষ্ট হইয়া কেবল সংস্কার ফলে ভিন্ন দেশীয় আর্য্যগণ বৈদিক জড়বিজ্ঞানে উন্নতিলাভ করিলেও উপনিষদ্ কেবল ভারতীয় আর্য্যেরই অধিকার, অন্যান্য দেশ এখনও ইহা হইতে শত হস্ত দূরে পড়িয়া আছে।

ব্যাকরণ

এইরূপে বেদ আবির্ভূত হইলে পর আর্য্যঋষিগণ সহসা শব্দব্রহ্মের এইরূপ বিবর্ত্তে বিস্মিত এবং কৌতূহলী হইয়া ইহার স্বরূপ নির্ণয়ার্থ যত্নবান হইলেন। তাঁহাদের কঠোর তপস্যায় এবং দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের ফলে তাঁহারা অপার-সাগর সদৃশ মূর্ত্তিমান শব্দব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রুতি শব্দব্রহ্মের সে মূর্ত্তির এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

চত্বারি শৃঙ্গাণি ত্রয়োঽস্য পাদা
দ্বেশীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহাদেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ॥

মহাদেব বৃষভরূপে মানুষের নিকট প্রাদুর্ভূত হইলেন।
তাঁহার চারি শৃঙ্গ, তিনটী চরণ, দুইটী মস্তক, সাতটী হস্ত।
সে বৃষভ তিনটী স্থানে বদ্ধ হইয়া শব্দ করিয়াছিলেন।
ভাষ্যকারগণ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—
চত্বারি শৃঙ্গানি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গ নিপাতাঃ।
ত্রয়োঽস্য পাদাঃ—লড়াদিবিষয়া ত্রিধা ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালাঃ।
দ্বে শীর্ষে—দ্বৌ নিত্যানিত্যাত্মনৌ। নিত্যঃ কার্য্যশ্চ ব্যঙ্গ ব্যঞ্জক ভেদাৎ।
সপ্ত হস্তাসোঽস্য—তিঙ্গাসহ সপ্ত সুব্বিভক্তয়ঃ।

ত্রিধা বদ্ধঃ=উরসি কণ্ঠে শিরসিচ বদ্ধঃ।

বৃষভ ইতি প্রসিদ্ধ বৃষভেণ রূপণং ক্রিয়তে

রোরবীতি শব্দং করোতি ; রৌতিঃ শব্দকর্ম্মা। ইহ শব্দশব্দেন

শব্দঃ বিবক্ষিতঃ। মহাদেব মর্ত্ত্যা আবিবেশ। দেবঃ শব্দঃ

মর্ত্ত্যাঃ মরণ ধর্ম্মাণো মনুষ্যাঃ তান আবিবেশ : ইতি মহতা

দেবেন পরব্রহ্মণা সদৃশ ইত্যর্থঃ।

এইরূপে সেই ঋষিগণ পরব্রহ্মস্বরূপে শব্দব্রহ্মের প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন যেমন কার্য্য জগতে পরব্রহ্মের লীলা, শব্দ জগতেও ঠিক তাই। কার্য্য জগতে যেমন সমুদায় প্রপঞ্চ একমাত্র প্রকৃতি হইতেইউৎপন্ন অথচ প্রকৃতির নিজের কোনও ক্ষমতা নাই, চিদাত্মা পুরুষের সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতি কিছুই করিতে পারে না, সে স্বয়ং জড়, আবার পুরুষের ও নিজের কোনও কার্য্য নাই তিনি নিক্রিয় নির্ব্বিকার প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞানমাত্র, অথচ তাঁহারই সংযোগে প্রকৃতি জড় হইয়াও জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টিস্থিতি সংহার করিতেছে. সেইরূপ শব্দ জগতের ও দুইটী ভাগ আছে। এক ভাগের অর্থ আছে অথচ সামর্থ্য নাই ; সে জড় নিশ্চল, কেননা তাহার দ্বারা কোন অর্থ প্রকাশ করিতে পারা যায় না। শব্দের অপর এক ভাগ আছে তাহার নিজের কোনও অর্থ নাই অথচ ইহার সহযোগে পূর্ব্বভাগ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। এইজন্য ইহার ও একটী ভাগের নাম প্রকৃতি অপর ভাগের নাম প্রত্যয়। প্রকৃতি ভূধাতুর নিজের অর্থ আছে বটে কিন্তু কেবল "ভূ" বলিলে সত্তা বুঝায় না ; এখন ইহার সে অর্থ থাকিয়াও নাই। আর তি প্রত্যয়ের নিজের কোনও অর্থ নাই। কেবল "তি", এইটী বলিলে বর্ত্তমান কাল ও বুঝায় না; বা তৃতীয় পুরুষের কোনও কর্ত্তা ও অভিহিত হয় না। কিন্তু "ভূ" প্রকৃতি নিস্ক্রিয় "তি" প্রত্যয়ের সহযোগে ভবতি নামে একটী শব্দ সৃষ্ট হইয়া প্রকাশ করিতেছে যে বর্ত্তমান কালে হওয়া ক্রিয়াতে তৃতীয় পুরুষের একজন কর্ত্তা। সেইরূপ রাম এই শব্দের অর্থ আছে বটে কিন্তু কেবল রাম, এ শব্দ দ্বারা সে অর্থ প্রকাশ পাইতে পারিতেছে না. সুতরাং তদ্দারা কোনও কার্য্য হয় না। আর "সু" প্রত্যয়ের নিজের কোনও অর্থ নাই। কেবল "সু" এই বলিলে একজন কর্ত্তাকে বুঝায় না, কিন্তু প্রকৃতি রাম যখন নিরর্থক "সু" প্রত্যয়ের সাহায্য লাভ করে তখন "রামঃ" এই পদের দ্বারা বুঝায় যে "এক জন রাম কোনও ক্রিয়ার কর্ত্তা।" এইরূপে জড় ও চৈতন্যের ন্যায় প্রকৃতি ও,

প্রত্যয়ের সহযোগে সমস্ত স্ফুট শব্দ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই জন্যই ঋষিগণ এই শব্দব্রহ্মকে পরব্রহ্ম স্বরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। আর বৈয়াকরণিকেরা বলেন "নিত্যানাং পদানাং প্রতিপত্ত্যর্থং প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ পরিকল্পনং শাস্ত্রেণ ক্রিয়তে নতু পদানি ক্রিয়ন্তে।" সুতরাং পদ নিত্য ইহার কেহ রচয়িতা নাই। বৈয়াকরণিকেরা কেবল বুঝাইবার জন্য ইহা বিশেষ করিয়া দেখাইতেছেন মাত্র। শব্দব্রহ্মের এই স্বরূপকে শ্রুতি একটী বৃষভের রূপে চিত্রিত করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

শব্দব্রহ্মের এইপ্রকার স্বরূপ; কে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। শাস্ত্রকারেরা নির্দেশ করেন ভগবান মহাদেব স্বয়ং এই শব্দশাস্ত্রের প্রথম প্রকাশক। তাঁহার প্রণীত ব্যাকরণকে মাহেশ ব্যাকরণ কহে। বোধ হয় উল্লিখিত শ্রুতি অনুসারে এ প্রবাদ প্রসিদ্ধ হইতে পারে। যাহা হউক প্রথমে এই মাহেশ ব্যাকরণই প্রসিদ্ধ ছিল ইহা এতই অনন্ত বস্তৃত যে; সমস্ত স্ফুট শব্দ মাত্রেরই প্রকৃতি প্রত্যয় ইহার দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক মহর্ষি কাত্যায়ন তাই বলিয়াছেন—

যন্মুক্তং ভাষ্যকারেণ কুশাগ্রীয় ধিয়াবুভৌ

নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ।

আমি (অর্থাৎ কাত্যায়ন) এবং ভাষ্যকার পাতঞ্জলি উভয়েই কুশাগ্রীয় বুদ্ধি; আমরা যখন শব্দ সাগরের কূলকিনারা পাই না অন্য স্থূলবুদ্ধিগণের কথা কি?

অন্য এক গ্রন্থকার মাহেশের সহিত পাণিনির তুলনায় সমুদ্রের নিকট গোষ্পদের উপমা দিয়াছেন।

যান্যুজ্জহার মাহেশাৎ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ,

তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনি গোষ্পদে।

বস্তুতঃ মাহেশ ব্যাকরণ এত বিস্তীর্ণ যে সাগরের ন্যায় তাহারও কূলকিনারা নাই। কিন্তু এবম্বিধ মহাব্যাকরণ বর্ত্তমানে প্রচলিত নাই।

সর্ব্বপ্রথম এই মাহেশব্যাকরণ দ্বারা বৈদিক ভাষা মার্জ্জিত হইয়াছিল, সেই অবধি সেই মার্জ্জিত ভাষার নাম হইল সংস্কৃত। এই মাহেশ ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া মারীচী, অত্রি, নারদ প্রভৃতি মহর্ষি, মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকার, বাল্মীকি, ভরত প্রভৃতি আদি কবি, বেদব্যাস প্রভৃতি পুরাণ ইতিহাসাদির প্রবর্ত্তক এবং কপিল গৌতম প্রভৃতি দর্শনকার ঋষিগণ সংস্কৃত ভাষায় অশেষ

গ্রন্থ রচনা করেন। পরে এই মাহেশ ব্যাকরণসমুদ্র হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া; গালবাপি, শলি, চাক্রবর্ম্মণ, স্ফোটায়ন, কাশ্যপ, গার্গ্য, ভরদ্বাজ, সেনক, শাকটায়ন, সাকল্য, পাণিনি প্রভৃতি মহর্ষিগণ একএকটী শব্দশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

সম্প্রতি গালব প্রভৃতি ঋষি প্রণীত ব্যাকরণ দেখা যায় না, বোধ হয় তাহা লুপ্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু পাণিনি প্রণীত ব্যাকরণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

কোষাদিতে প্রসিদ্ধ আছে পাণিনির পাঁচটী নাম যথা—আহিক, দাক্ষী-পুত্র, শালঙ্কিন্, পাণিন ও শালাতুরীয়। প্রবাদ আছে যে ইনি কঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবান মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট বরলাভ করিয়া এই সুবৃহৎ ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত ব্যাকরণকে পাণিনীয়াষ্টক বা পাণিনীয়াষ্টাধ্যায়ী বলে। মহামুনি কাত্যায়ন ইহার বার্ত্তিক রচনা করিয়া তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, তৎপরে মহামুনি পতঞ্জলি উক্ত পাণিনীয়াষ্টক ও বার্ত্তিকের মহাভাষ্য রচনা করিয়া পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। তৎপ্রণীত মহাভাষ্যকে ফণিভাষ্য কহে। প্রসিদ্ধ আছে যে নাগরূপী সহস্রশীর্ষা ভগবান অনন্তদেব মানবের কায়মনোবাক্য শুদ্ধির নিমিত্ত পতঞ্জলি মুনিরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাজমৃগাঙ্ক নামক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পাণিনিসূত্রের মহাভাষ্য ও পাতঞ্জল নামক যোগসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনেক স্থলে ইনি ভাষ্যকার, গোনর্দ্দীয় ও চূর্ণিকৃৎ এই তিন নামে অভিহিত।

পাণিনির ব্যাকরণ যে কোন্ সময়ে রচিত তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না, পাণিনিসূত্র বহুকাল রচিত হইবার পর কাত্যায়ন তাহার বৃত্তি রচনা করেন, তাহারও বহুকাল পরে মহর্ষি পতঞ্জলি তাহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। মহর্ষি ব্যাসদেব যে পতঞ্জলি প্রণীত যোগশূত্রের ভাষ্যকার, সেই পতঞ্জলি যে গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, কে তাহার কাল নির্ণয় করিবে? তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে ইহা পুরাণকার বেদব্যাসের ও অনেক পূর্ব্বে!

আরও অনেক গ্রন্থকার এই পাণিনি ব্যাকরণের ব্যাখ্যা করিয়া সুগম করিয়া দিয়াছেন। মাধবাচার্য্য প্রভৃতি গ্রন্থকার ইহাকে পাণিনিদর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু ইহা পদের অনুশাসন দ্বারা বেদের প্রকৃত অর্থ

নির্দ্দেশ করিয়া পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রদর্শন করায়—এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি।"

এই পাণিনিদর্শন সমস্ত দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ অন্যান্য দর্শন অনেক-স্থলে বেদ বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করেন; কোথাও বা বেদের বাস্তবিক অর্থের উচ্ছেদ করিয়া নিজের মতের পরিপোষক অর্থান্তর কল্পনা করিয়া ব্যাকুলিত করেন। এবং সমুদয় বেদভাগের সমালোচনা না করিয়া নিজ মতের অনুকূল কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া অভিমতার্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু এই পাণিনিদর্শন কোথাও বেদবিরোধী নহে প্রত্যুত প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ করিয়া বৈদিক শব্দের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া দেয় এই জন্য ইহাকে মোক্ষলাভের সোপানাবলির প্রথম সোপান বা মোক্ষমার্গের প্রশস্ত রাজপথ বলে। এই জন্য আচার্য্যেরা বলিয়াছেন—

তদ্দ্বারং অপবর্গস্য বাঙ্মলানাং চিকিৎসিতং।
পবিত্রং সর্ব্ববিদ্যানাং অধিবিদ্যং প্রচক্ষতে
ইদমাদ্যং পদস্থানং সিদ্ধিসোপান পর্ব্বণাম্।
ইয়ং সা মোক্ষমার্গাণাং সরলা রাজপদ্ধতিঃ।

এই ব্যাকরণশাস্ত্র মোক্ষের দ্বার স্বরূপ, বাক্যমল বিশোধক ঔষধ, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত, আর ইহা সিদ্ধিলাভের সোপানা-বলির প্রথম সোপান, এই সেই মোক্ষমার্গের সরল রাজপথ।

অতএব ইহা যে "পাণিনিদর্শন" তাহাতে সন্দেহ কি? এই পাণিনীদর্শন বা পাণিনীয়াষ্টাধ্যায়ীর সার সঙ্কলন করিয়া চন্দ্র, বর্দ্ধমান, সর্ব্ব-বর্ম্মা, অনুভূতি, স্বরূপাচার্য্য, ক্রমদীশ্বরাচার্য্য, বোপদেব, পদ্মনাভ দত্ত প্রভৃতি বৈয়াকরণিকেরা এক একটী ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে বাদীন্দ্র চক্রচূড়ামণি মহাপণ্ডিত ক্রমদীশ্বরাচার্য্য প্রণীত সংক্ষিপ্তসার, সর্ব্ববর্ম্মাপ্রণীত কলাপ, বোপদেব প্রণীত মুগ্ধবোধ, পদ্মনাভ দত্ত প্রণীত সুপদ্ম ব্যাকরণ বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। এই সকল আধুনিক ব্যাকরণের মধ্যে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ সুখ-বোধ্য ও বহুবিস্তৃত। মহাপণ্ডিত ক্রমদীশ্বরাচার্য্য ইহার সূত্রকার। বিদ্বৎ-প্রিয় মহারাজাধিরাজ শ্রীমজ্জুমর নন্দী সেই সূত্রের বৃত্তি প্রণয়ন করেন। আর মহাপণ্ডিত ঔত্থাসনিক গোয়ীচন্দ্র পাণিনী, কাত্যায়ন, ভাষ্যকার, জয়া-দিত্য, জিনেন্দ্র রক্ষিত প্রভৃতি বৈয়াকরণিকের মত সমালোচনা করিয়া এই সমস্ত সূত্র ও বৃত্তির "বিবরণী" নামে টীকা প্রণয়ন করেন। আর ন্যায় পঞ্চা-

ননাচার্য্য, কবিচন্দ্র, গোপাল গোস্বামী, বংশীবদন ও অভিরাম বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণ প্রত্যেকে ঐ টীকার এক একটী ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। আরও অন্যান্য পণ্ডিতগণ ইহার পঙক্তিমালা, জ্ঞাপকাবলী দুর্ঘটবোধ প্রভৃতি বহুবিধ আংশিক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। এইরূপে সেই মাহেশ মহাব্যাকরণ অনেকাংশে বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপে বেদপ্রকাশের পর বেদার্থের বোধের জন্য সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণশাস্ত্র প্রকাশিত হইল, তৎপরে সেই বেদশিক্ষার সুগমের জন্য ঋষিগণ নানাবিধ পথ আবিষ্কারে যত্নবান হইলেন; সেই যত্নের ফলে নারদ, লোমশ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষি শিক্ষাগ্রন্থ, মহর্ষি কাত্যায়ন, কল্পসূত্র মহর্ষি যাস্ক নিরুক্তগ্রন্থ, পিঙ্গলঋষি ছন্দঃশাস্ত্র, মহর্ষি ভৃগু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। বেদাধ্যয়নের সহিত এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় না, বা বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না, এজন্য এই ষড়্বিধ গ্রন্থকে বেদাঙ্গ বলে। এই সকল বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদাঙ্গ। কারণ বেদের সহিত ব্যাকরণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ. সেইজন্য আচার্য্যেরা বলিয়াছেন—

আসন্নং ব্রহ্মণস্তস্য তপসামুত্তমং তপঃ

প্রথমং ছন্দসামঙ্গং আহুর্ব্যাকরণম্ বুধাঃ।

ব্যাকরণশাস্ত্র বেদের অতি নিকটবর্ত্তী, উত্তম তপস্যাস্বরূপ এই জন্য ইহাকে পণ্ডিতেরা প্রথম অর্থাৎ প্রধান বেদাঙ্গ বলেন। এই ষড়্বিধ বেদাঙ্গের সাহায্যে মহাপণ্ডিত সায়নাচার্য্য সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের বিশদ ভাষ্য রচনা করিয়া বেদের গূঢ়ার্থের প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানে সেই ভাষ্যের সাহায্যে পশ্চাত্যপণ্ডিত অধ্যাপক মোক্ষমূলর ইংরাজী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদক্ষিণাচরণ কাব্যতীর্থ।

সাধক-কবি চণ্ডীদাস।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহার রত্নগর্ভে কয়েকটী বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমের ধারায় বঙ্গীয় সমাজকে আপ্লুত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে গীতকাব্যকার ছিলেন এই গীতিকাব্যকারগণের মধ্যে চণ্ডীদাসই সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। বঙ্গপ্রদেশান্তর্গত পর্ব্বতারণ্যবেষ্টিত কঙ্করময় বীরভূমেই সেই প্রেমবিহ্বল রসিকরাজ চণ্ডীদাসের সূতিকাগৃহ। কিন্তু বাঁকুড়াবাসীগণ দাবী করিয়া থাকেন যে চণ্ডীদাস ঐ জেলান্তর্গত ছাতনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় বিশালাক্ষী নাম্নী এক দেবী বিরাজিতা; তিনি চণ্ডীদাস আরাধিতা বলিয়া তথাকার লোকে নির্দ্দেশ করেন এবং একটী প্রস্তর খণ্ড আছে তাহাও চণ্ডীদাসের সিদ্ধাসন বলিয়া প্রদর্শিত হয়। তথায় এক ঘর ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে চণ্ডীদাস তাঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রেমিক কবি রচিত গীতাবলী কিম্বা কিম্বদন্তী হইতে চণ্ডীদাসের ছাতিনাগ্রামে বাস সম্বন্ধে কোন আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু বীরভূমে বাস সম্বন্ধে তাঁহার গীতাবলী হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ইহাও অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার সাধনার আরম্ভ ও সমাপ্তি এই স্থানেই হইয়াছিল; তবে তাঁহার সিদ্ধাসন কিরূপে ছাতিনা গ্রামে প্রকাশ পাইল তাহা অবোধ্য।

নিম্নলিখিত কবিতা তাঁহার বীরভূমে বাস সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সাক্ষী। যথা—

"নান্নুরের মাঠে গ্রামের কুটীর নিরঞ্জন স্থান অতি
বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথা ভজন করয়ে নিতি।"

"নিতের আদেশে বাশুলী চলিল,
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে।
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয়।"

যে স্বভাব কবির সঙ্গীতলহরী 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো'

তিনি বীরভূম জেলার ক্ষুদ্র পল্লী নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নান্নুর শাঁকুলিপুর থানার অন্তর্গত, সিউড়ীর পূর্ব্বাংশে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে উক্ত গ্রামের পশ্চিম দিকস্থ কোনও ক্ষেত্রে হলাকর্ষণ কালে একটী চুলা পাওয়া গিয়াছিল তাহা হইতে অনুমিত হয় যে এককালে ঐ স্থানেই লোকের বসতি ছিল কিন্তু কঠোর কালের ধ্বংসনীতির প্রভাবে সে স্থান এক্ষণ ক্ষেত্র ও জঙ্গলে পরিণত এবং তাহার কিয়দ্দূরে নূতন পল্লীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যেই বিশালাক্ষীর পবিত্র মন্দির বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের সুখস্মৃতি জাগরিত করিতেছে। পূর্ব্বে মাতার মদ্য মাংস দিয়া ভোগ হইত। যথা—

"বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥" (চৈতন্য ভাগবত)

কিন্তু এক্ষণ মৎস্য ও ছাগ শিশু ভিন্ন আর কোন তান্ত্রিক পূজার আয়োজন হয় না। বোধ হয় চণ্ডীদাসের সময় হইতে মদ্যাদির ভোগ উঠিয়া গিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে ও দক্ষিণে কতকগুলি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সে সকল অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। বিশালাক্ষী মন্দির সম্মুখস্থ শিবমন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে আরও কয়েকটী শিবমন্দির আছে তৎপশ্চাতের একটী উচ্চ ভূমিতে অট্টালিকার ভগ্ন স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে ইহাকে চণ্ডীদাসের আবাস ভূমি বলিয়া উল্লেখ করেন। অনধ্যা ঐ ভিটা খননকালে উহার মধ্য হইতে সপ্ত হস্ত পরিমিত একটী নরকঙ্কাল বহিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা ব্যতিত তথা হইতে মধ্যে মধ্যে প্রাচীন মোহর ও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চণ্ডীদাসের জন্ম লইয়া অনেক মতভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গভাষা প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ চণ্ডীদাসের জন্মকাল নিরূপণ করিয়াছেন। ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় ঐ শতাব্দীর প্রারম্ভ নির্দ্দেশ করেন। আবার ১২৮০ সাল ১০ই পৌষের সোম প্রকাশে জনৈক পত্র প্রেরক ১৩৩৯ শকে চণ্ডীদাসের জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা স্থানীয় সংবাদে যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহাতে তাঁহার ১৩০৫ শক হইতে ১৩১৫ শকের মধ্যে জন্ম হইয়াছিল ইহা অনুমান করিতে পারি। চণ্ডীদাস ভবানীচরণ রায়ের ঔরসে ও মাতা ভৈরবী সুন্দরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা বিশালাক্ষী দেবীর পূজক ছিলেন। এবং শক্তিদেবীর পূজক থাকা হেতু ভবানীচরণও তাহার বংশধর চণ্ডীদাসকে শাক্ত

সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া অনুমান করা যায় কিন্তু অতি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃ বিয়োগ হওয়াতে চণ্ডীদাস ঘোর দুঃখে পতিত হইলেন এমন কি কোন কোন দিন অন্নাভাবে তাঁহাকে দারুণ জঠর জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া পরকীয় গৃহে আহার ভিক্ষা করিতে হইত যাহা হউক অচীরেই গ্রামবাসীগণ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে উপবীত করিয়া বিশালাক্ষীর পূজক নিযুক্ত করিলেন। সেই অবধি তাঁহার দুঃখের লাঘব হইল। এই সময়ে রামমনি নামক এক অল্প বয়স্কা রজক কন্যা উদর জ্বালায় চণ্ডীদাসের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহাকে মন্দির মার্জ্জনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। নান্নুরের সে গৃহে রামমনি বাস করিতেন তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। তথায় একঘর রজকের বাস তাঁহারা রামমনিকে এই বংশসম্ভূতা বলিয়া থাকেন। নান্নুরের নির্জ্জন প্রান্তরে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া চণ্ডীদাস দেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় বাশুলীমাতার বরে তাহার কবিতা কল্পনার স্ফুরণ হইয়াছিল। এই-রূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শালতোড়া গ্রামের নিত্যা নাম্নী এক বনদেবী বিরাজিতা তাহার বিশালাক্ষী বা বাশুলী নাম্নী এক সহচরী ছিলেন। বনদেবী ঝুমুর শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। একদা তিনি ঝুমুর শুনিতে শুনিতে সহচরীকে সহজ ভজনা প্রচার করিবার আদেশ দেন। তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তে বাশুলী উপযুক্ত পাত্রের জন্য নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া শেষে নান্নুর গ্রামে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন অনতিদূরে এক পর্ণকুটীরে চণ্ডীদাসের দেব দেহ ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন। বিশালাক্ষী ইহাকে সৎপাত্র স্থির করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিলেন এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলে বলিলেন "বৎস চণ্ডীদাস আজ হতে অনুরাগের সহিত, মধুর প্রেম রসের আস্বাদন কর, বৈষ্ণবের ব্রজভার বড় মধুর—তুমি সেই ভাবের ভজনা করিয়া ধন্য হও এই আমার ইচ্ছা। রামমনি রজকী তোমার সহকারিণী হইবে।" চণ্ডীদাস বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে উত্তর করিলেন ঃ—

"উত্তমকুলেতে জনমিয়ে জনম ছিঃ নীচ সহ ব্যবহার ॥"

প্রত্যুত্তরে—

"বাশুলী কহয়ে এই সে সার
এ রস বেদান্ত সমুদ পার"

আর চণ্ডীদাস স্থির থাকিতে পারিলেন না। মস্তক ঘুরিয়া তিনি মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়িয়াছিলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর গুরু করণের জন্য ব্যাকুল হইয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বিশালাক্ষী মাতা মন্ত্র দিবার জন্য গৃহদ্বার আলো করিয়া দাড়াইয়া আছেন চণ্ডীদাস কাঁদিয়া মায়ের চরণতলে পতিত হইয়াছিলেন। জগজ্জননী রজকী রামমনির সহিত তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিলেন। দেবীর কৃপায় হৃদয়ের মলিনতা দূর হইল। তখন মস্তকোপরি নীল গগনে যামিনীকান্ত নক্ষত্রপুঞ্জে বেষ্ঠিত হইয়া চণ্ডীদাসের উপর রজত-কিরণ অজস্র ধারায় ঢালিতে লাগিলেন। লতা গুল্ম বৃক্ষরাজী মধুময়.পুষ্প-পুঞ্জে চণ্ডীদাসের অভ্যর্থনায় নিবিষ্টমনা। নিম্নে নব শষ্পমণ্ডিত মেদিনী বীরভূমের কঠিন কঙ্কর হইতে চণ্ডীদাসের পবিত্র পদযুগল যেন নিজ কমল বক্ষে ধারণ করিলেন। দয়েল হাকিল, পাপিয়া ডাকিল কোকিল বধূ কুলায় বসিয়া কুহুরবের অমৃতধারায় স্বর্গ মর্ত্ত এক করিল। মলয় মারুত চণ্ডী-দাসের পূত দেহ চুম্বন করিয়া দেশ দেশান্তরে সমাচার দিতে ছুটিয়া গেল। ভাগ্যবান চণ্ডীদাস পর্ণকুটীরে বাস করিয়া আজ লক্ষপতি ভূপতি অপেক্ষা ভাগ্যবান। তাই এই সুখের রজনীতে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সুকণ্ঠে গাহিলেন।

"প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে কোন বরণ হব
কোন কর্ম্ম যাজন করিলে কোন বৃন্দাবনে যাব
নব বৃন্দাবনে নব নাম হয় সকল আনন্দ ময়
কোন বৃন্দাবনে ঈশ্বর মানুষে মিলিত হইয়া রয়
কোন বৃন্দাবনে বিরজী বিলাসে তরুলতা চারি পাশে
কোন বৃন্দাবনে কিশোরাকিশোরী শ্রীরূপ মঞ্জুরী সাথে
কোন বৃন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম যায়
কোন বৃন্দাবনে বিকসিত পদ্ম ভ্রমরা পশিছে তায়
গো পথের পথ না হয় বেকত রসিক জনার সনে
উপাসনা ভেদ যাহার হয়েছে সেই সে মরম জানে
দ্বিজ চণ্ডীদাস না জানিয়ে তত্ত্ব কেমনে হইবে পার
উত্তম কুলেতে লভিয়ে জনম ছিঃনী-সহ ব্যবহার ॥"

সেই মধুর গান শুনিবার জন্য মলয়াচল হইতে পবন ফিরিয়া আসিল। ব্রজ-ধামের যমুনায় উজান বহিল বাঁকাসখার বহুদিনের নীরব বাঁশী ত্রিদিব হইতে বাজিয়া উঠিল।

নগণ্য নান্নুর চণ্ডীদাসকে বক্ষে ধারণ করিয়া আজ ব্রজধাম সদৃশ সৌভাগ্যবান হইলেন। রজকিনীর সহিত চণ্ডীদাসের প্রেম সুরু হইয়া জীবনে মরণে সেই "চরণ সার" করিলেন। তাঁহার এই প্রেম রূপজ মোহ জনিত নহে। ইহা প্রেমময়ের স্বর্গীয় প্রশ্রবণ! মন্দাকিনী ধারায় যাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হয় তিনি মানবকুলে ধন্য তাঁহার পদরেণু গ্রহণে পতিত ও তরিয়া যায় এবং যে মহাত্মা পবিত্র প্রেমের অধিকারী তিনিই লাজলজ্জা সমাজবন্ধন ত্যাগ করিয়া বলিতে পারেন

"ওরূপ মাধুরী পাশরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
তুমি সে উপাসনা রস॥
ভেবে দেখ মনে এতিন ভুবনে
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
ধোপানী চরণ সার॥"

তাই চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অকুতোভয়ে আরও গাহিয়াছিলেন ঃ—

"শুন রজকিনী রামি!
ওদুটী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥"

"তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি দেবমাতা গায়ত্রী॥"

নীচ রজক কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও রামমনি সামান্যা রমণী ছিলেন না। তাই বাশুলী মাতা যোগ্যপাত্রে যোগ্যপাত্রী দান করিয়াছিলেন।

রামমনির সহিত চণ্ডীদাস মিলনের আর একটী জনশ্রুতি শুনা যায়। চণ্ডীদাস বাল্যকালে ভাল লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই এবং যৌবনে পদার্পণ করিয়া অতিশয় যথেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। তামাকু সেবন করিতে

ও মৎস্য ধরিতে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি প্রত্যহ যে পুষ্করিণীতে মৎস্য শিকার করিতে যাইতেন সেই সরোবরের অপর একটী ঘাটে রামমনি কাপড় কাচিতেন। এইরূপে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করিতে করিতে তাঁহাদের চারি চক্ষু মিলিত হইল; অন্তরের কোমল তন্ত্রী সহসা বাজিয়া উঠিল। প্রেমিক ভ্রমর প্রস্ফুটিত কোমলমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন।

এ কার্য্য কখনই গোপন থাকিবার নহে। প্রথমে কাণাকাণি, তারপর শুনাশুনি—এরূপে গুপ্ত প্রণয় চতুর্দ্দিকে ব্যক্ত হইয়া পরে। আমাদের প্রেমিক প্রেমিকার দশাও সেইরূপ হইল। ধোপানীর সহিত চণ্ডীদাসের অবৈধ সম্বন্ধ জানিয়া গ্রামস্থ লোকে বিশালাক্ষীর মন্দির হইতে উভয়কে বিদূরিত করিলেন। চণ্ডীদাস রামমনির প্রেমে এতই আত্মহারা হইয়াছিলেন যে লোকলজ্জা সমাজ বন্ধন সমস্ত তুচ্ছ করিয়া অনায়াসে তিনি রজকিনীর গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণসমাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চণ্ডীদাসের ভ্রাতা নকুল প্রভৃতি আত্মীয়গণকে সমাজচ্যুত করিলেন। চণ্ডীদাসের খুড়িমাতা ও নকুল বিব্রত হইয়া রজকনন্দিনীকে ত্যাগ করতঃ সমাজে উঠিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু :—

"শুনি চণ্ডীদাস, ছাড়িয়া নিশ্বাস ভিজিয়া নয়ন জলে।
ধোবিনী সহিতে, আমি যেন তাতে উদ্ধার হইব কুলে॥
পিরীতি আলম্ব, পিরীতি কুটুম্ব পিরীতি সমুদ্র বিধি।
পিরীতি উন্মাদ, পিরীতি আস্বাদ পিরীতে পাইবে নিধি।
পিরীতি আচার, পিরীতি ব্যাভার পিরীতে তোমরা ভাই।
পিরীতের তরে, দুয়ারে দুয়ারে আদর করিতে চাই॥"

কিন্তু খুড়িমাতা ও নকুল ভ্রাতার একান্ত অনুরোধে প্রেমিকবরকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইল; এবং সমাজে উঠিবার জন্য নকুল সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এদিকে রজক কন্যার শীরে বজ্রাঘাত হইল। চণ্ডীদাস অভাবে তিনি জগৎশূন্যময় দর্শন করিতে লাগিলেন। চণ্ডীদাসের রূপ গুণ মনে করিয়া, তাঁহার অনৈসর্গিক প্রেমের স্বাদ অনুভব করিয়া, নয়ন ধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিতে লাগিল। অবশেষে অস্থির হইয়া চণ্ডীদাসকে নিমেষের দেখা দেখিবার জন্য তাঁহার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

ছেন। চণ্ডীদাস পরিবেশন করিয়া আরও ব্যঞ্জন আনিবার জন্য যাইতেছিলেন এমন সময় রজককন্যা তাহার পদধারণ করিয়া বলিলেন "প্রভু নীচ রজককুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখে ছিলাম, কেন আমায় পবিত্র প্রেমের আস্বাদন দিয়া পাগল করিলে? বল প্রভু এক্ষণে আমার গতি কি হইবে? তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব।" ভোজনকারী ব্রাহ্মণগণ সবিস্ময়ে দেখিলেন চণ্ডীদাসের দুইহাত থালায় আবদ্ধ আর দুইটী হস্ত প্রসারিত করিয়া রজকিনীকে আলিঙ্গন করিলেন। এই সময়ে রামমণির দেহ হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি উদ্ভাসিত হইল এবং মুহূর্ত্তের জন্য যেন সেই স্থানে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য বিকাশ পাইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ এই অলৌকিক ব্যাপারে মোহিত হইয়া রজককন্যাকেও একবাক্যে পরিবেশন করিবার আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবগুণ্ঠনাবতী রামমণি ব্রাহ্মণ মণ্ডলী মধ্যে পরিবেশন আরম্ভ করিলে হঠাৎ তাহার অবগুণ্ঠন বায়ুতাড়িত হইয়া উন্মুক্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ অসামান্যা রজক কন্যা অপর দুইটী হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক অবগুণ্ঠনে বদনমণ্ডল পুনরাবৃত করিয়াছিলেন। এই অলৌকিক ঘটনা অবলোকন করিয়া ব্রাহ্মণগণ ভয়বিচলিত চিত্তে জাত্যন্তর করিবার বাসনা ত্যাগ করিয়া উভয়ের স্তুতিগান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

আজ উভয়ের চির পোষিত প্রেমের জয় হইল। ধন্য তোমরা, ধন্য তোমাদের প্রেম আর ধন্য তোমাদের অনুরাগ। প্রেমের প্রভাবে স্বার্থপর সংসারের কুবাতাস ত্যাগ করিয়া তোমরা প্রেমরাজ্য স্বর্গের সামগ্রী হইয়াছ। তাই বুঝি চণ্ডীদাস, শুধু হৃদয়ের আবেগ উচ্ছাসে এই প্রাচীন বঙ্গকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলে! তুমি অনেক দিন গিয়াছ কিন্তু তোমার সেই বিণার মধুর ঝঙ্কার এখনও বঙ্গবাসীর শ্রবণপথে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে। এদিকে বিনোদ রায় নামক একজন ব্রাহ্মণের প্রতি বিশালাক্ষী মাতার স্বপ্ন হইল যে "গ্রামবাসীগণ আমার শিষ্যদ্বয়ের কলঙ্ক প্রচার করিয়া অপরাধী হইয়াছে, তাহারা অচীরে চণ্ডীদাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে অপরাধী হইবে, প্রত্যুষে স্বপ্নবাক্য চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল এবং সকলে আসিয়া চণ্ডীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এস্থলে রামমনির কিঞ্চিৎ কুল বিবরণ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নান্নুরের তিন ক্রোশ উত্তর পার্শ্বে তেহাই নামক গ্রামে রজকিনীর

পূর্ব্ববাস ছিল। তিনি পিতা সনাতনের ঔরসে ও মাতা লক্ষ্মীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন। রামমনির অপর আর একটী ভগ্নী ও দুইটী ভ্রাতা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের নাম জানা যায় না। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার ভগ্নী ভ্রাতৃদ্বয় ও জননী অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। পিতা সনাতন ভগ্নপ্রাণে জগতের অসারত্ব অনুভব করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন পঞ্চদশবর্ষীয় রামমনি কিছুদিন পিতৃগৃহে একাকিনী বাস করিয়া অন্নাভাবে নান্নুরগ্রামে আগমনপূর্ব্বক পরিচারিকাকার্য্যে নিযুক্তা হইয়াছিলেন।

এক্ষণে আর কলঙ্কের নিন্দাবাদ বা সমাজের কুটিল কটাক্ষ নাই সকলেই চণ্ডীদাস ও রামমনির প্রাধান্য অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়াছেন।

এ কি রজকিনীর গুণ ? না হরি ভজনের গুণ ?
চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ।
হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোপি সপচাধম॥

কুল কিম্বা বংশগৌরবে কেহ পরমপিতা শ্রীহরির কৃপালাভ করিতে পারেন না। কেবল "ভক্তিপ্রিয় মাধবঃ।" ভক্তাধীন হরি শুদ্ধ প্রেমভক্তির কাঙ্গাল। এই প্রেম ভক্তির গুণে পরম দয়াল চণ্ডালের সহিত সখ্যতা করিয়া তাঁহার প্রদত্ত অকিঞ্চিতকর সামগ্রী সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন; আত্মাধিক ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া জগৎপিতা গোবিন্দ গোপবালক রাখালের উচ্ছিষ্ট ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভগবৎলীলাভূমি বৃন্দাবনে ভক্তাধীন হরি চণ্ডালিনীর ক্রোড়ারূঢ় হইয়া তাঁহার প্রদত্ত সামান্য ফল ভোজনে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন তাই প্রেমাতিশয্যে মুগ্ধ হইয়া প্রেমিক কবি নীলকণ্ঠ মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন।

"যে হরি কাণ্ডারী ভবনদীর অকুলে।
সেই দয়াময় হইয়ে সদয় কৃষ্ণচন্দ্রোদয় চণ্ডালিনীর কোলে॥
হায় কি পুণ্যবল কার দত্তফল হরি লইলেন কমল করে তুলে।
লোকে ভ্রমে ছোয় না যাকে, চণ্ডালিনী মাকে
হরি চাঁদমুখে ডাকেন মা মা বলে॥
আমি শুনি রামায়ণে, চণ্ডালের গুনে
ওঁকে ডেকেছিল রামা মিতে বলে,
তাইতে হরিধানের মুড়ি, তাইকে করে গুরি

উনি খেয়েছিলেন মিতার ভাবেতে ভুলে
কথা বলতে ভাসে নেত্র, পুলকিত গাত্র
ওঁকে চণ্ডালের মিত্র সবাই বলে
তাইতে চণ্ডালিনীমায়, পরম দয়ায়
ভাবে ভাসাইলেন প্রেম অশ্রু জলে
থাকলে দৃঢ়ভক্তি, কৃষ্ণেতে আসক্তি
কাজ কি রে তার জাতকুলে
আমার কৃষ্ণের কাছে ভাই জেতের বিচার নাই
দেন ভক্তি মুক্তি কেবল ভোক্তি পেলে।”

চণ্ডীদাস প্রেমের কবি তিনি কোকিলকণ্ঠে প্রেমসঙ্গীত গাহিতে ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাজরঞ্জনে, অর্থের লালসায় বা প্রশংসার আশায় তিনি গীত রচনা করেন নাই শুদ্ধ গোপীভাবে বিভোর হইয়া গোপীকারঞ্জনের কৃপালালসায় অমর কবি চণ্ডীদাস প্রেমের উচ্ছ্বাস সুর লয়ে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রেম কল্পনার উজ্জ্বল রত্ন যাহা সাহিত্য-ভাণ্ডারকে অলঙ্কৃত করিয়াছে সে রত্নের সমতুল আজও সৃষ্টি হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না তাহাও সন্দেহ।

কবিবরের নিম্নলিখিত রচনায় যে কি মধুর স্বাভাবিক ভাবের বিকাশ পাইয়াছে তাহা পাঠকমহাশয় একবার অনুভব করুণ।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ—

নটরাজ যমুনাসলিলে শ্রীমতিকে অবগাহণ করিতে দেখিয়া সুবলকে বলিতেছেন—

“সখা কো ধনি মাজয়ে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে, পায়ের উপর পা॥
অঙ্গেরি বসন করেছে আসন এলায়ে দিয়েছে বেণী।
উচ কুচ মাঝে হেম হার সাজে সুমেরু শিখর জিনী॥
কিবা সে দুবলি শঙ্খ ঝলমলি সরু সরু শশিকলা।
মাজিতে ঘসিতে উদাসিল চিতে দেখিয়ে হইলাম ভোলা॥
নাহিয়া উঠিতে নিতম্ব তটেতে নেমেছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়া আঁধার কণক চাঁদার শরণ লইল আসি॥

চঞ্চল নীল স্মরি নিঙ্গারি নিঙ্গারি পরাণ সহিত মোর।
সেই হতে চিত কভু নহে স্থির বিরহে হইলাম ভোর॥
বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে, শুনহে নাগর চাঁদ।।
সেই বৃষভানু রাজার নন্দিনী নাম বৃষভানু রাধা॥"

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে নীচ উচ্চ সকলেরই সুরুচির আবির্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে ধনশালী মধ্যবৃত্তি ও নীচ ব্যক্তিগণ আপন আপন গণ্ডীর ভিতর থাকিতেন কিন্তু এক্ষণ আকৃতি ও বেশভূষা দেখিয়া তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ করা অত্যন্ত অসম্ভব। পূর্ব্বে খাঁটী-শালকে ব্যবহার ছিল কিন্তু বহুমূল্য বলিয়া অল্প লোকেই তাহা ব্যবহার করিতেন কিন্তু এক্ষণে তাঁহার নকল হওয়াতে সকলেই তাহার আবরণে এক হইয়াছেন। পূর্ব্বে কাঞ্চন নির্ম্মিত চেন কয়টা লোকে পরিত কিন্তু এক্ষণে কেমিকেলের চেন হওয়ায় মুটেমজুর পর্য্যন্ত তাহা ব্যবহার করিয়া জন্মসার্থক করিতেছে—এবং সেইজন্য খাঁটীদ্রব্যের আদর সমধিক হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। চণ্ডীদাসের সেই অমৃত নির্ঝরিণী স্বভাব কল্পনা ও খাঁটী সেই কারণে সাধারণের সহজ সাধ্য নয় তাই নকলের আদর হওয়ায় তাহার সাহিত্য ভাণ্ডারের কৌস্তভমণি আজ বহুদূরে নিক্ষিপ্ত এবং বহুদিনের অব্যবহারে তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

সকল সমাজে সঙ্গীতকে প্রাণের উচ্ছ্বাস বলিয়া থাকে। সঙ্গীতে হৃদয়ের কথা অন্তরের ব্যথা স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত ও হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীকে যুগপৎ জাগরিত করে। সঙ্গীত দুঃখে সান্ত্বনা, সুখে সহচর, তাই বসন্তে কুসুম, প্রভাতে ব্রহ্মমূর্ত্তি, সন্ধ্যায় যমুনা পুলিন রাত্রে নির্ম্মল জ্যোৎস্না। সেইজন্য সম্রাট ও দরিদ্রের গৃহে তার সমান আদর সেই নিমিত্ত নরঘাতক দস্যুর পাষাণ হৃদয়ে এবং হরিভক্ত চূড়ামনি প্রহ্লাদের প্রেমিক অন্তরে তার সমান অভ্যর্থনা।

এই সঙ্গীতের সুকোমলবন্ধনে জীব মাত্রেই সমভাবে বশীভূত। তাই বিষধর সর্প সঙ্গীতের মোহনতানে ফনা উত্তোলন করিয়া নৃত্য করে, মধুর সুরে আকৃষ্ট হইয়া মৃগগণ ব্যাধের হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন দেয়। সঙ্গীতের চির সহচর প্রেম। যেখানে প্রেম সেই-খানেই কৃষ্ণ। মহাভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"রাম রাম সব ত কহে ঠক ঠাকুর আউর চোর।
বিনা প্রেম সে নাহি মিলে শ্রীনন্দকিশোর॥"

বিশেষতঃ এই পাপপূর্ণ কলিকালে হরি নাম সংকীর্ত্তন ভিন্ন জীবের অন্যগতি নাই। যথা ঃ—

কৃতে তৎধ্যায়তে বিষ্ণু ত্রেতায়াং জজতেমকৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥

অধিক আর কি বলিব হরিভক্তি বিলাসে বর্ণিত আছে হরি নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছেন "যে ভক্ত প্রেমের সহিত আমার গুণগান করে সে আমার শঙ্কর অপেক্ষা প্রিয়।" শঙ্কর মুখে "সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া গোবিন্দ-পদ প্রেমে দ্রব হইলে ত্রৈলক্যতারিণী সুরধনী সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় সঙ্গীতের কি অপূর্ব্ব মহিমা। সেই প্রেমের চরম ফল আত্মদান। সঙ্গীতের সহিত এতগুলি প্রেমের মিলন আছে বলিয়াই তাহার সর্ব্বত্রে জয় এবং প্রেমের চরম উৎকর্ষ মধুর রাধাকৃষ্ণ লীলায় বিশদরূপে প্রতিফলিত। পূর্ব্বরাগ, প্রণয়, আত্মদান, মান, বিরহ, উদ্দীপনা এবং মিলন এই প্রেমরূপ নন্দন কাননের পারিজাত চণ্ডীদাস সেই প্রেম মন্দাকিনী সিঞ্চিত মধুর রাধাকৃষ্ণ লীলায় তন্ময় হইয়া সুমধুর রচনা-ঝঙ্কারে নীরব নান্নুরের কুঞ্জকুটীর অহরহ মুখরিত করিতে লাগিলেন। প্রেমে বিহ্বল হইয়া গাহিয়াছিলেন ঃ—

"বঁধু কি আর বলিব আমি
মরণে জীবনে, জনমে জনমে প্রাণনাথ হও তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
জাতি কুল শীল, সকল মজাঞা হইনু তোমার দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এতিন ভুবনে আমার কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে?
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়?
শীতল জানিয়া শরণ লইনু ওদুটী কমল পায়॥
অবলা অখলে না ঠেলে চরণে ত্রুটীর নাহিক ওর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি তবে যে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি॥"

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভায় থাকিয়া ও চণ্ডীদাস সুদুর বীরভূমের বিশালাক্ষী মন্দিরে বসিয়া প্রেমসঙ্গীত গাহিতে

লাগিলেন। চণ্ডীদাসের যশসৌরভ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইলে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

সময়ক্রমে মিথিলাধিপতি শিব সিংহ বাহাদুর এই সময় তাহার প্রজাগণের অবস্থা ও জমিদারী পরিদর্শন করিবার জন্য বিদ্যাপতি সমভিব্যবহারে তাঁহার গৌড় রাজ্যের রাজধানী মঙ্গলকোটে আসিয়া উপস্থিত হন বিদ্যাপতি এই সুযোগে রূপনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া চণ্ডীদাস দর্শন আশায় বীরভূম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই রূপনারায়ণ মিথিলাধিপতির কোনও নিকট আত্মীয় ছিলেন। তিনি মিথিলা নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রূপপুর গ্রামে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে ইহা বোলপুর থানার অন্তর্গত। রূপপুর প্রান্তরে এখনও বৃহদট্টালিকার ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্থানকে তথাকার সকলে রাজবাটী বলিয়া থাকে এবং উক্ত রাজার প্রতিষ্ঠিত বারাহী নাম্নী দেবী দ্বিখণ্ড দেহ অদ্যাপি তথায় বিরাজিতা। এইরূপে প্রবাদ আছে যে দেবী কালাপাহাড় কর্ত্তৃক দ্বিখণ্ডিতা হইয়াছিলেন প্রেম বিলাসে লিখিত আছে॥

"কমল ললিত চরণ কমল মধু পাওয়ে সেই সুজান
রাজা নরসিংহ রূপ পরায়ন গোবিন্দদাস অনুমান"।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনার নিমিত্ত মঙ্গলকোটের পথে অগ্রসর হইলেন এবং সুরধনীর তীরের একটী বটবৃক্ষমূলে উভয়ে মধ্যাহ্নে সময়ে সাক্ষাৎ হয়। তথায় উভয়ে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে উভয়ের কবিত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনেক আলাপে ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নান্নুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাপতি তাঁহার কুটীরে কিছুদিন সুখে অতিবাহিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করতঃ পূর্ব্বোক্ত রূপ-পুরের বারাহী দেবীর মন্দির নিকটে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া সাধনা আরম্ভ করেন এবং সেই সময় তাঁহার গীতাবলী বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। ধন্য বীরভূম, সাধকের অসাধ্য-সাধন ও সিদ্ধিলাভ কেবল তোমারই উর্ব্বর ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। সেইজন্য মিথিলা নগর ছাড়িয়া বিদ্যাপতি তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

চণ্ডীদাসের তিরোহিত সম্বন্ধে নানালোকে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু বীরভূমে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহাই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয়।

একদা বীরভুম অন্তর্গত কীর্ণাহার বাসীগণ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া রামমনি সহ চণ্ডীদাস তথায় আগমন করিয়াছিলেন এবং একদিন তাঁহার প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে কতিপয় মুসলমান রমণী একবারে বিহ্বল হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে তথাকার মুসলমানগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন নিরুপায় দেখিয়া চণ্ডীদাস রামমনি সহ এক সন্নিকটস্থ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং এইরূপ জন-শ্রুতি যে চণ্ডীদাসের সিদ্ধি যোগপ্রভাবে মন্দির বসিয়া গেল এবং সাধন-বলে চণ্ডীদাস রামমনি সহ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া সখি সঙ্গিনীরূপে গোবিন্দ লাভ করিলেন। নান্নুর গ্রামে সুমধুর বীণার ঝঙ্কার রব হইল। কীর্ণাহার বাসীগণ হাহাকার করিতে লাগিল।

যাও কবি নিত্যধামে। তথায় মধুর ভাবের ভাবিনী হইয়া অনন্তকাল তোমার সুধাময় কলকণ্ঠে পবিত্র নিত্য কুঞ্জ ঝঙ্কারিত কর। তোমার অমৃত নিঝরিণী প্রেমসঙ্গীত চিরকাল বাঙ্গালীর হৃদয়ে পবিত্র গঙ্গাজলের ন্যায় রক্ষিত হইবে।

শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।
হেতমপুর।

ভাগবত ধর্ম্ম

ভক্তির মৌলিকতা ও অজন্যতার উপর ভাগবত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। জ্ঞানের দ্বারায় ভক্তি হয়, কর্ম্মের দ্বারায় বা যোগের দ্বারায় বা অন্য কোন কিছুর দ্বারা ভক্তি হয় এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। ভক্তি প্রথম হইতেই থাকে। একটা উদাহরণ দিলে আচার্য্যগণের বিচারণা পদ্ধতি কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ জ্ঞানের সাধনপদ্ধতি লইয়া আলোচনা করা যাউক। সাধন চতুষ্টয় এই জ্ঞান সাধনার পথ। বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব ইহাই হইল সাধন চতুষ্টয়। ষট্ সম্পত্তির মধ্যে ছয়টি কথা রহিয়াছে, তাহাদের নাম শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান।

এখন বিবেক ও বৈরাগ্য লইয়াই একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। ভক্তি কেমন করিয়া প্রথম হইতেই ইহাদের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন। আমরা

বুঝিতে পারি, বা না পারি আমরা সাহস করিয়া স্বীকার করি বা না করি, সাধন ক্ষেত্রে ভক্তিদেবীই রাজরাজেশ্বরী, মানবের প্রকৃত কল্যাণ এই ভক্তি দেবীই সাধন করিতেছেন।

প্রথমতঃ দেখা যাউক বিবেক কি ? শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বামীপাদ বলেন ঃ—

"ব্রহ্মৈব নিত্যমন্যৎ তু অনিত্যমিতি বেদনম্।
সোঽয়ং নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক ইতি কথ্যতে॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য, আর যাহা কিছু সকলই অনিত্য, এই প্রকারের যে জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রে নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

তাহার পর বৈরাগ্য।

"ঐহিকামুষ্মিকার্থেষু হ্যনিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ।
নৈস্পৃহ্যং তুচ্ছ বুদ্ধিষৎ তদ্‌বৈরাগ্যমিতীর্য্যতে॥"

অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সকল ভোগ্য বস্তুই অনিত্যরূপে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তৎসমুদয়ে যে তুচ্ছ বুদ্ধি জন্মে তাহার নাম বৈরাগ্য।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্ম নিত্য এই জ্ঞান পূর্ব্বে, আর এই জ্ঞানের সাহায্যেই অন্য সকলের অনিত্যতা ও তুচ্ছতা উপলব্ধি হইতেছে। ভিতরে নিত্য না থাকিলে, অনিত্য বলিয়া কোন কিছুকে বুঝিতে পারা যায় না। ভিতরে ভাব না থাকিলে অভাবের বোধ হয় না। এখন 'ব্রহ্ম নিত্য' এই টুকু যদ্যপি বিচার করিয়া বা তার্কিকের যুক্তির সাহায্যে মাত্র বুঝিতে পারা যায় তাহা হইলে কি হইবে ? উত্তরে সকলেই বলিবেন, কিছুই না। কারণ আমরা শাস্ত্র ও পড়িয়াছি, হিসাব করিয়া বুঝিয়াও দেখিয়াছি ইহলোকে ও পরলোকে যাহা কিছুই আমরা সত্য বলিয়া জানিও যাহা কিছু পাইবার জন্য দিন রাত্রি ব্যাকুল হইয়া পরিশ্রম করি তৎসমুদয়ই অনিত্য। কিন্তু শুধু জানিয়া কি হইবে ? আমরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের মত

"দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ।"

অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয় দোষযুক্ত বলিয়া বুঝিতেছি তাহাতেও আমি আমার এই প্রকারের স্বামীত্ব বুদ্ধি জাগিতেছে।

সাধু ঋষি আমাদের এই অবস্থা দেখিয়া শুধু জানাটা পশু পক্ষীর মধ্যেও আছে ইহা দেখাইয়া বলিতেছেন, এপ্রকারের জানায় কিছু হইবে না।

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেণ সংসার স্থিতি কারিণঃ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চিতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হিসা॥
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্॥" মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

অর্থাৎ যদিও মানবগণ পশুপক্ষীর ন্যায় সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন* তথাপি মহামায়া প্রভাবে বাসনারূপ আবর্ত্ত-বিশিষ্ট মোহরূপ গর্ত্তে নিপাতিত হইয়া সংসারস্থিতির হেতুর হইয়া থাকে; জগৎপালক পরমেশ্বরের যোগনিদ্রা স্বরূপ যে মহামায়া, তিনিই এই জগৎকে সম্যক্‌রূপে মোহিগস্ত করিতেছেন। অতএব এই মোহ বিষয়ে বিস্ময় করিও না। দেবী অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রকাশিকা ভগবতী অচিন্ত্যমহিমা সেই মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্তকে স্বীয় শক্তিবশে বিবেক হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া মোহে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন তিনিই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।"

আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে ইহলোক ও পরলোক অনিত্য বলিয়া যদ্যপি তাহাতে তুচ্ছবুদ্ধি সম্পন্ন হইতে হয় তাহা হইলে নিত্য যে ব্রহ্মবস্তু তাহাতে অনুরাগ থাকা চাই। বিচারটুকু এই। একজন বলিতেছেন যে আগে বুঝিব এ সব অনিত্য, তাহার পর নিত্য বস্তুতে অনুরাগ হইবে, এই দুইটির মধ্যে

* (মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর এই স্থানের ব্যাখ্যায় প্রাচীন আচার্য্যেরা দুইটি জ্ঞানের মধ্যে যে একটা বিশেষ রকমের প্রভেদ আছে, তৎপ্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহার একটিকে সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় সামান্যজ্ঞান ও অপরটীকে প্রকৃতজ্ঞান বলা যাইতে পারে; ইহাদের নাম প্রাচীন মতে যথাক্রমে জ্ঞান ও বিজ্ঞান, প্রথমটি মনের সাহায্যে ও দ্বিতীয়টি বুদ্ধি বা হৃদয়ের সাহায্যে লব্ধ হইয়া থাকে। ইংরাজী দর্শনে একটি Ratiocinative আর একটি Intuitive, প্রথম জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বলীলার যে দিকটার সহিত আমাদের পরিচয় হয় তাহার নাম শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় উতি, আর দ্বিতীয় জ্ঞানের সাহায্যে যে দিকটার সহিত পরিচয় হয় তাহার নাম পোষণ। প্রথমটি যোগ নিদ্রা—মা কালীর বামদিক, আর দ্বিতীয়টি যোগমায়া—মা কালীর দক্ষিণ দিক।)

যেন একটা কালগত ব্যবধান আছে, এবং এই দুইটির মধ্যে যেন প্রথমটি জনক আর দ্বিতীয়টি জন্য। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে আমাদের এই ধারণা ভুল। নিত্যে অনুরাগ বা ভক্তি প্রথম হইতেই আছে, তবে আমার নিকট এখন বীজরূপী হইতে পারে। ইহা হইতে ভক্তির মৌলিকতা ও অজন্যতা প্রতিপাদিত হইল। Originality and primacy of the feeling aspect in man আধুনিক কালের পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে ও স্বীকৃত হইয়াছে।

জ্ঞানযোগ সাধনার প্রত্যেক অঙ্গটি লইয়া বিচার করুন, চিন্তা করুন, বিস্মিত হইয়া দেখিবেন ভক্তিদেবী রাজরাজেশ্বরীর মত কেমন করিয়া আমাদের অলক্ষ্যে থাকিয়া বিশ্ব-পোষণ করিতেছেন। এই ভক্তিদেবী ভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সাররূপা। ইহা আমরা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিব।

অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় আলোচনা করিলেও আমরা বুঝিতে পারিব ভক্তিদেবী গোপনে রাজরাজেশ্বরীরূপে ইহাদেরও পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মহাভারতে আছে "বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগমাহুর্মনীষিণঃ" অর্থাৎ বেদে যোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়া মনীষিগণের দ্বারা কথিত হইয়াছে। এই অষ্টাঙ্গ যোগের নাম. যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি লওয়া যাউক। অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ ইহাদের নাম যম। সত্য সম্বন্ধে ব্যাসভাষ্যে এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে।

"তত্রাহিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহঃ, উত্তরে চ যম-নিয়মাস্তন্মূলাস্তৎসিদ্ধিপরতয়া তৎপাদনায় প্রতিপাদ্যন্তে, তদবাতরূপ করণায়ৈবোপাদীয়ন্তে তথা চোক্তং "স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা তথা ব্রতানি বহুনি সমাদিৎস্যতে তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্ত্তমানস্তামেবাবদাতরূপামহিংসাং করোতি।"

অর্থাৎ এই সকলের মধ্যে অহিংসা সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে), সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অনভিদ্রোহ। সত্যাদি অন্য যমনিয়ম সকল অহিংসামূলক তাহারা অহিংসা-সিদ্ধির হেতু বলিয়া অহিংসা-প্রতিপাদনের নিমিত্তই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর অহিংসাকে নির্ম্মল করিবার জন্যই সত্যাদি প্রয়োজন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মবিৎ যে ভাবেই ব্রত অনুষ্ঠান করুন না কেন, ঐ ঐ ব্রতের দ্বারা তিনি প্রমাদকৃত হিংসা হইতে নিবর্ত্তিত হইয়া অহিংসাকেই নির্ম্মল করেন।

একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে কেবল প্রাণীপীড়ন বর্জ্জন করাই অহিংসা নহে, সকলের প্রতি মৈত্রী প্রভৃতি সদ্ভাব পোষণ করিতে হইবে। সকলের প্রতি যথার্থ রূপে সদ্ভাবপোষণ কিরূপে হইতে পারে? সর্ব্বভূতে আশ্রয় তত্ত্বরূপে, চৈতন্যরূপে এবং আনন্দ বা মধুরূপে যে পরমার্থ সত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন সেই পরমার্থসত্যের প্রতি অনুরাগ না হওয়া পর্য্যন্ত শম, নিয়মাদি অনুষ্ঠান একটা প্রাণশূন্য ব্যাপার ও সার্থকতাহীন। এখানেও ভক্তির মৌলিকতা ও অজন্যতা পরিদৃষ্ট হইতেছে।

আসল কথা এই যে ভক্তির সংজ্ঞা লইয়া ও বিশ্বব্যাপরের প্রকৃত অর্থ লইয়া আমাদের চিত্তে দারুণ ভ্রান্তি থাকিয়া যায় সেই জন্য আমরা ঠিক ভাগবত ধর্ম্ম ও লীলা তত্ত্ব বুঝিতে পারি না। লীলাবাদীগণ আমাদিগকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বা "যুগল পিরীতি" কি তাহাই অনুধ্যান করিতে বলিয়াছেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব চিন্তা করিলে প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে ভগবান্ কেবল গম্য নহেন, তিনি গম্য ও গময়িতা। তিনি নিজেকে নিজের হইতে পৃথক করিলেন, তার্কিক বলিলেন, ভালই হইল "তিনি পূর্ণ, তাঁহাতে অপূর্ণতা আসিল" কিন্তু শ্রুতি ইহার উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" অর্থাৎ পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

তিনি নিজেকে নিজের হইতে পৃথক করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই, যে নিজেকে নিজে খুঁজিবার জন্য, নিজেকে নিজে ভাল বাসিবার জন্য। নিজেকে নিজে খোঁজেন কেন? নতুবা লীলা হয় না। নতুবা জগৎ তাহাকে খুঁজিবার প্রবৃত্তিই বা কোথা হইতে পাইবে আর খুঁজিবার পথই বা কোথা হইতে পাইবে। লীলা শেষ হইলে নিজেকে নিজে খুঁজিয়া পাইবেন। কিন্তু এই যে শেষ ইহা আমাদের যেমন শেষের ধারণা আছে সে প্রকারের একটা পূর্ণচ্ছেদ নহে। ইহা অশেষের শেষ। নিজেকে নিজে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন তাই জগৎ রাধাকৃষ্ণের উপাসক, তাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনায় নিখিল জগতের যাবতীয় অধ্যাত্মসাধনা পরিণতি লাভ করিয়াছে।

তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইল এই যে শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিতেছেন। (শ্রীকৃষ্ণও অবশ্য শ্রীমতী রাধিকাকে খুঁজিতেছেন সে কথা আমরা জানি, কিন্তু সে কথা পরে!) এই যে শ্রীরাধার মিলন চেষ্টা ব্রজদেবীগণ তাহাতেই নিমগ্না, তাঁহাদের অন্য চেষ্টা, অন্য আকাঙ্ক্ষা অন্য কল্পনা ও আশা নাই, কিসে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইবে এই তাঁহাদের ধ্যান, এই তাঁহা-

দের জ্ঞান। বৈষ্ণবসাধক এই গোপীগণের অনুগা হইতে চাহেন, তাঁহাদের আর অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই। যেমন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন

"হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে, আহীরীগোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব॥
যাবটে আমার কবে, এ পাণি গ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তার পায়॥
তেঁহ কৃপাবান্ হইয়া, রাতুল চরণে লঞা,
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবি দুঁহার যুগল চরণ॥
বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানাযন্ত্র লৈঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে॥
দুঁহু চাঁদ মুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,
হেন দিন হইবে আমার॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,
রাখিবে রাতুল দুটি পায়।
নরোত্তম দাস ভণে, প্রিয়নর্ম্ম সখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায়।"

সর্ব্বসাধারণের সুবোধ্য করিয়া এই তত্ত্বটুকু বুঝাইতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়। এই বিশ্বলীলায় আমরা জীবকুল যে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া একেবারে অসহায় ভাবে, আঁধার হইতে গভীরতর আঁধারের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি এ কথা যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। এই বিশ্বের যিনি কর্ত্তা, যিনি একমাত্র সত্য তিনি আনন্দময়। তাঁহার একটি ইচ্ছা আছে,

তিনি রসময়, তিনি আত্মারাম হইয়াও যোগমায়া আশ্রয় করিয়া নিত্য রমণের জন্য ব্যাকুল।

"রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আলিঙ্গিতে মনে উঠে কাম।"

ইহাই ভগবানের স্বরূপের অভিপ্রায়। মানুষ যদি একবার সজ্ঞান ভাবে শ্রীভগবানের এই অভিপ্রায় টুকু বুঝিতে পারে তাহা হইলে সে এই মহৎ ও মধুর কার্য্যের সহায়তায় আত্মবিসর্জ্জন না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না। তখন এই লীলারস আস্বাদনের জন্য শ্রীভগবানের যে নিত্য ব্যাকুলতা সেই ব্যাকুলতার সহিত তাহাকে তাহার জীবনের সুর মিলাইয়া ফেলিতে হইবেই হইবে। এই ব্যক্তি ভগবানের স্বগণ, বিশ্বকল্যাণের সেবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত, অকল্যাণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাঁহার আর আত্মসুখ দুঃখ বা লাভালাভের বিচার থাকে না, তাঁহার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসিত হয়। ইহাই জীবের স্বভাব, ইহাই অধ্যাত্ম, ইহাই স্বরূপে অবস্থান। ইহারই উপরে শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্যলীলাবাদ প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্ম বা ব্রহ্মার জগৎ তাহা ইহার নীচে। এখানে বিধি আসিয়া রাগে পরিণতি লাভ করিয়াছে। Law has fulfilled itself in Love.

এই রাজ্যের যিনি অধীশ্বরী তিনি যোগমায়া। যাঁহার সম্বন্ধে চণ্ডী বলিয়াছেন—"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" সেই দেবীই আবার প্রসন্না হইয়া মানবের মুক্তির হেতু হয়েন।

মুক্তি বলিতে যেন আমরা মোক্ষাভিসন্ধি বা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা বা আত্মরক্ষা না বুঝি।

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।" অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া যে স্বরূপে অবস্থান তাহারই নাম মুক্তি।

এই যোগমায়া বা শ্রীভগবানের আনন্দময়ী শক্তি তিনি কার্য্য করিতেছেন, মা যেমন স্তন্যপান করাইয়া সন্তানকে পোষণ করেন তেমনি দেবী কাত্যায়নী আমাদিগকে পোষণ করিতেছেন। মায়ের ছেলে হইতে না পারিয়াই এত দুঃখ, মায়ের করুণামৃতধারা সর্ব্বদা আসিতেছে অথচ তাহা উপেক্ষা করিয়া বিষ খাইতেছি, ইহাই তো দুঃখ।

"হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥

গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায়।
সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥”

আমরা আগামীবারে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সহিত ভাগবত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আলোচনা করিব।

সুখ।

শ্রুতি বলিয়াছেন “নাল্পে সুখমস্তি, “ভূমা হিতৎ সুখং বৃহদারণ্যক”,—অল্পে সুখ নাই, যাহা ভূমা তাহাই সুখ স্বরূপ, শ্রুতি ভূমা পুরুষকেই সুখস্বরূপ বলিয়াছেন।” এই ভূমা পুরুষ কাহাকে বুঝাইতেছে? যেখানে এক ভিন্ন অন্য কেহ শ্রবণ করে না, যেখানে এক ভিন্ন জানিবার আর দ্বিতীয় নাই তিনিই ভূমা পুরুষ। [“যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যং শৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা বৃহদারণ্যক”] শ্রুতি যখন ভূমা পুরুষকে সুখ স্বরূপরূপে উপদেশ দিয়াছেন, তখন সুখ ও ব্রহ্ম একই পদার্থ ও তাহা সতত যে জীবের প্রার্থনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মানব এবং জীবমাত্রেই সুখেরই আশায় সতত পরিভ্রমণ করিতেছে। মানবের অন্তঃকরণে যে মহতী সুখস্পৃহা জাগিয়া রহিয়াছে, সেই সুখস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্যই মানব প্রতিমুহূর্ত্তে ধাবিত হইতেছে; মানব যাহা কিছু করিতেছে, যাহা কিছু শুনিতেছে, যাহা কিছু বলিতেছে—মানবের ছুটাছুটি হাস্য কোলাহল, আহার বিহার, অধ্যয়ন অধ্যাপনা, ধর্ম্মভাব, প্রবল কর্ত্তব্যানুরাগ বা স্বদেশহিতৈষণা—সকলেরই মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে জীবাত্মা সেই এক শুদ্ধ নিত্য অখণ্ড অবিকারী অবিচ্ছিন্ন ভূমাপুরুষ বা সুখ প্রাপ্তির আশায় অনাদি অনন্তকাল হইতে স্বীয় কর্ম্ম সংস্কার লইয়া ধাবিত হইয়াছে এবং সমূহ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাহার সেই সুদুর্লভ সুখাশা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেছে।

শ্রুতি বলিয়াছেন এই সুখস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে সমস্ত ভূতবর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সমস্ত ভূতবর্গ আনন্দতেই জীবনধারণ করিতেছে, সমস্ত ভূতবর্গ আনন্দতেই অবস্থান করিতেছে, সমস্ত জীব আনন্দতেই লয় পাইতেছে।

বিজ্ঞানই আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ যাঁহারা সেই পরমব্রহ্মের আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র নির্ভয় চিত্তে বিচরণ করেন; তাঁহাদিগের আর গর্ত্ত বাসাদি দুঃখের ভয় থাকে না।

["আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি, আনন্দং অভিসংবিশন্তি। বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম, আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, আননং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"]

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, যিনি সুখময় ও রস স্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম; জীব এই ব্রহ্মরসেই আনন্দিত হইয়া উঠেন; যদি সেই আকাশবৎ পূর্ণ আনন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহ বা জীবিত থাকিত, কেহ বা প্রাণকার্য্য করিত, এই আনন্দরূপ ব্রহ্মই জীবকে আনন্দ প্রদান করেন, এই আনন্দরূপ ব্রহ্মই আনন্দের মীমাংসা স্বরূপ বা তারতম্য বিশ্রান্তি স্থান।

["রসো বৈ সঃ, রসং হি এব অয়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি; কো হি এব অন্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষা আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হি এব আনন্দয়াতি, সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি।"]

বেদান্ত শাস্ত্র ও ব্রহ্মই যে আনন্দময় বা সুখস্বরূপ তাহা একটী অধিকরণে প্রদর্শন করিয়াছেন,—অধিকরণস্থ সূত্র কয়টী ও তাহার মর্ম্মার্থ উল্লিখিত হইতেছে;—

(১) শ্রুতিতে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া আনন্দময় শব্দ বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে; তৈত্তিরীয় শ্রুতি স্পষ্টতঃ এই কথা বলিয়াছেন;—

(২) 'বিকারার্থে' ও 'প্রচুরার্থে' ময়ট্ প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়; আনন্দময় শব্দের 'ময়ট্' প্রত্যয় 'প্রচুরার্থে' প্রযুক্ত হইয়াছে, 'বিকারার্থে প্রযুক্ত হয় নাই'; কেননা ব্রহ্মাই আনন্দের মূল।

(৩) শ্রুতিতে মন্ত্রবাক্যে আনন্দময় শব্দ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে;

(৪) আনন্দময় শব্দ কেবল ব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে; জীবকে বুঝায় না;

(৫) শ্রুতি বলিয়াছেন আনন্দময় জীবের প্রাপ্য; সুতরাং আনন্দময় শব্দ 'জীব', 'প্রকৃতি' বা অন্য কিছুকেই বুঝাইবে না; কেবল ব্রহ্মকেই বুঝাইবে।

(৬) শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, আনন্দময় আত্মাকে জানিতে পারিলে জীবের মুক্তি হয়; সেই হেতু আনন্দময় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাহেন।

['আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ'। 'বিকার শব্দান্নেতি চেন্নপ্রাচুর্য্যাৎ।' 'তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ'। 'কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা'। অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি।']

আনন্দ, সন্তোষ, সুখ, মোদ, প্রমোদ, শ্রেয়, প্রেয়, প্রসাদ প্রভৃতি শব্দ এক আনন্দময়কেই বুঝাইয়া থাকে; এ বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্গণ উল্লেখ করিয়াছেন,—

আনন্দময়ের পঞ্চ অবয়ব; প্রিয়ই তাঁহার মস্তক; 'মোদ' তাঁহার দক্ষিণপক্ষ; প্রমোদ উত্তর পক্ষ; আনন্দই আত্মা'—

["তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদোদক্ষিণপক্ষঃ, আনন্দ আত্মা—"]

অপেক্ষিত বিষয় দর্শন জন্য যে সুখ তাহাকে 'প্রিয়' বলে; অপেক্ষিত বিষয় লাভ জন্য যে সুখ তাহাকে 'মোদ' বলে, অপেক্ষিত বিষয়ভোগ জন্য যে সুখ তাহাই 'প্রমোদ' নামে অভিহিত হয়, সুষুপ্তি আদি অবস্থাতে ভাসমান অজ্ঞানোবাহিত যে সুখ তাহাই আনন্দ নামে অভিহিত; আর নিরুপাধিক যে সুখ তাহাই ব্রহ্ম।

সন্তোষও সুখ বা আনন্দের নামান্তর; সন্তোষ হইতে অনুত্তম বা শ্রেষ্ঠতম সুখলাভ হইয়া থাকে। সন্নিহিত সাধন হইতে যাহা লাভ ঘটে তাহার অধিক পাইবার অনিচ্ছাকে সন্তোষ কহে। সন্তোষের লক্ষণ সম্বন্ধে বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন যে যদৃচ্ছালাভকে যথেষ্ট বলিয়া যিনি মনকে প্রবোধ দিতে পারেন, তাঁহার সেই মনোবৃত্তি সন্তোষ নামে অভিহিত হয়। ["সন্তোষঃ সন্নিহিতসাধনাৎ অধিকস্য অনুপাদিৎসা"। (১) "যদৃচ্ছালাভতো নিত্যং মনঃ পুংসো ভবেদিতি। যা ধীস্তামৃষয়ঃ প্রাহুঃ সন্তোষং সুখলক্ষণং॥" (২) "তৃষ্ণাক্ষয়রূপাৎ সন্তোষপ্রকর্ষাৎ নিষ্কামস্য যোগিনোঽনুত্তমং সাতিশয়যুক্তবিষয়নিরপেক্ষত্বাৎ নিরতিশয়ং সুখং ভবতি।" (৩) "সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ।" (৪) "অত্যাবশ্যক প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহক বিদ্যমানসাধনাদতিরিক্তস্য অলিপ্সা।" (৫)] যদৃচ্ছালাভে মন যাঁহাদের পরিতৃপ্ত এবং উহাই যাঁহারা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের সেই প্রকার মনোবৃত্তি সন্তোষ নামে অভিহিত হয়; সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে 'অলং বুদ্ধিরই নামই সন্তোষ; সমস্ত অভাব মিটিয়া না গেলে সন্তোষলাভ করিবার কোন উপায় নাই; মহর্ষি পতঞ্জলি এই জন্যই বলিয়াছেন, সন্তোষ হইতে অনুত্তম বা শ্রেষ্ঠতম সুখলাভ হইয়া থাকে। সন্তোষ হইতে ব্রহ্মগতি পর্য্যন্তলাভ করা যায়, আচার্য্য গুরু শঙ্কর বলিয়াছেন,—

সাধু সঙ্গ, সাত্ত্বিক দান, ব্রহ্ম বিচার, সন্তোষ, এই চার পদার্থ ব্রহ্মগতি

বা মুক্তি প্রদানে সমর্থ হয়। ["কে হেতবো ব্রহ্মগতেস্তু সত্তিঃ সৎসঙ্গতি দান বিচার তোষাঃ।" মহর্ষি পতঞ্জলি সন্তোষকে কখন বা ক্রিয়াস্বরূপে কখন বা ফলস্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্য যোগগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় ইহা কোথায় বা ব্রহ্মানন্দস্বরূপ; কোথায় বা ফলস্বরূপ তখন ইহা নিষ্কামযোগীগণের প্রার্থনীয় বস্তু; আবার কোথায় বা ইহা ক্রিয়া স্বরূপ— তখন ইহা ঈশ্বর প্রণিধান, স্বাধ্যায়, তপস্যা প্রভৃতির ন্যায় সাধ্যবস্তু। ["শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যয়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ।"]

'প্রসাদ' নামে বস্তুটীও সুখেরই নামান্তর। মহর্ষি দ্বৈপায়ন ঋষি ভগবন্মুখে বলিয়াছেন, 'যাঁহারা বিষয়ানুরাগ এবং বিদ্বেষের সহিত কোনরূপ সংস্রব না রাখিয়া নিজ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া বিষয়রাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হ'ন, সেই বিজিত মানবগণ প্রকৃতি প্রসন্নতালাভে সমর্থ হ'ন, প্রসন্নচেতা মানবগণের সমস্ত দুঃখ নষ্ট হয়। প্রসন্নমনা ব্যক্তিগণের প্রজ্ঞা ব্রহ্মসংস্থিতিলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। চিত্তপ্রসাদ ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হওয়া যায় না; প্রসাদ শূন্য ব্যক্তি আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশ প্রদান করিতে পারে না; চিত্তে অভিনিবেশ না জন্মাইলে শান্তি আসিতে পারে না; এবং ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের শান্তি বা বিরাম না জন্মিলে সুখ পাওয়া যায় না।

["রাগ দ্বেষ বিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
প্রসাদে সর্ব্ব দুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্ন চেতসোহ্যাস্তু বুদ্ধি পর্য্যবতিষ্ঠতে॥
নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
নাচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥"]

শাস্ত্রে যে সমস্ত স্থলে সুখের উল্লেখ আছে তাহা একবিধ নহে: তাহা স্বরূপ, উপাধি ও অধিকারী ভেদে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা (১) কাম্যসুখ (২) দিব্যসুখ (৩) তৃষ্ণাক্ষয় সুখজনিতঃ বা ব্রহ্মানন্দ। প্রার্থনীয় পদার্থ পাইলে যে সুখ মনোমধ্যে জন্মে তাহাকে কাম্যসুখ বলে। যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে মনের সদ্বৃত্তিসমূহ স্ফূর্ত্তি পায় ও তাহা হইতে যে অপূর্ব্ব এক তৃপ্তি জন্মে তাহাই দিব্যসুখ নামে অভিহিত। আর যে সুখ তৃষ্ণাক্ষয় জনিত, যে সুখ বাসনা সমূহ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে বা সবীজ দগ্ধপ্রাপ্ত হইলে স্বতঃই উদ্ভূত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠতম সুখ, এই সুখই ষোল কলায়

পূর্ণ। ধনরত্ন নাম বৈভব প্রতিপত্তি স্ত্রীপুত্রাদিলাভে যে সুখ তাহা কাম্য সুখ। বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রে উত্তীর্ণ হইলে বা প্রভূত সৎসাধনা বশতঃ যে সুখ লাভ হয়, নিষ্কাম বা নিঃস্বার্থভাবে দানাদি কার্য্যে যে সুখ লাভ হয় তাহাকে দিব্যসুখ বলে। তৃতীয় প্রকার সুখ ব্রহ্মানন্দ; ইহা অখণ্ড ও নিত্য, ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ। বিশুদ্ধ বিমল সুখের উপলব্ধি ব্রহ্মের উপলব্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

["যচ্চকামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখং।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হন্তি ষোড়শীং কলাং" ॥]

মানব ইহলোক ও পরলোকে যে সমস্ত সুখভোগ করে তাহাই কাম্য ও দিব্য সুখ নামে অভিহিত; এতদ্বিধ সুখ লৌকিক নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী; বিষয়ের নিত্যত্ব ও উপযোগিতার উপর সুখের তারতম্য বা কাম্যত্ব ও দিব্যত্ব নির্ভর করে; আর বাসনাক্ষয়রূপ যে সুখ তাহা অলৌকিক ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

অষ্টাবক্রঋষি রাজর্ষি কুশধ্বজ জনককে কোন সময়ে এই ব্রহ্মানন্দ বা সুখ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন,—"যিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছেন তিনি যথা সুখে অধিষ্ঠিত আছেন, যিনি ব্রহ্মানন্দলাভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত সুখী, সুস্থ বা স্বাস্থ্যসম্পন্ন; সর্ব্বত্যাগী কৌপিনধারী সন্ন্যাসীর পক্ষে এই সুখ সুদুর্লভ। শারীরিক বা মানসিক সর্ব্ববিধ ক্লেশ উহা আমার নহে। আমি যথাসুখে অবস্থিত আছি, আমার (আত্মার) কোন কার্য্যই নাই, আমি (আত্মা) নিখিল বিষয়েই নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত আছি। সুতরাং যখন যে কর্ম্ম উপস্থিত হয় তাহাই সাধনপূর্ব্বক আমি যথাসুখে অধিষ্ঠিত আছি; অধুনা আমি এখন কোন কার্য্যের উদ্যোক্তা নহি; কিম্বা কোন কার্য্যের ফলাভিলাষীও নহি; যখন যে কার্য্য আমার সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহাই সম্পাদন করতঃ আমি যথা-সুখে বাস করিতেছি; কর্ম্ম, নিষ্কর্ম্ম ও নির্ব্বন্ধাদি দেহাসক্ত কর্ম্মীগণেরই হইয়া থাকে; কিন্তু আমার সহিত দেহের সংযোগ নাই বিয়োগও নাই, অতএব আমি যথাসুখে অবস্থিতি করিতেছি। গতি, স্থিতি বা শয়নাদি কোন অবস্থা-তেই আমার কোন অবস্থাতেই আমার কোন অর্থ নাই বা অনর্থ নাই; সুতরাং এই সমস্ত কর্ম্ম আসক্তিহীন হইয়া আমি সম্পাদন করিতেছি, কোন কার্য্যে আমার আস্থা বা অনাস্থা নাই, সেই জন্য আমি ঐ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াও যথাসুখে অবস্থিতি করিতেছি; নিদ্রায় আমার কোন হানি নাই,

সিদ্ধির প্রতি যত্ন করিতেও আমার বাসনা নাই; সুতরাং আমি বিষাদ ও উল্লাস পরিহারপূর্ব্বক যথাসুখে অবস্থিতি করিতেছি। এখন আমার কার্য্যে যত্ন করাও যা আর একেবারে কার্য্য না করাও তাই; কেন না আমার কামনা নাই। এই সংসারে সুখ দুঃখরূপ নানাবিধ অনিয়ম দেখিয়া মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়কেই পরিহারপূর্ব্বক আমি যথা সুখে অবস্থান করিতেছি।

["অকিঞ্চনভবং স্বাস্থ্যং কৌপীনত্বেঽপি সুদুর্লভম্।
ত্যাগাদানে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্॥
কুত্রাপি খেদঃ কায়স্য জিহ্বা কুত্রাপি খিদ্যতে।
মনঃকুত্রাপি তত্ত্যক্তা পুরুষার্থে স্থিতঃ সুখম্॥
কৃতং কিমপি নৈব স্যাদিতি সঞ্চিন্ত্য তত্ত্বতঃ।
যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তৎ কৃত্বাসে যথা সুখম্॥
কর্ম্মনৈষ্কর্ম্মনির্ব্বন্ধভাবা দেহস্থযোগিনঃ।
সংযোগাযোগবিরহাদহমাসে যথা সুখম্॥
অর্থানর্থোন মে স্থিত্যা গত্যা শয়নেন বা।
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ তস্মাদহমাসে যথাসুখম্॥
স্বপতো নাস্তি মে হানিঃ সিদ্ধি যত্নবতো ন বা।
নাশোল্লাসৌ বিহায়াস্মদহমাসে যথা সুখম্॥
সুখাদিরূপা নিয়মং ভাবেষ্বালোক্য ভূরিশঃ।
শুভাশুভবিহায়াস্মদহমাসে যথাসুখং॥"]

আনন্দ বা সুখ, ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও আমরা সংসারে যে সুখ অনুভব করিয়া থাকি তাহা লৌকিক। এই লৌকিক আনন্দ বাহ্য, আধ্যাত্মিক সাধন নিমিত্ত ও ব্রহ্মানন্দ অনুভবের সহায়। কারণ বিষয়িগণ এই লৌকিক আনন্দের অনুভব হেতু বিষয়ানন্দে বিতৃষ্ণ হইয়া সেই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বিষয়ানন্দ অবিদ্যাজনিত। অবিদ্যানাশ হইলে বিষয়ানন্দের নাশ হয় ও ব্রহ্মানন্দের ভোগ হইয়া থাকে।

লৌকিক বা বৈষয়িক আনন্দ একবিধ হইলেও উহাতে তারতম্য আছে। সর্ব্বপ্রকার জীব বৈষয়িক আনন্দ সমানভাবে উপভোগ করিতে পারে না। এই জন্য ইতর প্রাণী হইতে মনুষ্যের এবং মনুষ্য হইতে দেবতাদিগের আনন্দ অনুভবের পরিমাণ অধিক। অকামহত বেদাধ্যায়ী এবং বিত্তবিশেষ সমন্বিত মানুষিক আনন্দ হইতে গন্ধর্ব্বগণের আনন্দ শতগুণে উৎকৃষ্ট। মনুষ্য গন্ধর্ব্বগণ

যেরূপ আনন্দ উপভোগ করেন, দেবগন্ধর্ব্বগণ তাহা হইতে শতগুণ আনন্দ উপভোগ করেন। দেবগন্ধর্ব্ব হইতে নিত্যধামবাসী পতৃগণ, নিত্যধামবাসী পিতৃগণ হইতে দেবলোকজাত সুরগণ, স্বর্গপুরজাত অমরবৃন্দ হইতে কর্ম্ম-দেবগণ, কর্ম্মদেবগণ হইতে হবির্ভুজদেবগণ হবির্ভুজদেবগণ হইতে দেবরাজ ইন্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্র হইতে দেবগুরু বৃহস্পতি, সুরাচার্য্য বৃহস্পতি হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে বিষয়বিরক্ত আত্মতত্ত্বপরায়ণ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মজ্ঞগণ তদপেক্ষা শতগুণ আনন্দ উপভোগ করেন।

["সৈষানন্দস্যমীমাংসাভবতি। স একো মানুষঃ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একো মনুষ্য গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহ-তস্য তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বানামানন্দাঃ। স এক পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামা-নন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দঃ। যে কর্ম্মণা দেবানপি যন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ। স একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং ইন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতে-রানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স এক প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ।"]

এইরূপে দেখা যায় প্রজাপতি হইতে ইতর জীব পর্য্যন্ত বিবিধ জীবের আনন্দভোগের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যিনি যেরূপ অধিকারী বা আত্মবিকাশ সম্পন্ন আনন্দের উপভোগও তদনুযায়ী। আবার সকল প্রাণী যেমন একই বিষয়ে সমান আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ মানু-ষের মধ্যেও সকল মানুষ জ্ঞান বিকাশের অভাব হেতু একই বিষয়ে সমান আনন্দগ্রহণ করিতে পারে না। দুইটি বালক যদি একই প্রকার শিক্ষার অধীনে থাকিয়া সমান সাধনার বশবর্ত্তী হইয়া কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়—এই কৃতকার্য্যতার জন্য উভয়ের মধ্যে আনন্দের উপভোগ পরিমাণ সর্ব্বাংশে সমতুল নহে। উহাদের মধ্যে যাহার আত্মবিকাশ অধিকতর প্রস্ফুট হইয়াছে

তাহারই আনন্দোপভোগ পরিমাণ অধিক হইবে। তাহা হইলে বুঝা যায় যে যিনি যেরূপ অধিকারী, যিনি যেরূপ আত্মবিকাশলাভে সমর্থ হইয়াছেন আনন্দোপলব্ধিও তিনি তদনুযায়ী লাভ করিয়া থাকেন।

সেইরূপ মানুষের আনন্দানুভবের পরিমাণ যেরূপ তীক্ষ্ণ পশুপক্ষী আদি ইতর প্রাণীর আনন্দানুভব পরিমাণ তত তীক্ষ্ণ নহে। বিজ্ঞানাচার্য্যগণ অধুনা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে প্রদর্শন করিয়াছেন যে বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ সকলও আনন্দে সাড়া দিয়া থাকে। তবে তাহাদের আনন্দ সেইরূপ বিকাশযুক্ত নহে। ইতর প্রাণীদিগের মনের বিকাশ বা চেতনার বিকাশ অল্প বলিয়া গবাদি পশুও যৎপরোনাস্তি কষ্টবীম্বরে সমর্থ হয়। শস্যক্ষেত্রে যাইয়া শস্যনাশ হেতু পুনঃ পুনঃ তাড়িত হইতেছে, প্রহৃত হইতেছে, আবার সদ্য সদ্য সেই শস্যক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইতেছে। আত্মবিকাশের অভাব হেতু, সুখ দুঃখ বোধের অল্পতা হেতু ইহারা এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। পশুজাতির মধ্যে অপত্যস্নেহজনিত সুখ ও পুত্রবিয়োগজনিত দুঃখও দৃষ্ট হয়। বৎসহারা হইলেও তাহারা শোকসূচক আর্ত্তনাদ করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এরূপ সুখদুঃখ স্থায়ী, মর্ম্মস্পর্শী বা গভীরগাহী নহে। এক্ষণে বিজ্ঞানও দেখাইয়া দিয়াছে বৃক্ষাদি উদ্ভিদজাতীয় জীব ও আনন্দে সাড়া দেয়। তাহারাও হর্ষ দুঃখভয় প্রকাশ করে। এই সমস্ত অবস্থা আলোচনা করিলে বোধ হয় যে একই নিরুপাধিক সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণের বিকাশের তারতম্য অনুসারে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেব মনুষ্য পশুপক্ষী উদ্ভিদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন এবং বহুবিধভাবে স্বীয় লীলা বিস্তার করিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম স্থিতিভঙ্গ রূপ মহাব্যাপার সুসম্পন্ন করিতেছেন।

কথিত আছে পুরাকালে ন্যায় ও মঙ্গলময় বিধান সমূহের অধিষ্ঠাতৃপুরুষ ধর্ম্মদেব যুধিষ্ঠিরকে এই লৌকিক সুখ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ধর্ম্মরূপী যক্ষ জিজ্ঞাসা করেন, "সুখী কে? আশ্চার্য্য কি? পথ কি? এবং বার্ত্তাই বা কি? আমার এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইবে তোমার ভ্রাতাগণ জীবিত হইবেন।" মহারাজ যুধিষ্ঠির উত্তর করিয়াছিলেন যিনি কখন ঋণগ্রস্ত বা প্রবাসী না হইয়া দিবসের শেষভাগে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য বস্তুর অভাবে শাকমাত্র ভোজন করেন তিনিই যথার্থ সুখী।

["যক্ষ উবাচ, কো মোদতে কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কা চ বার্ত্তিকাঃ।

বদ মে চতুরঃ প্রশ্নান্ মৃতা জীবন্তু বান্ধবাঃ ॥

যুধিষ্ঠির উবাঁচ,"

পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বে গৃহে।

অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥"]

যিনি ঋণী তাঁহার মনের স্বাচ্ছন্দ্য একেবারে নষ্ট হয়। তিনি ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়া সতত চিন্তা যুক্ত থাকেন। যিনি প্রবাসী, তাঁহারও চিত্তপ্রসাদ একেবারে নষ্ট হয়। তিনি সতত আত্মীয়বর্গের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিয়া সর্ব্বদা অভাব অনুভব করেন।

ধর্ম্মরূপী যক্ষ যে সুখের কথা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা লৌকিক, অনিত্য, ও খণ্ড। এই লৌকিক সুখ ব্রহ্মানন্দের অংশবিশেষ। এই লৌকিক সুখে যখন কোনরূপ তৃষ্ণা,বাসনা বা কামনার গন্ধ না থাকে, যখন ইহা আত্মতৃপ্তিতে বিভোর তখন ইহা ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়। এই লৌকিক সুখই 'প্রেয়নামে অভিহিত হয়। এবং ব্রহ্মানন্দই 'শ্রেয়ঃ নামে অভিহিত হয়। পরমহিতৈষিণী শ্রুতি বলিয়াছেন শ্রেয়ঃ ও প্রেয় নামে নামক পদার্থদ্বয় মানুষকে সতত অধিকার করিয়া আছে। ব্রহ্মানন্দ ও লৌকিক আনন্দজ্ঞাপক শ্রেয়ঃ ও প্রেয়নামে পদার্থদ্বয় অত্যন্ত ভিন্ন ও বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, শ্রেয়ঃই প্রকৃত সুখ, ও আমাদের বরণীয়। প্রেয় আপাতমনোরম ও দুঃখকর; যিনি জ্ঞানী, যিনি ধীমান্, যিনি সদসদ্বিবেকী তিনিই এই দুঃখ জনক প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ স্বরূপ শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করেন। এই শ্রেয়েরই অপর নাম ব্রহ্মানন্দ বা বিমল সুখ। এস জীব! সেই খণ্ড অনিত্য, ক্ষণিক, লৌকিক সুখাশায় আর মুগ্ধ না থাকিয়া সেই পরিপূর্ণা, শাশ্বতী, নিত্য সর্ব্বভূতাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মানন্দময়ী 'তুষ্টিরূপাকে পাইবার জন্য প্রাণ ও মনে পিপাসার সঞ্চারপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

দাও বল।

দুর্ব্বল জীবন-নাথ! দাও বল, দাও বল।
উঠুক প্রলয় ঝড়,
সর্ব্বধ্বংসী ভয়ঙ্কর,
কি ভয়, কি ভয় নাথ! তুমি যদি দাও বল।
দংশুক সহস্র বিছা
অশনি ? সে ভয় মিছা,
দুর্ব্বল হৃদয়ে নাথ! তুমি শুধু দাও বল।
বিপক্ষে দাঁড়াক ধরা,
ত্যজুক আত্মীয় যারা,
দুর্ব্বল জীবনে নাথ! তুমি শুধু দাও বল।
অপার সাগর বুকে
ক্ষুদ্র কীট ভাসে সুখে।
তোমারি করুণা নাথ! তুমি শুধু দাও বল।

কস্যাচিৎ বালকস্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মঃ, অ, প, রামানন্দরায় মিলন।

"সঞ্চার্য্য রামাভিধ ভক্তমেঘে
স্ব ভক্তিসিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ
স্তজ্জত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি"

অন্বয়ঃ—গৌরাব্ধি (গৌর প্রেম সমুদ্রঃ) গৌরাঙ্গঃ রামাভিধ-ভক্ত মেঘে মেঘতুল্যে) স্বভক্তি নিজভক্তি সিদ্ধান্তানাং (দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস সিদ্ধান্তনাং) চয়ানি (সমূহাদীনি) সঞ্চার্য্য (সঞ্চারণং কৃত্বা) অমুনা রোমা-মেঘেন) এতৈঃ (ভক্তি সিদ্ধান্তময় জলৈঃ) বিতীর্ণৈঃ (বিস্তারণৈঃ) তৎ মৃতানি) তত্ত্বং (বোধত্বং : তেন বোধেন রত্নালয়তাং (রত্ন সমুদ্রতাং)

বঙ্গার্থ—সমুদ্র যেমন আপনার বাষ্পের দ্বারায় মেঘের সৃষ্টি করিয়া, সেই মেঘরাশি আপনাতে পাতিত করিয়া; তাহার দ্বারা শঙ্খ ও মহামূল্য রত্নোৎপত্তি করতঃ আপনাকে রত্নাকর নামে অভিহিত করেন। কলিযুগপাবন দীনদয়াল শ্রীমহাপ্রভু সেইরূপ আপনার ভক্তিরস সিদ্ধান্ত সকল শ্রীরামানন্দ রায়ের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া, তাঁহার মুখে আপনি আস্বাদ করিয়া, সেই আস্বাদিত রত্ন সদৃশ সিদ্ধান্ত সকল জগতে প্রচার করিয়া অবিদ্যাতিমিরাবৃত্ত জগজ্জীবের অন্তঃকরণ হইতে তমঃ বিদূরিত করেন।

উল্লিখিত শ্লোকটীতে সাঙ্গরূপক অলঙ্কার আছে, যাহাতে অঙ্গাঙ্গীভাব বর্ত্তমান থাকে তাহাকে সাঙ্গরূপক কহে। বাষ্প, বৃষ্টি, মেঘ ও মহারত্ন সকল যেমন সমুদ্রের অঙ্গ তেমনি ভক্ত ও ভক্তি শ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গ। প্রেমভক্তি দেবী যেন ভক্তরূপে জগতে মূর্ত্তিমতী হইয়া, ভক্তের অঙ্গের দ্বারা গোবিন্দ সেবা করিয়া সেই অপ্রাকৃত আনন্দ নির্য্যাস আস্বাদ করিয়া আপনি কৃতার্থ হন। শ্রীমহাপ্রভু কেন ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া ভক্তের মুখে প্রেমভক্তি আস্বাদ করেন? এ কার্য্যটী কি তাঁর ললিত ত্রিভঙ্গ বেণুবিনোদি-শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে হয় নাই? ইহার উত্তর এই যেমন কোন পাচিকা নানাবিধ সুরসাল মিষ্টান্নাদি পাক করিয়া, আপনার প্রভুকে আস্বাদ করাইয়া আপনি বিমলানন্দ উপভোগ করেন, প্রভু মিষ্টান্নাদি উপভোগ করিয়া আনন্দানুভব করেন বটে কিন্তু কি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় তাহা তিনি জানেন না; এবং পাচিকাও যে কতদূর আনন্দ অনুভব করিলেন তাহাও জানিতে পারেন না, তবে তাঁহার মুখের একটা অপূর্ব্ব উৎফুল্লতা দর্শন করিয়া ইনি যে, আনন্দানুভব করিতেছেন তাহা জানিতে পারেন মাত্র। সেইরূপ ভক্তিদেবী ভক্তের অঙ্গে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন হৃদয় কটাহে দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি ভিন্ন রসের পাক করিয়া আনন্দময় প্রভুকে আস্বাদ করাইয়া থাকেন এবং আপনিও আনন্দ অনুভব করেন। সাধারণতঃ একটা উত্তম জিনিষ উপভোগ করিলে, ভোক্তার হৃদয়ে তাহার পাকপ্রণালী ও উপকরণ সামগ্রী জানিতে চেষ্টা হয় এবং অন্যকে উপভোগ করাইতেও ইচ্ছা হয়। পূর্ণ কৃষ্ণাবতারে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তে হৃদয়ের ভিন্ন রস মাধুরী প্রভু আস্বাদ করিয়াছিলেন কিন্তু আপনি আনন্দরস উপভোগ করিলেও ভক্তের হৃদয়ে কিরূপ আনন্দোদয় হয় তাহা পরিজ্ঞাত হন নাই, এমন

রাধার প্রেম পরাকাষ্ঠা স্মরণ করিয়াছিলেন। ইহা প্রভুপাদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী ললিতমাধব নাটকে অপরি ফলিত কেশরক বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তিই ভক্তের এক চেটিয়া ধন, ভক্তের কৃপাকে হেতু করিয়া ভক্তি উদিতা হন। ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবলা ইনি জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগের অপেক্ষা করেন না, সূর্য্য যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হইলে পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর দিক আলোকিত হয় সেইরূপ ভক্তি সূর্য্য হৃদাকাশে উদিত হইলে, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞান তাঁহার ছটায় আলোকিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ কর্ম্ম শ্রীগোবিন্দের পরিচর্য্যায়, জ্ঞান,লীলা পরিজ্ঞানে ও যোগ,শ্রীপাদপদ্মের সহিত মনের সংযোগে বাহ্যব্যাপার ভুলিয়া যান যথা কাপিলেয়ে "বাসো যথা পরিকৃতো মদিরা মদান্ধঃ।"

সামান্য মদে মত্ততা নিবন্ধন যখন কোমরে কাপড় আছে কিনা মনে থাকে না তখন অনুরাগমদের মত্ততা দেহ স্মৃতি নষ্ট করিবে ইহাতে কি আশ্চর্য্য আছে এ মদে নেশা কিয়ৎক্ষণ থাকে। কিন্তু অনুরাগ মদের নেশা আর কখনও ছোটেনা বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ভক্তি ভক্তের দেহে প্রকাশিতা হইয়া তাঁহার বাহ্য দৈহিক ব্যাপার ভুলাইয়া দিয়া আপনার ভজন ব্যাপারে নিযুক্ত করেন। কারণ ভক্তির কার্য্যই নিষ্টাভজন, দর্শনশাস্ত্রে আসক্তিতে দেহের জন্ম এবং অনাসক্তিতে স্থূল দেহের বিনাশ কহিয়া থাকেন। ভক্তির অপূর্ব্ব প্রভাব এই যে দেহ রাখিয়া দেহ ক্ষয় করেন, অর্থাৎ অহঙ্কার ক্ষয় করেন। তথা চরিতামৃতে "আমি কৃষ্ণপদ দাসী"। যেমন একটা আনন্দ অনুভব করিতে হইলে একাকী হয় না অনেক লোকের আবশ্যক হয় সেইরূপ শ্রীরাধা মহাভাব স্বরূপিণী হইয়া, অশেষ কায় ব্যূহ প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণসেবানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন এইজন্য রাধার প্রেমের বল এবং আপনার শ্রীমূর্ত্তির মাধুরি ও তদুপভোগজনিত শ্রীরাধার আনন্দ জানিবার জন্য ঠাকুরকে রাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করিতে হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

"কিম্বা কহি কৃষ্ণলীলার বসতি নগরী"

নগরীতে যেমন অনেক লোকের বাস এবং নানাবিধ রসের নানাবিধ আনন্দের দ্বারা পূর্ণা রাধাতে সেইরূপ, শান্ত, দাস্য সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর রস পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি হইয়াছে। সেই রসপূর্ণতা প্রতিক্ষণ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বিভিন্নরূপে কৃষ্ণ সেবা করিতেছেন। তাঁহার পূর্ণতা তথাপি নিরন্তর

জলন, মূলে কিন্তু একদীপ করয়ে গণন” সেইজন্য রামানন্দ রায়ের হৃদয়ে প্রথমে সাধন লইতে আরম্ভ করিয়া সাধ্য শিরোমণি গোপীভাব প্রকাশ করিলেন তৎপরে গোপীভাবের মধ্য দিয়া শ্রীরাধার ভাব চন্দ্রিকার ছটার দ্বারায় তাঁহার হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিলেন। ভোজন করিতে হইলে তিক্ত রস হইতে আরম্ভ করিয়া “মধুরেণ সমাপয়েৎ” অর্থাৎ মধুর রস ভোজনে পর্য্যাপ্তি হয় এইজন্য শ্রীমহাপ্রভুও শ্রীরাধার বিলাস বিবর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে শ্রবণ করিলেন। বর্ষণ হইবার পূর্ব্বে মেঘে যেমন বায়ুর সঞ্চার হইয়া থাকে রামানন্দ রায় মেঘেও প্রভু অনুরাগ বায়ুর সঞ্চার করিয়াছিলেন, সমুদ্রের বাষ্প যেমন মেঘাকারে সমুদ্রে বর্ষণ করিয়া সমুদ্রে রত্নের সৃষ্টি করিয়া জগতের অভাব দূর করেন। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম সাধু ও কৃষ্ণ কৃপায় বৃদ্ধি লাভ করিয়া তাহার দ্বারা গোবিন্দ পরিচর্য্যা করিয়া কৃষ্ণের শক্তি বিশেষ বিগ্রহ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি প্লাবিত হইয়া থাকে। রাধার হৃদয় কি উপাদানে গঠিত এবং কিরূপ প্রণালীতে তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে প্রেম রসের নব মাধুরীর উদয় হয় আমি নিজে অবগত হইয়া এবং আস্বাদ করিয়া জগৎ জীবের চিত্তকে কথঞ্চিৎ সেই ভাবে গঠন করিয়া শ্রীচরণ প্রান্তে আকর্ষণ করিব, তাহা হইলে আর তাহাদের অশেষ যন্ত্রনার লেশ মাত্রও থাকিবে না, যেন দীন দয়াময় এইটী চিন্তা করিলেন। পিতা যেমন আপনার অক্ষম পুত্রকে গুপ্তধন দিয়া যান, প্রভুও তেমনি অন্ধ, খঞ্জ মূক, বধির কলির জীবকে গুপ্ত অহৈতুকী রাধাপ্রেম বিতরণ করিলেন।

নবদ্বীপ গগণে উয়ল দিনরাতি
খনরসে সিঁচল স্থলচর জাতি
দেখ দেখ গৌর জলদ অবতার
বরিষয়ে প্রেম অমিয়া অনিবার
তবধরি জগভরি দুরদিন ভোর
হরিরসে ডগমগ ডাগজনে ভোর
নাচত উনমত ভকত ময়ূর
অভকত ভেক রোয়ত উঁসে দূর
ভকতি লতা তিন ভুবনে বেয়াপ
উত্তম অধম প্রেম ফল পাব
কীর্ত্তন কুলিশ যোগ বনজারি
জ্ঞান নেও ঘন গরজে বিদারি।

চিতবিঃ নিকষিল করম ভুজঙ্গ
নিরমল কলিমদ দহন তরঙ্গ
তাপিত চাতক তিরপিতি ভেল
দশ দিশ সরহুঁ নদী বহি গেল
ডুবল অবনী কাঁহো নাহিঠাম
সংসার বাচলে রহু বলরাম।

মেঘ বর্ষণ করিয়া জীবের বাহিরের তাপ হরণ করেন অন্তরের তাপ হরণ করিতে পারে না কিন্তু অপূর্ব্ব গৌর সমুদ্রের প্রেমসুধারা রামানন্দ মেঘে প্রবিষ্ট হইয়া বৃষ্টি দ্বারায় জীবের বাহ্যাভ্যন্তরের তাপ দূর করিতেছেন

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়
কোন ভাগ্যবান্ জীব দেখিবারে পায়"

মেঘ বাহিরের বস্তকে আপনার বরণ ধারণ করায় কিন্তু গৌর সমুদ্র মেঘের বৃষ্টি ধারা জীবের অন্তর শ্যাম ধাম প্রকাশ করিয়া থাকেন। গৌর সমুদ্র মেঘে শ্যাম বর্ণের প্রকাশ এখানেও মেঘের উৎকর্ষ সাধিত হইল। বর্ষণকারী মেঘে বিদ্যুতের প্রকাশ পায় এখানে রামানন্দ রায় মেঘে প্রাপ্তির আঁশা বিদ্যুৎ অচঞ্চল চঞ্চল ভাবে বিরাজ করিতেছেন।

"আপনে অযোগ্য বলি মনে হয় ক্ষোভ
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ"

ক্রমশঃ।

কুলদাচরণ প্রার্থী
শ্রীহরিদাস শর্ম্মা

সখি! কেবা নিরমিল গোরা তনু খানি কোন্ উপাদান দিয়ে
আঁখির পলকে মূরতি বিথারি প্রাণ উপহার লয়ে
রসে ঢল ঢল সোনার কমল প্রেমের সায়রে নাচে
রাসের হিল্লোলে মৃদু মৃদু দুলে জীবন যৌবন যাচে
সোরা নয় যেন পরশ মাণিক পরশ করয়ে যারে
তাহার সরম ধরম করম কুলের ভরম হরে
কত কোটি চাঁদ ছনিয়া ছানিয়া বিরলে গড়িল বিধি
মনে হয় যেন হিয়ায় লুকায়ে প্রেমের যাজন সাধি
গোরা চাঁদপদ নখর মাণিক হিয়ার আঁধার হরে
লখিতে নারি কোন্ ছাঁদে আসে সাধন উপেক্ষা করে
প্যারিলাল বলে দীন দয়াময় জগৎ তরিবে যদি
আমার হৃদয় কালিমা হরিয়ে দেখাও শকতি সিধি॥

বর্ষগীতি

বরষের পর যেতেছে বরষ আপন চিহ্ন আঁকি'—
সিন্ধু-যাত্রী পথিক আমরা বিস্ময়ে চেয়ে থাকি !
কোথা হ'তে আসে তরুণ আশার লক্ষ উদার ঢেউ,
দেখিতে দেখিতে কোথা মিশে যায় ভাবিয়া না পাই কেউ !
কবে ফুটে উঠে রক্ত তপন উজ্জ্বল করি' ধরা—
পাখীকুল গায় কুসুম বিকাশে বহে বায়ু প্রাণহরা !
মনে অনুমানি বুঝি এ ধরণী কেবলি জোছনা মাখা,
বসন্ত হেথা রহে চিরদিন শান্তির কোলে ঢাকা !
আবার কখন সকলি মিলায় নিমেষ না হ'তে শেষ,
সারাটি বক্ষ কেঁপে উঠে দুখে হা বিধি, হা পরমেশ !
নিমেষে নিমেষে ফুরাইয়া আসে সম্বল যা' ছিল কিছু,
আমরা সবাই বৃথা ছুটে যাই আলেয়ার পিছু পিছু !
নিবিড় সাধনে আকুল রোদনে বরষ বাধা না মানে,
আপনার মনে বেগে চলে যায় অজানিত পথ-পানে।
দু' ফোঁটা অশ্রু নাহি ঝরে কভু, ভুলা'তে ব্যথিত-বাথা—
নাহি ফোটে হাসি অধর-প্রান্তে শুনি কারো সুখ-কথা !
জগতের সব হরিষ-বিষাদে স্থির অচঞ্চল রহি'—
আর্য্য ঋষির মতন কেবল বরষ যেতেছে বহি' !
বিশ্ব তোমার তপোবন কিগো, হে সৌম্য, হে মহান,
কা'র আশা চেয়ে অনন্ত-হৃদয়ে করিতেছ এ ধেয়ান ?
কেবা সে বিরাট দেবতা তোমার, কেবা সে পূজ্য তব ?—
সমুদ্র-যাত্রী পথিক আমরা, তাঁরে কি দেখিতে পাব ?
যা' কিছু মোদের দিয়েছ আদরে যা কিছু নিয়েছ হরি'—
হে বরষ, আজি শেষ মুহূর্ত্তে সাশ্রু-নয়নে স্মরি !
বুঝিতেছি কিছুই মোদের হয় নি ব্যর্থ কভু
সকলি তোমার মঙ্গল ক্রোড়ে পাইয়াছে ঠাঁই প্রভু !
নিঠুরের মতো কেমনে তোমায় দিব গো বিদায় আজ,
নিখিল তেয়াগি এস হে রাজন্, আমাদেরি হৃদি-মাঝ !
হেথা হবে তব পূত রাজধানী—হেথা হবে তব ঘর :
সিন্ধু-যাত্রী পথিক আমরা, সখা তব, নহি 'পর' !

শ্রীননীবালা দেবী